বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

শচীশ-গ্রন্থাবলী

(তৃতীয় ভাগ)

✽

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, - - - - - - - কলিকাতা

গ্রন্থাবলী সিরিজ 4794

(তৃতীয় ভাগ)

১। বেলমতিয়া, ২। রাণী ব্রজসুন্দরী, ৩। বঙ্গ-সংসার,
৪। পূজার মালা, ৫। শ্রীসনাতন গোস্বামী।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

[মূল্য ৯ টাকা

বেলমতিয়া

উপন্যাস

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

উৎসর্গ

চিকিৎসককুল-গৌরব কবিরাজ

শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিরত্ন

সোদরপ্রতিমেষু

ভাই সতীশ,

চল্‌তে চল্‌তে আমরা ক্রমে সমুদ্রকূলে এসে দাঁড়িয়েছি। এ জন্মের আগেও তুমি যেমন দাদা ব'লে আমার বুকে এসেছিলে, ভরসা আছে, জন্মান্তরেও তুমি ভাই ব'লে, সখা ব'লে আমার বুকে আসবে। মধ্যে রেখে যাচ্ছি একটা বাঁধন। বাঁধনটা নেবে কি ভাই ?

তোমার চিরদিনের

শচীশ

বেলমতিয়া

১

সূর্য্য ডুবিল কি না ডুবিল, তা বুঝা গেল না—আকাশে এত মেঘ। আশ্বিন মাস, ঝড়-বৃষ্টির সময় নয়; তবু আকাশে আড়ম্বরটা খুব বেশী। সমস্ত আকাশপট ছাইয়া ঘন মেঘ জমাট বাঁধিল। বাতাস নাই, সব স্থির-গম্ভীর—আকাশে যেন একটা সাজ সজ্জা, একটা আয়োজন চুপি চুপি চলিতেছে। আয়োজন শেষ করিয়া দেবতারা পবনদেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি তখন উত্তর-পশ্চিম কোণে হিমালয়ের এক গহ্বরমধ্যে নিদ্রিত ছিলেন। অকালে নিদ্রাভঙ্গ হেতু তিনি কুম্ভকর্ণের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং উনপঞ্চাশটি অনুচর লইয়া গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ছুটিলেন। বীরপ্রসূ অঞ্জনার ন্যায় মধুমতী নদী তাহার অনিবেদিত যৌবন পবনদেবের চরণে উৎসর্গ করিবার বাসনায় ফুলিয়া উঠিল এবং গর্জ্জনশীল নিষ্ঠুর পতির মনোরঞ্জনার্থ নিজেও ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ধ্বংসলীলায় প্রবৃত্ত হইল।

সব অন্ধকার। যেটুকু আলো আকাশে পৃথিবীতে ছিল, তাহা মেঘ উদরে পুরিয়াছে। মাঝে মাঝে সেই সঞ্চিত আলো উদর চিরিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইতেছে। একখানি সুন্দর পান্সী সেই আলোতে পথ দেখিয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিয়াছে। নৌকার আরোহী অন্নদাপ্রসাদ সিংহ আকাশপানে চাহিয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে বারংবার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ইন্দ্রপুর আর কতদূর?" মাঝি পুনঃ পুনঃ একই উত্তর দিতেছে, "আর বেশী দূর নয় হুজুর।"

অন্নদা বাবু শ্বশুরালয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করত স্ত্রী ও কন্যাসহ গৃহে ফিরিতেছেন। তাঁহার বয়স বেশী নয়—ত্রিশের মধ্যে হইবে। স্ত্রী বেদগর্ভা তাঁর চেয়ে দশ বছরের ছোট। কন্যা বেলমতিয়া মোটে পাচ বছরের। তিন জনই অতি সুন্দর—তাঁহাদের ভিতর-বাহির সব সুন্দর। আকাশ-পৃথিবী শুধু অন্ধকার। হিংস্র অন্ধকার—যে চিরদিন আলোককে বলিয়া থাকে 'আমি নিত্য, তুমি অনিত্য,' সে সেই সৌন্দর্য্যময় মুখ তিনখানিকে, সে আলোটুকুকে গ্রাস করিতে মুখব্যাদান পূর্ব্বক ছুটিয়া আসিল। কিন্তু পদ্মফুলের ন্যায় মুখ তিনখানিকে কিছুতেই উদরে লুকাইতে পারিল না—হিংস্রের প্রয়াস ব্যর্থ হইল।

কিন্তু মেঘের গর্জ্জন বাড়িয়া উঠিল, বায়ুও উনপঞ্চাশ সহচর সহ চীৎকার করিয়া উঠিল, মধুমতীও দেহ দোলাইয়া পতির মনোহরণে প্রয়াস পাইলেন। কন্যা বেলমতিয়া ভয় পাইয়া মায়ের বক্ষে মুখ লুকাইল। অন্নদা বাবু চীৎকার করিয়া মাঝিকে আদেশ করিলেন, "কিনারায় লাগাও।"

মাঝি। বাতাসে ঠেলে আনছে হুজুর, ভিড়তে দিচ্ছে না।

বাবু। তবে ও পারে লাগাও।

মাঝি কি উত্তর করিল, তা শুনা গেল না। নৌকার গলুই সহসা ঘুরিয়া গেল। অন্নদা বাবু জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মালকোঁচা মারিলেন। স্ত্রীকে বলিলেন, "বেলুকে আমার কাছে দেও।"

কন্যাকে বামহস্তে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া অন্নদা বাবু এক জন বলিষ্ঠ যুবা দাড়ীকে কহিলেন, "যদি কোন বিপদ ঘটে রনু, তবে তোর মা ঠাকরুণের ভার তোর উপর—"

রনু কহিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বাবা, কারুর এমন সাধ্য নেই, মা-ঠাকরুণের পায়ের আঙ্গুলে হাত দেয়।"

"সামাল সামাল" বলিয়া মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল। চারিজন দাড়ী বোটে লইয়া নৌকা স্থির রাখিতে চেষ্টা করিল। পান্সী হেলিয়া দুলিয়া স্থির হইল। পৃথিবী আলোকিত করিয়া বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সেই আলোকের সাহায্যে সকলে দেখিল, কিনারা বেশী দূর নয়। সকলের প্রাণে আশা জাগিয়া উঠিল। বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কিনারায় লাগাতে পারলে পাঁচ শ টাকা বখশিষ।"

কথা শেষ হইতে না হইতে একটা দমকা বাতাস সহসা পান্সীকে উল্টাইয়া দিল। কেহই সে জন্য প্রস্তুত ছিল না। যাহারা ভিতরে ছিল, তাহারা সহসা বাহির হইতে পারিল না; যাহারা বাহিরে ছিল, তাহারা দূরে ছিটকাইয়া পড়িল। ক্ষণমধ্যে নৌকা, মানুষ অদৃশ্য হইল।

* * * *

পঞ্চভূতের গর্জ্জন ডুবাইয়া সহসা চীৎকার উঠিল —"বেদগর্ভা !"

উত্তর নাই। নিষ্ঠুর পবন জানাইয়া গেল, সে নাই।

আবার চীৎকার উঠিল—"বেলু !"

উত্তর নাই। একটা মহাকায় তরঙ্গ অন্নদা বাবুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, সে আমারই গর্ভে।

২

লোকে চলিত কথায় বলে, যাকে কৃষ্ণ রক্ষা করেন, তাকে কে মারে? কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল, বেদগর্ভা রক্ষা পাইবেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাকে মারে? মধুমতী স্বীয় গর্ভ হইতে তাঁহাকে তুলিয়া মাথায় করিয়া বহিয়া কিনারায় ফেলিল। মধুমতীর কাজ এইখানে ফুরাইল; কিন্তু সে চৈতন্যশূন্য দেহে প্রাণ দিবে কে? কৃষ্ণ তখন সেই নির্জ্জন অন্ধকারময় ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ নদীতটে তারাপদ ভট্টাচার্য্যকে প্রেরণ করিলেন। তা না হইলে যে রক্ষা হয় না।

তারাপদ যাইতেছিলেন তাঁহার কর্ম্মস্থল জয়পুরে। সঙ্গে স্ত্রী ও কন্যা। মধ্যাহ্নে আহারান্তে নৌকারোহণে যাত্রা করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশনে উঠিয়া পশ্চিমের গাড়ী ধরা। সন্ধ্যাকালে যখন আকাশে মেঘ উঠিল, তখন তিনি কূলে নৌকা লাগাইয়া দু'টা মোটা খোঁটায় বেশ করিয়া নৌকা বাঁধিলেন। মাঝিদের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেই দু'দিকে দুটো খোঁটার সঙ্গে শক্ত দাড়তে নৌকা বাঁধিলেন। বাঁধিয়া দুই দিকের ঝাঁপ ফেলিয়া নৌকার ভিতর বসিয়া রহিলেন। ক্রমে অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া গেল, ঝড়ও বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু তিনি ঝাঁপ ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে ত বেদগর্ভা রক্ষা পান না; তখন কৃষ্ণ একদিকের খোঁটা উপড়াইয়া ফেলিলেন—নৌকা দুলিয়া উঠিল। তারাপদ ব্যস্ত হইয়া নৌকার বাহিরে আসিলেন; বুঝিলেন, একদিকের খোঁটা উপড়াইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ একটা দাঁড়িকে সঙ্গে লইয়া নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। খোঁটা পুতিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার পথের উপর কি একটা পড়িয়া রহিয়াছে। সেই সময় কৃষ্ণ একবার কটাক্ষপাত করিলেন; সেই তড়িতালোকে তারাপদ দেখিলেন, এক সালঙ্কারা সুন্দরী রমণীর দেহ শায়িত রহিয়াছে। খোঁটা পোতা আর হইল না, দাঁড়ীর উপর সে ভার অর্পণ করিয়া তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত রমণীর দেহ উঠাইয়া নৌকার ভিতর আনিলেন। স্ত্রী-পুরুষে দুই জনে অনেক শুশ্রূষা করিলেন। অনেক শুশ্রূষার পর মনে হইল, দেহে প্রাণ আছে; নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, কিন্তু জ্ঞান হইল না।

আকাশ পৃথিবী প্রকৃতিস্থ হইল মধ্যরাত্রিতে; তখন তাঁহারা নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। রেল-ষ্টেশনে পৌঁছিতে রজনী প্রভাত হইল। তৎকালে বেদগর্ভার জ্ঞান হইয়াছে বটে, কিন্তু বাক্‌শক্তি বা উত্থানশক্তি একেবারেই ছিল না। তারাপদ মুস্কিলে পড়িলেন। তাঁহাকে কোথায় কাহার নিকট রাখিয়া যান? এ সালঙ্কারা রূপবতী যুবতীকে যার তার কাছে রাখিয়া যাওয়া যায় না। যদি রমণী কথা কহিতে পারিতেন, তাহা হইলে না হয় তাঁহার ঠিকানা জানিয়া লইয়া বিশ্বাসী ভৃত্যের সঙ্গে স্বামি-গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। নিজে যাওয়া সম্ভবপর নয়; কেন না, পূজার ছুটীর শেষে কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। সময় আর নাই, ছুটী ফুরাইয়াছে—পথে আর বিলম্ব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অবশেষে তারাপদ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

দুই তিন দিন রেলে কাটাইয়া তারাপদ জয়পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁহার একটি বাড়ী ছিল, দাসদাসীও ছিল, সুতরাং কোন অসুবিধায় পড়িতে হইল না। এ কয়দিনে বেদগর্ভার অবস্থা কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই। জয়পুরে আসিবার পর তাঁহার অবস্থা আরও কঠিন হইল। প্রথমে জ্বর হইল, তারপর অনেক উপসর্গ আসিয়া জুটিল। আবার তিনি জ্ঞান হারাইলেন। রাজবৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। স্বামি-স্ত্রী সাধ্যমত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এত সেবা-যত্ন সত্ত্বেও বেদগর্ভার সারিয়া উঠিতে দুই মাস লাগিল।

দুই মাস পরে যখন তিনি সারিয়া উঠিলেন, তখন দেখা গেল, তাঁহার স্মৃতিশক্তি এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার নিজের নাম, দেশের নাম কিছুই তিনি স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসিত হইলে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসুর পানে চাহিয়া থাকেন, তারাপদ বড় ফাঁপরে পড়িলেন। বেদগর্ভার অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল, বামপ্রকোষ্ঠে সোনা-বাঁধান 'লোহা' ছিল। এই সব দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, বেদগর্ভা কোন ধনী ব্যক্তির ঘরণী। তারাপদ-গৃহিণী গহনাগুলি সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া তিন চারি-খানি মোটা গহনা তাঁহার নিত্য ব্যবহারের জন্য

পরিতে দিয়াছিলেন। বেদগর্ভা ব্রাহ্মণ কি শূদ্রকন্যা, তাহার কোন পরিচয় তারাপদ পান নাই। সুতরাং তাঁহাকে একটু তফাৎ রাখিতেন—আহার্য্যাদি স্পর্শ করিতে দিতেন না। বেদগর্ভা বেশ প্রফুল্লমনে সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেন; পূর্ব্বস্মৃতি পীড়ন করিতেছিল না। তবে এক এক দিন তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইত। তখন তিনি ভীতিব্যাকুল নয়নে চারিদিকে নেত্রপাত করিতেন,—কি যেন খুঁজিতেছেন, কি যেন দেখিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি তখন আশে-পাশে থাকিত না—শূন্যে নিবদ্ধ থাকিত। গৃহিণী শোভনা সে সময় চেষ্টা করিয়াও সহজে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেন না।

শোভনার স্নেহ-যত্নের কোন ত্রুটি ছিল না; ছোট বোনের ন্যায় বেদগর্ভাকে দেখিতেন, আর যাহাতে সে সুখে থাকে, সে বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সংসারে পরিজনও কম। একটি ছোট মেয়েকে লইয়া তাঁহার এখানকার সংসার। একটি পুত্র কলিকাতায় তাঁহার ভাশুরের নিকট ছিল; সেখানে সে লেখাপড়া শিখিত। ভাশুর কলিকাতায় একটি কলেজে অধ্যাপক। এখানে স্বামী মহারাজার কলেজে সংস্কৃতাধ্যাপক। বেতন বেশ মোটা। এখানে বিশেষ অশান্তির কিছুই ছিল না। দেশময় খ্যাতি, মহারাজার অনুগ্রহ, বাড়ী-বাগান, অর্থ, স্বাস্থ্য, যা' কিছু সংসারী লোকের কাম্য, তা' তারাপদ এখানে পাইয়াছেন। দুঃখ যা' একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে। তাহাকে জয়পুরে আনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ সহোদর যাদবচন্দ্র আপত্তি করেন। কাজেই তাহাকে দেখিতে মাঝে মাঝে ছুটী লইয়া দেশে যাইতে হয়। জয়পুরে শুধু কন্যাটিকে লইয়া থাকেন।

জয়পুরে অনেক বাঙ্গালীর বাস। কেহ চাকরী করেন, কেহ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। এই সব বাঙ্গালীর মধ্যে যেমন একতা, সহানুভূতি দৃষ্ট হয়, তেমন একতা বা প্রণয় বাঙ্গালার মধ্যে বাঙ্গালীর ভিতর দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালীরা এখানে একটি বৃহৎ পরিবারের ন্যায় বাস করে। এক জন আহত হইলে সকলে সে আঘাত অনুভব করে। এই সব প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে তারাপদর সম্মান যথেষ্ট। তাঁহার পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, লোকানুরাগ, দয়াধর্ম্ম স্থানীয় সকল লোকেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুও অনেক ছিল। তাঁহাদের নিকট তিনি কিছুই লুকাইতেন না। দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেদগর্ভা-সম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনা তিনি অকপটে তাঁহাদের নিকট বলিয়াছিলেন। কিন্তু বেদগর্ভা তখন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান; তাঁহারা সে সময় কেহ এমন পরামর্শ দিলেন না যে, বেদগর্ভাকে অযত্ন কর বা দূরে সরাইয়া দেও। তাঁহারাও তখন তাঁহাদের বাড়ীর মেয়ে-ছেলে পাঠাইয়া শোভনাকে সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বেদগর্ভ যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন বন্ধুরা তারাপদকে পরামর্শ দিলেন, অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীকে তাহার পতিগৃহে পাঠাইয়া দেও। তার পর যখন মাসের পর মাস গড়াইয়া গেল, তথাপি বেদগর্ভার স্মৃতিশক্তির বিকাশ হইল না, তখন তাঁহারা এক বৈঠকে স্থির করিলেন, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল, প্রভাতনাথ কালবিলম্ব না করিয়া এক মুসাবিদা খাড়া করিলেন এবং পড়িয়া সকলকে শুনাইলেন,—

বিজ্ঞাপন

যশোহর জেলার অন্তঃপাতী মধুমতী নদী-সৈকতে একটি বিংশতিবর্ষীয়া রমণীকে অচৈতন্য অবস্থায় গত আশ্বিন মাসের শেষ নাগাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নাম ধাম তিনি বলিতে পারেন না—দুর্ঘটনায় তাঁহার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। রমণী এক্ষণে আমার গৃহে রাজবৈদ্যের চিকিৎসাধীনে আছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাহাকে লইয়া যাইতে পারেন।

এ মুসাবিদার ভুল ধরিতে পারেন, এমন পণ্ডিত সেখানে কেহ ছিলেন না। কেন না, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রভাত বাবুর নাকি অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস ও কবিতাপুস্তক পাঠ করিয়াছেন এবং ইহাও সকলে জানিতেন যে, প্রভাত বাবু মধ্যে মধ্যে ছোট গল্প লিখিয়া কোন এক বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার কলেবর অলঙ্কৃত করেন। সুতরাং তাঁহার বাঙ্গালা রচনার উপর কলম চালাইতে পারেন, এমন শক্তিধারী পুরুষ সে মজলিসে কেহ ছিলেন না। যখন খসড়াটি সকলের মনঃপূত হইল, তখন তারাপদ কতকটা নিশ্চিন্তমনে গৃহে ফিরিলেন এবং পরদিন তাহা তাঁহার ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন, বিজ্ঞাপনটি যেন বঙ্গবাসী কাগজে দেওয়া হয়।

ইহার পরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু কেহ কোন অনুসন্ধান লইল না। তখন তিনি ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিলেন, বিজ্ঞাপনের কেহ কোন উত্তর দিল না কেন? জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন, তিনি

তারাপদর পত্র বিজ্ঞাপনসহ কোথায় রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তখন পরীক্ষার সময়, অনেক কাগজপত্র তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছিল; গোলমালে কোথায় সে মুসাবিদা গিয়াছে, তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিতেছেন না। যাহা হউক, তিনি সেই বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে অন্য একটা বিজ্ঞাপন লিখিয়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাও জানাইলেন। এই পত্রপ্রাপ্তির পর তারাপদ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু মাসের পর মাস, এমন কি, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, কেহই বিজ্ঞাপনের উত্তর দিল না। তারাপদ জানিতেন না যে, তাঁহার ভ্রাতার লিখিত বিজ্ঞাপনটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল;—

বিজ্ঞাপন

জয়পুর যাইবার পথে রেলগাড়ীতে একটি নিঃসহায় মেয়েকে পাওয়া গিয়াছে। যাহার কন্যা হারাইয়াছে, তিনি যেন আমার নিকট অনুসন্ধান করেন।

চারি পাঁচ বৎসরের পর তারাপদর মনের অবস্থা এমন হইল যে, তিনি সদাই শঙ্কিত থাকিতেন, পাছে কেহ বিজ্ঞাপনের উত্তর দেয়। বেদগর্ভাকে কেহ দাবী করে—এ বাসনা তাঁহার মোটেই ছিল না।

৩

একদা মধ্যাহ্নে চন্দনপুরে এক ধনী গৃহস্থের খিড়কী-দ্বারে দাঁড়াইয়া এক ভিখারিণী ডাকিল,—"মা!"

ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে তুই?"

"আমি—আমি কিছু চাইতে এসেছি।"

"ভিতরে আয় দেখি"

ভিখারিণী উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী দেখিলেন, ভিখারী একটি রোগা ছোট মেয়ে। নিকটে ডাকিলেন; মেয়েটি আর দুই পা অগ্রসর হইয়া অধোমুখে দাঁড়াইল। নিকটে একটা পিতলের ঘড়া ছিল, তাহাতে মেয়েটির কাপড় ঠেকিয়া গেল। গৃহিণী রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ঘড়াটা ছুঁলি? তুই কি রকম মেয়ে? ওরে রাধি, ঘড়াটার জল ফেলে দিয়ে মেজে নিয়ে আয়।" বালিকা সঙ্কুচিত হইয়া দুই পা পিছাইয়া গেল। গৃহিণী তখন লক্ষ্য করিলেন, বালিকার পরিধানে একখান জীর্ণ বস্ত্র, জীর্ণ হইলেও বস্ত্রখানি মলিন নয়। রুক্ষ কেশরাশি মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; রুক্ষ হইলেও কেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। অঙ্গ তৈলহীন, কিন্তু দেহের কোথাও একটু ময়লা নাই। মুখখানি শুষ্ক শীর্ণ। সেই শীর্ণ মুখের উপর দুইটি বড় বড় চোখ লজ্জায় সঙ্কুচিত।

বালিকা আবার একটা অপকর্ম্ম করিয়া বসিল—মাছকোটা বঁটি উঠানের এক ধারে পড়িয়াছিল, বালিকার পা সহসা তাহাতে লাগিয়া গেল। তদ্দৃষ্টে গৃহিণী মহাবিরক্ত হইলেন; কহিলেন, "তুই কি রকম মেয়ে? এটায় লাথি মারবি, ওটায় কাপড় ঠেকাবি—যা' ভিক্ষা পাবি নে—গেরস্ত-বাড়ীতে দুপুর-বেলা ভিক্ষে নিতে এসেছে।"

বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। বালিকাও অতি বিষণ্ণ অন্তরে ধীরপদে উঠান ছাড়িয়া খিড়কী-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল, কিন্তু জল চাহিতে সাহস করিল না। দ্বার অতিক্রম করিয়া পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য মুখে চোখে একটু জল দেয়, একটু জল পান করে। মাথার উপর প্রখর রৌদ্র, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, কিন্তু জলে নামিতে তাহার ভরসা হইতেছে না; কি জানি যদি জল স্পর্শ করিলে অপরাধ হয়। সে যে ভিখারী, পরের কৃপাপ্রার্থী, সে কোন্ সাহসে এমন সুন্দর পুকুরের জল স্পর্শ করিবে? গৃহিণী হয় ত এই জলে স্নান করেন, হয় ত তিনি এই জল পান করেন; এ পবিত্র জল, ছিন্নবসনা ভিখারী স্পর্শ করিলে হয় ত কলুষিত হইবে। বালিকা কুণ্ঠিতচিত্তে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইল। কিন্তু জল দেখিয়া তাহার পিপাসা এত বাড়িয়া গেল যে, ভয় আর তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, সে চঞ্চল-চরণে সোপানাবলী অবতরণ করিল। মুখে মাথায় জল দিয়া শূন্য উদর জলে পূর্ণ করিল। যখন উঠিয়া আসিতেছে, তখন দেখিল, ঘাটের উপর একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। বালিকা উপরে উঠিয়া আসিলে স্ত্রীলোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায় বাছা?"

"তা' ত আমি জানি নে।"

"সে কি? কোথা বাড়ী, তা' জান না?"

"না?"

"থাক কোথা?"

"কৃষ্ণপুরে—"

"সে যে এখান হ'তে অনেকটা পথ।"

"হাঁ।"

"তাই বুঝি তোমার আসতে এত দেরী হ'ল?"

বালিকা উত্তর করিল না—অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। যে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তাহার নাম বামা। সে এই বাড়ীতেই থাকে, তবে পরিচারিকারূপে নয়। সে পরিচয় পরে দিব। বামা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কে আছে?"

বালিকা। বুঝি কেউ নেই।

বামা। কেউ নেই? আহা! কা'র কাছে থাক?

বালিকা। এক আয়ি আছে—

বামা। তোমার আপন আয়ি?

বালিকা। না, তিনি আমাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছেন।

বামা। কত দিন হ'তে সেখানে আছ?

বালিকা। তা এক বছর হবে।

বামা। তার আগে কোথায় ছিলে?

বালিকা। চালদেডাঙ্গায়।

বামা। কার কাছে?

বালিকা। একটি স্ত্রীলোকের কাছে অনেক দিন ছিলুম; তিনি আমাকে মানুষ করেছিলেন, বড় স্নেহ করতেন। তিনি মারা যেতে আমি আয়ির কাছে এসেছি।

বামা। আয়ির সঙ্গে বুঝি তোমার আগে জানাশোনা ছিল?

বালিকা। হাঁ; যে স্ত্রীলোকটি আমাকে মানুষ করেছিলেন, আয়ি তাঁরই কি রকম মাসী হন।

বামা। স্ত্রীলোকটির নাম জান কি?

বালিকা। প্রসন্নময়ী।

বামা। তিনি কি জাত?

বালিকা। শুনিছি, তিনি কায়স্থ।

বামা একটু চিন্তা করিল; চিন্তান্তে কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে এস।" বালিকা একটু ইতস্ততঃ করিল। বামা কহিল, "ভয় কি, কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।" বালিকা অনিচ্ছার সহিত ধীরে ধীরে বামার পশ্চাদনুসরণ করিল।

বামা তাহাকে উঠানে বসাইয়া একবার গৃহিণীর অন্বেষণ করিল। গৃহিণী তখন তাঁহার কক্ষে মেজের উপর পড়িয়া পাখা হস্তে এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিলেন। তাঁহার কাঁচাপাকা চুলের রাশি মেজের উপর লুটাইতেছিল। গৃহিণী সরস্বতীর আয়তন কিছু বেশী। তাঁহার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে না; বিধবা হইবার পর তাঁহার চুল অকালে পাকিয়া গেল, দেহের আয়তনও বাড়িয়া গেল। এখন লোকে তাঁহাকে মাংসস্তূপ বলিয়া চুপি চুপি কত রহস্য করে। যাহারা দুধ-ঘি খাইতে পায় না, তাহারাই স্থূলাঙ্গীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাকে। গৃহিণীর বিশ্বাস ছিল, তিনি দোহারা মাত্র; বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা কৃশ হইলে তাঁহার পক্ষে অশোভন হইবে। যাহা হউক, তাঁহার তপ্তকাঞ্চন গৌরবর্ণ সকল দোষ ঢাকিয়া লইয়াছিল। তিনি যখন অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় মেজের উপর গড়াগড়ি দিতেছিলেন, তখন তথায় কোন কালিদাস উপস্থিত থাকিলে কহিতেন, মেজের উপর চম্পকফুলরাশি স্তূপীকৃত রহিয়াছে।

বামা, গৃহিণীকে নিদ্রালু দেখিয়া তাঁহার কাছে আর আসিল না; দূর হইতে প্রস্থান করিল; এবং রন্ধনশালায় দ্রুতপদে আসিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরকে কহিল, "আমার ভাত কই?" পাচক তখন ঝি-চাকরের ভাত থালায় থালায় বাড়িয়া দিতেছিল। কাহারও ভাত কাঁসিতে, কাহারও গামলায়, কাহারও বা থালায়। যে দাসী বা ভৃত্য ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়, তাহার পাত্রে মৎস্য ও ব্যঞ্জনের প্রাচুর্য্য কিছু বেশী। যে দাসী বৃদ্ধা ও মুখরা, তাহার ব্যঞ্জনাদির স্বল্পতা অনেক সময় কলহ সৃষ্টি করিত। পাচক কোন প্রতিবাদ বা যুক্তিতর্ক কানে তুলিত না—প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া স্বল্পকেও স্বল্পতর করিত। এইরূপ অনুগত জনের প্রতি কৃপাবান্ ও প্রতিবাদী পক্ষ প্রতি কৃপাকাতর পাচক মহাশয় বামা কর্ত্তৃক সম্বোধিত হইয়া একটু শ্রদ্ধার সহিত কহিল, "আপনার ভাত ঘরের ভিতর ঢাকা দিয়ে রেখেছি, এনে দি।"

"একটা কলাপাতা এনো।"

বামা উঠানে আসিয়া দেখিল, বালিকা সেখানে নাই। খিড়্কীতে আসিয়া দেখিল, বালিকা দ্বার-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বামা তাহার হাত ধরিয়া উঠানে আনিল। তার পর যখন তাহার পাতে অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়া তাহাকে খাইতে বলিল, তখন বালিকা চুপি চুপি কহিল, "আয়ি এখনও কিছু খায় নি।"

"তুমি খেয়ে তার জন্যে ভাত নিয়ে যেও।"

বামা তাহার অর্দ্ধেক ভাত বালিকাকে তুলিয়া দিয়াছিল; এখন বাকি অর্দ্ধেক নিজে না খাইয়া আয়ির জন্য সরাইয়া রাখিল। বালিকা কহিল, "আয়ির যে অসুখ, সে ত ভাত খাবে না।"

বামা। তবে কি খাবে সে?

বালি। আমি তারই জন্যে ভিক্ষে করতে এসেছিলাম।

বামা। তোমার নিজের জন্যে নয়?

বালি। না।

বামা। তুমি আজ কিছু খেয়েছ?

বালিকা নিরুত্তর রহিল। বামা বুঝিল, সে উপবাসী আছে। কত দিন উপবাসী আছে, কে জানে? বামা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের ঘরে কি কিছু নেই?"

বালিকা সে কথারও কোন উত্তর করিল না। বামা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তা' তুমি এত দুব-গাঁয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছ কেন?"

বালি। গাঁয়ে দু' এক বাড়ীতে একটু দুধ চেয়েছিলুম, বললে, তাদের ছেলেরা খাবে।

বামা বুঝিল, বালিকা একটু দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া জমীদারের দ্বারে ভিক্ষার্থে আসিয়াছে। কহিল, "আচ্ছা, তুমি খেয়ে নাও, তোমার আর ব্যবস্থা পরে হবে।"

বালিকা হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল। বামা কহিল, "খাও মা, লজ্জা কি? এ তো তোমার ভিক্ষে নয়, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে ব'সে খাচ্ছ।"

বালিকার নয়ন-পল্লব আর্দ্র হইল বামা জানিত না, দুই দিন বালিকা কিছু খায় নাই। বামা হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি কি আমার মেয়ে নও? যদি আমাকে পর মনে কর, তবে খেও না।"

বালিকাকে অগত্যা খাইতে হইল।

৪

যে বাড়ীর উঠানে পাত পাড়িয়া ভিখারিণী খাইতে বসিল, সে বাড়ীর একটু পরিচয় প্রয়োজন। বাড়ীটি তিন মহল;—সদর, অন্দর ও রন্ধনশালা। সদর খণ্ডের এখন আর সে শ্রী নাই। কর্তা হরনাথ বসু যখন জীবিত ছিলেন, তখন এ মহল খুব গুলজার ছিল; কলিকাতা হইতে কত বন্ধুবান্ধব আসিয়া হাস্য-কলরবে মুখরিত করিতেন। গান, থিয়েটার কত হ'ত। এখন সেখানে দ্বারবানদের "ভজন" ছাড়া আর কিছু বড় শুনা যায় না। দুই চারি জন কর্ম্মচারীও এখানে থাকে। কাছারী বাড়ী স্বতন্ত্র; সেখানে নায়েব থাকেন। অন্দরমহলও মলিন, শোভাহীন। কোন ছেলেপিলে, কোন বউঝি সেখানে নাই। মলের ঠুনঠুন্, ঘুমুরের ঝুমঝুম্ শব্দ নাই। আছে কেবল কতকগুলো বিধবা, আর ফাটাপায়ের দুপ্‌দুপুনি শব্দ। শিশুর কলকল হাস্য, যুবতীর গুন্ গুন্ গান বহুদিন হইতে সে গৃহে শুনা যায় নাই; এখন শুনা যায় শুধু ফেরিওয়ালার বাজখাঁই গলার ন্যায় কতকগুলো আধবুড়ো মাগীর চীৎকার। অন্দরমহলের পর একটা ছোট উঠান; সেটা পার হইলে রন্ধনশালা, সে শালা যে গুলজার নয়, সে কথা বলিবার যো নাই। পাচক ও দাসী-দের কলহ অহরহ লাগিয়া রহিয়াছে; আর সেই কলহের সময় উভয়পক্ষমধ্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা ফরাসীদেশের পার্লামেণ্টের উপযুক্ত। অস্ত্রশস্ত্রেরও অভাব ছিল না;—হাতা, বেড়ী, ঝাঁটা, নোড়া, বঁটি ইত্যাদি। এ সকল আয়ুধ অস্ত্র-আইনের বহির্ভূত থাকায় অবাধে শত্রুপক্ষকে প্রদর্শিত হইত। গোলযোগ বেশী হইলে অর্থাৎ অস্ত্র-প্রয়োগের সম্ভাবনা ঘটিলে রাষ্ট্রপতি বামা আসিয়া যুধ্যমান যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করিতেন।

তারপর খিড়কী। সে দিকে একধারে গোয়াল, ধানের কয়েকটা মরাই, আর একধারে বেশ একটি পুকুর। গোয়ালে গরু, মরাইতে ধান, আর পুকুরে মাছ—সব পূর্ণ। পুকুরের তিন পাড়ে ফলফুলের গাছ। ফুলে ঠাকুরপূজা ছাড়া আর কিছু হয় না, যুঁই বেল নিয়ে কেউ যে মালা গাঁথবে, এমন মালিনী এ বাড়ীতে কেহ ছিল না। ফুলেরা হয় ত ভাবে, তাদের একটা জন্ম বৃথা গিয়াছে। পুকুরের জলের দুঃখও বড় কম নয়। সে বহুদিন হইতে কোন সুন্দরীর অঙ্গসেবা করে নাই, কোন সুগন্ধি তৈল-সিক্ত কেশের আঘ্রাণ লইতে পায় নাই। কত আশা লইয়া সে জন্ম লইয়াছিল; কত সাধ করিয়া-ছিল, সুন্দরীর অলক্তকরঞ্জিত চরণতল সযত্নে ধুইয়া দিয়া তাহার পদধূলি হৃদয়ে ধারণ করিবে—সালঙ্কারা যুবতীর চিবুক ধরিয়া তাহাকে কত সোহাগ করিবে, চন্দ্রহার কণ্ঠহার কত নাচাইবে দুলাইবে; কত সুন্দর বালককে বুকে ধরিয়া সাঁতার শিখাইবে—কোন সাধই তার মিটিল না। কতকগুলো বুড়ীর গায়ের মলামাটী আর থান-কাপড় ধোয়া ছাড়া আর সে বিশেষ কোন কাজে লাগিত না।

এই পুষ্করিণী যিনি খনন করিয়াছিলেন, তিনি কয়েক বৎসর হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। স্বর্গে কি অপর কোন স্থানে আরোহণ করিয়াছেন, সে কথা ঠিক বলা যায় না। তবে নিমন্ত্রণপত্রে ইহা স্পষ্ট লেখা ছিল যে, হরনাথ বসু মহাশয় স্বর্গারোহণ করি-য়াছেন। পত্রে তাঁহার একমাত্র সন্তান রমণী-মোহনের স্বাক্ষর ছিল, সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই; তবে তিনি তখন নাবালক ছিলেন।

রমণীমোহনের মা ছাড়া সংসারে আর কেহ ছিল না; একটি ছোট ভাইবোন থাকিলেও তাঁহার

ক্ষুধিত প্রাণ অনেকটা শান্ত থাকিত—পথে ঘাটে পরের ছেলে-মেয়ে ধরিয়া বেড়াইতে হইত না। ছোট ছেলে-মেয়ে দেখিলে তাহার মন স্নেহে ভরিয়া আসিত, আর কত আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে জাগিত। তার বয়স বেশী নয়,—বিংশতি বৎসর অতিক্রম করে নাই; কিন্তু এই বয়সেই ভাবে, সে বড় দুঃখী। বাড়ীতে মন বেশী বসে না—কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে বিদ্যাভ্যাস করে। সেখানে তার একটি বাড়ী ছিল, আর তার অভিভাবক স্বরূপ একজন শিক্ষক ছিলেন। কলেজ বন্ধ হইলে বাড়ী চলিয়া আসে। এবার আসিয়াছে গ্রীষ্মের বন্ধে—লম্বা ছুটী।

মা ছাড়া বাড়ীতে আর এক জন ছিল, তাহাকেও রমণীমোহন মাতৃতুল্য জ্ঞান করিত। সে বামা। ত্রিশ বৎসর আগে বামা এ বাড়ীতে আসিয়াছিল গৃহিণীর সখীরূপে। গৃহিণী সরস্বতী পিত্রালয় হইতে তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। যখন দশমবর্ষীয়া সরস্বতী শ্বশুরালয়ে আসিয়া সংসার পাতাইলেন, তখন বামা তাঁহার একমাত্র সহায় ও সম্বল। এখনও তাই। সংসারের সকল ভার তার উপর; তার কথার উপর কথা চালাইতে অনেক সময় সরস্বতীরও সাহস হইত না। দাস-দাসীরা বামাকে যত ভয় করিত, তত ভালও বাসিত।

বামা বড় ঘরের মেয়ে। তার বাপ এক জ্ঞাতির সঙ্গে মামলা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। অর্থাভাবে তিনি আর বিলেতে আপিল করতে পারেন নি; মৃত্যুকালে আপিল করবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, একমাত্র সন্তান বামাসুন্দরীর উপর। বিংশতি-বর্ষ বয়সে বামা যখন পিতাকে হারাইয়া নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইল, তখন সে সরস্বতীর সহিত চন্দনপুরে চলিয়া আসিল। আসিল বটে, কিন্তু ভুলিল না যে, তাহাকে আপিল করিতে হইবে। সে জানিত না যে, এতকাল পরে আপিল আর চলে না; সে আপিল করিবার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া যাইতেছে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, আপিল ক'রে তোমার লাভ কি? ধর তুমি মকর্দ্দমা জিত্‌লে, জমীদারী পেলে, নাতি-পুতি নেই, নিয়ে করবে কি? —বামা তাহা হইলে উত্তর করিত, আমি যাকে ছেলে বা মেয়ে ব'লে গ্রহণ করব, তাকে দেব। অনেকেই জানিত, বামা রমণীমোহনকেই সন্তানরূপে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আজ বামা এক অজ্ঞাত-কুলশীল বালিকাকে কন্যা বলিয়া আদর করিল। এক দাসী শুনিয়া চুপি চুপি রমণীমোহনকে পরে এক সময়ে তাহা বলিয়া দিয়াছিল। রমণী হাসিয়া বলিয়াছিল, "যদি সত্যই আমি একটি বোন পাই, তা হ'লে কি সুখের হয়!"

এই বোন আহারান্তে বামার সহিত হাত ধুইতে পুকুরে গেল। সেখানে রমণীমোহন তখন মাছ ধরিতেছিল। একটা ছিপ হাতে, আর একটা ছিপ পায়ের তলায়। ঘাটের উপরে এক আমগাছ ছিল, তাহারই ছায়ায় বসিয়া রমণীমোহন আর্ভিং সাহেব-লিখিত মৎস্য ধরিবার বিবরণের সত্যাসত্য বিচার করিতেছিল। রমণীকে ঘাটের উপর দেখিয়া বালিকা আর সিঁড়ি নামিতে সাহস পাইল না। বামা ডাকিলে নামিয়া আসিল বটে, কিন্তু ঘাট হইতে কিছু দূরে কাদায় নামিয়া সে হাতমুখ নিঃশব্দে ধুইল। রমণী তাহাকে দেখিতে দেখিতে বামাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে বড়-মা?"

বামা। আমার মেয়ে।

রম। না বড় মা, বল না।

বামা। মেয়েটি কিছু চাইতে এসেছিল।

রম। কি চাইতে?

রামা। রোগীর পথ্য।

রম। পাঁউরুটী বিস্কুট?

বামা। দুর বোকা ছেলে। ওর আয়ির অসুখ করেছে, ঘরে কিছু নেই। তাই ও এসেছে—

রম। আমি এখুনি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি; ঘর কোথা?

বামা। কৃষ্ণপুর, অনেকটা পথ।

রম। তা হোক, আমি ঘোড়ায় যাব।

বামা। বিকেলে যাস্, এখন বড় রোদ।

রম। আমার সামান্য কষ্ট, কিন্তু যে রোগী, তা'র যে ভারি কষ্ট হচ্ছে।

বামা। তুই এখন ডাক্তার আর লোক পাঠিয়ে দে, এর পরে তুই যাস্।

রমণী সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে চলিয়া গেল। বামা একটু পরে কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি মেয়ে?"

"নীরদা।"

"তোমার বাড়ী গ্রামের কোন দিকে?"

"পূবদিকে।"

"তোমার আয়ির নাম?"

"যশোদা।"

"তুমি ডাক্তারের সঙ্গে গাড়ী ক'রে যাও, এত রোদে হেঁটে যেতে পারবে না।"

"কবিরাজ হ'লে ভাল হ'ত—ডাক্তারের ওষুধ হয় ত খাবেন না।"

"ঠিক কথা, আমি তার ব্যবস্থা করছি।"

অর্দ্ধঘণ্টামধ্যে নীরদা বৈদ্য ও ভৃত্য লইয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীতে চাল, ডাল, লবণ, তেল, রোগীর পথ্য, সাবু, বেদানা, লেবু প্রভৃতি অনেক জিনিস ছিল। তাহা দেখিতে দেখিতে নীরদার চক্ষু ভরিয়া জল আসিল।

৫

চন্দনপুর হইতে রত্নপুর প্রায় দুই ক্রোশ পথ। অপরাহ্নে রমণী যখন অশ্বারোহণে যশোদার কুটীর-দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সেখানে গ্রামের দুই চারি জন মাতব্বর ব্যক্তি বৈদ্যকে লইয়া যশোদার রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা অনেক রোগীর কথা, কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের কৃতিত্বের কথা বিবৃত করিতে-ছিলেন। এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিতেছিলেন, পেলারাম কবিরাজের মত বৈদ্য তিনি ভূভারতে দেখেন নাই। একবার তিনি নৌকা করিয়া আসিতেছিলেন, সহসা দেখিলেন, নদীতীরে এক চিতা সজ্জিত হইতেছে—পার্শ্বে শব শায়িত; তদ্দৃষ্টে তিনি তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে নামিয়া পড়িলেন। শব বা মুমূর্ষুকে পরীক্ষা করিয়া এক মাত্রা সূচিকা-ভরণ খাইতে দিলেন। যেমন ঔষধ পেটে পড়া, মুমূর্ষু অমনি উঠিয়া বসিল, পরমুহূর্ত্তে হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। এ রকম কবিরাজ এখন আর জন্মে না—বলিয়া বক্তা অনেক আক্ষেপ করিলেন। এক জন সদ্গোপ একটি বৈদ্যের আখ্যায়িকা আরম্ভ করিতে-ছিলেন, এমন সময় রমণীমোহনের অশ্বের হ্রেষারবে চমকিত হইয়া তিনি আরম্ভেই আখ্যায়িকা বন্ধ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যুক্তকরে প্রণাম করিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণও প্রণাম করিলেন, কিন্তু এ প্রণাম শূদ্রকে নয়, এ প্রণাম অশ্বারোহী জমীদারকে।

রমণীমোহন সকলকে নমস্কার করিয়া রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে বৈদ্যের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈদ্য অতি গম্ভীর-বদনে কহিলেন, "রোগ অতি কঠিন—বাতশ্লেষ্মাবিকার।" রমণীমোহন কুটীরা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। একখানি ছোট খড়ের ঘর, তা' আবার সকল স্থানে খড় নাই—বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে। ঘরের সামনে একটু দাওয়া, তারই এক পাশে একটা উনান। নীচে একটু উঠান। উঠানে একটি তুলসীমঞ্চ, মঞ্চে একটি সজীব তুলসীগাছ। একটি লেবু-গাছ, একটি পিয়ারা-গাছ উঠানের এক পাশে ফল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমণী উঠানে আসিয়া দাড়াইতেই নীরদা নামিয়া আসিল। রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আয়ি কই?"

"ঘরের ভিতর—আসুন।"

রমণী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, তথায় মূর্ত্তিমান্ দারিদ্র্য বিরাজ করিতেছে। দু'চারখানা ছেঁড়া মাদুর, কাঁথা, আর কয়েকটি মাটীর পাত্র ছাড়া ঘরে আর বড় একটা কিছু নাই। নীরদা লক্ষ্য করিল, রমণী গৃহের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে। নীরদার একটু লজ্জা হইল; কহিল, "মা অনেক জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছেন।" রমণী দেখিল, ঘরের এক কোণে কিছু চাল-ডাল পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরে পিতল-কাঁসার কোন পাত্রই রমণীর চোখে পড়িল না; দুই তিন দিনের মধ্যে চুলা জ্বলিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। চালের ছিদ্র দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে, প্রাচীরের স্থানে স্থানে মাটী খসিয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র্যের বিষাদ-মূর্ত্তি দেখিয়া রমণীমোহন স্তব্ধ হইল। আজন্ম সুখে লালিত-পালিত রমণীমোহনের ধারণা ছিল না, সংসারে এতটা অভাব কাহারও হইতে পারে। তার পর কন্থায় শায়িতা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া রমণী-মোহনের ধারণা হইল, বৃদ্ধা খাইতে না পাইয়া রোগশয্যা লইয়াছে। তাহার ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান হইতেছিল, কিন্তু জ্ঞানের অবস্থা বেশী সময় থাকিতে-ছিল না—সত্বরই সে ঘুমাইয়া পড়িতেছিল; তখন নিদ্রাঘোরে অনেক অসংলগ্ন কথা বলিতেছিল। রমণীমোহন রোগীর পার্শ্বে ভূপৃষ্ঠে বসিল। বৃদ্ধার তখন জ্ঞানসঞ্চার হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কে বাবা তুমি?"

রমণী। আমি তোমার নাতি, আয়ি।

বৃদ্ধা। বেঁচে থাকো দাদা; আমি চল্লুম—আমার নীরদাকে দেখো।

রমণী। তুমি যাবে কেন? বৈদ্য বলছেন, ভয় নেই—

বৃদ্ধা। না দাদা, আমার মেয়াদ ফুরিয়েছে। আমি মরি, তা'তে দুঃখ নেই—দুঃখ যা' নীরদার জন্যে। আহা, বাছার আমার কেউ নেই।

রমণী। তার জন্যে ভেবো না—আমি তার ভার নিলুম।

বৃদ্ধা। তুমি কে দাদা? এত মিষ্টি কথা—

রমণী। আমার বাড়ী চন্দনপুরে, হরনাথ বসু আমার পিতা।

বৃদ্ধা। আমাদের জমীদার? অ্যাঃ! বাঁচলুম, ভগবান্ তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন; তিনি যে কারুর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। কত কৃপা দয়ালের—

রমণী। নীরদা, একটু দুধ দেও, আয়ির গলা শুকিয়ে গেছে।

বৃদ্ধা একটু দুধ খাইয়া সুস্থ বোধ করিল। কহিল, "দাদা, নীরদাকে আমি তোমায় দিলাম—তাকে অযত্ন করো না।"

রমণী। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আয়ি!

বৃদ্ধা। নীরদা অজ্ঞাত নয়, আমিও অজ্ঞাত নই—আমার এমন অবস্থা ছিল না দাদা—

বলিতে বলিতে বৃদ্ধা অচৈতন্য হইয়া পড়িল। তাহার চৈতন্য-সম্পাদন করিতে রমণী বিধিমত চেষ্টা করিল; অকৃতকার্য্য হইয়া বৈদ্যকে ডাকিল। তিনি একটু মকরধ্বজ মাড়িয়া রোগীর জিহ্বায় দিলেন। দিলেন বটে, কিন্তু নাড়ী টিপিয়া মুখ বাঁকাইলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি জুতা পায় দিয়া ঘরের ভিতর সশব্দে প্রবেশ করিল। রমণীমোহন চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, আগন্তুক এক জন যুবা পুরুষ—জুতা, জামা, ছড়ি সব আছে: দেখিতেও মন্দ নয়। যুবা কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "এই যে নীরদা।"

নীরদা ভীত হইয়া দূরে সরিয়া দাড়াইল। আগন্তুক কহিল, "এখন চল, গাড়ী এনেছি। আমি তোমাকে কত খুঁজেছি, তুমি এইখেনে এসে লুকিয়ে আছ, তা' কেমন ক'রে জানব বল—কাল সন্ধান পেলুম। নেও, এখন চল।"

নীরদা বাঙ নিষ্পত্তি করিল না। রমণীমোহন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা কোথায় যাবে?"

আগন্তুক। আমার বাড়ীতে।

রমণী। তুমি কে?

আগ। আমি খগেন—নীরদা চেনে।

রমণী। তোমার সঙ্গে নীরদার সম্পর্ক কি?

আগ। সে আমার বাগ্‌দত্তা স্ত্রী।

রমণীমোহন ফিরিয়া নীরদার পানে চাহিলেন। নীরদা নতমুখে কহিল, "না।"

যুবা কহিল, "তুমি এখন যাবে কি না বল?"

নীরদা। না, যাব না।

যুবা! জোর করতে হবে না কি?

নীরদা এবার মুখ তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমি কিছুতেই যাব না।"

যুবা। আচ্ছা, কেমন না যাও দেখ্‌ছি, ভেবো না, আমি একা এসেছি।

রমণীমোহন কহিলেন, "এখানে রোগীর কাছে গোল করো না, বাইরে চল।"

যুবা। নীরদাকে নিয়ে তবে যাব।

রমণী। নিতে হয়, পরে নিও, এখানে গোল করো না।

এমন সময়ে সকলে সচকিতে শুনিলেন, বৃদ্ধা বলিতেছেন, "খগেনের সঙ্গে নীরদাকে পাঠিও না দাদা। ছেলেটা ভাল নয়; ওর কাকী প্রসন্ন, নীরদার নামে বিষয় লেখা-পড়া ক'রে দিয়েছে, তাই ও নীরদাকে বিয়ে—"

আর কথা সরিল না, বৃদ্ধা অচৈতন্য হইয়া পড়িল। নীরদা কহিল, "আমি বিষয় চাই নে, ও নিক্ গে।"

খগেন কহিল, "আমি বিষয় ছাড়্‌ব না, তোমাকেও ছাড়্‌ব না; তুমি এখন দিব্যিটি হয়েছ—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রমণীমোহন তাহার ঘাড় ধরিয়া এক ধাক্কা মারিলেন,—সে উঠানে গিয়া গড়াইল। হাতের ছড়িটা নেবুতলায় গিয়া পড়িল। খগেন উঠিয়া আগে গায়ের ধূলা ঝাড়িল, পরে যষ্টি-সংগ্রহে মনোযোগী হইল। হেঁট হইয়া ছড়ি কুড়াইতে গিয়া গাছের কাটায় পাঞ্জাবীটা ছিঁড়িয়া গেল। ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল; কিন্তু রমণীমোহনকে আক্রমণ করিতে তাহার সাহসে কুলাইল না। সে শুধু শরতের মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল, আর যাইবার সময় বলিয়া গেল, "দেখে নেবো—সব বেটাদের দেখে নেবো—আমি থানায় চল্লুম—হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে ছাড়্‌ব।"

রমণীমোহন সে দিকে আর কান না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবিরাজ মহাশয়, রোগীর অবস্থা কি বুঝছেন?"

"সুবিধা নয়।"

"আজ রাত্রে—"

"না, আজ কিছু ঘটবে ব'লে মনে হয় না।"

"তবে নীরদা, আজ তুমি এখানেই থাক; একা থাকতে হবে না—আমি তার ব্যবস্থা করছি।"

বলিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। বৈদ্যও পিছনে পিছনে আসিলেন। মাতব্বর ব্যক্তিরা তখনও বসিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা তখন দু' চারটি ন'ন, গ্রামের ছেলে ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে ঘোড়া দেখিতে। সহিসের নীল পাগড়ি ও চাপকান দেখিয়া অনেকে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে; কিন্তু মালিকের পানে বড় কেহ চাহিয়াও দেখিল না। রমণীমোহন প্রাচীন

ব্যক্তিদের সমীপস্থ হইতে না হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। এক ব্যক্তির নগ্ন স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ছিল; রমণীমোহন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু আপনারা আমার গুরুজন। এখন আপনাদের নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে—"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

রমণী। এই অনাথা স্ত্রীলোকটি মরণাপন্ন, দেখবার শোনবার কেউ নেই। আপনারা দয়া ক'রে দুইটি স্ত্রীলোককে আজ রাত্রির মত—

চক্রবর্ত্তী। তার আর কি। ওরে রামা, তোর মাকে এখুনি পাঠিয়ে দে, এসে খোড়া দেখিস্। ওরে জগা, তোর পিসীকে ডেকে দে

রমণী। বৃদ্ধা দেহ রাখলে আমি মেয়েটিকে নিয়ে যাব। কবিরাজ বলছেন, আজ রাত কাটলে, কাল আর কাটবে না। কাল সকালে আমি আবার আসব। যতক্ষণ না আসি, আপনারা—

চক্রবর্ত্তী। এ আর বেশী কথা কি, এ তো আমাদের কর্ত্তব্য।

রমণী। কবিরাজ মহাশয় আজকের মত ঔষধ পথ্য দিয়ে গেলেন, কাল সকালেই আবার আসবেন আমি এখন তবে যাই—প্রণাম।

রামা আসিয়া দেখিল, অশ্ব চলিয়া গিয়াছে; তখন সে মহা দুঃখিত হইয়া বন্ধুমহলে চক্রবর্ত্তীকে গালি পাড়িতে লাগিল। জগাও ছাড়িল না, দুই কথা অসাক্ষাতে বলিয়া লইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন সদর্পে মুমূর্ষুর গৃহে প্রবেশ করিয়া রামার মা ও জগার পিসীকে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। নীরদাকে কহিলেন, "তোমার কোন ভয় নেই দিদি, আমি যখন এখানে রয়েছি, তখন তোমার ভাবনা কি?"

নীরদা ভুলিল না, সেই দিন প্রভাতে তাঁর বাড়ীতে একটু দুধ চাইতে গিয়া দুধ পায় নি। গ্রামের কেউ তাঁর পানে ফিরেও চায় নি, আর আজ সকলে তার কুটীর-দ্বারে দণ্ডায়মান।

পরদিন প্রভাতে রমণীমোহন আসিয়া দেখিলেন, নীরদা গৃহে নাই। অনুসন্ধানে জানিলেন, খগেন তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

৬

ইন্দ্রপুর বেশ একখানি বড় গ্রাম। প্রায় তিন হাজার লোকের বাস, অনেকেই শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন, রাস্তা ঘাট, হাট-বাজার, নদী-পুকুর সব ভাল। গ্রামের জমীদার অন্নদাপ্রসাদ বাসভূমির উন্নতিকল্পে সদা যত্নবান ও মুক্তহস্ত। পুকুরে পাঁক নাই, গ্রামের ভিতর বাঁশঝাড় নাই, রাস্তার পাশে জঙ্গল নাই। নদী পূর্ণ, দীঘিকা পূর্ণ, ক্ষেত্রও শস্যপূর্ণ। জমীদার স্বয়ং ঘুরিয়া ফিরিয়া সকল অভাব দেখিয়া বেড়ান; কিন্তু আজ কয় বৎসর তিনি তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়া বাহিরে যান নাই।

তাঁহার গৃহ প্রাসাদ-তুল্য। লোকজন, নায়েব-গোমস্তা, চাকর-বরকন্দাজ, একজন বড় জমীদারের যেমন থাকা প্রয়োজন, তেমনি আছে। প্রয়োজন না থাকিলেও অনেক ক্ষেত্রে দেউড়ীর শোভা সম্পাদনার্থে বরকন্দাজ রাখা হয়। বন্দুক ধরিয়া শান্ত্রী পাইচারি না করিলে, বন্দুকের কুঁদা দিয়া ভিখারীকে না মারিলে গৃহস্বামীর সম্মানের লাঘব হয়। কিন্তু এখানে অন্নদা বাবুর দেউড়ীতে কাহারও হাতে বন্দুক ছিল না।

অন্দরমহলে দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় অনাত্মীয়ের ভিড় যেমন ধনী ব্যক্তির গৃহে সচরাচর হইয়া থাকে, তেমনি ভিড় ছিল। তবে সদরে অনুচরবৃন্দের মাথার উপর যেমন দেওয়ান ছিলেন, অন্দরমহলে তেমন কোন মাথা ছিলেন না। কর্ত্রী আজ কয়েক বৎসর সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; কিন্তু অন্নদাবাবুর বিশ্বাস, তাঁহার স্ত্রী মরেন নাই কেন না, তাঁহার দেহ নদীগর্ভে পাওয়া যায় নাই। শত শত ব্যক্তি তাহার দেহ অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই। ঘটনার স্থান হইতে অনেক দূরে একটি ছোট খালের বিকৃত দেহের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছিল, পরে দুইটি জামাও পাওয়া গিয়াছিল। এই সব দেখিয়া সকলে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, এই দেহাবশেষ বেলমতিয়ার। এই দুর্ঘটনার পর হইতে অন্নদাবাবু সকল কার্য্যে উৎসাহশূন্য। কিন্তু তাঁহার অন্দরমহলের অধিবাসীরা কর্ত্রীর অভাবে খুবই উৎসাহযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

কর্ত্রীর তিরোধানের পর অন্দরমহলে ভিড় বাড়িয়াছে বই কমে নাই আত্মীয় অনাত্মীয়ের শুভাগমন ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিস আসিয়াছে—যথা, কলহ, কোলাহল, আবর্জ্জনা, বিশৃঙ্খলতা। অধিবাসীরা কেহ কাহাকে মানে না, নেতা বলিয়া কেহ কাহাকে স্বীকার করিতে চায় না—সকলেই নেতা হইতে চায়। কিন্তু এক মধ্যবয়সী মহিলা কর্ত্রী হইবার জন্য যেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তেমন আর কেউ নয় কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনি যে,

কেহ তাঁহাকে কর্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। কোন দাসীকে তিনি তিরস্কার করিলে দাসী দশকথা শুনাইয়া দিত, কোন পুরমহিলাকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে তিনিও কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দান করিতেন। সকল দিকে তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হইলেও তিনি কর্ত্তৃত্ব করিতে ছাড়িতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তিনি এক দিন এই সংসারে কর্ত্রী হইবেন; কর্ত্রী হইয়া এই সব অবাধ্য প্রজাকে কিরূপে শাস্তি দান করিবেন, তাহাও তিনি কল্পনায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবাধ্য প্রজাদের একটা তালিকা তিনি মনে মনে ছকিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দিন দিন সে তালিকা বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

এই মহিলার নাম শান্তমণি। তাঁহার মুখের ভাব বা তাঁহার কার্য্যাদি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে শান্ত বলিয়া একেবারেই মনে হয় না। আমাদের মনে না হইলেও তাঁহার নামদাতার মনে হইয়াছিল; সুতরাং নামটা আটকাইয়া গিয়াছে—এখন আর কোনমতেই ছাড়ান যায় না। এই সংসার বা গৃহকর্ত্তার সহিত তাহার কতটুকু সম্বন্ধ, তাহা তিনি ব্যতীত অপর কেহ সম্যক্ অবগত ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক দিন বালিকা কন্যা দেবযানীর হাত ধরিয়া অন্নদাবাবুর সম্মুখে আসিয়া সখেদে কহিলেন, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, এখন তুমি আমায় আশ্রয় না দিলে আমার উপায় নেই।" বিস্মিত অন্নদাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" উত্তর হইল—"আমি তোমার পিসী গো, এই তোমার বোন"—ইত্যাদি। সম্বন্ধ স্থাপিত হইল—তিনি গৃহে রহিয়া গেলেন। তখন সংসারে কর্ত্রীর অভাব হয় নাই।

তা'র কিছুকাল পরে কর্ত্রীর অভাব হইল; ইতিমধ্যে শান্তমণির দারিদ্র্যক্লিষ্ট দেহও সবল হইয়া আসিয়াছিল। কন্যা দেবযানার ত কথাই নাই, তিনি দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িয়া উঠিতেছেন। বাড়িয়া উঠিয়া এখন তিনি বিদ্যাপতির বর্ণিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছেন, যথা—'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল, শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল।' বয়সের সঙ্গে রূপও বাড়িয়া উঠিল। রূপ ও যৌবন সঙ্গে লইয়া দেবযানী এ গৃহে আসেন নাই। সম্ভবতঃ ইন্দ্রপুরের তাজা মৎস্য-মাংস, সুপেয় দধি-দুগ্ধ, নাটক-নভেল প্রভৃতির সম্মিলিত শক্তি, যৌবনের শোভাসম্পদ আনিয়া অকালে দেবযানীর অঙ্গে বিস্তার করিল। এই রূপ আর যৌবন দেবযানীকে যেমন উন্মত্ত করিয়া তুলিল, তাহার মায়ের প্রাণেও তেমনি বহু আশার সৃষ্টি করিল। কন্যার একাদশ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইতে না হইতে শান্তমণি তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বাদশ বৎসরে ত কথাই নাই; কিন্তু কন্যা যখন ত্রয়োদশ অতিক্রম করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরে পা দিল, তখন তিনি একরূপ নিশ্চিন্ত হইলেন, কন্যার বিবাহের কারণ আর তাঁহার কোন উদ্বেগ রহিল না। তিনি যে অচিরে সংসারে কর্ত্তৃত্ব-পদ লাভ করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। কর্ত্রী হওয়া যা, আর কর্ত্রীর গর্ভধারিণী হওয়াও তাই। তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ পদমর্য্যাদা কল্পনা করিয়া লইয়া পদোচিত চাল-চলন, গাল-মন্দ চালাইতে লাগিলেন। সুতরাং বাড়ীতে খুবই ঝগড়া বাধিয়া উঠিল।

অন্তঃপুরে পিসী, মাসী, দিদি, কাকী প্রভৃতি বহুপূর্ব্ব হইতেই অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। তাঁহারা বিশেষ নিকটাত্মীয় না হইলেও শান্তমণি অপেক্ষা দূর-সম্পর্কীয়া নহেন। তাঁহারা সুতরাং নবাগতের প্রভুত্ব কোনমতেই স্বীকার করিলেন না। স্বীকৃত না হইলেও প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা অবিরাম চলিতে লাগিল। আশা যত বাড়িতে লাগিল, চেষ্টা ততই প্রবল হইল। অবস্থা এমনি দাঁড়াইল যে, প্রত্যহ প্রভাত হইতে রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত অন্তঃপুরমধ্যে অবিরাম একটা যুদ্ধ চলিত; কাকপক্ষী দূরে যাক্, মশা মাছিও সে গৃহ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল এবং একটা বৈঠক বসাইয়া বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিবার মতলব আঁটিতেছিল।

কাক-পক্ষীরা গৃহত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু পুরমহিলারা কেহই গৃহত্যাগ করিলেন না। তাঁহারা বরং উত্তেজিত হইয়া পরদিন কলহ কিরূপে করিবেন, তাহার একটা মহলা রাত্রিতেই দিয়া রাখিতেন। কোন্ কোন্ বাক্যবাণ শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিলে শত্রু কাতর হইয়া পড়িবে, তাহাও চিন্তা করিতে করিতে বিনিদ্র অবস্থায় রজনী অতিবাহিত করিতেন। কলহে সর্ব্বাগ্রগণ্যা ছিলেন এক শীর্ণকায়া গৌরবর্ণা প্রাচীনা রমণী। তিনি সম্পর্কে অন্নদাবাবুর খুল্লতাত-পত্নী ছিলেন। তাঁহাকে এ যাবৎ অনেকেই সম্মান করিয়া চলিত; এমন কি, গৃহকর্ত্তা বা কর্ত্রীও বড় একটা তাঁহার অবাধ্য হইতেন না। এই বহু-সম্মানাস্পদ পদ—কর্ত্রীর উপরেও কর্ত্তৃত্ব—তিনি এ যাবৎ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বিনা বাধায়; তা' সেটা বুদ্ধি-বলেই হউক অথবা রসনার তেজেই হউক, কিন্তু এক্ষণে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ধনুকে টঙ্কার দিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। বালিরাজার ন্যায়

তিনি এই সুগ্রীবকে মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিতে পারিতেন, যদি পিছনে রাম না থাকিতেন।

এই রাম জন্ম লইযাছিলেন দেবযানীরূপে শান্তমণির জঠরে। যে তীক্ষ্ণশর বালিরাজাকে আহত করিযাছিল, বুঝি তদপেক্ষা তীক্ষ্ণশর আঁখিতে লইযা দেবযানী যখন গৃহস্বামীর কক্ষে ঘন ঘন যাতাযাত করিত, তখন শত্রু-পক্ষীযেরা কিছু চঞ্চল হইযা পড়িত। বালিবাজা-পক্ষীয কোন কোন দুর্ব্বলচিত্ত অনুচর ভাবিত, যাহার পশ্চাতে রূপ-যৌবন প্রভৃতি শস্ত্র লইযা রামচন্দ্র দণ্ডাযমান, তাহাকে ধ্বংস করা সম্ভবপর নয। এই সকল দূরদর্শী ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সুগ্রীব-পক্ষে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিলেন; আবাব কেহ কেহ বা দুই পক্ষেই রহিলেন, অর্থাৎ দুই পক্ষকেই চুপি চুপি জানাইলেন যে, আমি তোমারই হিতৈষী— শত্রুপক্ষের নিকট হইতে তথ্য লইবাব জন্য আমি তাহার সহিত মিশিতেছি।

এই সকল রাজনৈতিক ব্যাপার যে তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে সংঘটিত হইতেছে, তাহা গৃহস্বামী একেবারেই অনবগত। তিনি যে কোন দিন দেবযানীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য কবিযাছিলেন, তাহা মনে হয না। দেবযানী শরক্ষেপ করিযা থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহা বক্ষ ভেদ কবিতে পারে নাই। পুনবায দার পরিগ্রহ কবিতে কোন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি অন্নদাবাবুকে পবামর্শ দিযাছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদেব যুক্তিযুক্ত প্রস্তাবে হাঁ কি না কিছুই বলেন নাই। তাঁহাকে মৌনী দেখিযা কন্যার আত্মীযেরা ঘন ঘন যাতাযাত আরম্ভ করিলেন এবং অন্নদা বাবুকে এতই উত্ত্যক্ত করিযা তুলিলেন যে, তাঁহাকে বাধ্য হইযা আদেশ দিতে হইল, কোন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব লইযা আসিলে তাঁহার দর্শন পাইবে না। তার পর হইতে আর কেহ বিবাহের প্রস্তাব লইযা তাঁহার নিকট আসিতে সাহস পাইত না।

ঘটক ও অবক্ষণীযা কন্যাদের আত্মীযের হাত হইতে পারত্রাণ পাইয়া অন্নদা বাবু যে নিশ্চিন্ত হইবেন, এরূপ সম্ভাবনাও ছিল না। অন্দবের ঘটক নিয়ত আসা যাওযা করিযা তাঁহাকে অনেক সময বিরক্ত করিত। স্ত্রী-কন্যা মধুমতীর জলে হারাইয়া অন্নদা বাবু সংসারে এতই বীতরাগ হইযাছিলেন যে, তিনি অন্দরমহলে আর প্রবেশ করিতেন না। সদর অন্দরের মধ্যে দুইটি বড় ঘর ছিল, তিনি তথায অবস্থান করিতেন এবং দিবারাত্র বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে অতিবাহিত করিতেন। কেহ আসিযা পাঠে ব্যাঘাত ঘটাইলে তিনি বড়ই বিরক্ত হইতেন। শান্তমণি আসিযা বস্ত্রালঙ্কারের দাবী করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেন। দেবযানা পানীয বা আহার্য্য লইয়া আসিলে "রেখে যাও" বলিযা তাহাকে ত্বরায বিদায করিতে চেষ্টা পাইতেন। দেবযানী সহজে বিদায হইত না, মাযের উপদেশমত এটা ওটা নাড়িয়া চাড়িযা ঘরময ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন দেখিত, গৃহস্বামী তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না, তখন সে ক্ষুন্নমনে প্রস্থান করিত। কিন্তু দেওযান আসিলে অন্নদা বই ফেলিযা উঠিযা দাঁড়াইতেন। একদা দেওযান আসিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি ইচ্ছে করেছি, একবার তীর্থ ঘুরে আসি।"

অন্নদা। বেশ, যান্।

দেও। কিন্তু বিষয দেখবে কে?

অন্ন তাই ত—

দেও। তুম নিজে দেখ ত আমি যেতে পারি।

অন্ন। আমাকে আর ও-সব ঝঞ্ঝাটে জড়াবেন না।

দেও। আমার অবর্ত্তমানে বিষয কে দেখবে?

অন্ন। কাকা, বিষয ত আপনার। আমি পিতার মুখে শুনেছি, আপনি মামলা-মকর্দ্দমা ক'রে সামান্য বিষযকে এত বড় কবেছেন। আপনি আপনার বিষয রক্ষার্থে যেরূপ ব্যবস্থা করবেন, সেইরূপ হবে।

দেও। (সজল-নযনে)। বাবা, বুড়ার একটা অনুবোধ তোমাকে রক্ষা কবতে হবে।

অন্ন। আজ্ঞা করুন।

দেও। তোমাকে বিযে করতে হবে।

অন্ন। প্রয়োজন কি, বেশ ত চ'লে যাচ্ছে।

দেও। তোমার আমার অবর্ত্তমানে বিষয় কার হাতে যাবে? এক দূর-সম্পর্কীয জ্ঞাতি আছে, তা'কে দেওযাই কি তোমার ইচ্ছে?

অন্ন। না, না; আপনার ছেলে কিরণ আমার অবর্ত্তমানে বিষয পাবে। আমি সেইমত উইল করব।

বৃদ্ধ দেওয়ান রামকুমার মুখোপাধ্যায কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "বাবা, তুমি যে আমার বড় ছেলে।"

অন্ন। কাকা, আর কিছু কাল আমাকে অবসর দিন্।

দেও। বেশ। তীর্থযাত্রা এখন তবে আর করব না।

অন্নদাপ্রসাদ একটু হাসিযা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

৭

জয়পুরে আসিয়া বেদগভার নাম হইয়াছিল—পুষ্প। তিনি সেই নামেই সাড়া দিতেন; নামটি তাঁহার বেশ মনে থাকিত। গৃহের কাজকর্ম্ম তিনি বেশ করিয়া যাইতেন, কোনরূপ বিস্মৃতি ঘটিত না। শোভনা এক দিন সিন্দুর ও আলতা পরাইয়া দিয়াছিলেন, তদবধি তিনি নিজেই সিন্দুর ও আলতা পরিতেন, কোন ভুল হইত না। সকল কাজই তিনি ঠিক করিয়া যাইতেন, বিশেষ কোন ভুল হইত না; তবে এক এক দিন মাথাটা কি রকম বিগড়াইয়া যাইত। সে সময় কেহ ডাকিলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, কথার উত্তর বড় একটা দিতেন না; যদি দিতেন, সে সব কথার শৃঙ্খলা বড় একটা থাকিত না। কি যেন ভাবিতেন, দূরে যেন কি দেখিতেন, কখন বা ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেন। প্রতীতি হইত, একটা ভয়াবহ স্মৃতি তাঁহার মনের দুয়ারে সে সময় ঘা দিতেছে। কিন্তু স্মৃতির শৃঙ্খলা ছিল না—এক একটা দৃশ্য মনের সম্মুখে ক্ষণেকের জন্যে আসিয়া সরিয়া যাইত। কখন দেখিতেন, ভয়াবহ অন্ধকার—আকাশে পৃথিবীতে কোথাও আলো নেই, সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তিনি একা। আবার কখন দেখিতেন, চারিদিকে সর্প-জিহ্বার ন্যায় বিদ্যুৎ চমকিয়া তাঁহাকে দংশন করিতে আসিতেছে। কখন বা মানস নয়নে দৃষ্ট হইত, বায়ুবিক্ষোভিত অনন্ত জলরাশি, আর সেই উত্তাল তরঙ্গশৃঙ্গোপার ভাসিয়া চলিয়াছেন তিনি একা। এই সব দৃশ্য অতর্কিতভাবে তাঁহার মনের ভিতর ক্ষণেকের জন্যে ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ভয়কাতর করিয়া তুলিত। সে সময় তাঁহাকে উন্মাদিনী বলিয়া প্রতীত হইত। রাজবৈদ্যের চিকিৎসা সত্ত্বেও বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।

একদা অপরাহ্ণে একটা ছোট ঘরে মোজা সেলাই করিতে করিতে শোভনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বোন, তোমার দেশ কোন্ গাঁয়ে বলতে পার?"

"দেশ—দেশ? কেন, জয়পুর নয় কি?"

"জয়পুরে ত আমরা তোমাকে এনেছি; তার আগে কোথায় ছিলে?"

পুষ্প চিন্তা করিয়া কহিল, "সে যে অনেক দিনের কথা—না দিদি, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, এই আমার দেশ।"

শোভনা সে কথার কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি নাম ছিল, বলতে পার?"

পুষ্প। কেন, পুষ্প।

শোভ। পুষ্প নাম ত আমরা তোমাকে দিয়েছি; তার আগে তোমার নাম কি ছিল?

পুষ্প। নাম বুঝি আবার বদলায়? আমি চিরকালই পুষ্প।

শোভ। তুমি এত গহনা কোথায় পেলে?

পুষ্প। তুমি দিয়েছ।

শোভ। আমি দিইনি, তুমি এনেছ।

পুষ্প। আমি আবার কোথা হ'তে আনব? এ সব কথা কি বলছ দিদি?

এমন সময় উভয়ে দেখিলেন, দ্বারের উপর তারাপদ দণ্ডায়মান। শোভনা মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন; দেখাদেখি পুষ্পও কাপড় টানিল।

সদানন্দ তারাপদর আর সে প্রফুল্লতা নাই, যেন সে শরৎ হরণ করিবার লইয়া কে তাঁহার মুখের উপর বিষাদ-কালিমা লেপন করিয়াছে। তিনি এখন সতত বিমর্ষ, চিন্তাকুল। পূর্ব্বে তিনি দিবা যামিনীর অধিকাংশ সময় পাঠে অতিবাহিত করিতেন, গভীর রাত্রিতে যখন সকলে সুপ্ত, তখনও তিনি পুস্তক লইয়া পড়িয়া থাকিতেন; শোভনা কত অনুযোগ করিত, সতীন বলিয়া গ্রন্থকে কত গালি পাড়িত; কিন্তু তিনি পুস্তক ছাড়িয়া উঠিতেন না। এখন সেই সব পুস্তকরাশিতে তিনি আর সুখ খুঁজিয়া পান না; যে সকল ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র তাঁহার প্রাণতুল্য ছিল, এখন সে সকল গ্রন্থ সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া তিনি অন্যমনে একখানি মুখ শুধু চিন্তা করিতে থাকেন। পূর্ব্বে তিনি অন্দরমহলে কদাচিৎ আসিয়া দর্শন দিতেন। শোভনা—তাঁহার বয়স বেশী নয়, ত্রিশের মধ্যে হইবে—স্বামীর সঙ্গসুখের জন্য লালায়িত হইলেও, আহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত বড় একটা তাঁহার দর্শন পাইতেন না। কিন্তু এখন সে স্বামী অন্দরমহল পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে চান না; কোন দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কলেজ হইতে চলিয়া আসিয়া গৃহের ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলে ইদানীং মিথ্যা কথা বলিয়া স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা করিতেন।

পূর্ব্বে তিনি সন্ধ্যার সময় বন্ধুগৃহে গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন; এখন বড় একটা আর যান না; যদি যান, অল্পক্ষণ থাকিয়া চলিয়া আসেন। এইরূপ অস্বচ্ছন্দ ও অপ্রকৃতিস্থ মন লইয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

সুস্থমন সুস্থদেহ শোভনাকে আগে তিনি পরম রূপবতী বলিয়া জানিতেন—তাঁহার তুলনায় স্বর্গের দেবীও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। এখন বুঝিয়াছেন, শোভনার সৌন্দর্য্যে চাঞ্চল্য নাই, তরঙ্গ নাই, উন্মাদিনী শক্তি নাই—পুষ্পের তুলনায় তিনি অতি তুচ্ছ। গৃহে ছুটিয়া আসিতেন শোভনাকে দেখিতে, এখন ছুটিয়া আসেন পুষ্পকে দেখিতে। দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া যখন আলুলায়িতকুন্তলা পুষ্পকে তারাপদ দেখিলেন, তখন তাঁহার নয়ন আর সব তুচ্ছ করিয়া পুষ্পের বদনে নিবদ্ধ রহিল। পিপাসাতুর যেমন জলের প্রতি চাহিয়া থাকে, তারাপদ তেমনি পুষ্পের বদনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। শোভনা ধীরকণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ এত সকাল সকাল যে?"

তারাপদ চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া উত্তর করিলেন, "শরীরটা তেমন ভাল নেই।" অসঙ্কোচে মিথ্যা বলিলেন। এখন আর মিথ্যা বলিতে বড় বেশী বাধে না। যুধিষ্ঠির এক দিন নিজের স্বার্থ-পানে চাহিয়া মিথ্যা বলিয়াছিলেন; তারাপদ হয় ত ভাবিতেন, তাঁহার স্বার্থ কি ধর্ম্মপুত্রের চেয়ে কিছু কম? কিছুতেই কম নয়, বরং বেশী। রাজ্য ত' অতি তুচ্ছ, অতি অনিত্য; এই অনিত্য বস্তুর জন্যে মিথ্যা কথা? প্রবঞ্চনা? তারাপদ কোন কালেই এই মিথ্যার জন্য যুধিষ্ঠিরকে শ্রদ্ধা করিতেন না।

শোভনা কহিলেন, "আজকাল দেখছি, তোমার শরীরটা প্রায়ই খারাপ হয়, বদ্যি দেখাও না কেন?

তারা। দেখিয়েছিলাম। বদ্যি বলেন, অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাথার ব্যামো হয়েছে; এখন চাই শুধু বিশ্রাম।

শোভ। বিশ্রামই লও না কেন?

তারা। বিশ্রাম নিলে কি চলে? খাব কি?

শোভ। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না; এখন কিছু দিনের জন্যে ছুটী নিয়ে চল দেশে যাই।

তারা। দেশে এখন যাব না।

শোভ। তবে কি করবে মনে করেছ?

তারা। এখনও কিছু স্থির করিনি—দেখি।

শোভ। তুমি যদি দেশে না যাও, তবে আমরা তোমাকে একা ফেলে দেশে চ'লে যাব।

তারা। ইস্!

শোভ। ইস্ বল্‌লে হচ্ছে না, আমরা এখানে আর বেশী দিন থাক্‌ছিনে; কত দিন দেশে যাইনি, দিদি কত লিখছেন—

তারা। পরে দেখা যাবে।

বলিয়া তিনি পরিচ্ছদ বদলাইতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। শোভনা হাতের কাজ ফেলিয়া স্বামীর পশ্চাদনুসরণ করিলেন এবং তাঁহার চাপকানের বোতাম, জুতার ফিতা খুলিয়া দিয়া, তাঁহার হাতে কাপড় তুলিয়া দিলেন। স্বামী অভ্যাসমত সমস্ত সেবা লইয়া অতি শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, "আর পারি না শোনা!"

স্ত্রী কি পার না?

স্বা। শরীর বইতে।

স্ত্রী মন ক্লান্ত না হ'লে শরীর সহজে ক্লান্ত হয় না।

স্বা। মনও বুঝি ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছে।

স্ত্রী। কেন, যুদ্ধ ক'রে?

স্বা। যুদ্ধ? কার সঙ্গে?

স্ত্রী। আমার শ্বশুর মহাপুরুষ ছিলেন, মৃত্যুকালে তিনি তোমাকে যা' ব'লে গেছেন, সে কথাটা ভুলো না।

স্বা। কি কথা? আমার ত তা স্মরণ নেই।

স্ত্রী। তিনি বলেছিলেন, কখন ভুলো না, তুমি ব্রাহ্মণসন্তান।

স্বা। তা'তে কি?

স্ত্রী। তা'তেই সব—বুঝে দেখ।

বলিয়া শোভনা হাত-পা ধুইবার জল রাখিতে প্রস্থান করিলেন। তারাপদ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সময় দাড়াইল না, স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিল। মাথার উপর ঘড়ীটা টক্ টক্ করিয়া মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজাইয়া চলিল। তারাপদ একাসনে বসিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ কন্যা কাজল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, মা কই?"

কাজলের বয়স এগার বারো হবে; মায়ের মতই সুন্দর। তারাপদ উত্তর করিলেন, "জানিনে।"

"তবে তুমি এসো।"

"কোথা?"

"মাসী-মা কি রকম করছেন।"

"কি রকম করছেন?"

"হাতের সেলাই ফেলে দিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে কি রকম ক'রে চেয়ে আছেন। মানুষে হঠাৎ

ভূতপ্রেত দেখলে ভয়ে যেমন কাঁপে, মাসীও তেমনি কাঁপছেন।"

"আমি এখন যেতে পারব না।"

"মা যে কোথায় গেলেন!"

"ঠাকুর-ঘরে দেখ গে দিখি।"

কন্যা প্রস্থান করিল। ক্ষণপরে শোভনা আসিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝি এখনও ওঠনি? ওঠ ওঠ, হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে বেড়াতে যাও। খোলা মাঠে একটু বেড়িও।"

"কোথায় বেড়াব, তা'ও তোমায় ব'লে দিতে হবে শোনা?"

"এত দিন ত ব'লে দিয়েছি; এখন ভাল না লাগে, বলব না।"

"তা' বলছিনে—"

স্বামী যে স্ত্রীর অবাধ্য নহেন, তাহা প্রতিপন্ন করিতে তারাপদ ব্যস্ত হইয়া পাড়লেন।

৮

চালদেডাঙ্গা গ্রামখানি নদীর উপরে না হইলেও নদী হইতে বড় বেশী দূর নয়। গ্রামখানি ছোট; ছোট হইলেও কয়েকখানি পাকা বাড়ী আছে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতির কয়েক ঘর বসতিও আছে।

প্রসন্নময়ীর বাড়ীখানিও পাকা। দুই তিনখানি ছোট ঘর, একটুখানি দরদালান, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা উঠান। তা' ছাড়া বাড়ীর পশ্চিমদিকে আম-কাঁটালের বাগানও একটু আছে। উঠানে পেঁপে-গাছই বেশী; ফলেছেও অনেক। তবে দু'চারিটা আম-কাঁটালও আছে।

বাড়ীর এখন প্রকৃত মালিক নীরদা। প্রসন্নময়ী উইল করিয়া তাঁহার বাড়ী-বাগান আর প্রায় পঞ্চাশ বিঘা ধানী জমী নীরদাকে দিয়া গিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র দেবরপুত্র খগেনকে কিছু দেন নাই। তাহার সহিত বা তাহার মাতাপিতার সহিত প্রসন্নময়ীর কোন কালে বনিবনাও ছিল না। উভয়পক্ষে মামলা-মকর্দ্দমাও হইয়াছিল। খগেনের পিতা বরাবরই হারিয়া আসিয়াছেন; যখন তিনি দেখিলেন, প্রসন্নময়ী চিতায় দেহ রাখিয়া অন্য জগতে প্রস্থান করিলেন, তখন তিনি বিলম্ব না করিয়া সম্ভবতঃ সে জগতেও নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে জ্যেষ্ঠাগ্রজ-পত্নীর অনুসরণ করিলেন।

রহিল বিধবা স্ত্রী ও গুণধর খগেন। তাঁহারা খড়ের ঘরে নিকটেই বাস করিতেন; প্রসন্নময়ীর মৃত্যুর পরে তাঁহারা পাকা বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া নীরদাকে বহিষ্কৃত করিলেন। পরে যখন গ্রামের মুরুব্বীরা খগেন ও তাহার উপযুক্ত গর্ভধারিণীকে ধিক্কার দিয়া কহিল, বাড়ী ও বিষয় নীরদার—তোমরা কেহ নও, তখন তাহাদের ভয় হইল। তাহারা পরামর্শ করিয়া অবশেষে স্থির করিল, নীরদাকে বিবাহ করিলে সকল গোল চুকিয়া যায়।

কিন্তু তখন নীরদা কোথায়? অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বহু অনুসন্ধানের পর সংবাদ পাওয়া গেল, নীরদা কৃষ্ণপুরে আছে। তখন নীর-দাকে আনিতে খগেন ছুটিল। গিয়া দেখিল, নীরদা বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। তখন ধনের লালসার সঙ্গে রূপের লালসাও জাগিয়া উঠিল। প্রহৃত হইয়াও খগেন নিজের সঙ্কল্প ছাড়িল না—মধ্যরাত্রিতে ফিরিয়া আসিয়া নীরদাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেল।

যখন দুই ক্রোশ পথ গোযানে অতিক্রম করিয়া খগেন গৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন রজনী প্রভাত-প্রায়। দ্বারে করাঘাত করিতেই জননী দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং নীরদাকে লইয়া ঘরে উঠাইলেন। নীরদা বিনা প্রতিবাদে ঘরে গিয়া বসিল।

বিধবা কহিলেন, "তোমার মত বউ পাব, সে ত আমার ভাগ্যের কথা। খগা তোমার জন্যে কত কাঁদে। কত জায়গা হ'তে বিয়ের সম্বন্ধ আসত; তা' সে তোমাকে ছেড়ে কাউকে বিয়ে করতে রাজি নয়। বলে, নীরদাকে পাই ত বিয়ে করি, নইলে চিরকাল এমনি থাকব। আহা, বাছার কি মায়ার শরীর!"

নীরদা কহিল, "তোমরা কায়স্থ ব'লে শুনেছি—"

বিধবা। হাঁ, আমরা কায়েত।

নীরদা। আমি কৈবর্ত্ত।

বিধবা। ও মা, তাই না কি!

নীরদা। পিসীমা (প্রসন্ন) তা' জানতেন।

বিধবা আমরা কখন ত তা' শুনিনি।

নীরদা। আমি যে কায়েত তা'ও বোধ হয় কখন শোননি, পিসীমা আমার হাতের রান্না কখন খেতেন না।

বিধবা বড়ই চিন্তাকুল হইয়া পড়িল। পুত্রের অনুসন্ধানে একবার বাহিরে গেল; দেখা না পাইয়া নীরদার কাছে ফিরিয়া আসিল। নীরদা কহিল, "তোমরা আমার কাছে কি চাও?"

বিধবা। দেখ মা, আমরা গরীব—

নীরদা। বিষয় চাও? স্বচ্ছন্দে নাও, আমি লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি।

বিধবা। কি জানি মা, ছেলে কি চায়; একবার তাকে ব'লে দেখি।

নীরদা। বলবে আর কি? বিষয় তোমাদের, আমি কোথাকার কে; আমাকে ছেড়ে দেও, তোমরা ভোগ কর।

এমন সময় খগেনের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। জননী বাহিরে আসিয়া চুপি চুপি পুত্রকে কহিলেন, "দেখ্, এ বিয়ে হ'তে পারে না।"

পুত্র। কেন, শুনি?

মা। নীরি কৈবর্ত্তর মেয়ে।

পুত্র। কে বললে?

মা। নীরি।

পুত্র। ওর কথা বিশ্বাস করো না।

মা। আমরা ত জানছিনে ও আমাদের স্বজাত। গাঁয়ের লোকে আমাদের একঘরে করবে।

পুত্র। করে করুক; তখন আমাদের অনেক বিষয় হবে, কোন্ বেটাকে ভয়।

মা। বিষয় ত ও লেখাপড়া ক'রে দিতে চাচ্ছে

পুত্র। ও যে নাবালক, লেখাপড়া ক'রে দেবার ওর কোন এক্তিয়ার নেই।

মা। কি জানি বাবা, আইন-কানুন ত আমার জানা নেই।

পুত্র। আমি বেশ জানি। ওই যে কালী মুহুরীর ছেলে নিতে আমার কাছে আসা যাওয়া করে না, তাকে আমি জিজ্ঞেস ক'রে দেখিছি। সে বলেছে, নীরদা নাবালক, ওর কোন কাজই সেদ্ধ নয়। নিতের বাপ এক দিন সহরের বড় মোক্তারের মুহুরী ছিল, এখন জেলে আছে—

মা। ও মা, বলিস্ কি! ও সব লোকের পরামর্শ নিস্‌নে—ও বাবা, জেল! না, না, না।

পুত্র। আমি ত আর জেলে যাচ্ছিনে—

মা। তুই বাবা জেলে গেলে আমি প্রাণে বাঁচব না।

পুত্র। থাম্, এখন হতেই কান্না সুরু করলে।

মা। কি জানি বাবা, কোথা হ'তে কি হয়, তুই যে আমার অন্ধের নড়ি।

পুত্র। ঘ্যান ঘ্যান করো না, আমি পুরুতবাড়ী চললুম।

মা। এত তাড়াতাড়ি কেন? আগে দেখ্, বোঝ্, কৈবর্ত্তর মেয়ে কি না।

পুত্র। কৈবর্ত্ত হ'লেও বিয়ে করবো—বেশ মেয়েটা।

মা। পুরুতে বিয়ে দেবে কেন?

পুত্র। টাকা পেলে অনেক পুরুত ছুটে আসবে।

মা। ট্যাকা পাবি কোথা? এখানকার পেতল-কাসা সব ত—

পুত্র। টাকা কি আর নগদ দিচ্ছি! তুমিও যেমন বোকা।

মা। যা' ভাল বুঝিস্ কর্, আমার হাত-পা কাঁপছে।

পুত্র। তোমার হাত-পা ত হাওয়াতেই কেঁপে আছে। এখন দেখো, মেয়েটা পালায় না যেন।

পুত্র প্রস্থান করিল। মধ্যাহ্নে ফিরিয়া কহিল, "পুরুত ঠিক হয়েছে, আজ সন্ধ্যায় বিয়ে। আজকের দিনটা সাবধান থেকো—নীরি যেন না পালায়।"

সন্ধ্যা আসিল। যে ঘরে নীরদা আবদ্ধ ছিল, সেই ঘরের শিকল খুলিয়া খগেন প্রবেশ করিল; কহিল, "নীরদা, এসো।"

নীরদা। কোথায়?

খগেন। উঠোনে।

নীরদা। কেন?

খগেন। ন্যাকা সাজতে হবে না। পুরুত ব'সে, লগ্ন বয়ে যায়—চলো।

নীরদা। আমার বিয়ে! কার সঙ্গে?

খগেন। আবার ন্যাকা সাজছ? তুমি কি জান না, তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে ধ'রে এনেছি?

নীরদা। জানি, তুমি চুরি ক'রে আমাকে এনেছ, তা'র ফলও পাবে—

খগেন। পাই পাব—এখন ত চল। সহজে না যাও—

নীরদা। আচ্ছা, চলো।

নীরদা উঠানে আসিয়া পুরোহিতকে বলিল, "দেখুন, আমি কৈবর্ত্ত, আর এ ব্যক্তি কায়স্থ—আপনি এ বিয়ে ঘটতে দেবেন?"

পুরোহিত কহিলেন, "আমি ত কোন দোষ দেখি না মা। শাস্ত্রে আছে, প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের সময় কোন জাতিবিচার ছিল না—সমগ্র মানবজাতির জন্যে এক ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট ছিল। এখন সপ্তম মনু বৈবস্বতের কাল আর নাই, অষ্টম মনু সাবর্ণির বিধান প্রবর্ত্তিত হয়েছে—এখন ত মা, আর জাতি-ভেদ নেই।

নীরদা। আপনিও তা হ'লে আর ব্রাহ্মণ ন'ন?

পুরোহিত। অ্যাঁ, তা', ব্রাহ্মণ—এই কি জান মা।—

নীরদা। জেনেছি; আগে আপনি আমার

অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করুন, তার পর বুঝব, আপনি যা' বলছেন, তা' আপনি বিশ্বাস করেন।

পুরোহিত। এই কি জান মা, লোকাচার—সমাজ—

নীরদা। আপনি কি বলতে চান, সমাজ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করে?

পুরোহিত। এ সব কথা তুমি বুঝবে না মা, গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব। এখন বসো—লগ্ন বয়ে যায়।

নীরদা আপনি শালগ্রাম নিয়ে চ'লে যান; এ আমার বাড়ী—এখানে গোলমাল করবেন না।

পুরোহিত। আমি গোলমাল করতে আসি নি মা, তোমার বিয়ে দিতে এসেছি। তা' তুমি যদি বিয়ে না কর—

নীরদা। আমি বিয়ে করব না।

পুরোহিত। বুঝে দেখ মা—

নীরদা। পাড়ার লোক ডাকতে হবে না কি?

পুরোহিত। না মা, ও সব করো না—জেল টেল যেতে পারব না। বারোটা টাকার জন্যে—

খগেন-গর্ভধারিণী তখন বদ্ধ কণ্ঠকে মুক্তি দিলেন, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও বাবা, জেল না কি! ওরে খগা, তুই একে ছেড়ে দে রে—তোকে জেলে যেতে দিতে পারব না। কর্ত্তা—"

খগেন। তুই গোল ক'রে পাহারাওয়ালা ডাকবি দেখ্‌ছি।

জননী। পাহারা এ'য়েছে নাকি রে? কর্ত্তাকে যে অমনি ক'রে ধ'রে নিয়ে গিছল। ও বাবা, কি হ'ল রে—

খগেন। তোকে আমি জেলে দেবো, তবে ছাড়্‌ব।

বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মায়ের মুখ বাঁধিল। পুরোহিতকে কহিল, "তুমি একটু বসো ঠাকুর—" বলিতে বলিতে আচম্বিতে নীরদার হাত ধরিল। নীরদা হাত ছিনাইয়া লইয়া সিংহ-শাবকের ন্যায় ঘাড় বাঁকাইয়া গর্জ্জিয়া কহিল, "এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার হাত ধর!"

খগেন। আচ্ছা, আগে দু'হাত এক হোক, তার পর দেখে নেবো।

অকস্মাৎ দ্বারে করাঘাত হইল। সকলেই দ্বারপানে চাহিল। পুরোহিত শালগ্রাম-শিলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন। প্রস্তরময় নারায়ণ যে তাঁহাকে এ বিপদে রক্ষা করিতে পারিবেন, তাঁহার এরূপ ভরসা হইল না। তিনি কল্পনায় দেখিতে লাগিলেন, গ্রামের লোক চৌকীদার লইয়া আসিয়াছে। বিধবা স্থির করিলেন, দারোগা তাঁহাকে জেলে লইয়া যাইতে আসিয়াছে। খগেনও বড় সুস্থির ছিল না, সে লুকাইবার স্থান অন্বেষণ করিতেছিল। দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত হইতে লাগিল। নীরদা চঞ্চল-চরণে গিয়া দ্বার খুলিল। প্রথমেই প্রবেশ করিলেন—রমণীমোহন। তাঁহার হাতে একটা ছোট লণ্ঠন; ছোট হইলেও তাহার আলো বড় তীব্র। রমণীমোহনের পশ্চাতে দুই জন দ্বারবান্; তাহাদের পিছনে গ্রামের কয়জন মাতব্বর ব্যক্তি ও চৌকীদার। তাহাদের দেখিয়া খগেন্দ্র-জননী বন্ধন খুলিয়া ফেলিলেন এবং চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আমি কিছু জানিনে দারোগা বাবা; ওই দেখ পুরুত পালাচ্ছে—"

পুরোহিত পলাইতে পারিলেন না, গ্রামের লোক ধরিল। রমণীমোহন কহিলেন, "সে বদমায়েস কই?"

জননী। ওই দেখ, সে গাছে উঠে লুকিয়েছে—আমি কিছু জানি নে বাবা—ওই সব জানে—দোহাই দারোগা বাবা, আমায় জেলে দিও না।

রমণীমোহন বাতি উঠাইয়া দেখিলেন, বদমায়েস গাছের উপর।

৯

জয়পুরে রামবাবুর প্রশস্ত বৈঠকখানায় সন্ধ্যার পর সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙ্গালীরা সমবেত হইতেন। এখানে খেলাধূলা হইত না, শুধু বাজে গল্প হইত; গুরুতর প্রসঙ্গ যে কখন আলোচিত হইত না, সে কথা বলা যায় না। গান-বাজনাও কখন কখন চলিত। তারাপদ আগে প্রত্যহই এখানে আসিতেন, এখন কদাচ আসেন। আজ যখন সন্ধ্যার পর অকস্মাৎ আসিয়া সভায় দর্শন দিলেন, তখন প্রভাত বাবু নয়ন বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—

"এসো, এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥"

গৃহ-স্বামী রামবাবু কহিলেন, "আলোটা জোর ক'রে দেও, আমরা হয় ত ভুল দেখছি।" এইরূপ বিদ্রূপের মধ্যে তারাপদ আসন-গ্রহণ করিলেন। প্রভাত কহিলেন,—"হে সুন্দর! শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি—

কোন্ দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে—"

তারাপদ কহিলেন, "তুমি কি আমাকে তিষ্ঠুতে দেবে না প্রভাত?"

প্রভাত (যুক্তকরে)। ক্ষম মোর অপরাধ, হে দীন-দয়াল—

রামবাবু। আচ্ছা তারাপদ, সত্য বল, কেন তোমার দেখা পাই না?

তারা। শরীরটা ভাল নয়।

প্রভাত। "এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাস নীচ-কুলোদ্ভব—"

তারা। তুমি জ্বালিয়ে তুললে—

প্রভাত। "অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি, ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।" তোমার শরীর মন্দ! এ কথা কানে শুনতেও হ'ল? মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি কৃপা ক'রে আমাদের শরীরও অমনি মন্দ ক'রে দেও।

রাম। আঃ, খোঁড় কেন, আজ বারটা ভাল নয়—

প্রভাত। নিশ্চয়ই ভাল, নইলে তারার দর্শন পাওয়া যায়?

তারা। দেখ, বাহির দেখে ভিতরের বিচার করো না।

প্রভাত। কেন করব না? দুষ্মন্ত, জগৎসিংহ এঁরা কি করেছিলেন? শকুন্তলা-'তলোত্তমার বাহির দেখিয়াই তাঁহারা ভিতরের বিচার করে-ছিলেন; আমি বিনা নজিরে কথা কই না।

তারা। তোমাকে কথায় আঁটতে পারব না।

প্রভাত। কথায় না পার, বাহুবলে পার; যে রকম ষণ্ডা হয়ে উঠছ। যাক্ বাজে কথা; এখন কাজের কথা শোন। তারা, আমি তোমার শরণাগত।

তারা। অভয় দিচ্ছি—কি চাও?

প্রভাত। আমার পুত্রের উপনয়ন, তোমাকে কার্য্যভার গ্রহণ করতে হবে।

তারা। আমি পারব না।

প্রভাত। কপট, এই তোমার অভয়দান?

তারা। তোমাদের কার্য্যপদ্ধতির সঙ্গে আমার মতের মিল নাই।

প্রভাত। কোন রকমে মিলিয়ে নাও।

তারা। তোমরা এখন কান বিঁধিবে, মাথা ন্যাড়া করবে; এ সব মূর্খের আচারের সঙ্গে আমার মত একেবারেই মেলে না।

প্রভাত। আচারে না হয় ঝাল বেণী দিয়ে তোমার মুখরোচক ক'রে নিও।

তারা। তা'তে রাজি আছি—ধর দিলাম।

প্রভাত। তবে দেব, চাড্ডি পদধূলি দেও।

রামবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "পদধূলি দেবার যোগ্য পাত্র কি না, আগে বাজিয়ে নেও। প্রভু যে কইলেন, কর্ণবেধ ও মস্তকমুণ্ডন কুপ্রথা—

তারা। আমি কুপ্রথা বলি নি, ভ্রান্ত সংস্কার—যেমন শ্রাদ্ধে বৈতরণী, ধেনু-দান—

রাম। দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করুন।

তারা। ওরে মূর্খ ভক্ত, আমার ব্যবস্থায় তোদের অবিশ্বাস! তবে শোন্—

প্রভাত। (যুক্তকরে) আজ্ঞা করুন।

তারা। মস্তক-মুণ্ডন কাকে বলে?

প্রভাত। কি ক'রে জানব বলুন। আমরা ত জানতুম, মাথাটা কেটে ফেলে দেওয়া।

তারা। বিদ্রূপ!

প্রভাত। আজ্ঞে, বিদ্রূপ কি করতে পারি? সেটা যে ভারি অন্যায় হবে।

তারা। মস্তকমুণ্ডন হচ্ছে, পূর্ব্ব-সংস্কার মাথা থেকে দূর ক'রে ফেলে দেওয়া—

রাম। আর কর্ণবেধ?

তারা। যখন পূর্ব্ব-সংস্কার দূর হবে, তখন কর্ণ বিদ্ধ ক'রে—তা'র পূর্ব্বসংস্কারবিহীন মস্তকে—প্রণব-মন্ত্র প্রেরণ করবে।

রাম। তা হ'লে পরামাণিকের বাচ্ছা মার খেয়ে মরে কেন?

তারা। তোমরা দয়া ক'রে মারো ব'লে।

প্রভাত। আর মারব না, এখন থেকে আইন বাঁচিয়ে চল্‌ব।

তারা। যদি কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ, মাথা হ'তে পূর্ব্ব-সংস্কার দূর ক'রে প্রণব-মন্ত্র দিতে পারে, তবে সে মন্ত্র বা উপবীত কেহ কখন ত্যাগ করতে পারে না। যাক, উপনয়ন কবে?

প্রভাত। আর তিন দিন পরে তার পর—

তারা। তার পর আবার কি? তোমার বিয়ে নাকি?

প্রভাত। "লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়।"

রক্ষা কর ভাই—বিয়ের কথা বোল না—(সুর আর সহযোগে)—আর বোলো না, আর ভুলো না, ক্ষম গো সখা, ছেড়েছি ও সব বাসনা।

রাম। কেন গো, এত বীতরাগ কেন?—
"একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।"

প্রভাত। বাহবা রাম, এতদিনে তুমি দেখছি, একটা মানুষ হয়ে উঠলে। এ সব সঙ্গের গুণ; বলে সৎসঙ্গে কাশীবাস—

রাম। ভাই, সার্টিফিকেটটা আমাকে লিখে দিও—মেয়েমহল আমাকে আমলই দেয় না।

প্রভাত। দেব, দেব,—আর কিছু দিন আমার সঙ্গে ঘোরো ফেরো—

তারা। তোমরা বড় বাজে কথা কও—

প্রভাত। এতদিন এ কথাটা কেউ ধরতে পারে নি—বলি হারি বুদ্ধি ভাই :—

"ও নহে শশাঙ্ক কুণ্ডলিত ফণিধর,
ও নহে কলঙ্ক তাহে শয়িত কেশব।"

আমি বলছি কি, উপনয়ন দিয়ে আমি বাড়ী যাচ্ছি।

তারা। বাড়ী? স্বদেশ?

প্রভাত। হাঁ, হাঁ।—

"এই ত আমার, জগতের সার,
স্মৃতিসুখকর জনম-ঠাঁই।
যেখানে আহ্লাদে নবীন আস্বাদে
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই॥"

তারাপদ উত্তর না করিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রভাত কহিলেন, "বড় যে জিজ্ঞেস করলে না, কেন যাচ্ছি?

তারা। অ্যাঁ, তাই ত, কেন যাচ্ছ প্রভাত?

প্রভাত। ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি? যাচ্ছি কিছু লাভের আশায়। পুত্রের দিদিমা কৈলাস-পর্ব্বত অভিযানে গমন করেছেন, আর যে সেই দেহ নিয়ে ফিরবেন, এমত সম্ভাবনা নাই। শিবদূত বিষয়াদি সঙ্গে নিয়ে যেতে তাঁহাকে দেন নাই, আমার পুত্রের জন্য তাহা রক্ষা করছেন। আমি সেই সব অনিত্য দ্রব্যের একটা পাকা ব্যবস্থা করতে চলেছি।

তারা। তোমার স্ত্রী সঙ্গে যাচ্ছেন?

প্রভাত। আমাকে তিনি আজও নাবালক মনে করেন—কোথাও একা ছেড়ে দিতে ভরসা পান না।

রাম। তবে এখানে ছেড়ে দেন কোন্ ভরসায়?

প্রভাত। এখানে মানুষ নেই বিবেচনায়।

রাম। আমরা কি তবে জানোয়ার?

প্রভাত। কি তোমার সূক্ষ্মবুদ্ধি ভাই! সত্যটাকে উপলব্ধি করতে তোমার একটুকুও বিলম্ব হ'ল না।

তারা। তুমি আমার দাদার ওখানে যাবে প্রভাত?

প্রভাত। যাদবের বাসায় গিয়েই ত উঠব—তার পর অখযানে সোনারপুর—

তারা। একটা কাজ করবে প্রভাত?

প্রভাত। কাজ করতেই আমার জন্ম। তোমাদের পাড়া থেকে শুনতে পাও না, সকাল হ'তে মক্কেল নিয়ে কি রকম লড়াই করি? এখন কি করতে হবে বল? রাবণের চিতা নিবুতে হবে, না, পশিয়া সাগরতলে কেশে ধ'রে আনিব জটায়ুরে?—না, হ'ল না—তা' না হোক, ছোটখাটো কাজের ভার আমার উপর দিও না। মেয়েমানুষের মত কান্নাকাটি করবার যদি দরকার হয়, অথবা গাছের আড়াল হ'তে শরক্ষেপ করবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে সে কাজের ভার রামের উপর দিও।

তারা। রহস্য রাখ, মন দিয়ে শোন।

প্রভাত। রহস্য রাখিনু পকেটে, মন দিনু তোমারে—

তারা। এখনও রহস্য!

প্রভাত। জানতাম না, তুমি কবিতা-বর্জ্জিত ভীল—এখন বল।

তারা। এক জনকে তোমায় নিয়ে যেতে হবে।

প্রভাত। কা'কে? তোমার স্ত্রীকে? আমি পারব না।

"কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হুঁ বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ।"

রাম। এ বয়সেও তোমার এত রঙ্গ! বুড়ো হ'লে যে!

প্রভাত। কি, আমি বুড়ো?—

"অঞ্জন-গঞ্জন, জগজন-রঞ্জন
জলদপুঞ্জ জিনি বরণ।
তরুণারুণ, থল কমলদলারুণ,
মঞ্জীর-রঞ্জিত চরণ॥"

যা বলেছ, ক্ষমা করলুম, আর আমাকে বুড়ো বলো না; আমার স্ত্রী এ কথা জানতে পারলে হয় তোমাকে ভস্ম করবে, নয় কুলত্যাগিনী হবে। যা'ক্, এ সব প্রসঙ্গে আর প্রয়োজন নেই—তারা চটছে; আমি কি তাকে চটাতে পারি? সে একদিন কত দুঃখ-ভরে আমাকে বলেছিল—

"কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর?
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এতদিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে॥

মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এতদিন বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাহি আপন বলিয়া॥"

না ভাই, আমি তোমার আছি—দুঃখ করো না। কি, পুষ্পকে নিয়ে যেতে হবে?

তারা। হাঁ; দাদা যদি তা'র উপায় করতে পারেন।

প্রভাত। আমি—তব দুঃখে দুঃখী—প্রস্তুত আছি। কিন্তু কেন ভাই, এ অনলশিখারূপিণী সীতাকে তোমার দাদার ঘর জ্বালাতে পাঠাবে? সে বেটী শ্বশুরঘর জ্বালিয়েছে, পঞ্চবটী পুড়িয়েছে, পোড়াচ্ছে, আর কেন তা'কে লঙ্কা পোড়াতে পাঠাও?

তারা। দেখো প্রভাত, এ সব কথা নিয়ে তুমি রহস্য করো না।

প্রভাত। রহস্যটাকে অনেকক্ষণ আমি পকেটে পুরেছি, এখন আমি জ্বলন্ত সত্য কথা বলছি। আমি শাস্ত্রগ্রন্থ হ'তে এ সব কথা উদ্ধৃত ক'রে তোমাকে শোনাচ্ছি—তোমার ত আর বাল্মীকি পড়া নেই!—

তারা। প্রভাত—

প্রভাত। বিশ্বাস হ'লো না? দেও ত রাম, শাস্ত্রখানা—

রাম। কোন্ শাস্ত্র চাই তোমার?

প্রভাত। আঃ, কি জ্বালা! যত মূর্খ এসে জুটেছে।

বলিয়া তিনি উঠিলেন; এবং আলমারি হইতে একখানা মোটা কেতাব টানিয়া লইয়া স্বস্থানে উপবেশন করিলেন। সকলে কৌতূহলী হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রভাত পড়িলেন—

—"কতক্ষণে চেতন পাইয়া
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা যাদব;—
হায় তারাপদ,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগা,
কাল মধুমতী-তটে কালকূটে ভরা
এ পুষ্পেরে? কি কুক্ষণে—(তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবকশিখারূপিণী মোহিনীরে আমি
আনিনু এ হৈমগেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়ি স্বর্ণ কোলকাতা, নিবিড় কাননে
পশি—"

আর পড়া হ'ল না; তারাপদ বইখানা ছিনাইয়া লইয়া দেখিলেন, সেখানি থ্যাকারের ডিরেক্টরি।

১০

গৃহে ফিরিয়া তারাপদ আহারাদি সমাপন করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর; অন্য দিন এত রাত্রি হয় না। শোভনা ও পুষ্প দুই জনই তাঁহার আহারের সময় কাছে বসিয়া থাকেন। আজ পুষ্প আসে নাই। তাহাকে অনুপস্থিত দেখিয়া তারাপদ একবারও জিজ্ঞাসা করিলেন না, সে কোথায় আছে। নীরবে আহার সমাপন করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

দুই দণ্ড পরে শোভনাও শয়নকক্ষে আসিলেন। দেখিলেন, স্বামী তখনও শয়ন করেন নাই—একখানা কৌচে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শোও নি যে বড়?"

স্বামী। না।

স্ত্রী। তা' না শোও, চুরুট খাচ্ছ কেন? ব'লে দিয়েছি ত শোবার আগে ও সব খেয়ো না; মাথা গরম হয়, রাতে ঘুম হয় না—কাজেই মাথা ঘোরে।

স্বামী। মাথা ত সে জন্যে ঘোরে না—

স্ত্রী। তা আমি জানি।

স্বামী। কি জান শোনা?

স্ত্রী। জানি, যখনই তুমি যুদ্ধে পরাস্ত হও, তখনই তুমি কাতর হয়ে পড়।

স্বামী। তা হ'লে তুমি সব জান শোনা?

স্ত্রী। দেখ, স্বামী স্ত্রীকে যতটা চিন্‌তে না পারে, স্ত্রী স্বামীকে তার চেয়ে বেশী চিন্‌তে পারে। তোমার ক্ষুদ্র চিন্তাটুকুও আমার অবিদিত নাই।

স্বামী। সব জেনেও তুমি আমাকে ভালবাস? শ্রদ্ধা কর?

স্ত্রী। শ্রদ্ধা-ভক্তি বিচারের অধীন বটে, কিন্তু ভালবাসা কাহারও মানা শোনে না।

তারাপদ কোন উত্তর করিলেন না, নীরবে ধূমপান করিয়া যাইতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তারাপদ কহিলেন, "একটা কথা তোমায় বলা হয় নি।"

শো। কি?

তা। প্রভাত তা'র স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেশে যাচ্ছে।

শো। আমি তা' শুনেছি। কবে যাবেন?

তা। ছেলের পৈতে দিয়ে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে যাবে।

শো। দেশে গিয়ে পৈতে দিলেই ত পারতেন।

তা। সেখানে জ্ঞাতি-কুটুমের ভেতর কে সব মরেছে। শোকের মধ্যে শুভ কাজটা করতে চায় না।

শো। তুমিও কেন একবার কয়েক দিনের জন্যে ঘুরে এস না।

তা। আমি মনে করছি, পুষ্পকে প্রভাতের সঙ্গে পাঠাব।

শো। কার কাছে পাঠাবে?

তা। দাদার কাছে।

শো। সেখানে! আচ্ছা, পাঠাও। তিনি যদি অভাগীর কোন কিনারা করতে পারেন।

তা। প্রভাতও খোঁজ করবে বলেছে।

সে রাত্রি উভয়ের মধ্যে আর বাক্যালাপ হইল না।

উপনয়ন হইয়া গেল। প্রভাতের যাত্রার দিন সমাগত হইল। অপরাহ্ণ পাঁচটার গাড়ীতেই যাওয়া স্থির। বন্দোবস্ত এইরূপ হইল যে, তারাপদ পুষ্পকে লইয়া বরাবর ষ্টেশনে যাইবেন, প্রভাত আগে গিয়া মালপত্র ওজন ও টিকিট করিবে।

তারাপদ বেলা তিনটার সময় কলেজ হইতে আসিয়া অতিশয় ব্যস্ততার সহিত অবিরাম ভিতর-বাহির করিতে লাগিলেন। কিছুই করিতেছেন না, অথচ তিনি যে ভাবে ঘন ঘন চুরুট টানিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন তিনি আজ বিলাত যাইবার উদ্দেশ্যে বোম্বে মেল ধরিতে যাইতেছেন। পুষ্পের গুছাইবার বড় কিছু ছিল না—একটা ছোট বাক্স, কয়েকখানা কাপড়, জামা। গহনা সঙ্গে দেওয়া তাঁহারা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না, কি জানি, পথে যদি চুরী যায়। পুষ্পের স্বামীর দর্শন পেলে তখন তাঁহাকে গহনা দেওয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে পুষ্পের মতামত গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

বিদায়ের সময় আসিল। শোভনা ও কাজল কাঁদিতে লাগিল। পুষ্প কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কোথায় পাঠাচ্ছ দিদি?"

"তোমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি বোন্!"

"সে কোথায়?"

"গেলেই জানতে পারবে।"

"তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি চিনি না, তোমার কাছ-ছাড়া আমাকে করো না দিদি।"

শোভনা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাজলও কাঁদিল; কাঁদিতে কাঁদিতে মাসীকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমি মাসীকে ছেড়ে থাকতে পারব না, তোমার পায়ে পড়ি মা, মাসীকে পাঠিও না।"

শোভনা তখন চক্ষুর জল মুছিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—"গাড়ীকা উপর বাকস্ উঠাও।"

তারাপদ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তিনি হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, গাড়ীর মাথার উপর বাক্স উঠিতেছে। প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্ত্রী কন্যা পুষ্পকে গাড়ীতে উঠাইতেছে। অবশেষে শোভনা যখন কহিলেন, "তুমি গাড়ীতে ওঠ," তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী ছুটিল। দুই দিকে জান্‌লা খোলা ছিল; দুই জনে দুই দিকে বসিয়া দেখিতে দেখিতে চলিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর তারাপদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের ছেড়ে চল্‌লে পুষ্প?"

পুষ্প। আপনারা পাঠাচ্ছেন, তাই যাচ্ছি।

তারা। যেতে কি তোমার ইচ্ছে হচ্ছে না?

পুষ্প। কেন হবে? আমার আর কে কোথায় আছে?

তারা। তবে তোমার যেতে ইচ্ছে নেই?

পুষ্প। না; দিদিকে ছেড়ে কোথাও যেতে আমার ইচ্ছে করে না।

"কোচম্যান গাড়ী রোখো।"

গাড়ী দাড়াইল। ফিরাইতে বলিবেন কি না, তারাপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুষ্প জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ী থামালেন কেন?"

তারা। তোমার যে যেতে ইচ্ছে নেই, পুষ্প।

পুষ্প। আমার ইচ্ছে নেই হোক, দিদির যে ইচ্ছে হয়েছে।

তারা। আমিই তোমাকে পাঠাচ্ছি।

পুষ্প। বেশ, তবে আমি যাব।

তারা। কেন পাঠাচ্ছি, তা' ত তুমি জিজ্ঞেস করলে না।

পুষ্প। জিজ্ঞেস করবার দরকার ত নেই; আপনি যা' ভাল বুঝেছেন, তাই করছেন।

তারাপদ বড় ফাঁপরে পড়িলেন, কি করিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার ভিতর হইতে দুই ব্যক্তি কথা কহিতে লাগিল, তিনি মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। এক জন কহিল, "দেখো, অত দুর্ব্বল হয়ো না—পাঠিয়ে দেও।"

দ্বিতীয়। তাই ব'লে জোর ক'রে পাঠাতে হবে নাকি?

প্রথম। হাঁ, হবে। ক'দিন আগে খোলা মাঠে ব'সে অনেক চিন্তা ক'রে যা' স্থির করেছ, তা' কার্য্যে পরিণত কর—পিছিও না।

দ্বিতীয়। তাই ব'লে কি এক নিঃসহায় স্ত্রীলোককে ঘাড় ধ'রে তাড়াতে হবে?

প্রথম। তোমার ধর্ম্ম, অনাথার ধর্ম্ম, তোমার

স্ত্রীর শান্তিরক্ষা করতে হ'লে তোমাকে তাই করতে হবে।

দ্বিতীয়। আমি এতবড় পাষণ্ড নই, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান আমার আছে।

প্রথম। না, সে জ্ঞান তোমার নেই; কোথা হ'তে নেমে এসেছ, ভুলে গেছ?

দ্বিতীয়। নেমেছি বটে, আর নামব না—এখন হ'তে সাবধান হব।

প্রথম। সাবধানতার পাহাড় এনে দাঁড় করালেও প্রবৃত্তির প্রবাহমুখে তা' ভেসে যাবে। প্রলোভনকে কখন কাছে রেখো না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আর উত্তর করিতে পারিল না।

"গাড়ী চালাও।"

গাড়ী চলিতে লাগিল। ক্রমে ষ্টেশন দেখা গেল। তারাপদ দূর হইতে দেখিলেন, ট্রেণ ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাড়ী-বারান্দায় অশ্বযান থামিল। তারাপদ ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে নামিয়া চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন; প্রভাতকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এ-দিক ও-দিক দেখিতে লাগিলেন। তা'র পর কি ভাবিয়া প্লাটফর্ম্মে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, প্রভাত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রভাত সহাস্যে কহিলেন, "অতঃপর তুমি একা?"

"না, পুষ্প আছে।"

"কই, দেখ্‌ছি না ত।"

"গাড়ীতে আছে।"

"ওঃ, বুঝেছি; ট্রেণ ছেড়ে না গেলে তাকে আনছ না।"

"এই যে আনছি; আমি দেখতে এলুম, তুমি এসেছ কি না।"

"আর আন্‌তে হবে না—ঘণ্টা পড়েছে।"

সত্য ই ঘণ্টা পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীও নড়িল। প্রভাত কহিলেন,—

"সোনার গাগরি, বিষজল ভরি,
কেবা আনি দিল আগে,
করিনু আহার, না করি বিচার,
এ বধ কাহারে লাগে।
নীর-লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী, আহার করিতে,
বঁড়শী লাগিল মুখে॥"

আর শোনা গেল না—গাড়ী দূরে চলিয়া গেল। তারাপদর তখন ইচ্ছা হইল, গাড়ীখানাকে টানিয়া ফিরাইয়া আনিয়া পুষ্পকে তাহার ভিতর উঠাইয়া দেন।

কিন্তু তিনি যখন ঘোড়-গাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া পুষ্পকে দেখিলেন, আর পুষ্প যখন বলিল, 'আমার তবে যাওয়া হ'ল না, বেশ হয়েছে,' তখন তারাপদ আনন্দ বোধ করিলেন এবং গাড়ীখানা যে পুষ্পকে না লইয়া চলিয়া গেল—ইহাতে তিনি বড় স্বস্তি অনুভব করিলেন।

বাড়ীতে যখন তিনি পুষ্পকে লইয়া নামিলেন, তখন শোভনা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; পুষ্পকে জড়াইয়া ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তারাপদ পিছনে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে চলিলেন— "গাড়ী ধরতে পারলুম না, আমরা পৌঁছে প্রভাতকে খুঁজে নিতে না নিতেই গাড়ী ছেড়ে দিলে।"

"কেন, তোমরা ত যথেষ্ট সময় থাক্‌তে গিছলে।"

"তা' গেলে কি হয়—ওরা যদি সময়ের আগে ট্রেণ ছাড়ে।"

"তা' আবার করে না কি?"

"কেন, এই সেবার হয়েছিল, নন্দ গাড়ী পেলে না। আর একবার ওই যে কে গাড়ী পেলে না।"

"গাড়ীগুলোর ভারি অন্যায় ত।"

১১

রমণীমোহন কণ্ঠন উঁচু করিয়া দেখিতে না দেখিতে খগেন গাছের উপরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নীচে লাফাইয়া পড়িল। সকলেই চমকিত হইলেন। রমণীমোহন ক্ষিপ্রতার সহিত খগেনকে ধরিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

"ওগো, আমি মরিছি গো, আমাকে ছেড়ে দেও।"

"কি হয়েছে, বল না।"

"সাপে কামড়েছে।"

বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো, আমার কি হলো গো!" বলিতে বলিতে খগেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রমণী তাহাকে সরাইয়া লইয়া এক ব্যক্তিকে ধরিতে বলিলেন, এবং খগেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা কাম্‌ড়েছে?"

"হাতে।"

রমণীমোহন দেখিলেন, দক্ষিণ হস্তে তর্জ্জনীতে দংশন-চিহ্ন। রক্তও পড়িতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি

নিজের কাপড়খানির একাংশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার প্রকোষ্ঠে ও বাহুতে তাগা বাঁধিলেন এবং দষ্ট স্থানে ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন। তদ্দৃষ্টে মাতব্বর ব্যক্তিরা হৈ হৈ করিয়া উঠিলেন। এক বৃদ্ধ ব্যক্তি কহিলেন, "কেন বাবা, তুমি পরের জন্যে প্রাণ দেবে?"

রমণীমোহন উত্তর করিলেন না, বিষ টানিয়া যাইতে লাগিলেন। আর এক ব্যক্তি কহিলেন, "দাঁতে বা মুখে যদি একটু ক্ষত থাকে, ত' হ'লেই সর্ব্বনাশ।" তৃতীয় ব্যক্তি কহিলেন, "এ হতভাগাটার জন্যে কেউ নিজের প্রাণ বিপন্ন করে?" চতুর্থ ব্যক্তি উত্তর করিলেন, "আরে প্রাণ ব'লে প্রাণ! কত বড় জমীদারের ছেলে।" প্রথম ব্যক্তি পুনরায় কহিলেন, "তুমি এই করবে বাবা, আর আমাদের দাঁড়িয়ে তা দেখ্‌তে হ'ল?"

রমণীমোহন মুখ তুলিলেন। ভৃত্যদের আদেশ করিলেন, "পাল্কীতে উঠিয়ে আমার বহিন্ নীরদাকে তোমরা নিয়ে যাও। কৃষ্ণপুরে আয়ির বাড়ীতে তুলবে—আমি যতক্ষণ না যাই, তোমরা কেহ চন্দনপুরে যাবে না। ঘোড়া চৌকীদারের জিম্মায় রেখে যাও।"

নীরদা যখন ভৃত্যদের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছে, তখন রমণী কহিলেন, "তোমার আয়ি এখনও বেঁচে আছেন নীরদা। আমি যাচ্ছি, তুমি এগোও।"

খগেন্দ্র-জননী কহিলেন, "যাও বাছা, যাও; আর তোমার মনে কষ্ট দেব না। তোমার শাপে আজ আমার এই দশা গো—"

বলিয়া আবার ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। তাহার ক্রন্দন ও চীৎকার অসহ্য হইলে তাহাকে প্রতিবেশীর গৃহে স্থানান্তরিত করা হইল। তখন পাড়ার অনেক লোক জড় হইয়াছে। নবাগত এক ব্যক্তি, পুরোহিতকে রোরুদ্যমান অবস্থায় এক কোণে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনি এখানে ব'সে কাঁদছেন কেন?" পূর্ব্বাগত এক ব্যক্তি উত্তর করিল, "এই মহাপুরুষ এক কৈবর্ত্ত মেয়েকে জোর ক'রে কায়েতের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিলেন। এখন উনি দারোগাকে বিয়ে করবার মতলবে নিংবর চৌকীদারের সঙ্গে যাত্রা করছেন। তাই দু'চার ফোঁটা শান্তিবারি চক্ষু হ'তে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।"

কথা কয়টি রমণীমোহনের কানে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা কৈবর্ত্তের মেয়ে?"

"শুনছি ত তাই পুরুতের মুখে।"

রমণীমোহন আবার খগেনের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণপরে কহিলেন, "আমার বিবেচনায় আশঙ্কার কোন কারণ আর নাই—আপনারা একবার দেখুন।"

বৃদ্ধ। আমরা কি আর বুঝব বাবা? তুমি এখন মুখটা ধুয়ে ফেল।

রমণীমোহন উত্তমরূপে মুখ ধৌত করিলেন। এক ব্যক্তি ছুটিয়া গিয়া গ্রামের এক রোজাকে ডাকিয়া আনিল। রোজা আসিয়া পরীক্ষান্তে কহিল, "দেহে বিষ নাই।" তখন খগেন উঠিয়া বাঁধন খুলিয়া ফেলিল। তার পর বৃক্ষ-কোটরস্থিত সাপটাকে মারিবার জন্যে খগেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, কেহ তাহাকে নিরস্ত করিয়া রাখিতে পারিল না। রোজার সাহায্যে অচিরাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দেখা গেল, সর্পটি বিষাক্ত, চন্দ্রবোড়া-জাতীয়; খগেন তাহাকে নৃশংসভাবে মারিল—অবশেষে পোড়াইল, ইত্যবসরে রমণীমোহন গ্রামস্থ ভদ্র ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া পুরোহিতকে ছাড়িয়া দিন্—অর্থলোভ ছাড়া এ ঘটনায় তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ ছিল না। আর এ বাড়ী ও বিষয়াদি যাহা কিছু নীরদার, তাহা আপনারা ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, নীরদা কখন কোন আপত্তি করিবে না। এখন আপনাদের অনুমতি হয় ত যাই।"

সকলেই তাঁহাকে নমস্কারাদি করিয়া বিদায় দিলেন। খগেন কহিল, "আমি আলো ধ'রে আপনাকে সাঁকো পার ক'রে দিয়ে আসি।"

গ্রামের লোকেরা বলিল, "হাঁ, সঙ্গে যাও; বাঁশের পুল, তা'তে আবার জীর্ণ—সঙ্গে কেউ নেই।"

খগেন আলো ধরিয়া চলিল, পিছনে অশ্বোপরি রমণীমোহন। তাঁহারা গ্রামপ্রান্তে আসিয়া পৌছিলেন। পুলটি সেইখানে। নীচে খাল—মধুমতীর একটি ক্ষুদ্র শাখা। বর্ষাকালে জলে পূর্ণ থাকে, এখন জলশূন্য। তবে কাদা খুব বেশী, গরু-বাছুর হাঁটিয়া পার হইতে পারে না। পুলের প্রান্তে আসিয়া খগেন কহিল, "আপনি ঘোড়া হ'তে নামুন, আমি আগে ঘোড়াটা ও-পারে রেখে আসি।" রমণীমোহন নামিলেন; আসিবার সময়ও তিনি হাঁটিয়া পুল পার হইয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ সেতু—এক হাত প্রশস্ত, বিশ পঁচিশ হাত দীর্ঘ। ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া খগেন সাবধানে পুল পার হইল; এবং তাহাকে এক বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া রাখিয়া অপর পারে ফিরিয়া আসিল। রমণীকে কহিল, "এবার আপনি চলুন।" রমণী অগ্রবর্ত্তী হইলেন—পশ্চাতে

থাকিয়া খগেন আলো ধরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে কহিল, "আপনি আমার প্রাণ রক্ষে করেছেন, তা আমি কখন ভুলব না; কিন্তু ইহাও আমি কখন ভুলব না যে, তুমি নীরদা ও বিষয় হ'তে আমাকে বঞ্চিত করছ—"

বলিতে বলিতে পশ্চাৎ হইতে খগেন এক ধাক্কা মারিল। রমণীমোহন টলিলেন; আবার এক ধাক্কা—এবার পড়িলেন; পড়িবার সময় এক হাতে বাঁশ ধরিয়া ফেলিলেন। বংশদণ্ড অবলম্বন করিয়া তিনি শূন্যে ঝুলিতে লাগিলেন। খগেন তখন ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়া রমণীমোহনের হাতের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিল। আঘাতের উপর আঘাত—হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল—রমণীমোহন খালের ভিতর পড়িয়া গেলেন। খগেন তখন হাসিয়া কহিল, "এখন তুমি নীচে যাও, পৃথিবীর তল পর্য্যন্ত যাও; আমি এখন তোমার ঘোড়ায় চ'ড়ে নীরদাকে আন্‌তে চল্লুম।"

১২

নীরদা যখন কৃষ্ণপুরে আসিয়া পৌছিল, তখন রাত্রি এক প্রহর। পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে দ্বারবানেরাও আসিল। নীরদা আসিয়া দেখিল, তাহার আয়ি পূর্ব্ববৎ—দেহে প্রাণ আছে, এই পর্য্যন্ত গ্রামের চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর জগার পিসী মুমূর্ষুর পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। খলে মকরধ্বজ, বাটিতে দুধ, তামার পাত্রে গঙ্গাজল তুলসী সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। নীরদা বুঝিল, যত্নের কোন ত্রুটি হয় নাই; বরং যে যত্ন সে কখন করিয়া উঠিতে পারিত না, সে যত্ন অলক্ষ্যে কে তাহার আয়িকে করিয়াছে। নীরদার হৃদয়খানি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

চক্রবর্ত্তী নীরদাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। চালদেডাঙ্গায় কি কি ঘটিয়াছিল, জানিবার জন্য চক্রবর্ত্তীর প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। তিনি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; নীরদা অতি সংক্ষেপে তদুত্তর দিতেছিল। সংক্ষিপ্ত উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট না হইয়া বাহিরে দ্বারবানদের জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। এমন সময় দেখিলেন, এক ব্যক্তি ঘোড়া ছুটাইয়া কুটীরের দিকে আসিতেছে। সকলেই ভাবিলেন, জমীদার বাবু; কিন্তু অশ্বারোহী যখন অশ্ব হইতে নামিল, তখন সকলে দেখিল, এ ব্যক্তি খগেন। নীরদার মনে কেমন একটু সন্দেহ হইল। নীরদা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই খগেন বলিল, "চল নীরদা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।"

"কোথায় নিয়ে যেতে চাও?"

"চালদেডাঙ্গায়; সেই বাবু তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন।"

"কেন?"

"গ্রামের পাঁচজনের সামনে কি তোমাকে লেখাপড়া দিতে হবে। চলো—আর দেরী করো না।"

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

"বাঃ, আমি কি তোমাকে মিথ্যা বলতে এত পথ বয়ে এসেছি? বাবু বল্লেন, তুমি আমার ঘোড়া ও আলো নিয়ে চট্‌ ক'রে নীরদাকে নিয়ে এস। পাল্কীতে আসতে দেরী হবে, তুমি ঘোড়ায় উঠিয়ে জলদি নিয়ে এস।"

"তোমার সঙ্গে ঘোড়ায়! তিনি এ কথা কখনই বলবেন না।"

বলিয়া নীরদা এক জন দ্বারবানকে ডাকিল; এবং তাহাকে উঠানের একপ্রান্তে লইয়া গিয়া চুপি চুপি কি বলিল। দ্বারবান্ গম্ভীর-বদনে বাহিরে আসিয়া তাহার সহচরকে চুপি চুপি কি বলিল। সহচর তখন লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ঘোড়ায় উঠিল। খগেন ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কি কর, কি কর, আমাকে এখনি বাবুর কাছে ফিরে যেতে হবে, নীরদাকে নিয়ে।"

"আরে তোম্ ত বদমাস্ আদমি।"

"আমি আভি ভালো আদমি।"

"আচ্ছা বাবুজিকো আনে দিজিয়ে।"

বাবু আভি আস্‌তে নেহি পারবে।"

"কাহে?"

"বাবুর দরকার হ্যায়।"

"আচ্ছা, হাম্ বাবুজিকো পুছকে আতা হ্যায়, তোম্ হিঁয়া খাড়া রহো।"

"হামি দাঁড়িয়ে থেকে কেয়া করবো, হামি ভি যাই।"

প্রথম দ্বারবান্ কহিল, "নেহি ভাই, তোম্ কাঁহা যায়েগা?"

বলিয়া তাহার হাত ধরিল এবং লণ্ঠনটি কাড়িয়া লইয়া অশ্বারোহীর হস্তে দিল। চক্রবর্ত্তী ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া সকলকে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্বারবান ঘোড়া ছুটাইয়া চালদেডাঙ্গা অভিমুখে রওনা হইল। গ্রামপ্রান্তে সেতুর নিকট পৌছিতে তাহার বড় বেশী বিলম্ব হইল না। সেতুর মুখে পৌছিয়া সে ঘোড়া হইতে নামিল;

এবং ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সাবধানে সেতুপার হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ সেতুর নীচে হইতে—"কে যায়?"

উপর হইতে—"এ কেয়া! বাবুজি?"

নীচে—"কে রঘুবীর?"

উপর—"হুজুর। হুজুরকো এসা হাল—"

নীচে—"সেই বদ্‌মায়েসটা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। এখন তুমি এক কাজ কর; ঘোড়াকে বেঁধে রেখে এসো—তোমার পাগড়ীটা আমার মাথার উপর ঝুলিয়ে দাও।"

দ্বারবান হুকুমমত পাগড়ি ঝুলাইয়া দিল; বস্ত্রের একপ্রান্ত রমণীমোহন ধরিলেন। তাঁহার হাত দুইটি তখনও মুক্ত, কিন্তু নড়িবার শক্তি নাই—কোমরের উপর কাদা উঠিয়াছে। রমণীমোহন পাগড়ির একপ্রান্ত ধরিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। কাদায় এত জোরে তিনি বসিয়া গিয়াছেন যে, তাহার পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। রঘুবীরের পাদুকা হইতে তিনি বড় বেশী দূরে ছিলেন না—হাত আট দশ হইবে; কিন্তু কাদায় ধরিয়া রাখিলে তিনি উঠিবেন কিরূপে? নিরাশ হইয়া তিনি রঘুবীরকে কহিলেন, "তুমি আমাকে টেনে তোলো।"

রঘুবীর প্রাণপণ শক্তিতে টানিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। দুঃখে নৈরাশ্যে উভয়ের কান্না আসিল। তখন সহসা একটা মতলব রমণীমোহনের মাথায় আসিল। তিনি কহিলেন, "তুমি পাগড়ীটাকে বাঁশে বেঁধে রেখে ঘোড়াকে নিয়ে এসো।"

ক্ষিপ্রপদে রঘুবীর ঘোড়া আনিল। রমণী কহিলেন, "এখন ঘোড়ার গলায় পাগড়ী বেঁধে দিয়ে ঘোড়া চালাও।"

ঘোড়া প্রথমে নড়িতে চাহিল না; অবশেষে মার খাইয়া চলিল। অশ্বরাজ দুই পা যাইতে না যাইতে রমণীমোহন কাদা ঠেলিয়া উঠিলেন; তখন দ্বারবান তাঁহাকে টানিয়া তুলিল। উপরে উঠিয়া রমণীমোহন নীচে পানে একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল,—তিনি তাড়াতাড়ি সেতু পার হইয়া মাটীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পায়ে বুট জুতা ছিল, তাহা খুলিয়া পড়ে নাই। উভয়ে অনুসন্ধান করিয়া এক জলাশয়ের নিকট আসিলেন এবং রমণীমোহন উত্তমরূপে দেহ ও বস্ত্র ধৌত করিয়া ঘোড়ায় উঠিলেন।

কৃষ্ণপুরে যখন তিনি আসিলেন, তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। তিনি দেখিলেন, তাঁহার অপেক্ষায় নীরদা ও দ্বারবান্ কুটীরদ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নীরদার চক্ষুতে অনেক প্রশ্ন; অনেক ব্যাকুলতা। রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আয়ি—?"

"সেই রকমই আছেন।"

"বেশ। আমার জন্যে আর কোন চিন্তা নেই; কিন্তু চিন্তার কারণ খুবই হয়েছিল। রঘুবীর পৌঁছিতে আর একটু বিলম্ব হইলে আমার হয় ত জীবন্ত সমাধি হইত।"

বলিয়া রমণী ঘটনাটি সংক্ষেপে বলিলেন। নীরদা শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু কিছু বলিল না। তাহার চোখে মুখে তাহার অন্তরের ভাব ফুটিয়া উঠিল। রমণী কহিলেন, "আমি রক্ষে পেয়েছি নীরদা, তোমারই জন্যে। তুমি রঘুবীরকে না পাঠালে আমার কি হ'ত নীরদা?"

নীরদা কাঁপিয়া উঠিল। রমণী কহিলেন, "কিন্তু সে বদ্‌মায়েস কোথা গেল? রঘুবীর বল্‌লে, তোমরা তাকে ধ'রে রেখেছ।"

দ্বারবান্ তখন যুক্তকরে কহিল, "হুজুর, ও শালে ভাগ্ গিয়া। হাম্ একদফে উধার গিয়া—"

"তুমি ঠিক পাহারা দেওনি মিশির! আচ্ছা, তোমরা দু'জনে আজ এখানে থাক্‌বে, হুঁসিয়ারিতে পাহারা দেবে। আমি এখন বাড়ী চল্লুম—কাল সকালে আবার আসব।"

* * * *

পরদিন প্রভাতে আসিয়া রমণীমোহন দেখিলেন, বৃদ্ধা দেহত্যাগ করিয়াছেন। রমণী তাহার সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রামের লোক সকলেই সাহায্য করিল। দাহ শেষ হইলে রমণীমোহন নীরদাকে কহিলেন, "এইবার নীরদা, আমার মার কাছে চল।"

নীরদা আয়ির জন্য একটু কাঁদিল। রমণী কহিলেন, "বিধাতা তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন; কষ্ট-নিবারণ যদি মানুষের সাধ্যাতীত না হয়, তবে তোমাকে আর দুঃখ পেতে হবে না।"

নীরদা কহিল, "আমি অতি হতভাগিনী, আমি যাঁহাকে আশ্রয় করি, তিনিই সরিয়া দাঁড়ান। আপনি কেন এ হতভাগিনীকে গৃহে লইয়া যাইবেন?"

রমণী। আমার ভাগ্য তোমার সাধ্য নাই পরিবর্ত্তন কর, নীরদা। সেখানে তোমার মা আছেন, তিনি তোমার প্রতীক্ষা করছেন।

নীরদা। আমার মা? ওঃ, চন্দনপুরের মায়ের

কথা বলছেন? আপনি বলছেন, যাব। কিন্তু এ দেশে থাক্‌তে আর আমার ইচ্ছে নেই।

রমণী। কোথায় যেতে চাও?

নীরদা। তিলডাঙ্গা কোথায়, আপনি জানেন কি?

রমণী। না; তবে সন্ধান নিতে পারি।

নীরদা। আচ্ছা চলুন; কিন্তু আমি পাল্কীতে যাব না—হেঁটে যাব।

রমণী। কেন নীরদা?

নীরদা। আমি কয়েকদিন আগে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলাম হেঁটে; আজও ভিক্ষায় যাচ্ছি—

রমণী। আজ ত ভিক্ষায় নয়।

নীরদা। আজও ভিক্ষা করতে। সে দিন আম্মির জন্যে গিয়েছিলাম—আজ নিজের জন্যে যাচ্ছি।

রমণী। আজ তুমি যাচ্ছ তোমার মায়ের কাছে—তোমার ভাইয়ের কাছে। আজ তারা যে তোমাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকছে।

নীরদা আর কিছু না বলিয়া পাল্কীতে উঠিল। কিন্তু আশঙ্কা রহিল, গৃহিণীর জন্যে। যদি তিনি আশ্রয় না দেন? এই ভয়েই সম্ভবতঃ নীরদা যাইতে চাহিতেছিল না।

১৩

"বড়-মা!"

"কি বাবা?"

"তোমার মেয়েকে এনিছি।"

"বেশ করেছ। নীরদা কই?"

"পাল্কীতে আসছে—এলো ব'লে।"

"সন্ধ্যে হয়ে এলো, বাছা এখনো হয় ত কিছু খায়নি।"

"আন্‌লুম ত, কিন্তু মা কি বল্‌বেন?"

"সে আমি বুঝব; তুই ভাবিস্‌নে।"

"তুমি ভার নিলে?"

"হাঁ রে হাঁ।"

পাল্কী আসিয়া দ্বারে থামিল। নীরদাকে আনিতে উভয়ে সদরে আসিলেন। বামা তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "এস, মা এস। তার পর তাহাকে পুকুরে লইয়া গিয়া স্নান করিলেন। দুই জনে স্নান সমাপন করিয়া যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে ঘরে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রমণীর একখানি কাপড় টানিয়া লইয়া বামা নীরদাকে পরিতে দিলেন। বালিকা একটু সঙ্কোচের সহিত তাহা পরিল। ভয় হইতে লাগিল, যদি গৃহিণী তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাকে অপমান করেন। তার পর বামা তাহাকে খাইতে দিল। এবার উঠানে নয়—বামার শয়নকক্ষে; কদলীপত্রে নয়—কাংস্যপাত্রে। দ্বার বন্ধ করিয়া বামা তাহাকে অতি যত্নের সহিত খাওয়াইল। তারপর তাহার শয্যার একাংশে তাহাকে শুইতে বলিয়া সে অন্য কার্য্যে চলিয়া গেল।

এদিকে রমণীমোহন মায়ের সন্ধানে ছাদের উপর উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী সরস্বতী তথায় পা ছড়াইয়া বসিয়া ভিজা গামছা দিয়া গা মুছিতেছিলেন, আর দাসী রামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "হাঁরে, একটু আগে একখানা পাল্কী এসে থাম্‌ল না? মোহন এলো বুঝি? কি ক'রে যে বেড়াচ্ছে!"

রমণীমোহন সেই সময় আসিয়া কহিলেন, "মায়ের আদর খাবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে!"

বলিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন।

মায়ের অভিমান আর রহিল না। পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এ ক'দিন কি ক'রে বেড়াচ্ছিস্‌ বল্‌ দেখি?"

রমণী। বাবা যা' করতেন, আমিও তাই করছি মা।

জননী। তাই কর্‌ বাবা—

রমণী। বাবার সুখ্যাতি সকলেই করে মা; আজও লোকে তাঁর নাম করে, আর কাঁদে। আমি কি ক'রে তাঁর নাম রাখব মা!

জননী। তিনি স্বর্গে থেকে তোমাকে শক্তি দেবেন; তুমি তাঁর মত হও বাবা, এর বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি জানিনে।

রমণী। মা, একটি অনাথাকে আমি এনেছি।

জননী। কোথায় এনেছ? এখানে?

রমণী। হাঁ।

জননী। দেখ, ভিখিরি-টিখিরিকে বাড়ীতে স্থান দেওয়া আমি পছন্দ করিনে। কিছু দিতে থুতে হয়, দিও; কিন্তু বাড়ীতে আনা—

রমণী। ও সব কথা যাক্‌। মহাভারতের সেই গল্পটা বল না মা।

জননী। কোন্‌ গল্পটা রে?

রমণী। সেই যে যযাতি রাজার ছেলে পুরুর কথা।

জননী আখ্যান আরম্ভ করিলেন। পুরু কিরূপে পিতার জরা লইয়া তাঁহাকে যৌবনদান করিলেন, সে কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিলেন। আখ্যান শেষ হইলে রমণী কহিলেন, "পুরু কিছু বেশী করেন

নি—পিতার জন্যে পুত্র আরও বেশী করতে পারে। আমার বড় দুঃখ হয়—"

জননী। কি দুঃখ হয় বাবা ?

পুত্র। বাবা যদি এমনি একটা কিছু আমার কাছে চাইতেন—

জননী। তুই যে তখন ছোট রে—

পুত্র। তা' হোক।

জননী। তুই কি দিতিস্ ?

পুত্র। তাঁকে আবার দেব কি ? আমিই যে তাঁর্ ; তবু মনে হয়, তিনি যদি বলতেন, 'মোহন, তোর আয়ু দিয়ে আমাকে বাঁচা—'

জননী। ষাট ষাট—

পুত্র। তা' হ'লে মা, আমার কত আনন্দ হ'ত, আর আমার জীবন কত সার্থক হ'ত !

জননী। এখন চল্, খাবি চল্। কাল যে কখন্ এসে খেলি, তা' জানতেও পারলুম না

মাতা-পুত্র নামিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সরস্বতী দেখিলেন, একটি মেয়ে উঠান ঝাঁট দিতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে রে ?"

বামা জানিত, গৃহিণীর প্রথম সম্ভাষণ কিরূপ হইবে ; সুতরাং সে নীরদার কাছে কাছেই ছিল। এক্ষণে অগ্রসর হইয়া উত্তর করিল, "কে আবার ? মানুষ।"

সর। মানুষ ত দেখ্ছি, কিন্তু মানুষের ত একটা নাম থাকে।

বামা। নাম জান্লেই সব বুঝে নেবে ? নাম বলতে পারি, কিন্তু আর কিছু জিজ্ঞেস করো না।

সর। এই মেয়েটি সে দিন ভিক্ষে নিতে এসেছিল না ?

বামা। হাঁ।

সর। আজ বুঝি আবার ভিক্ষে চাইতে এসেছে ?

বামা। সে দিন অনেক দিয়েছিলে কি না, তাই লোভ পেয়ে আজ আবার এসেছে '

সর। তোকে কথায় আঁটতে পারব না, এখন কথাটা খুলে বল্।

বামা। ওগো, মোহন কাল একে নিয়ে এসেছে।

সর। এখানে থাক্‌বে না কি ?

বামা। না গো না ; আজই আমার সঙ্গে চ'লে যাবে।

সর। তোর সঙ্গে কোথায় রে ?

বামা। কেন, আমার বাড়ীতে।

সর। তোর আবার বাড়ীতে কে আছে যে, তার জন্যে তোর আজ নাড়ী কেঁদে উঠল ?

বামা। কেউ না থাকুক, ঘরদোর ত আছে।

সর। তোর তাও নেই।

বামা। না থাকে, তৈরী ক'রে নেব।

সর। দেখ্ বামাদি, তোর যা' কিছু আছে, সব এইখানেই আছে। আমি আছি, মোহন আছে, আর এই বাড়ী ঘরদোর আছে।

বামা। না, না, তোমরাও আমার নও, বাড়ীও আমার নয়।

সর। তুই মোহনকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বি ?

বামা। পারব। এখন যে আমি মেয়ে পেয়েছি।

বলিয়া বামা, নীরদাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। সরস্বতী তখন ব্যাপারটা কি বুঝিলেন। একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুই যাবি যা, কিন্তু মেয়েটিকে আমি রেখে দেব। আহা, বেশ মেয়ে !"

কার্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া বামা একটু আনন্দ অনুভব করিল ; কিন্তু সে ভাব লুকাইয়া একটু ঝঙ্কারের সহিত কহিল, "তোমাকে আর সোহাগ দেখাতে হবে না, আমার মেয়েকে আমি নিয়ে যাব।"

গৃহিণী, নীরদার কাছে না আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তোমার নাম কি বাছা ?"

"নীরদা।"

"বেশ নাম। তোমাকে ঝাঁট দিতে হবে না— ঝাঁটা রাখ।"

"আমি তবে কি করব ?"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না।"

"সে কেমন ক'রে—"

বামা কহিল, "সে ভাবনা তোকে আগে হ'তে করতে হবে না, তখন তুই কাজের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়বি। এখন তুই চান করে আয়।"

বামা তাহাকে একখানি নূতন কাপড়, একখানি নূতন গামছা আনিয়া দিল। কাপড়খানি ডুরে, দেশী। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই এ কাপড় কোথা পেলি, বামা-দি ?"

বামা একটু হাসিয়া কহিল, "আমি কাল দুপুরে সরকারকে দিয়ে আনিয়ে রেখেছিলুম।"

সর। তুই বুঝি আগে হ'তে জান্‌তিস, নীরদা আসবে ?

বামা। আমিই ত ওকে আনিয়েছি ; ও কি আসতে চায় ?

সর। তোমার এত দরদ কেন শুনি ?

বামা। সে কথা আর একদিন বলব।

সরস্বতী তখন আর কিছু বলিলেন না ; কিন্তু কয়েকদিন পরে এক সময়ে চুপি চুপি কহিলেন, "দেখ্, নীরদাকে ঘরে দোরে উঠ্‌তে দিস না—কি জাত জানা নেই।"

বামা। তোমাদের ঘরে উঠ্‌বে না গো, ভয় নেই।"

সর। তোর ঘরে ত উঠবে বামাদি।

বামা। তা' আমার মেয়ে আমার কাছে শোবে না ত কি উঠোনে প'ড়ে থাকবে।

সর। দেখ্, অতটা বাড়াবাড়ি করিস্ নে—

বামা। তোমার ভাল না লাগে, আমাকে ছেড়ে দেও না।

সরস্বতী পলায়ন করিলেন। বামা, নীরদাকে সাজাইতে বসিল। যে সকল স্বর্ণালঙ্কার বামা আজ ত্রিশ বৎসর পেটরার ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আজ সেগুলি বাহির করিল। এতকাল সাজাইবার লোক পায় নাই, বড় দুঃখেই তাহাদের তুলিয়া রাখিয়াছিল। আজ বামা লোক পাইল, আজ দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পরে বামা সাজাইবার লোক পাইল। চন্দ্রহার, কণ্ঠহার, তাগা, বালা, চিক্, তাবিজ, যশম প্রভৃতি অনেক গহনা বামা একে একে নীরদাকে পরাইয়া দিল। তাগা বালা বড় হইয়াছে, খুলিয়া পড়িয়া যাইতেছে, তবু বামা খুলিয়া লইল না—সমস্ত পরাইল ; যা' কিছু তাহার ছিল, সব পরাইল। বেনারসী কাপড় জামা বাহির করিল, তাহাও পরাইল। পরাইয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দেখিতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে তাহার বুভুক্ষিত প্রাণ স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বামা সহসা নীরদার চিবুক ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল ; বলিল, "একবার মা ব'লে ডাক্।"

"মা।"

দুই জনেরই চক্ষে জল আসিল। তার পর বামা সামলাইয়া লইয়া কতকগুলি গহনা খুলিয়া লইল। হার বাজু বালা রাখিয়া দিল। কাপড়-জামাও খুলিয়া লইল ; খুলিয়া লইয়া কহিল, "এ সব তোমার রইল। তুমি যে আমার মেয়ে, আমি যে মেয়ে পেয়েছি। ভাবছিলুম, কা'কে দিয়ে যাব ; মোহনের বউয়ের জন্যেই ছিল ; কিন্তু সে কবে আসবে না আসবে, আর তা'র অভাবই বা কি হবে ? তার চেয়ে আমার মেয়ে—"

"আমি এখন সব খুলে রেখে দিই না কেন মা ?"

"না, না, তুমি পর ; এ সব তোমার।"

নীরদা অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিয়া রহিল। বামা কার্য্যান্তরে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেল, "এ ঘরটি তোমার ও আমার। আর কারুর ঘরে যাবার অধিকার তোমার ও আমার নেই। বুঝেছ ?"

"বুঝেছি।"

তার কয়েক দিবস পরে এক দিন সন্ধ্যাকালে উন্মুক্ত ছাদে বসিয়া গৃহিণী বামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বামা-দি, সত্যি ক'রে বল্, মেয়েটির জন্যে তুই এত ক'রে মরিস্ কেন ? জানা নেই, শোনা নেই—"

বামা। হ্যা, এ কথা তোমাকে এক দিন বলব বলেছিলুম। বল্‌ছি, শোন ; কিন্তু তুমি কি বুঝবে ?

সর। তুই কি ইংরিজীতে বলবি না কি ?

বামা। না, আমি বাঙ্গলাতেই বলব ; তবে শোন। আমি বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী আশ্রয় নেবার পর একদিন বৈকালে দেখলুম, একটা পায়রা এসে আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর বস্‌ল। সে একা—দূরে বা নিকটে—আর কোন পায়রা দেখতে পেলুম না। তার জন্যে আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠল। পায়রা ওড়ে না, ব'সে রইল। আমি আকাশের পানে বার বার চেয়ে দেখ্‌তে লাগলুম, কিন্তু কোথাও কোন পায়রা দেখতে পেলুম না। তখন আমি কি করব, কিছু ঠিক করতে না পেরে, ছুটে গিয়ে কিছু চাল-কড়াই নিয়ে এলুম। কিন্তু পাখী তা খেলে না, উড়ে গেল। আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল, আমি সমস্ত বিকেলটায় তার প্রত্যাশায় ছাদে ব'সে রইলুম ; কিন্তু সে আর এলো না। পাখী যদি তখন এসে আমার গায়ের মাংস খেতে চাইত, আমি তা'ও তা'কে দিতুম। কিন্তু সে আর এলো না ; সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন আকাশ ঢাকল, তখন আমি চোখে জল নিয়ে নীচে নেমে এলুম। আমার দুঃখ বুঝলে কি ?

সর। তুমি সেই পায়রা বুঝি এত দিন পরে পেলে ?

বামা। হা, পেয়েছি—আমার নিজের কোলে তাকে পেয়েছি। সে মাতৃহীনা, মা চায় ; আমি সন্তানহীনা, সন্তান চাই। রাত্রিতে সে যখন আমার গলা জড়িয়ে শুয়ে থাকে, তখন আমাদের দু'জনের বুভুক্ষিত প্রাণ শান্ত হয়। আমি তা'র দিকে পিছন ফিরি না, সে আমার দিকে পিছন ফিরে না।

সর। কেন, মোহনকে পেয়েও কি তোমার প্রাণ শান্ত হয় নি ?

বামা। না, হয় নি। মোহন তোমার, নীরদা আমার। মোহনের অভাব নেই, নীরদার সবই অভাব। নীরদা আমার দুঃখী মায়ের দুঃখী মেয়ে। বিলেতে আপীল ক'রে যদি আমি জমীদারী ফিরে পাই, তবে আমি তা' নীরদাকে দিয়ে যাব।

ঠিক সেই সময় নীচে বামার ঘরে বসিয়া রমণীমোহন নীরদাকে বলিতেছিলেন, "আজ আমি সমস্ত দিন কোথায় ছিলুম, বল দেখি নীরদা?"

নীরদা। কৃষ্ণপুরে।

রমণী। কি ক'রে জানলে? আশ্চর্য্য! আমি কা'উকে কিছু বলি নি, সইসকেও নিয়ে যাই নি।

নীরদা উত্তর করিল না, একটু হাসিল মাত্র। রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এইবার বল দেখি, কেন আমার ফিরতে এত দেরী হ'ল?"

নীরদা। আপনি আয়ির শ্রাদ্ধ করাচ্ছিলেন।

রমণীমোহন বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল নীরদার পানে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর কহিলেন, "নীরদা, তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—"

নীরদা। এ কথাটা বলতে ভারি ত বুদ্ধির দরকার! আজ যে একমাস পূর্ণ হ'ল।

রমণী। আর এক দিন নীরদা, তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়েছিলুম—তুমি সে রাত্রিতে আমার প্রাণ রক্ষা করেছিলে।

নীরদা। আমার জন্যেই ত আপনার বিপদ্ ঘটেছিল। দায়ী আমি।

রমণী। তোমার যে রকম বুদ্ধি, তুমি লেখা-পড়া চট্ ক'রে শিখে নিতে পারবে। এবার পূজার বন্ধে যখন আসব, তখন আমি তোমায় বর্ণপরিচয় ধরাব।

নীরদা। আপনি কি শীগ্‌গির কোলকাতায় যাবেন?

রমণী। হাঁ, আর চার পাঁচ দিন পরে কলেজ খুলবে।

নীরদা। আবার কবে আসবেন?

রমণী। পুজোর সময়; তার আগে আর লম্বা ছুটী নেই। তখন তোমার জন্যে কি আনব নীরদা?

নীরদা। ঠাকুর-দেবতার ছবি আনবেন; ঘর-দোর সাজাব।

রমণী। তোমার নিজের ঘরটি ত বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছ; আমার ঘরের অবস্থা বোধ হয় জান না, একবার দেখে এসো। টেবিলের উপর জামা-কাপড়, বিছানার উপর কেতাব। আন্‌লা এমনিভাবে বোঝাই যে, দরকারমত কোন কাপড়-জামা খুঁজে পাই না। বই যে কোথায় কে গেছে, তা' খুঁজতে গেলে পড়ায় আর মন থাকে না। যা'ক এখন সে সব কথা; আমি তোমার জন্যে ছবি আনব, আর খান্ কয়েক বই আনব। আমি এখন উপরে মায়েদের কাছে যাই।

তিনি প্রস্থান করিলেন। যখন নীরদা দেখিল, তিনি সত্যই উপরে গিয়াছেন, তখন সে কয়েকটি ধূপ লইয়া রমণীর ঘরে প্রবেশ করিল। তাঁহার দুইটি বড় বড় ঘর। একটি বসিবার, আর একটি শুইবার। নীরদা কোমর বাঁধিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল। দুইটি ঘরের কোণে, খাটের নীচে, আলমারীর মাথায়, টেবিলের উপর যেখানে যা ধূলা ছিল, তাহা নীরদা অল্পসময়ের মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে পরিষ্কার করিল। কেতাবগুলা বিছানা বা আলমারীর মাথা হইতে উঠাইয়া আনিয়া বসিবার ঘরে যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল। জামা-কাপড় আন্‌লায় উঠিল। ঘড়ীটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—কেন, তা রমণী খবর রাখিতেন না—নীরদা তাহাকে দম দিয়া চালাইয়া দিল। তার পর শয্যা ঝাড়িয়া বালিসগুলি যথাস্থানে রাখিল। এ সকল কাজের ভার এক জন দাসীর উপর ন্যস্ত ছিল। সে ঠিক দুই বেলা হাজির দিয়া মেজের ধূলা, ঘরের কোণে আলমারীর তলায় জমা করিত; আর বিছানায় দু' ঘা ঝাড়ু মারিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিত। নীরদা দেখিল, তাহার কাজ অনেক, কিন্তু সময় অল্প; ভয়—পাছে রমণী আসিয়া পড়েন। সেই অল্পসময়ের মধ্যে যা কিছু পারিল, করিল; তাহাতেই কক্ষ দুইটি একটা নূতন শ্রী ধারণ করিল। তার পর ধূপ জ্বালিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

নীরদা যখন তার নিজের ঘরে প্রবেশ করিল, তখন শুনিল, গৃহিণী উপর হইতে নামিতে নামিতে পুত্রকে বলিতেছেন, "এখন দিন ভাল নেই, তুই কি ক'রে যাবি?" রমণী উত্তর করিতেছিলেন, "তোমাকে ছেড়ে যে দিন দূরে যাই, সেই দিনই ত খারাপ মা—ভাল দিন ত পাওয়া যাবে না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি নামিয়া আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

তথায় আসিবামাত্র তাঁহার হাসি লুকাইল—তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং বিস্মিত-নয়নে চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় ঘড়ীতে দশটা বাজিল, ঘড়ীর আওয়াজ অনেক দিন রমণী শুনেন নাই। এখন ঘড়ীর ঘণ্টা শুনিয়া তিনি ঘড়ীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

শ'ঙা থামিল ও ধূপের গন্ধ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। ক্ষণপরে তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "বড়-মা, বড়-মা, দেখে যাও, আমার ঘরে কে এসেছিল! সব কি সুন্দর—"

১৪

অন্নদা বাবুর অনেক আত্মীয় ছিল—অন্ততঃ তাহারা আত্মীয় ব'লে প'রিচয় দিত; কিন্তু নিকটাত্মীয় কেহ ছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। খুলনা জেলায় এক ঘর ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে বিষয়াদি লইয়া এতই বিবাদ বাধিল যে, তাঁহারা পরস্পর বিশেষ অনাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বিবাদের সময় দেখা গে', আত্মীয়ের চেয়ে বিষয় প্রিয়, আর অংশীদার অপেক্ষা শত্রু বাঞ্ছনীয়। এই নিকটাত্মীয় সরিয়া দাঁড়াইলে অনেক দূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব ব্যক্তি, অন্নদা বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হরিপ্রসন্ন নামধেয় কোন বালকের সহিত অন্নদা বাবুর সামান্য সম্পর্ক ছিল। সামান্য হইলেও সে যখন পিতৃমাতৃহীন হইল, তখন দেখিল, অন্নদা বাবু ছাড়া তাহার আর কেহ নাই। পাঁচ জনের পরামর্শ-মত অন্নদা বাবুর দ্বারস্থ হইয়া তাঁহার আশ্রয়প্রার্থী হইল। অন্নদা বাবু তাহাকে আগ্রহের সহিত আশ্রয়দান করিলেন ও লেখা-পড়া শিখাইলেন। যখন দেখিলেন, পড়াশুনায় তাহার মনোযোগ নাই, তখন তাহাকে নিজের সেরেস্তায় কাজ দিলেন।

কিন্তু সেরেস্তার কাজে তাহার দক্ষতা প্রকাশ পাইল না; না পাইবারই কথা, কড়া-ক্রান্তি বিঘা-কাঠায় কোন ভদ্রলোকই দক্ষতা দেখাইতে পারে না। এ কাজ ছাড়িয়া বাজার-সরকারের কাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল এবং দেওয়ানজির কাছে তাহার আবেদন জানাইল। দেওয়ান বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, হরির বয়স কম, বাবুরও আত্মীয়, অন্দর-মহলে যাতায়াত করিতে তাহার কোন বাধা হইবে না। দেওয়ান তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হরিপ্রসন্ন অষ্টাদশ বৎসর বয়সে বাজার-সরকারে আকাঙ্ক্ষিত পদলাভ করিল; এবং এক সুচতুর ভৃত্যের নিকট হইতে জানিয়া লইল, কিরূপে হিসাব-পত্র দিতে হয়। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই তাহার আহার-বিহার ও বেশভূষার অনেক পরিবর্তন ঘটিল। রেসমের পাঞ্জাবী, বিলাতী জুতা ও গরদের চাদরে ভূষিত হইয়া হরিপ্রসন্ন প্রত্যহ সন্ধ্যায় বন্ধুমহলে বসিয়া টপ্পাদির চর্চ্চা করিত। রাত্রি একটু বেশী হইয়া গেলেও তাহাকে আহারের নিমিত্ত কোন অসুবিধায় পড়িতে হইত না—পাচক ঠাকুর বিনা প্রতিবাদে ঘৃতপুষ্ট লুচি লইয়া তাহার জন্যে অপেক্ষা করিত।

অন্দরমহলের দাসদাসীরা সকলেই একটু বাজার-সরকারের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিত; কেন না, তিনি তাহাদের আবেদন-নিবেদন বিবেচনা করিতেন এবং কার্য্যাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। এমন কি, পুরমহিলারাও এই যুবকের মনোরঞ্জন করিবার প্রয়াস পাইতেন। কাহার কাপড় চাই, কাহার কাপড় বদলাইয়া একখানা ভাল কাপড় আনিতে হইবে, কাহার ফিতে চাই, আর্শী চাই, দাঁতের মিশি চাই, গামছা চাই, টোয়ালে চাই; কাহারও অসুখ করিয়াছে, ডাক্তার ডাকিতে হইবে, ঔষধ আনিতে হইবে। যার যত কিছু দরকার, সব বাজার-সরকারকে জানাইতে হইবে। কর্ত্রী বর্ত্তমানে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। এখন হরিপ্রসন্ন ব্যতীত তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ শুনিতে আর কেহ নাই। তবে কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিলে দেওয়ানের কানে উঠিত।

যে যত চেষ্টাই করুক, হরিপ্রসন্ন কিন্তু প্রসন্ন ছিলেন সরাম সুগ্রীবের প্রতি। তিনি শান্তমণির ঘরে গিয়া বসিতেন, আর নির্জ্জন মধ্যাহ্নে দীর্ঘকাল ধরিয়া দেবযানীকে নাটক-নভেল পড়িয়া শুনাইতেন। এক দিন শুনাইতেছিলেন, কেমন করিয়া এক অবিবাহিত যুবক, বিবাহিতা যুবতীকে শুনাইতেছিল, স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়। তিনি আরও পড়িয়া শুনাইতেছিলেন, কেমন করিয়া সেই যুবক, রমণীকে বিপথগামী করিবার উদ্দেশ্যে কতরকম কৌশল অবলম্বন করিতেছিল—বুঝাইতেছিল, চিত্ত যখন যাহাকে চায়, তখন যেমন করিয়া পার, তাহাকে আপন করিয়া লইবে। এই সুখময় পাঠের সময় সহসা শান্তমণি তথায় উপস্থিত হইয়া পাঠে ব্যাঘাত উৎপন্ন করিল; কহিল, "বাবা, ও সব বই প'ড়ে ওকে শুনিও না—ও এক রত্তি মেয়ে।"

হরি। সে কি পিসী মা! এ সব পবিত্র গ্রন্থ যে সভায় গির্জ্জায় পড়া হয়।

শান্ত। তা' হো'ক। আমাদের এ ঘর সভাও নয়, গির্জ্জেও নয়।

হরি। আমাদের দেশের ছাপাওয়ালারা আমাদের মঙ্গলের জন্যে, আমাদের শিক্ষার জন্যে বাঙ্গালা ভাষায় এই সব চমৎকার বই অনুবাদ ক'রে ছাপিয়েছেন।

শান্ত। যারা ছাপিয়েছে, তারা তাদের ঘরের মেয়েদের প'ড়ে শোনাক্, আমার মেয়ে ও সব শুনবে না।

দেবযানী। মা, তুমি এ সব ভাব বুঝতে পারবে না—

শান্ত। আমার সাত কাল গেছে, আমি বুঝতে পারব না, আর তুমি সবে—

দেব। এ বইখানায় বড় ঘরের কথা আছে—

শান্ত। বড় ঘরে সব শোভা পায়; তুমি আমার গরীবের মেয়ে, তোমার ও-সব ভাবে দরকার নেই।

হরিপ্রসন্ন বিরক্ত' লইয়া প্রস্থান করিলেন। শান্তমণি কন্যাকে কহিলেন, "দেখ, তুই হরির সঙ্গে অত মিশিস্ নে।"

কন্যা। কেন তাতে দোষ কি?

মা। দোষ যে কি, তা' তোকে বোঝাতে পারব না; এইটুকু শুধু মনে রাখিস্, আমি তোর মা—আমার চেয়ে কেউ তোর ভাল খোঁজে না—আমি তোকে বারণ করছি।

কন্যা। বারণ করলেই ত হবে না, কারণ দেখাতে হবে।

মা। তোকে আবার কি কারণ দেখাব রে!

কন্যা। সে সব দিন আর নেই মা। আমি হরিদার মুখে শুনেছি, সকল মানুষেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার অধিকার আছে। তোমার কারণ শুনে আমি যদি বুঝি, তোমার কথা ন্যায্য—

মা। তুই এ সব কথা কি বলছিস? আমার কথা ন্যায্য কি না, তার বিচার করবি তুই? আ হতভাগা মেয়ে!

কন্যা। আমি শুনেছি, মনের উপর জোর করবার অধিকার কারুর নেই; আমার মন যা চাইবে, তাই করব।

মা। হরিটা দেখছি তোকে উচ্ছন্ন দিয়েছে। আমি যেমন চোখের মাথা খেয়ে—

কন্যা। তুমি কি চাও, খুলে বল দেখি।

মা। তুই কি চাস্, আগে খুলে বল্ দেখি? তুই কি বাজার-সরকারের বউ হ'তে চাস্, না, তার মনিব হ'তে চাস্?

কন্যা। আমি মনিব হ'তে চাই।

মা। তবে ও হতভাগাটার সঙ্গে আর মেশামিশি করিস্ নে।

কন্যা। তা' হলেই কি আমি ওর মনিব হয়ে পড়লুম?

মা। হবি, হবি—কটা দিন অপেক্ষা কর।

কন্যা। অপেক্ষা করতে করতে ত বুড়ো হয়ে পড়লুম।

মা। সবুরে মেওয়া ফলে রে। তুই আগে এ বাঁদরটার সঙ্গ ছাড়।

কন্যা। বা, হরিদা কত জিনিস দেয়—

মা। ক' পয়সার মোরদ তার যে, তুই লোভ করছিস! আর এ যে একটা রাজ্যির ঐশ্বর্য্যি।

দেবযানী ভাবিয়া দেখিল, মায়ের এ কথাটা অযুক্তি-সঙ্গত নয়। কিন্তু তাই ব'লে হরিপ্রসন্নর সঙ্গ ত্যাগ করবার প্রয়োজন কি? সে আসছে, যাচ্ছে, তা'তে কার কি ক্ষতি বাপু? মা যেমন তা'কে দু'চক্ষের বিষ দেখেন, আমি ত তেমন দেখি নে। তাকে আমার লাগে ভাল, তাকে দেখলেই আনন্দ হয়। তা' ছাড়া তার কাছে শিক্ষা পাওয়া যায়, জিনিসও পাওয়া যায়। তা'কে ছাড়ব কেন? মার যেমন বুদ্ধি।

দেবযানী এ সম্বন্ধে অশিক্ষিতা জননীর সহিত একেবারেই একমত হইতে পারিলেন না। এক জন শিক্ষিত উচ্চভাবাপন্ন যুবকের সহিত একটু সাহিত্য আলোচনা করিলে যে কোন দোষ হইতে পারে, ইহা তিনি মনে করিতে পারিলেন না। অন্নদার কাছে তিনি অনুক্ষণ যাইতে বলেন, সেখানে গিয়া যে কি হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন না। তাঁহার অন্নদা ত ছান্দোগ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি বর্ম্মের অন্তরালে সকল সময় অবস্থান করিতেছেন; রূপ-যৌবন অস্ত্র সে বর্ম্ম ভেদ করিতে এত দিন পারে নাই, পারিবেও যে, এরূপ ভরসা কম। দেবযানী ভাবিল, তবু জননী বলেন, সেখানে চুপ ক'রে ব'সে পাঠ শুনবি। সেখানে ব'সে পাঠ কি শুনব? কেতাবগুলার নাম বানান হয় না, ভাষাও বুঝা যায় না। আরে ছ্যা, সেখানে গিয়ে করব কি? তাই দুটো ভাল কথা বলুক। তা নয়, শুধু বলবে, রেখে যাও। ব্যস্, তার পর আর মানুষটার চৈতন্য নেই। ঘরে যে একটা মানুষ আছে, এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা' একবার ফিরেও দেখবে না। এত তাচ্ছিল্য সহ্য হয় না। তার চেয়ে হরিপ্রসন্ন ঢের ভাল। আর বিয়ে করতে হয়, স্পষ্ট ক'রে বল্, না করতে হয়, তাও বল্; আমি কি চিরজীবন তার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাক্ব?

জননীও যে অধীর হইয়া পড়েন নাই, এমন কথা বলা যায় না। যতই রূপ ও যৌবন তাঁহার কন্যার দেহকে নানা শোভা সম্পদে সাজাইতে লাগিল, ততই তাঁহার উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। শত্রুপক্ষীয়েরা

নানা কথা ইঙ্গিতে, কখন বা স্পষ্ট ভাষায় শুনাইতে লাগিল। সে সব কথার উত্তর নাই, তাঁহাকে নীরব থাকিতে হইত। যে শান্তমণির হুঙ্কারে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিত, আজ সে শান্তমণিকে নীরবে গৃহমধ্যে বসিয়া থাকিতে হইত। শত্রুপক্ষীয় কেহ তাঁহার দর্শন পাইলে একটা না একটা শর নিক্ষেপ করিয়া যাইত। একদা এক দাসী কোন পুবমহিলাকে কি বলিতেছিল, এমন সময় তথায় শান্তমণি আসিয়া পড়িলেন। পুব-মহিলা তখন দাসীকে কহিলেন, "আমার কাছে ব'লে কি হবে বাছা? যা'র জামাই বাজার-সরকার, তাকে বল গে যাও।"

শান্তমণি বিরস-বদনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন এবং জানালায় দাঁড়াইয়া অনেক চিন্তা করিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, শত্রুরা বড় অন্যায় বল্‌ছে না ত। মেয়ে ত একটা মাগী হয়ে উঠেছে, তার কাছে নিত্যি আনাগোনা করছে একটা ছোঁড়া; এ ত ভাল কথা নয়। লোকে ত দোষ ধরবেই; পরের ঘরে এমনটা হ'লে আমি কি ছেড়ে কথা কইতুম! এখন কি করা যায়? অন্নদার গতিক ত ভাল দেখছি নে। আমি লুকিয়ে দেখেছি, সে মেয়েটার পানে একবার ফিরেও দেখে না। মেয়েটাকে এত বলি, তার বই পড়া শুন্‌বি, মানে বুঝিয়ে দিতে বল্‌বি, তা মেয়েটা সে সব কথা কানেও তোলে না। কি যে ছাই হরি পড়ে, সে সব শুন্‌তে মেয়েটা পাগল। অন্নদার কাছে যেতেই চায় না। আহাম্মুক মেয়েটা একেবারেই বুঝছে না, কত বড় বিষয়টা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি করি কি? মেয়ে ত আর রাখা যায় না, শেষকালে কি একটা কেলেঙ্কারি হবে? নীচে ফুলবাগানে বেড়াচ্ছে কে? দেখী না? দেখি গে কে। হয় ত সে ছোঁড়াটাও আছে। কি জ্বালাতেই পড়্‌লুম।

১৫

পূজার বন্ধে রমণীমোহন বাড়ী আসিয়াছেন; কিন্তু তিনি একা আসেন নাই, তাঁহার সঙ্গে বন্ধু রমেশ আসিয়াছেন। রমেশের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব অনেক দিনের। উভয়ে সহপাঠী ও সমবয়স্ক। রমেশের বাড়ীও এই যশোহর জেলায়। তাঁহার মাতা-পিতা নাই। এক পিসী, আর এক বিধবা ভগ্নী লইয়া তাঁহার সংসার। বিষয়াদি কিছু আছে, তাহাতে সংসার এক রকম বেশ চলিয়া যায়। তিনি কলিকাতায় হোষ্টেলে থাকিয়া লেখাপড়া করেন।

রমেশ যে এইবার প্রথম এখানে আসিলেন, তা' নয়—তিনি বৎসরে দু'বার একবার রমণীর সঙ্গে চন্দনপুরে আসেন। রমণীও কখন কখন তাঁহার বাড়ী নারায়ণপুরে গিয়া থাকেন। রমেশের মা নাই, তিনি মায়ের আদর খাইতে চন্দনপুর আসেন, রমণীর ভগ্নী নাই, তিনি ভগ্নীর আদর খাইতে নারায়ণপুরে যান। তবে এক জন ব্রাহ্মণ, অপরে কায়স্থ। তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না,—উভয়ে একপাত্রে আহারাদি করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বন্ধুর জাতি দেখিবার প্রয়োজন নাই, যে প্রকৃত বন্ধু, সে আত্মীয় অপেক্ষা প্রিয়, সহোদর ভ্রাতার সমান স্নেহের পাত্র।

রমণীমোহন বাড়ী আসিয়া আগে মায়েদের চরণ-বন্দনা করিলেন; পরে নীরদার অন্বেষণে তাহার ঘরে আসিলেন। তখন অপরাহ্ন। নীরদা যখন প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি দেখিলেন—এ কি! এ ত সে নীরদা নয়। কয়েক মাস পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছিলেন যাহাকে মুকুল মাত্র, এখন দেখিতেছেন তাহাকে সন্ধ্যামলয়স্পৃষ্ট ফুটনোন্মুখ বেলমতিয়া। যাহাকে বালিকা দেখিয়া গিয়াছিলেন, সে আজ কৈশোরের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। প্রতিমায় কর্দ্দম লেপন করিতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া দেখিলেন, তাহা বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। মুখেতে অনেক হাসি লইয়া রমণীমোহন আসিয়াছিলেন, নীরদাকে দেখিবামাত্র তাঁহার হাসি স্তব্ধ হইয়া দাড়াইল; ছোট ভগ্নীর জন্যে অনেক কথা লইয়া আসিয়াছিলেন, সে সব কথা কণ্ঠে বাধিয়া রহিল। রমণীমোহন অনিমেষ-নয়নে নীরদার মুখখানি দেখিতে লাগিলেন। বুদ্ধিতে ললাট উজ্জ্বল, আনন্দে নয়ন দীপ্ত, ধীরতায় ভ্রূদ্বয় সংযুক্ত, অনুরাগে ওষ্ঠ কম্পিত। মুগ্ধ নয়নে রমণী তাঁহার রোপিত পুষ্পবৃক্ষকে দেখিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে নীরদার চক্ষু অবনত হইয়া পড়িল। চক্ষু নত করিয়াও নীরদা অনুভব করিল, রমণীমোহনের স্নেহকোমল দৃষ্টি তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্ষণপরে নীরদা কহিল, "আপনার তিনখানা চিঠি আমি পেয়েছি।"

"তুমি ত তার একখানারও উত্তর দেও নি নীরদা।"

অকস্মাৎ বামা তথায় আসিয়া পড়িয়া উত্তর করিল, "ও কি লেখাপড়া জানে যে, তোমার চিঠির উত্তর দেবে?"

রমণী। এবার আমি নীরদাকে লেখাপড়া শেখাব।

বামা। তুই নীরদার জন্যে কি এনেছিস্ দেখি।

রম। নীরদা ছবি চেয়েছিল, ছবি এনেছি।

বামা। আমি যে কাপড়-জামা আন্‌তে লিখেছিলুম, তা' আনিস নি?

রম। এনেছি।

বামা। নিয়ে আয়, দেখি।

রম। কাল দেখো; আজ ছবি দেখ।

দাসীরা ছবির বাক্স আনিল। অনেক ছবি, আর সকলগুলিই ঠাকুর-দেবতার। নীরদা আগ্রহের সহিত ছবি দেখিতে লাগিল। কিন্তু রমণী দেখিতেছিল শুধু নীরদাকে। সহসা নীরদা তাহা বুঝিতে পারিল। সে কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আগে এ সঙ্কোচ ছিল না। বড় ভায়ের সঙ্গে অল্পভাষী ছোট বোন যেমন মেলামেশা করে, নীরদা প্রায় সেই রকমই করিত। কিন্তু আজ কোথা হইতে সঙ্কোচ আসিয়া উভয়ের মধ্যে দাঁড়াইল। লজ্জা বা সঙ্কোচের প্রাচীর কোমল হইলেও ভঙ্গপ্রবণ নয়; ভাঙ্গিতে না পারিয়া রমণীমোহন প্রস্থান করিলেন।

নিজের ঘরে আসিয়া রমণীমোহন দেখিলেন, সেখানেও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। শয়নঘর বসিবার ঘরে পরিণত হইয়াছে, আর বসিবার ঘরে শয্যা পালঙ্ক আসিয়া বুঝাইতেছে, এই ঘরে তোমাকে শয়ন করিতে হইবে। এই পরিবর্ত্তনে এইটুকু সুবিধা হইল যে, বারান্দা হইতে যে কেহ তাহার মহলে প্রবেশ করিবে, তাহাকে আগে বসিবার ঘরে আসিতে হইবে। পরিবর্ত্তনটি সুবিধাজনক বলিয়া রমণীর মনে হইল। দেখিলেন, গৃহ-প্রাচীরের ধারে ধারে কয়েকটি কাচের আলমারী, আর সেই আলমারীগুলি পুস্তকে পূর্ণ। সকল আলমারী তাঁহার ঘরে পূর্ব্বে ছিল না। সকল পুস্তকগুলিও তথায় আগে ছিল না। পুস্তকগুলি ঝাড়িয়া, গুছাইয়া রাখা হইয়াছে: যে রাখিয়াছে, সে নিরক্ষর নয়। টেবিল-চেয়ার যেখানে রাখিলে ভাল দেখায়, কৌচ সোফা যে স্থানে সংরক্ষিত হইলে যাতায়াতের কোন বিঘ্ন ঘটে না, সেই সেই স্থানে আসবাবগুলি রাখা হইয়াছে। একটা বড় ঘড়ি প্রাচীর-গাত্রে স্থান লইয়াছে। ঘড়িটি মূল্যবান্, কারুকার্য্যখচিত; তাহার সৌন্দর্য্য আরও বাড়ান হইয়াছে কয়েকখানি ছোট ছোট ছবি দ্বারা। ছবিগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘড়িটিকে বেষ্টন করিয়া আছে। টেবিল দুইখানি ভেলভেট কাপড়ে ঢাকা, তা'তে অনেক কারুকার্য্য। টেবিলের উপর রৌপ্য-নির্ম্মিত মস্যাধার, ফরাসী দেশের সৌখীন ফুলদানী, তা'তে তাজা সুগন্ধি ফুল, কাটা কাগজ, পেন্সিল, কলম প্রভৃতি আরও কত কি আছে। প্রথম ঘর দেখা হইলে ভিতরের ঘরে গেলেন। সে ঘরে দুইটি কাচের আলমারীতে তাঁহার কাপড়-জামা সব সাজান রহিয়াছে। আলনায় দু'চারটা কাপড়-জামা, টোয়ালে ইত্যাদি ঝুলিতেছে। পালঙ্কের পার্শ্বে একটি ছোট টেবিল; তাহার উপর বাতিদান, ডিবা ও গেলাস, তিনটিই রৌপ্যনির্ম্মিত। মধ্যস্থলে পালঙ্ক, তা'র উপর শুভ্র শয্যা—যেন কাহাকে সে আহ্বান করিতেছে। চারিদিকের প্রাচীরে বড় বড় ছবি। বাপ-মায়ের আর দুর্গা-কালীর ছবি মাথার দিকে, অন্যান্য বড় বড় ছবি অন্য তিন দিকে। বসিবার ঘরেও অনেক ছবি। রমণী বিস্মিত-নয়নে চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। এ সব ছবি, আসবাব তাঁহার ঘরে ছিল না, কোথা হইতে আসিল? সাজালই বা কে? সেই কি সাজিয়েছে—যে কয়েক মাস আগে একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ঘর গুছাইয়াছিল? অসম্ভব! সে একটি ছোট মেয়ে, তার মাথায় এত বুদ্ধি আসিতে পারে না। আর সে এ সব আসবাব-পত্র পাইবেই বা কোথায়? ওঃ, মনে হয়েছে, এ সব যে বাবার বৈঠকখানায় ছিল। সেখান থেকে আন্‌লে কে? মায়ের হুকুম ভিন্ন আসেনি নিশ্চয়; কিন্তু তাঁর কাছ হ'তে এ হুকুম আদায় করলে কে? তিনি নিজে হ'তে যে এ সব আন্‌তে বলেন নি, এটা ঠিক্। যাক্, বড় মাকে জিজ্ঞেস করলেই সব জান্‌তে পারব। আর এক কথা, ঘর বদলাতেই বা কে বল্লে? এইটে বসবার ঘর হ'য়ে বেশ হয়েছে। আচ্ছা, এটা কেন এতদিন আমাদের মাথায় আসে নি? আগে শোবার ঘর, তার পর বসবার ঘর, কি বিশ্রী ছিল।

রমেশ সহসা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস্ রণি?"

"ভাই, আমার ঘরটা আগাগোড়া বদলে গেছে।"

"আমিও তাই ভাবছি, কে এমন করলে রে?"

"তাই ত ভাবছি। তুই চানের ঘরে যা, কাপড়-চোপড় ছাড়্; আমি বড়মার কাছ হ'তে ঘুরে আসি।"

রমণী জুতা-জামা না খুলিয়াই একেবারে রন্ধন-শালায় বড় মার কাছে উপস্থিত। দাসদাসী ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বামা কহিল, "কি রে, তুই এখানে কেন?"

"শুনে যাও বড় মা।"

বামা কাছে আসিতেই রমণী তাহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন।

"ওরে পাগল, কাপড় ছাড়্।"

পাগল ছাড়িল না—তদবস্থায় একেবারে বামার

ঘরে উপস্থিত। সেখানে নীরদা ছবির রাশির মধ্যে বসিয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, কেন রমণীমোহন তাঁহার বড়-মাকে টানিয়া আনিতেছেন। তাহার তখন হাতে ছবি, কোলে ছবি, সুতরাং পলাইবার সুবিধা হইল না। লুকাইবে ভাবিল, তাহাও পারিল না—তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। তাহার মুখখানি তখন লজ্জায় আরক্তিম, মৃদুহাস্যে দীপ্ত। রমণীমোহন ভুলিয়া গেলেন, কেন তিনি বড়-মাকে টানিয়া আনিয়াছেন। নীরদা মুখ নত করিয়া ছবিগুলি গুছাইতে লাগিল। বামা কহিল, কি রে ছবিওয়ালীর মেয়ে, আজকে কি কাপড় কাচতে যেতে হবে না?"

"আমি ছবিওয়ালীর মেয়ে কি না, তুমি আমার চেয়ে ভাল জান মা।"

"দেখ্‌লি মোহন, আমাকে কেমন গালটা পাল্‌টে দিলে।"

"কেমন আদর করলে, সে কথাটাও বল।"

"দুষ্টু মেয়ে! তুই কোথা হ'তে এ বুড়ো বয়সে আমাকে মাযাতে জড়াতে এলি বল্ দেখি?"

"তুমিই ত আমাকে এনেছ মা।"

"তখন কি জানি তুই এত দুষ্টু।"

বলিয়া নীরদার মুখচুম্বন করিলেন। রমণী দাঁড়াইয়া নীরদার আদর দেখিলেন। নীরদার চুম্বিত গণ্ড লাল হইয়া উঠিল। রমণী কহিলেন, "তোমাকে যা বল্‌তে এসেছি, তা' এখন শোন বড় মা।"

"বল্ না, আমার কান ত আছে।"

"আমার ঘর দুটি এমন ওলোট পালোট করলে কে?"

বামা হাসিতে হাসিতে কহিল, "ও মা, এই কথা বল্‌তে তুই বুঝি আমাকে ধ'রে নিয়ে এলি? তা আমি কি ক'রে জানব—"

রমণী। তুমিই জান—

বামা। তুই এসে আগে যে আমায় ধরবি, তা' আমি জানতুম।

রমণী যেন একটু নিরাশ হইয়া কহিলেন, "তবে এ তোমার কাজ?"

বামা কহিল, "না রে না, আমি বুড়ো মানুষ, ও সব কি জানি।" নীরদা তখন ছবি ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এ কার কাজ?"

নীরদা তখন ঘরের কোণে ঢুকিয়া গিয়াছে। গৃহপ্রাচীর প্রতিবন্ধক না হইলে সে আরও সরিয়া যাইত। তাহার ভিতরের বুদ্ধি বলিয়া দিল, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে অসভ্যতা হইবে; তাই সে পিছন ফিরিয়া তাহার লজ্জামাখা মুখখানি লুকাইতে পারিল না। তাহার মুস্কিল দেখিয়া বামার আনন্দ হইল। সে হাসিতে হাসিতে রমণীকে কহিল, "তুই এত লেখা-পড়া শিখেছিস, চোখ দেখে চিন্‌তে পারিস নে? সামনেই ত আমি রয়েছি, দেখে কি বুঝছিস আমি করেছি, না আর কেউ করেছে?"

রমণী। তবে এ নীরদার কাজ?

বামা। আমি নাম-টাম করব না বাছা, আমাকে বল্‌তে বারণ ক'রে দিয়েছে।

প্রাচীর ঠেলিয়া পলাইবার উপায় নাই দেখিয়া নীরদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রমণী কহিলেন, "তুমি এই সব করেছ নীরদা? তোমার মাথায় এত বুদ্ধি!"

নীরদা। হুঁ, কি আর করেছি, আপনি অমন ক'রে বল্‌বেন না।

রমণী। কি আর করেছ? আমার আড্ডাঘর যে দেবালয় ক'রে তুলেছ।

নীরদা। মা, পথ ছাড়, আমি বাইরে যাই।

বামা আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন; পথ ছাড়া দূরে থাক্, তিনি পথ আরও আগুলিয়া দাঁড়াইলেন।

রমণী। আচ্ছা নীরদা, তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে বাইরের ঘরে এই সব আসবাবপত্র আছে?

বামা। আমি যে ওকে বাড়ীঘর সব দেখিয়ে এনিছি। দেখে দেখে বল্লে, জিনিসগুলো সব মাটী হয়ে যাচ্ছে—কারুর ব্যবহারে আস্‌ছে না।

রমণী। এটা ত আমাদের কারুর মাথায় আসে নি। সত্যিই ত বন্ধ ক'রে রেখে দামী জিনিসগুলো আমরা মাটী করছিলুম। তা'র পর কি হ'ল বড় মা?

বামা। কি আর হবে? তোর মাকে আমি বল্লুম। তিনি বল্লেন, সত্যিই ত। তার পর নীরদার উপর সব ভার পড়্‌ল।

রমণী। আমার ঘর সাজান হ'লে মা দেখেছিলেন?

বামা। কত দিন দেখেছিলেন। দেখেন আর নীরদাকে আদর করেন। কতবার বলেছেন, "আহা, এমনি একটি লক্ষ্মী আমার ঘরে বউ হয়ে আসে!"

নীরদার গোলাপের ন্যায় মুখখানি আরও লাল হইল। রমণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনের ভিতর একটা কথা মুহূর্তের জন্যে ছুটিয়া গেল—নীরদা কি আমার স্ত্রী হইতে পারে? স্ত্রী?—আমার জীবন-সঙ্গিনী? সকল সময় তাহাকে দেখিতে

পাইব, আদর করিতে পাইব, আমার নিজস্ব হইযা থাকিবে; আমার, আমার নীরদা—

"আর ত তোর দরকার নেই? আমি এখন রান্নাঘরে চলুম—তুই কাপড় ছাড় গে যা।"

রমেশ তখন সরস্বতীর কাছে বসিযা বলিতেছিলেন, "রণী এবার কি করেছে, জান মা? দর্শন-শাস্ত্রে এমনি পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে যে, সাহেব বাঙ্গালী সব তাকে ধন্য ধন্য করেছে।"

"ও মা, সত্যি না কি?"

"শুধু তাই নয, দেশের এক জন বড় রাজা খুসী হযে তা'কে একটা সোনার পদক দিয়েছেন।"

"কই, সে ত আমাকে কিছু বলে নি। সে কোথা গেল?"

"সে বলে, আমার ক্ষমতায কিছু হয নি, 'নীরদা'র পযে হযেছে।"

"মেয়েটি পযমন্ত বটে: বেশ মেয়ে, আমার এমনি একটি বউ হয।"

"তা' রণীর সঙ্গে বিয়ে দেও না।"

"দূর পাগল। নীরদার যে জাত নেই।"

"মা, রণীর বিয়ে দেবে না?"

"আমি ত ঘরে বউ আনবার জন্যে ব্যস্ত, ও যে বিয়ে করতে চায না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করতে পারিস্?"

"আচ্ছা দেখব।"

"তুই পূজোর ক'টা দিন এখানে থেকে যা।"

"তা হ'লে পিসীমা বক্ষে রাখবেন! কেঁদে কেঁদে মধুমতীতে বন্যা তুলবেন।"

"তোর জন্যে আমি ভাল কাপড় এনে রেখেছি।"

"নীরদার জন্যেও রণী ভাল কাপড় জামা এনেছে।"

"কই, আন্ দেখি।"

"তাকে ব'লো না কিন্তু, জান্‌তে পার্‌লে আমাকে মারবে।"

রমেশ ছুটিযা গিযা কাপড়-জামা আনিল। গৃহিণী দেখিযা বুঝিলেন, জিনিসগুলি মূল্যবান্। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম রে?"

"তা, ঠিক জানি নে, বড়-মা দাম দেবেন বলেছেন।"

"আমি তবে নীরদাকে একখানা গয়না দেব। কি দিই? আমার ত কোন গয়না তা'র হবে না। আমার বাউটি ভেঙ্গে তা'র জন্যে চুড়ি গড়তে দি। হা হাঁ, সেই বেশ। ওরে রমেশ, সরকারকে বল্ ত স্যাক্‌রা ডাকতে।"

"আজ যাক্ না মা, সন্ধ্যে হযে এল—"

"না, না, আজকেই দেব। পূজোর আগে চুড়ি চাই—স্যাকরারা যে দেরী করে।"

গৃহিণী যখনি যা' ধরিবেন, তখনি তা' করা চাই। যে খেযালটা মাথায আসে, তাহা বিলম্ব হইলে মাথা হইতে চলিযা যায। অধিকাংশ কাজ তিনি খেযালের ভরে করেন। অপর কেহ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইযা কোন কাজ করিলে, তিনি তাহাকে কত উপদেশ দিযা থাকেন। তিনি পূর্ব্বে ভাবিযা দেখেন নাই, নীরদাকে পূজার সময কাপড়-জামা দেওযা কর্ত্তব্য। অন্য বৎসর এই সময কাপড়-চোপড় যেমন কেনা আসে, এ বৎসরও তেমনি সব কেনা এসেছিল। যখন দেখিলেন, বামা নীরদার জন্যে কাপড়-জামা আনিযাছে, তখন তাঁহার মাথায খেযাল চড়িল, বামা যা' দিচ্ছে, তা'র চেয়ে বেশী কিছু দিতে হবে। অতএব ডাক স্বর্ণকার।

স্বর্ণকার আসিল—সদর-মহলে নাযেবের কাছে। তাহার নিকট বাউটি দাসী-হস্তে প্রেরিত হইল। নীরদার ডাক পড়িল, তাহার হাতের মাপ লইতে হইবে। গৃহিণী মাপ নিতে জানেন না—অন্ততঃ দাযিত্ব নিতে ইচ্ছুক নহেন, কি জানি যদি ছোট-বড় হইযা যায। তখন বামাকে রন্ধনশালা হইতে ডাকিযা আনা হইল। বামাও সে দাযিত্ব লইতে পশ্চাৎপদ হইল। তখন বামী ঝিকে ডাক পড়িল। তাহার ভাশুরপোর সম্বন্ধী নাকি স্বর্ণকারের দোকানে চাকুরী করে। তার পর মাপের জন্যে তামার তার আনিতে এক জন ছুটিল। এইরূপে সমস্ত বাড়ী ওলোট-পালোট করিযা নীরদার জন্যে চুড়ি তৈযার করিতে দেওয়া হইল। ফল এই হইল যে, সকলে জানিল, নীরদা, গৃহিণীর অনুগ্রহ লাভ করিযাছে। কেহ কেহ ইহাও বলিল যে, নীরদাকে গৃহিণী পুত্রবধূ করিবেন স্থির হইযা গিযাছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ গৃহিণীর উপযুক্ত সম্মান দাসদাসীর নিকট হইতে নীরদা লাভ করিল।

১৩

দুই চারি দিন পরে একদা সন্ধ্যাকালে মাঠের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে রণী, তুই কি বিয়ে করবি নে?"

রমণী। তুই কেমন ক'রে আমার মতলবটা জান্‌তে পারলি?

রমেশ। তোর ভাব দেখে।

রমণী। আমিও তোর সম্বন্ধে একটা মহাসত্য আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি।

রমেশ। চট্ ক'রে তা প্রকাশ ক'রে ফেল্, বুঝে দেখি, তুই নিউটনের চেয়ে বড় কি না।

রমণী। তুই আজ আট নয় বছর ধ'রে এক জনের স্মৃতি বুকে ধ'রে আছিস্। যদি তা'কে পাশ, তবে তুই বিয়ে করিস্।

রমেশ। ঠিক্ বলেছিস্ ভাই। আমি যখন আমার মামার বাড়ীর দেশে তাকে প্রথম দেখি, তখন তার বয়স চার পাঁচ বৎসর। তা'কে দেখেই আমার মনে হ'ল, তা'কে যেন আমি চিনি—সে আমার কত আপনার। আমি তখন ছোট; ছোট হ'লেও তাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করত। আমার মনে হ'ত, সে-ও যেন আমাকে ভালবাসত; আমার প্রতীক্ষায় ঘাটের পৈঠার উপর ব'সে থাক্‌ত। আমি তার জন্যে পিয়ারা জাম পেড়ে নিয়ে যেতুম; সে বল্‌ত, তুমি কষ্ট ক'রে কেন গাছে উঠে ফল পাড়—যদি প'ড়ে যাও? কিন্তু অন্য একটা ছেলেকে জাম পেড়ে আনতে বল্‌ত।

রমণী। তা হ'লে তোর প্রণয়িনী একটা পাঁচ বছরের মেয়ে। বেশ! আর তাকে দেখিছিস্?

রমেশ। দেখিছি অনেক দিন পরে।

রমণী। তখন সে বড় হয়েছে?

রমেশ। হবার ত কথা। কিন্তু সে বড় মেয়ের চেয়ে ছোট মেয়ে আমার ভাল লেগেছিল। তখন তাহাতে কিশোরীর নয়নরঞ্জন সৌন্দর্য্য ছিল না—ছিল শুধু মনোমোহন রূপ, আর ছিল স্বপ্ন, স্মৃতি, ছায়া।

রমণী। তুই ভাই কবি মানুষ, তোর সব কথা আমি বুঝে উঠতে পারি নে।

রমেশ। বুঝেও কাজ নেই। এখন তুই বিয়ে করবি কি না বল্।

রমণী। না।

রমেশ। কেন বল্ দেখি?

রমণী। তুই কোন্ একটা সত্য আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌লি।

রমেশ। দেখ্, আমার ক্ষমতা ও রুচি সম্বন্ধে তুই বড় অজ্ঞ।

রমণী। আমি স্বীকার ক'রে নিলুম।

রমেশ। আমি নিউটন্ কলোম্বসের চেয়ে খনা বরাহমিহিরকে অধিক শ্রদ্ধা করি।

রমণী। তাঁহাদের ভাগ্য।

রমেশ। ছোট বয়স থেকে হাঁচি-টিক্‌টিকি এড়িয়ে চলছি। স্থানে অস্থানে টিক্‌টিকি যেমন পড়া, অমনি পাঁজি খুলে ক্ষণাদেবীর স্মরণ লওয়া। একবার রাজা হবার যোগ ছিল, কিন্তু সেটা কেটে গেল ক্লাসে গাধার টুপি মাথায় দিয়ে। বাল্যকাল হ'তে এইভাবে জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চ্চা ক'রে এখন আমার এমনি একটা ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ দেখলেই তা'র ভবিষ্যৎ টপ্ ক'রে ব'লে দিতে পারি।

রমণী। ফল-ফুলের নাম করতে হবে নাকি?

রমেশ। ছোট দরের জ্যোতিষীর কাছে সে সব কর গে—আমার কাছে ও সব দরকার হয় না। রাশিচক্র আমার সম্পূর্ণ অনুগত; কেবল দুই একটা বাগাতে পারি নি; বাকি দশটার কাউকে উদরস্থ করিছি, কারুর বা উপরে চ'ড়েছি—

রমণী। কা'কে বাগাতে পার নি?

রমেশ। এই সিংহ আর মকরটাকে।

রমণী। বেশ। এখন, আমার গণনা ক'রে বল।

রমেশ। দেখ রমণী বাবু, তোমার শীঘ্রই বিবাহ হবে।

রমণী। শুভ-সংবাদ। কা'র সঙ্গে?

রমেশ। বলছি; তুমি আমার দিকে ভাল ক'রে চাও দেখি। 'যার লগ্নে থাকে মাথাকাটা, তার সঙ্গে ফেরে অনেক বেটা'—নীরদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। শাস্ত্রের বচন, ভুল হবার যো নেই।

রমণীমোহন চমকিয়া উঠিলেন। সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে কহিলেন, "দূর পাগল, তা' হবার নয়, নীরদা কৈবর্ত্তের মেয়ে।"

রমেশ। সে কি! শুনলুম, বিয়ে স্থির হয়ে গেছে।

রমণী। কার কাছে শুনলে?

রমেশ। ঝি-চাকর সকলেই বলাবলি করছিল; মা সে দিন স্যাকরা ডেকে বিয়ের গয়না গড়াতে দিয়েছেন—

রমণী। জ্যোতিষী মশায়ের বিদ্যে ধরা পড়েছে; যা শুনেছ, সব ভুল। এ বিয়ে হবার নয়।

রমেশ অপ্রতিভ হইয়া বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে একটা সত্য তিনিও আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "তুইও আমার মত দুঃখী রণী।"

রমণী। এবার দেখছি, তুমি খনাকে ভাসিয়ে দিয়ে আবিষ্কারের পথে চলেছ।

রমেশ। তুই নীরদাকে ভালবাসিস্?

রমণী। নিশ্চয়ই বাসি; এ বাড়ীর কে তাকে ভালবাসে না?

রমেশ। 'ওরে, সে ভালবাসা নয়। যে ভাল-বাসায় পাহাড় টলে, নূতন বিশ্ব সৃষ্ট হয়, আমি সেই ভালবাসার কথা বলছি।

রমণী। সে রকম ভালবাসা কবির কল্পনাতে সৃষ্ট হয়, আমি কোথায় পাব ভাই? যে অপ্রাপ্য, তার জন্যে আকিঞ্চন কেন?

রমেশ। হৃদয় যে কোন যুক্তি শোনে না ভাই। এখন যা' দেখছি, তা'তে মনে হয়—

রমণী। কি মনে হয় কবিশেখর?

রমেশ। চণ্ডীদাসের একটি পদে তোমাকে তা' বুঝিয়ে দিচ্ছি—

"নিতই নূতন পীরিতি দু'জন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়য়
পরিণামে নাহি খায়॥"

রমণী। ভাই, আমি "পরিণামে নিরাশা।"

রমেশ। নিরাশ হয় কাপুরুষেরা। এ ধন তোমারই—তোমারই জন্যে বিধাতা তা'কে এখানে এনেছেন। আমার কথা বিশ্বাস কর, এ 'অপরূপ রূপ' কৈবর্ত্তের ঘরে জন্মাতে পারে না।

রমণীমোহন কোন উত্তর করিলেন না। রমেশ কহিলেন, "আমি যখন তাকে প্রথম দেখি, তখন আমি চম্‌কে উঠি; ভাবলুম বুঝি তোমার ঘরের লক্ষ্মী, মূর্ত্তি ধ'রে আমাকে দেখা দিলেন। শেষে শুনলুম, এই সে নীরদা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক ভাই, নীরদা ছোট ঘরের মেয়ে নয়।"

রমণী। যদি ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যের ঘরের মেয়ে হয়?

রমেশ। তা হ'লে বিধাতা তোমাকে দুঃখ দিতে তাকে এখানে আন্‌তেন না—তাঁর দয়ায় আমার অসীম বিশ্বাস।

রমণী। তুমি আমাকে অনেকটা সুস্থ করলে। কিন্তু কি ক'রে জানব, নীরদা কার মেয়ে?

রমেশ। বিধাতা তোমাকে তা' সময়ে জানিয়ে দেবেন, তাঁর দয়ায় বিশ্বাস হারাইও না। এখন বাড়ী চলো—অন্ধকার হয়ে এলো।

উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিলেন। রমেশ কহিলেন, "তা হ'লে কাল আমাদের যাওয়া স্থির?"

রমণী। আর দু'টো দিন থেকে যা না।

রমেশ। না ভাই; লক্ষ্মীপুজোর পর আবার দেশভ্রমণে যেতে হবে।

রমণী। এবার কোথায় যাবি স্থির করিছিস্?

রমেশ। ঠিক নেই।

রমণী। জয়পুরে যাবি ত?

রমেশ। বল্‌তে পারি নে, তবে মন যদি বারণ না মানে—

রমণী। আমি হ'লে ত স্পষ্টাস্পষ্টি বিয়ের প্রস্তাব ক'রে ফেলি।

রমেশ। করবার যো নেই ভাই; দুই পরি-বারের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ; আমার মনে হয়, আমাদের বংশের মধ্যে এই রকম ঝগড়া দেখে সেক্ষপিয়র রোমিও-জুলিয়েট লিখেছিলেন।

রমণী। শুনেছি, সেক্ষপিয়র তোর আগে জন্ম নিয়েছিলেন।

রমেশ। তাই নাকি! কিন্তু ভাই, শোনা কথায় একটুও বিশ্বাস করিস্ নে। কবিরা মরে না, এ কথা জানিস্ ত?

রমণী। দোহাই তোর ভাই, কবিদের মরতে দে। যে রকম বেড়ে উঠেছে, আশঙ্কা হয়, বুঝি সত্যিই তাদের মরণ নেই—শতস্কন্ধ রাবণের তুল্য তারা অক্ষয় অমর।

রমেশ। শতস্কন্ধ রাবণ ত মরেছিল।

রমণী। মরেছিল সীতার হাতে—প্রকৃতির অস্ত্রে।

রমেশ। পুরুষ-কবিরাও মরবে সেই রকম প্রকৃতির হাতে। প্রকৃতি যে রকম আসর জুড়ে বসছেন, তুই যাদের ভয় করছিস্, তাদের শীগ্‌গির স'রে পড়তে হবে।

রমণী। আঃ, বাঁচা যাবে।

রমেশ। ওরে বিপদ আরও বাড়বে। এখন ত আমরা ছন্দে অছন্দে কোন রকমে মিলিয়ে পদ্যে বলছি; মেয়েরা যে মিল্‌তে না পেরে শুধু গদ্যে বলবে। আরে বলা ব'লে বলা—ভাষার শ্রাদ্ধ, ভাবের শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধের শ্রাদ্ধ।

রমণী। এটা তোমার হিংসের কথা।

রমেশ। না, ভাই না; দু'চারটে নমুনা তোকে দিতে পারতুম—থাক্—বাড়ী আসা গিয়েছে।

পরদিন অপরাহ্নে উভয়ে অশ্বারোহণে নারায়ণপুর অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির হইল।

মধ্যাহ্নে রমণীমোহন নীরদার নিকট বিদায় লইতে গিয়া দেখিলেন, নীরদা দ্বারের দিকে পিছন করিয়া জানলার পাশে ছবির মধ্যে বসিয়া আছে। চারি

দিকে ছবি ছড়াইয়াছে—সকলগুলি মেজের উপর; কেবল একখানি ছবি দেওয়ালের গায় ঠেস দেওয়া রহিয়াছে। অন্যান্য ছবিতে নীরদার মন নাই, এই ছবিতে তাহার সমস্ত মনঃপ্রাণ। নিনিমেষ-নয়নে নীরদা ছবিখানি দেখিতেছে। রমণীমোহন একটু সরিয়া গিয়া দূর হইতে দেখিলেন, ছবিখানির তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—আত্মাঞ্জলি। একটি তমাল গাছের তলায় শ্রীকৃষ্ণ বংশীহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তাঁহার পদতলে হাঁটু গাড়িয়া শ্রীরাধিকা বিরাজ করিতেছেন। তিনি দণ্ডায়মান নহেন, উপবিষ্টও নহেন—মাঝামাঝি অবস্থা। শ্রীরাধার পিছনে যমুনা, মাথার উপর পূর্ণচন্দ্র, সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণ; দূরে অরণ্যানী। শ্রীকৃষ্ণের চরণ দু'খানি জ্যোতির্ম্ময়, চরণতল অলক্তকরঞ্জিত। কণ্ঠে বনমালা, 'ও' তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি অবনত, মুখে মৃদু হাসি। শ্রীকৃষ্ণের ভাব রমণীমোহনের প্রীতিকর হইল না; তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, নীরদা ছবিতে কি এমন পাইয়াছে যে, তাহার দৃষ্টি ছবি হইতে আর ফিরিতে চাহিতেছে না। তার পর তিনি দৃষ্টি নামাইয়া শ্রীরাধার পানে চাহিলেন। তাঁহার ভাব, তাহার ভঙ্গিমা রমণীমোহনকে মুগ্ধ করিল। যত দেখেন, ততই সে ভাব অধিকতর মিষ্ট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শ্রীরাধার হাত দুইখানি বুকের উপর ন্যস্ত—সে হাত দুইখানি কত কথা নীরবে ব্যক্ত করিতেছে; বলিতেছে ওগো, আমার সবই তোমার—আমার নিজের বলিয়া কিছু রাখি নাই; তোমাকে আমি হৃদয়মাঝারে ডাকিতেছি না, এ হৃদয় ত আমার নয়—সবই যে তোমার, রাজা। শ্রীরাধা উদ্ধমুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। তাঁহার নয়ন বলিতেছে, ওগো, তুমি আমার সব লইয়া আমাকে কৃতার্থ কর; তোমার চরণে আমার আর কোন প্রার্থনা নাই—প্রার্থনা শুধু, ভিক্ষা শুধু, তুমি আমার সব লও। শ্রীরাধার দেহলতা সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার ব্যগ্রতা জানাইতেছে; বলিতেছে, ওগো লও—আর বিলম্ব করিও না, বিলম্ব আমার সহিতেছে না। রমণীমোহন ছবিখানি দেখিতে দেখিতে নীরদার মত তন্ময় হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন শুনিলেন, শ্রীরাধার সমস্ত লোমকূপ ঝঙ্কৃত হইয়া গান উঠিয়াছে—

"অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস-রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পষাণ-পুতলি তুমি জীবনের সখি॥
অঙ্গ-আভরণ তুমি শ্রবণ-রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন॥"

সহসা বামা পশ্চাৎ হইতে কহিলেন, "কি দেখছিস মোহন?"

নীরদা ও মোহন উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন। মোহন কহিলেন, "ছবি দেখছি। বেশ ছবিখানি, না নীরদা?"

নীরদার চক্ষুর আবেশ তখনও যায় নাই; সে তাহার স্বপ্নময় চক্ষু আগন্তুকদ্বয় পানে ফিরাইয়া উঠিয়া দাড়াইল। রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছবিগুলি কি এমনিভাবে প'ড়ে থাক্‌বে নীরদা?"

নীরদা একটু হাসিয়া কহিল, "না। আপনি ফিরে এসে দেখবেন, ছবিগুলি এখানে নেই।"

"তারা কোথা যাবে?"

"এসে তা দেখতে পাবেন।"

"তা জানবার জন্যে আমার এত কৌতূহল হচ্ছে যে, দু'দিনের বেশী নারাণপুরে থাক্‌তে পারব না।"

১৭

রমণীমোহনের নারায়ণপুর হইতে ফিরিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইয়া গেল। রমেশের পিসী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু কি করেন, মহাষষ্ঠী আসিয়াছে, আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

রমণীমোহন বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, বারান্দাময় ছবি। দরজার পাশে, জানালার মাথায়, দেওয়ালের গায়, বেশ হিসাব করিয়া ছবিগুলি খাটান হইয়াছে। তাঁহার ঘরে একখানিও নতন ছবি আসে নাই, বামার ঘরেও না। গৃহিণী সরস্বতী একখানি ছবি পাইয়াছেন; সেখানি ভগবতীর ছবি—মা সিংহারূঢ়া, চতুর্ভুজা, বরাভয়করা। সরস্বতী সে ছবিখানি পাইয়া মহানন্দিতা। মোহনকে কত উৎসাহভরে ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ, আমার মেয়ে কেমন বুদ্ধি ক'রে খাটের পায়ের দিকে ছবিখানি খাটিয়ে দিয়েছে। ঘুম ভাঙ্গলে আগে ভগবতীর চরণদু'খানি আমার চোখে পড়বে"

রমণী। আর সমস্ত রাত তোমার চরণ দু'খানি ভগবতীকে দেখাবে; কেমন মা?

জননী। ও মা, তাই ত; তবে কি হবে? তুই এক কাজ কর,—শিয়রের দিকে ছবিখানি খাটিয়ে দে।

রমণী। সেটা ভাল বন্দোবস্ত—উঠেই আগে রামীর মুখ দেখবে।

জননী। তুই জ্বালালি। আমার ছবিতে কাজ নেই, তুই নিয়ে যা।

রমণী হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "না মা, যেখানে আছে, সেইখানেই থাক্।"

জননী। তুই যে বল্‌লি পায়ের দিকে—

রমণী। কোথায় জগদম্বা নেই মা? তুমি যেখানে পা রেখেছ, সেখানেও তিনি আছেন। আমি কোলকাতায় থাকি বা যেখানেই থাকি, তোমার স্নেহ, তোমার আশীর্ব্বাদ সকল সময় আমাকে বেষ্টন ক'রে থাকে; আর যিনি জগতের মা, তিনি আমাদের ভুলে থাক্‌বেন কেন? তিনি যে সকল জিনিষে, সকল মানুষে থেকে দিন-রাত আমাদের আদর করছেন, তুমি আমার জন্যে যেমন কর, তিনি আমাদের সকলের জন্যে তেমনি করেন।

জননী। তবে তিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দেন কেন?

রমণী। তুমিও ত আমাকে অনেক দুঃখ কষ্ট দেও। আমার জ্বর হ'লে আমি ভাত খেতে চেয়েছি, তুমি আমাকে খেতে দেও নি—আমি কত কেঁদেছি। আমি পশ্চিমে বেড়াতে যেতে চাইলে, তুমি আমাকে যেতে দেও নি—আমি দুঃখ পেয়েছি।

জননী। তাই ব'লে তোর যাতে মন্দ হয়, এমন কাজ তোকে আমি করতে দেব?

রমণী। তিনিও আমাদের তা' করতে দেন না। আমরা বুঝতে না পেরে দুঃখ পাই।

এমন সময় বামা আসিয়া কহিল, "কি গো, মায়ে পোয়ে কি কথা হচ্ছে?

রমণী। তোমারই কথা হচ্ছে বড় মা। বলছিলুম, তুমি এখন মেয়ে পেয়ে ছেলেকে ভুলে গেছ।

বামা। কোলের সন্তানকে সকলেই ভালবাসে। তোর মাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ দেখি, সে যে এখন সকল কাজেই নীরদাকে গোঁজে।

রমণীর একটু ভাবান্তর হইল। ভাবিলেন, নীরদার উপর সকলের এ স্নেহ কেন? সে কি চিরদিন আমাদের ঘরে থাকিবে? তা'র যখন বিয়ে হবে, সে যখন অপরের ঘরে যাবে, সে যখন পরের হবে—না, না, তা' হবে না, সে এই ঘরেই চিরদিন থাকবে, তা'কে মায়েরা ছেড়ে দিতে পারবেন না—আচ্ছা, আমার যদি একটি ছোট বোন থাকত', তা'কে ত বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে হ'ত, তখন? সে আলাদা কথা—বোন ত শ্বশুর-বাড়ী যাবেই।—

বামা। কি ভাবছিস্ মোহন?

রমণী। অ্যাঁ, ভাবছি, 'আত্মাঞ্জলি' ছবিখানা কোথায় গেল; সেখানা ত দেখতে পাচ্ছি না।

বামা। সেখানি নীরদার বসবার ঘরে। যখনি তার হাতে কাজ না থাকে, তখনি সেই ছবিখানির সম্মুখে যোড় হাতে ব'সে থাকে। আমি লুকিয়ে দেখিছি, ছবি দেখতে দেখতে সে কেঁদে ফেলে।

সরস্বতী। তার খুব ভক্তি ত। মেয়েটি বেশ। ইচ্ছে করে, সকল সময় তাকে কাছে বসিয়ে রেখে তার মিষ্টি কথা শুনি। সে যদি লেখা-পড়া জানত, তা হ'লে তার মুখে মহাভারত শুনতুম।

রমণীমোহন প্রস্থান করিলেন।

নীরদা সত্যই তখন তার ঘরে ছবিখানির সম্মুখে যুক্তকরে উপবিষ্ট ছিল। ছবিখানি একটি ছোট চৌকীর উপর রক্ষিত, নীরদা হর্ম্ম্যতলে একখানি ছোট শতরঞ্চের উপর উপবিষ্ট। নয়ন মুদ্রিত, গণ্ড অশ্রুতে প্লাবিত, ওষ্ঠদ্বয় বিযুক্ত। মনে মনে শ্রীরাধাকে ডাকিয়া কহিতেছিল, "আমাকে আত্ম-নিবেদন শিখায়ে দেও মা। আমি যেন নিজের জন্যে কিছু রাখি না, দেহ মন আত্মা সব যেন বিলায়ে দিতে পারি। সুখ-সম্পদ্-ধন ঐশ্বর্য্য কিছু চাই না—চাই শুধু তোমার মত নিজেকে বিলায়ে দিতে। আমি চোখ বুজে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমার দেহ কৃষ্ণময়, তোমার প্রাণ কৃষ্ণময়; তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে কৃষ্ণের ছবি, তোমার নয়নে কৃষ্ণমূর্ত্তি, তোমার দেহময় কৃষ্ণনাম লেখা। যে শক্তিতে, যে সাধনায় তুমি এইভাবে আত্ম-নিবেদন করতে পেরেছ, আমাকে সেই শক্তি দেও, সেই সাধনায় দীক্ষা দেও।"

"নীরদা!"

ঘরের দ্বার ভেজান ছিল—বন্ধ ছিল না। রমণীমোহন দ্বার ঠেলিয়া দেখিলেন, নীরদা নিমীলিত-নয়নে হর্ম্ম্যতলে উপবিষ্ট। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "নীরদা!"

উত্তর নাই। দুই তিনবার ডাকিতে নীরদা চক্ষু মেলিয়া দেখিল। তাহার চক্ষু সহসা বাহিরের জিনিস গ্রহণ করিল না। রমণীমোহন কহিলেন, "দেখছি, তুমি সমাধিতে ছিলে নীরদা, তোমাকে এ সময় বিরক্ত করা উচিত হয় নি।"

নীরদা প্রকৃতিস্থ হইয়া রমণীকে প্রণাম করিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ এলেন?"

"অনেকক্ষণ। তুমি ত দেখবে না—"

"আপনার এত দেরী হ'ল কেন?"

"শীগ্‌গির এলে হয় ত ছবিগুলি খাটানো দেখ্‌তে পেতাম না।"

নীরদা হাসিয়া কহিল, "আমি এক দিনেই সব ছবি খাটিয়েছি।"

রমণী। এখানি ত খাটাও নি।

নীরদা। এখানি আমার।

রমণী। আর অন্যগুলি?

নীরদা। বাড়ীর।

রমণী। এ বাড়ী কি তোমার নয়?

নীরদার মুখ লাল হইয়া উঠিল—উত্তর করিল না। রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল নীরদা, এ বাড়ী কি তোমার নয়?"

নীরদা অধোমুখে নিরুত্তর রহিল।

১৮

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা শেষ হইতে না হইতে গৃহিণীর ইঙ্গিত পাইয়া ঘটকেরা আসিয়া বাড়ীতে ভিড় করিতে লাগিল। গৃহিণী সরস্বতী স্পষ্টই তাহাদের বলিয়া দিয়াছেন, কন্যা লক্ষ্মীদেবীর চেয়ে সুন্দর হওয়া চাই, তাহার পিতা ধনবান্ হওয়ার নিতান্ত প্রয়োজন। গৃহিণী নগদ টাকা কিছু দাবী করেন না, তবে দু'দশ হাজার মুদ্রা যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইলে, গৃহিণী গ্রহণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করিবেন না, এ কথাও তাহাদের বলিয়া দিলেন।

ঘটকেরা চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। অনেক বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যার ছবি (ফটো) তাহাদের ঘরে ছিল; সেই সবগুলি এক্ষণে অন্দর-মহলে প্রেরিত হইতে লাগিল। নূতন ফটোও আমদানি হইতে লাগিল। রমণীমোহন অন্তঃপুরে আসিলে মায়েরা তাঁহাকে ধরিয়া পড়েন; এবং ছবিগুলি একে একে তাঁহাকে দেখাইয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। সরস্বতী বলেন, আমার একটি ছেলে, তাহার ক'নে পছন্দ হইলে তবে আমি কথা দিব। ছেলে কিন্তু কাহাকেও পছন্দ করেন না। তিনি ফটোর দৌরাত্ম্যে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সদরে পলায়ন পূর্ব্বক যে তিনি একটু শান্তি পাইবেন, এমন সম্ভাবনাও ছিল না; তথায় ঘটকের দল বিপুল উৎসাহে বিরাজ করিতেছিল। রমণীমোহনকে দেখিবামাত্র তাহারা কোথায় উর্ব্বশী মেনকা দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার পরিচয় আরম্ভ করে। রমণী-মোহন সেখানেও শান্তি না পাইয়া অতঃপর খিড়কির পুষ্করিণীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যখনি দেখেন, বাহিরে মেঘমালার ন্যায় ঘটকবৃন্দ, আর অন্তঃপুরে নীহারিকার ন্যায় ফটো-নিচয়, তখনি তিনি পলায়ন পূর্ব্বক ছিপ হস্তে পুষ্করিণীতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু মাছ বড় একটা ধরা পড়িত না। রমণী বাড়ী আসিলে মৎস্যকুল সংবাদ পাইত; আর তাহারা এমনি সতর্ক থাকিত যে, রমণীর ছায়া জলে পড়িবা-মাত্র তাহারা নিরাপদ্ স্থানে প্রস্থান করিত। যাহারা নিতান্ত বোকা, তাহারাই শুধু ধরা পড়িত। একদা তিনি একটা এক সের মাছ ছিপে গাঁথিয়া 'বড় মা', 'বড় মা', বলিয়া এত চীৎকার করিয়া-ছিলেন যে, দুই মা, নীরদা-দাসদাসী সকলে পুকুর ঘাটে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়া-ছিলেন, হয় ত বা জলের ভিতর হইতে কুমীর উঠিয়া মোহনকে ধরিয়াছে।

এক দিন অপরাহ্নে তিনি মহাবিরক্ত হইয়া পুকুর-ঘাটে ছিপ হস্তে আসিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, নীরদা পুকুরে গা ধুইতেছে। আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া নীরদা কুলি করিয়া একটা বকের গায় জল দিবার অনুক্ষণ চেষ্টা করিতেছে। বক অনেকটা দূরে কিনা-রায় বসিয়া আছে, জল অতদূরে পৌঁছিতেছে না। নীরদার চেষ্টাকে উপেক্ষা করিয়া বক অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে যোগীদের ন্যায় নিশ্চলদেহে বসিয়া রহিয়াছে। নীরদা যখন দেখিল, বক ভীত না হইয়া তাহার শক্তিকে উপেক্ষা করিতেছে, তখন সে কহিল, "দেখবি, উঠাব?" এতবড় শাসনেও বক যে ভয় পাইল, এমন বুঝা গেল না। নীরদা পুনরায় তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তুই কেন মাছ খাবি?" বক আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে কোন কোন জবানবন্দী করিল না। নীরদা তখন 'রায়' প্রকাশ করিল—"তুই মাছ খেয়ে যাস্ ব'লে ত মাছ ধরা পড়ে না, শুধু হাতে লোককে ফিরতে হয়—আমি তোকে উঠাব।"

বলিয়া নীরদা গামছা উঠাইয়া মারিবার ভঙ্গী করিল। তখন বক সভয়ে উড়িয়া গেল; তাহার গতি চক্ষু দ্বারা অনুসরণ করিতে গিয়া নীরদা দেখিল, কূলের উপর গৃহস্বামী দণ্ডায়মান। নীরদার মুখ লাল হইয়া উঠিল। রমণীমোহন হাসিয়া কহিলেন, "নীরদা, বকটাকে মেরে ফেললে?" নীরদা কোন উত্তর না করিয়া জলের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখ-খানি শুধু জাগিয়া রহিল। রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বকের সঙ্গে কি কথা কইছিলে নীরদা?" নীরদা এবার চিবুক ডুবাইল; বোধ হয়, তাহার লজ্জামাখা হাসিটুকু লুকাইবার অভিপ্রায়ে।

রমণী কহিলেন, "তুমি আমাকে না বল্‌লেও বক উড়ে যাবার সময় সে কথা আমাকে ব'লে গেছে। হ্যাঁ নীরদা, বকে মাছ খেয়ে যায় ব'লে আমি মাছ ধরতে পারিনে ?"

"তুই কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস মোহন ?"

"নীরদার সঙ্গে। দেখ না বড় মা, নীরদা বলে কি না—"

নীরদা কি বলে বা না বলে, সে বিষয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া বামা, নীরদাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "তুই মেয়ে কখন্ এইছিস্, তোর কি আর হয় না ?"

বামার কণ্ঠে বিরক্তি; রমণী তাহা লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার মেজাজটা আগে হইতে বড় ভাল ছিল না: এখন একটু চড়িয়া উঠিল। নীরদা যখন বসন সংযত করিয়া লইয়া স্মিত-মুখে উঠিয়া পড়িল, তখন রমণী গম্ভীর-বদনে ঘাটে নামিলেন। বামাও সঙ্গে সঙ্গে নামিল। রমণী কহিলেন, "আমি যেমন ছিপটি ফেলিছি, আর অমনি তোমার হাতপা ধোবার দরকার প'ড়ে গেল।"

বামা। তুই মাছ ধরবি ত কত।

রমণী। তোমাদের জন্যেই ত মাছ 'চারে' আসে না।

বামা। কেন, এ কথা নীরদাকে এতক্ষণ বলতে পারিস নে ? তখন যে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলি !

রমণী। তখন আমি 'চার' ফেলেছিলুম, না ছিপ ফেলেছিলুম ! কতকগুলো কথা বল্‌লেই হয় না।

বামা। বলুব না ত কি ? সকাল নেই, বিকেল নেই, সকল সময় খিড়কির পুকুরে মাছ ধরা। মেয়ে-ছেলেরা গা ধোবে না ?

রমণী। আজ হ'তে আর মাছ ধরব না—

বলিয়া তিনি ছিপগাছটা জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বামা কহিল, "তোর মেজাজটা এমন হয়েছে কেন বল্ দেখি ?"

রমণী। তোমরাই ক'রে তুলেছ।

বামা। আমরা কি করলুম তোর ?

রমণী। কি না করেছ ? ঘরে আসি ত ছবির তাড়া নিয়ে আমাকে তাড়া করবে, বাইরে যাই ত কতকগুলো নিষ্কর্ম্মা হতভাগা রাজ্যির লোকের কুলুজি গাইতে থাক্‌বে।

বামা। না গাইলে চলবে কেন ? সব দেখে শুনে ত মেয়ে আনতে হবে।

রমণী। না, আনতে হবে না—কোন মেয়েকে এ বাড়ীতে আসতে হবে না।

বামা। ও মা, সে কি ! তুই কি বিয়ে করবি নে ?

রমণী। না। দরওয়ানদের ব'লে দেব, কোন হতভাগাকে যেন বাড়ীতে ঢুকতে না দেয়।

বামা। আমি তোর মাকে বলতে চললুম—

রমণী যাও, বল গে।

বামা। মা হুকুম করলে তখন কি করবি ?

রমণী। তখন পালাব, ছোট বয়সে যেমন পালাতুম।

বামা। দেখছি তোর অনেক বিদ্যে হয়েছে।

রমণী। এতদিনে বুঝি সেটা জান্‌লে ?

বামা। এতদিনেই জান্‌লুম। বেশ —

রমণী। শাসাচ্ছ কি—মার কাছে বলতে যাবে ত ? যাও, আমিও কাপড়-চোপড় গোছাই গে।

বামা অবাক্ হইয়া গেল। রমণী হন্ হন্ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি অদৃশ্য হইলেন, তখন বামা একটু হাসিয়া রমণীর উদ্দেশ্যে কহিল, "বুঝেছি বাবা, বুঝেছি—তোমার ভাব আমি বুঝেছি; নীরদারও বুঝেছি। রমেশকে চিঠি লিখে আমি শীগ্‌গির নীরদার বিয়ের ব্যবস্থা করছি। মেয়েও বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু ওকে ছেড়ে থাক্‌ব কেমন ক'রে ?"

বামা, গৃহিণীকে কোন কথা বলিল না, রমণী-মোহনও গৃহত্যাগ করিলেন না। কিন্তু পাত্রী অন্বেষণ সমানে চলিতে লাগিল। একটি পাত্রী স্থিরও হইল। গৃহিণী এক দিন বামাকে সঙ্গে লইয়া মেয়ে দেখিয়া আসিলেন। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, কন্যা পরমাসুন্দরী, এমন কি, নীরদার চেয়ে সুন্দর। তাহার পিতা এক জন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তি না হইলেও তিনি উপযুক্ত দানসামগ্রী ও যৌতুকাদি দিতে পশ্চাৎপদ্ নহেন। মেয়েটিকে গৃহিণীর বেশ মনে ধরিল। তিনি একরকম স্থির করিয়া আসিলেন। কন্যার পিতা শুভ দিনে পাত্র দেখিয়া সব স্থির করিয়া যাইবেন, এইরূপ কথা হইল।

যে দিন অপরাহ্নে কন্যার পিতা, পাত্র দেখিতে আসিবেন, সেই দিন প্রভাতে বামা হাসিতে হাসিতে রমণীকে কহিল, "কি রে, এইবার পালাবি ?"

রমণী। কেন পালাব না ?

বামা। ইস্, তা' আর পালাতে হয় না। বউ আসছে যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা।

রমণী। তোমার অপ্সরী-কিন্নরীর বাচ্ছা হ'লেও আমি বিয়ে করছি না।

বামা। ও মা, বলিস্ কি ! সব যে ঠিক।

রমণী। মানুষ অনেক কথাই ঠিক করে, বিধাতা কিন্তু সে সব বেঠিক ক'রে দেন।

বামা। দেখছি তুই অনেক কথা শিখেছিস্।

রমণী। তা' শিখব কেন, তোমরা যা' শেখাবে, তাই শিখব, না?

বলিয়া রমণী মায়ের কাছে গেলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুখ-খানা তুই হাঁড়িপানা ক'রে এলি কেন রে মোহন?"

রমণী। মন ভাল না থাক্‌লে সকলেই মুখ হাড়িপানা করে। তোমরা কি তখন হাসতে থাক?

জননী। কে তোকে রাগালে রে? আয়, আমার কোলে আয়।

পুত্রের প্রাণ গলিয়া গেল। এতক্ষণ শুধু আঘাতের উপর আঘাত পাইতেছিল, এইবার শীতল বারি আহত স্থানে সিঞ্চিত হইল। তাহার লোভ হইল, মায়ের কোলে শুইয়া পড়িয়া তাঁহাকে তাহার দুঃখের কথা জানায়। কিন্তু তখনও তাহার আহত স্থানের বেদনা যায় নাই,—সে দাড়াইয়া ফুলিতে লাগিল। মা দেখিলেন, পুত্রের প্রাণে গভীর বেদনা। তিনি ব্যস্ত হইয়া পুত্রকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন বিপুল দেহ লইয়া সহসা উঠা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি যখন বলিলেন, "আমার কোলে আয় বাবা! কি দুঃখু তোর হয়েছে, আমাকে বল্। আমি যেমন ক'রে পারি, তোর দুঃখ ঘোচাব।"—তখন পুত্র আর থাকিতে পারিলেন না, মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িলেন। মা ছেলের মাথাটিকে আদর করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা, বল্।"

"মা, আমি বিয়ে করব না।"

"সে কি! কেন করবি নে?"

"তা' জিজ্ঞেস করো না।"

"কেন, মেয়ে ত ভাল।"

"ভাল-মন্দর কথা নয় মা।"

"তবে কি?"

"মা, বিয়ে করতে এখন আমার ইচ্ছে নেই; যদি তুমি জোর ক'রে আমার বিয়ে দেও, তা' হ'লে আমি বড় কষ্ট পাব। তোমার পায়ে পড়ি মা, আমাকে চিরদুঃখী করো না।"

"তোকে বিয়ে করতে হবে না বাবা; তোর সুখের জন্যেই বিয়ে। যদি তুই দুঃখ পাস্, তবে বিয়েতে দরকার কি? না, না, তোকে বিয়ে করতে হবে না। তুই আমার মুখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তোর হাসি-মুখ একবার দেখি।"

পুত্র উঠিয়া বসিয়া মায়ের পানে চাহিয়া হাসিল। মাও হাসিলেন; বলিলেন, "তোকে দুঃখু দিয়ে আমি তোর বিয়ে দেব?—গুরুঠাকুর এসে বললেও দেব না। কিন্তু—"

রমণী। কিন্তু কি মা?

জননী। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা ছিল, একটি বউ ঘরে আনি।

রমণী। মা, আমি অতি হতভাগা। আমার একটি ভাইও নেই—আচ্ছা মা, আমি বিয়ে করব।

জননী। না বাবা, তোকে আমি দুঃখু দেব না।

রমণী। দুঃখু কি?—আমি বিয়ে করব।

জননী। সত্যি করবি? তোর দুঃখু হবে না?

রমণী। সত্যি বিয়ে করব মা, তোমার মুখে হাসি দেখতে। কিন্তু মা, আমায় কিছু দিনের সময় দেও—

জননী। ফাল্গুনের আগে ত আর বিয়ে হচ্ছে না—শীতকালে কে বিয়ে দেয়—

রমণী। বেশ।

পুত্র তখন হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

১৯

পরদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে রমণীমোহন নীরদার ঘরে গিয়া দেখিলেন, নীরদা একখানি বই পড়িতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা, তুমি পড়তে জান?"

নীরদা নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বই খানি লুকাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া আর লুকাইল না, কোলের উপর রাখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। রমণীমোহন কহিলেন, "কি বই দেখি।"

নীরদা আপত্তি না করিয়া বইখানি দিল। রমণী দেখিলেন, সেখানি পরমহংসদেবের কথামৃত। বই-খানি ফিরাইয়া দিয়া রমণী কহিলেন, "আমার দু' একবার মনে হয়েছিল, তুমি লেখাপড়া জান।"

"হুঁ, ভারি ত জানি। 'ক' 'খ' চিন্‌লেই বুঝি লেখাপড়া জানা হ'ল।"

রমণী। কোথায় শিখলে নীরদা?

নীরদা। প্রসন্নপিসী শিখিয়েছিলেন; তিনি ইংরিজী-বাঙ্গলা দুই ভাল জানতেন।

রমণী। তুমি এতদিন বল নি কেন তুমি লেখা-পড়া জান?

নীরদা। আপনি কি ব'লে বেড়ান, আপনি বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন?

রমণী। (সবিস্ময়ে) তুমি কি ক'রে তা জান্‌লে নীরদা?

নীরদা একটু হাসিল, কিন্তু উত্তর করিল না। রমণী পীড়াপীড়ি করাতে কহিল, "আজ সকালে আপনার ঘর গোছাতে গিয়ে দেখি, মেঝেতে একখানা ছাপা চিঠি প'ড়ে রয়েছে—"

রমণী। সেখানা ত ইংরিজীতে লেখা।

নীরদা উত্তর করিল না।

রমণী। তুমি ইংরিজি জান?

নীরদা। দু' একখানা বই পড়েছিলাম, এই মাত্র।

রমণী। দু' একখানা বই পড়ার ত বিদ্যে নয়—

নীরদা। পিসীর কোন কাজ ছিল না, দিনরাত তিনি আমায় নিয়ে থাকতেন, কত গল্প বল্‌তেন।

রমণী। আমার আল্‌মারী সাজান দেখেই আমি বুঝেছিলাম, লেখাপড়া-জানা লোক ভিন্ন আমার বই এমন ক'রে আর কেউ সাজাতে পারত না।

নীরদা। বইখানা সোজা কি উল্টো রাখা হচ্ছে, তা জান্‌তে কি বিদ্যের দরকার হয়?

রমণী। তোমাকে যত দেখছি নীরদা, ততই আমি বিস্মিত হচ্ছি—তুমি একটি হেঁয়ালি। এত ধৈর্য্য, এত বুদ্ধি, এত আত্মসংযম তোমার বয়সী মেয়ের পক্ষে বড় আশ্চর্য্য।

নীরদা। যে অল্পবয়সে বাপ-মা হারিয়ে দুঃখ ভোগ করে, সে বিধাতার কৃপা হ'তে বঞ্চিত হয় না—তিনি তাহাকে ধৈর্য্য, আত্মসংযম শিক্ষা দেন।

রমণী। একটা জিনিস না থাক্‌লে কোন শিক্ষাই হয় না।

নীরদা। সেটা কি?

রমণী। রক্ত। বড় ঘরে না জন্মালে বুদ্ধি, ধৈর্য্য, আত্মসংযম শিক্ষা হয় না। শুধু বিপদে তা' শিখাতে পারে না, ভিতরে একটা শক্তি থাকা চাই। আমার কি মনে হয় জান নীরদা?

নীরদা। বলুন।

রমণী। তুমি কৈবর্ত্তের মেয়ে নও

নীরদা উত্তর না করিয়া মুখখানি নীচু করিল। রমণী কহিলেন, "তুমি চুপ ক'রে রইলে যে?"

নীরদা। কি বলব?

রমণী। তুমি কি কৈবর্ত্তের মেয়ে?

নীরদা। না।

রমণী। তবে চালদেডাঙ্গায় সে কথা শুনেছিলাম কেন?

নীরদা। আমি রক্ষে পাবার উদ্দেশ্যে সে কথা রচনা করেছিলাম।

রমণীমোহন অনেকটা আরাম পাইলেন—একটা ভারী জিনিস কাঁধের উপর হইতে নামিয়া গেলে লোকে যেমন আরাম বোধ করে, তিনিও তেমনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় স্কন্ধে আর একটা বোঝা আছে, সেটা কত দিনে নামিবে, তা' বিধাতা জানেন।

রমণী। তুমি যখন নিজের পরিচয় কিছুই জান না, তখন তোমাকে বারম্বার সে কথা জিজ্ঞেস করতে চাই না। কিন্তু একটা কথা জানতে চাই—তুমি অনেকদিন আগে একবার একটি গ্রামের পরিচয় জানতে চেয়েছিলে।

নীরদা। হাঁ।

রমণী। গ্রামের নাম তিলডাঙ্গা, না?

নীরদা। হাঁ।

রমণী। আমি আজ সকালে নায়েবের নিকট হ'তে গ্রামখানির পরিচয় জেনেছি। আমার জিজ্ঞাস্য, সে গ্রামের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

নীরদা। সম্পর্ক কিছু নেই।

রমণী। তবে?

নীরদা। আমার মনে হয়, তিলডাঙ্গার কাছেই আমার বাড়ী।

রমণী। কেন তোমার এমন মনে হয়?

নীরদা। সে অনেক কথা—

রমণী। আমার ইচ্ছা আছে, আমি একবার অনুসন্ধানে যাই।

নীরদা। না, আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না।

এমন সময় বামা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "তুই নিজে যাস নি মোহন, এক জন গোমস্তাকে পাঠিয়ে দে।"

রমণী। তুমি বুঝি আমাদের কথা আড়াল হ'তে শুনছিলে?

বামা। না বাবা, আমার বাপ এমন ছোটলোক নয়।

সরস্বতীও সেই সময় ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "কার বাপের কথা হচ্ছে রে?"

বামা কহিল, "এই তোমার আমার বাপের কথা।"

নীরদা একটু হাসিয়া রমণীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "এইবার সে কথা মায়েদের ব'লে দি?"

রমণীও একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "তুমি এত দুষ্টু তা' আমি জানতুম না নীরদা।"

নীরদা। মায়েরাই ত আমাকে আদর দিয়ে দুষ্টু করেছেন।

সরস্বতী। কি কথা নীরো?

নীরদা। পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে ছোট মা।.

সরস্বতী। মোহন পাশ হয়েছে?

নীরদা। শুধু পাশ নয়, সকলের উপর হয়েছেন।

সরস্বতী। হ্যা রে মোহন, তুই ত আমাকে তা' বলিস নি।

রমণী। কাল মোটে খবর এসেছে।

সরস্বতী। তা তখুনি কেন আমাকে বলিস নি—

রমণী। কাল যে সব গোলমাল গেল

সরস্বতী। তা এত বড় খবরটা তোর ভাবী শ্বশুরকে একবার শুনিয়ে দিলি নে?

রমণী। (গম্ভীর কণ্ঠে)। মা, তিনি ত আমার ভাবী শ্বশুর ন'ন।

সরস্বতী শ্বশুর নয় ত কি? তাঁরই মেয়ের সঙ্গে যে তোর বিয়ে।

রমণী। মা, তোমার হুকুমে বিয়ে করছি—তোমাকে সুখী করবার জন্যে তোমার বউ আনছি—এই পর্য্যন্ত।

বামা এতক্ষণ নীরবে মাতাপুত্রের কথা শুনিতেছিলেন; এখন অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পর্য্যন্তটা কি, খুলে বল্।"

রমণী। বিয়ে মায়ের জন্যে, কুটুমও মায়ের জন্যে—

বামা। আর বউ?

রমণী। সে-ও মায়ের।

বামা। তোমার বউ নয়?

রমণী। না।

বামার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল, "তবে তোমার বউ কি নীরদা?"

কথাটা বলিয়াই বামা অনুতপ্ত হইল। তখন রমণীমোহনের মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাকে তখন দেখিলে কেহ মনে করিতে পারে না যে, তিনি আবার মায়ের কোলে শুইয়া আদর খান। তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষায় তিনটি হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি বামার দিকে দীপ্ত নয়নে চাহিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ।"

সকলে স্তম্ভিত হইল। ক্ষণকাল কেহ কোন কথা বলিল না। বামা কথাটা উড়াইয়া দিবার অভিপ্রায়ে কহিল, "তুই কি সব মিছে বক্‌ছিস!"

"আমি মায়ের সামনে আজও মিছে কথা বলি নি।"

বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

২০

রমণীমোহন কলিকাতা চলিয়া যাইবার কিছু কাল পরে রমেশের নিকট হইতে 'তার' আসিল, রমণী শয্যাশায়ী—পীড়িত জননী তখন ব্যাকুল হইয়া পুত্রের নিকট যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নায়েবকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি আজই কলিকাতায় যাব—নিয়ে চল।" সে দিন গাড়ী ধরিবার সময় ছিল না, সুতরাং যাওয়া ঘটিল না। পরদিন প্রভাতে যাওয়াই স্থির হইল।

অনেকেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। গৃহিণী কহিলেন, "বামা দি, তোমার যাওয়া হ'তে পারে না।"

বামা। কেন, শুনি?

সরস্বতী তুমি গেলে এখানে সংসার দেখবে কে?

বামা। কারুর দেখবার দরকার নেই, সংসার চুলোয় যাক্। যাকে নিয়ে সংসার, সেই যখন প'ড়ে, তখন এ সংসার থাকল বা গেল, দেখবার প্রয়োজন কি?

গৃহিণী নিরুত্তর হইলেন রামী বলিল, "আমি যাব" তার ইচ্ছা, একবার কলিকাতা ও কালীঘাট দেখিয়া আসে। শ্যামার ইচ্ছা, কলিকাতায় কিছু সওদা করে। সে শুনিয়াছে, সেখানে নাকি বড় হাট বসে, আর সে হাটে কাকুই ফিতা চুলের কলপ সাবান নাকি বিক্রয় হয়। ধামীর ইচ্ছা, সে একবার রেলগাড়ীতে চাপে। কাজেই সকলে দাদা বাবুর জন্যে কাঁদিয়া আকুল হইল, এবং রাত্রি জাগিয়া গৃহিণীর পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল। গৃহিণী একটু সজাগ হইলেই তাহারা চোখে কাপড় দিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে, আবার তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলে পা-দোক্তার শব্দ করিতে থাকে সে রাত্রিতে গৃহিণীর পদযুগল একটুও বিশ্রাম পায় নাই।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সকলে প্রস্তুত। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামা-দি, এরা সকলেই যাবে নাকি?"

"না। সেখানকার বাড়ী ছোট, ধরবে না।"

"নীরদা যাবে ?"

"যাবে।"

"সেখানে গিয়ে কি করবে সে ?"

"এখানেই বা থেকে কি করবে ?"

"আমি তা' বলছি নি—"

"যা বলছ, আমি তা বুঝিছি। এখন আর সাবধান হ'লে কি হবে ? যা' করেন ভগবান।"

গৃহিণী আর কিছু বলিলেন না। দলটিকে খাটো করিয়া লইয়া তাঁহারা রওনা হইলেন। সন্ধ্যাকালে কলিকাতার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন, সে খাটো দলেরও তথায় স্থান নাই। তখন পাশের একটা বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। নায়েব, দরওয়ান প্রভৃতি তথায় রহিল।

পরদিন প্রভাতে গৃহিণী এক জন সাহেব ডাক্তার আনাইলেন। সাহেব না দেখিলে ভাল চিকিৎসা হইতে পারে না। বাঙ্গালীরা কিছু বুঝে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস নাই। যে বাঙ্গালী ডাক্তার পূর্ব্ব হইতে চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাঁহাকে অবশ্য তাড়াইয়া দেওয়া হইল না। সাহেব, রোগী দেখিয়া বলিয়া গেলেন, রোগ কঠিন নয়, তবে জ্বর ছাড়িতে দুই তিন সপ্তাহ লাগিতে পারে। এক জন বৃদ্ধ জ্ঞাতি কলিকাতায় থাকিতেন, তিনি মাঝে মাঝে আসিয়া রমণীকে দেখিয়া যাইতেন। নিকটাত্মীয়েরা বড় কেহ আসিতেন না; তবে বন্ধু-বান্ধবেরা দুই-বেলা ভিড় করিতেন। তাঁহাদের কেহ বেদানা আনিতেন, কেহ বা ফুল আনিতেন, কেহ বা নিজের বাগানের পিয়ারা আনিতেন। তবে চিকিৎসাদি রমেশের মতেই চলিত। নায়েব পাড়াগাঁয়ের লোক, তিনি সহরের কোন ডাক্তারকে চিনিতেন না; এমন কি, তিনি ভরসা করিয়া পথে একাকী বাহির হইতে পারিতেন না—পাছে পথ চিনিয়া ফিরিয়া আসিতে না পারেন।"

চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বিশেষ কোন ত্রুটি না হইলেও জ্বর উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সাহেব প্রত্যহই একবার আসিতেন, কিন্তু জ্বর তাঁহাকে ভয় করিল না—বাড়িয়া যাইতে লাগিল, গৃহিণী দুই চারি দিন রোগীর পাশে বসিয়া রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুখী মানুষ, ভারী দেহ—বড় একটা তিনি কাজে লাগিতেন না। মা কালীর সমীপে "মানৎ" করিয়া আর মাঝে মাঝে রোগীর মাথায় হাত বুলাইয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধা করিতেন। বামা অনেকটা কাজে লাগিতেন। রোগীর পথ্যাদি প্রস্তুত করিতে, খাওয়াইতে, শয্যা পরিষ্কার করিতে সকল সময়ে তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু সাহেব যখন ব্যবস্থা করিলেন, ডাক্তারখানা হইতে মাংসের কাথ আনিয়া রোগীকে খাওয়াইতে হইবে, তখন বামা সরিয়া দাঁড়াইলেন—নীরদার উপর সে ভার পড়িল। তাহার উপর আরও গুরুতর কাজের ভার পড়িল। জ্বর কখন্ বাড়ে কমে, কোন্ সময়ে কোন্ ঔষধটা খাওয়ান হয়, এই সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন পড়িল। বামা ও গৃহিণী সরস্বতীর কৃপাপাত্রী কোন কালে যে ছিলেন, এমন মনে হয় না। দুই একখানা বই পড়িয়াই তাঁহারা ভারতীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। গৃহের অপর কোন স্ত্রীলোক, জননী বীণাপাণির ভক্ত ছিলেন না। শিক্ষিত লোকের অভাবে যখন চিকিৎসার ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা জন্মিল, তখন নীরদা আর আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে পারিল না—তাহাকে বিস্তার পরিচয় দিতে হইল। বামা ও গৃহিণী সবিস্ময়ে দেখিলেন, নীরদা থার্ম্মিটার লইয়া জ্বর দেখিতেছে, আর তাহা লিখিয়া রাখিতেছে। যে সময় যে ঔষধ খাওয়াইতেছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছে। ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ ও পথ্য খাওয়াইতেছে, যত্নে জ্বর বেশী উঠিলে মাথায় বরফ ধরিতেছে, রোগীর বুকে ফ্লানেল জড়াইয়া পিন দিয়া আঁটিয়া দিতেছে, এই রকম অনেক আশ্চর্য্যজনক কাজ তাহাকে করিতে দেখিয়া বামা প্রভৃতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নীরদার আদর খুবই বাড়িল। সে কিন্তু আত্মগোপনে সতত চেষ্টিত থাকিত। সে চেষ্টা করিলে কি হইবে, তাহার উপর যে এখন সকল ভার পড়িয়াছে। গৃহিণী দুধ বা জল রোগীকে খাওয়াইতে গেলে হয় ত অনেকটা একসঙ্গে মুখের ভিতর ঢালিয়া দিতেন, বুকে পিঠে মালিস করিতে গেলে হয় ত বিছানাতেই খানিকটা ফেলিয়া দিতেন, সেক দিতে গেলে রোগীকে হয় ত পুড়াইয়া দিতেন, থার্ম্মমিটার বগলে লাগাইতে গেলে আগেই ত সেটা ভাঙ্গিতেন। এইরূপে সকল কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া তিনি এক্ষণে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, এবং দূরে বসিয়া নীরদাকে উপদেশ প্রদান করেন।

এত যত্ন ও চিকিৎসা সত্ত্বেও মহাবলবান্ রোগকে পরাস্ত করা গেল না। রোগ-রাজ অন্যান্য সেনাপতি পাঠাইয়া সাহেবের সমগ্র শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া তুলিলেন। নিউমোনিয়া ছিল না, সে আসিল; মলে রক্ত ছিল না, এক্ষণে তিনিও আসিলেন; জ্বর একবার করিয়া হইত, এক্ষণে দুইবার করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিতে লাগিল। নানা উপসর্গ

এইরূপে দেখা দিয়া সকলকে মহাচিন্তিত করিয়া তুলিল। বামা ও গৃহিণী আগে যাহা কিছু করিতে পারিতেন, এখন তাহাও আর পারেন না। চিন্তা, উদ্বেগ, রাত্রিজাগরণ তাঁহাদের শান্ত ও অকর্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই সকল ভার নীরদার উপর পড়িল।

সকল ভার লইয়া নীরদা বড় মুস্কিলে পড়িল। ঔষধের পাত্র-হস্তে রোগীর পার্শ্বে দাড়াইয়া ঔষধ খাওয়াইতে তাহার লজ্জা বোধ করিত; আবার বিছানায় বসিয়া তাপযন্ত্র বগলে লাগাইয়া বাহু চাপিয়া পাঁচ মিনিট বসিয়া থাকিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইত; বুকে মালিস করিতে, চোখমুখ ধোয়াইতে মুছাইতে তাহার বুক কাঁপিত। তাহার বিশ্রাম নাই, আহার নিদ্রারও বড় একটা অবসর নাই,—দিবা-রাত্র রোগীকে লইয়া থাকিত। মুখে কথা নাই, কোন কাজে চাঞ্চল্য নাই—ধীরে, নীরবে, সমস্ত প্রাণমন প্রত্যেক কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া বিদ্যুল্লতার ন্যায় কক্ষময় ঘুরিয়া বেড়াইত।

যে রোগী, তাহার কিন্তু কোন দুঃখ নাই; বুঝি সে রোগের যন্ত্রণাও অনুভব করিত না। নীরদার সেবায় বড়ই সে আরাম উপভোগ করিত। নীরদা যখন তাহাকে খাওয়াইত, তখন সে নীরদার চক্ষু দুইটির পানে চাহিয়া থাকিত; নীরদা যখন পার্শ্বে বসিয়া রোগীর বুকে মালিস করিত, তখন সে চক্ষু ভরিয়া নীরদার মুখখানি দেখিত। নীরদা যখন থার্ম্মমিটার লাগাইয়া রোগীর বাহু চাপিয়া ধরিয়া অবনতবদনে বসিয়া থাকিত, তখন রোগী নিমীলিত-নয়নে তাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিত। নীরদা যখন চোখ-মুখ মুছাইয়া দিত, তখন রোগীর অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিত। সে হাসি নীরদার হাত কাঁপাইয়া দিত—তাহার কাজের অন্তরায় হইত।

এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। দিন যতই যাইতে লাগিল, নীরদা রমণীমোহনের ততই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। নীরদা শয্যা-রচনা না করিলে সে শয্যা রমণীমোহনের পছন্দ হইত না। নীরদা ঔষধ না খাওয়াইলে ঔষধ গড়াইয়া পড়িয়া যাইত, নীরদা মালিস না করিলে প্রয়োজনীয় সকল স্থানে মালিস হইত না। নীরদা যেমন করিয়া শুশ্রূষা করিত, ঠিক সময়ে পথ্যাদি দিত, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইচ্ছামত হাতে হাতে যোগাইয়া দিতে পারিত, এমনটা আর কেহ পারিত না। নীরদা ক্ষণকাল কাছে না থাকিলে চলিত না; নীরদা ক্ষণেকের জন্যে অন্তরালে গেলে রোগীর ব্যাকুল চক্ষু তাহাকে অন্বেষণ করিত। তদ্দৃষ্টে বামা এক দিন গৃহিণীকে কহিল, "হচ্ছে কি?"

"আগে ছেলে বাঁচুক।"

"তার পর?"

"তুমিই ত বলেছ, ভগবান্ যা করেন।"

বামা আর কিছু বলিল না। আগে নীরদা পাশের ঘরে শুইত, এখন সেখানে শুইলে চলে না। বামা ও গৃহিণী রোগীর ঘরে হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া থাকিতেন। বামার পাশে নীরদার জন্যেও একটা বিছানা করা থাকিত; কিন্তু সে শয্যা সকল দিন স্পৃষ্ট হইত না। দিবা-যামিনীর অধিকাংশ সময়ই নীরদাকে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কাটাইতে হইত। রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীরদার লজ্জা সঙ্কোচ কমিয়া আসিয়াছিল। সে এখন নিঃসঙ্কোচে রোগীর হাত-পা টিপিয়া দিত। একদা নিশীথে নীরদা পদসেবা করিতেছে, রমণী-মোহন তাহাকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "আমার ভাল লাগছে না নীরদা, পা ছেড়ে দেও।"

নীরদা। তবে কি করব?

রমণী। তুমি ঘুমোও গে।

নীরদা। আমার ঘুম পায় নি।

রমণী। মায়েরা ত ঘুমুচ্ছেন, তোমার ঘুম পায় না কেন?

নীরদা। তাঁরা বুড়ো মানুষ, সমস্ত দিন খাটেন—

রমণী। আর তুমি সমস্ত দিন বুঝি ব'সে থাক?

নীরদা পা ছাড়িয়া হাত লইয়া পড়িল। রমণী কহিলেন, "তোমাকে আমি বড় কষ্ট দিচ্ছি, না নীরদা?"

নীরদা। আমার একটুও কষ্ট হয় না।

রমণী। নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু নীরদা, আমি বড় সুখে আছি। লোকে বলে, রোগে কষ্ট; কষ্ট হয় তার, যার নীরদা নেই।

নীরদা এবার মালিস আরম্ভ করিল। রমণী-মোহন কহিলেন, "এমনি ক'রে যদি আমাকে চিরদিন শয্যায় প'ড়ে থাকতে হয় নীরদা, আর এমনি ক'রে যদি চিরদিন তোমার সেবা পাই, তা হ'লে আমি আরোগ্য চাই না।"

নীরদার আর বসিয়া থাকা চলে না—সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু মালিস ছাড়িয়া উঠা যায় না।

রমণীমোহন একটু বিশ্রাম লইয়া কহিলেন,

"দু'মাস আগে বাড়ীতে যে কথা বলেছিলাম, তা' মনে আছে নীরদা? আমি সে দিন বড়ই চপলতা করেছি; তা' আমি কি করব, বড় মা যে আমাকে ক্ষেপিয়ে দিলেন। আমি কারুর ভয়ে কখন মিথ্যে বলি নি, সেদিনও জিজ্ঞাসিত হয়ে আমি ভয়ে বা লজ্জায় মিথ্যে বলি নি। তুমি আমার স্ত্রী—উঠো না নীরদা—যদি আর বলবার সুযোগ না হয়—তুমি যাহাই কেন হও না, তুমি আমার একমাত্র স্ত্রী, ভগবান্ সাক্ষী, পিতা সাক্ষী—একটু জল দেও।"

জল খাইয়া পুনরায় কহিলেন, "আমি মরিব না, ভয় নাই—তোমাকে দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া উঠিব; তোমার কথা শুনিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব; তোমার কর স্পর্শ করিবার জন্য, তোমার অঙ্গের বাতাস লইবার জন্য আমি সারিয়া উঠিব। ভয় নাই নীরদা, আমি মরিব না।"

নীরদা আর বসিয়া থাকিতে পারিল না—উঠিবার উপক্রম করিল।

"কোথা যাচ্ছ নীরদা? শুতে?

"হুঁ।"

"যাও, একটু ঘুমোয গে।"

নীরদা, বামার পাশে গিয়া শুইযা পড়িল; এবং বামাকে ঠেলিযা উঠাইয়া রোগীর কাছে পাঠাইযা দিল। নিজে শুইযা রহিল, কিন্তু ঘুমাইল না—চক্ষু বুজিযা পড়িয়া রহিল। ক্ষণপরে শুনিল, রমণীমোহন বলিতেছেন, "নীরদা কি ঘুমুলো বড় মা?"

বামা। বোধ হয় ঘুমিয়েছে। বাছা একটু খেতে-শুতে সময পায না।

রমণী। কি জানি কেন এমন হয় বড় মা—

বামা। কি হয বাবা?

রমণী। নীরদা আমার কাছে থাক্‌লে মনে হয়, যম আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না; সে কাছে না থাক্‌লে আমার ভয করে। হয ত নীরদা যখন ঘুমুবে, তখন মৃত্যু এসে—

বামা। ষাট, ষাট। ও-সব কথা মুখে আন্‌তে আছে!

অন্ধকারের মধ্যে নীরদা শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। রমণীমোহন কহিলেন, "বাতি কি নিবে গেছে বড় মা—জ্বেলে দেও—বড় অন্ধকার।"

বাতি শেষ হইয়া গিয়াছিল। বামা দ্বিতীয় বাতি জ্বালিয়া দিল।

রমণী। বড় মা, নীরদাকে ডেকে দেও।

বামা। ও মা, নীরদা যে বিছানার উপর ব'সে রয়েছে!

রমণী। নীরদা, কাছে এসো, আমার শরীর কেমন করছে।

নীরদা চকিতের মধ্যে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার রোগীকে দেখিল; তার পর ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা ঔষধ আনিয়া রোগীকে খাওযাইল। বামা কহিল, "তুই ঘুমের ঘোরে এ কোন্ ওষুধ খাওযালি? এ রকম ওষুধ ত খাওয়ান হয় না।"

নীরদা। এ ওষুধটা আলাদা ক'রে ডাক্তার দিয়ে গিছলেন; ব'লে গিছলেন, রোগী দুর্ব্বল হ'লে খাওযাতে।

সে রাত্রি কোন রকমে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে কযেকজন বড় বড় ডাক্তার আসিল। রোগীকে পরীক্ষা করিযা তাঁহারা বড় একটা আশা দিলেন না; এমন কি, বলিযা গেলেন, রোগীর হৃদ্‌যন্ত্র সহসা বন্ধ হইযা মৃত্যু ঘটিতে পারে। রমেশকে সে কথা চুপি চুপি এক জন ডাক্তার বলিতেছিলেন, রমণীমোহনের কানে তাহা গিযাছিল। তিনি তখন নিমীলিতনযন, কিন্তু সজাগ। পরে কেহ কোনরূপে জানিতে পারিল না যে, এ নিষ্ঠুর সংবাদ রমণীমোহনের কর্ণগোচর হইয়াছে। সে দিন সকল সময রমেশ এক জন ডাক্তার লইযা পাশের ঘরে সতর্ক রহিযাছেন। বামা ও গৃহিণী সকল সময় রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট। তাঁহাদের বিষাদভরা মুখ, বর্ষণোন্মুখ নযন দেখিযা রমণীমোহন বুঝিলেন, তাঁহারাও এ দারুণ বার্ত্তা শুনিযাছেন।

রাত্রি যখন তৃতীয প্রহর, তখন গৃহিণীদের বড় আলস্যবোধ হইল; তাঁহারা আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না—একবার গড়াইয়া লইবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা বিছানায় আসিযা একটু "কাৎ" হইলেন। বোধ হয, নিদ্রাদেবী উপাধানের নিম্নে লুক্কায়িত ছিলেন; তাঁহারা শুইবামাত্র দেবী তাঁহাদের আচ্ছন্ন করিলেন। কিন্তু নীরদার নিদ্রা নাই, সে ঠিক শয্যাপার্শ্বে বসিযা আছে। রমণীমোহন ক্ষীণ-কণ্ঠে ডাকিলেন, "নীরদা!"

নীরদা। আমি ত পাশেই ব'সে আছি—

রমণী। তোমার 'আত্মাঞ্জলি' ছবিখানি এনেছ নীরদা?

নীরদা। এনিছি।

রমণী। আজ আমি বুঝেছি, তুমি জগন্মাতার কাছে কি চাও। তুমি সবই আমায় নিবেদন ক'রে দিয়েছ—

কণ্ঠ ক্ষীণতর হইল; তদ্দৃষ্টে নীরদা ঔষধ আনিয়া সেবন করাইল। রমণী কহিলেন, "ডাক্তারে বলেছে, আজ আমার জীবনের শেষ।"

"না, তা' হ'তে পারে না—"

বলিয়া নীরদা টলিতে টলিতে বাহিরে উঠিয়া গেল। ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আর ভয় নেই, মা দুর্গা রক্ষা করেছেন।"

"যার পাশে তুমি, তার ভয় কি নীরদা? তোমার সমস্ত শক্তি আমাকে ঘিরে রেখেছে। নীরদা, একটি আমার প্রার্থনা আছে—তোমার একখানি হাত আমার বুকে দেও।"

নীরদা তৎক্ষণাৎ রমণীর বুকে হাত দিল। রমণী ধীরে ধীরে নিজের একখানি হাত উঠাইয়া নীরদার হাত চাপিয়া ধরিলেন; ক্ষণপরে কহিলেন, "কত শক্তি ঢালছ নীরদা? আমার যে সমস্ত দেহ কেঁপে উঠছে—তোমার শক্তির ভাণ্ডার নিঃশেষ ক'রে আমাকে দিচ্ছ—হাত তুলে নও—তুলে নও—"

এমন সময় সরস্বতী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কহিলেন, "অ্যাঁ, কি হয়েছে?"

রমণীমোহন কহিলেন, "আর ভয় নেই মা, রক্ষা পেয়েছি।"

জননী। বাবা আমার—

রমণী। মা, নীরদা আমাকে রক্ষা করেছে; পৃথিবীর ডাক্তার একত্র হয়েও যা' করতে পারত না, নীরদা তা' করেছে—সে তা'র সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে শক্তিমান্ করেছে—তার আয়ু দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে। আমি ত আর দুর্ব্বল নই মা।

সরস্বতী কাঁদিতে কাঁদিতে নীরদাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "মা আমার—"

২১

রাত্রি প্রভাত হইলে ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, রোগীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। রোগীর জ্বর নাই ও সে মারাত্মক দুর্ব্বলতাও নাই। সাহ্লাদে গৃহিণী মা কালীর দ্বারে জোড়া মহিষ বলির ব্যবস্থা করিলেন। নীরদাকেও পুরস্কৃত করিতে বিস্মৃত হইলেন না,—কণ্ঠ হইতে মূল্যবান্ হার খুলিয়া লইয়া নীরদার গলায় পরাইয়া দিলেন। নীরদা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া হার পরিল এবং গৃহিণীকে একটা প্রণাম করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। অন্তরালে গিয়া হার খুলিয়া ফেলিল এবং রমণীমোহনের শয্যার নিয়ে তাহা লুকাইয়া রাখিল। যখন রাখিতেছে, তখন রমণী তাহা দেখিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রাখছ নীরদা?"

"হার।"

"কোথায় পেলে?"

"ছোট-মা দিয়েছেন।"

"কেন?"

"তা জানি নে; তিনি আদর ক'রে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন।"

"আমাকে দেও।"

নীরদা হার বাহির করিয়া রমণীর হাতের কাছে ধরিল। রমণী কহিলেন, "আমার গলায় পরিয়ে দেও নীরদা, আমার যে শক্তি নেই।"

নীরদা একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া রমণীর কণ্ঠে হার পরাইয়া দিল; কিন্তু তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। সেই মুখখানি আরও লাল হইল, যখন রমণীমোহন কহিলেন, "এই আমাদের বিয়ে নীরদা; আমি বাঁচি বা মরি, আমি তোমার।"

নীরদা হর্ম্ম্যতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া খাটের বাজুতে মাথা রাখিল। কাহাকে সে প্রণাম করিল, কি প্রার্থনা করিল, তাহা বিধাতা জানেন। নীরদা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার চক্ষু জলভারে অবনত। রমণীমোহন কহিলেন, "যা নিবেদিত, তাই আবার নিবেদন করছ নীরদা? বহুপূর্ব্বে ত ভাণ্ডার শূন্য করেছ।"

নীরদা চক্ষু তুলিতে পারিল না; তুলিলে জল ঝরিয়া পড়িবে। অবনত-বদনে ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

দূরে দাঁড়াইয়া বামা সব দেখিল। কথাগুলি শুনিতে পায় নাই। সে দিন বামা কাহাকেও কিছু বলিল না। পরদিন অপরাহ্নে রমেশকে নিভৃতে পাইয়া কহিল, "নীরদার কি বিয়ে হবে না?"

রমেশ। কেন হবে না বড়-মা?

বামা। যে ধাড়ী হয়ে উঠল, তোরা ত নিশ্চিন্ত আছিস্।

রমেশ। রণীর সঙ্গে বিয়ে দেও না।

বামা। তা হ'লে ত ভালই হ'ত, কিন্তু তা' ত হবার যো নেই।

রমেশ। তোমাদের যে কি দশা! ছেলের সুখের চেয়ে তোমরা জাতটাকে বড় মনে কর।

বামা। তোদের মত ইংরেজি প'ড়ে আমরা ত ক্রীষ্টান হই নি, আমাদের শাস্তর মেনে চল্‌তে হয়। এখন বিয়ের কি করবি বল্?

রমেশ একটু চিন্তা করিল; মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "বিয়ের আর ভাবনা কি? এমন মেয়ে, কত পাত্র জুটবে।"

বামা আনন্দিত হইয়া কহিল, "কিন্তু ঘর বর ভাল হওয়া চাই।"

রমেশ। বর ভাল হ'তে পারে, কিন্তু ঘর কি ক'রে ভাল হবে?

বামা। কেন?

রমেশ। তারা আমাদের মত ক্রীষ্টান না হ'লে ত অজানা মেয়েকে ঘরে নেবে না।

বামা। তাই ব'লে ক্রীষ্টানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে নাকি?

রমেশ। তুমি কি আশা কর, গোঁড়া হিন্দুরা বিয়ে করতে চ'লে আসবে?

বামা। গোঁড়া না হো'ক—

রমেশ। গোঁড়ার নীচেই ত তোমরা; তোমাদের ঘরের ছেলে-মেয়েকে কোন্ হিঁদুতে বিয়ে দিতে নেবে?

বামা। কেন, আমরা কি?

রমেশ। তোমরা কি নও? যার বাড়ীতে দু' কুড়ি রাম-পাখীর শ্রাদ্ধ হয়ে গেল, সে কি না আজ মেয়ের বিয়ে দিতে গোঁড়া হিন্দু খুঁজে বেড়ায়।

বামা। রুগীর পথ্য বই ত নয়—

রমেশ। আজকাল সকলেই রুগী—কেউ বাড়ীতে ব'সে খান, কেউ কেউ বা হোটেলে পথ্য করতে ছোটেন।

বামা। তোদের সঙ্গে কথা কবার যো নেই, তোরা যে কি হইছিস!

রমেশ। দেখ বড় মা, আমার সাফ্ কথা। নয় তোমরা রণীর সঙ্গে বিয়ে দেও, আর নয় ক্রীষ্টান বা মুসলমানের ঘরে ফেলে দেও।

বামা। তুই থাম্।

রমেশ। তুমি কি তবে সঙ্কল্প করেছ, নিজের ঘর বাঁচিয়ে পরের ঘর ডোবাতে? কি সাধু উদ্দেশ্য! কি উদার হৃদয় তোমার!

বামা। আমি যদি তোর সঙ্গে আর কথা কই—

রমেশ। শান্ত হও বড়-মা, ফস ক'রে একটা প্রচণ্ড দিব্যি ক'রে ফেলো না। আমি এখন হোটেলে চল্লুম, সাত আট দিনের মধ্যে ফিরে এসে তোমাকে একটি ভাল পাত্র দেখাব; রামী-শামীর জন্যে যদি দু' একটা চাও, তা হ'লে তা'ও আন্‌তে পারি।

বামা। তুই এখন গেলে চলবে কেন?

রমেশ। রণী ভাল আছে, আর থাকবার দরকার নেই। দরকার বোঝ, ডাকতে পাঠিও—কাছেই ত হোটেল।

রমেশ প্রস্থান করিলে বামা চিন্তামগ্ন হইল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, রমণীমোহনও সারিয়া উঠিতে লাগিলেন। চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিলেন, তিনি দেহে একটু বল পাইলে পশ্চিমাঞ্চলে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইবেন। ব্যবস্থাটা সকলেরই মনোনীত হইল। নায়েব কয়েক জন দাসদাসী লইয়া চন্দনপুরে ফিরিয়া গেলেন।

যত দিন যাইতে লাগিল, বামা ততই অধৈর্য্য হইতে লাগিল। সে ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল যে, এ সুযোগে নীরদার বিবাহ না ঘটিলে ত্বরায় যে বিবাহ ঘটিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। কলিকাতায় পাত্রের অভাব নাই, কিন্তু পল্লীগ্রামে বড়ই অভাব। চন্দনপুরে একবার ফিরিয়া গেলে আর এখন বিবাহ ঘটিবে না। সুতরাং বিবাহ দিয়া যাইতেই হইবে। কিন্তু পাত্র কই?

পাত্র আছে এক রমণীমোহন। কিন্তু তাহার সঙ্গে নীরদার বিবাহ ঘটিতে পারে না। বিবাহ দিলে 'জাত' থাকিবে না, ধর্ম্ম থাকিবে না। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গাঢ় প্রণয় দিন দিন যেরূপ জমাট বাঁধিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিলে হয় ত উভয়ের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। প্রণয় আরও গাঢ় হইবার পূর্ব্বে উভয়কে পৃথক্ করা প্রয়োজন। কিন্তু কেমন করিয়া তা' করা যায়? বিবাহ ভিন্ন আর এক উপায় আছে; আমি নীরদাকে লইয়া আমার দেশে চলিয়া যাই। জমী-জমার উপস্বত্ব হইতে আমাদের বেশ চলিয়া যাইবে। এখন টাকা জমা হইতেছে, তখন না হয় জমিবে না। কিন্তু সরস্বতী কি ছাড়িয়া দিবে? মোহনও নীরদাকে ছাড়িবে না। হায়, হায়, কেন আমি নীরদাকে গৃহে আনিলাম! দেখি, রমেশ যদি বিয়ের জোগাড় করতে পারে।

পীড়াপীড়ি করাতে রমেশ এক দিন একটি পাত্র আনিল। পাত্রটির বয়স ষাট হইবে; দুই পক্ষ গত হইয়াছে; তিনি এক্ষণে তৃতীয় পক্ষ বাসনা করিয়াছেন। কেশ ধবল, মাংস লোল, দেহ জীর্ণ; কিন্তু বাসনা প্রবল। নীচের ঘরে পাত্রকে বসাইয়া রমেশ বামাকে সংবাদ দিল। বামা নীচে নামিয়া গিয়া উঁকি মারিয়া পাত্রকে দেখিল। পাত্র বুঝিল, তাহার পরীক্ষা রমণীমহলে আরম্ভ হইয়াছে। সে সময়

তাহার মুখখানি যাহাতে ভাল দেখায়, সে জন্য সে যথেষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিল। হাসি হাসি মুখ হইলে তাহাকে ভাল দেখায়, এটা দর্পণ তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল। এক্ষণে এই পরীক্ষা-ক্ষেত্রে হাসিটাকে একটু বেশী মাত্রায় আমদানী করিল। ফল এই হইল, ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় কর্ণমূল স্পর্শ করিবার উপক্রম করিল। চক্ষুর্দ্বয়ও কোটরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বামা মুহূর্ত্তের জন্য পাত্রকে দেখিয়া উপরে চলিয়া গেল। পাত্র সে সংবাদ অনবগত, সে সাম্‌নে কসরৎ চালাইতে লাগিল।

বামা উপরে আসিয়া রমেশকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিল। রমেশ মনে মনে হাসিয়া পরদিন আর এক পাত্র আনিয়া হাজির করিল। এবার পাত্রটি নব্যযুবক, রমেশের সহপাঠী। রমেশ তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া আনিয়াছিল। তাহার মাথায় 'টেরি', মুখে চুরুট, বুকে ঘড়ি, হাতে আংটী। বামা অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনিল, পাত্রের সহিত রমেশের আলাপ হইতেছে—

রমেশ। আপনি তা হ'লে এ বিবাহ করতে সম্মত আছেন ?

পাত্র। আগে মেয়ে দেখি, তার পর, বুঝলেন কি না—

রমেশ। যদি পছন্দ হয়, তা হ'লে কোন্ মতে আপনি বিবাহ করবেন ?

পাত্র। তা' যে মতে হয়—বুঝলেন কি না—আমার তা'তে কোন আপত্তি নেই; মস্‌জিদে হোক, গির্জ্জেয় হোক, যেখানে হোক—বুঝলেন কি না, মেয়ে আর টাকা নিয়ে কথা।

রমেশ। আপনারা কুলীন ?

পাত্র। খুব ভালরকম কুলীন, বুঝলেন কি না।

রমেশ। কা'র সন্তান ?

পাত্র। আমার বাপের নাম প্রিয়নাথ বসু, বুঝলেন কি না।

রমেশ। আপনি পূর্ব্বে আর বিয়ে করেছিলেন ?

পাত্র। দু' একটা ক'রে থাকব, বুঝলেন কি না।

রমেশ। তাঁরা জীবিত ?

পাত্র। ম'লে ত বাঁচতুম, বুঝলেন কি না। খোরপোষের নালিশ করেছে, টাকার দরকার, বুঝলেন কি না—

রমেশ। বেশ বুঝিছি। আপনি বসুন, পাত্রীকে আনি।

রমেশ বাহিরে আসিলে বামা কহিল, "ও পোড়ারমুখোকে এখুনি বিদেয় ক'রে দাও। হতভাগা আমাদের বোঝাতে এসেছে।"

রমেশ। তা' কি রকম পাত্র নীরদার পছন্দ হবে, তা' একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখ না, আমি সেই রকম আনি।

যুক্তিটা মন্দ নয়। পরদিন বামা নীরদাকে লইয়া পড়িল। অনেক ভূমিকা, নিবেদন, উপক্রমণিকার পর বামা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোকে ছেড়ে নীরো আমি কেমন ক'রে থাকব বল্ দেখি ?"

নীরদা। কেন তোমাকে আমায় ছেড়ে থাক্‌তে হবে মা ?

বামা। তুই যখন স্বামিঘর করতে যাবি, তখন ত তোকে ছেড়ে থাক্‌তে হবে।

নীরদা কোন উত্তর করিল না—অবনত-বদনে ছানার জল করিয়া যাইতে লাগিল। বামা কহিল, "আচ্ছা নীরো, কোন্ রকম পাত্র তোর পছন্দ ?—রমেশের মত ?"

নীরদা কাজ বন্ধ করিয়া অতি গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর করিল, "মা, আমার বিয়ে হয়েছে।"

বামা (সবিস্ময়)। সে কি রে! কা'র সঙ্গে ? কবে ?

নীরদা। আর কিছু আমাকে জিজ্ঞেস করো না মা।

বামা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর কহিল, "বুঝিছি।"

নীরদা বামার প্রতি আর ফিরিয়া চাহিল না; ছানার জল লইয়া রোগীর ঘরে প্রস্থান করিল।

সরস্বতী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন ক'রে ব'সে রয়েছ কেন বামা-দি ?"

বামা। ভাবছি—

সর। কি ভাবছ ? মোহন এখন ভাল হয়ে উঠেছে, ভাববার আর কি আছে ?

বামা। ভাবছি নীরদার বিয়ের কথা।

সর। কে সব নীরদাকে দেখতে এয়েছিল না ?

বামা। তারা এলে কি হবে, নীরদা বিয়ে করবে না।

সর। কেন ?

বামা। সে বলে, আমার বিয়ে হয়েছে।

সর। ও মা, সে কি! কা'র সঙ্গে বিয়ে হ'ল ?

বামা। তুমি নীরদাকে যে হার দিয়েছ, সে হার কোথায় ?

সর। মোহনের গলায় দেখিছি।

বামা। কেন তার গলায়, জান কি ?

সর। নীরো রাখতে দিয়ে থাকবে।

বামা। না, নীরদা হার মোহনের গলায় পরিয়ে দিয়েছে।

সর। তা'তে আর হ'লো কি?

বামা। হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু। তুমি যেমন বোকা! ওদের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে।

সরস্বতী স্তম্ভিত হইলেন। বামা কহিল, "আমি অনেক দিন হ'তে দেখে আসছি, ওদের খুব ভাব হয়েছে। দু'জনকে দু' ঠাঁই করবার অনেক চেষ্টা করিছি, পারিনি। এখন এক উপায় আছে।

সর। কি?

বামা। আমি নীরদাকে নিয়ে দেশে চ'লে যাই।

সর। না।

বামা। তুমি আমাকে ছেড়ে দিতে চাও না, তা' জানি; কিন্তু—

সর। তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি বামা-দি, কিন্তু নীরদাকে পারি নে।

বামা। কেন শুনি?

সর। বাছা যদি আমার সত্যিই নীরদাকে ভালবেসে থাকে, তবে তাকে সরিয়ে বাছার মনে আমি কষ্ট দেব না।

এমন সময় রমণীমোহন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে মায়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা, আমি সেরে উঠিছি ব'লে তোমার কাছে যে যা' চাইছে, তা'কে তুমি তাই দিচ্ছ। কাউকে শাল, কাউকে টাকা, কাউকে গয়না—কই, আমাকে ত কিছুই দিলে না।

জননী। তোমারই ত সব বাবা।

রমণী। না মা, আমাকে একটা জিনিস দিতে হবে।

জননী। কি চাই বাবা?

রমণী। মা, মা, আমি নীরদাকে চাই।

বামা বুঝিয়াছিলেন, মোহনের কি চাই। গৃহিণীকে সতর্ক করিবার অবসর পাইলেন না। রমণীমোহন কহিলেন, "মা, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চেয়েছি; তোমার ইচ্ছে হয় দেবে, ইচ্ছে না হয় আমাকে বিমুখ করবে। তুমি নিষেধ করলে নীরদার পানে আমি জীবনে ফিরেও চাইব না, তার নামও আমার মুখে কখন শুনবে না। কিন্তু মা, তখন আমার চেয়ে দুঃখীও আর পৃথিবীতে থাকবে না। এখন তুমি যা' বলবে, আমি তাই করব।"

জননী। বাবা, তুমি নীরদাকে বিয়ে কর—

রমণী মায়ের চরণের উপর পড়িয়া চোখের জলে পদ ধৌত করিয়া দিল।

বামা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "তুমি ত বল্লে, বিয়ে কর; এখন ও যদি মুচির মেয়ে হয়—?"

গৃহিণী। নীরো যদি মুচির মেয়েও হয়, তবু মোহন যখন ওকে চায়, তখন আমি কোন আপত্তি করব না।

বামা। তাই ব'লে ছেলে আব্দার ধরলে জাত-কুল সব নষ্ট করতে হবে?

গৃহিণী। ওরই জন্যে ত আমার সব। ও যদি সুখী না হয়, তবে জাত-কুল নিয়ে আমি কি করব?

বামা। তুমিও ত দেখ্‌ছি ওর সঙ্গে পাগল হলে।

গৃহিণী। আমি পাগল হই নি বামা-দি, আমি ছেলের মা।

ইঙ্গিতটুকু বামাকে আঘাত করিল। গৃহিণী, নীরদাকে ডাকিলেন। নীরদা আসিলে গৃহিণী তাহার হাত দুইখানি লইয়া রমণীর হাতের মধ্যে দিলেন; বলিলেন, "এই নেও বাবা, তুমি যা চেয়েছিলে, আমি তোমাকে তাই দিলাম; আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা চিরসুখী হও।"

উভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহিণীর চরণের উপর মাথা দিয়া পড়িলেন। চোখের জলে ক্ষিতি প্লাবিত হইল। গৃহিণীরও চোখের জল তাহাদের মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ বর্ষিত হইল।

২২

ইন্দ্রপুরে অন্নদাবাবুর ঘরে আসিয়া দেবযানী কহিল, "দাদা, তুমি কি সমস্ত দিনরাতই পড়বে—"

উত্তর নাই। তিনি তখন দুঃখবাদী সোপেন হাউয়ার উপনিষদ পাঠান্তে কি বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতেছিলেন।

"দাদা, শোন না—"

অন্নদা বাবু তখন ভাবিতেছিলেন, "এক জন বিধর্ম্মী উপনিষদ্ পাঠ ক'রে ব'লে গেল, 'ইহা আমার জীবনে শান্তি দিয়েছে, মরণেও শান্তি দেবে।' আমি ত উপনিষদের ঋষিচরণপূত ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েও সে কথা বলতে পারলুম না, আমি ত একটুও শান্তি পেলাম না। মায়া কি এত প্রবল—"

দেবযানী পুনরায় ডাকিল, "দাদা, ও দাদা—"

অন্নদাপ্রসাদ পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া দেবযানীর পানে চাহিলেন। দেবযানী কহিল, "হ্যাঁ দাদা, তুমি কি সমস্ত দিন-রাত পড়বে?"

অন্ন। তাতে কার কি ক্ষতি দিদি?

দেব। তোমার শরীর যে ভেঙ্গে পড়্ছে।

অন্ন। কেন, আমি ত বেশ আছি।

দেব। তুমি নিজে কিছু বুঝতে পাচ্ছ না; এই দেখ না কেন, কখন্ আমি জলখাবার রেখে গিয়েছি, সন্ধ্যে হয়ে গেল, এখনও তুমি তা' খাও নি।

অন্ন। জলখাবার না খেলে কি শরীর দুর্ব্বল হয়ে যায়?

দেব। তা' হয় বই কি চল, একটু বেড়াতে যাই।

অন্ন। কোথায় বেড়াব?

দেব। কেন, ফুল-বাগানে।

অন্ন। না, সেখানে আর বেড়াব না।

দেব। তবে নৌকো ক'রে বেড়াই গে চল।

অন্ন। নৌকোয়? না।

দেব। তবে গাড়ী ক'রে—

অন্নদাপ্রসাদ সহসা কোন উত্তর করিলেন না, অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিলেন। দেবযানী কহিল, "ঘোড়াগুলোর যে বাত ধ'রে গেল।"

অন্ন। তারা আজও মরে নি?

দেব। মর্বে কেন? কাকাবাবু যে তাদের যত্ন নেন।

অন্ন। কোন্ জিনিসটার তিনি যত্ন নেন না?

দেব। এখন তুমি চলো—

অন্ন। আজ থাক্, তুমি একাই বেড়াতে যাও।

দেব। আমি যাব? নৌকো ক'রে যাই?

অন্ন। নৌকোয় নয়—গাড়ীতে যাও।

দেবযানী চঞ্চল-চরণে প্রস্থান করিল। সে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার অঙ্গের সুরভি রহিয়া গেল। সুগন্ধ বায়ু কক্ষের চারিদিকে ঘুরিয়া কত কথা অন্নদাপ্রসাদকে জানাইল। তিনি বিমনা হইলেন। ক্ষণ পরে একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "দেওয়ান কাকা আছেন কি না দেখ ত।"

স্বল্পকাল পরে বৃদ্ধ দেওয়ান রামকুমার মুখোপাধ্যায় আসিয়া দর্শন দিলেন। অন্নদাপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া প্রণাম করিলেন। দেওয়ান বসিয়া কহিলেন, "আমি তোমার কাছে আসছিলুম বাবা—"

অন্ন। আজ্ঞা করুন।

রাম। এক জন সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করেন।

অন্ন। বেশ, সন্ধ্যার পর দেখা হবে; তাঁর থাকবার ব্যবস্থা বোধ হয় ক'রে থাকবেন।

রাম। নীচের বড় বৈঠকখানায় তাঁর স্থান ক'রে দিয়েছি।

অন্ন। বেশ করেছেন।

রাম। তোমার কথাটা কি বাবা?

অন্ন। আপনি দেবযানীকে চেনেন?

রাম। কে, শান্তর মেয়ে?

অন্ন। হাঁ।

রাম। চিনি বই কি। তাঁদের সঙ্গে তোমাদের যে একটু সম্বন্ধ আছে।

অন্ন। দেবযানীর আজও বিয়ে হয় নি—

রাম। আমি তা' জানি।

অন্ন। তা'র বিয়ের কি করছেন?

রাম। কি করব বাবা, শান্তকে বিয়ের কথা বল্লে, সে বলে, আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না।

অন্ন। মেয়ে খুব বড় হয়েছে, বিয়ে না দিলে আর চলে না।

রাম। আমার মনে হয়, হরিপ্রসন্নর সঙ্গে তা'র বিয়ে দেওয়াই শান্তর ইচ্ছে।

অন্ন। হরিপ্রসন্ন কে?

রাম। গোলোকের ছেলে; বাপ-মা হারিয়ে ভাইবোনে তোমার আশ্রয় নিয়েছিল

অন্ন। এখন সে কি করে?

রাম। সেরেস্তায় দিয়েছিলুম, পারলে না; এখন বাজার-সরকারি করে।

অন্ন। ছেলে ভাল?

রাম। রূপ আছে, কিন্তু গুণ বড় নেই।

অন্ন। পছন্দ আপনার না হ'লে, অন্য পাত্র দেখুন।

রাম। শান্তকে আর একবার ব'লে দেখি।

অন্ন। তাঁকে আর বলবার দরকার নেই এই ফাল্গুন মাসের মধ্যে যা'তে তা'র বিয়ে হয়, আপনি দয়া ক'রে সেই ব্যবস্থা করবেন

রাম। একটা কথা বল্‌ব বাবা?

অন্ন। স্বচ্ছন্দে বলুন।

রাম। তুমি যদি দেবযানীকে বিয়ে কর—

অন্ন। আমি? আমি বিয়ে করব?

রাম। হাঁ। মেয়েটি মন্দ নয়—

অন্ন। কাকা, আপনার সঙ্গে আমার কথা ছিল, আপনি আমার বিয়ের কথা আর তুলবেন না।

রাম। মন যে মানে না বাবা।

এমন সময় শান্তমণি ঝড়বেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অন্নদার দিকে ফিরিয়া মহা উত্তেজনার সহিত কহিলেন, "তুমি কি দেবীকে গাড়ী ক'রে বেড়াতে যেতে বলেছ?"

অন্ন। ঠিক বলি নি, তবে অনুমতি দিয়েছি।

শান্ত। সে আমাকে না ব'লে চুপি চুপি হরির সঙ্গে বেড়াতে চ'লে গেছে।

অন্ন। তা'তে আর দোষ কি হয়েছে?

শান্ত। দোষ খুবই হয়েছে। তুমি হরিকে চেন না, তাই ও কথা বল্‌ছ। আমি যে বাড়ীতে মুখ দেখাতে পারছি নি।

অন্ন। হরির সঙ্গে দেবযানীর বিয়ে দাও না কেন?

শান্ত। ওই পোড়ারমুখো ছেলের সঙ্গে? তার চেয়ে আমার মেয়ের গলায় দড়ি—

অন্নদা ও রামকুমার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন। রামকুমার কহিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, হরিপ্রসন্ন তোমার মনোনীত পাত্র।"

শান্ত। রক্ষে করুন দাদা, অমন পাত্র আমি চাই নে। এ কয় দিনে আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে।

অন্ন। দেখ পিসী, তুমি যদি হরির সঙ্গে ওর বিয়ে দেও, তা হ'লে হরি যাতে দুপয়সা রোজগার করতে পারে, কাকামহাশয় সে ভার নিতে পারেন।

শান্ত। না, না—ওর হাতে আমার এই সোনার পিত্তিমে দেব না। ও হতভাগা সে দিন রেতে নেসা ক'রে আমার ঘরে ঢুকেছিল।

অন্নদাপ্রসাদ রামকুমার বাবুর মুখপ্রতি চাহিলেন। দেওয়ানের মুখ কঠোর ও গম্ভীর হইল। কহিলেন, "তুমি এ কথা এত দিন আমায় বল নি কেন?"

শান্ত। বল্লে, একটা কেলেঙ্কারি হ'ত বই ত নয়। তা' ছাড়া হতভাগা আমাকে যন্ত্রণা দিত, খেতে পরতেও কষ্ট দিত। ও কি কম!

অন্নদা পুনরায় দেওয়ানের পানে চাহিলেন। এবার দৃষ্টিতে শুধু বিস্ময় নয়, একটু অনুযোগও ছিল। দেওয়ান তাহা বুঝিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া শান্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা হ'লে আমি পাত্রের চেষ্টা অন্য জায়গায় করি?"

শান্ত। তা—না—তা' করতেই হবে। ও হতভাগার সঙ্গে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। ও কি আমার মেয়ের যুগ্যি? কত রাজপুত্তুর অমন মেয়ে পেলে বর্ত্তে যায়।

অন্ন। তা হ'লে এই মাসেই যাতে বিয়ে হয় কাকা, আপনি তার চেষ্টা করবেন।

শান্ত। আমার ইচ্ছে ছিল—

অন্ন। কি ইচ্ছে ছিল?

শান্ত। মেয়েটা আর বাইরে যায় কেন? আমি ওকে ছেড়ে থাকব কি ক'রে, আমার ওই বই ত আর নেই—কার্ত্তিক আমাকে ছেড়ে চ'লে গেছে—

চক্ষুতে অঞ্চল প্রদান পূর্ব্বক একটু ফোঁপাইলেন। কার্ত্তিক নামে তাঁহার একটি দুই তিন বৎসরের শিশুপুত্র ছিল; বহুপূর্ব্বে সে দেহ রাখিয়া স্বর্গের দিকে যাত্রা করিয়াছে। সম্ভবত এতদিনে সে আবার মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিয়াছে। কার্ত্তিক ভগবতীর সঙ্গে বছরে দুইবার ও একাকী একবার ধরাধামে আসিয়া থাকেন, ইহাই শ্রোতারা জানেন। তা' ছাড়া তিনি যে আবার কোন্ সুযোগে অসময়ে শান্তমণির গর্ভাশ্রয়ে আসিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারা অনবগত ছিলেন। কার্ত্তিকের জন্ম ও তিরোধান সম্বন্ধে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া অন্নদাপ্রসাদ একটু বিরক্তির সহিত কহিলেন, "তোমার মনের কথাটা খুলেই বল না কেন?"

শান্ত। আমি মনে করেছিলুম, এই বাড়ীতেই যদি মেয়েটার বিয়ে হ'ত!

অন্নদা। এ বাড়ীতে কার সঙ্গে?

শান্ত। এই—এই তুমিই যদি তা'কে চরণে আছ্রয় দেও।

অন্নদা। আমি! আমি ওকে বিয়ে করব?

শান্ত। সম্পর্কে ত বাধে না—

অন্নদা। দেখ শান্তপিসী, এ কথা কখন আর বোলো না—বোধ হয়, দ্বিতীয়বার সাবধান করতে হবে না।

শান্তর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার এতদিনের সাধ-আশা মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া গেল। কল্পনায় সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া সে কত যত্নের সহিত তাহা সাজাইয়াছিল, এখন সে অট্টালিকা প্রচণ্ড ভূকম্পনে মুহূর্ত্তমধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কি বলিবে, কি করিবে, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া নিশ্চল পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া দেওয়ানের দয়া হইল, কিন্তু অন্নদার হইল না—তাঁহার মুখ তখন ক্রোধে আরক্তিম।

এমন সময় দেবযানী কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কয় মাসের মধ্যে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শুধু দেহে বা বেশে নয়—মনের ভাবেও অনেক পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে তাহার লোভ ছিল, কর্ত্রী-পদে —সরকার-পত্নীর পদ তাহার আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। কর্ত্তার অর্থ পছন্দ করিত, কিন্তু তাঁহার সঙ্গ সে পছন্দ করিত না—ভৃত্যের সঙ্গসুখই তাহার ঈপ্সিত ছিল। মন চাইত না যাইতে অন্নদার কাছে; কিন্তু জননী কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট নিয়ত প্রেরিত হওয়ায় তাহার

মন ক্রমেই বেঁকিয়া দাঁড়াইল। মন চাইত সদা হরিপ্রসন্নর সহিত আলাপ করিতে, মাতা তাহাতে প্রতিবাদী। মন তখন মাথা নাড়া দিয়া স্বীয় বাঞ্ছিত পথে চলিল। শান্তমণি সে পথে যত বাধা-বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন, ক্ষিপ্ত মন ততই বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিতে লাগিল; এবং জননী যাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন, তাহারই সঙ্গ দেবযানীর নিকট আকাঙ্ক্ষিত ও সুখকর হইয়া উঠিল। যাহাকে ত্যাগ করিতে জননী আদেশ করিতেছেন, তাহাকে সে একমাত্র বন্ধু বিবেচনা করিয়া আশ্রয় করিল। প্রেমাস্পদকে আপন জন ভাবিয়া দেবযানী, জননীকে লুকাইয়া গোপনে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল। মায়ের কাছে লুকাইবার কথা রহিল, কিন্তু প্রেমাস্পদের নিকট লুকাইবার কিছু রহিল না—সর্বস্ব তাহাকে প্রদত্ত হইল। এই প্রেমাস্পদ বুঝিল না, কতটা ত্যাগ, কতটা বিশ্বাস, কতটা ভালবাসা লইয়া এই সরল বিশ্বাসী বালিকা তাহার দ্বারে অঞ্জলি দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বুঝিবার তাহার শক্তি ছিল না। কুসঙ্গ, কুশিক্ষা তাহার শুদ্ধ মনোবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। পিতৃহীন যুবকের স্বাভাবিক নির্মল হৃদয়ের উপর হইতে কুশিক্ষার কালিমা দূর করিয়া দিতে কেহই ছিল না। সুতরাং তাহার মন-অশ্ব রশ্মি ঢিল পাইয়া ইচ্ছামত ছুটাছুটি করিতে লাগিল—বল্‌গা টানিয়া রাখিতে তাহার প্রবৃত্তি নাই—অশ্বকে সংযত করিতেও তাহার পার্শ্বে কেহ নাই। এই উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র যুবকের চরণে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া আজ দেবযানী ভিখারী—প্রেমাস্পদের কৃপাপ্রার্থী।

যখন দেবযানী কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অন্নদাপ্রসাদ কঠোর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরী হ'ল কেন ?"

দেব। দেরী ত হয় নি—এই ত যাচ্ছি—

অন্ন। বেশ দেরী হয়েছে।

দেব। গাড়ী সাজাল, কাপড়-চোপড় বদলালুম—

অন্ন। কাপড় ত যথেষ্টই অঙ্গে ছিল, সাজ-গোজ করবার কি প্রয়োজন পড়েছিল ?

দেব। নীলাম্বরী কাপড়খানা পরতে হরিদা—

শান্ত। ফের তোর হরিদা! আজ আমি কুরুক্ষেত্র করব।

অন্ন। চুপ কর।

রাম। তুমি একা বেড়াতে গিছলে ?

দেব। হ্যাঁ—না—ঠিক একা নয়—

রাম। ঠিক একা নয় যদি, তবে সঙ্গে কে ছিল ?

দেব। ঠিক সঙ্গে নয়—এই আমি আসছিলুম আর হরিদা এসে—

শান্ত। আজ আমি তাকে ঝাঁটা-পেটা করব—

রাম। তোমার মাকে সঙ্গে নিলে না কেন ?

দেব। মাকে কোথাও খুঁজে পেলুম না।

শান্ত। তুই আমাকে কোথা খুঁজেছিলি রে হতভাগি ?

দেব। কেন, আসবার সময় তোমাকে ত কোথাও দেখতে পেলুম না—জিজ্ঞেস কর গে না পেমদাকে।

অন্ন। তোমাকে অনুমতি দিয়ে আমারই অন্যায় হয়েছে দেবযানি। ভবিষ্যতে আর এ রকমটা হবে না। এখন তুমি যেতে পার। আর পিসী, এই মাসের মধ্যেই যা'তে দেবযানীর বিয়ে হয়, সে ব্যবস্থা কাকা মহাশয় করবেন।

দেবযানী পলাইল। শান্তমণিও নীরবে কন্যার অনুসরণ করিলেন। উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলে অন্নদাপ্রসাদ কহিলেন, "দেখুন কাকা, হরির উপর বেশী কড়া হবেন না—ছেলেমানুষ।"

রাম। ছেলেমানুষের মত কাজটা করে নি।

অন্ন। তা'কে একেবারে তাড়াবেন না—খেতে পাবে না; সেরেস্তায় সরিয়ে দিয়ে অন্দরে আসা বন্ধ ক'রে দেবেন।

রাম। বেশ, তাই করব। এখন আমি উঠি। সন্ন্যাসীকে পাঠিয়ে দিই গে।

২০

রামকুমার প্রস্থান করিলে অন্নদাপ্রসাদ পাশের ঘরে উঠিয়া গেলেন। সেটা একটা বড় হলঘর—সদর অন্দরের মধ্যে, নাচ-গান হইলে মেয়েরা এই হলঘরের একাংশে চিকের অন্তরালে স্থান লইত। এখন আর নাচগান নাই, কয়েক বৎসর হইতে আমোদ-প্রমোদ সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যেখানে মেয়েরা বসিত, সেখানে এখন পুস্তকপূর্ণ বড় বড় আলমারী। দেয়ালের ধারে ধারে যে কৌচগুলা ছিল, সেগুলা আজও তেমনি আছে। মাঝে দুখানা বড় টেবিল, আর কয়েকখানা গদি আঁটা চেয়ার। অপর পার্শ্বে ঢালা বিছানা; তার উপর একখানা বড় কার্পেট; কার্পেটের একধারে একখান ছোট নক্সাকাটা চাদর বিছান রহিয়াছে। নক্সাগুলি বেদগর্ভার হাতে তোলা—ময়ূর হরিণ, গাছপালা অনেক জিনিস তাহাতে চিত্রিত রহিয়াছে। অন্নদাপ্রসাদ মাঝে মাঝে আসিয়া এই চাদরের উপর শয়ন করেন।

কার্পেটের অপরাংশে একখানি পুরু গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। এই গালিচায় বহুকাল কেহ বসে নাই। আগে যেমন পাতা ছিল, এখনও তেমনি পাতা আছে।

অন্নদাপ্রসাদ এই বড় ঘরে আসিয়া একটা জানালার নিকটে দাঁড়াইলেন। শুনিলেন, অন্দর-মহলে তুমুল কোলাহল হইতেছে। তিনি সরিয়া আসিয়া অন্দরের দ্বার-সমীপে দাঁড়াইলেন। শুনিলেন শুধু কোলাহল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিন চারিটা কণ্ঠ এককালে ঝঙ্কৃত হইতেছিল। যখন দুইটি কণ্ঠ ফাটিয়া নীরব হইল, তখন অন্নদাপ্রসাদ শুনিলেন, তাঁহার কাকীমা বলিতেছেন, "দেখ শান্ত, আমি তোমাকে স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, ও-সব কেলেঙ্কারী এখানে চলবে না—আমার ভাশুরের কুলে যে তোমরা কালি দেবে, তা আমি বেঁচে থাকতে হচ্ছে না। এই বেলা তোমার মেয়ে নিয়ে মানে মানে স'রে পড়।"

শান্তমণিও তাহার যথাযথ উত্তর করিলেন; কিন্তু সে সব কথা শুনিতে অন্নদাপ্রসাদের প্রবৃত্তি হইল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আবার বাতায়ন-সমীপে দাঁড়াইলেন। চিন্তা করিলেন, "এ সব আমারই ত্রুটিতে ঘটিয়াছে। আমি সংসারে থেকে, সংসারীর কর্ত্তব্য পালন করি না কেন? যদি সংসারে মন না থাকে, তবে আর এক জনকে মনিব খাড়া ক'রে আমি স'রে দাঁড়াই না কেন? আমি না গৃহী, না সন্ন্যাসী। একটা আশ্রম বেছে লওয়া দরকার—মাঝে দাঁড়িয়ে আমি দু'কূল নষ্ট করছি। আবার গৃহী হব? কিন্তু কা'কে নিয়ে? এ শূন্য সিংহাসনে বসবার যোগ্য কেউ ত নেই—"

রামকুমার বাবু সহসা কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আমি ভেবে দেখ্‌লুম, হরিপ্রসন্নর সঙ্গেই দেবযানীর বিয়ে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।"

অন্ন। পিসী যে রাজি ন'ন।

রাম। মেয়েমানুষ তিনি, তা'তে আবার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম; তাঁর মতে মত দেওয়াটা কি আমাদের উচিত হবে?

অন্ন। আমারও অভিপ্রায়, হরির সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে হয়। অন্য পাত্র সহজে এ মেয়েকে নিতে চাইবে না।

রাম। আমিও তাই বুঝিছি। তা হ'লে তুমি শান্তকে আর একটু বুঝিয়ে বোলো।

অন্ন। বোঝাব আর কি, তিনি রাজি না হ'ন, তাঁকে মেয়ে নিয়ে অন্যত্র যেতে হবে।

রাম। বেশ, তবে বিলম্বের প্রয়োজন কি? সাম্‌নে যে দিনটা পাওয়া যায়, সেই দিনেই হো'ক না কেন?

অন্ন। তাই ভাল। আমি পিসীকে খবরটা দিয়ে রাখি।

খবর দিতে তাঁকে আর যেতে হ'ল না, পিসী ঝড়বেগে তথায় উপনীত হইলেন। বেশ আলুথালু, মাথায় কাপড় নাই, চক্ষু রক্তবর্ণ। অন্নদাপ্রসাদ কহিলেন, "স্থির হও।" শান্ত প্রথমে অন্নদা প্রভৃতিকে দেখিতে পান নাই, এ ঘর অতিক্রম করিয়া পাশের ঘরে যাইতেছিলেন; অন্নদার কণ্ঠস্বর সহসা শুনিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন; এবং বস্ত্রাদি সংযত করিয়া লইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি এর একটা বিলি কর।"

অন্ন। তাই করছি।

শান্ত। আমি এখানে আর তিষ্ঠুতে পারছি না।

অন্ন। দেখ, আমরা নিজেই আমাদের অশান্তি সৃষ্টি করি।

শান্ত। আমি কি করলুম?

অন্ন। তুমি করেছ অনেক অন্যায় কাজ। তুমি মেয়ের বিয়ে না দিয়ে আশা ক'রে বসেছিলে, আমি তাকে বিয়ে করব। ছি ছি!

শান্ত কোন উত্তর করিল না।

রামকুমার কহিলেন, "হরিকে তোমার মেয়ের কাছেই আসতে দেওয়া উচিত হয় নি; তুমি তোমার নিজের স্বার্থ পানে চেয়েছ, মেয়ের পানে চাও নি। এখন তুমি যে বীজ বপন করেছ, তা'র ফল লও।"

শান্ত। আমি তা' কি করব—?

রাম। তোমার করবার ছিল অনেক। তুমি কি জানতে না, তোমার মেয়ে নীলাম্বরী সাড়ী কোথা থেকে পায়? তুমি কি বুঝতে পার নি, তোমার মেয়ে কোথা হ'তে আতর-গোলাপ এনে মাখে? যাক্‌ ও-সব কথা। এখন তোমার মেয়ের বিয়ে হরির সঙ্গে দেওয়াই আমরা স্থির করেছি। এই মাসেই বিয়ে—তুমি তৈরী হও।

শান্ত। ও হতভাগার সঙ্গে দেবীর বিয়ে দেব না।

রাম। এত গোলমালের পর কোন ভদ্র পরিবার তোমার মেয়েকে নেবে না।

শান্ত। কেন, আমরা কি করেছি?

অন্নদাপ্রসাদ একটু বিরক্ত হইয়া গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন, "আমরা যা' ব্যবস্থা করেছি, তাতে তুমি রাজি না হও, তা হ'লে তোমার মেয়েকে নিয়ে আর কোথাও যাও।"

শান্ত। তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

অন্ন। তোমার চেয়ে আমার কর্ত্তব্য বড়।

শান্ত ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিল। পরে কহিল, "বিয়ে কবে হবে?"

অন্ন। তা' পরে জান্‌তে পারবে।

শান্ত। এই বাড়ী হ'তেই বিয়ে হবে?

অন্ন। না; আমার বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল হবে না। তোমরা আমার বাগানবাড়ীতে যাও, সেইখানেই বিয়ে হবে।

শান্তমণি আর কথাটি না কহিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিল। সে অদৃশ্য হইলে অন্নদাপ্রসাদ কহিলেন, "কাকা, আমার অপরাধ বড় কম নয়; আমি গৃহী হইয়াও গৃহীর কর্ত্তব্য পালন করি নাই। আমি নয় সত্বর সংসার ছাড়ব, নয় গৃহী হ'ব।"

দ্বারপথে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী সহাস্যে বলিলেন—"সংসার ছাড়বার তোমার বয়স হয়েছে অন্নদা?"

অন্নদা, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া যত্নসহকারে গালিচার উপর বসাইলেন। অতঃপর কহিলেন, "সংসার ছাড়া না ছাড়া, মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে, বয়সের উপর নির্ভর করে ব'লে আমার মনে হয় না।"

সন্ন্যা। কথাটা ঠিক, কিন্তু অনেকের ত শ্মশান-বৈরাগ্য হয়। তোমার সংসার ত্যাগ করা হবে না।

অন্ন। আপনি কি ক'রে তা' জান্‌লেন?

সন্ন্যা। তা পরে বল্‌ছি। তুমি আমাকে চিনতে পার কি?

অন্ন। আপনাকে এ-বেশে কখন দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

সন্ন্যা। অন্য বেশে?

অন্ন। দেখিছি। আপনি আমার পিতৃবন্ধু গিরিজানাথ।

সন্ন্যা। ঠিক বলেছ।

অন্ন। আপনি সংসার ছেড়েছেন, তা'ও শুনিছি। এখন আপনার আশ্রম কোথা?

সন্ন্যা। আশ্রম কোথাও নেই; গুরুদেব যেখানে থাকেন, আমিও সেখানে থাকি।

অন্ন। তিনি এখন কোথায় আছেন?

সন্ন্যা। বৈদ্যনাথে।

অন্ন। তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সন্ন্যা। তাঁকে তুমি দেখেছ, তিনি তোমার পিতার গুরু—নাম স্বযুম্নানন্দ। আমরা তিন জনে তাঁর নিকট এক সময়ে দীক্ষা গ্রহণ করি।

অন্ন। আপনি, বাবা, আর কে?

সন্ন্যা। চন্দনপুরের হরনাথ।

অন্ন। স্বামিজি কি বৈদ্যনাথে আশ্রম করেছেন?

সন্ন্যা। না, করেন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীর কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম থাকা ঠিক নয়। উপদেশ দেন, সর্পের ন্যায় পরগৃহবাসী হবে, কুমারীর শাঁখার ন্যায় একাকী থাকবে, ছুঁচ-নির্ম্মাণে ব্যাপৃত কর্ম্মকারের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হবে, সন্ধ্যাকালে বেশ্যারা ঘরদ্বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে যেমন প্রাণনাথের প্রতীক্ষায় থাকে, তেমনি অন্তর পরিষ্কার ক'রে ভগবানের প্রতীক্ষায় থাক্‌বে—

অন্ন। বুদ্ধদেবের ছয়টি উপদেশ এই রকম ছিল না?

সন্ন্যা। তাঁরই উপদেশ গুরুদেব আমাদের বলেন। তুমি যখন জান, তখন আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এখন আমি এসেছি তোমার কাছে একটু প্রয়োজনে।

অন্ন। আজ্ঞা করুন।

সন্ন্যা। তোমাকে একবার বৈদ্যনাথে যেতে হবে বাবা।

অন্ন। কেন?

সন্ন্যা। গুরুদেবের আজ্ঞা।

অন্ন। আমি ত যেতে পারব না।

সন্ন্যা। কেন?

অন্ন। আমি তাঁর প্রতীক্ষায় আছি

সন্ন্যা। কার প্রতীক্ষায় বাবা?

অন্ন। আমার স্ত্রীর।

সন্ন্যা। তিনি ত দেহ রেখেছেন ব'লে শুনেছি

অন্ন। তাঁহার দেহ পাওয়া যায় নি

সন্ন্যা। তিনি জীবিত থাকলে—

অন্ন। ক্ষমা করবেন, আমি তর্ক করতে চাই নে। এইটুকু শুধু জানবেন, আমি আজ নয় বৎসর তাঁর প্রতীক্ষায় আছি; প্রয়োজন হয়, জীবন-ভোর থাক্‌ব—স্থানান্তরে যাব না।

সন্ন্যা। বুদ্ধদেব কি এই রকম প্রতীক্ষা করতে বলেছেন?

অন্ন। ক্ষমা করবেন। আমার হৃষীকেশ আমার ভিতরে থেকে আমাকে যা' করাচ্ছেন, তাই করছি; যা' বোঝাচ্ছেন, তাই বুঝছি।

সন্ন্যা। বেশ, কর। আমাকেও তবে এখানে থাকতে হবে,—যত দিন না তুমি আমার সঙ্গে যেতে সম্মত হও। গুরুদেবের আদেশ আমি লঙ্ঘন করতে পারব না।

অন্ন। আপনি থাক্‌বেন, সে ত আমার সৌভাগ্য; কিন্তু স্থানান্তরে আমি কিছুতেই যাব না।

সন্ন্যা। শীঘ্রই তা' দেখা যাবে অন্নদাপ্রসাদ। আমার গুরুর মুখ দিয়ে আজও বৃথা বাক্য বাহির হয় নি।

বলিয়া হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসী নীচে নামিয়া গেলেন।

২৪

বেদগর্ভাব কোন গোল নাই, খান দান হাসেন, বেড়িয়ে বেড়ান—কোন চিন্তা নাই। হয় ত মনে করেন, সংসারে বুঝি শুধু হাসি-খেলা। এখানে বাসনা-কামনা, আশা-উল্লাস, সুখ-দুঃখ কিছুই নাই, আছে শুধু আহার-বিহার। জীবন-নদে তরঙ্গ নাই—ধীরে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু যে বিপুলা নদীতে আসিয়া তিনি দেহ ঢালিয়াছেন, সে নদীতে তিনি বিষম তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার নিজের তাহা লক্ষ্য করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু প্রভাতকুমারের স্ত্রী সুশীলাসুন্দরী সেটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। একদা মধ্যাহ্নে তিনি শোভনার গৃহে আসিয়া কহিলেন, "তোরা অনেক দিন দেশে যাস নি, তা তোর ভাশুর কিছু বলেন না?"

শোভনা। আগে বলতেন বই কি, কত চিঠি লিখতেন; এখন আর কিছু বলেন না।

সুশী। কেন যান নে খুলে বল্ দেখি।

শোভ। উনি বলেন, সেখানে গেলে ম্যালেরিয়া ধরবে; বেশী পীড়াপীড়ি করলে বলেন, সেখানে কি আমাকে মারতে নিয়ে যেতে চাও? কাজেই আমাকে চুপ ক'রে যেতে হয়।

সুশী। কাজলের ত বিয়ে দিতে হবে—সে যে ধাড়ি হয়ে উঠল।

শোভ। তা' ত দেখছি; কত বলি, তিনি গা করেন না।

সুশী। দেখ্ বোন্, তুই এক কাজ কর্, বল্ যে, আমি কাজলকে নিয়ে দেশে যাই, তুমি একা এখানে থাক।

শোভ। তা'ও দিদি ব'লে দেখেছি, তা'তেও কোন ফল হয় নি। তিনি উত্তর করেন, একা থাকতে আমার বড় কষ্ট হবে।

সুশী। গুণের নিধি; তা' এখানে সকলে ব'সে থাক্‌লে মেয়ের বিয়ে কি ক'রে হবে?

শোভ। ভগবান্ জানেন। কি ক'রে যে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার পাব।

সুশী। তুই এক কাজ কর্—তোর দিদিকে লেখ, তোর ভাশুর এসে কাজলকে নিয়ে যান।

শোভ। আমি কাজলকে ছেড়ে থাক্‌তে পারব না।

সুশী। তা বটে; কোলের মেয়ে, ছেলেটিও কাছে নেই।

শোভ। আমি কোন উপায়ই খুঁজে পাচ্ছি নে দিদি। এখানেও পাত্র সন্ধান করেছি, আমাদের পাল্টি ঘর এ দেশে একেবারেই নেই।

এমন সময় পুষ্প তাহার শয়ন-ঘর হইতে উঠিয়া আসিল। সে তাহার ঘরে কাজলকে লইয়া ঘুমাইতেছিল। শোভনা কহিলেন, "যা' হাত মুখ ধুয়ে আয় গে।" পুষ্প চলিয়া গেল।

সুশীলা কহিলেন, "এ মেয়েটাকে বিদেয় করতে পারিস বোন্?"

শোভ। আহা, ওর কি অপরাধ!

সুশী। তোকে আর দরদ দেখাতে হবে না—এ আগুন খোড়ো ঘরে রাখে?

শোভ। ওকে কোথায় ভাসাব দিদি?—ওর যে কোথাও স্থান নেই।

সুশী। তাই ব'লে কি নিজের ঘরে রাখতে হবে?

শোভ। না হয়, তোমার পাকা ঘরে ওকে নিয়ে যাও।

সুশী! কি জাত জানা নেই, আমি ঘরে তুলব কি ক'রে?

শোভ। স্পষ্ট বল না কেন, সাহসে কুলুচ্চে না।

সুশী। দূর!

পুষ্প আসিয়া কহিল, "আমার কথা হচ্ছে বুঝি?"

সুশী। কেমন ক'রে জান্‌লি তোর কথা হচ্ছে?

পুষ্প। আমি আসতেই তোমরা যে চুপ করলে।

সুশী। তোর এ দিকে ত বেশ বুদ্ধি আছে।

পুষ্প। কোন্ দিকে নেই?—আমি বুঝি বোকা?

সুশী। যদি বোকা না হ'স, তবে নাম বলতে পারিস না কেন?

পুষ্প। কেন পারব না? আমার নাম পুষ্প।

সুশী। পুষ্প নাম ত আজ ক'বছর হ'তে হয়েছে; আগে কি ছিল?

পুষ্প। তোমরা বলছ, আগে আমার একটা নাম ছিল, তা হ'লে সে নামের কথা তোমরাই ভাল জান।

সুশী। বা রে, মেয়ে যে ভারি চালাক হয়েছে।

আচ্ছা, বল্ দেখি, মেয়ে-জন্ম নিলে তা'র বিয়ে হয় কি না?

পুষ্প। হয়।

সুশী। তোর হয়েছিল?

পুষ্প। নিশ্চয়ই হয়েছিল; নইলে আমার হাতে নোয়া, মাথায় সিঁদুর কেন?

সুশী। ও বাবা! মেয়ে যে আমায় জেরা করে! আচ্ছা, তোর বিয়ের কথা কিছু মনে আছে?

পুষ্প। না; আমি বোধ হয় তখন খুব ছোট।

সুশী। খুব বাজনা-বাদ্যি হয়েছিল?

পুষ্প। হয়েছিল ব'লে মনে হচ্ছে—দাঁড়াও—

সুশী। খুব আলো ক'রে অনেক লোকজন নিয়ে বর এসেছিল—

পুষ্প। ঠিক বলেছ—অনেকদিনের কথা কি না—মনে হচ্ছিল না।

সুশী। তোর স্বামী খুব বড়লোক, না?

পুষ্প। তা' বলতে পারি নে—

সুশী। এই ধর্, তোর হাতে অনেকগুলো সোনার চুড়ি ছিল, হীরে-বসান বালা ছিল—শোভনা, নিয়ে আয় ত এর সব গয়না।

শোভনা গহনা আনিতে চলিয়া গেল। পুষ্প শূন্য পানে চাহিয়া অতীতের কথা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। সুশীলা তাহার চিন্তা-স্রোতে বাধা না দিয়া নীরবে তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। শোভনা গহনা লইয়া আসিলে পুষ্প মাথা তুলিয়া দেখিল। সুশীলা কহিলেন, "সেই কাপড়খানা নিয়ে আয় ত শোভনা।"

শোভনা গহনার বাক্স রাখিয়া কাপড় আনিতে চলিয়া গেলেন। একটা ছোট টিনের বাক্সতে অলঙ্কারগুলি রক্ষিত ছিল; সুশীলা বাক্সটি খুলিয়া গহনাগুলি একে একে বাহির করিলেন, এবং পুষ্পের চোখের উপর তাহা নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন। পুষ্প তা' দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এ যে আমার গয়না।"

সুশীলা। ইস্, তোর বই কি! তুই কোথা পেলি?

পুষ্প। কোথায় পেলুম, তা' মনে হচ্ছে না, কিন্তু এ সব আমার।

সুশী। আচ্ছা, তুই গায়ে পর দেখি—ঠিক ঠিক পরতে হবে।

পুষ্প গহনাগুলি পরিতে লাগিল। টায়রা প্রভৃতি দু'চারখানা গহনা ছিল না, সম্ভবতঃ জলে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। যা' ছিল, তাহা পুষ্প ক্ষিপ্রতার সহিত পরিতে লাগিল। পরিতে কেমন একটা ব্যগ্রতা তাহার কার্য্যে প্রকাশ পাইল। পরা শেষ হইলে স্বস্তি অনুভব করিল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া বারম্বার সেগুলি দেখিতে লাগিল। সুশীলা কহিলেন, "তুই এইবার কাপড়খানা পর দেখি।"

কাপড়খানি মূল্যবান্। এই কাপড়খানি পরিয়া দুর্ঘটনার দিন বেদগর্ভা পিত্রালয় হইতে স্বামীর সঙ্গে আসিতেছিলেন; শোভনা যত্নসহকারে কাপড়খানি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। পুষ্প কাপড়খানি পরিল

বস্ত্র ও অলঙ্কার পুষ্পেরই উপযোগী—পূজা বাড়ীর উলঙ্গ প্রতিমাকে আজ যেন বসন-ভূষণে সজ্জিত করা হইল। উভয়ে মুগ্ধনয়নে পুষ্পের পানে চাহিয়া রহিলেন। পুষ্প শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। সকলে নীরব। এমন সময় কাজল চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া কহিল, "এ কি আমি স্বপ্ন দেখছি! তুমি কি আমার সেই মাসী-মা?"

মাসী-মা কিন্তু উত্তর করিলেন না—তিনি প্রাচীরগাত্রে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার ললাট ভ্রুকুটিবদ্ধ, দৃষ্টি বহুদূরে, দেহ স্থির। সুশীলা ইঙ্গিতে কাজলকে নিবৃত্ত করিয়া পুষ্পের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাপড়খানা কার পুষ্প?"

পুষ্প। আমার।

সুশী। কবে প'রেছিস?

পুষ্প। তাই ভাবছি

সুশী। মনে ক'রে দেখ দেখি, সেই যে কাপড় গয়না প'রে তুই নৌকা ক'রে আসছিলি—

পুষ্প। ওঃ, মনে পড়েছে। কি অন্ধকার! কি আকাশের গর্জ্জন! কি ভয়ানক সমুদ্র!

সুশী। সমুদ্র কোথায় পেলি?

পুষ্প। হাঁ, হাঁ, ওই দেখ না, ওই গর্জ্জে আসছে—

ভয়ে পুষ্প পিছাইতে লাগিল। বিষধর সর্প সম্মুখে গর্জ্জিয়া উঠিলে লোকে যেমন আতঙ্কে পিছাইয়া যায়, পুষ্প তেমনি ভয়ে পিছাইতে লাগিল। সুশীলা উঠিয়া গিয়া তাহাকে ধরিলেন; কহিলেন, "ও যে মধুমতী নদী।"

পুষ্প প্রকৃতিস্থ হইয়া উত্তর করিল, "মধুমতী? মধুমতী? আমি যে তার নাম শুনিছি। সে কে বল দেখি?"

সুশী। সে যে মস্ত নদী, অনেক জল—তোর বাড়ীর পাশ দিয়ে বয়ে যায়।

পুষ্প। হাঁ হাঁ, মস্ত নদী, অনেক জল—খুব গর্জ্জন—

সুশী। তারই উপর তোর বাড়ী।

পুষ্প। আমার বাড়ী? সে কি!

সুশী। মস্ত বাড়ী—মোটা মোটা থাম—অনেক লোকজন—বড় বড় ঘর।

পুষ্প। হাঁ, হা, কি যেন ওই রকম দেখেছিলাম—

সুশী। সেই তোর বাড়ী।

পুষ্প। তবে আমি সেখানে থাকৃতে পাইনে কেন? তারা কি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

সুশী। আঃ পোড়াকপালী!

শোভনা মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখ দিদি, আমার মনে হয়, এর ঘরের সন্ধান করা একেবারেই কঠিন নয়।"

সুশী। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

শোভ। যেখানে পুষ্প ডোবে, সেখানে বা তার নিকটে বড় জমীদার দু' একঘর যদি থাকেন—

সুশী। অন্য কোন দেশের জমীদার বা ধনী ব্যক্তি যদি সেই দিন ওই পথে গিয়ে থাকেন?

শোভ। তাও' হ'তে পারে, কিন্তু সে সম্ভাবনাটা খুব কম।

সুশী। আমিও তাই মনে করি। তোরা যে একেবারে খোঁজ-খবর নিলি নে। ঘটনার পরে একটু চেষ্টা করলেই সন্ধান মিলত। তা কাজলের বাপের ত সে ইচ্ছা নয়। যা'ক, এখন আর সে কথা তুলে আক্ষেপ করলে কি হবে?

শোভ। এখন আমি দেখছি, পুষ্পের স্মৃতি-বিলম দুরারোগ্য নয়—চেষ্টা করতে করতে সকল কথা তার মনে প'ড়ে যেতে পারে।

সুশী। আমি আজই বলব কর্ত্তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে। আমার মনে হচ্ছে, সামান্য চিকিৎসায় এর স্মৃতি ফিরে আসতে পারে।

শোভ। চিকিৎসায় কিছু হবে ব'লে আমার মনে হয় না।

সুশী। তবে কিসে হবে?

শোভ। আজ সে কথা বলব না।

এমন সময় কাজল বলিয়া উঠিল, "বাবা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছ বুঝি?"

সকলে মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। কিন্তু তারাপদ চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই যে ভুবনমোহিনী মূর্ত্তির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিলেন—লজ্জাসরম তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিল না। সুশীলা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন

২৫

রাত্রি দশটা। ক্ষুধা নাই বলিয়া তারাপদ শুইয়া পড়িয়াছেন। শোভনাও কিছু খাইলেন না। অন্যান্য সকলে আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িল।

শোভনা ঘরে আসিয়া দেখিলেন, স্বামী শয্যায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছেন; কহিলেন, "দেখ, সুস্থ মানুষের পেটে কিছু না থাকিলে ঘুম হয় না—একটু কিছু খাও।"

'না', 'না' বলিতে বলিতে তারাপদ শয্যা ছাড়িয়া একখানা কৌচের উপর আসিয়া বসিলেন। শোভনা কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া অদূরে একখানা চৌকীর উপর কার্পেট লইয়া বসিলেন। বোধ হয়, একখানা আসন বুনিতেছিলেন। তারাপদ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে আবার কৌচের উপর বসিলেন। শোভনা নীরবে বুনিয়া যাইতে লাগিলেন। তারাপদ স্থির দৃষ্টিতে শোভনাকে দেখিতে লাগিলেন। স্ত্রী তাহা অনুভব করিলেন, কিন্তু চক্ষু উঠাইলেন না। তারাপদ ডাকিলেন, "শোভনা!"

শোভনা স্বামীর পানে চাহিলেন।

"শোভনা, তোমার মুখে যে সৌন্দর্য্য দেখিতাম, তাহা ত আর তোমার মুখে নাই।"

"আমি কবে আবার সুন্দর ছিলুম?"

"তুমি এক দিন সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ ছিলে—"

"তোমার মুখে সে কথা শুনতুম বটে।"

"এখন শোন না কেন?"

"এখন আমি কুৎসিত হয়ে থাকব।"

"না শোভনা, তুমি তেমনি আছ—আমার চোখই এখন কুৎসিত হয়েছে,—কলুষিত হয়েছে।"

"তুমি চিরসুন্দর, চিরপবিত্র—"

"তুমি আজও কি তাই ভাব?"

"ভাব কি আবার বদলায়?"

"তুমি কি আমার হৃদয় দেখতে পাচ্ছ না? যে সিংহাসনে তুমি অধিষ্ঠিত ছিলে—"

"তোমার অপরাধ কি? তুমি এই কয় বৎসর সাধ্যমত যুঝেছ।"

"আর পারি না শোভনা, আমাকে রক্ষা কর।"

শোভনার হাত হইতে কার্পেট পড়িয়া গেল।

"শোভনা, তুমি রক্ষা না করলে আমার উপায় নেই। আমি শক্তিহীন, বুদ্ধিশূন্য, ধর্ম্মভ্রষ্ট, আমাকে রক্ষা কর।"

শোভনার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি

হইল না। তারাপদ কহিলেন, "শোভনা, আমি অনেক যুঝেছি, কিন্তু আর পারছি না; আমি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি—আমার সমস্ত শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এখন তুমি দয়া না করলে, তোমার শক্তি, তোমার পবিত্রতা আমাতে সঞ্চারিত না করলে আমার আর রক্ষা নেই।"

শোভ। কেন অত কাতর হচ্ছ? শক্তিময়ীকে ডাক, তিনি তোমাকে শক্তি দেবেন।

তারা। তাঁকে ডাক্‌তে পারি কই? কে এক জন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়—সে আমাকে ডাক্‌তে দেয় কই? মাতৃমূর্ত্তি সরিয়ে দিয়ে সে নিজে মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করত আমার সম্মুখে দাঁড়ায়। তোমার মূর্ত্তি একেবারে দূরে সরিয়ে দিয়েছে; যে প্রেমময়ী মূর্ত্তি আমার নিকট অপার মাধুরীভরা ছিল, আজ সে মূর্ত্তি আমার অপ্রিয়—

শোভ। সে কথা তোমাকে আর বলতে হবে না। তোমার বুকের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা' ত আমার অবিদিত নেই।

তারা। অবিদিত নেই! বিশ্বাস হচ্ছে না।

শোভ। সে কথা তুমি এখন বিশ্বাস করতে পারবে না। এইটুকু জেনে রেখো, সাধ্বী স্ত্রীর কাছে স্বামীর ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র ভাবটুকুও অজ্ঞাত থাকে না।

তারা। তবে তুমি জান্‌তে পেরেছ, আমি তোমাকে এখন কি ভাবে—

শোভ। সে ত অনেক দিন জেনেছি

তারা। জেনেও তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর?

শোভ। পাথরের দাগ জল-ঝড়ে মুছে যায় না। শৈশবাবধি যে অঙ্কপাত আমার হৃদয়ে হয়েছে, তা' ত কোন ঘটনায় মুছে যেতে পারে না। টুকরো টুকরো ক'রে ভাঙ্গো, তখনও দেখবে দাগ রয়েছে। তুমি আমার মন বুঝতে পারবে না—স্বামীরা সাধারণতঃ স্ত্রীর মন বুঝতে পারে না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তারাপদ কহিলেন, "আমি সত্যই তোমার হৃদয় টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গেছি। কিন্তু কি করব—আমি এখন বিষপানে উন্মত্ত—ফিরে দেখবার আমার অবসর নেই।"

শোভ। আমার জন্যে তুমি একটুও কষ্ট পেও না; আমার যা' দুঃখ তোমার জন্যে। বিষ ব'লে যখন বুঝেছ—

তারা। বুঝেছি অনেক দিন, তবু দু হাতে ক'রে এ হলাহল পান করে আসছি। আগে পান করতে আশঙ্কা হ'ত, এখন আর আশঙ্কা নেই; আগে লজ্জা ছিল, এখন লজ্জা নেই; আগে ধর্ম্মভয় ছিল, এখন তাও নেই। আমি সব হারিয়ে শোভনা, আজ তোমার শরণাপন্ন—আমাকে রক্ষা কর।

শোভ। তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমি তোমার দাসী মাত্র।

তারা। দূর ক'রে ফেলে দেও তোমার ও ঘৃণিত পরিচ্ছদ! মহীয়ান্ বেশ পরিগ্রহ কর—আমার হৃদয়ে অবস্থিত এ মহিষকে সংহার কর—আমার এ হলাহল পানের পিপাসা নষ্ট কর।

শোভনার দেহ রোমাঞ্চিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিলেন না। তারাপদ কহিলেন, "তুমি নিজেকে ভুলে যাচ্ছ কেন শোভনা? তুমি আমার সঙ্গে ব'সে অনেক শাস্ত্র পড়েছ, অনেক জ্ঞান অর্জ্জন করেছ; প'ড়ে শুনে কি শেষে এই বুঝেছ, তুমি আমার দাসী? ছি, ছি, তা' ত নয়—তুমি তোমার কর্ত্তব্যের দাসী, আর আমার ধর্ম্মরক্ষিণী নিত্যসহচরী। তুমি আমার দশদিক্ রক্ষা করবে, অধর্ম্ম-অসুর আমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তা' দেখবে; আমি বিপথে না চলি, প্রবৃত্তি আমাকে পীড়ন করতে না পারে—সতত সতর্ক থাকবে; আমার আত্মার আত্মীয় হয়ে, আমার এই দেহ-মধ্যে আমি যেটা, সেটাকে নিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তুমি স্ত্রী হয়ে, তোমার কর্ত্তব্যের দাসী হয়ে তোমার কর্ত্তব্য কি পালন করেছ শোভনা?"

শোভ। যা' তুমি শিখাও, তাই আমি শিখি; যা' তুমি করাও, তাই আমি করি আমার স্বাতন্ত্র্য আমি অনেক দিন হারিয়েছি। এখন কি করতে হবে, আদেশ কর

তারা। আমার আদেশ নয় শোভনা, তোমার কর্ত্তব্যের আদেশ—এই প্রলোভনকে—এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গকে দূর কর।

শোভ তাই ব'লে কি নিরাশ্রয়কে অকূলে ভাসাব?

তারা। ভাসাতে হয়, তা'ও ভাসাবে; কিন্তু আমাকে রক্ষা করবে

শোভ সেটা কি মানুষের কাজ হবে? যে এক দিন মুমূর্ষুকে প্রাণ দিয়েছিল, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়েছিল, সে আজ কেমন ক'রে তাকে সমুদ্রের জলে নিরবলম্ব ভাসিয়ে দেবে?

তারা। দেখ, শাস্ত্র বলেছে, আত্মার জন্যে দেহ, আর দেহের জন্যে আত্মপরিজন। আত্মাকে রক্ষা করতে হ'লে অনাত্মীয় ত দূরের কথা, আত্মপরি-জনকেও বিসর্জ্জন করা যেতে পারে।

শোভ। আমি তা পারব না—নিরপরাধা নিরাশ্রয়াকে আমি অকূলে ভাসাতে পারব না।

তারা। তবে আমাকে ভাসানই কি কর্ত্তব্য ব'লে মনে করলে?

শোভ। তা' ত হ'তেই পারে না।

তারা। তবে?

শোভ। আমাকে কিছুদিন সময় দেও।

তারা। কিন্তু বেশী দিন নয়। আজই অপরাহ্ণে যখন আমি সেই ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি দেখলুম, তখনই আমি মনে করেছিলুম, এই প্রতিমা, এই দেবীকে নিয়ে আমি কোন দূর-দেশান্তরে চ'লে যাই। তোমার কথা শুনব না, সংসারের পানে চাইব না, লোকনিন্দা গ্রাহ্য করব না—ধর্ম্ম ভগবান্ কারুর পানে চাইব না—আমি এই উন্মাদক মূর্ত্তি নিয়ে দূর দেশান্তরে পালিয়ে যাই—

শোভনা শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমাকে এক মাসের সময় দেও—"

তারা। বেশ—কিন্তু তাও খুব বেশী; একদিনও সময় দিতে ভরসা হয় না।

শোভ। তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেও—

তারা। তুমি আমার প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করতে চাও? তুমি কি মনে কর, আজও আমি মানুষ আছি?

শোভনা উত্তর করিলেন না। বিনিদ্র অবস্থায় উভয়ে নিশি অতিবাহিত করিলেন।

২৬

পরদিন বেলা দশটার সময় আহারাদি সমাপন করিয়া তারাপদ কলেজে গেলেন। শোভনা ভৃত্য শিবুকে কহিলেন, "তুই শীগ্‌গির খেয়ে দেয়ে নে, তোকে এক জায়গায় যেতে হবে।

"কোথা যেতে হবে মা?"

"তা, জানতেই পারবি।"

বলিয়া তিনি একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। দুই ছত্র লিখিয়া সেখানি মোড়িয়া দাসীর মারফৎ সুশীলার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তার পর তিনি ক্ষিপ্রতার সহিত স্নানাহার সমাপন করিয়া লইলেন। পুষ্প কহিল, "দিদি, তুমি আজ আমার সঙ্গে কথা কইছ না কেন?"

শোভনা পুষ্পকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে মনে মনে ত অনেক কথা কইছি।"

"আমি কিন্তু তা' শুনতে পাই নি।"

"কান বাইরের কথা শোনে, মন অন্তরের কথা শোনে। তুমি মন দিয়ে শুনো দিখি।"

"আচ্ছা শুনব।"

"এখন তুমি কাপড় নিয়ে সেলাই কর গে যাও।" পুষ্প প্রস্থান করিল।

শিবু যথাসময়ে আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া কহিল, "কোথায় যেতে হবে মা?"

"তোর কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে আয়।"

শিবু একটা ছোট পুঁটুলি বগলে করিয়া আসিয়া কহিল, "এখন হয়েছে ত?"

"তোকে আমাদের দেশে যেতে হবে।"

শিবুর বাড়ীও যশোহর জেলায়। বহুকাল হইতে সে এ সংসারে আছে। বুদ্ধিতে বা কার্য্যদক্ষতায় না হোক,প্রভুভক্তিতে সে এখন সাধারণ ভৃত্যের অনেক উপরে উঠিয়াছে। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু দেহে আজও বিপুল শক্তি। শিবুর বাপ-মা, ভাই-বোন একসময়ে ছিল; কিন্তু এখন তাহারা ধরাধামে নাই। কাজল ও তাহার দাদা, ভাইবোনের স্থান লইয়াছে; আর কর্ত্তা-গৃহিণী দ্বারা মাতাপিতার স্থান অধিকৃত হইয়াছে। যাহা পাইয়াছে, তাহা লইয়া শিবু তৃপ্ত, শান্ত ও সুখী। যে সংসারে সে আছে, সেই সংসারে সুখ-দুঃখে সে এখন সুখী ও দুঃখী। স্বতন্ত্র বাসনা-কামনা তাহার নাই। তাহার বাল্যকালাবধি ঝোঁক ছিল—মৎস্য শিকারে। এখানে সে সুবিধা নাই; তজ্জ্ন্য বড়ই মনঃকষ্টে আছে। এক্ষণে দেশে যাইতে হইবে শুনিয়া আনন্দিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও যাবে মা?"

শোভ। না, তুই একলা যাবি।

শিবু। একলা? কেন মা?

শোভ। তা' বলছি। এখন একলা যেতে পারবি ত?

শিবু। তা' ত পারব।

শোভ। তবে ভাবছিস কি?

শিবু। তোমাদের একা রেখে যাই কি ক'রে? বিদেশ, বিভুঁয়—

শোভ। তোকে সে সব কিছু ভাবতে হবে না। এখন যা বলি, মন দিয়ে শোন্—

শিবু। আচ্ছা বল।

শোভ। ন' বছর আগে আমরা যখন দেশ থেকে নৌকো ক'রে আসি, তখন মেঘ-ঝড় দেখে আমরা কোথায় নৌকো বেঁধেছিলুম, তা' বলতে পারিস?

শিবু। খুব পারি। রেলের কাছে এসে আমরা

নৌকো বাঁধলুম, আর আমি একটা বড় মাছ ছিপে—

শোভ। দূর, সে দিনের কথা নয়—তার আগের দিনের কথা আমি বলছি। সেই যে আমরা পুষ্পকে কুড়িয়ে নৌকোর উপর উঠিয়ে আনলুম, তুই আগুন ক'রে সেক দিতে লাগলি—

শিবু। ওঃ, মনে পড়েছে, আর বলতে হবে না। এখন সেখানে গিয়ে কি করতে হবে? আবার কেউ ডুবেছে নাকি?

শোভ। থাম্। সেই জায়গাটার নাম কি বল্ দেখি?

শিবু। সেটা আমি ঠাওর করতে পারি নি—বড় আঁধার ছিল। কেউ যদি আলো ধ'রে জায়গাটা দেখিয়ে দিত—

শোভ। দূর হতভাগা! তা'র নিকটে কোন গাঁয়ের নাম জানিস নে?

শিবু। খুব জানি।

শোভ। বল্ দেখি।

শিবু। তিলডাঙ্গা। আমি সেখানে মাছ ধরব ঠিক করেছিলুম।

শোভ। তোকে সেইখানে যেতে হবে; তার নিকটে নদীর এ-পার ও-পার দুপারের গাঁয়ে সন্ধান নিবি, ন'বছর আগে কোন বড় লোকের নৌকো ডুবেছিল কি না—

সুশীলা আসিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইলেন। শোভনা ইঙ্গিতে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া শিবুকে বলিতে লাগিলেন, "আর সেই বড় লোকের স্ত্রী নৌকো ডুবে মরেছে, না তাকে পাওয়া গেছে। যখন সন্ধান পাবি, তখন সেই বড় লোকের নাম, তাঁর স্ত্রীর নাম, তাঁর গাঁয়ের নাম জেনে নিবি। ভুলিস নে, মনে ক'রে রাখবি। মনে থাকবে না বুঝিস যদি, তবে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিস। বুঝেছিস?"

শিবু মহাচিন্তিত হইয়া কহিল, "বুঝেছি ত, এখন পারলে হয়।"

শোভ। এ সোজা কাজটা পারবি নি?

শিবু। তুমি ত ঘরে ব'সে বল্লে সোজা, একবার সে ঝড়বৃষ্টির দেশে গিয়ে দেখ দেখি।

শোভ। এখন ঝড়বৃষ্টি কোথা রে?

শিবু। তা, বটে, কিন্তু হ'তে পারে ত। এই সেবার আশ্বিন মাসেই হ'ল। যাক্, এখন কি করতে হবে বল।

শোভনা গালি দিয়া কহিলেন, "তোকে কিছু করতে হবে না, তুই বেরো—"

সুশীলা তখন হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমি ওকে বোঝাচ্ছি; গাধাকে বোঝাতে হ'লে গাধা সাজতে হয়।"

শোভ। তোমার গাধার বেশটা দেখে একবার নয়ন সার্থক করি।

সুশী। আমি না তোর দিদি!

শোভ। দিদি ছিলে—যতক্ষণ গাধা সাজ নি।

সুশী। আচ্ছা শোভনা, তোর এ বুদ্ধি এত দিন কোথা ছিল?

শোভ। দিদি, বুদ্ধি আমার নয়। যিনি বুদ্ধিরূপে আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি সহসা কাল আমাকে এ বুদ্ধি দিলেন। দেখলুম যখন, পুষ্পর স্মৃতিশক্তিকে সাহায্য করলে, সে অনেক কথা মনে করতে পারে, তখন ভেবে দেখলুম, তাকে এই রকমে সাহায্য করলে সে তার স্মৃতশক্তি সম্পূর্ণরূপে ফিরে পেতে পারে।

শিবু কহিল, "তবে তোমরা গল্প কর—আমি একটু শুই গে।"

সুশীলা কহিলেন, "শুবি কি রে? শোন্।"

তখন তিনি কোথায় কার কাছে যাইতে হইবে, কি কি সন্ধান লইতে হইবে, সকল কথা শিবুকে বিস্তৃতরূপে বুঝাইয়া দিলেন। অনেক বকাবকির পর তিনি শিবুকে একরকম বুঝাইতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে কহিলেন, "দেখ্ শিবু, বাবুর ফটো যদি একখানা আনতে পারিস, তা হ'লে ভাল হয়।"

শিবু। ফটোক! ঘাড়ে ক'রে আনব কি ক'রে? ও-সব আমার দ্বারা হবে না।

সুশী। ফটোক নয়—ফটো, ফটো।

শিবু। সে জিনিসটা কি, তাই বল না—নদী না মাছ?

সুশী। হতভাগা! মাছই কেবল চিনেছ। ছবি ছবি—

শিবু। তাই বল। এখন ছবিওয়ালা কোথা পাই বল দেখি? তোমাদের ফরমাজটা বড় বেয়াড়া। এখন দু' দশ মণ মাছ আনতে বল, তা' আনতে পারি, কিন্তু ছবি তুলব কেমন ক'রে? সে সব বিদ্যে আমার আসে না।

সুশী। ওরে হতচ্ছাড়া, তোকে ছবি তুলতে হবে না। বড় লোকেদের ছবি তোলা থাকে—আচ্ছা, তোকে দেখাচ্ছি—শোভনা, কাজলের বাপের ছবি-খানা বার কর ত।

তারাপদর ফটো আলমারী হইতে শোভনা

বাহির করিয়া সুশীলার হাতে দিলেন। তিনি তাহা শিবুকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কা'র ছবি বল্ দেখি?"

শিবু। কেন, আমার বাবার; আমাকে ঠকাতে পারবে না।

সুশী। তা' কি পারা যায়—তুমি কত বড় বুদ্ধিমান্। এখন শোন, এই রকম ছবি সেই বাবুর আছে, তাই তোমাকে আনতে হবে।

শিবু। আলমারী ভেঙ্গে আনব নাকি?

সুশী। না রে—বাবুর চাকরের সঙ্গে ভাব ক'রে, তাকে কিছু দিয়ে ছবিখানা হাত করবি।

শিবু। আমার বাপঠাকুরদাও তা' পারবে না।

সুশী। কেন, বল্ দেখি?

শিবু। আমাকে তোমরা বোকা পেয়েছ? আমি কি বুঝতে পারছি নে, এটা চুরি করা হবে। আমাদের গাঁয়ে একজন ঘটি চুরি করেছিল—

সুশী। ওরে, তুই থাম্, তোকে ফটো আনতে হবে না।

শিবু। তবে কি করতে হবে বল?

সুশীলা আবার গোড়া হইতে বুঝাইলেন।

শিবু। তোমরা দু'জনে আমার মাথাটা ঘুলিয়ে দিলে।

সুশীলা কহিলেন, "এমন গাধাকেও পাঠাচ্ছিস শোভনা?

শিবু কহিল, "আমার ঘাড়ে গাধার বোঝা চাপালে আমি গাধা হব না ত কি হব?"

শোভনা পঞ্চাশটি টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, "চিঠিপত্র লিখ্‌তে হ'লে আমাকে লিখবি। দু'খানা খামে ঠিকানা লিখে দিলুম। এখন তুই আয়— ছুটোর গাড়ী ধরবার সময় আছে।"

শিবু উভয়ের পদধূলি লইয়া বিদায় হইল।

২৭

গ্রাম হইতে কিছু দূরে অন্নদা বাবুর উদ্যানবাটী। বাগান খুব বড়, কিন্তু বাড়ীখানি ছোট। গৃহের ভূরিভাগ শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত, কিন্তু হর্ম্ম্যতল রক্ত ও কৃষ্ণ-প্রস্তরে আচ্ছাদিত। উদ্যানমধ্যে শুভ্র গৃহটি, নদীবক্ষ হইতে নীলাকাশ-ললাটে চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

অনেক ফল-ফুলের গাছ। ফুলের গাছ গৃহসান্নিধ্যে, ফলের গাছ দূরে। কোন কোন পুষ্পবৃক্ষ বেদগর্ভার স্বহস্ত-রোপিত। কোন কোন বৃক্ষ অন্নদা বাবু নিজে রোপণ করিয়াছিলেন। সে সব গাছে বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষক নিজহাতে আজও যত্ন লয়, জল দেয়। গাছগুলিও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফুল দেয়; কিন্তু তাহাদের রূপ দেখিবার কেহ নাই, তাহাদের সৌরভ লইবারও কেহ নাই। বৃদ্ধ মালী তাহাদের রূপগুণের কিছুই বুঝিত না—সেবা করিয়া যাইত, মনিব তাহাদের স্বহস্তে রোপণ করিয়াছেন বলিয়া।

এখন তাহাদের রূপ-গুণের বিচার করিবার লোক আসিয়াছে। দেবযানী মনের আনন্দে উদ্যানমধ্যে ছুটিয়া বেড়ায়; আর তাঁহার জননী ম্রিয়মাণ হইয়া গৃহকোণে বসিয়া থাকেন। তাঁহার কণ্ঠের আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, মনেরও আর সে তেজ নাই। ভগ্ন আশা লইয়া তিনি এক্ষণে নির্ব্বাসিত। বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজনে তাঁহার মন নাই। যাহাকে তিনি দুই চক্ষুর বিষ দেখেন, তাহারই সঙ্গে তাঁহার একমাত্র সন্তানের বিবাহ। এ দুঃখের কাহিনী কাহাকেও যে শুনাইবেন, এমন পাত্রও নাই। হরিপ্রসন্ন নিত্য যাতায়াত করে। সে আসিলে তাহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া শান্তমণি স্থানান্তরে প্রস্থান করেন। হরি নির্জ্জনে দেবযানীর সহিত আলাপাদি করিয়া ইন্দ্রপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ফাল্গুন মাসেই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল, কিন্তু হরির এক জ্ঞাতির মৃত্যু ঘটায় বিবাহ স্থগিত আছে। বৈশাখের প্রথমে বিবাহ হইবে কথা আছে। কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে হরিপ্রসন্নর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল।

একদা সন্ধ্যাকালে হরিপ্রসন্ন অতি গম্ভীর-বদনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর গেল না, পুষ্করিণীর তীরে এক বকুলতলায় বসিল। তখনও অন্ধকার হয় নাই, সবেমাত্র সূর্য্যাস্ত হইয়াছে। দেবযানী নীলাম্বরী সাটী পরিয়া আতর-গোলাপ মাখিয়া কেশে ফুল মালা জড়াইয়া হাসিতে হাসিতে হরিপ্রসন্নর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হরিপ্রসন্নর মুখপানে চাহিয়াই সে শঙ্কিত হইল; তাহার পা আর উঠিল না—সে যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

"বসো, বলছি।"

বকুলতলায় বেদীর উপর চিন্তিত অন্তরে দেবযানী বসিল। হরিপ্রসন্ন শূন্যপানে চাহিয়া কহিল, "দেখ দেবি, তোমাতে আমাতে বিয়ে হ'তে পারে না।"

দেবযানী স্তম্ভিত হইল। সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না।

হরিপ্রসন্ন কহিল, "তুমি আমাকে ভালবাস, আমি তোমাকে ভালবাসি, ইহাই কি যথেষ্ট নয় ? এ ভালবাসাটাকে আবার একটা শৃঙ্খলে বাঁধা কেন ? বাঁধবার দরকার কি ?"

দেব। আমি ত বলেছি, আমি তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।

হরি। আমিও তাই বাসি। তবে একটা লৌকিক বন্ধনের প্রয়োজন কি ?

দেব। তবু—

হরি। দেখ, তুমি বই পড় না, আমি অনেক বই পড়েছি। ভালবাসাটা শৃঙ্খল দেখ্‌লেই ভয়ে পালায়। একজন কবি বলিয়াছেন—

"বিবাহিতা নারী—সখের খেলনা,
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন,
ইহারাই সতী—বিঘত প্রমাণ
আশা, রুচি, স্নেহ, ইহাদের প্রাণ ;
নারীর মাহাত্ম্য রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কত জন,
প্রণয় কি ধন নারীর তরে ?"

বুঝলে দেবযানী ? এই যে স্বামি-স্ত্রীর শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রেম, এটা অতি হেয়। ভালবাসাকে বাঁধবার চেষ্টা করো না, বাঁধন দেখলেই সে পালায়। তোমার যাকে ইচ্ছে তাকে ভালবাসবে, আমার যাকে ইচ্ছে তাকে ভালবাসব। তোমার যদি অন্য কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়, তা হ'লে তাকেই যে তোমাকে ভালবাসতে হবে, তার কোন মানে নেই ; তুমি তখনও গোপনে আমাকে ভালবাসতে পার—

দেব। ছি, ছি, ও রকম কথা বলো না।

হরি। তুমি বড় সেকেলে, এ সব কথা তুমি বুঝবে না। একটু লেখাপড়া জানলে, আজকাল-কার বড় বড় লেখকদের মতামত জানা থাকলে এ সব উঁচুদরের কথা বুঝতে পারতে।

দেব। আমার বুঝে কাজ নেই।

হরিপ্রসন্ন উত্তর করিল না। তাহার উদ্দেশ্য, দেবযানীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা। কোন ধনী ব্যক্তির একমাত্র দুহিতার সহিত তাহার বিবাহ-প্রস্তাব চলিতেছে। স্কন্ধ হইতে দেবযানীকে নামাইতে না পারিলে এ সুবিধাজনক পরিণয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ বোঝা যে নামে না—আটার মত গায়ে জড়িয়ে আছে। চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিলে একটা কলহ বাধান যায়। দেবযানী কহিল, "চুপ ক'রে রইলে যে ?"

হরি। আমার যা' বলবার, তা' বলেছি—তোমাতে আমাতে কিছুতেই বিবাহ হ'তে পারে না।

দেব। কেন ?

হরি। তুমি চরিত্রহীনা—গৃহলক্ষ্মীর পদের অযোগ্যা।

দেবযানী স্তব্ধ হইল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "কে আমাকে এ অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে ?"

হরি। তুমি সতর্ক থাকলে,—

দেব। আর বল্‌তে হবে না, আমারই ত্রুটি হয়েছে।

হরি। এখন তা' বুঝেছ ত ? তবে আমায় আর দোষী করো না।

দেবযানী সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। রুদ্ধ যন্ত্রণা তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল। একটু সামলাইয়া লইয়া ব্যথিত কাতর কণ্ঠে কহিল, "দেখ, আমি অবলা, আমার বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই ; তুমি যা বলেছ, আমি তাই বিশ্বাস করেছি ; তুমি যা' করিয়েছ, আমি তাই করেছি—তুমি আমাকে ত্যাগ করো না।"

হরি। তোমার মত মেয়েকে আমি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারি নে।

দেব। কেন, কেন, আমি কি ?

হরি। তুমি পাপিষ্ঠা।

দেব। তোমাকে ভালবেসে, তোমার অনুগত হয়ে যদি পাপ ক'রে থাকি, তবে আমি পাপিষ্ঠা ; কোন দিকে না চেয়ে—নিজের স্বার্থ, মায়ের স্বার্থ, কোন দিকে না চেয়ে যদি তোমাকেই সার ক'রে আমি পাপ ক'রে থাকি, তবে নিশ্চয়ই আমি পাপিষ্ঠা।

হরি। তুমি যে বেশ বক্তৃতা দিতে শিখেছ দেখছি।

দেব। কাউকে কিছু শেখাতে হয় না, লোকে ঘটনায় প'ড়ে আপনিই শেখে। যেটা প্রাণ থেকে বেরোয়, সেইটিই বক্তৃতা। তোমার শেষ কথা কি ?

হরি। তোমাকে বিয়ে করতে আমি পারি নে।

দেব। তাই যদি তুমি কর্তব্য ব'লে মনে ক'রে থাক, তবে বিয়ে করো না।

হরি। কি করব বল—

দেব। না, আর কিছু বলতে হবে না। আমাদের এই শেষ সাক্ষাৎ। একটা কথা ব'লে দি—

হরি। কি বল ?

দেব। দেওয়ান কাকা না জান্‌তে পারেন, তুমি এ বিবাহে অসম্মত।

হরি। কেন ?

দেব। জানতে পারলে তোমাকে জেলে দেবেন।

হরি। কেন, আমি কি ক'রেছি ?

দেব। তুমি নাকি চুরি করেছ।

হরিপ্রসন্নর বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে সত্যই অনেক টাকা ভাঙ্গিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ সব কথা জানলে কেমন ক'রে ?"

দেব। যে দিন আমরা চ'লে আসি, সে দিন তিনি মাকে বলেছিলেন, আমি আড়াল থেকে শুনিছি।

হরি। তিনি মার কাছে কি বলেছিলেন ?

দেব। তিনি বলেছিলেন, যদি বিয়ে হয়, তখন এই চুরির ব্যাপার চেপে দেলতে হবে।

হরি (সংযে)। এখন উপায় দেবযানি ?

দেব। বোলো আমি রাজি নই তোমাকে বিয়ে করতে।

হরিপ্রসন্ন বিস্মিত নয়নে দেবযানীর পানে চাহিল। দেবযানী কহিল, "আমি একটু কাগজে তোমাকে লিখে দেব, আমি এই বিবাহে অসম্মত।"

হরি। রাগটা গিয়ে ত তোমাদের উপর পড়তে পারে।

দেব। পারে বই কি ; কিন্তু তা'তে আমি ভয় খাই না।

হরি। তোমাদের যদি তাড়িয়ে দেন ?

দেব। দেন, চ'লে যাব।

হরি। তুমি আমার জন্যে এত বড় বিপদ ঘাড়ে ক'রে নিচ্ছ কেন ?

দেব। বিপদ আর কি ?—আমাদের কোন রকমে চ'লে যাবে।

হরিপ্রসন্ন চিন্তামগ্ন হইল। চিন্তান্তে কহিল, "দেখ দেবি, তোমাকে আমি সকল কথা খুলে বলি—তোমাকে আমি ভালবাসি, বিয়ে করতেও রাজি। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, তোমার বা আমার কিছু নেই—সম্বল আমার চাকরিটুকু। তা'ও থাকে আছে, থাকে নেই। কথাটা বুঝে দেখ ; আমি যে জীবন ভোর খেটে মরব, তা'র ফলটা পেতে পাব—সেটা আমি বড় সুখের মনে করতে পারি নে। একটি ছোট মেয়ে যশপুরে আছে। বাপের একটিমাত্র সন্তান, বিষয়-আশয় নগদ টাকা মন্দ নেই। আমার সঙ্গে কথা হচ্ছে—"

দেব। ভালই ত, বিয়ে কর।

হরি। আমি সেই লোভে প'ড়ে—

দেব। এ রকম লোভে সকলেই পড়ে। বিয়েটা হ'লে তোমার আর দুঃখ-কষ্ট থাকবে না।

হরি। কিন্তু একটা আবার গোল লেগেছে।

দেব। কি ?

হরি। কে আবার সেখানে লাগিয়েছে, আমার চাল-চুলো নেই। জীবনের দরুণ বাড়ীখানা যদি কিন্‌তে পারতুম, তা হ'লে কোন বেটা কথা কইতে পারত না।

দেব। কত টাকা হ'লে বাড়ীখানা হয় ?

হরি। তিন শ' টাকার কম যে দেবে, তা' মনে হয় না।

দেব। আমি তোমাকে সে টাকা দিচ্ছি।

হরি। তুমি দেবে ? তুমি কি বল্‌ছ দেবি ?

দেব। কেন, দিতে দোষ কি ? যদি বাড়ীখানা পেলে তোমার সুবিধে হয়—

বলিতে বলিতে সে কণ্ঠ হইতে হার, প্রকোষ্ঠ হইতে চুড় বালা খুলিতে লাগিল। হরি স্তব্ধ হইয়া তাহা দেখিতে লাগিল। অবশেষে কহিল, "তুমি সব গয়না আমাকে দিচ্ছ দেবি ?"

দেব। রেখে আর ফল কি ? তোমার জন্যই ত আমার গয়না।

হরি। তোমারও ত একদিন বিয়ে হবে।

দেব। না, হবে না।

হরি। তুমি বিয়ে করবে না ?

দেব। না।

হরি হাত পাতিয়া গহনাগুলি লইল বটে, কিন্তু পকেটে তুলিল না ; কহিল, "তুমি আমার জন্য শুধু হাত করেচ দেবি, গয়না নিতে আমার মন যাচ্ছে না।"

দেব। নাও, আমার দিব্যি নাও—আমার এতে আর কোন প্রয়োজন নেই।

হরি। অর্থে প্রয়োজন বোধ করে না, এমন মানুষ আমি সংসারে দেখি নি।

দেব। যার আশা নেই, ভবিষ্যৎ নেই, সেই অর্থে কোন প্রয়োজন বোধ করে না।

হরি। যাই হোক, আমি তোমার দান গ্রহণ করলুম—আমার বড় দরকার।

দেব। একটা কাগজে আমি লিখে দেব, গয়না-গুলি তোমাকে আমি তিনশত টাকায় বিক্রী করলুম ; নইলে কেউ তোমাকে কষ্ট দিতে পারে। তুমি বোসো—আমি আসছি।

বলিয়া দেবযানী প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, তার পরিধানে আর নীলাম্বরী সাটী নাই, কবরীতে ফুলমালা নাই। দুইখানি কাগজ হরিপ্রসন্নর হাতে দিল। দেবযানী কহিল, "একখানিতে গয়নার কথা লেখা রইল, আর একখানিতে লিখে দিলুম, আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি নই।"

হরিপ্রসন্ন হাত পাতিয়া কাগজ দুইখানি লইল, কিন্তু যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। দেবযানী যখন প্রণাম করিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইল, তখন হরি কহিল, "তোমার গয়না ফিরিয়ে নাও দেবি, আমি চাই না।"

"তা' না হ'লে ত বাড়ী কেনা হবে না।"

"না হোক—"

"বাড়ী না হ'লে ত বিয়ে হবে না।"

"বিয়ে করতে চাই নে—"

"অধীর হয়ো না; বিয়ে ক'রে সুখী হও।"

বলিয়া দেবযানী প্রস্থান করিল।

২৮

তিলডাঙ্গায় আসিয়া শিবু একখানা মুদীর দোকানে বসিল। তখন মধ্যাহ্ন। শিবুর চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া মুদী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি খাওয়া-দাওয়া হয় নি?"

শিবু। আর ভাই খাওয়া-দাওয়া—

দোকা। এখানে চাল-ডাল আছে—

শিবু। তা' তো আছে—

দোকা। হাঁড়ি, কাঠও পাবেন

শিবু। কি জ্বালা—

দোকা। শুকনো কাঠ, জ্বাল ভালই হবে।

শিবু। এ আবার কি বিপদ্!

দোকা। বিপদ্! ও সব জিনিস আমার দোকানে নেই।

শিবু। বলি, ছিপ আছে?

দোকা। ছিপ্! মাছ ধরা ছিপ্? ও-সব এ গাঁয়ে পাবেন না।

শিবু। তবে তোমাদের গাঁয়ে পাব কি?

দোকা। চাল ডাল নুণ তেল—

শিবু। আরে, সে সব খাবে কি দিয়ে, মাছ চাই ত?

দোকা। ওরে ভুলো, দেখ্ ত ছিপ্-টিপ্ আছে কি না? মশায়ের ত এইখানেই রেঁধে বেড়ে খাওয়া হবে?

শিবু। মাছ পেলেই হবে।

দোকা। ওরে ভুলো, তোর হরিদার বাড়ী থেকে চ'গাছা ভাল ছিপ্ নিয়ে আয়।

নেপথ্যে। (যাই বাবা)।

দোকা। মহাশয়ের মাছ ধরা অভ্যাস আছে?

শিবু। কা'কে এ কথা জিজ্ঞেস করছ? মাছধরা আমার অভ্যেস আছে কি না! আগে মাছেদের জিজ্ঞেস কর গে, তাদের কি অভ্যাস আছে।

দোকা। ওরে ভুলো, তিনগাছা ছিপ্—

শিবু। নদীর ভেতর যেখানে মাছ থাকুক, আমার 'চারে' তখনি চ'লে আসবে।

দোকা। ওরে ভুলো, চারগাছা রে—

দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র ভুলো দু'গাছা ছিপ্ আনিয়া সত্বর হাজির করিল। শিবু তখন গম্ভীরভাবে যন্ত্র পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভুলো মুখগহ্বর বিস্তার পূর্ব্বক পরীক্ষকের বদনপ্রতি চাহিয়া রহিল। দোকানের মালিকও চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া পরীক্ষার প্রণালী দেখিতে লাগিল। সেই সময় জনৈক ক্রেতা কিছু চাউল লইতে আসিয়াছিল, দোকানী এতই অন্যমনস্ক যে, তাহাকে এক সেরের পরিবর্ত্তে তিন পোয়া তণ্ডুল দিল। পরীক্ষার পর শিবু কহিল, "বড় মাছ এ সুতায় টিকিবে না।"

দোকানী। বড় মাছ? ওরে ভুলো, দৌড়ো দৌড়ো—আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—তুই দোকানে বোস

এবার দোকানী একটা ভাল ছিপ লইয়া আসিল। পরীক্ষান্তে শিবু একটু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, ছিপটা মন্দ নয়। তার পর কেঁচোর অন্বেষণে চলিল। ভুলো এবার খুবই ক্ষিপ্রতা দেখাইল। সত্বর সমস্ত যোগাড় করিয়া লইয়া সে সহকারী বা শিক্ষার্থিরূপে মৎস্যকুলরিপু শিবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নদীতীরে আসিয়া শিবু একবার তীক্ষ্ণ-নয়নে চারিদিক্ দেখিল। একখানা জীর্ণ নৌকা "অর্দ্ধ অঙ্গ জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ স্থলে" অবস্থায় পড়িয়াছিল। শিবু তাহার উপরে উঠিয়া মাছ ধরিতে বসিল। শিক্ষার্থী তাহার পিছনে একগাছা ছিপ লইয়া বসিল। শিক্ষক কহিল, "তুই নেমে যা— আমার হাতের গোড়ায় থাকলে মরবি।" ভুলো ক্ষিপ্রতার সহিত লাফাইয়া পড়িল।

অদূরে এক জন জেলিয়া "ক্ষেপলা" জাল নদীতে ফেলিতেছিল। ছোট জাল, বোধ হয়, ছোট মাছই তাহার লক্ষ্য। কিনারা ধরিয়া জাল ফেলিতে ফেলিতে জীর্ণ নৌকার দিকে ক্রমশই সে অগ্রসর

হইতেছিল। কখন হাঁটুজলে, কখন বা কোমর-জলে দাঁড়াইয়া জাল ফেলিতেছিল। যখন শিবুর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন শিবু কহিল, "এখানে জাল ফেলিসনে, তফাৎ দিয়ে যা'—আমার চারের মাছ ভয় পাবে।"

জেলিয়া কহিল,—"এখানে মাছ পাবে না কর্ত্তা।"

শিবু। খুব পাব—আমি পেয়েছি।

জেলে। বড় মাছ?

শিবু। হাঁ রে হাঁ।

জেলে। কত দিন আগে শুনি।

শিবু। সেই যে দিন ঝড় হয়, তার পর-দিন।

জেলে। আজ ছ' দিন আগে ঝড় হয়ে গেছে—

শিবু। না রে না; আমি বড় ঝড়ের কথা বলছি—ন' বছর আগে।

জেলিয়ার ভাব আচম্বিতে পরিবর্ত্তিত হইল। ব্যস্ত হইয়া কহিল, "হাঁ, হাঁ, ন' বছর আগে বড় ঝড় হয়েছিল, ঠিক সাঁঝের বেলা, খুব ম্যাঘ, খুব হাওয়া, চারিদিক্ আঁধিয়ার—আমরা 'না' বেয়ে যাচ্ছিলুম—"

শিবু। আমরাও নৌকা বেয়ে যাচ্ছিলুম।

জেলে। তোমরাও ডুবেছিলে নাকি?

শিবু। আমরা ডুব্‌বো কি রে? আমরা কোথায় ডুবো মানুষ রক্ষে করেছি।

জেলে। রক্ষে করেছ? কা'কে? মরদ না মেয়ে?

শিবু। আমার পিসীকে। পিসী কি মরদ হয় রে! তুই বড় মুখ্যু।

জেলিয়া যেন একটু নিরাশ হইল; কহিল, "তা হ'লে সে তোমার নায়ের লোক!"

শিবু। আমাদের নায়ের হবে কি ক'রে মুখ্যু? আমাদের 'না' ত ডোবে নি।

জেলে। তবে তানারে পেলে কোথা?

শিবু। পেলুম আবার কোথা? আমরা কি তাকে জলের ভেতর খুঁজতে গিছলুম? সে আমাদেরই নায়ের কাছে এসে লেগেছিল।

জেলে। আর একটা নায়ের লোক?

শিবু। বলছি ত হ্যাঁ—জ্বালিয়ে মারলে—মাছ আর 'চারে' এলো না।

জেলে। তানারে নিয়ে তোমরা কি করলে?

শিবু। বাঁচালুম—আগুন জেলে সেক-তাপ দিয়ে বাঁচালুম।

জেলে। বাঁচিয়েছ? তানাকে বাঁচিয়েছ?

শিবু। হাঁ, হাঁ, বাঁচাই নি ত কি 'চার' করেছি?

জেলে। তিনি দেখতে কেমন?

শিবু। ভারি সোন্দর, যেন মা দুগ্‌গা—তুই অমন করছিস কেন জেলের-পো?

জেলিয়া নৌকা ঠেস দিয়া দাঁড়াইল; তাহার হাত হইতে জাল পড়িয়া গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তানারে কোথা পেয়েছিলে?"

শিবু। যেখানে আমরা না বেঁধেছিলুম।

জেলে। সে কোথা?

শিবু। এইখানটা কোথা হবে। রাত্তিরে ঠাওর হয় নি।

জেলিয়া এবার কাদার উপর বসিয়া পড়িল। শিবু তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মাছ ধরার দিকে আর মন দিতে পারিল না। শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যার কথা জিজ্ঞেস করছ, তিনি তোমার কে?"

"আমার মা।"

"দূর! তিনি তোদের ঘরের মেয়ে ন'ন—তাঁর গায়ে অনেক গয়না।"

জেলিয়া একটু তেজের সহিত কহিল, "তিনি আমার মা; তুমি সে কথা বুঝবে না। যদি তুমি সত্যি আমার মায়ের খবর জানো, তবে আমাকে তানার কাছে নিয়ে চল—মা তানার পোকে দেখলেই চিনবেন।"

শিবু স্থির করিল, লোকটা পাগল; কোন উত্তর না করিয়া তাহার পানে কৃপাবর্ষী নয়নে চাহিয়া রহিল। জেলিয়াও হয় ত ভাবিল, শিবু তাহাকে ছলনা করিতেছে। উদাস দৃষ্টিতে আকাশ পানে চাহিয়া সে বলিতে লাগিল,—"আজ এই ন' বছর আমার মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; মা আমার এই জলের ভিতর লুকিয়েছে। কত খুঁজি, তবু পাই নে—আর কি পাব না মাকে?"

এক জন স্নানার্থী পিছন হইতে কহিল, "কি রে রোঘো, তোর মাকে খুঁজছিস?"

"খুঁজছি, পাচ্ছি কই?"

"এ দেশে আর পাবি নে—স্বর্গে গিয়ে যদি ন্যাগাল পাস।"

শিবু জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি খুঁজচে?"

স্নানার্থী। আমাদের জমীদারের পরি-বারকে।

শিবু। তা, জলের ভেতর কেন?

স্নানা। তিনি আর তাঁর মেয়ে জলের ভেতর আছেন।

শিবু। মেয়ের হাত ধ'রে জলে লাফিয়ে পড়েছেন নাকি?

স্নানা। তুমি কোন্ দেশের লোক গা? মেয়ের হাত ধ'রে কেউ সখ ক'রে জলে লাফায় নাকি?

শিবু। কি জানি ভাই, তোমাদের গাঁয়ের সখ কেমন! এই একটা লোক মাছ ধরতে এসে জালটাল ফেলে সখ্ ক'রে কাদার উপর শুয়ে পড়ল—

স্নানা। রোঘো কি মাছ ধরে বেড়াচ্ছে মনে করেছ? ও মাছ ধরে না, মাছ পেলে ছেড়ে দেয়—

শিবু। সেটাও বুঝি একটা সখ?

স্নানা। না গো না, জাল ফেলে ওর মাকে খুঁজছে। নদীর দু'ধারে—ফরিদপুর আর যশর জেলায়—চার ক্রোশ এদিকে চার ক্রোশ ওদিকে জাল ফেলে দিন-রাত খুঁজে বেড়ায়। নদীর গর্ভে ডুবুরির মত নেমে গিয়ে খোঁজে। আজ ন' বছর অবিরাম এই করছে

শিবু। ন' বছর বল্লে? সে সময় কি হয়েছিল?

স্নানা। এত কথার পর কি হয়েছিল! বলে, সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সীতা কার ভার্য্যা। তোমার দেখছি তাই। ন' বছর আগে ঝড়েতে প'ড়ে জমীদারের নৌকা ডুবেছিল তিনি কোন রকমে রক্ষে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী-কন্তে রক্ষে পান নি। তাঁরা জল থেকে আর ওঠেন নি তাই রোঘো—

শিবু। ন' বছর আগে। আচ্ছা, কি মাসে বল ত।

স্নানা। দুর্গা-পূজোর কিছু পরে—আশ্বিনের শেষ।

শিবু। ঠিক হয়েছে; জমীদারের নাম কি বলতে পার?

স্নানা অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায়।

শিবু। একটু লিখে দাও—বড় গোলমেলে নাম।

স্নানা এখন লিখব কি ক'রে? দেখছ চানে এসেছি।

শিবু। তা' বটে। আচ্ছা, পরে দিও।

স্নানা। তোমার দরকারটা কি বল দেখি? তুমি থাকই বা কোথা?

শিবু। থাকি অনেক দূরে—দিল্লি মিল্লি ছাড়িয়ে। আমার দরকার হচ্ছে, মা-ঠাকরুণ ব'লে দিয়েছেন, নামটা লিখে নিয়ে যেতে।

স্নানা। মা-ঠাকরুণটি কে?

শিবু। কে আবার? মা-ঠাকরুণ।

স্নানা। তোমার মনিবের পরিবার?

শিবু। মুনিবও বলতে পার, বাপও বলতে পার।

স্নানা। তিনি দিলি-মিল্লিতে কি করেন?

শিবু। রাজার রাজ্য চালান

স্নানা। কোন্ রাজার রাজ্যি?

শিবু জয়পুর—জয়পুরের মহারাজ বাহাদুর।

স্নানা। তা' তাঁর আমাদের জমীদারের নামে কি দরকার?

শিবু। সেটা তাঁকে জিগ্যেস কর গে না ভাই: খট্ ক'রে টিকিট কেটে চ'লে যাও—

স্নানা। তা' তুমি সে দেশ থেকে চট্ ক'রে চ'লে এসে মট্ ক'রে মাছ ধরতে বসলে কেন?

শিবু। খাব ব'লে। ভাল কথা ভাই, একটা কাজ করতে পার?

স্নানার্থী কয়েকটা ডুব দিয়া লইয়া উত্তর করিল, "কি কাজ?"

শিবু তোমার এই বাবা সিংহী জমীদারের একখানা ফটো দিতে পার? ফটোক নয়, ফটো ফটো—যা'কে তোমরা ছবি বল

স্নানার্থী একটু হাসিয়া উত্তর করিল, "কি হবে?"

শিবু মা-ঠাকরুণ আনতে ব'লে দিয়েছেন।

"আমি কোথা পাব?" বলিয়া তিনি সূর্য্যদেবের দিকে চাহিয়া যুক্তকরে "জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

শিবু কহিল, "তাই ত, ছবি এখন পাই কোথা?"

প্রণামটা সমাধা করিয়া গ্রামবাসী রামচরণ কহিল, "তুমি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বল দেখি।"

শিবুর পেটে আর বড় বেশী লুকান ছিল না; যাহা ছিল, তাহা রামচরণ জেরা করিয়া বাহির করিয়া লইল। বুদ্ধিমান্ রামচরণ সমস্ত কথা শুনিয়া গম্ভীর বদনে কহিল, "আচ্ছা, তুমি মাছ ধর, আমি আসছি। ওরে রোঘো, চট্ ক'রে ডুব দিয়ে নে, আমার ওখানে দুটো পেসাদ পাবি"

২৯

দোকানী মাঝে একবার দেখিতে আসিল, কতগুলা মাছ ধরা পড়িয়াছে। আসিয়া যখন দেখিল, একটি আমিও উঠে নি, তখন সে কুপিত হইয়া

শিবুকে ভর্ৎসনা করিল ; এমন কি, কহিল, কেঁচো ও গোবরের চারের মূল্য সে আদায় করিয়া লইয়া ছাড়িবে। অনেক আশা করিয়া দোকানী আসিয়াছিল, গিয়া দেখিবে, বড় বড় রোহিত পুচ্ছ আন্দোলন পূর্ব্বক রসনাকে আহ্বান করিতেছে। রোহিত-মৎস্যের কোন্ অংশটা সে ভক্ষণ করিবে, তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। এক্ষণে নিরাশ হইয়া ক্রোধের বেগটা শিবুর উপর ফেলিল। শিবু কহিল, "আমি কি করিব ? তোমাদের গাঁয়ের লোক এসে যে জ্বালাতন করছিল !"

"কে এসেছিল রে ভুলো ?"

"পঞ্চায়েত জেঠা।"

দোকানী একেবারে নরম হইয়া গেল ; কহিল, "কেন, কেন ? আমাদের সেই মোকদ্দমার কথা কিছু বলছিলো নাকি ?"

"না।"

দোকানী শিবুর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আচ্ছা ধর ভাই, তাড়াতাড়ি কি ? তবে তোমার খাওয়া-দাওয়াটা হ'লো না, এই আমার ভাবনা।"

"পেটে আমার আধসের গরম পুরি আছে—এবেলা না হ'লে চ'লে যাবে।"

দোকানী প্রস্থান করিল। শিবু নূতন 'চার' ফেলিয়া মৎস্য ধরিতে প্রবৃত্ত হইল। কিছু মাছও পাইল ; তবে রোহিত-জাতীয় কেহ তন্মধ্যে ছিল না। যখন অপরাহ্ণ অতীতপ্রায়, তখন রামচরণ আসিয়া গম্ভীরবদনে ভুলোকে ছিপসহ বাড়ী যাইতে আদেশ করিল। ভুলো অনিচ্ছায় ছিপ উঠাইল এবং মৎস্যগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

যখন সে অদৃশ্য হইল, তখন পঞ্চায়েত শিবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

"শিবচন্দ্র দাস—আমরা মাহিষ্য—আমাদের পাল্টি ঘর—"

"সে পরিচয়ে আমার প্রয়োজন নেই—আমরা কায়স্থ ; এখন তুমি আমার সঙ্গে চলো।"

"সন্ধ্যের মওড়ায় মাছটা খায় ভাল।"

"এখানে তুমি মাছ ধরতে এয়েছ, না, তোমার মায়ের কাজ করতে এসেছ ?"

শিবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রামচরণের পশ্চাদনুসরণ করিল। পঞ্চায়েত তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। বাড়ী দেখিয়া রামচরণের শ্রদ্ধা হইল। বাড়ীর সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা, চালের গোলা, ধানের মরাই, গোয়াল, ঢেঁকিশাল ইত্যাদি রহিয়াছে। লোকজন উঠানে কাজ করিতেছে—গোয়ালরা গো-দোহন করিতেছে, চাষীরা ধান কর্জ্জ লইবার জন্য পঞ্চায়েতের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট উমেদারী করিতেছে। চারিদিকে লক্ষ্মীশ্রী বর্ত্তমান, শিবুর মন বড়ই প্রসন্ন হইল। চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে তাহার মনে উদয় হইল, এরা বেড়ে আছে—আমার মুনিব যেমন দেশ ছেড়ে বিদেশ-বিভুঁইতে চাকরি ক'রে মরে।"

গৃহস্বামী, শিবুকে এক নির্জ্জন ঘরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে তোমার পিসীর কথা রোঘোর কাছে বল্ছে, সে পিসীর বয়স কত হবে ?"

"বিশ পঞ্চাশ হবে।"

রামচরণ দেখিল, শিবু নিরক্ষর নির্ব্বোধ। কহিলেন, "দেখছি বিধাতা তোমাকে বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে পীড়ন করেন নি। আচ্ছা, আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি।"—বলিয়া 'কিরণ কিরণ' বলিয়া চীৎকার করিলেন। ভগিনী কিরণ 'কি দাদা' বলিতে বলিতে উপস্থিত হইল। রামচরণ কহিলেন, "একটা কল্কে নিয়ে আয় ত।" কিরণ অদৃশ্য হইলে রামচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই বয়েস তাঁর হবে ?"

শিবু (সহাস্যে)। তিনি এর চেয়ে ঢের সোন্দর।

রাম। আরে, সোন্দর তিনি ত বটেই, আমি বয়েসের কথা জিজ্ঞেস করছি।

শিবু। বয়েস এই রকম হবে।

রাম। তোমরা তাঁকে পেয়েছিলে ন' বছর আগে আশ্বিন মাসে পূজোর পর—কেমন ?

শিবু। হাঁ।

রাম। ঠিক সন্ধ্যার সময় ?

শিবু। তা' হবে।

রাম। হবে কি ? ঠিক ক'রে বল।

শিবু। কি ক'রে বলব ? ম্যাঘে চারিদিক্ আঁধার, সূয্যি মামা কখন্ যে ডুবেছিল, তা' ঠাওর করতে পারি নি।

রাম। বুঝলুম। আচ্ছা, তোমরা তাঁকে নিয়ে পালালে কেন ?

শিবু। আমরা কোথা তা'কে রেখে যাব ? জলের উপর ?

রাম। কেন, তাঁর বাড়ীতে।

শিবু। তার বাড়ী কোথা, আমরা কি ক'রে জানব ?

রাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারতে।

শিবু। তানার কি আর গেয়ান ছিল ? তিন মাস লাগ্‌ল গেয়ান হ'তে।

রাম। তিন মাস পরেও ত তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারতে?

শিবু। অতশত আমি জানিনে।

রাম। হুঁ। তোমরা নৌকো ক'রে কোথা যাচ্ছিলে?

শিবু। ইষ্টিশনে; তা' নইলে জয়পুরে যাব কেমন ক'রে?

এমন সময়ে রঘু একটা ছোট পুঁটলি হাতে উপস্থিত হইল। রামচরণ তাহাকে বসিতে বলিয়া ভিতরে উঠিয়া গেলেন। কিরণ কক্ষে আনিতেছিল। তাহাকে কহিলেন, "তুই এক কাজ করতে পারিস?"

কির। বল।

রাম। বাবুদের বাড়ীতে তুই আজও যাতায়াত করিস্?

কির। কখন-সখন যাই।

রাম। দু'খানা ফটো সেখান হ'তে যোগাড় করতে পারিস?

কির। কার ফটো?

রাম। বাবুর আর তাঁর স্ত্রীর

কির। আমারই কাছে আছে।

রাম। তুই পেলি কোথা?

কির। সই আমাকে দিয়েছিলেন আমরা দু'জনে একদিনে জন্মেছিলুম। এক বৎসর আমাদের জন্মতিথি উপলক্ষে সই আমাকে তাঁদের ছবি দিয়েছিলেন, আর আমাদের ছবি—

রাম। ছবিখানা আন্ দেখি।

কিরণ তৎপরতার সহিত ছবিখানি আনিল। আঁচল দিয়া সযত্নে ঝাড়িয়া একবার সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া ছবিখানি দাদার হাতে দিল। রামচরণ দেখিলেন, একখানি কৌচের উপর অন্নদাপ্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী পাশাপাশি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তামাকের কথা ভুলিয়া গিয়া রামচরণ ছবিখানি লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

ছবি দেখিয়া রামচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কার ছবি বলতে পার শিবু?"

শিবু। এ লোকটাকে চিনি নে। আর—আর এ যে দেখছি আমার পিসীমা। বাহবা, তুমি জয়পুরে গিয়ে ফটো তুলে এনেছ নাকি?

রাম। এখন তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ, ইনি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া পিসী-মা?

শিবু। ঠিক চিনিছি। আমাকে কেউ সহজে ঠকাতে পারবে না।

রাম। তা' ত দেখতেই পাচ্ছি। এখন তুমি এক কাজ কর—রোঘোকে সঙ্গে নিয়ে জয়পুরে ফিরে যাও—

শিবু। ওকে নিয়ে যাব কেন?

রাম। দেখ, তুমি যেমন তোমার মনিবদের বাপ-মা বলেছ, রোঘোও তেমনি ওর মনিবদের বাপ-মা বলেছে। আগে ও নৌকোর দাঁড়ি ছিল। ওর মার নৌকো ডুবে যাবার পর হ'তে রোঘো আর নৌকোর কাজ করে না—শুধু ওর মাকে খুঁজে বেড়ায়। তুমি ওকে ওর মার কাছে নিয়ে যাও, ওকে বাঁচাও।

শিবু। ওর খরচা কে দেবে?

রাম। আমি দেবো।

শিবু। কিন্তু আমার দু' চার দিন দেরী হবে।

রাম। কেন, মাছ ধরতে হবে না কি?

শিবু। মায়ের বাড়ীতে এখনো যাওয়া হয় নি; একবার যেতে হবে।

রাম। তাঁর বাড়ী কোথায়?

শিবু। চাল্‌দেভাঙ্গা—এখান হ'তে এক বেলার পথ।

রামচরণ চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা শিবু, তোমার পিসী কেন বাড়ী ফিরে আসছেন না বলতে পার?"

শিবু। আসবেন কি ক'রে? তাঁর কি আর দেশের নাম মনে আছে?

রাম। কেন, কি হয়েছে?

শিবু। সব ভুলে মেরেছে—কত ডাক্তার বদ্দি—

রাম। ও: বুঝিছি। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! শিবু! তুমি ছবি-টবি নিয়ে আজই চ'লে যাও—যদি এই সব দেখে শুনে তাঁর কিছু স্মরণ হয়।

শিবু। বলেছি ত আমার দু'চার দিন দেরী হবে।

রামচরণ পুনরায় চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, একবার বাবুকে সকল সমাচার দিয়া আসেন। কিন্তু শিবুর মত একটা নির্ব্বোধের কথার উপর নির্ভর করিয়া জমীদার বাবুর শোক নূতন করিয়া জাগাইয়া দেওয়া সমীচীন বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন না। হয় ত তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, এমন কি, দেওয়ান বাবুও তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন। আর যদি শিবুর কথা সত্যই হয়, অর্থাৎ যদি তাহার পিসী সত্যই জমীদার-গৃহিণী হ'ন, তাহা হইলেও কি এ স্মৃতিহীনা পাগলিনীর সংবাদ

জমীদার-বাবুকে দেওয়া উচিত হইবে? হয় ত তাঁহাকে আরও শোকার্ত্ত করিয়া তোলা হইবে। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া রামচরণ আপাততঃ অন্নদাপ্রসাদকে কোন সংবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। নামধাম শুনিয়া ছবি দেখিয়া যদি জমীদার-গৃহিণীর নষ্ট স্মৃতি ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তিনি নিজেই ত গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। তখন কাহাকেও কিছু করিতে হইবে না। এই পরামর্শটা সমীচীন বলিয়া তাঁহার মনে হইল। চিন্তান্তে কহিলেন, "আচ্ছা, তাই হবে, তোমার সঙ্গে দু'চার দিন বাদে রঘু যাবে; এখন তোমার বাবার কাছে ছবি-টবিগুলো পাঠিয়ে দি।"

"বাবার কাছে নয়, মার কাছে।"

"তোমার মার নাম কি?"

"সে সব আমার ঠাওর নেই। এই খাম নাও, ঠিকানা লেখা আছে—পড়্‌তে পারবে ত, দেখ।"

বলিয়া শিবু একখানা খাম ফেলিয়া দিল।

রামচরণ খামখানি লইয়া ঠিকানাটি পাঠ করিলেন। পরে তাহা বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখিয়া রঘুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রোঘো, তুই নদীর ভেতর হ'তে জালে বা কাঁটায় কাপড়-চোপড় কি তুলেছিলি না?"

"হাঁ, দিদিমণির দুটো ঘাগরা।"

"সে দুটো কোথা?"

"আমারই কাছে আছে—দেওয়ানজি নিলে না, ফিরিয়ে দিলে।"

"কাল সকালে সে দুটো নিয়ে আসিস্—এখন যা।"

বৃক্ষাশ্রয়ে বসিয়া হরিপ্রসন্ন, দেবযানীর কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার হৃদয় পাষাণে গঠিত নয়। মৃত্তিকার নিম্নে জল, তবে মাটী না সরাইলে জল পাওয়া যায় না। কোথাও অনেক নীচে জল, কোথাও বা অল্প নীচে জল। জল আছে সর্ব্বস্থানে, তবে আবরণ-অন্তরালে। মানুষমাত্রেরই প্রাণ আছে, দয়া আছে; তবে সে সব ক্ষেত্রবিশেষে কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন থাকে। কোন ক্ষেত্রে ফুৎকারে এ আবরণ সরিয়া যায়, কোন ক্ষেত্রে ভূকম্পনের প্রয়োজন হয়। হরিপ্রসন্নর মনের উপর যে মলামাটী সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা দেবযানী সরাইল। বুঝি সব সরাইতে পারিল না, তাই হরিপ্রসন্ন তখনও গহনা লইয়া বসিয়া রহিল। দেবযানী উৎসের দ্বারে আঘাত করিয়াছে, কিন্তু আবর্জ্জনা সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিতে পারে নাই। নির্ম্মল স্বচ্ছ বারি বাহির হইবার জন্য ভিতর হইতে দ্বারপথে আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু পথ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না থাকায় প্রবাহের বারি ছুটিতে পাইল না।

চারিদিকে অন্ধকার। হরিপ্রসন্ন সেই অন্ধকার-মধ্যে বসিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে দেবযানীর বা অপর কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিল না, উদ্যানে তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু সে বসিয়া রহিল। ফুলের গন্ধ বায়ু-তরঙ্গে বাহিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ গন্ধময় করিল। হরিপ্রসন্নর অন্ধকারাবৃত হৃদয়েও ফুলের গন্ধ প্রবেশ করিল। সে সৌরভে আকুল হইয়া পুষ্পবৃক্ষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবযানী তাহার ঘরে নাই। উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল; সেই দীপালোকে দেখিল, একখানা কাগজ টেবিলের উপর চাপা দেওয়া রহিয়াছে। হরিপ্রসন্ন ক্ষিপ্রহস্তে কাগজখানা টানিয়া লইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল—

"মা, আমি চল্‌লুম—এ জীবনে আর দেখা হবে না। কেন আমি মরতে যাচ্ছি, তা' বলব না—এ জীবনে নয়, পরজন্মেও নয়। আমার সকল অপরাধ ভুলে যেও মা, আমাকে ক্ষমা কোরো।

হরিপ্রসন্ন দাদাকে বিয়ে করতে আমি রাজি নই। কেন নই, তা'ও বলব না।

আমার গয়নাগুলি হরিপ্রসন্ন দাদাকে বিক্রি করেছি তিন শ' টাকায়। টাকা আমার কাছে আছে।

আবার বলি মা, তোমার আদরের মেয়েকে ক্ষমা কোরো।

সেবিকা দেবযানী।"

পত্র পড়িয়া হরিপ্রসন্নর মাথা ঘুরিয়া গেল। উৎসমুখে যে সব আবর্জ্জনা সঞ্চিত ছিল, তাহা সজোরে নিষ্কাশিত হইল,—হরি গহনাগুলি ফেলিয়া রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নদীর দিকে ছুটিল। নদী তখন শীর্ণকায়া। খানিকটা নামিয়া যাইবার পর হরিপ্রসন্ন নক্ষত্রদীপ্ত অস্পষ্টালোকে দেখিল, কে এক জন দূরে আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভাবিল, এই ব্যক্তিই দেবযানী।

দেবযানীই বটে। উদ্যানে বসিয়া যে মুহূর্ত্তে হরিপ্রসন্ন প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি পাপিষ্ঠা—আমি তোমাকে বিবাহ করিব না, সেই মুহূর্ত্তেই দেবযানী স্থির করিয়াছিল, সে এ ব্যর্থ জীবন ত্যাগ করিবে। এখন তাহার ভাবিবার বা পিছাইবার কিছুই ছিল

না। বিলম্বও তাহার সহিতেছিল না। চিঠিখানি তাড়াতাড়ি লিখিয়া রাখিয়া নদীর ধারে আসিল এবং গলায় বস্ত্র দিয়া যুক্তকরে ভগবানকে একটু ডাকিল। কহিল, "আমি মূর্খ, অজ্ঞান, কখন তোমাকে ডাকি নি; আজ কি করছি, তা'ও বুঝতে পারছি নে; আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরো দীননাথ।" তাহার চক্ষুর জল মাটীতে পড়িল। শুনিয়াছি, ভক্তের নয়নাশ্রু বিস্তৃত হইলে ভক্তাধীন ভগবান্ স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি এ অবলার অন্তিম আবেদন শুনিতে সম্ভবত ছুটিয়া আসিয়া থাকিবেন।

দেবযানী ডুবিল। উপরের জল স্থির হইল—সকল চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া স্রোত বহিয়া চলিল। কূলে দাঁড়াইয়া হরিপ্রসন্ন যখন দেখিল, দেবযানী ডুবিয়া গিয়াছে, তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে আকুল চীৎকারও কালস্রোতে ডুবিয়া গেল—শুনিতে, নিকটে বা দূরে কেহ ছিল না। হরিপ্রসন্ন কাহারও সাহায্যের প্রত্যাশায় চীৎকার করে নাই—চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটিয়া আসিয়া জলে পড়িল। শীর্ণকায়া নদীর গর্ভ অন্বেষণ করিয়া সদ্যোনিমজ্জিতা দেবযানীকে তুলিতে বড় বিলম্ব হইল না, স্বল্পকাল-মধ্যে দেবযানীর অচৈতন্য-প্রায় দেহ বাহুমধ্যে ধরিয়া হরিপ্রসন্ন কূলে উঠিল। সামান্য শুশ্রূষায় তাহার জ্ঞান-সঞ্চার হইল; তখন সে উঠিয়া বসিয়া কহিল, "তুমি কেন আমাকে বাঁচাইলে?"

হরি। তোমার দেহ, তোমার প্রাণ আমার—তাহা নষ্ট করবার তোমার ত কোন অধিকার নেই দেবযানি।

দেব। আমার দেহপ্রাণ ত তোমার গ্রহণযোগ্য নয়।

হরি। আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর।

দেব। তোমার অপরাধ? তুমি ত কোন দোষ কর নি।

হরি। আমি তোমাকে বিপথে এনে আবার আমিই তোমাকে তিরস্কার করিছি; তবু তুমি আমাকে কিছু বলো নি। তুমি কত বড়, আর তোমার পাশে আমি কত ছোট।

দেব। ও-সব কথা বোলো না—

হরি। দেবি, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। ধনের লোভে প'ড়ে আমি তোমার মত সর্ব্ব-ত্যাগীকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলাম। আমি কতবড় পাষণ্ড—

দেব। ও-রকম ক'রে বলো না, আমার কষ্ট হয়।

হরি। কি করব দেবযানি, আমার প্রাণ ফেটে অনুতাপের আগুন বেরিয়ে পড়ছে। যদি আজীবন তোমাকে ভালবেসে তোমাকে কখন সুখী করতে পারি, তবেই এ আগুন নিববে—

দেব। এখন ওঠ—বাড়ী চল—না জানি মা কত ভাবচেন।

একদা মধ্যাহ্নে সুশীলাসুন্দরী, শোভনাদের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, গৃহ-স্বামিনী আহারে বসিয়াছেন। শোভনা কহিলেন, "আসুন, আসুন—ওরে আসন দে—বামুনঠাকুরকে ভাত আনতে বল্—"

সুশীলা। আজ এ ঢং কেন? ক'দিন আসি নি ব'লে বুঝি?

শোভনা। তাই বলি, আজ সকাল হ'তে আমার বাম অঙ্গ নাচছে কেন

সুশীলা। তুই যে আজ বড় ভাত খাচ্ছিস?

শোভনা। কেন খাব না?

সুশীলা। আ সে একাদশী।

শোভনা। তুমি কি খেয়েছ?

সুশীলা। অন্ন ছাড়া আর সব।

শোভনা। তাকে একাদশী-ব্রত বলে না।

সুশীলা। তবে কা'কে বলে ভট্‌চাজ মশাই?

শোভনা। একাদশীকে হরিবাসর বলে কি না?

সুশীলা। তা' ত বলে।

শোভনা। তোমার ক'টা ইন্দ্রিয়?

সুশীলা। দশটা, মন নিয়ে এগারটা।

শোভনা। মন হচ্ছে যেমন দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা, তেমনি তোমার দশটি তিথির রাজা হচ্ছে একাদশী। সে দিন হরিবাসর করিবে।

সুশীলা। বুঝলুম না।

শোভনা। একাদশীর দিন শুধু উপবাস করলেই হ'ল না, সে দিন তোমার দশ ইন্দ্রিয় নিয়ে হরির সঙ্গে বাস করতে হবে। কৃষ্ণ-পক্ষে অর্থাৎ দুঃখের দিনে, শুক্লপক্ষে অর্থাৎ সুখের দিনে, মনকে তাহার অনুচর দশ-ইন্দ্রিয় নিয়ে হরির সঙ্গে উপবাস করতে হবে। তবে ত হরিবাসর হবে; নইলে দেহকে ক্লেশ দিয়ে নিরাহারে থাকলে আত্মার কি কল্যাণ হবে? দেহের কিছু হ'তে পারে, তার সঙ্গে হরিবাসরের কোন সম্বন্ধ নেই।

সুশীলা। তোর কাছে আজ এক ছিষ্টিছাড়া কথা শুনলুম—নিশ্চয়ই তোর মন-গড়া। এখন তুই হাত ধুয়ে আয়—কথা আছে।

শোভনা হস্ত-প্রক্ষালনাদি করিয়া সুশীলাকে কহিলেন, "তোদের একাদশীতে পাণদোক্তা খাওয়া নিষেধ আছে?"

সুশী। একেবারেই না।

শোভ। "তা হ'লে বেশ সুবিধা ক'রে নিয়েছ— এখন পাণ খাও।"—উভয়ে ঘরে আসিয়া বসিলেন।

শোভ। এইবার মুখ খোল।

সুশী। তুই যে পাণ দিয়ে মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছিস।

শোভ। তোর মুখ বন্ধ করবার এত বড় ওষুদটা প্রভাত বাবুর বুঝি জানা নেই?

সুশী। খুব জানা আছে। এসেই আগে মুখে পাণ ঠেসে দেয়, নইলে তার কথা কবার সুবিধে হয় না। এত বকতেও পারে ভাই। একবার শীতকালে ছুটীর দিন দুপুরবেলা আমরা শুয়েছিলুম। কর্ত্তা বোকে যেতে লাগলেন; আমার যখন কাণ ঝালাপালা হয়ে উঠল, তখন আমি চুপিচুপি স'রে পড়লুম। বালিশটা দেখে তিনি মনে করলেন, আমি বুঝি শুয়ে আছি। তিনি সমানে বোকে যেতে লাগলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে দেখি, তিনি সমানে রসনা চালাচ্ছেন। আমাকে বাইরে থেকে আসতে দেখে একেবারে অবাক। এতই বকে ভাই!

শোভ। তুমিই কোন্ কম। এখন কাজের কথা বল।

সুশী। হা, শোন। আমি সকল কথা তাঁকে খুলে বলেছিলুম—

শোভ। তোমার পেটে কবে কথা থাকে ভাই?

সুশী। কেমন ক'রে থাকবে? যুধিষ্ঠির তাঁহার গর্ভধারিণী কুন্তীকে কি অভিসম্পাত দিয়েছিলেন তা' ত জান, আমি কেমন ক'রে রমণী হয়ে সে অভিসম্পাতের হাত এড়াব? সাধে আমার পেটে কথা থাকে না।

শোভ। আহা, কি যুধিষ্ঠিরের ভক্ত গো!—যেন দ্রৌপদী। এখন কাজের কথা বল্।

সুশী। তিনি আমার কাছে সব কথা শুনে বড় বড় ডাক্তার-বদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। এক জন ডাক্তার একটি ঘটনার কথা বলেছিলেন।

শোভ। ঘটনাটি কি শুনি।

সুশী। একটি সাহেবের কথা—তাঁরও স্মৃতি-বিভ্রম ঘটেছিল। তবে তাঁর পীড়া খুব কঠিন। পুষ্পের কথা শুনে বলেছেন, এ রোগ অতি সহজ; আত্মীয়স্বজনের দর্শন পেলেই স্মৃতি ফিরে আসবে।

শোভ। সাহেবের ঘটনাটা কি শুনি?

সুশী। সে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলি। এক ধনবান্ সাহেব জাহাজের ডেকে বেড়াতে বেড়াতে প'ড়ে যান—

শোভ। জলে নাকি?

সুশী। না, ডেকের উপর। তখন খুব ঝড় হচ্ছিল, জাহাজ দুলছিল; তিনি পা ঠিক রাখতে না পেরে প'ড়ে যান। প'ড়ে গিয়েই অজ্ঞান। তার পর দেখা গেল, তাঁর পক্ষাঘাত হয়েছে, আর স্মৃতিশক্তি এককালে নষ্ট হয়েছে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর ডাক্তার এক ক'রে চিকিৎসা করালেন, কিছুই হ'ল না। শয্যায় শুয়ে প'ড়ে থাকেন, নার্সে শুশ্রূষা করে—

শোভ। আগেকার কোন কথাই তাঁর স্মরণ ছিল না?

সুশী। না; তবে ভয় ভালবাসা এ সব বোধ হয় ছিল। যাই হো'ক, এই অবস্থায় তাঁর চার বছর কাটল। এখন তাঁর বিষম ভয় ছিল বানরকে। বানর দেখ্‌লেই তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠতেন—

শোভ। শুনিছি বটে, কোন কোন বড়লোকের এই রকম একটা উপসর্গ থাকে। সেনাপতি রবার্ট বিড়াল দেখলে আঁতকে উঠতেন, আর আমাদের সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র নাকি কেন্নো দেখলে সে অঞ্চল ছেড়ে পালাতেন।

সুশী। সাহেবটি বানর দেখলে ভয় পেতেন বটে, কিন্তু এই বানরই আবার তিনি তাঁর বাগানে পুষে-ছিলেন। এক দিন একটা বানর খাঁচা থেকে কোন রকমে মুক্তি পেয়ে একেবারে সাহেবের জান্‌লার উপর হাজির। সে সময় তাঁর ঘরে কেউ ছিল না। তিনি বানর দেখে মহাভীত হয়ে পড়লেন, কিন্তু উত্থানশক্তি-রহিত, পালাবার উপায় নেই। বানর এ-দিক ও-দিক ঘুরে অবশেষে সাহেবের শয্যার উপর লাফিয়ে উঠল। তা দেখে সাহেব এত ভয় পেলেন যে, রোগের বাঁধন আর তাঁকে বিছানায় ধ'রে রাখতে পারলে না— তিনি পালঙ্ক হ'তে লাফিয়ে প'ড়ে একেবারে বাইরে; সেখানে সকলে তাঁকে দেখে অবাক্। যে ব্যক্তি চারি বৎসর শয্যা ত্যাগ করেন নি, পূর্ব্বের কোন কথা স্মরণ করতে পারেন নি, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে রোগমুক্ত—

শোভ। বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ত।

সুশী। ডাক্তার তাই বলেছেন, যে জিনিসটাকে পুষ্প অত্যধিক ভয় করে বা ভালবাসে, সেই জিনিসটা দেখলেই সে আবার স্মৃতি ফিরিয়ে পেতে

পারে। আমার মনে হয়, ছবিটবিগুলো পেলেই কার্য্যোদ্ধার হবে। কিন্তু পাঠিয়েছ যে গাধাকে—

শোভ। দেখ দিদি, মানুষের শক্তির উপর আমার বড় বেশী বিশ্বাস নেই। যখন সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা হয়, তখন কোন্ ঘটনার ভিতর দিয়ে কাহার দ্বারা যে কার্য্যসিদ্ধি হয়, তা' কেউ চিন্তা ক'রে উঠতে পারে না।

এমন সময় সদর-দরজায় ঘা পড়িল। দাসী সোফিয়া গিয়া দেখিল, ডাক-পিয়ন চিঠি নিয়ে এসেছে। একটা পার্শেল ছিল—আসিতেছে তিল-ডাঙ্গার এক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে। উভয়ে ক্ষিপ্রহস্তে পার্শেলটা খুলিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, দুইটি ছোট ফ্রক ও একখানি ফটো তন্মধ্যে রহিয়াছে। ফ্রকের ভাঁজে একখানি কাগজ ছিল তাহাতে পুষ্প ও তাঁহার স্বামি-কন্যার সমস্ত পরিচয় দেওয়া আছে। পুষ্পের স্বামী অন্নদাপ্রসাদ এক জন বড় জমীদার, তাঁহার নাম শোভনার অপরিচিত নয়। কন্যার নাম ও বয়স লিখিয়া দিতে লেখক বিস্মৃত হ'ন নাই; কিন্তু একটা কথা লিখিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন,—অন্নদাপ্রসাদ বর্ত্তমান কালে জীবিত, না মৃত। যাই হউক, এই সব কাপড় চোপড়ের সম্মুখে উভয়ে স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন মৃতদেহ আগলাইয়া বসিয়া রহিয়াছেন একটা বড় ঘরের শোকাবহ ইতিহাস তাঁহাদের সম্মুখে; যাহারা এই নাটকে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ সম্ভবতঃ মহাপ্রস্থান করিয়াছেন—বুঝি একমাত্র পুষ্পই জীবিত। আর সেই পুষ্পেরই বা কি দশা এখন! অর্থ, পদ, স্মৃতি, বুদ্ধি, আশ্রয় হারাইয়া সে এক্ষণে পরগৃহবাসী, পরান্নভোজী যাহার অনুগ্রহলাভার্থে শতশত ব্যক্তি এক দিন লালায়িত হইত, সে এখন পরের মুখাপেক্ষী। শোভনার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল; তিনি অধীর হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া পুষ্পের ঘরে উপস্থিত হইলেন, পুষ্প তখন কার্পেটে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি তুলিতেছিল। শোভনা পুষ্পকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। পুষ্প হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন দিদি?"

"তুই যে আমার ছোট বোন!"

কাজল কহিল, "আর আমি বুঝি কেউ নই?"

"তুই তোর মাসীর, আমি কেন তোকে আদর করব রে?"

পুষ্প তখন কাজলকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার হয়েই, চিরদিন থেকো।"

পিছন হইতে সুশীলা কহিলেন, "ও কি শ্বশুর-বাড়ী যাবে না?"

"যাবে বই কি তখনও কাজল আমারই থাকবে। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

৩২

সুশীলা যখন প্রস্থান করিলেন, তখন বেলা তিনটা। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, তিনি পুনরায় সন্ধ্যার পর আসিবেন।

তারাপদ কলেজ হইতে আসিলে শোভনা কহিলেন, "আজ তোমার রাম বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, সন্ধ্যার পরই যাবে।"

তারা। কই, আমি ত কিছু শুনি নি

শোভ। গেলেই শুনতে পাবে।

তারা। তোমাদের কোন মতলব আছে নাকি?

শোভ। আমরা গোবিনজির আরতি দেখতে যাব

তারা। হা' আমি বাড়ী থাকলে তোমাদের ভক্তির পথে কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা আছে কি?

শোভ। আছে বই কি। তুমি একা বাড়ীতে ব'সে থাকলে মন আমার চঞ্চল হবে

তারা। তবে যাব, কিন্তু খেতে পাব তা না, তবু [illegible] এসে তোমাদের গাড়ি—

শোভ। সত্যি [illegible] না গা না, আমি কি মিছে ক'রে তোমাকে সরাচ্ছি? সত্য দিদি আমাকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, এই দেখ না—

তারা। তা তিনেই লিখুন বা তুমিই লিখে থাক, আমি তোমার হুকুমমত সন্ধ্যার পরই যাব। তোমরা তবে বাত্রি ক'রো না।

সন্ধ্যার পর সুশীলা গাড়ী লইয়া আসিলেন এ বাড়ীর তিন জনে প্রস্তুত ছিলেন চারিজনে যাত্রা করিলেন। গোবিনজির মন্দির মহারাজার প্রাসাদ সংলগ্ন দেশবিখ্যাত মন্দিরের বর্ণনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। বিগ্রহ বহু প্রাচীন—বৃন্দাবন হইতে অত্যাচারের ভয়ে সরাইয়া এখানে আনা হইয়াছিল। আরতি শেষ হইলে শোভনা বিগ্রহ-পদতলে প্রণাম করিয়া মুদ্রিতনয়নে যুক্তকরে কহিলেন, "ঠাকুর, আমি নিজের জন্যে কখন তোমার দ্বারে প্রার্থী হই নি, আজ এই অনাথিনীর জন্যে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। তুমি যে

দীনশরণ্ অনাথের নাথ, এ দীন কাঙ্গালকে, এ নিরাশ্রয়াকে আশ্রয় দেও ঠাকুর।"

আরতি দেখিয়া সকলে ফিরিলেন। বাসায় আসিয়া শোভনা দেখিলেন, তারাপদ নাই। তখন তাঁহারা চারিজনে তারাপদর বড় ঘরে আসিয়া বসিলেন এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন। ঘরে একটা আলো জ্বলিতেছিল, আরও একটা আলো শোভনা জ্বালিলেন। তার পর পুষ্পের পার্শ্বে বসিয়া সুশীলাকে ইঙ্গিত করিলেন। সুশীলা কহিলেন, তুই সে কাপড় গয়না-গুলো আগে পরিয়ে দে। শোভনা তৎপরতার সহিত সেগুলি বাহির করিয়া পুষ্পকে বস্ত্র-অলঙ্কারে সাজাইলেন। পুষ্প কহিল, "এ সব কেন দিদি ?"

"তুই যে শ্বশুরবাড়ী যাবি বোন ."

"সেই যেমন একবার পাঠিয়েছিলে ?—আমি যাব না।"

শোভনা, পুষ্পের রক্তপদ্মদলতুল্য ওষ্ঠাধরে চুম্বন দান করিয়া কহিলেন, "কত পুণ্য করলে তোর মত বোন পাওয়া যায় পুষ্প !"

পুষ্প কহিল, "আর তোমার মত দিদি ?"

সুশীলা বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় রোগীর নিকটে একখানি স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া কহিলেন, "তোমরা বড় গোল করছ—একটু চুপ কর।" পুষ্প, কাজলের পার্শ্বে একখানি কৌচের উপর উপবিষ্ট ছিল।

সুশীলা। পুষ্প, তুমি যে কাপড়খানি পরেছ, এখানি কার ?

পুষ্প। আমার।

সুশী। আর গয়না ?

পুষ্প। আমার।

সুশী। সব গয়না ?

পুষ্প। হাঁ, সবই আমার।

সুশী। আচ্ছা, এ সব গয়না ছাড়া তোমার আর কোন গয়না ছিল ?

পুষ্প। তা' বল্‌তে পারি নে

সুশী : আচ্ছা দেখ দেখি—

বলিয়া সুশীলা ফটোখানা দেরাজের ভিতর হইতে টানিয়া নিলেন। ফটোর ভূরিভাগ হস্ত দ্বারা চাপিয়া রাখিয়া বেদগর্ভার মাথার ও কাণের গহনা দেখাইলেন। পুষ্প উঠিয়া আসিয়া গহনাগুলি ছবিতে দেখিল, কিন্তু চিনিতে পারিল না। বলিল, "ও সব গয়না কা'র, আমি জানি নে।"

সুশীলা সে কথা ছাড়িয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ইন্দ্রপুর কোথা জান ?"

পুষ্প চিন্তা করিল। চিন্তান্তে কহিল, "নাম শুনিছি ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক ক'রে কিছু বল্‌তে পারছি নে।"

সে প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়া সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানা কার ছবি বল দেখি ?"

বলিয়া তিনি বেদগর্ভার ছবি দেখাইলেন, অর্দ্ধাংশ হস্ত দ্বারা চাপিয়া রাখিলেন। নিজের ছবি দেখিতে দেখিতে পুষ্পের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। কহিল, 'এ আমার ছবি, তুমি কোথা পেলে ?"

সুশীলা। কেমন ক'রে জান্‌লে, এ তোমার ছবি ?

পুষ্প এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিল। গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার ছবি কোথা পেলে ?"

কণ্ঠস্বর প্রভুত্বব্যঞ্জক ; সুশীলা চমকিত হইলেন। কহিলেন, "বল্‌ছি ; এ ফটোর পিছনে কি লেখা আছে, প'ড়ে দেখ দেখি।"

"এ যে আমার হাতের লেখা।"

কণ্ঠস্বর তীব্র। পশ্চাদ্ভাগে লেখা ছিল—"সোদ-রাধিকা সতীরাণী করকমলে—বেদগর্ভা।"

"বেদগর্ভা ! সতীরাণী ! আমি যে চিনি, আমি যে তাদের জানি, দাঁড়াও, মনে করি।"

কিন্তু মনে ক'রে উঠতে পুষ্প পারিল না। দর্শকেরা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন, পুষ্প কিছুই স্মরণ করিতে পারিল না, তখন তাঁহারা ফ্রক দুইটি বাহির করিলেন। ফ্রক দুইটি নাড়িয়া দেখিবামাত্র পুষ্পের চক্ষু স্থির হইল ; আয়তলোচন আরও বিস্তার করিয়া জামা দুইটির পানে সে চাহিয়া রহিল। সুশীলা কালবিলম্ব না করিয়া কহিলেন, "এ যে তোমার মেয়ে বেণুর জামা—বেলমতিয়া—স্মরণ হচ্ছে না ? পাঁচ বছরের মেয়ে নৌকো ক'রে আসছিল—ঝড়-বৃষ্টি অন্ধকার—মধুমতী গজরাচ্ছে—তোমার স্বামী অন্নদাপ্রসাদ তোমাদের সঙ্গে আসচেন—মনে পড়ছে না ? এই দেখ তোমার স্বামীকে—"

বলিয়া তিনি উজ্জ্বল দীপালোকে অন্নদাপ্রসাদের ফটো দেখাইলেন। যে ব্যগ্রতা, যে আগ্রহ লইয়া পুষ্প ছবি দেখিল, তাহা অবর্ণনীয়। সমস্ত শক্তি তাহার চক্ষুতে, সমস্ত রক্ত তাহার মাথায়। পুষ্প দেখিতে দেখিতে চাৎকার করিয়া উঠিল, "এই যে আমার দেবতা, এই যে আমার সর্ব্বস্বধন।" বলিতে বলিতে পুষ্প হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া পড়িল।

চৈতন্যলাভ করিয়া পুষ্প যখন উঠিয়া বসিল, তখন

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইবার বল দেখি, এ জামা দুটি কার?"

"আমার মেয়ে বেলুর।"

"তোমার নাম?"

"বেদগর্ভা।"

"তুমি এখানে এলে কেন?"

বেদগর্ভা নীরব। চিন্তান্বিত হইয়া কৌচের উপর বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে আর বিরক্ত করা যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া সুশীলা উঠিলেন।

৩৩

সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে বেদগর্ভা, শোভনাকে কহিলেন, "দিদি, আমি বাড়ী যাব।"

শোভ। তোমার বাড়ীতে তুমি যাবে বই কি বোন।

বেদ। আজই যাব।

শোভ। আজ কি ক'রে হয়? সঙ্গে লোকজন দিতে হবে ত।

বেদ। তুমি যাকে হয় দেও—আমি আর থাকৃতে পারছি না।

শোভ। এক জন লোকে ত হবে না—দু'জন চাই। এক জন মেয়েমানুষ সঙ্গে নিতে হবে ত।

বেদ। আমি সমস্ত খরচ দেব।

শোভ। খরচের জন্যে ভাবনা নেই, লোকের জন্যে ভাবনা।

বেদ। আমার বাড়ী কি এখান হ'তে অনেক দূরে?

শোভ। রেলে তিন দিনের পথ।

বেদ। এত দূরে আছি! এ দেশটার নাম জয়পুর না?

শোভ। হাঁ।

বেদ। দিদি, এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকতে আমার ইচ্ছা করছে না; তুমি এখনি আমার যাবার বন্দোবস্ত কর, নইলে আমি একা চ'লে যাব।

শোভনা বড় মুস্কিলে পড়িলেন। কহিলেন. "সোফিয়াকে না হয় সঙ্গে দিলুম, কিন্তু এক জন পুরুষ ত চাই; তা' আবার যে সে লোক হ'লে হবে না—চালাক-চতুর জানাশুনা লোক চাই।"

বেদগর্ভা কহিলেন, "আমাকে এখানে গাড়ীতে তুলে দিও, আমি একেবার যশোরে গিয়ে নামব।"

শোভনা (সহাস্যে)। তা' হবার যো নেই—অনেকবার গাড়ী বদলাতে হবে। হ্যাঁরে, কাজল, কা'কে সঙ্গে দেওয়া যায় বল্ দেখি?

কাজল। জীবনের মা সে দিন বলছিল, তার ছেলে নাকি দু'চার দিনের মধ্যে দেশে যাবে।

শোভনা। সত্যি নাকি? আমি এখুনি তাকে ডাকাচ্ছি।

জীবনের মাকে ডাকিতে লোক গেল। তা'র বাড়ী যশোহর জেলায়, ইন্দ্রপুর হইতে বড় বেশী দূরে হইবে না। পথঘাট জীবনের জানা আছে, লোকটাও ভাল, তবে অলস। সে যদি যায়, তা' হ'লে শোভনা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "জীবনের মা আসছে, একটু দেরী হ'তে পারে তা'র ছেলে আজ দেশে যাবে কি না, তাই সে ব্যস্ত।"

জীবনের মা আসিয়া যখন শুনিল, শোভনার গরজ, তখন সে কহিল, "যাওয়া-আসার খরচ যোগাড় হবে, তবে ত সে দেশে যাবে। যোগাড় হোক, তখন একটা দিন দেখে যাবে।"

কাজেই শোভনাকে যাওয়া-আসার ভাড়া স্বীকার করিতে হইল। তখন জীবনের মা আহ্লাদে আট-খানা হইয়া কহিল, "আমি এখুনি ছেলেকে ব'লে সব ঠিক করছি।"

শোভনা কহিলেন, "আর শোন জীবনের মা, দু'টোর গাড়ীতে যেতে হবে, পাঁচটায় নয়।"

আচ্ছা, বলিয়া লুব্ধা প্রস্থান করিল।

বেদগর্ভা কহিলেন, "দিদি, বড় আদর-যত্নে ছিলাম, ছাড়তে মন চাচ্ছে না; কিন্তু—

শোভ। যাবে বই কি বোন! নিজের ঘর-দোর—

বেদ। কত পুণ্যবলে তোমাকে পেয়েছিলুম দিদি, মায়ের পেটের বোনও এত করে না—যত তুমি করেছ।

শোভ। তুমি যে আমার বোনের চেয়েও বড় বলিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন

বেদগর্ভা। আর এক কথা দিদি, কাজলের বিয়ের ভার আমার উপর

শোভনা। সে যে তোমারই মেয়ে

বেদগর্ভা। আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না। তবে যদি—

শোভনা। তবে যদি কি?

বেদগর্ভা। তবে যদি বেলুকে ফিরে পাই—পাব যে, সে আশা নেই।

শোভনা কোন আশা দিতে পারিলেন না, সুতরাং

নিরুত্তর রহিলেন। ক্ষণপরে শোভনা কহিলেন, "এখন চলো, সকাল সকাল কাজ সেরে নিতে হবে।"

আহারান্তে তারাপদ কলেজে চলিয়া গেলেন। মেয়েরা আহারাদি শেষ করিয়া গুছাইতে বসিলেন। গুছান যতটা না হো'ক, সাজানই বেশী। বেদগর্ভাকে নিজের একখানি ভাল সাড়ী পরাইয়া দিয়া শোভনা গহনার বাক্স আনিলেন। সুশীলা সেই সময় আসিয়া কহিলেন, "গহনা সঙ্গে দিও না, এর পরে ডাকে পাঠিয়ে দিও।" পরামর্শটা যুক্তিসঙ্গত; শোভনা গহনা উঠাইয়া রাখিলেন।

গাড়ীতে উঠিবার সময় বেদগর্ভা দুই জনকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দিদি, তোমাদের ছোটবোনটিকে ভুলো না।"

কাঞ্চনকে কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র অশ্রুধারা তাহার মস্তকোপরি বর্ষণ করিলেন।

গাড়ীতে উঠিয়া কহিলেন, "দাদাকে আমার প্রণাম দিও।"

চারিজনের অশ্রু-প্রবাহমধ্যে গাড়ী চলিল।

* * *

ট্রেণ চলিয়াছে। একখানি মধ্যম শ্রেণীর মেয়েগাড়ীতে বেদগর্ভা ও দাসী সোফিয়া; আর তৃতীয় শ্রেণীর পুরুষের গাড়ীতে জীবন। তৃতীয় দিবস রাত্রি যখন এগারটা, তখন গাড়ী মোকামায় আসিয়া লাগিল। অনেক যাত্রী উঠিল, নামিল। সোফিয়া নিদ্রিত, বেদগর্ভার নিদ্রা নাই; তিনি একবার শুইতেছেন, পরক্ষণেই আবার উঠিতেছেন। অনেক যাত্রী রাত্রির আহারাদি এইখানেই সমাপ্ত করিল। বেদগর্ভার আহারের ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি সোফিয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাকে উঠাইয়া কিছু পুরি ও মিষ্টান্ন কিনিতে বলিলেন। উভয়ে সংক্ষেপে আহারাদি সমাপন করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

দণ্ড দুই পরে বেদগর্ভা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সোফিয়াকে জাগাইলেন। সে উঠিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কত দিন জয়পুরে আছি সোফি?"

"দশ বারো বরষ হোগা।"

"এত দিন? কি সর্ব্বনাশ।"

সোফিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেদগর্ভা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "মেয়েটা ত বেঁচে নেই—দুধের বাচ্ছা—সেই ঝড়-তুফানে—সে গেছে। কিন্তু স্বামী? তাঁর কথা ত দিদি কিছু বলেন নি। বোধ হয়, দিদি কিছু জানেন না, হয় ত জেনেও আমাকে কিছু বলেন নি। শুভ সংবাদ হ'লে নিশ্চয়ই আমাকে বল্‌তেন। আমার স্মরণ হ'লো না জিজ্ঞেস করতে; আমি ধ'রে নিয়েছিলুম, তিনি আমারই মত রক্ষে পেয়েছিলেন। বাড়ীতে যদি চুপি চুপি কোন কথা হয়ে থাকে, তা হ'লে সোফিয়া শুনে থাক্‌তে পারে। সোফি, সোফি, ওঠ—"

সোফিয়া উঠিল। বেদগর্ভা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যারে, আমার দেশের খবর কিছু জানিস?"

"নেহি, পিসীমা।"

"বাবু—আমার স্বামী বেঁচে আছেন কি?"

"হম্ নেহি জান্‌তা মাইজি।"

সোফিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। গাড়ী ছুটিতেছে। বেদগর্ভার চিন্তাস্রোতও ছুটিতেছে। তিনি ভাবিলেন, "যদি গিয়ে দেখি, তিনি বেঁচে নেই, তা'হলে? তা' হলে মধুমতীর জল ত আছে—যে মধুমতী এক দিন আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সে আর আমাকে ফেরাতে পারবে না।"

ট্রেণ ঝাঝা ষ্টেশন ছাড়াইয়া চলিল। তিনি ভাবিলেন, "আর যদি তিনি আমার ন্যায় রক্ষে পেয়ে থাকেন, তা' হলেই কি তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন? দশ বারো বছর আমি নিরুদ্দেশ; এতকাল পরে যদি আমি দেশে ফিরে যাই, তা' হ'লে কি বিনা সঙ্কোচে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন? সকলে আমাকে মৃত জ্ঞান করেছে, তার পর বারো বছর—যুগের পর আমাকে অকস্মাৎ দেখলে তারা কি আমাকে আদর ক'রে ঘরে তুলে নেবে?—না, স্বামীই আমাকে স্পর্শ করবেন? কত লোকে কত কথা বলবে, তাঁর ইচ্ছা থাকলেও তিনি আমাকে গ্রহণ করতে পারবেন না। কে বিশ্বাস করবে, আমি এই বারো বছর পাগল হয়ে ছিলুম? আমি হ'লে ত করি নি; তারা আমার এই আশ্চর্য্য কথা বিশ্বাস করবে না ব'লে তাদের আমি দোষ দিতে পারি নে। তা' হ'লে কি আমি স্বামীর দ্বার হ'তে অপমানিত হয়ে ফিরব? না, তা' আমি পারব না। তা'র আগে মৃত্যু ভাল।"

শিমুলতলায় গাড়ী থামিল; ক্ষণেকের জন্যে তাঁর চিন্তাস্রোতও বন্ধ হইল। গাড়ী নড়িলে তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, "আর যদি তিনি বিয়ে ক'রে থাকেন? বিয়ে ক'রে থাকাই সম্ভব। তিনি কি বারো বছর আমার অপেক্ষায় ব'সে আছেন? তা' সম্ভব নয়। তিনি বিয়ে করে সুন্দর বউ ঘরে এনেছেন; তার হয় ত ছেলে-পিলে হয়েছে। আমি ঘরে গেলে সতীন ত আমাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে,

পুরমহিলারা তারই পক্ষে কথা কইবে; স্বামী হয় ত নির্ব্বাক থাকবেন। আমি কি তবে অপমানিত, বিতাড়িত হ'তে ঘরে ফিরে যাচ্ছি? আমি কি দেখতে যাচ্ছি, আমার সতীনের সৌভাগ্য? আমার গৃহে, আমার শয্যায় আর এক জন অধিষ্ঠান করছে, আমি তাই দেখতে যাচ্ছি? আমি এ দৃশ্য দেখতে পারব না—এ অপমান, লাঞ্ছনা আমার সহ্য হবে না। তার আগে আমার মৃত্যু ভাল।

"তবে আমি কি করব? ওগো কে কোথায় আছ ব'লে দেও না গা, আমি এখন কি করব? ও আমার অন্তর্য্যামী, ও আমার হৃষীকেশ, আমাকে বুদ্ধি দেও—আমাকে পথ দেখিয়ে দেও। আমি কেন আগে সকল সংবাদ না নিয়ে চ'লে এলুম? কেন আমি আশ্রম ছেড়ে, আমার সোণার দিদিকে ছেড়ে চলে এলুম? অ্যাঁ, স্বামী কি সত্যই আমাকে গ্রহণ করবেন না? তাঁর ইচ্ছা থাকলেও সতীন গ্রহণ করতে দেবে না। তবে কি আমাকে আমার ঘরের দোরে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে মধুমতীর গর্ভে আশ্রয় নিতে হবে? আমি যে আর ভাবতে পারছি নে—আমার মাথা গরচে—আমি কি আবার পাগল হ'ব?

"আচ্ছা, এইখানে কোথাও নেমে প'ড়ে চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নি না কেন? চিঠি কা'কে লিখ্‌ব? দেওয়ান কাকাকে? তিনি কি আজও বেঁচে আছেন? না থাকেন, আর কেউ প'ড়ে দেখ্‌বে; দরকার বোধ করে, উত্তর দেবে। নিতে কেউ না আসে, যাব না; মরণ ত নিজের হাতে। তাই করা যাক্, নেমে পড়ি—সোফি, সোফি, নেমে পড়্।"

গাড়ী তখনও চলিতেছে। কিরূপে নামিবে, সোফিয়া তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ঘুমের ঘোর, সে জানালা দিয়া নামিবার উপক্রম করিল। বেদগর্ভা তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিলেন, "আগে গাড়ী থামুক।"

জীবন কোন্ গাড়ীতে আছে, তাহা তাঁহারা জানেন না, তাহাকে সংবাদ দিতে বা তাহার নিকট হইতে টিকিট চাহিয়া লইতে বেদগর্ভার স্মরণ হইল না। গাড়ী থামিতে না থামিতে সোফিয়াকে লইয়া বেদগর্ভা নামিয়া পড়িলেন। কোন্ ষ্টেশনে গাড়ী থামিল, সে সংবাদ তিনি অনবগত; অবগত হইবার প্রয়োজনও তিনি কিছু দেখেন নাই।

তাঁহাদের রাখিয়া গাড়ী যখন চলিয়া গেল, তখন সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জীবন কই?"

বেদ। ও মা, তাই ত, তা'কে ত বলা হ'ল না।

সোফি। তোমার কাছে টিকট্ আছে ও পিসী-মা?

বেদ। কই না; তোর কাছে নেই?

সোফি। আমি তা'র মু' দেখি নি।

বেদ। তবেই ত বিপদ্; জীবনের কাছে টিকিট রয়ে গেল—লণ্ঠনের গায়ে লেখা আছে, পড়িয়া দেখিলেন—বৈদ্যনাথ জংসন। পরিচিত একটা জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া তিনি একটু তৃপ্তি অনুভব করিলেন। কিন্তু সকল যাত্রী চলিয়া গেলে টিকিটবাবু যখন তাঁহাদের সমীপস্থ হইয়া টিকিট চাহিলেন, তখন তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। বেদগর্ভা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কহিলেন, "আমার সঙ্গের লোকের কাছে টিকিট রয়ে গেছে।"

"সে লোক কোথা?"

"এই গাড়ীতে চ'লে গেল।"

টিকিটবাবু মধুরভাবে হাসিয়া বলিলেন, "তা' বললে ত চলবে না; এখন টিকিট দেখাতে হবে, না পার, পুলিসে যেতে হবে।"

বেদগর্ভা প্রমাদ গণিলেন। টিকিট-বাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইলেন, স্ত্রীলোকটি বড়ই সুন্দর। তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তোমাকে পুলিসে দেব না। কাল সকালের মধ্যে যদি টিকিট দেখাতে পার, তখন যা' হয় করা যাবে; এখন আমার বাসায় যাও, পানী প'ড়ে আলো ধ'রে রেখে আসছে।"

বেদগর্ভা নড়িলেন না। টিকিট-বাবু একটু তাড়াতাড়ি করিতে লাগিলেন; কেন না, তখন পশ্চিমে যাইবার গাড়ী আসিতেছে, তাঁকে ও-দিকের যাত্রী দেখিতে যাইতে হইবে। অনেক বুঝাইলেও বেদগর্ভা নড়িলেন না। তখন বাবু কহিলেন, "হাত ধ'রে নিয়ে যেতে হবে না কি?"

বেদগর্ভা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া মৃদু অথচ তীব্র-কণ্ঠে কহিলেন,—"স'রে দাঁড়াও।"

৩৪

চিকিৎসকের পরামর্শে রমণীমোহন দেওঘরে বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থে আসিলেন সঙ্গে দুই মা ও নীরদা আসিয়াছেন। বর্দ্ধমানের পশ্চিমে কখন তাঁহাদের আসা হয় নাই। পাহাড় ঝরণার গল্প তাঁহারা শুনিয়াছিলেন; কিন্তু কখন দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। সুতরাং দেওঘর তাঁহাদের নিকট বড়ই মনোরম লাগিল। নন্দন পাহাড়ের সমীপবর্ত্তী পুরণদহে একটা বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। পাহাড়

ঝরণা দেখিয়া সকলে আনন্দ করিয়া বেড়ান, কিন্তু নিকটে জঙ্গল নাই। এক দিন জঙ্গল দেখিতে দাতার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। আর এক দিন তপোবনে যাইবেন স্থির হইল।

তপোবন দেখিতে সকলের বিপুল উৎসাহ। নামই মন আকর্ষণ করে, তার পরে না জানি কত কি সেখানে আছে। অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, তপোবনে গিয়া হয়ত দেখিবেন, রামায়ণ-কথিত মুনি-ঋষিরা বিপুল জটাভার লইয়া যাগযজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞধূমে গগন সমাচ্ছন্ন। বেদমন্ত্র গীত হইতেছে, দেবতারা যজ্ঞাংশ লইতে আসিয়াছেন। যাঁহারা কল্পনায় ত্রেতাযুগের দৃশ্য মানসপটে অঙ্কিত করিতেছিলেন, তাঁহারা তপোবন দর্শন করিয়া নিরাশ হইলেন। আর যাঁহারা অসাধারণ কিছু দেখিবার আশা লইয়া আসেন নাই, তাঁহারা তপোবন দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যেমন নাম, তেমনি গুণ। এ সুখটুকু তাঁহারা পাইলেন, কেন না, তাঁহারা কোন আশা লইয়া আসেন নাই। বিপুল আশাই যে সুখের অন্তরায়।

এ পাহাড়টি অনেকেই দেখিয়াছেন। দেখিয়া সকলেই বলিয়াছেন, পাহাড়টি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর। বড় বড় শিলাখণ্ড স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে; শিলার আশে-পাশে গাছ; গাছের আশে-পাশে শিলা। পাহাড়ের পাদমূলে ঝরণা, বক্ষে মন্দির, শিরে গুহা। এই গুহাতে যোগিবর বালানন্দ স্বামী এক্ষণে বাস করিতেছেন। গুহার আর সে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নাই, কৃত্রিমতায় নষ্ট করিয়াছে।

তপোবন দেখিতে দেখিতে গৃহিণীর মনে হিমালয়ের ভাব জাগ্রত হইল। ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে, কৈলাস কি এই রকম?"

"সে যে মা অনেক উঁচু, উনত্রিশ হাজার ফুট—"

"সে যে উঁচু, তা আমি জানি; আমি বলছি, এই রকম কৈলাস পাহাড় কি না।"

"কথাটার উত্তর দিতে আমাকে কিছুদিনের সময় দেও।"

"কেন রে?"

"আমি একবার কৈলাস হ'তে ঘুরে আসি।"

"তোকে বলতে হবে না।"

গৃহিণী কৃত্রিম কোপ-সহকারে পুত্র-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিলেন। যেখানে দাসীরা বসিয়া জটলা করিতেছিল, সেইখানে গিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কেমন দেখছিস?"

"আর মা, এমনেটা আর কোথায় দেখি নি।"

আর এক জন দাসী কহিল, "আমাদের গাঁয়ে রাম বাবাজির উঠোনে গিরি গোবর্দ্ধন দেখেছিলুম, তার চেয়ে এ তপোবন পাহাড় বড়।"

তৃতীয়া দাসী কহিল, "বেশ বড় বড় পাথর মা; এ রকম পাথরের শিল হ'লে বাটনা ভাল বাটা যায়, ঠাকুরের কাছে বকুনি খেতে হয় না। ঠাকুরকে বলবো, এই পাথর একখানা দেশে নিয়ে যেতে।"

দ্বিতীয়া কহিল, "তুই একখানা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাস্।"

নীরদা, গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে পাণ-দোক্তা লইয়া ফিরিতেছিল; কহিল, "এখানে আর পিকদানি আনি নি মা।"

গৃহিণী সহাস্যে কহিলেন, "এখানে আর পিক্‌দানি কি করব পাগলি?"

বলিয়া তিনি স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। নীরদাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। নীরদা এখন সকল সময়ে সরস্বতীর কাছে না থাকিলে তাঁহার চলে না। নীরদা হিসাব রাখে, চিঠিপত্র লেখে; তাঁহার বিছানা করে, যেখানকার যা' তা' গুছাইয়া রাখে। জল দেয়, পাণ দেয়, একত্র বসিয়া আহার করে। দিবসের ভূরিভাগ গৃহিণীর সহিত ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রিতে বামার কোলের ভিতর গিয়া শয়ন করে।

আহারাদি সমাপন করিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। স্বল্পকাল বিশ্রাম করিয়া রমণীমোহন কহিলেন, "মা, গুহা দেখ্‌তে চল।"

মা। গুহা কোথা রে?

পুত্র। পাহাড়ের মাথায়; গেলেই দেখতে পাবে।

মা। আমি এতদূর উঠতে পারব না।

পুত্র। পারবে বই কি, বেশ ধাপ বাঁধান আছে।

মা। না বাপু, মধ্যিখানে হয় ত আট্‌কে থাকব।

পুত্র। যদি আট্‌কাও, আমি কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে যাব।

মা। ইস, আমাকে আর তুলতে হয় না।

পুত্র। ছেলের কাছে মা কখন ভারি হয় না। দেখবে পারি কি না।

মা। না, দেখতে চাইনে—তোর দুর্ব্বল শরীর।

পুত্র। চল তবে।

মা। তুই নাছোড়বান্দা—চল্।

গৃহিণীর সঙ্গে বামা ও নীরদা চলিল। বালানন্দ স্বামীর চিরপ্রজ্জলিত ধুনির বিভূতি অঙ্গে মাখিয়া

সকলে উপরে উঠিলেন। খানিকটা উঠিয়া গৃহিণী ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রমণীমোহন হতাশ হইয়া কহিলেন, "তবে ফিরে চল।"

সরস্বতী। তুই নীরদাকে নিয়ে উপরে যা, আমরা তপোনাথের মন্দিরে বসি।

নীরদা কহিল, "আমিও এখানে বসি না কেন মা?"

সরস্বতী। না, তুমি যাও। কেউ না গেলে ওর একা যেতে ভাল লাগবে না।

নীরদা সঙ্কুচিতভাবে রমণীমোহনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যখন তাহারা অদৃশ্য হইল, তখন গৃহিণী কহিলেন, "আমার মনের মত বউ হয়েছে।"

বামা। এর মধ্যে বউ হ'ল না কি?

সর। হ'ল বই কি, ছেলে যখন নিয়েছে—

বামা। ছেলে যদি অজ্ঞাত নিয়ে এসে থাকে?

সর। তা কেও আমি বউ ব'লে ঘরে তুলব

বামা। দেখ, তুমি এক দিন আমাকে বলেছিলে, বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমিও সে কথা তোমাকে এখন বলি।

সর। আমার বাড়াবাড়িটা কোথা দেখলে?

বামা। বাড়াবাড়ি আবার কা'কে বলে? নীরদা জল না দিলে সে জল তোমার মিষ্টি লাগে না, সে পাণ সেজে না দিলে, পাণ তোমার ভাল লাগে না, তোমার সঙ্গে সে খেতে না বসলে তোমার আহারে রুচি হয় না—

সর। ঠিক বলেছ; সে আমার যে কাজটা না করে, সে কাজটা আমার ভাল লাগে না, সে আমার কাছে না থাকলে আমার যেন সব খালি খালি ব'লে মনে হয়, নীরদা আমাকে 'মা' ব'লে না ডাকলে আমার তৃপ্তি হয় না; রাতে তোমার কাছে শোয়, তা'ও আমার ভাল লাগে না—ইচ্ছে করে, আমি তাকে বুকে ক'রে নিয়ে শুই।

বামা। বাড়াবাড়ি আর কাকে বলে? তুমি দেখছি আমার উপরে উঠেছ।

সর। তুমি যা' করেছ বামা-দি, তা' দয়ায়। তোমার দয়াটা বেশী, আমার শরীরে দয়া নেই—

বামা। আর তুমি যা' করছ, তা' বুঝি মায়ায়?

সর। আমি যে কেন তাকে এত ভালবাসি, তা' আমি জানিনে। বুঝি তার গুণে, বুঝি বা—

বামা। কি?

সর। বুঝি যে দিন তাকে আমি বউ ব'লে বুকে নিয়েছি, সেই দিন হ'তে তাকে আমি এত ভালবেসেছি।

বামার একটু হিংসা হইল। সংসারে সাধারণত দেখা যায়, যার দয়া বেশী, তার হিংসাটাও যেন কিছু বেশী। বামা পছন্দ করিত না, আর কেহ নীরদাকে ভালবাসিয়া আপন করিয়া লয়; সে ইচ্ছা করিত না, তা'র চেয়ে নীরদা অপর কাহাকে ভালবাসে। দিন দিন যতই বামা দেখিতে লাগিল, নীরদা অপরের হইয়া যাইতেছে, ততই সে ক্ষুব্ধ ব্যথিত হইতে লাগিল। নীরদা যে দিন "মা" বলা ছাড়িয়া 'বড়-মা' বলিয়া তাহাকে ডাকিল, সেই দিন হইতে তাহার মন বিমুখ হইল। বামার ইচ্ছা নয়, রমণীমোহনের সহিত নীরদার বিবাহ হয়, রমেশের সহিত বিবাহ দেওয়াই তাহার অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু রমেশ তাহাকে বিবাহ করিতে চায় না। প্রস্তাব করিবামাত্রই সে জিব কাটিয়া বলিয়াছিল, "ছি ছি! আমি নীরদার যোগ্য নই—তার একটিমাত্র যোগ্যপাত্র পৃথিবীতে আছে—তার হাতে নীরদাকে দেও।"

বামা সে যোগ্যপাত্রের হাতে নীরদাকে দিতে চায় না। তাহার মনোমত ব্যবস্থা কোন দিকে করিতে না পারিয়া বামা অন্তরে জ্বলিতে লাগিল হিংসার জ্বালাটা বেশী।

৩৫

যে চরিত্রহীন, সে কাপুরুষ। চরিত্রবানের সম্মুখে সে সদা কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত। বেদগর্ভার তাড়নায় টিকিট-বাবু থমকিয়া দাঁড়াইল; সে তীব্র কণ্ঠস্বরে কাপুরুষের হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। বাবুটি জড়িতকণ্ঠে কহিল, "তা টিকিট দিতে না পার, লক্ষ্মী-সরাই হ'তে ভাড়া দেও।"

"আমি ভাড়া দিচ্ছি" বলিয়া অন্ধকারের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া টিকিট-বাবুর হাতে ভাড়া হিসাব করিয়া দিল টিকিট-বাবু আর কথাটি না কহিয়া প্রস্থান করিল যে বা'ক্তি ভাড়া দিল, সে অগ্রসর হইয়া কহিল, "মা, তোমার সঙ্গে আর কেউ নেই?"

"না।"

"এখানে জানাশোনা লোক কেউ আছে?"

"না।"

"আমি ত তোমাকে সঙ্গে ক'রে আমার বাড়ীতে রেখে আসতে পারছি না মা। আমাকে এই ট্রেণে কাশী যেতে হবে—মা মরণাপন্ন। আচ্ছা, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি আমার স্ত্রীকে। তুমি এই কাগজটুকু নিয়ে দেওঘরে মলয়াবাসে যাবে; আমার স্ত্রী তোমার জন্যে যথাসাধ্য করবেন।"

তিনি একটুক্‌রা কাগজে দুই ছত্র লিখিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি অপর পার্শ্বের প্ল্যাটফর্মে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি তখন সাড়ে তিনটা। দেওঘরে যাইবার গাড়ী ষ্টেশনের একদিকে দাঁড়াইয়া ঘুমাইতেছে। জিজ্ঞাসাবাদে বেদগর্ভা জানিলেন, সেই নিদ্রিত গাড়ীখানি দেওঘরে যাইবে। এক পাণ্ডাই তাঁহাকে এ সংবাদ দিল। তিনি সোফিয়াকে লইয়া পাণ্ডার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলেন, এবং যথাকালে বৈদ্যনাথধাম মহাতীর্থে উপনীত হইলেন। টিকিট নাই, পাণ্ডা তাঁহাদের ভাড়া দিয়া লইয়া চলিল। তখন রজনী প্রভাত-প্রায়।

পাণ্ডা তাঁহাদের নিজের বাড়ীতে লইয়া গেল না; সহরের প্রান্তভাগে একটা বাড়ীতে লইয়া উঠিল। বেদগর্ভা কহিলেন, "এ কোথা আন্‌লে? আমাকে মলয়াবাসে নিয়ে চল। আমি ত তোমাকে গাড়ীতে ব'লে দিয়েছি।"

"এইঠো ত মলয়াবাস আছে মা; তুমি ভিতরে গিয়ে দেখ না।"

এ বাড়ী মলয়াবাস নহে। এখানে থাকেন এক জন সাধু, তাঁহার নাম পিঙ্গলানন্দ। বোধ হয় তাঁহার দীর্ঘ জটার বর্ণ পিঙ্গল বলিয়া তাঁহার নাম পিঙ্গলানন্দ হইয়াছে। তাঁহার শিষ্য সেবক যথেষ্ট, নাম-যশও খুব। তাঁহার নাম শুনিলে অনেকেই ভক্তিনম্রচিত্তে প্রণাম করিয়া থাকেন। অনেকেই অবগত আছেন, তিনি দিবাভাগে উপবাসী থাকেন, সন্ধ্যার পর একটিমাত্র ফল ভক্ষণ করেন—তা' সে ফলটি আমই হউক, অথবা কাঁটালই হউক। কিন্তু দুষ্ট এক জন দুষ্টপ্রকৃতির লোক বলিত, তিনি গোপনে পূরা-দস্তর আহার করিতেন। এ সব অশ্রদ্ধেয় কথার উপর নির্ভর করিয়া এক জন বড় সাধুকে বিচার করিতে ভক্তদের প্রবৃত্তি হইত না। তাঁহার ধুনির আগুন কোন সময়ে নির্ব্বাপিত হয় না, মাথার চরণস্পর্শী জটাও কখন খাটো হয় না। তা ছাড়া তিনি ঔষধাদি সময় সময় রোগীদের দিয়ে থাকেন; এবং তাহা সেবন করিয়া বা গলায় ধারণ করিয়া অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, ইহাও লোকে বলিয়া থাকে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পাইয়া বন্ধ্যা রমণী সন্তান লাভ করিয়াছে, দরিদ্রও ধনী হইয়াছে। তাঁহার কৃপা-লাভাশায় দূরদেশান্তর হইতে ভক্তেরা ছুটিয়া আসিয়া থাকে। বেদগর্ভা যাচ্ঞা না করিয়াও এই মহাযশস্বী তপস্বীর আশ্রয়-লাভ করিতে সমর্থ হইলেন।

পাণ্ডাঠাকুর এই সাধুমহারাজের নিকট বেদগর্ভা ও তাহার দাসীকে হাজির করিবামাত্র মহারাজ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; কেন না, তিনি অবিদ্যার বদন নিরীক্ষণ করেন না। তার পর অর্দ্ধনিমীলিত-নয়নে তাহাদের একবার দেখিয়া লইয়া জনৈক শিষ্যকে কি ইঙ্গিত করিলেন। শিষ্য যুক্তকরে বেদগর্ভাকে অভিবাদন করিয়া ভিতর-প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। অবশ্য সোফিয়াও সঙ্গে চলিল। তথায় তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া শিষ্য আবার গুরুর নিকট আসিল। উভয়ের মধ্যে চোখে চোখে কি কথা হইল; শিষ্য ভণ্ড পাণ্ডার হস্তে পনেরটি টাকা গণিয়া দিল। পাণ্ডা-বেশী দুর্বৃত্ত বিদায় হইল।

বেদগর্ভা ভিতরে গিয়া দেখিলেন, তথায় কোন স্ত্রীলোক নাই, আছে কেবল কতকগুলো ষণ্ডা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা মুখে গঞ্জিকা আওড়াইতেছেন, নয়ন কিন্তু বেদগর্ভার উপর। তিনি বিরক্ত হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। সেখানে খোদ গুরু-ঠাকুর আসিয়া ধর্ম্মকথা শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদগর্ভা বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমাকে পথ দিন্—আমি ধর্ম্মশালায় যাব।"

পিঙ্গলানন্দ সহাস্যে কহিলেন, "সেখানে যাওয়া কি তোমার উচিত হবে? তোমার রূপ-যৌবন আছে, অঙ্গে অলঙ্কার আছে; এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে?"

বেদ। হাঁ হবে; আমি সেইখানেই যাব।

পিঙ্গ। বেত আত্মহত্যা করতে চাইলে আমি ত তা'কে মহাপাপ করতে দিতে পারি নে। তুমি এখানে থাক—আমি তোমাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষা দেব; অথবা ইচ্ছা কর যদি, শাক্ত বা শৈব' মন্ত্রেও দীক্ষা দিতে পারি।

বেদ। যখন আপনার নিকট আমি দীক্ষাপ্রার্থী হব, তখন আপনি দীক্ষা দেবেন।

পিঙ্গ। তোমার কল্যাণ ত আমাকে দেখতে হবে।

বেদ। দেখবার কোন প্রয়োজন নেই—এখন পথ ছাড়ুন।

পিঙ্গ। দেখিতেছি তুমি উন্মাদ, এ অবস্থায় তোমাকে আমি পথে ঘাটে ছাড়িয়া দিতে পারি না। (জনৈক শিষ্যের প্রতি) ওহে মদানন্দ, স্ত্রীলোকটি বুদ্ধিহীনা, তোমরা সতর্ক থাকিবে।

মদানন্দ কূপ হইতে জল তুলিতেছিল, কহিল—"আমি আগে হ'তেই বুঝেছি, মেয়েটির বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই—আমি চোখে চোখে রাখব।"

গুরু। হাঁ হাঁ, তাহাই করিও; আর দেখ, এই বুদ্ধিহীনা রমণীকে বুঝাইয়া বলিও, আমি কে, আমার ক্ষমতাই বা কি। আমি মনে করিলে যোগবলে এখনি পৃথিবী ধ্বংস করিতে পারি, আর এমনি একটা পৃথিবী মুহূর্ত্তে সৃষ্টি করিতে পারি। আমাকে যে তুচ্ছ করে, সে বাতুল ভিন্ন আর কিছু নয়—

তিন চারি জন বলিষ্ঠকায় সন্ন্যাসী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই; আপনার ন্যায় শক্তিশালী ভূভারতে কে আছে?"

গুরু। ভূভারত কি বলছ, স্বর্গে কয়টা আছে? এক ছিল নহুষ, তা' সেটা গণ্ডমূর্খ—নিজের দোষেই বেটা গেল। আর এক ছিল—

মদা। আর নেই, আপনার ন্যায় আর নেই।

গুরু। আর নেই না কি? আমি মনে করেছিলুম বিশ্বামিত্র।

মদা। আরে ছ্যা, আপনার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

গুরু। তাই না কি? আমি নিজেকে বড় ব'লে প্রচার করতে পারি নে। শাস্ত্রে বলেছে, অহঙ্কার ত্যাগ করবে, নিজেকে ছোট মনে করবে। আমি কি ক'রে নিজে বলি, আমি কত বড়?

এমন সময় নামানন্দ নামধেয় জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে দুই জন ভদ্রলোক মহারাজের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

গুরু কহিলেন, "আমার পরিচয়টা ভাল ক'রে দিয়েছ ত?"

"সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হয় নি।"

"আচ্ছা যাও, আমি যাচ্ছি—তাড়াতাড়ি যাওয়াটা অশোভনীয় হবে। বলগে, সূক্ষ্মশরীরে স্বর্গবাসী দেবতাদের সঙ্গে আমি ক্ষণেক যোগ সেবাকার্য্যে বসিয়েছি।"

নামানন্দ প্রস্থান করিলে গুরু, মদানন্দকে কহিলেন, "আর দেখ মদানন্দ, দাসীটার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে ব'লে মনে হয়; সে যদি বাইরে যেতে চায়, তা হ'লে আপত্তি করবার কোন কারণ দেখি না। কিন্তু পুনঃ প্রবেশ বাঞ্ছনীয় নয়। বুঝেছ ত?"

"আজ্ঞে, চিরদিনই কি বোঝাতে হবে?"

"বেশ, বেশ।"

তখন স্বামীজী নিশ্চিন্ত-মনে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার ঘরখানি বেশ বড়, সাজ-সজ্জারও ত্রুটি নাই। খট্টাঙ্গোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা বিস্তৃত। দেওয়ালের গায়ে ঘড়ি ও একখানি বড় আয়না। গৃহকোণে একটি লোহার সিন্দুক; মধ্যস্থলে একটি টেবিল, দুইখানি চেয়ার। টেবিলের উপর কাগজ-কলম-দোয়াত। স্বামীজী এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, লোহসিন্দুকের মধ্যে একটি দুষ্প্রাপ্য শালগ্রাম রক্ষিত আছে; বড় বড় সাধুরা তাহা চুরি করিবার অভিপ্রায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সুতরাং একটা সিন্দুক আনাইয়া শালগ্রামটিকে লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছে। আর আয়না? আত্মদর্শনাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই আয়নার প্রয়োজন—দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব প্রতি চাহিয়া থাকিলে নাকি আত্মদর্শন করিতে পারা যায়। যাহা হউক, এক্ষণে পিঙ্গলানন্দ স্বামী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বেশভূষা, জটা ইত্যাদি ঠিক করিয়া লইলেন। তার পর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বেদগর্ভার জন্যে পার্শ্বের একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। উভয় কক্ষমধ্যে একটি দ্বার ছিল। তাহা ঈষন্মুক্ত করিয়া বেদগর্ভা যখন দেখিলেন, স্বামীজী বাহির হইতে দ্বারে শিকল দিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন, তখন তিনি স্বামীজীর শয়নকক্ষে নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন। টেবিলের নিকট আসিয়া একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া লিখিতে বসিলেন। পাঁচ ছয় ছত্র লিখিয়া পত্রখানা শেষ করিলেন। পরে একখানা সাদা খামের ভিতর তাহা পুরিয়া এবং আঁটিয়া শিরোনাম লিখিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কার্য্য শেষ করিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। পরে দুই দিকের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সোফিয়াকে চুপি চুপি কিছু উপদেশ দিলেন। কহিলেন, "তুই আগে চিঠিখানা কোন ডাকবাক্সে ফেলবি—টিকিট দরকার নেই। ডাকবাক্স চিনিস ত? বেশ। চিঠিখানা ফেলে তুই মহাবাবাদের সন্ধান করবি। সেটা বড় লোকের বাড়ী ব'লে আমার মনে হয়, অনেকেই তার সন্ধান দিতে পারবে, সন্ধান পেলে সেই বাড়ীর মা'কে এই কাগজখানা দিবি; আর তাঁকে সকল কথা বলবি। চিঠি দু'খানা ভাল ক'রে লুকিয়ে নে।"

তারপর তাহাকে দ্বার খুলিয়া বিদায় করিলেন। বাহিরে আসিতে না আসিতে মদানন্দ তাহাকে ধরিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছ?"

"মায়ের জন্যে খাবার আনতে।"

কথাটা বেদগর্ভার শিক্ষামত বলিয়াছিল। তিনি আরও বলিয়া দিয়াছিলেন যে, বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই সে যেন কোন পথিক বা দোকানীর নিকট হইতে এই ভণ্ড সাধুর বাড়ীর ঠিকানাটা জানিয়া লয়। সোফিয়া যে পথ চিনিয়া সাহায্য-কারীকে সঙ্গে লইয়া এ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে পারিবে, এমন ভরসা তাঁহার ছিল না। তাই

তিনি পূর্ব্বাহ্নে ঠিকানাটা জানিয়া লইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

দাসীর পথ কেহ রোধ করিল না। মদানন্দ একটু হাসিয়া পিছনের দ্বারপথে তাহাকে বিদায় করিলেন। তখন বেলা এক প্রহর।

দ্বিপ্রহরের সময় মদানন্দ এক থালা ভাত আনিয়া বেদগর্ভার সম্মুখে রাখিল; কহিল, "স্নান-টান করবে ত যাও।"

"আমি কিছু খা'ব না।"

"তোমার দুর্ব্বুদ্ধি। এমন গুরু বহুভাগ্যে লোকে পায়—"

"বিরক্ত করো না—যাও।"

"ওরে বাপ্ রে; এ যেন তোমার বাড়ী।"

এমন সময় বহির্ব্বাটী হইতে স্বামীজী ডাকিলেন, "মদানন্দ!"

"আজ্ঞে।"

"মদানন্দ, আমার এ পবিত্র আশ্রমে কোন স্ত্রীলোক আছে?"

"রাম, রাম; এ কথা শুন্‌লেও পাপ।"

"এই শোন, এঁরা বলছেন, ভিতরে স্ত্রীলোক আছে।"

"এ সব বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছের কথা।"

"এরা আমার আশ্রম তল্লাস করতে চায়।"

মদানন্দ তখন বেদগর্ভার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে চাপা গলায় কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে এস—"

বেদগর্ভা তখন চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাহিরের লোকেরা তাহা শুনিল; তাহারা তখন নিষেধ না শুনিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসীদের কেহ কেহ লাঠী ধরিতেছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, আগন্তুকেরা দলে ভারি, পাড়ার লোকেরা যোগ দিয়াছে। তখন শিষ্যবৃন্দ লুকাইয়া পড়িল। বেদগর্ভা ঘোমটা টানিয়া সোফিয়ার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিঙ্গলানন্দ তখন মহা তেজের সহিত শিষ্যবৃন্দকে গা'ল পাড়িতে লাগিলেন; বলিতে লাগিলেন, "আমার আশ্রমে স্ত্রীলোক! কোন্ হতভাগা এনেছে, আমি তা যোগবলে এখনি জেনে নেব; তার পর তাকে মুহূর্ত্তে ভস্ম করব। পাপিষ্ঠ দুরাচার—" তাঁহার ক্রোধ এতই প্রদীপ্ত হইল, আর তিনি এতই গর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে, অন্য কেহ একটি কথা বলিবারও অবসর পাইল না। তাহারা নীরবে বেদগর্ভাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

৩৬

পাহাড়ের মাথায় আসিয়া রমণীমোহন দেখিলেন, গুহার দ্বার তালাবদ্ধ; তখন তিনি নীরদাকে লইয়া এক প্রশস্ত প্রস্তরের উপর বসিলেন। নীরদা একটু দূরে সঙ্কুচিতভাবে বসিল। তাহার বুক আনন্দভরা, মুখ হাসিভরা, দেহ সৌন্দর্য্যভরা। সে এখন কিশোরী নয়, সে এখন যুবতী। যৌবন-সঞ্চারের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই—কখন আগে আসে, কখন বা পিছাইয়া আসে। মনের আনন্দ নির্দ্দিষ্ট কালের অনেক পূর্ব্বে যৌবনকে বরণ করিয়া লইয়া আসে। যেখানে শোক-দুঃখ, সেখানে যৌবন আসিতে বিলম্ব করে। প্রেম-স্ফুলিঙ্গ অন্তরে প্রবেশ করিলে কৈশোর পুড়িয়া যায়; আর যৌবন আসিয়া সমস্ত দেহ-মন অধিকার করিয়া বসে। তার কালাকাল নাই, বয়সের হিসাব নাই।

উভয়ে বসিয়া নীরবে চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। সহসা রমণীমোহন বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর!"

"বড় সুন্দর।"

"এ তোমারই ছায়া নীরদা।"

"যিনি এমন সুন্দর ক'রে আকাশ-পৃথিবী গড়েছেন, না জানি তিনি কত সুন্দর।"

রমণীমোহন সে কথা কাণে তুলিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আকাশ পৃথিবীকে স্পর্শ করিতে নামিয়া আসিতেছে, আর পৃথিবী বুক পাতিয়া আকাশকে আহ্বান করিতেছে। আমি তোমাকে চাই, আর তুমি আমাকে চাও। আকাশ-পৃথিবীতে যেমন চিরসম্বন্ধ, তোমাতে আমাতে তেমনি চিরসম্বন্ধ। আমি শুনিয়াছি, দুই এক জন্মের দেখা-শুনায় প্রণয় জন্মে না। জন্মে-জন্মে তুমি আমার আপন জন ছিলে, তাই এ জন্মে তোমাকে দেখিতে না দেখিতে আমি চিনিয়াছি, তুমি আমার আত্মার আত্মীয়—তুমি আমার কত আপনার।"

নীরদা স্তব্ধ হৃদয়ে সেই নীরবতার মধ্যে এই সঙ্গীতঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। রমণীমোহন যৌবন-সুলভ কত কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। বেলা গড়াইয়া যাইতে লাগিল। রমণী কহিলেন, "নীরদা, তোমার দু'টি চোখের ভিতর দু'টি তিল যে আমি কি সুন্দর দেখি, তা' তোমাকে কি বলব; তিল যে এত সুন্দর হ'তে পারে, তা' আমার ধারণাই ছিল না। কিন্তু তুমি এমনি দুষ্টু যে, আমাকে তা দেখতে দেও না—আমার পানে কিছুতেই তুমি চোখ তুলে চাও

না। আমি যখন ব্যায়রামে পড়েছিলুম, তখন আমি বেশ ছিলুম, সকল সময় তোমার মুখখানি দেখতে পেতুম। তুমি যদি এ রকম দুষ্টুমি কর, তবে আবার আমি ব্যায়রাম করব।"

নীরদা মুখ তুলিয়া রমণীর পানে চাহিল; নীলপদ্ম দুটি রমণীমোহনের মুখের উপর মুহূর্তের জন্য স্থাপন করিয়া কহিল, "না, ও-সব কথা আপনি বলবেন না।"

রমণী। আচ্ছা নীরদা, তুমি আমাকে আজও 'আপনি' বল কেন? ভগবানকে আমরা 'আপনি' বলি, যখন আমরা তাঁকে দূরে রাখি; যখন নিকটে এনে আপনার জন ভাবি, তখন 'তুমি' বলি। তুমি কি আজও আমাকে এত দূরে রেখেছ?

নীরদা উত্তর করিল না, অধোমুখে একটু হাসিল। রমণী উত্তরের জন্য আর পীড়াপীড়ি না করিয়া নীরদার সলজ্জ মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে নীরদা কহিল, "একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেব কি?"

"কি কথা, বল।"

"তিলডাঙ্গা সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া হবে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভাল কথা; আমি নায়েবের নিকট হইতে সন্ধান পেয়েছি—"

"গ্রামখানি কোথা?"

"মধুমতীর ধারে—ইন্দ্রপুরের কাছে।"

"ইন্দ্রপুর! ইন্দ্রপুর! আমি যে সে গ্রামের নাম শুনেছি।"

"কার কাছে শুনেছ?"

"পিসীমার (প্রসন্নময়ী) কাছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর ইন্দ্রপুরে যেতে।"

"কেন?"

"সেখানে গেলে নাকি আমি পিতার সন্ধান পাব।"

"তোমার পিতার নাম কি তিনি বলেন নি?"

"বলবার অবসর পান নি—অকস্মাৎ বাক্‌রোধ হ'ল।"

"তুমি কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ, তা' কি তিনি বলেন নি?"

"এক দিন তিনি ইঙ্গিতে এইটুকুমাত্র বলেছিলেন যে, তাঁর ছেলে থাকলে আমার সঙ্গে তার বিয়ে দিতেন।"

"কি ভাগ্যিস তাঁর ছেলে ছিল না।" বলিয়া তিনি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরদার পানে চাহিলেন। নীরদার মুখ রাঙ্গা হইল।

নিকটে একটা বৃক্ষশাখায় একটি পাখী বসিয়াছিল, সে একা, তার কাছে আর কোন পাখী নাই। সে গান করিতেছিল না, শুধু বসিয়াছিল। রমণী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আহা, পাখীটা কি দুঃখী চুপ ক'রে ব'সে রয়েছে—একবার ডাকছে না—" এমন সময় পাখীটা ডাকিয়া উঠিল। রমণী কহিলেন, "আহা, কি আর্তস্বরে পাখী ডাকছে—" পাখী উড়িয়া গেল, রমণী বলিয়া উঠিলেন,—"খুঁজতে গেল। আপন জনকে খুঁজতে গেল।"

পাখী উড়িতে উড়িতে অদৃশ্য হইল। রমণী কহিলেন, "জীবনটাই ওর বৃথা; যার সঙ্গী নাই, তার কিছু নাই।" উভয়ে নীরব; যে দিক পাখী উড়িয়া গিয়াছিল, সেই দিকে উভয়ে চাহিয়া রহিলেন। সহসা নীরদা কহিল,"এখান হ'তে গিয়ে আমি ইন্দ্রপুরে যাব।"

রমণী। কেন, সেখানে যাবে কেন?

নীরদা। আমার পিতার সন্ধানে।

রমণী। তোমাকে আর কি আমরা কোথাও যেতে দিতে পারি?—আমি লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেবো।

নীরদা। আমি নিজে না গেলে হবে না; আমি সেখানে গেলেই সকলে আমাকে চিনতে পারবে, তা হ'লে সহজেই আমি পিতার সন্ধান পাব।

রমণী। এটা সম্ভব নয় যে, এতকাল পরে তোমাকে দেখলেই লোকে চিনতে পারবে।

নীরদা। প্রসন্ন-পিসীর কিন্তু অন্যরকম ধারণা ছিল; তিনি আমাকে রাস্তাঘাটে বেরুতে দিতেন না, পাছে আমার বাপের দেশের লোক আমাকে চিনতে পারে।

রমণী। এটা এখন আমার সম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে; তোমার মত সুন্দর মেয়ে আর ত কোন দেশে নেই।

নীরদা। আমি বাপের সন্ধান না নিয়ে আপনাদের বাড়ীতে আর যাব না।

রমণী। সে কি নীরদা! আমরা কি তোমার কোন অসম্মান করেছি?

নীরদা। অসম্মানের কথা নয়—

রমণী। তবে?

নীরদা। আমি আপনাদের স্বঘর কিনা, সেটা জানা দরকার।

রমণী। নাই জানলে, মা ত তোমাকে গ্রহণ করেছেন।

নীরদা। তাঁর অসীম দয়া, অসীম স্নেহ, কিন্তু আমার ত একটা কর্তব্য আছে।

রমণী। তোমার কর্ত্তব্যটা কি শুনি?

নীরদা সহসা কোন উত্তর করিল না; অনেক পীড়াপীড়ির পর কহিল, "আমি যদি জানতে পারি, আমি কায়স্থ নই, তা হ'লে আর চন্দনপুরে ফিরে যাব না।"

রমণীমোহন স্তম্ভিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "এ সঙ্কল্প করো না নীরদা—"

নীরদা। আপনি কি বলতে চান, আমি যাঁদের নিকট এত দয়া, এত স্নেহ পেয়েছি, তাঁদের বংশে আমি কলঙ্ক আনব? আমি ত তা' পারব না।

রমণী। তুমি যে বংশে আসবে, সেই বংশই উজ্জ্বল করবে; তোমা হ'তে কলঙ্ক! অসম্ভব!

নীরদা। আমি যদি ছোটঘরের মেয়ে হই, তা' হ'লে ত আমি মাকে ভাত রেঁধে দিতে পারব না, সেই যে আমার তুষানল হবে।

রমণী। দেখ, জাতিবিচার ভুলে যাও—পূর্ব্বে এ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর মানুষ ছিল না—সকলেই সমান—

নীরদা। আমার অত জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। যত দিন না আমি সে জ্ঞান লাভ করি, তত দিন আমাকে শাস্ত্র সমাজ মেনে চলতে হবে।

রমণীমোহন চিন্তামগ্ন হইলেন। তাঁহার সকল আনন্দ মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল; আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। নীরদাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবেন, এ ভরসা তাঁহার নাই। তিনি নীরদাকে ভাল রকমই চিনিয়াছেন। সে বয়সে বালিকা হইলেও তাহার মনের তেজ ও শক্তি অনন্যসাধারণ। তবে এখন উপায়? নীরদার পিতৃপরিচয় জানিতে না পারিলে এ অবস্থায় কোন উপায়ই সম্ভব নয়। রমণীমোহন কিছুকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা নীরদা, তুমি বলেছিলে তোমার পিসী তোমাকে তিলডাঙ্গা হ'তে এনেছিলেন—"

নীরদা। হ্যাঁ।

রমণী। তোমাকে কোন্ অবস্থায় তিনি পান?

নীরদা। আগে তিনি আমাকে সে কথা বলেন নি। আমি বড় হ'লে এক দিন হঠাৎ তাঁর মুখ হ'তে বেরিয়ে পড়ল, আমি জলে ডুবেছিলুম, তিনি আমার অচৈতন্য দেহ তুলে নৌকায় উঠান।

রমণী (চিন্তান্তে)। তখন তোমার বয়স কত শুনেছ কি?

নীরদা। আমি তখন পাঁচ বছরের মেয়ে।

রমণী। আর এখন তোমার বয়স?

নীরদা। তা' ঠিক বলতে পারি নে—চোদ্দ-পনর হ'তে পারে।

রমণী। নীরদা, ভগবান্ দয়া করেছেন—তুমি আমার স্বঘর।

নীরদা। স্বঘর! আপনি আমার বাবাকে চিনতে পেরেছেন?

আনন্দে নীরদা বিহ্বল হইল। রমণীমোহনের অবস্থাও তদ্রূপ। রমণীমোহন কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "আমার অন্তর্যামী ভগবান্ সহসা আমাকে চিনিয়ে দিয়েছেন।"

"তিনি কে? তাঁর নাম কি?"

"বলছি—দাঁড়াও—আমাকে স্থির হ'তে দেও।"

"তাঁর নামটি আগে বলুন।"

"তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বড়—ধনে, মানে, বংশে সকল বিষয়ে তিনি আমাদের চেয়ে বড়।"

"নাম? নাম?"

"অন্নদাপ্রসাদ সিংহ রায়।"

"ইন্দ্রপুরের জমীদার?"

"হ্যাঁ।"

"বেঁচে আছেন?"

"আছেন।"

"আর মা?"

"তা' জানি নে।"

নীরদা কাঁদিতেছিল। রমণীমোহন কহিলেন, "স্থির হও নীরদা—কেঁদো না। আমি আজই রাতের গাড়ীতে ইন্দ্রপুরে লোক পাঠাব।"

কম্পিতকণ্ঠে নীরদা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ক'রে আমার বাপের পরিচয় পেলেন?"

"বলছি, নীচে চল।"

উভয়ে একরাশি ভার বুকে লইয়া নীরবে নীচে নামিয়া আসিলেন। তপোনাথের মন্দিরে তখনও গৃহিণীরা বসিয়া আছেন সরস্বতী দেখিলেন, উভয়ের মুখ জলদের ন্যায় গম্ভীর; নীরদার চক্ষু রক্তবর্ণ। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে? এত দেরী হ'ল কেন?"

রমণী একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলেন; কহিলেন, "মা, ইন্দ্রপুরের জমীদারকে তুমি জান?"

সরস্বতী। অন্নদাপ্রসাদকে? জানি বই কি। আমাদের সঙ্গে এক সময়ে তাদের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। সে আমাকে কাকীমা ব'লে ডাকত।

বামা কহিয়া উঠিল, "ওর বাপ ভবানীই ত আমাদের সব ফাঁকি দিয়ে—"

"বড়-মা, তুমি নীরদাকে নিয়ে নীচে যাও—আমরা যাচ্ছি।"

"কেন রে, একসঙ্গেই যাব।"

"মা, তুমি উঠে এস—।"

রমণীমোহন জননীকে সঙ্গে লইয়া নীচে নামিতে লাগিলেন। পথে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অন্নদা-বাবুর নৌকা ডুবে গিছল না?"

সর। আহা, বাছার কি সর্ব্বনাশই হয়ে গেছে।

রম। কি সর্ব্বনাশ মা?

সর। স্ত্রী-মেয়ে সব হারিয়েছে।

রম। তাঁদের দেহ কি পাওয়া গিছল?

সর। তা' পাওয়া যায় নি বটে—

রম। কত দিন আগে নৌকাডুবি হয়েছিল মা?

সর। অনেক দিন—ঠিক ঠাওর হচ্ছে না।

রম। আচ্ছা, আমি মনে ক'রে দিচ্ছি মা; আমার বয়স তখন এগারো বারো বছর, আমি গাঁয়ের স্কুলে প'ড়ি। ভাত খেয়ে স্কুলে যাচ্ছি, এমন সময় খবর এ'লো, আমাদের এক গোমস্তা স্ত্রী-পুত্রসহ মধুমতীতে ডুবে মরেছে।

সর। ঠিক বলিছিস; সেই দিনই বিকেলে খবর পেলুম, অন্নদাপ্রসাদেরও নৌকা ডুবেছে।

রম। সে দিন সংক্রান্তি—পূজোর বন্ধের পর সেই দিন সবে স্কুল খুলেছে, তুমি আমাকে স্কুলে পাঠাতে রাজি ছিলে না—

সর। সে আজ ন দশ বছরের কথা।

রম। মা, নীরদা কে জান?

সর। কে? কে?

রম। অন্নদাবাবুর জলে ডোবা মেয়ে।

সর। ও মা! বলিস কি! সত্য নাকি? এত ভাগ্যি আমাদের হবে! নীরদা, নীরদা কই?

গৃহিণীর দেহ কাঁপিতে লাগিল; রমণীমোহন তাঁহাকে ধরিয়া এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসাইলেন। নীরদা রামার সঙ্গে পশ্চাতে কিছু দূরে আসিতেছিল। সমীপস্থ হইলে সরস্বতী তাহাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

৩৭

প্রভাতে উঠিয়া দয়ানন্দ সন্ন্যাসী ঠাকুর জনৈক কর্ম্মচারীকে কহিলেন, অন্নদাপ্রসাদকে লইয়া সেই-দিন তাঁহাকে দেওঘরে যাইতে হইবে। অনুসন্ধানে জানিলেন, বাবু নিদ্রিত; আর দেওয়ান স্নানার্থে নদীতে গিয়াছেন। সন্ন্যাসীও স্নানাদি সমাপন করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে মধুমতী অভিমুখে চলিলেন। প্রশস্ত নদী, অনেক বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিতেছে। সন্ন্যাসী ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, দেওয়ান কোমর-জলে দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হচ্ছে?"

দেওয়ান ফিরিয়া দেখিলেন, কিন্তু উত্তর করিলেন না। সন্ন্যাসী সত্বর স্নান সমাপন করিয়া লইলেন। দেওয়ান কূলে দাঁড়াইয়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জলে দাঁড়িয়ে কি করছিলে?"

"সন্ধ্যাহ্নিক"

"দাঁড়িয়ে বা উবু হয়ে বসে আহ্নিক হয় না।"

"কেন হবে না? অনেকেই ত করেন।"

"আহ্নিকের কতকগুলো প্রক্রিয়া আছে, তা' দাঁড়িয়ে হ'তে পারে না। মন্ত্রগুলোর অর্থ হৃদয়ঙ্গম কোরো, তোতাপাখীর মত আবৃত্তি কোরো না।"

"আমি অতটা বুঝে দেখি নি।"

"মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যে কখন্ করবে?"

"সেটা এখুনি সেরে নিলুম।"

"তা' কি হয় বাবা?"

"কেন হবে না, সকলেই ত তাই করে।"

"মধ্যাহ্নে—প্রাতঃকাল আর সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে—ইড়াপিঙ্গলার মধ্যস্থলে, অর্থাৎ সুষুম্না দিয়ে যখন দেহের বায়ু প্রবাহিত হবে, তখন মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করতে হবে।"

"কথাটা ঠিক বুঝ্‌ছি নে।"

তোমার দুই নাকের ছিদ্র, চন্দ্র সূর্য্য। বামের ছিদ্রে ইড়া, দক্ষিণের ছিদ্রে পিঙ্গলা, আর দুই ছিদ্রের মধ্যস্থলে সুষুম্না। যখন মধ্যস্থল দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন সেই সময়কালীন আহ্নিক করাই বিধি-সঙ্গত। ইড়া গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, উভয়ের মধ্যে সুষুম্না সরস্বতী স্বরূপিণী। এই ত্রিবেণীতে স্নান—যাক্, আজ আর আমার সময় নেই, এখন অন্নদাপ্রসাদকে নিয়ে আমাকে দেওঘরে যাত্রা করতে হবে।"

"সে কি!"

"গুরুদেব আমাকে স্বপ্নে আদেশ করেছেন—"

"আপনার গুরু আদেশ করতে পারেন, কিন্তু—"

"তাঁর আদেশ নড়াবার শক্তি পৃথিবীতে কারুর নেই।"

"আচ্ছা, দেখা যাবে।"

দয়ানন্দ সিক্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করত গুরুর পাদুকা পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। পূজা-ধ্যান সমাপন-পূর্ব্বক তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন এবং গৃহস্বামীর

সহিত সাক্ষাৎ করণানন্তর কহিলেন, "তুমি প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে লও, তোমাকে এখুনি দেওঘরে যেতে হবে।"

অন্ন। আমার যাওয়া হ'তে পারে না, পূর্ব্বে আপনাকে সে কথা বলেছি।

দয়া। আমার গুরুদেবের আদেশে তোমাকে যেতেই হবে।

অন্ন। তিনি কি আমাকে দীক্ষা দিতে চান?

দয়া। তিনি উপযাচক হয়ে কখন দীক্ষা দেন না।

অন্ন। তবে কি জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন?

দয়া। নিশ্চয়ই তোমার মঙ্গলের জন্য।

অন্ন। এ অবস্থায় আমার মঙ্গল কি হ'তে পারে?

দয়া। কি হ'তে পারে বা না পারে, তাহা ত আমরা বুঝি না বাবা।

অন্ন। দেওঘরে গেলে আমার মঙ্গল হবে, এমন কোন কথা আছে কি?

দয়া। মঙ্গল কোন্ পথ দিয়ে আসে, তাহা ত মনুষ্যবুদ্ধির অজ্ঞেয় যাক, এখন তোমার আপত্তিটা কি?

অন্ন। তাহা ত আপনাকে বলেছি,—আমি আমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করছি

দয়া। তুমি আজও মনে কর, তিনি ফিরে আসতে পারেন?

অন্ন। নিশ্চয়ই করি।

দয়া। তুমি পাগল।

অন্ন। আমার হৃষীকেশ যদি পাগল হয়ে আমাকে ভুল বুঝিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি পাগল বই কি।

দয়া। ধর, যদি তিনি বেঁচেই থাকেন, আর যদি তিনি সত্যই এখানে ফিরে আসেন, তা হ'লে তুমি তাঁহাকে বিনা সঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারবে?

অন্ন। নিশ্চয়ই পারব।

দয়া। এই নয় বৎসর তিনি কোথায় আছেন, কাহার আশ্রয়ে আছেন, তাহা তুমি জান না, কাহার অন্ন খাইয়া কি ভাবে তিনি এই দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতেছেন, তাহা তুমি অবগত নও; এ অবস্থাতেও তুমি তাঁহাকে বিনা সঙ্কোচে বিনা অনুসন্ধানে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?

অন্ন। তাঁহার সম্বন্ধে কখন কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে না। আপনি তাঁকে চেনেন না, তাই এ প্রশ্ন করছেন।

দয়া। আচ্ছা, তিনি আসেন আসুন, তোমার এখানে থাকবার প্রয়োজন কি?

অন্ন। আমি না থাকলে তিনি হয়ত ফিরে যাবেন।

দয়া। তা যাবেন কেন?

অন্ন। তাঁকে যদি কেউ চিনতে না পারে, কেউ আদর ক'রে ঘরে না তোলে—

দয়া। তুমি তাঁকে এতকাল পরে চিনতে পারবে?

অন্ন। আমার ত তাঁকে চোখে দেখবার প্রয়োজন হবে না—নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও তাঁর উপস্থিতি আমি অনুভব করতে পারব।

বলিতে বলিতে অন্নদাপ্রসাদের কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। এমন সময় দেওয়ান রামকুমার ত্রস্তপদে ব্যস্ততার সহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানি চিঠি। চিঠিখানি মনিবের হাতে দিয়া কহিলেন, "বাবা, ভগবান্ বুঝি এত দিনে মুখ তুলে চাইলেন।"

তাচ্ছীল্যের সহিত অন্নদা চিঠিখানা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেওয়ানের কথায় চমকিত হইয়া তিনি কাগজ পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র স্তব্ধ হইলেন। এ যে তার হস্তাক্ষর। সেই কি চিঠি লিখেছে? না, আর কেহ সেই রকম হস্তাক্ষরে লিখেছে? না, না, এ যে 'কাকামশায়' ব'লে আরম্ভ করেছে, 'প্রণতা বেদগর্ভা' ব'লে শেষ করেছে। না, এ আমার সেই। যা'র প্রতীক্ষায় আজ আমি নয় বৎসর ব'সে আছি, এ আমার সেই যার আশা আমি ছাড়তে পারি নি, যে বেঁচে আছে, আমার অন্তরাত্মা প্রতিদিন আমাকে ব'লে দিয়েছে, এ আমার সেই।

অন্নদাপ্রসাদ চক্ষু মুছিয়া চিঠিখানা পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার অবসন্নতা দূর হইল—তিনি উঠিয়া কহিলেন, "কাকা, চলুন।"

"একটু অপেক্ষা কর, টাকাকড়ি লোকজন ঠিক ক'রে নি।"

"দেরী করবেন না।"

"ঘোড়ার ডাকের ব্যবস্থা করতে হবে ত।"

বলিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

তিনি অদৃশ্য হইলে দয়ানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা যাবে বাবা?"

"দেওঘরে।"

দয়ানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, "অকস্মাৎ সেখানে যাবার প্রবৃত্তি হ'ল কেন?"

অন্নদাপ্রসাদ পত্রখানা সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন। তিনি পড়িলেন—

"কাকামশাই, আমি বেঁচে আছি ; কিন্তু মরেছিলাম স্মৃতিশক্তি হারিয়ে। আপাততঃ আমি আবার মহাবিপদে পড়েছি। যদি আজও আপনার মেয়ের উপর স্নেহদয়া থাকে, তবে এখানে ত্বরায় এসে আমাকে উদ্ধার করবেন। দেওঘর ষ্টেশন হ'তে অর্দ্ধ-মাইল উত্তরে এক ভণ্ড সাধুর গৃহে আবদ্ধ। —প্রণতা বেদগর্ভা।"

দয়ানন্দ পত্রখানি ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আমি বোধ হয় সে সাধুকে চিনি।"

অন্ন। লোকটার নাম কি ?

দয়া। আমার ধারণা মিথ্যা হ'তে পারে, এ ক্ষেত্রে তিনি দোষীও না হ'তে পারেন ; সুতরাং নাম বলাটা আমার ঠিক হবে না।

অন্ন। পরশু দেখছি চিঠি লেখা হয়েছে, আজ সকালে আমি পেলুম। কাল বিকেলে চারটার আগে যে পৌঁছতে পারব, এমন ভরসা নেই। মোট চার দিন, না জানি এর মধ্যে কি ঘটে—

দয়া। কোন ভয় নেই বাবা, গুরুদেব রক্ষা করবেন। যখন একবার তিনি দয়া ক'রে তোমাকে স্মরণ করেছেন, তখন আর বিপদের আশঙ্কা নেই।

৩৮

পরদিন অপরাহ্ণে সুষুম্নানন্দ স্বামী দেওঘরে ভক্ত ও শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সরস্বতীকে বলিতেছিলেন, "এই হরনাথের ছেলে ? বেশ, ছেলেটি ভাল, সুখী ও দীর্ঘজীবী হবে।"

সর। তাই বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন।

গুরু। আর এটি বুঝি তোমার বউ ?

নীরদার মুখ লজ্জায় আনত হইল। সরস্বতী সস্নেহে নীরদার পানে চাহিয়া কহিলেন, "এখনও হয় নি।"

গুরু। বটে! আমি ভেবেছিলুম, হয়ে গেছে। বেশ মেয়ে, খুব সুলক্ষণা। শনির দশা কয়বৎসর ছিল, কিছু কষ্ট পেয়েছে ; তা' সে সব কেটে গেছে, আর অশান্তি নেই।

সর। (যুক্তকরে) বাবা, অনুমতি হয় ত একটা কথা জিজ্ঞেস করি

গুরু। স্বচ্ছন্দে কর মা, তোমরা যে আমার ছেলে।

সর। এই মেয়েটির বাপ বেঁচে আছেন কি ?

গুরু। আছেন, একটু পরেই তাকে দেখতে পাবে।

সর। মা ?

গুরু। বেঁচে আছেন। তাঁরাও সব শনির কোপে প'ড়ে বড় কষ্ট পেয়েছেন।

সর। তাঁদের নাম জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

গুরু। ব্যস্ত হয়ো না, এখুনি দেখ্‌তে পাবে।

নীরদা কিন্তু বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আনন্দ ও ব্যাকুলতা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। চতুর্দ্দিকে চঞ্চল-নয়নে দেখিতে লাগিল। স্বামীজী তাহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এই রকম ব্যাকুল হবে মা, ভগবানকে দেখবার জন্যে। ভক্ত ব্যাকুল হ'লে তিনি দর্শন না দিয়ে থাকতে পারেন না। দর্শন চাইবে, প্রেম চাইবে, ভক্তি চাইবে ; আর কিছু চাইবে না—চেয়ে তাঁকে ব্যথা দিও না—চাইবার দরকার নেই ; যা' তোমার কল্যাণকর,তিনি তোমাকে অযাচিত তাই দেবেন। অনেক সময় তিনি ভক্তকে পরীক্ষা করেন, তোমাকেও করেছেন। যখন রমণী মরণাপন্ন, তখন তুমি মা দুর্গার কাছে মাথা কুটে বলেছিলে, 'মা, আমার আয়ু নিয়ে ওঁকে বাঁচাও।' সামান্য এক মুহূর্ত্তের জন্যে যে ব্যাকুলতা নিয়ে তুমি মায়ের দ্বারে মাথা কুটেছিলে,সে ব্যাকুলতা নিয়ে মায়ের দর্শন-কামনা করবে। মা তোমার কাতর-প্রার্থনায় চঞ্চল হয়ে তোমাকে চকিতের জন্যে দেখা দিয়ে জানিয়ে গিছলেন, তিনি তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। স্বামীর জন্যে কাতর হয়ে যেমন ডেকেছিলে, মায়ের দর্শনাভিলাষী হয়ে তেমনি কাতর-অন্তরে ডাকবে, মা চঞ্চল হয়ে দর্শন দেবেন। তুমি ডাকতে পারবে—তোমাতে সে মহাশক্তি আছে।"

রমণী ও তাঁহার জননী কণ্টকিত-দেহে স্বামীজীর কথা শুনতেছিলেন ; নীরদা বিস্ময়বিস্ফারিত-নয়নে স্বামীজীর পানে চাহিয়াছিল। স্বামী সহাস্যে নীরদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মা, তুমি তোমার স্বামীর আরোগ্য-কামনা ক'রে নিজের জীবন দিতে চেয়েছিলে কি না ?"

নীরদার মাথা নীচু হইয়া পড়িল লজ্জায় সে এতই অভিভূত হইল যে, উত্তর দেওয়া দূরে থাক্, সেখানে বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। স্বামীজী পুনরায় কহিলেন, "এ ভালবাসার জন্যে লজ্জা কি মা ? এ ত কামজ বা রূপজ ভালবাসা নয়, এ যে বিশুদ্ধ প্রেম, এ যে দুর্ল্লভ বস্তু—যা' তুমি শ্রীরাধিকার কাছে চেয়েছিলে, এ যে তাই। এ পবিত্র স্বর্গীয় বস্তুর জন্যে লজ্জা কি মা ?"

নীরদা কাঁপিতেছিল ; কিন্তু তা'র চেয়ে রমণীমোহন বেশী কাঁপিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, "আমি নীরদার যোগ্য হ'তে কোন কালেই পারব না। দুখানা কেতাব প'ড়ে তারই গর্ব্বে নীরদাকে আমি শিক্ষা দিতে গিছলাম ; এখন তার কাছে শিক্ষা নিয়ে, তাকে সব দিয়ে যদি কখন—"

"তোমরা এখন বাগানে বেড়াও গে—আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যেও না।"

সরস্বতী সদলে উঠিলেন। আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ উদ্যান। উদ্যানমধ্যে বৃক্ষান্তরালে আসিয়া সরস্বতী, নীরদাকে বুকে টানিয়া লইলেন এবং চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। কহিলেন, "কত পুণ্যবলে তোমাকে পেয়েছি মা।"

আলিঙ্গনপাশ-মুক্ত নীরদা বামার দিকে ফিরিল। কহিল, "তুমি আমাকে আদর করবে না মা?"

বাঁধ ভাঙ্গিল। বামা, নীরদাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মস্তকোপরি অশ্রুবর্ষণ করিল। নীরদা কহিল, "আমি ত তোমারই মেয়ে, তুমিই ত আমাকে আশ্রয় দিয়েছ।"

বাঁধের আর চিহ্ন রহিল না—স্রোতে সব ভাসিয়া গেল। রমণীমোহনের ইচ্ছা হইল, তিনিও একবার নীরদাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করেন, বিপুল শক্তিতে সে বাসনা দমন করিয়া তিনি বহু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরদার পানে চাহিলেন এবং সুযোগমত চুপি চুপি কহিলেন, "কি ক'রে পরের জন্যে নিজের জীবন দিতে হয়, কি ক'রে ভালবেসে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়, আমাকে শিখিয়ে দেও নীরদা।"

নীরদা মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আপনাতে আমি যে সব পেয়েছি—"

রমণী। আর তোমাতে আমি বুঝি কিছু পাই নি?

নীরদা হাসিয়া কহিল, "পেলে আর অভাব হয় না।—"

এমন সময় দেখা গেল, তিন ব্যক্তি উদ্যানে প্রবেশ করিতেছেন। দ্বারবান ও ভৃত্যকে ফটকের বাহিরে রাখিয়া তাঁহারা উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রমণী প্রভৃতি পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। যখন আগন্তুকেরা তাহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, তখন নীরদা ডাকিল, "বাবা!" তিন জনেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া নীরদার পানে চাহিলেন। এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এই যে, আমার বেলমতিয়া।"

বেলমতিয়া অন্নদাপ্রসাদের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িল। তিনি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া শত শত মুখচুম্বন করিলেন। মধ্যে মধ্যে মুখখানি সরাইয়া দেখিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "এই যে আমার সেই মা—এই যে আমার মায়ের দুই চোখে দুই তিল; এত দিন কোথা ছিলি মা? তোকে যে কখন পাব, তা' ত ভাবি নি।"

বেলমতিয়া। মা কোথা বাবা?

অন্নদাপ্রসাদ। তিনি বেঁচে আছেন, কেমন ক'রে তা' তুই জানলি?

বেলমতিয়া। স্বামীজী বলেছেন।

অন্নদাপ্রসাদ। আমি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আজও দেখা পাই নি।

বেলমতিয়া। সে কি বাবা? এত কাল তাঁর দেখা পাও নি?

অন্নদাপ্রসাদ। আজ পাব ব'লে আশা আছে। তুইও আমার সঙ্গে আয়।

বেলমতিয়া উত্তর না করিয়া পিছনে চাহিল। তখন অন্নদাপ্রসাদ অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি নেত্রপাত করিলেন। সরস্বতী অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "তোমার কাকীমাকে চিনতে পার অন্নদা?"

তিনি চিনিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল না, রমণীমোহন তখন অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিলেন, কহিলেন, "আমাদের বাড়ী চন্দনপুরে, ইনি আমার মা।"

"ওঃ! তুমি হরনাথ কাকার ছেলে? বটে।"

বলিয়া তিনি দুই পা অগ্রসর হইয়া সরস্বতীর চরণে প্রণাম করিলেন; কহিলেন, "আমার বেলুকে আপনারা কোথা পেলেন?"

"সে অনেক কথা, পরে শুনো।"

"তাই ভাল, আমি এখন বড় ব্যস্ত। স্ত্রীর সন্ধানে ঘুরছি। তা' বেলু আপনারই কাছে থাক্ কাকীমা। (রমণীর প্রতি) তোমরা কোন্ বাড়ীতে আছ?"

রমণীমোহন তাহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমরা আপনার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

"স্বামীজীর কাছে?"

"হাঁ"

"চলো।"

অন্নদার সঙ্গে দয়ানন্দ ও দেওয়ান রামকুমার ছিলেন। তিন জনে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। রামকুমার কহিলেন, "আমরা জানতুম না, আপনি এখানে আশ্রম করেছেন।"

"আমার আশ্রম ত নয় বাবা, আমাকে দয়া ক'রে এর ব্যক্তি থাকতে দিয়েছেন।"

এই উদ্যানবাটীর মালিক গিরিজানাথ বা দয়ানন্দ করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "আমিই যখন কায়মনে আপনার, তখন এ সামান্য জমীটুকু কি আপনার নয়?"

"না বাবা, আমার ব'লে কিছু রাখি নি, রাখ্‌তে চাইও না। ব'সো অন্নদা, তোমার স্ত্রীর সন্ধান পেলে?"

অন্নদা। পাই নি। পিঙ্গলানন্দের আশ্রমে গিয়ে দেখলুম, দ্বার তালাবদ্ধ।

স্বামী। তোমার স্ত্রী সেখানে নেই। প্রেমানন্দ বলছিলেন, তিনি মলয়াবাসে আছেন।

অন্ন। যদি অনুমতি হয় ত আমি সেখানে যাই, পরে দুই জনে একত্রে চরণ-বন্দনা করব।

স্বামী। বেশ, এসো—প্রেমানন্দকে সঙ্গে লও।

অন্নদা প্রণাম করিয়া উঠিলেন। প্রেমানন্দও সঙ্গে চলিলেন।

৩৯

মলয়াবাস একটি বড় বাড়ী, বেলাবাগানে অবস্থিত। অন্নদাপ্রসাদ দলবলসহ যখন তথায় উপনীত হইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরে ঘরে দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রমণীমোহন, রামকুমার প্রভৃতি ফটকের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন; অন্নদাপ্রসাদ একাকী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন গৃহের বারান্দায় উঠিলেন, তখন তাঁহার পা কাঁপিতেছিল, কণ্ঠও শুকাইয়া গিয়াছিল। তিনি কাহাকেও ডাকিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক জন ভৃত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথা হ'তে আসছেন?"

"ইন্দ্রপুর হ'তে।"

"ভিতরে আসুন।"

একটা বড় ঘরে গিয়া অন্নদাপ্রসাদ বসিলেন। কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে। নিস্পন্দভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাহার মন বড় অস্থির হইতেছিল; তিনি আর ধৈর্য্যধারণ ক'রতে পারিতেছিলেন না; ইচ্ছা হইতেছিল, চীৎকার করিয়া ডাকেন—বেদগর্ভা।

অকস্মাৎ দেখিলেন, এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দ্বার সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার নয়নে পলক নাই, অশ্রু নাই। অশ্রু ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, পাছে দর্শনের ব্যাঘাত ঘটে। রমণী স্থির। ধ্যানমগ্না, পুরুষ বেপমান অধৈর্য্য। অন্নদাপ্রসাদ ছুটিয়া গিয়া রমণীকে বুকে ধরিলেন, তখন ধ্যানমগ্নার ধ্যানভঙ্গ হইল—তাহার দেহে জীবন, নয়নে অশ্রু বহিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে অন্নদার চরণের উপর লুটাইয়া পড়িল।

* * *

'জ্যোতির্নিবাস' অন্নদা ভাড়া লইয়াছিলেন। মস্ত বাড়ী, অনেক ঘর, দ্বিতলের উপর একটি সুসজ্জিত ঘরে বসিয়া বেলমতিয়া তা'র মায়ের গলা জড়াইয়া বলিতেছিল, "মা, আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি।"

"আমাকে দেখবি ব'লে এসেছিলি, তাই চিনতে পারলি, নইলে আর চিনতে হ'ত না।"

মায়ের একখানি হাত টানিয়া লইয়া আঙ্গুলগুলিকে আদর করিতে করিতে মতিয়া কহিল, "না মা; তুমি হাজার লোকের ভিতর থাক্‌লেও আমি তোমাকে চিন্‌তে পারতুম।"

মা। আমি কিন্তু তোর চোখ না দেখলে চিন্‌তে পারতুম না। তুই এত বড় হয়েছিস, এত সুন্দর হয়েছিস।

মেয়ে। তুমি কিন্তু মা ঠিক তেমনি আছ, বাবাও তেমনি আছেন। আমি বাবাকে দেখেই চিনেছি।

মা। তুই যে তখন খুব ছোট, কেমন ক'রে এত কাল পরে তুই আমাদের চিনতে পারলি?

মেয়ে। তা' জানি নে; বোধ হয়, মা-বাপকে কেউ কখন ভুলতে পারে না। বাবাকে দেখবামাত্রই আমি তাঁকে চিনেছিলাম। আমার মন আমাকে ব'লে দিয়েছিল, এই তোর বাপ।

অন্নদাপ্রসাদ ঘরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "বেলুর আমার কত বুদ্ধি, ও কি যে সে মেয়ে। ছোট বেলায় ওর অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় কত রকমে পেয়েছিলাম।"

বেদ। চেনাটা ত আর বুদ্ধির দ্বারা হয় না।

অন্ন। বেলু নির্ম্মল, শুদ্ধ, পবিত্র; তাই ওর ভিতরে যিনি আছেন, তিনি সময় সময় ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে থাকেন। কান পেতে অর্থাৎ মন স্থির ক'রে শুনলে শুনতে পাওয়া যায়, আমাদের অন্তরাত্মা কত উপদেশ আমাদের দিচ্ছেন। মনের উপর যত ময়লা পড়বে, সে ভাষা ততই অস্ফুট হবে। এখন বেলু, তুই ও-ঘরে যা', তোর শাশুড়ী তোকে দেখতে ছুটে এসেছেন। তারা তোকে না দেখে থাকতে পারেন না।

বেলমতিয়া সলজ্জবদনে প্রস্থান করিল। বেদগর্ভা কহিলেন, "বেলুর এখন বিয়ে দেব না—আমি ছেড়ে থাকতে পারব না।"

অন্ন। বৈশাখের শেষে বিয়ে দিয়ে আমরা সকলে পুরী চ'লে যাব। পাশাপাশি বাড়ীতে থাকব; তার পর রথ দেখে ঠাণ্ডা পড়লে দেশে ফিরব। এই রকম ত ব্যবস্থা করেছি।

বেদ। আচ্ছা, ছেলেটি কি ভাল? বেলুর যোগ্য হবে ত?

অন্ন। রমণীমোহনের কথা বলছ? এ রকম ছেলে আমরা শত চেষ্টা ক'রেও যোগাড় করতে পারতেম না। যত রূপ, তত গুণ। বেলু তার যোগ্য হবে কি না, তাই বল।

বেদ। আহা, বেলু আমার সুখী হোক! বাছা

আমার অনেক কষ্ট পেয়েছে তা' বিয়ে দিতে দেশে ত চলছ, জয়পুরে যাবে কবে ?

অন্ন। জয়পুরে দু' তিন দিনের মধ্যে যাব, তা'র পর তাঁদের নিয়ে দেশে ফিরব। আচ্ছা বেদু, তুমি কি ব'লে মনে করেছিলে, আমি ফের বিয়ে করেছি ?

বেদগর্ভা লজ্জায় স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "করলে না কেন ? করাই ত স্বাভাবিক।"

অন্নদা কহিলেন, "যাকে ভালবাসবে, তা'র উপর বিশ্বাস রেখো।"

পরিশিষ্ট

সূর্য্য উঠিল—মধুমতী-বক্ষঃ আলোকিত করিয়া সূর্য্য উঠিল। আকাশ নির্ম্মল, কোথাও একটু মেঘ নাই। নদী স্থির, কোথাও একটু তরঙ্গ নাই। মধুমতীর গর্জ্জন নাই, আছে শুধু কল্লোল। পবনদেবও প্রফুল্ল, আনন্দ দান করিতে করিতে মন্থরগমনে চলিয়াছেন। যেমন তিনি এক দিন ইন্দ্রপুরকে বিষাদে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, আজ তেমনি তিনি গ্রামবাসীদের আনন্দ দিয়া বেড়াইতেছেন। বুঝি তাঁহার অনুতাপ জন্মিয়াছে। সাড়ে নয় বৎসর আগে অকালে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ ঘটিয়াছিল, তদ্ধেতু তিনি ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করিয়া বসিয়াছিলেন, আজ বুঝি তাই তিনি অনুতপ্তচিত্তে সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। কাহারও মুখের ঘাম মুছাইয়া দিতেছেন, কোন রমণীর অলকা দোলাইতেছেন, কোন যুবতীর অবগুণ্ঠিকা তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছেন।

বৈশাখের শেষ, আজ বেলমতিয়ার বিবাহ। ইন্দ্রপুর আজ পত্রপুষ্প-অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া অনেক দিন পরে হাসিয়া উঠিয়াছে। পথের মাথায় মাথায় নহবতখানা, ধারে ধারে কদলীবৃক্ষ আর পত্রপুষ্পমাল্য। গ্রামে লোক আর ধরে না, গ্রামপ্রান্তে তাম্বু ফেলিয়া অতিথিদের স্থান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার অনেকে তাম্বুতে বা গৃহে না থাকিয়া নৌকায় বাস করিতেছেন। ছোট বড় অনেক বজরা, পান্‌সি-ডিঙ্গিতে নদীবক্ষঃ সমাচ্ছন্ন। নৌকাগুলিও সাজিয়াছে। তরণীনিচয়ের কণ্ঠে ফুলমালা, কটিতে ফুলের মেখলা, পদপ্রান্তে ফুলের নূপুর। তরণীর মাথায় পতাকা বায়ুতরঙ্গে নাচিতেছে। কোন পতাকায় লেখা আছে,—নবদম্পতী সুখী হউক; কোন পতাকায়,—নবদম্পতীর জীবনপথ নিষ্কণ্টক হউক; কোন পতাকায়,—প্রজাপতির আশিস্ নবদম্পতীর উপর বর্ষিত হউক। বজরার উপর উজ্জ্বল চন্দ্রাতপ; চন্দ্রাতপের স্তম্ভ বা দণ্ডনিচয় পত্রপুষ্পে ভূষিত। স্তম্ভনিচয় পুষ্পমাল্যে শৃঙ্খলিত। চন্দ্রাতপ-নিম্নে সুকোমল শয্যা আস্তৃত।

যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বজরায় বাস করিতেছেন, ছোট ছোট ডিঙ্গি তাঁহাদের আহার্য্য সরবরাহ করিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল ডিঙ্গির কর্ত্তা রঘু, আর কার্য্যাধ্যক্ষ রামচরণ। শিবুকে আজ এই শুভদিনে মাছ ধরিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া সে মনঃকষ্টে চুপ করিয়া বসিয়া বাজনা শুনিতেছে। বাজনা বাজিতেছে স্থলে, বাজনা বাজিতেছে জলে। কোন কোন নৌকায় শুধু বাদকের দল। কোন পান্‌সীতে নহবৎ, কোন ভড়ে ব্যাগপাইপ, কোন বজরায় গোরার বাজনা। আর যে ষ্টীমারে চড়িয়া বর বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, সে ষ্টীমারখানি এত ফুলপাতা দিয়া সাজান হইয়াছে যে, কেহ কেহ ভাবিতেছিল, এত বোঝা জাহাজ টানিল কি প্রকারে।

বর আত্মীয়-স্বজনসহ জাহাজেই অবস্থান করিতেছিলেন। জাহাজের আশেপাশে কয়েকখানি বজরা ছিল। একখানিতে ছিলেন সপরিবারে প্রভাতবাবু, আর একখানিতে তারাপদ স্ত্রীকন্যাসহ। প্রভাত ও তারাপদর সহিত রমণীমোহনের পূর্ব্বে দেখাশুনা ছিল না; গত রাত্রিতে অন্নদাপ্রসাদ তাঁহাদের মধ্যে পরিচয়াদি করিয়া দিয়াছেন। পরিচয়ের পর অন্নদা তাঁহাদের এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের লইয়া ইন্দ্রপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ঘাটের উপর বিস্তৃত উদ্যানমধ্যে বিশাল অট্টালিকা। প্রাঙ্গণে, গৃহমধ্যে, স্থানে স্থানে নাচগান হইতেছিল; রমণীমোহন সেখানে না বসিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন এবং ভাবী শাশুড়ীর সহিত চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তার পর তিনি আহারাদি সমাপন করিয়া জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বেলমতিয়ার সহিত আর সাক্ষাৎ ঘটিল না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই রমণীমোহন রমেশকে কহিলেন, "দেখ্ রমি, আজ আমাকে কিছু খেতে নেই, তোকেও কিছু খেতে দেব না।"

রমেশ। আমার অপরাধ ?

রমণী। তুই আমার বন্ধু ব'লে।

রমেশ। আমি তোমার বন্ধু না মিত্র, সুহৃৎ না সখা, সেটা আগে ঠিক ক'রে বল।

রমণী। কা'র কি ধর্ম্ম, আগে সেটা বুঝিয়ে দেও।

রমেশ। যিনি প্রণযাস্পদের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না, তিনি বন্ধু; যিনি প্রণযাস্পদের অনুমত থাকেন, তিনি সুহৃৎ; যাঁহারা একক্রিয় অর্থাৎ যাঁহাদের কার্য্যাদি একবিধ, তাঁহারা মিত্র এবং যিনি অন্যকে প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সখা। এখন আমি তোমার কোন্‌টা?

রমণী। তুই আমার চারটেই।

রমেশ তবে আমি উপবাসে রাজি আছি; কিন্তু বিযের পর এ কথাটা যেন স্মরণ থাকে।

রমণী। আচ্ছা চল্, এখন আমরা নোকো ক'রে বেড়িয়ে আসি।

রমেশ। কোথায যাবি?

রমণী। এ বজরায, ও বজরায, সব আলাপ ক'রে আসা যাক্।

রমেশ। তুই যে বর, তোর লজ্জা করবে না?

রমণী। বর ব'লে কি ঘোমটা দিয়ে থাক্‌তে হবে?

রমেশ। ঘোমটা না দেও, তা'ই ব'লে কি বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত করতে হবে?

রমণী। আগে সে বাবার সঙ্গে যাতাযাত করেছি।

রমেশ। তবে চল।

রমণী অবশ্য ইন্দ্রপুরে গেলেন না; একখানি ছোট নোকায উঠিয়া নদীবক্ষে বেড়াইতে লাগিলেন। বেলা যখন আটটা, তখন তিনি তারাপদর বজরায রমেশকে লইয়া উঠিলেন। তারাপদ আদর করিয়া উভয়কে বসাইলেন। রমেশকে কখন তিনি দেখিযাছেন বলিযা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিচয়, নামধাম কিছুই তিনি অবগত ছিলেন না। রমেশও তারাপদকে চিনিতেন না; তবে তাঁহার নাম জানিতেন। উভয়ে প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। রমণীমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসী-মা কই?"

"পাশের কামরায পালিয়েছেন তোমাদের দেখে। (জনান্তিকে)—ওগো, এদিকে এস, রমণী খুঁজছে।"

শোভনা একটু ঘোমটা দিযা হাসিতে হাসিতে আসিযা কহিলেন, "ও মা, আমাদের জমীদার যে।"

রম। তোমার ছেলে মাসী-মা।

বলিযা প্রণাম করিলাম।

শোভ। বেঁচে থাকো বাবা, নদীতে যত কোঁটা জল, তত বছর তোমার আয়ু হো'ক।

রম। রক্ষে কর মাসী-মা; অশ্বত্থামা বা বিভীষণ দূরে যাক্, ব্রহ্মারও এত আয়ু নেই। আমার বোন কোথা মাসী-মা?

শোভ। কে, কাজল? ঐ যে পাশের কামরায আছে। (রমেশকে দেখাইয়া) এ ছেলেটি কে?

"বলছি" বলিয়া তিনি 'কাজল' 'কাজল' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কাজল দ্বারপার্শ্বেই ছিল, সরিয়া আসিযা দাঁড়াইল। শোভনা কহিলেন, "তোর দাদাকে প্রণাম কর।"

কাজল চক্ষু তুলিয়া যেমন চাহিল, অমনি রমেশের সহিত তাহার দৃষ্টি-বিনিময হইল। উভযে চমকিযা উঠিল। রমেশ জানিত না যে, তারাপদর বজরায সে আসিযাছে, আর সেখানে তাহার স্বপ্নের দেবী কাজল আছে। কাজলও জানত না, রমেশ—তাহার বাল্যসখা—তাহাদের নৌকায আসিযাছেন। রমেশের পানে একবার চাহিযাই সে দৃষ্টি নত করিল এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করণানন্তর আগন্তুকদের প্রণাম করিল। রমেশকে প্রণাম করিতে কেহ তাহাকে বলে নাই, তবু সে তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া যখন কাজল উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন রমণী একছড়া বহুমূল্য হার তাহার গলায পরাইযা দিযা কহিলেন, "আমি তোমার দাদা—আমার বন্ধুর পক্ষ হইতে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, কাজল।"

তারাপদ একটু অপ্রসন্ন হইযা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বন্ধুটি কে?"

"এই যে রমেশ এবার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে, বরাবর কালেজে দ্বিতীয স্থান অধিকার ক'রে এসেছে—"

"কোথায বাড়ী? কার ছেলে?"

রমণীকে তখন সে সব পরিচয দিতে হইল। পরিচয পাইযা তারাপদর মুখ আরও গম্ভীর হইল। তিনি রমণীকে কিছু না বলিযা শোভনাকে কহিলেন, "হার ফিরিয়ে দেও।"

"আগে রমণীর কথাটা শোন।"

"শুনব আর কি, এ বিবাহ হ'তে পারে না।"

"কেন হবে না দাদা?" বলিযা বেদগর্ভা হাস্যমুখে কামরায় প্রবেশ করিলেন। অন্নদাপ্রসাদ তাঁহার পশ্চাতে। তাঁহাদের নোকা কখন্ যে আসিযা বজরার গায় ভিড়িযাছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই। তারাপদ বা শোভনা ইন্দ্রপুরে আসিযা অবধি বেদগর্ভা'র দর্শন পান নাই। দেড়মাস আগে জযপুরে তাঁহাকে দেখিযাছিলেন, তা'র পরে আজ তাঁহার গৃহে তাঁহাকে দেখিলেন। বেদগর্ভাকে

দেখিবামাত্র তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন। আগে দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের ভগ্নীকে, এখন দেখিলেন সম্রাজ্ঞীকে; পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন আশ্রয়হীনা আশ্রিতাকে, এখন দেখিলেন সকল সম্পদের অধিকারিণী রাজরাজেশ্বরীকে। শোভাসম্পদ, আনন্দ-জ্যোতিঃ, পবিত্রতা তাঁহার দেহময় পরিব্যাপ্ত। রমণী-মোহন উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুকদের প্রণাম করিলেন, অন্নদাপ্রসাদ জামাতাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "আমরা তোমার মাকে নিতে এসেছি মোহন।"

"দেখুন যদি পারেন; আমার ত মনে হয় না, তিনি যাবেন।"

বেদগর্ভা কহিলেন, "ইস্, যাবেন না বই কি; পায়ে ধ'রে নিয়ে যাব।" তার পর তিনি তারাপদকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "কেন হবে না দাদা! কাজল যে আমার মেয়ে, তা'র উপর আমার পূর্ণ অধিকার।"

তারাপদ হাসিয়া কহিলেন, "তোমার যা' ইচ্ছা, কর দিদি।"

বেদ। আজই আমি তার বিয়ে দেব।

তারা। আজ ত হ'তে পারে না বোন, দাদার অনুমতি নিতে হবে, আত্মীয়স্বজন পুরুত-নাপিত আনতে হবে—

দেব। আমি বুঝি তার ব্যবস্থা করি নি মনে করেছেন? দশখানা নৌকা পাঠিয়েছি তাঁদের আনতে, গাঁ-শুদ্ধ আনতে ব'লে দিয়েছি; তাঁরা এলেন ব'লে।

তারা (সহাস্যে)। দেখছি, শাশুড়ী-জামাইয়ে আগে হতে ষড়যন্ত্র করেছ। আমি তোমাদের আঁটতে পারব না—যা' ইচ্ছে কর।

বেদ। আমি মেয়ে-পক্ষ হ'তে জননীস্বরূপ পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করছি।

বলিয়া একটা হীরকাঙ্গুরীয় রমেশকে দিলেন। রমেশ তারাপদ ও শোভনাকে প্রণাম করিলেন। তারাপদ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া কহিলেন, "কিন্তু দাদার অনুমতি—"

বেদ। সে আমি বুঝব, আমি কি তাঁর ছোট বোন নই?

তারা। রমেশের আত্মীয় স্বজন—

বেদ। তাঁরা একটু আগে এসেছেন—তাঁদের সকলের মত হয়েছে।

তারা। তুমি দিদি, সব পার। কিন্তু টাকাকড়ি গয়নাপত্র কিছু ত আনি নি—

বেদ। ও-সব কথা আর বলবেন না; আমার মেয়ের বিয়ের ভার আমি নিয়েছি। আয় কাজল, আয়। কিছু খাস নি ত? আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল—নারাণপুরের লোকেদের সঙ্গে কথা কইতে। দিদি, তুমি তৈরী থেকো, জাহাজ হ'তে ফেরবার সময় তোমাকে নিয়ে যাব।

তারা। আর আমি? আমি বুঝি চুপ ক'রে এখানে একলা ব'সে থাকব?

বেদ (সহাস্যে)। কাজলের বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি এখনো বেরোয় নি; ছাপা হ'ল ব'লে। চিঠি পেলে আপনি যাবেন।

তারা। কন্যার বাপের এমন দুরবস্থা বুঝি আর কখন হয় নি।

সকলে বিদায় হইলে শোভনা কহিলেন, "অল্প-সময়ের মধ্যে পুষ্পের কত পরিবর্ত্তন ঘটেছে; আগে ছিল বোকা, এখন দেখছি তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী; আগে দেখেছিলাম পরমুখাপেক্ষিণী, এখন দেখছি, স্বাবলম্বিনী তেজস্বিনী—"

তারা। তখন দেখেছিলে মানুষ, এখন দেখছ দেবী।

শোভ। এখনও তুমি তাকে ভালবাস?

তারা। নিশ্চয় বাসি, নইলে তার এক কথায় আমি এ বিবাহে সম্মত হই?—তবে—

শোভ। তবে কি?

তারা। তবে মানুষকে যে ভাবে ভালবেসেছিলাম, দেবীকে সে ভাবে ভালবাসি না। আগে তাঁকে আমারই মত মানুষ ভেবে সখীভাবে ভালবেসেছিলাম; আজ মনে হচ্ছে সে ভাব আর আমার অন্তরে নাই। এখন তাঁকে দেবী দেখে—আমার অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত দেখে, আমার মন সম্ভ্রমে অবনত হয়ে পড়েছে—মাতৃভাব আমার হৃদয়ে জেগে উঠেছে। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, 'মা' ব'লে তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি—মা ব'লে তার চরণে লুটিয়ে পড়ি—

শোভ ছি ছি, তাঁর অকল্যাণ করো না।

তারা। দেখ ভাবই সব চেয়ে বড়। যে ভাব হৃদয়ে নিয়ে পুষ্প, ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করলে, সে ভাবে সম্মান করতে তোমরা শেখ নি। ভাব হচ্ছে রাজ্যেশ্বর, আর বর্ণাভিমান রূপের গর্ব্ব, ধনজনের অহঙ্কার, এ সব তার প্রজা—

এমন সময় হরিপ্রসন্ন ও দেবযানী আসিয়া যুক্ত-করে কহিল, "আপনারা আসুন, আমরা কাজলের বিয়েতে আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।"

সমাপ্ত

রাণী-ব্রজসুন্দরী

[উপন্যাস]

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম খণ্ড

ক্ষিতি

সঞ্চার

কালাচাঁদ ও ব্রজবালা

রাণী-ব্রজসুন্দরী

প্রথম পরিচ্ছেদ

"সন্ন্যাসী-ঠাকুর, বল্‌তে পার, আমার রাজুর কপালে কি আছে ?"

রাজুর প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। জননী 'রাজু' বলিয়া ডাকিতেন। মাতুল 'নিরঞ্জন' নাম দিয়াছিলেন; কিন্তু সে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন না। প্রথম জীবনে কালাচাঁদ নামেই সংসারে তিনি পরিচিত। কিন্তু জননীর নিকট চিরদিনই তিনি 'রাজু'।

রাজুর বয়স পনর বৎসর; নিবাস বীরজাওন গ্রামে, রাজু বড় ঘরের ছেলে। পিতা নয়নচাঁদ, গৌড় সুলতানের ফৌজদার ছিলেন। এক্ষণে পিতা গতাসু, মাতা বর্ত্তমান। জননী হরসুন্দরী অতিথি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, বল্‌তে পার, আমার রাজুর কপালে কি আছে ?"

জটাজুট-সমন্বিত বিভূতিবিলেপিত তেজোদীপ্ত-কলেবর সন্ন্যাসী-ঠাকুর হাস্যমুখে উত্তর করিলেন, "মা, আমি ত গণক নই।"

হরসুন্দরী। গণক না হইয়াও কি বলিতে পার না ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী। তোমার ছেলে কোথায় আছে, ডাক।

তখন ছেলেকে খুঁজিতে চারিদিকে লোক ছুটিল। ছেলে বড় দুরন্ত, বড় একটা ঘরে থাকে না। বৃহৎ অট্টালিকা, বিস্তীর্ণ উদ্যান, তা'তে তার মন টেঁকে না। কোথায় বাঘ, কোথায় ঘোড়া, এই করিয়া সমস্ত দিন বেড়ায়। পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের শক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। যে বাঘের সম্মুখে বড় বড় যোদ্ধারা একাকী যাইতে সাহস পাইত না, কালাচাঁদ অকুতোভয়ে অসিহস্তে তাহার সম্মুখীন হইত। একবার এতদঞ্চলে একটা ঘোড়া আসিয়াছিল, কেহ তাহার পৃষ্ঠে উঠিতে সাহস পায় নাই। বালক কালাচাঁদ লম্ফত্যাগে তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া স্বল্পকাল-মধ্যে তাহাকে বশীভূত করিল। বালকের এইরূপ সাহস ও শক্তির অনেক গল্প শুনা যায়।

বালক দুরন্ত হইলেও হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ছিল। তা' হইবারই কথা, ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া—পণ্ডিতকুলতিলক সায়নাচার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সে যখন অনন্যমনে সন্ধ্যাহ্নিক করিত, অথবা বিষ্ণুপূজায় বিনিবিষ্ট থাকিত, তখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইত, এমন শান্ত-শিষ্ট ছেলে বুঝি জগতে নাই।

কিন্তু গৃহবাহিরে বড় দুরন্ত। গ্রামের যত ছেলে জুটাইয়া বেশ একটা বড় দল করিয়াছিল। তাহাদের ঘোড়ায় চড়িতে, তরবারি চালনা করিতে শিক্ষা দিত। মুসলমানদের তখন অত্যাচার বেশী; কোন গ্রামই তাহাদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। কিন্তু এই বালক-সম্প্রদায়ের ভয়ে সে অঞ্চলে মুসলমান কোনও অত্যাচার করিত না।

এই বালক-সম্প্রদায়ের নেতা কালাচাঁদ। শুধু শক্তি ও সাহসে যে সে সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, তা' নয়, তাহার চরিত্রবলও যথেষ্ট ছিল। সে কখন মিথ্যা বলিত না, বা অধর্ম্মাচরণ করিত না। সে যাহা ধরিত, তাহা না করিয়া ছাড়িত না। মানুষ বা পশুকে কখন সে ভয় করিত না। তাহার উন্নত চরিত্র দেখিয়া, তাহার উন্নত ললাট, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সুগঠিত সুন্দর দেহ দেখিয়া সকলে তাহাকে কেমন একটু ভয় ও ভক্তি করিত।

কিন্তু এক জন তাহাকে ভয় করিত না। তাহার নাম গদাধর সান্যাল। গদাধর সাঁতোড়ের জমীদার-পুত্র। ধনে ও মানে গদাধর কালাচাঁদ অপেক্ষা বড়; কিন্তু বীর্য্য ও পরাক্রমে বুঝি ছোট। ছোট হইলেও গদাধর কখন কখন কৌশলে কালাচাঁদকে পরাস্ত করিত।

পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকিলেও উভয়ে উভয়কে ভালবাসিত, সম্মান করিত। উভয়ের মধ্যে কখন কখন কলহ হইত; কিন্তু কলহহেতু বাক্যালাপ বন্ধ থাকিলেও কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়িত না। এক জন বাড়ী গেলে, অপরে তাহার সঙ্গে যাইত; এক জন খাইতে বসিলে, অপরে তাহার পাত্রে খাইতে বসিত। কিন্তু যখন তাহারা বালকসম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া মল্লযুদ্ধ বা লক্ষ্যভেদ করিত, তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞান করিত।

কোন কোন দিন বালকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া মল্লযুদ্ধ বা লড়াই করিত। এক দলের নেতা কালাচাঁদ অপর দলের সর্দ্দার গদাধর। কালাচাঁদ কিছু উদ্ধত, কিছু ক্রোধী; সে যে দিন হারিত, সে দিন একটা রাগারাগি হইত। গদাধর কিন্তু তাহা গায়ে মাখিত না—হাসিয়া উড়াইয়া দিত।

প্রত্যহ অপরাহ্নে মল্লক্রীড়া চলিত; আজও চলিতেছিল। এমন সময় কালাচাঁদের গৃহ হইতে জনৈক ভৃত্য আসিয়া কহিল,—"মা-ঠাক্‌রুণ ডাক্‌ছেন।" মায়ের নাম শুনিয়া কালাচাঁদ আর কথা কহিল না,—খেলা ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যের অনুবর্ত্তী হইল। গদাধরও সঙ্গে চলিল।

যেখানে বসিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর, হরসুন্দরীকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিলেন, বালকদ্বয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হরসুন্দরী বলিলেন, "সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে প্রণাম কর।" বালকদ্বয় প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী, কালাচাঁদের ললাট নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "বালক মহা তেজস্বী—অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন—অস্ত্রকুশলী—"

হরসুন্দরী বাধা দিয়া বলিলেন, "ও সব কথা ত আমিও বল্‌তে পারি, ভাগ্যের কথা বল ঠাকুর।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না মা।"

জননী নীরব হইলেন। বালক, সন্ন্যাসীর দিকে আর একটু সরিয়া আসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "মা, তোমার পুত্র মহাযশস্বী হইবে—রাজ-রাজেশ্বর রাজার উপর রাজা হইবে—"

কালাচাঁদ বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল দেখি ঠাকুর, আমি কখন বাঙ্গালা হ'তে মুসলমান তাড়াতে পারব কি না?"

সন্ন্যাসী। তুমিই এক দিন—

কালাচাঁদ। আমিই এক দিন কি?

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বালকের ললাট উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না। জননী ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, মুখখানা এত বিমর্ষ করিলে কেন?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "মা, তোমার এ সন্তানকে অচিরে বিষপ্রয়োগে সংহার কর।"

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। গদাধর ছাড়িল না—সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল এবং সমীপস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কথাটা শেষ ক'রে যাও ঠাকুর! বন্ধু এক দিন কি হবে?"

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "নব বৎসর মধ্যে নিয়তি তাহা বলিয়া দিবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তার পর সাত বৎসর অতীত হইয়াছে। বালক এক্ষণে যুবক। সময় ধীরে ধীরে কালাচাঁদের দীর্ঘায়ত সুগঠিত দেহের উপর একটি একটি করিয়া সৌন্দর্য্য সাজাইয়াছে। জননী হরসুন্দরী পুত্রের বিবাহ-কারণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

সন্নিকটস্থ শ্রীপুর গ্রামে রাধামোহন লাহিড়ীর দুইটি কন্যা ছিল। দুইটিই সুন্দরী। তবে ছোটটির পার্শ্বে বড়টিকে রূপহীনা দেখাইত। বড়টির নাম ভূপবালা, ছোটটির নাম ব্রজবালা। ব্রজবালাকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই লালায়িত; কিন্তু ভূপবালার বিবাহ না হইলে ব্রজবালার বিবাহ হইতে পারে না। জননীর বড় ইচ্ছা, ব্রজবালার সহিত পুত্রের বিবাহ হয়। পুত্রেরও তাই বাসনা।

এক দিন গদাধর তাহার বন্ধুকে বলিল,—"কালাচাঁদ, তুমি ভূপবালাকে বিবাহ কর।"

কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি ব্রজবালাকে চাও?"

গদা। হাঁ।

কালা। তা' হ'তে পারে না গদা।

গদা। কেন হ'তে পারে না?

কালা। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ব্রজবালাকে বিবাহ কর্‌ব।

গদা। কবে প্রতিজ্ঞা করেছ?

কালা। যে দিন তা'কে দেখেছি।

গদা। তা'কে দেখেছ?

কালা। কতবার।

গদা। কালাচাঁদ।

কালা। কি গদা?

গদা। আমিও যে প্রতিজ্ঞা করেছি।

কালা। বেশ, দেখা যাক্‌, কে পায়।

তখন অপরাহ্ন। চারিদিকে বন, মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তর, মাথার উপর নীলাকাশ। নীলাকাশ-গায় একটা শুভ্রবর্ণ পাখী উড়িয়া যাইতেছিল, কালাচাঁদ ধনুক উঠাইয়া শরত্যাগ করিল; পাখী অচিরে পদতলে লুটাইয়া পড়িল। গদাধর বলিল, "কালাচাঁদ, যদি আমি সফলকাম হই?"

কালা। তা' হ'লে এ মুখ আর জনসমাজে দেখাব না।

গদা। কালাচাঁদ, এ প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ কর।

কালা। তুমি কেন কর না?

গদা। আমার সাধ্য থাকিলে তোমার জন্যে তাও করিতাম।

কালা। আমারও তাই।

উভয়ের মধ্যে কেমন একটা অপ্রীতি আসিয়া দাঁড়াইল। বাল্যকালের সৌহৃদ্য, স্নেহপ্রীতির বন্ধন দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। গদাধর বলিল, "কালাচাঁদ, কিছুতেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না?"

কালা। তুমি কি কখন আমায় সঙ্কল্পচ্যুত দেখেছ?"

গদা। বন্ধুর জন্যও সঙ্কল্প ছাড়বে না?

কালা। না—বাঙ্গালার সিংহাসনের জন্যেও না।

গদাধর নিরুত্তর হইল ক্ষণপরে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কালাচাঁদ, তুমি কি ব্রজবালাকে ভালবাস?"

কালা। বাসি—সেও বাসে।

গদা। সেও ভালবাসে?

কালা। হাঁ, সেও বাসে।

গদা। মিথ্যাকথা।

কালা। সাবধান গদাধর! কালাচাঁদকে মিথ্যা-বাদী বলিতে আজও কেহ সাহস করে নাই।

গদা। আমাকে মারিতে হয় মার: কিন্তু তবু বলিব, কালাচাঁদ, তুমি মিথ্যা বলিতেছ।

কালা। কালাচাঁদ জীবনে আজও মিথ্যা বলে নাই। শুন তবে গদাধর, আজিকার কথা নয়—এক বৎসর হইতে আমি ব্রজবালাকে ভালবাসিয়া আসিতেছি, এক বৎসর হইতে ব্রজবালাও আমাকে ভালবাসিয়া আসিতেছে। উভয়ে উভয়ের প্রণয়াসক্ত—উভয়ে উভয়েরই নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গদা। আমিও ওই রকম একটা কথা বলিতে পারি।

কালা। কি বলিতে চাও?

গদা। সে কথায় আর কাজ নাই—এখন চলিলাম।

কালা। না ব'লে যেতে পাবে না।

বলিয়া কালাচাঁদ উলঙ্গ তরবারিহস্তে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

গদাধর বলিল, "তুমি কি আমায় মারিতে চাও?"

কালা। ব্রজবালাকে যে ব্যভিচারিণী বলে, সে আমার বধ্য।

গদা। তবে আমায় বধ কর; কিন্তু যাহা একবার বলিয়াছি, তাহা শতবার বলিতেও পশ্চাৎ-পদ হইব না।

কালা। গদাধর!

গদা। আর কি কালাচাঁদ? তোমাতে আমাতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন ইচ্ছা হয়—সাধ্য থাকে, আমায় বধ কর। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখি, গদাধরও কখন মিথ্যা বলে না।

কালা। তুমি কি বলিতে চাও, ব্রজবালা তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ?

গদা। হাঁ।

কালা। সে, না তার বাপ্?

গদা। বাপের কথা কে ধরে? সে ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ—অর্থের দাস। আদেশ করিলে এখনই সে মাথায় করিয়া ব্রজবালাকে বহিয়া আনিয়া দেয়। আমি ব্রজবালার কথা বলিতেছি।

কালাচাঁদ কোন উত্তর করিল না; অসি-অগ্রভাগ ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত করিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া বলিল,—"যাও গদাধর, আর কখন আমার সম্মুখে আসিও না।"

গদা। অকারণ গর্ব্ব ও তেজ দেখাইয়া কোন পৌরুষ নাই, কালাচাঁদ রায়!—তোমার বাহুতে যেমন শক্তি আছে, অনেকেরই তেমনি আছে।

কালা। "না, তা' নাই, একদিন তা' দেখিবে।" বলিয়া কালাচাঁদ দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কালাচাঁদ গৃহে ফিরিয়া মায়ের কাছে বলিল, "মা, আমি তোমার বধূ আনিতে চলিলাম। যদি রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বে ফিরিয়া না আসি, তাহা হইলে জানিবে, তোমার পুত্রের সহিত এ জীবনে আর সাক্ষাৎ ঘটিল না।"

হরসুন্দরী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে বাবা?" কিন্তু সে কথার কে উত্তর দেয়? কালাচাঁদ তখন অশ্বারোহণে শ্রীপুর-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে।

শ্রীপুর গ্রামের একপ্রান্তে রাধামোহনের ঘর। ঘর অতি সামান্য। সামান্য হইলেও তন্মধ্যে যে মহামূল্য রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তাহা অনেক ধনী ভূস্বামীর গৃহে নাই। কালাচাঁদ সেই রত্নলাভাশায় বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

গ্রাম-মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কালাচাঁদ দূর হইতে দেখিতে পাইল, দুইটি মেয়ে কলসীকক্ষে জল আনিতে পুষ্করিণীর দিকে আসিতেছে। পুষ্করিণী গ্রামের বাহিরে। তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে

বড় বড় দীর্ঘিকা ছিল। এখন সে সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। তখন পুষ্করিণী খনন পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এখন লোক পুণ্য খুঁজে না, শুধু নাম খুঁজে। তখন পরোপকার লক্ষ্য ছিল, এখন নিজের উপকার লক্ষ্য হইয়াছে, সুতরাং এখন জলাশয় কমিয়া যাইতেছে—চিকিৎসালয় বাড়িতেছে।

যে দুইটি মেয়ে দীর্ঘিকায় জল আনিতে যাইতেছিল, তাহারা রাধামোহনের কন্যা। ভূপবালা আজও ষোড়শ বৎসর অতিক্রম করে নাই; ব্রজবালা তার চেয়ে এক বৎসরের ছোট। ভূপবালা নিরক্ষরা—ব্রজবালা বিদুষী। দুই জনেই সুন্দরী; কিন্তু ব্রজবালাকে দেখিলে ভূপবালার দিকে ফিরিয়া চাহিতে বাসনা হয় না। ভূপবালা গম্ভীরবদনা—ব্রজবালা সদাহাস্যমুখী; ভূপবালা ধীরা, সদা সঙ্কুচিতা—ব্রজবালা চঞ্চলা, গর্ব্বিতা; ভূপবালা লজ্জাবিনম্রবদনা, ব্রজবালা লজ্জাপরিশূন্যা। একটি মল্লিকা—অপরটি স্থল-পদ্মিনী। একটি অন্ধকারের আবরণ পৃথিবীতে না পড়িলে ফুটে না—অপরটি সূর্য্যালোকে জগৎ উদ্ভাসিত না হইলে ফুটিতে চায় না। সুতরাং ব্রজবালা নয়নরঞ্জিনী চিত্তোন্মাদকারিণী রূপসী-শিরোমণি।

কালাচাঁদ অশ্বারোহণে আসিতেছে দেখিয়া ব্রজবালা গতি মন্থর করিল। ভূপবালা সমভাবে চলিতে লাগিল,—পথের পানে চাহিয়া আনতবদনে চলিতে লাগিল। কালাচাদ বুঝিল, ব্রজবালা ভালবাসে, তাই সে গতি মন্থর করিল। সমীপস্থ হইয়া বলিল, "ব্রজবালা, আমি তোমার নিকটে এসেছি।"

ব্রজবালা উত্তর করিল না,—শুধু একবার নীলোৎপল তুল্য নয়ন তুলিয়া কালাচাঁদের পানে চাহিল। দৃষ্টিতে কটাক্ষ ছিল না, কিন্তু হাসি ছিল। ব্রজবালার চক্ষু দুইটি আকর্ণ-বিস্তৃত—বড় সুন্দর—নীল পদ্মের উপর যেন কৃষ্ণকায় চঞ্চল ভ্রমর উড়িয়া বেড়াইতেছে। কালাচাঁদ মুগ্ধচিত্তে নীলপদ্ম দেখিতে লাগিল। ব্রজবালা আর অপেক্ষা করিতে পারে না—ভূপবালা অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছে। ব্রজবালা দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে চলিতে লাগিল। কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "ব্রজবালা, তুমি আমাকে ভালবাস?"

ব্রজবালা। কতবার বল্‌ব?

কালাচাঁদ। আর একবার বল।

ব্রজবালা। বাসি।

কালাচাঁদ। আর কাহাকেও বাস না?

ব্রজবালা সহসা ঘুরিয়া কালাচাঁদের পানে চাহিল—মুহূর্ত্তের জন্য তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিল; পরে বলিল, "না।"

কালা। সত্য বলিতেছ?

ব্রজ। হাঁ।

কালা। মাথার উপর নীলাকাশ; তার উপর ভগবান্—তুমি সত্য বলিতেছ?

ব্রজবালা একবার আকাশ পানে চাহিল; তথায় সকলই শূন্য দেখিল। পরে ফিরিয়া অগ্রগামিনী ভগিনীর পানে চাহিয়া দেখিল; সেও অনেকটা দূরে। ব্রজবালা নিঃসঙ্কোচে উত্তর করিল,—"সত্য বলিতেছি।"

কালাচাঁদ সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল; সহাস্যমুখে প্রেমার্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রজ, আমায় বিবাহ করবে?" ব্রজ উত্তর না করিয়া শুধু একবার সলজ্জ সহাস্য দৃষ্টিতে কালাচাঁদের পানে চাহিল। কালাচাঁদ সেই দৃষ্টিটুকু লইয়া ব্রজবালার পিতৃভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাধামোহনের গৃহে কালাচাদ সচরাচর আসিত; সুতরাং তাহাকে দেখিয়া গৃহস্বামী কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। কিন্তু কালাচাঁদ যখন বলিল,"লাহিড়ী মহাশয, আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করতে এসেছি, তখন রাধামোহনের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি বলিলেন, "বেশ বাবা, বেশ! তোমার মত জামাই পাওয়া ত ভাগ্যের কথা। তা' বিবাহ কবে হবে?"

"আজই।"

"আজই?"

"হাঁ, সন্ধ্যার পরে।"

"সে কি বাবা, আমার যে কোন যোগাড় নেই।"

"কোন যোগাড়ের প্রয়োজনও নেই, শুধু একটি পুরোহিত আবশ্যক। তা' গ্রামে তা'র অভাব কি?"

লাহিড়ী মহাশয়ের নগ্ন স্কন্ধের উপর একখানা গামছা ছিল। তিনি তাহা বাম স্কন্ধ হইতে উঠাইয়া দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিলেন; শামুক টিপিয়া এক টিপ নস্য গ্রহণ করিলেন; পরে কেশ-বিরল মস্তকে হস্ত বিমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "তা পুরোহিতের অভাব কি?"

"তবে আয়োজন করুন।"

আয়োজন কি করিতে হইবে, তাহা লাহিড়ী

মহাশয় জানেন না ; তিনি সাদাসিধা লোক, সংসারের ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তিনি স্মৃতি, ন্যায়, পুরাণ লইয়া থাকেন ; গৃহিণী সংসার দেখেন, প্রাপ্যাদি আদায় করেন, গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে প্রয়োজন অপ্রয়োজনে কোন্দলাদি করেন। সুতরাং কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তার এলাকার বহির্ভূত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তা, গৃহিণীর শরণাপন্ন হইলেন।

গৃহিণী তখন গোশালায় দুগ্ধদোহনে বিনিযুক্ত। কর্ত্তা সংবাদ দিলেন, "তোমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত।"

গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গাভী ও বৎস উভয়েই পরিত্রাণ পাইল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাত্র কে গো?"

কর্ত্তা। কালাচাঁদ রায়।

গৃহি। বেশ পাত্র, বেশ ছেলে! ভূপিও কালাচাঁদকে ভালবাসে।

কর্ত্তা। কেমন ক'রে জানলে?

গৃহি। কেমন ক'রে আবার জানলুম? আমি কি কাণা, না আমি কখন কাউকে ভালবাসি নি?

কর্ত্তা মানিয়া লইলেন, গৃহিণী চক্ষুর্বিশিষ্টা ও ভালবাসিতে সম্পূর্ণ সমর্থা। গৃহিণী তবু ছাড়িলেন না,—তিনি সহাস্যে বর্ণন করিতে লাগিলেন, তিনি কিরূপে কৈশোরে বধূ-জীবনে একাকিনী লুকাইয়া রাধামোহনকে দেখিতেন—তিনি কিরূপে দেখা না দিয়া দেখিবার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতেন—

কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "সে সব কথা এখন থাক্—সময় অল্প, তুমি এখন বিবাহের উদ্যোগ কর গে।"

গৃহি। বিয়ে কবে?

কর্ত্তা। আজ।

গৃহি। সে কি গো!

কর্ত্তা। তা' আমি কি করব? ছেলে জিদ ধরেছে। কাজেই আমাকে সম্মতি দিতে হয়েছে।

গৃহি। সম্মতি দিলেই হ'ল কি? ঘরে ত কিছু থাকা চাই ; যোগাড় কোথা হ'তে হবে?

কর্ত্তা। ছেলে বলে, যোগাড়ের প্রয়োজন নেই—শুধু পুরোহিত ডাক।

গৃহি। আজ দিন ভাল?

কর্ত্তা। উত্তম দিন—অধিকন্তু সুতহিবুক যোগ—

গৃহি। ও সব রাখ। তা আমাদের কিছু খরচ হবে না?

কর্ত্তা। কিছু না।

গৃহিণী আহ্লাদে পরিপ্লুত হইলেন। হইবারই কথা ; অরক্ষণীয়া কন্যা বিনাব্যয়ে পাত্রস্থা হইতে চলিল। পাত্র আবার যে সে নয়,—রূপে, গুণে, কুলশীলে বাসবতুল্য। গৃহিণীর আনন্দ দেখিয়া কর্ত্তা দন্তরাজি আকর্ণ বিস্তার করিয়া হাসিলেন, এবং দক্ষিণ-স্কন্ধের গামছা বামস্কন্ধে ফেলিয়া পুরোহিত অন্বেষণে যাত্রা করিলেন।

পুষ্প, চন্দন, শালগ্রাম-শিলাদি লইয়া পুরোহিত যথাসময়ে বিবাহ দিতে আসিলেন। পুরোহিত আসিল দেখিয়া পাড়ার লোকেরা ব্যাপার কি দেখিতে আসিল। মেয়েছেলে সকলে শুনিল, কালাচাঁদের সঙ্গে ভূপবালার বিবাহ। ব্রজবালাও শুনিল ; সে বড় একটা দুঃখিত হইল না, কিন্তু বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইল। বাণাহতা ব্যাঘ্রী যেমন গর্জ্জিয়া উঠে, সেও তেমনই গর্জ্জিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার গর্জ্জন কেহ শুনিল না, ক্রোধও কেহ দেখিল না। সে হাস্যমুখে আলিপনা দিতে লাগিল, পিঁড়ির অপর পৃষ্ঠে পিটুলী-গোলা জলে শুধু লিখিল,—

বিলোক্য পরদার-প্রেমাভিমত্তং
চন্দ্রমসং তং প্রযুক্তমনসম্।
বিদার্য্য শতধা ক্রোধনো গদাপাণিঃ
সমাকিবরস্তসি হ্রমাতিমবারুতে॥

কি লিখিল, না লিখিল, কেহ তাহা দেখিল না—বুঝিল না। সকলে তখন কনেকে সাজাইতে ব্যস্ত। সাজাইবার কিছু নাই। ফুল-চন্দনে যতদূর হয়, ততদূর হইল। ফুলচন্দন ছাড়া আর একটা জিনিস ছিল,—সেটা ভূপবালার বিমল আনন্দোচ্ছ্বাস। ভূপবালা ফুলহারে সাজিয়া, চন্দনে চর্চ্চিত ও বিমল জ্যোতিতে স্নাত হইয়া পাত্রের নিকট আনীত হইল, কালাচাঁদ বলিল, "এ কে? ব্রজবালা কই?"

রাধামোহন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রজবালা?"

সুদূরশ্রুত অশনিনিনাদতুল্য গর্জ্জিয়া কালাচাঁদ বলিল, "হাঁ, ব্রজবালা—একে কে চায়?"

অশনি ভূপবালার মাথায় পড়িল। কিন্তু সে মরিল না, মরিলে বুঝি ভাল ছিল ; হতভাগিনী নীরবে অধোবদনে বসিয়া রহিল। রাধামোহন ভাবিলেন, কালাচাঁদ হয় ত ভূপবালাকে চিনিতে পারে নাই। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—

"এটি আমার কন্যা ভূপবালা।"

কালাচাঁদ উগ্রভাবে বলিল, "তোমার ভূপবালাকে যথা ইচ্ছা দান কর গে, আমায় ব্রজবালা দাও।"

রাধামোহনের মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পুরোহিতের পানে চাহিলেন। পুরোহিত তখন মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, "জ্যেষ্ঠা কন্যা পাত্রস্থা না হইলে কনিষ্ঠা উদ্বাহিতা হইতে পারে না।"

কথাটা কালাচাঁদের স্মরণ ছিল না। অপরাহ্নে গদাধর কেমন গোল বাধাইয়া দিয়াছিল। এক্ষণে এই গুরুতর আপত্তির কথা শুনিয়া কালাচাঁদ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, ভূপবালা চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। আত্মীয়েরা তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে গৃহান্তরে লইয়া গেল। সেখানে জননীর যত্নে সত্বরই ভূপবালা চৈতন্যলাভ করিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল, ঘরে আর কেহ নাই। তখন অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "মা।"

জননী উত্তর করিলেন,—"কি মা?"

ভূপ। মা, আমি চিরকাল এমনই থাকিব, তুমি ব্রজবালাকে পার কর।

মা। সে কি ভূপ?

ভূপ। কেন মা, তোমাদের কাছেই না হয় চিরকাল থাকিলাম।

মা। আমরা আর ক'দিন মা?

ভূপবালা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় রাধামোহন হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "কালাচাঁদ দুই জনকেই বিবাহ করিতে চায়।"

গৃহিণী। দুই মেয়েকে?

কর্ত্তা। হাঁ।

গৃহিণী। তোমার মত কি?

কর্ত্তা। আমি ত বিশেষ কোন আপত্তি দেখি না, কুলীনের ঘরে এমন অনেক ঘটে। তা' তোমার মত না হ'লে ত কিছু হবে না।

গৃহিণী নিরুত্তর রহিলেন। গৃহকোণে মৃন্ময় দীপাধারে ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছিল; গৃহিণী দীপ পানে চাহিয়া একটু কি ভাবিলেন। বোধ হয়, গদাধরকে তাঁহার মনে পড়িল। গৃহিণীর বড় ইচ্ছা ছিল, রাজকুমারের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। তিনি এই কামনা বুকে ধরিয়া গ্রাম্য-দেবতা ভীমেশ্বরের মন্দিরে কত মাথা কুটিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ হইল, এক জন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিল, ব্রজবালা রাজরাণী হইবে। এক্ষণে সব আশা চূর্ণ হইল। গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন,—"তাই হো'ক।"

কর্ত্তা প্রস্থান করিলেন, ভূপবালা ডাকিল, "মা!"

জননী উত্তর না দিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। কন্যা বলিল, "ছি!"

জননী নয়ন ফিরাইয়া লইলেন—কোনও উত্তর করিলেন না। কন্যা বলিল, "এখনও বাবাকে ফিরাও!"

জননী। ভবিতব্য কে খণ্ডাবে মা?

ভূপ। ভবিতব্য ত মানব নিজেই সৃষ্টি করে।

জননী। এখন আর ফিরবার উপায় নাই—বাগ্দান এতক্ষণ হয়ে গেছে।

বাগ্দান হইয়াও গিয়াছিল। তৎপরে কন্যাদান হইল। কালাচাঁদ দুইজনকেই বিবাহ করিল—ছাড়িল না। তবে ভূপবালাকে সঙ্গে লইয়া গেল না—শুধু ব্রজবালাকেই লইল। বিবাহের পর রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় ব্রজবালাকে শিবিকায় উঠাইয়া কালাচাঁদ অশ্বারোহণে গৃহে ফিরিল।

পরদিন প্রভাতে আসিয়া গদাধর দেখিল, রাধামোহনের গৃহ নিরানন্দ। শুনিল, কালাচাঁদ পূর্ব্বরাত্রিতে ব্রজবালাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়াছে। শুষ্ক ফুল, ছিন্ন মালা, উৎসৃষ্ট চন্দন চণ্ডীমণ্ডপের স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। আলিপনা দেওয়া পিঁড়িখানি দেওয়ালের গায় হেলান রহিয়াছে। পিঁড়িতে কি লেখা ছিল গদাধর পড়িল;—

বিলোক্য পরদারপ্রেমাভিমগ্নং
চন্দ্রমসং তং প্রফুল্লমনসম্।
বিনীয্য শত্রুং ক্রোধেন গদাপাণিঃ
সমাকিরন্নভসি হ্রমাত্তিমিবাবৃতে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তার পর আরও দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। কালাচাঁদ দেখিল, ব্রজবালাকে লইয়া যতটা সে সুখী হইবে মনে করিয়াছিল, ততটা সুখী হইতে পারিল না। ব্রজবালা ক্রোধী, গর্ব্বিতা, মুখরা, উদ্ধতা। ব্রজবালা আত্মসুখ-পরায়ণা, নির্ম্মম, হৃদয়হীনা। ব্রজবালা ঘোর আত্মাভিমানিনী, লজ্জাসঙ্কোচ-পরিশূন্যা। কিন্তু তার রূপ আছে—নিরুপম, অতুলনীয় রূপ। যৌবনের সঙ্গে রূপ দিন দিন বাড়িতেছিল। বিধাতা যেন সৌন্দর্য্যরাশি আহরণ করিয়া আনিয়া তাহার অঙ্গে অঙ্গে সাজাইতেছিলেন। কিন্তু রূপের তৃষ্ণা, রূপের মোহ কত দিন? পিপাসা মিটিয়া গেলে স্বচ্ছ

নির্ঝরিণীর জলও ভাল লাগে না। দুই বৎসরের মধ্যেই কালাচাঁদের ভুল ভাঙ্গিল। তখন সে পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজবালা ভাবিয়াছিল, সে বুঝি রূপের মোহে কালাচাদকে চিরদিন আচ্ছন্ন রাখিতে পারিবে। যখন দেখিল, কালাচাঁদ উপাসক না থাকিয়া সমালোচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহার ক্রোধ, আত্মাভিমান আরও গর্জ্জিয়া উঠিল। যতই সে কালাচাঁদকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল, ততই কালাচাদ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে এমন এক দিন আসিল, যে দিন কালাচাঁদ ভাবিল, এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে গৃহে আনিয়া ভাল করি নাই।

তখন ভূপবালাকে মনে পড়িল। ভূপবালা পিতৃগৃহে; এক দিনের জন্যও সে শ্বশুরালয়ে আসে নাই। অভাগিনী ভূপবালা যেখানে ফুটিয়াছিল, হতাদরে সেইখানেই শুকাইতেছিল। এক দিনের জন্যও সে শ্বশুরালয়ের নাম করে নাই, এক দিনের জন্যও সে নিজের দুঃখের কথা মুখ ফুটিয়া অপরকে বলে নাই; অনাঘ্রাত বনকুসুমের মত নির্জ্জনে ফুটিয়া নির্জ্জনে শুকাইতেছিল।

বহুকাল পরে তাহাকে কালাচাঁদের মনে পড়িল—বহুকাল পরে সেই চিরলাঞ্ছিত বিস্মৃত-প্রায় ভার্য্যাকে কালাচাঁদের স্মরণ হইল। প্রাবৃট্‌কালে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের দিনে সূর্য্যকে যেমন মনে পড়ে, ভূপবালাকে কালাচাঁদের তেমনই মনে পড়িল; কিন্তু তাহার মুখখানি কি রকম, কালাচাঁদ তাহা কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিল না।

কালাচাঁদ এক দিন অপরাহ্ণে পালঙ্কোপরি বসিয়া ব্রজবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপবালাকে মনে পড়ে?"

ব্রজবালা শয্যায় শুইয়া মেঘদূত পড়িতেছিল; পুথি হইতে নয়ন উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বল দেখি?"

কালাচাঁদ। তাহাকে আনিব ভাবিতেছি।

ব্রজবালা। কোথায়?

কালাচাঁদ। এখানে।

ব্রজবালা পুথি ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমি থাকিতে এখানে অপরের স্থান হইতে পারে না।"

কালাচাঁদ। সে কথা আমি বুঝিব,—তুমি কে?

ব্রজ। আমি কে? এরই মধ্যে বিস্মৃত হয়েছ, আমি কে? ভাল, আগেকার কথা না তুলে, এখনকার পরিচয়ই দি,—আমি তোমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী, গৃহকর্ত্রী।

কালা। ভূপবালাও আমার স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী—

ব্রজ। সে তোমার উপপত্নী।

কালা। ব্রজবালা!

ব্রজ। ভয় দেখাচ্ছ? ভয় কা'কে বলে, ব্রজবালা তা' জানে না। আমি শতবার বল্‌ব, ভূপবালা তোমার উপপত্নী।

কালা। তুমি নির্লজ্জ।

ব্রজ। সত্যবাদী মাত্রেই নির্লজ্জ। তুমি সত্য ক'রে বল দেখি—মাথার উপর আকাশ, তার উপর ভগবান্, তুমি সত্য ক'রে বল দেখি, তুমি কি শুধু ব্রজবালাকে বিবাহ কর্‌তে যাও নি?

কালা। গিয়েছিলাম, কিন্তু—

ব্রজ। তুমি কি আমার জন্যে তোমার বাল্যবন্ধু গদাধরের সহিত কলহ কর নি? তুমি কি এক দিন সন্ধ্যাকালে উন্মত্ত হৃদয়ে ছুটে গিয়ে পিতার নিকট করযোড়ে ব্রজবালাকে ভিক্ষা কর নি? তুমি কি বিবাহ-সভায় ভূপবালাকে উপেক্ষা ক'রে ব্রজবালার জন্য লালায়িত হও নি?

কালা। হয়েছিলাম, কিন্তু ব্রজবালাকে আগে বিবাহ করি নি—ভূপবালাকে করেছিলাম।

ব্রজ। যা'কে আগে বিবাহ করেছ, সেই বুঝি তোমার স্ত্রী?

কালা। সেই আমার সহধর্ম্মিণী।

ব্রজ। আর পরে যাকে বিবাহ করেছ?

কালা। সে?—সে—

ব্রজ। উপপত্নী—উত্তম। যে তোমার স্ত্রী, তাহাকে লইয়া থাক—উপপত্নীকে বিদায় দাও। এক গৃহে স্ত্রী ও উপপত্নীর স্থান হইতে পারে না।

কালা। ব্রজবালা, তুমি পাপিষ্ঠা।

ব্রজ। আর তুমি ধার্ম্মিকচূড়ামণি, না? এক জনের হৃদয় পদদলিত করিয়া কুক্কুরীর ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আর এক জনকে বলি দিবার অভিপ্রায়ে যূপকাষ্ঠ নির্ম্মাণ করিতেছ: তুমিই ধর্ম্মস্তম্ভ।

কালাচাঁদ উত্তর করিল না; শয্যা ছাড়িয়া গবাক্ষ-সন্নিধানে আসিয়া দাড়াইল। গবাক্ষ-পথ দিয়া আকাশ, প্রান্তর, নদী দেখা যাইতেছিল। কালাচাঁদ মহাশূন্য পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রজবালা মেঘদূত উঠাইয়া লইয়া পুথি পানে চাহিয়া রহিল।

কালাচাঁদ দেখিল, আকাশ যেন প্রান্তরের বুকের উপর ক্রমে নামিয়া আসিতেছে। আকাশ যত নামিয়া আসিতেছে, পৃথিবী তত নামিয়া যাইতেছে। দূরে পর্ব্বতমালা মস্তক উন্নত করিয়া আকাশকে

ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছে। আকাশ বাধা মানিতেছে না,—পৃথিবীকে পিষিয়া মারিবার উপক্রম করিতেছে। অবশেষে পৃথিবী সরিয়া গেল—পর্ব্বতমালা কোথায় মিলাইয়া গেল,—আকাশতলে রহিল, কালাচাঁদ একা। কালাচাঁদ যে দিকে চায়, সেই দিকে আকাশ,—ধূম্রকায় দীপ্তিশূন্য অনন্ত অসীম আকাশ। কালাচাঁদ অবলম্বন খুঁজিল, পাইল না। কালাচাঁদের দৃষ্টি রুদ্ধ হইল, শ্বাস বন্ধ হইল।

অনেকক্ষণ পরে কালাচাঁদ সংজ্ঞা লাভ করিল। তখন সে বাতায়ন হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল, "অনেক আশা করিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, ব্রজবালা।"

ব্রজবালা পুথি হইতে নয়ন না উঠাইয়া অতি রুক্ষস্বরে বলিল, "আমিও অনেক আশা বুকে ধরিয়া সকলকে ঠেলিয়া তোমাকে বিবাহ করিয়াছিলাম।"

কালা। সকলকে ঠেলিয়া ?

ব্রজ। হাঁ, সকলকে ঠেলিয়া। তুমি যেমন এক দিন আমার উপাসক ছিলে, তেমনিই অনেকে ছিল।

কালা। গদাধরের কথা বলিতেছ ?

ব্রজ। নামে প্রয়োজন কি ?

তখন গদাধরের বিস্মৃত-প্রায় কথাগুলি কালাচাঁদের স্মরণপথে উদিত হইল। সে এক দিন আকাশতলে বনরাজিবেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল—'গদাধরও কখন মিথ্যা বলে না।' কালাচাঁদ ভাবিল, "তবে গদাধর কি সত্য বলিয়াছিল ?" জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধর কি তোমাকে বিবাহ করুতে চেয়েছিল ?"

"চেয়েছিল—শতবার চেয়েছিল।"

কালাচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তার পর সরিয়া গেল; দূরে গবাক্ষসন্নিধানে আসিয়া পুনরায় দাঁড়াইল। আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়, নদী সব দেখিল। তার পর আবার ফিরিয়া গিয়া ব্রজবালার অতি সন্নিকটে দাঁড়াইল; এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্রজবালার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দন্তে দন্ত চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি তাকে ভালবাসিতে ?"

ব্রজ। আমি ?—আমি—?—তুমি নির্ব্বোধ।

কালা। শতবার নির্ব্বোধ; নইলে তোমায় বিবাহ করি ?

ব্রজ। তুমি অকৃতজ্ঞ।

কালা। আমি অকৃতজ্ঞ নই,—তুমিই অকৃতজ্ঞ ব্রজবালা! মানুষ, মানুষকে যতটা দিতে পারে, আমি তোমাকে ততটা দিয়েছিলাম।

বলিয়া কালাচাঁদ কক্ষত্যাগ করিল। স্ত্রীর সহিত কলহ করা তাহার অভিপ্রায় নহে। সে অনেক সহিয়াছে, ব্রজবালার শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছে; কিন্তু আজ আর পারিল না—ধৈর্য্যচ্যুত হইল। সে মায়ের কাছে গিয়া বলিল, "মা, বড় বউ কি চিরদিন পিত্রালয়েই থাকৃবে ?"

মায়ের অপরাধ কি, তাহা ত জানি না। পুত্র বড় বউকে আনিতে ইচ্ছা করে নাই, সুতরাং তাহাকে আনা হয় নাই, তবে ছেলের নিকট মা চিরদিনই অপরাধী; মায়ের নিকট ছেলে কখন অপরাধী নয়। এক্ষণে পুত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র জননী আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "থাকৃবে কেন ? আমি এখনই লগ্ন দেখিয়ে তাকে আনাবার ব্যবস্থা করছি।"

জননী ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরোহিতের নিকট লোক পাঠাইলেন। অসময়ে তলব পাইয়া পুরোহিত মহাশয় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তবে পাঁজি-পুথি আনিতে ভুলিলেন না। সেটা সকল সময়ে দ্বিতীয় বস্ত্রের ন্যায় পুরোহিত মহাশয়ের সঙ্গে থাকিত। তিনি অনেক গণনার পর দিন-স্থির করিয়া দিলেন,—পরদিন প্রভাতে দশ দণ্ডের পর বধূকে আনিবার লগ্ন স্থির হইল। সে সংবাদ সকলে শুনিল,—ব্রজবালাও শুনিল। কিন্তু কাহাকেও সে কিছু বলিল না—স্বামীর সহিতও আর সাক্ষাৎ করিল না। গভীর নিশীথে যখন সকলে সুপ্ত, তখন সে তাহার অলঙ্কার ও অর্থ লইয়া গৃহত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কালাচাঁদ দেখিল, তাহার কক্ষমধ্যে হর্ম্ম্যতলে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানা ব্রজবালার। উঠাইয়া লইয়া কালাচাঁদ পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল,—

"তুমি ভেবেছ কালাচাঁদ, ব্রজবালা তোমার খেলার পুতুল—ব্রজবালা বিলাসের উপাদান! ভুল বুঝেছ মূর্খ! ব্রজবালা দাসী হ'তে জন্মগ্রহণ করে নি—ব্রজবালা ললাটে রাজমুকুট ধারণ ক'রে সিংহাসনে বস্‌তে জন্মেছে।

যে রূপ পৃথিবীতে দুর্ল্লভ—দিল্লীশ্বরের ঈপ্সিত, আকাঙ্ক্ষিত, তুমি তাহা উপভোগ করুতে পেয়েছিলে; কিন্তু তুমি আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে না ক'রে, নিজের ভাগ্যলক্ষ্মীকে পদাঘাতে দলিত করলে।

আমি চলিলাম—তোমার পাপগৃহ ছাড়িয়া—তোমার নীচ-সংসর্গ ছাড়িয়া জন্মের মত চলিলাম। ভরসা আছে, এক দিন আবার সাক্ষাৎ হইবে; তখন দেখিব, কে বলবান্—কে কাহাকে দুর্ব্বল পাইয়া পীড়ন করে।"

পত্রে স্বাক্ষর নাই—স্বাক্ষরের প্রয়োজনও নাই। পত্র পড়িতে পড়িতে কালাচাঁদ দ্বাদশ সূর্য্যের তেজে জ্বলিয়া উঠিল, যে ক্রোধানল—আগ্নেয় ভূধরের সঞ্চিত অনলরাশির তুল্য—এত দিন শমিত ছিল, তাহা আজ জ্বলিয়া উঠিয়া কালাচাঁদের ধৈর্য্য, হিতাহিত-জ্ঞান ভস্মীভূত করিল কালাচাদ কাহাকেও কিছু না বলিয়া অসি-হস্তে অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ করিল। তাহার রুদ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না।

কালাচাদ গৃহত্যাগ করিয়া গদাধরের অট্টালিকা অভিমুখে ধাবিত হইল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল,—"এত দিন আমি দুর্ব্বল ছিলাম, আজ আমি সবল। এত দিন আমি পীড়ন করিতে অসমর্থ ছিলাম, আজ আমি সম্পূর্ণ সমর্থ।"

কালাচাঁদ অচিরে গদাধরের অট্টালিকা-দ্বারে আসিয়া উপনীত হইল। শুনিল, গদাধর তথায় নাই। গদাধর ছিলও না। সে এখানে বড় একটা আর থাকে না। প্রয়োজন হইলে কখন কখন আসে; নতুবা সাঁতোড়ে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। সাঁতোড় এখান হইতে অনেকটা পথ। সেইখানেই ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজধানী। বীরজাওন গ্রামে বিস্তীর্ণ জমীদারী ছিল বলিয়া তথায় একটা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল; এবং এক জন প্রবীণ কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিয়া গদাধর কাজকর্ম্ম শিক্ষা করিত।

গদাধরের পিতা তখন জীবিত ছিলেন। তিনি সাঁতোড়ে থাকিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শক্তিধর তাৎকালিক রাজধানী গৌড়ে থাকিতেন। গদাধর বীরজাওনে থাকিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন। কিন্তু গত দুই বৎসর হইতে এতদঞ্চলে বড় একটা সে আসে না।

কালাচাঁদ যখন আসিয়া দেখিল, গদাধর প্রাসাদে নাই, তখন সে সাঁতোড়ের পথ ধরিল, অনেকটা পথ যাইবার পর কালাচাঁদ দেখিল, কে এক জন অশ্বারোহী বীরজাওন অভিমুখে আসিতেছে। তাহার সঙ্গে প্রায় বিংশতি সশস্ত্র শরীর-রক্ষী। কালাচাঁদ ক্রমে নিকটস্থ হইল; তখন অশ্বারোহীকে কালাচাঁদ চিনিল,—সে গদাধর।

উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। দুই বৎসরের পর এই সাক্ষাৎ। দুই বৎসর সময়-সাগরে বিন্দু-মাত্র; বিন্দু হইলেও দাগ রাখিয়া গিয়াছে। গদাধরের আর সে শ্রী নাই, লাবণ্য নাই—সব শুকাইয়া গিয়াছে। গদাধর দেখিল, কালাচাদের লাবণ্য যেন উছলিয়া উঠিতেছে—কালাচাদ যেন সুখ ও সমৃদ্ধিতে, তেজ ও শক্তিতে ফাটিয়া পড়িতেছে। গদাধর কিছু না বলিয়া পথ অতিক্রম করিবার উদ্যোগ করিল। কালাচাদ নড়িল না; ডাকিল, "গদাধর।"

গদাধর কি ভাবিতেছিল; সে চমকিয়া উঠিয়া কালাচাদের মুখপানে চাহিল। কালাচাদ কঙ্কস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধর, ব্রজবালা কোথায়?"

গদাধর উত্তর না করিয়া বিস্ময় চমকিত নয়নে কালাচাদের পানে চাহিয়া রহিল। কালাচাদ বলিল, "গদাধর, শঠতা ছাড়—সত্য কথা বল।"

গদাধর। কি বলিব?

কালা। ব্রজবালা কোথায়?

গদা। তাহা তুমি ভাল জান।

কালা। আবার শঠতা!

গদা। গদাধর শঠতা জানে না—মিথ্যা জানে না, গদাধর চিরদিন নির্ভীক, সত্যবাদী।

কালা। দুই বৎসর পূর্ব্বে বনরাজিবেষ্টিত প্রান্তরের মধ্যে দাড়াইয়া মিথ্যা বল নাই?

গদা। না।

কালা। আজ বলিতেছ না?

গদা। না।

কালা। ধর্ম্ম সাক্ষী?

গদা। হা।

কালা। তুমি ধর্ম্মদ্রোহী মিথ্যাবাদী।

গদা। যে নিজে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, সে জগৎকে অসত্যময় দেখে।

কালা। তুমি যদি সে দিন সত্য বলিয়া থাক, তবে আজ মিথ্যা বলিতেছ

গদা। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে।

কালা। সাবধান গদাধর, আগুন লয়ে খেলা ক'র না।

গদা। এ ভয় শিশুকে দেখাও গে—এখন পথ ছাড়।

কালাচাঁদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া পথ ছাড়িল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে তোমার অনুচরের মধ্যেও মারিতে পারিতাম।"

কথা কয়টা এক জন বৃদ্ধ সৈনিকের কাণে গেল।

সে বাল্যকাল হইতে সাঁতোড়-রাজের চাকরী করিয়া আসিতেছে। আজ রাজকুমারকে অপমানিত হইতে দেখিয়া সে আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না,—ধনুক উঠাইয়া শরযোজনা করিল। কালাচাঁদ তখনও নিকটে, বেশী দূর যাইতে পারে নাই। বৃদ্ধ সৈনিক অশ্বদেহ লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিল। কালাচাঁদ অচিরে অশ্বসহ ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

শব্দে চমকিত হইয়া গদাধর পিছন ফিরিয়া দেখিল, ধূলিধূসরিত কালাচাদ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে মৃতপ্রায় অশ্ব-সান্নিধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; বৃদ্ধ সৈনিক দ্বিতীয় শর ধনুকে যোজনা করিয়া কালাচাঁদের ললাট লক্ষ্য করিতেছে। গদাধর তদ্দৃষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিল। সৈনিক পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল; গদাধর সেই অবকাশে ছুটিয়া আসিয়া শরমুখে দাড়াইল। সৈনিক বিস্মিত ও ক্ষুব্ধচিত্তে ধনুক নামাইল।

তখন গদাধর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বৃদ্ধ সৈনিককে বলিল, "আমার ঘোড়া কালাচাদকে দিয়া এস।"

সৈনিক দ্বিরুক্তি করিল না—সসম্মানে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিল। কালাচাদ অশ্ব গ্রহণ করিল, কিন্তু সহসা তাহাতে উঠিল না,—বিস্মিত নয়নে গদাধরের পানে চাহিয়া রহিল। গদাধর সে দিকে লক্ষ্য করিল না; মৃদুকণ্ঠে শুধু বলিল, "যাও, ব্রজবালার স্বামী, নির্বিঘ্নে যাও—কুশাঙ্কুরও যেন তোমার চরণে বিদ্ধ না হয়।"

গদাধর যখন অদৃশ্য হইল, তখন কালাচাদ নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিল। গদাধর যে পথে গিয়াছিল, সেই পথপানে পুনরায় চাহিল। তার পর নিজের গন্তব্য পথ ছাড়িয়া গৌড়ের পথ ধরিল। কালাচাঁদ জীবনে আর দেশে ফিরিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গদাধর পথের মাঝে দাড়াইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল। তখন কালাচাঁদ অদৃশ্য হইয়াছে। অনেক-ক্ষণ চিন্তার পর গদাধর যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিল—বীরজাওন আর গেল না।

গদাধর স্থির করিয়াছিল, ব্রজবালা স্বামীর সহিত কলহ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছে—রাধা-মোহন তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। গদাধর ভাবিল, "তা' কালাচাঁদ আমাকে ব্রজবালার কথা জিজ্ঞাসা করে কেন? আমি ব্রজবালার কে? আমাকে হয় ত এত দিন সে বিস্মৃত হয়েছে।"

ফিরিয়া সাঁতোড়ে পৌঁছিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। সাঁতোড় একটি ক্ষুদ্র নগর—ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র রাজধানী। নগরের উপকণ্ঠে একটা বিস্তীর্ণ পুষ্পো-দ্যান। সেই কুসুমময় উদ্যানের মধ্যে—নক্ষত্রবিভূষিত আকাশমধ্যে চন্দ্রমা-তুল্য—শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্রকায় হর্ম্ম্য। ক্ষুদ্র হইলেও এমন সৌন্দর্য্যময় গৃহ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সাঁতোড়-রাজ নানা দিগ্দেশ হইতে সুনিপুণ শিল্পী আনাইয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; এবং সুন্দররূপে সাজাইয়া গৃহের নাম রাখিয়াছিলেন—"শ্বেতা।" এক্ষণে 'শ্বেতা' গদাধরের আবাসস্থল।

গদাধর বিবাহ করে নাই। বিবাহে সম্মত করাইতে কেহ পারে নাই। কত কন্যাদায়গ্রস্ত অভি-ভাবক গদাধরকে ধরিয়াছিল; কত ইন্দুনিভাননা নানা দেশ হইতে আহৃত হইয়া গদাধরকে দেখান হইয়াছিল; কিন্তু গদাধর বিবাহ করিতে কিছুতেই প্রলুব্ধ হইল না। সংসারে কেমন যেন সে নিস্পৃহ; সকল কার্য্যেই তার অনাসক্তি। খেলা-ধূলা, মল্লক্রীড়া কিছুই আর ভাল লাগে না। এমন কি, গদাধর বিষয়কর্ম্মও বড় একটা দেখে না। তবে মাতাপিতার মনস্তুষ্টির জন্য কতকটা দেখা-শুনা করিতে হইত। সকল সময়েই সে নিশ্চেষ্টভাবে শ্বেতার পুষ্পোদ্যান-মধ্যে বসিয়া থাকিত।

গদাধর সাঁতোড়ে ফিরিয়া আসিয়া শরীর-রক্ষী-দের বিদায় দিল; এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া একাকী শ্বেতায় আসিল। শ্বেতার চারিদিকে উদ্যান—উদ্যানময় ফুল—ফুলে-ফুলে ভ্রমর। গদাধর কাহারও পানে ফিরিয়া চাহিল না,—অসীম চিন্তার ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে এক নিভৃত কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরটি অতি সুন্দর। মাথার উপর কাঠ বা লোহা নাই—শুধু একখানা প্রকাণ্ড সাদা পাতর বিছান রহিয়াছে। সেই পাতরের গায় কত সোনার পাতা, কত প্রবালের ফল। প্রাচীরগাত্রে কত বড় বড় গাছ লেখা রহিয়াছে। কোনও গাছের ছায়ায় বসিয়া শ্রান্ত পথিক বিশ্রাম লইতেছে—কোন তরু-শাখাতলে বসিয়া কৃষকরমণী তাহার ক্ষুধার্ত্ত স্বামীকে ভোজন করাইতেছে। এক দিকের প্রাচীরে একটি ক্ষুদ্র তটিনী অঙ্কিত রহিয়াছে। সাদা পাতরের গায় নীল শিলা বসাইয়া জল দেখান হইয়াছে। তটিনী আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রাম, প্রান্তর, বন অতিক্রম করিয়া

চলিয়াছে। গ্রাম, ক্ষুদ্র কুটীরনিচয়ে পরিপূর্ণ—প্রান্তর, শস্ত শষ্প-সমাচ্ছন্ন—বন, নক্ষত্র-প্রদীপ্ত নীলাকাশ-তুল্য কুসুম প্রফুল্ল। বনের ধারে কৃষ্ণকায় সাঁওতাল বালিকারা নগ্নদেহে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; কেহ ফুল তুলিয়া কেশে পরিতেছে; কেহ বা গরু মহিষকে জল খাওয়াইতেছে। গ্রামের নীচে নদীর তটে কুলবধূরা দীপহস্তে দাঁড়াইয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যপানে চাহিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য তখনও সম্পূর্ণ ডুবে নাই,—আধখানা জলের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছে, আধখানা জলের উপর জাগিয়া রহিয়াছে—কে যেন সেই নীল জলের উপর সিন্দূর-রাশি ঢালিয়া দিয়াছে—জল জ্বলিতেছে—বধূরা হাসিতেছে, মাথার উপর পাখীরা ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

কোন স্থানে দশাবতারের চিত্র—কোন স্থানে দশমহাবিদ্যার চিত্র। কোথাও শুভ্রশেখরবনরাজি-বেষ্টিত হিমালয়—গিরি-উপত্যকায় যোগীন্দ্রভূষণ মহাদেব ধ্যানমগ্ন—দূরে মন্মথ ফুলধনু আকর্ষণ করিতেছেন—ইন্দ্র-চন্দ্র দেবাদি শূন্যপথে উদ্বিগ্ন চিত্তে দণ্ডায়মান। আবার কোন প্রাচীরে বাল্মীকি-আশ্রম অঙ্কিত রহিয়াছে। ভয়চকিতা রোরুদ্যমানা সীতা-দেবীকে নিবিড় অরণ্যমধ্যে বিসর্জ্জন দিয়া রামানুজ লক্ষ্মণ কিরূপে একটু অগ্রসর হইতেছেন, আবার অশ্রু-মোচন করিয়া কিরূপে ফিরিয়া দেখিতেছেন, তাহা বিশেষ কৌশলসহকারে চিত্রে দেখান হইয়াছে।

এইরূপ কত চিত্র প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। গদাধর কোনও চিত্রপানে ফিরিয়া দেখিল না। ধীরে ধীরে আসিয়া একখানা প্রস্তর সনের উপর উপবেশন করিল। দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইল, গদাধর উঠিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ভৃত্য আসিয়া কক্ষে দীপ জ্বালিয়া দিয়া গেল। তখন গদাধরের চমক ভাঙ্গিল।

উঠিয়া গদাধর একটা পেটিকা খুলিল। তন্মধ্যে গজদন্ত-নির্ম্মিত একটা ক্ষুদ্র কৌটা ছিল, গদাধর সেই কৌটা-মধ্য হইতে তিনখানি পত্র বাহির করিল। পত্রগুলি একে একে পড়িল। শেষ পত্রে লেখা ছিল,—"যত দিন না তস্কর কর্ত্তৃক রত্ন অপহৃত হয়, তত দিন কি নিশ্চেষ্ট ও নীরব থাকিবে? আমি যে তোমারই প্রতীক্ষায় দেহ-মন লইয়া বসিয়া আছি, গদাধর!—তোমার ব্রজসুন্দরী।"

গদাধর পত্রখানা বারম্বার পাঠ করিলেন। অবশেষে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বাতায়ন-পথে নিক্ষেপ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কে এ সঙ্গীত গাহিল? কে এ গীত গাহিতে গাহিতে দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া গেল? কে অনন্ত হইতে এ শব্দতরঙ্গ তুলিয়া অনন্তে লুকাইল? আমার মনোমধ্যে যে কথা লুকান ছিল, সে কথা কে প্রতিধ্বনিত করিল? কে 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' বলিতে বলিতে—প্রাণের ব্যথা গাহিতে গাহিতে জগৎ চমকিত করিয়া অনন্ত আকাশে ছুটিয়া পলাইল? কে তুমি, রূপের জ্বালায় চক্ষু হারাইয়া অনন্তকাল ব্যাপিয়া অবিশ্রান্ত ছুটিয়া বেড়াইতেছ?

যে রূপ দেখিয়া তুমি চক্ষু হারাইয়াছ, সে রূপ কখন কি নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছ, পাখী? যদি তাহা দেখিতে পাইতে, তাহ হইলে তুমি ছুটিয়া পলাইতে পারিতে না;—সে রূপের আগুনে পুড়িয়া মরিতে। বুঝি সে অনলে পুড়িয়া মরিবার আশায় আকাশময় তাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে।

আমি তাহাকে খুঁজিয়া পাইলাম না—আমার প্রাণের ব্যথা জানাইতে পারিলাম না। যদি তোমার ওই অনন্ত আকাশ, বা কোন প্রাণশূন্য, শব্দশূন্য প্রদেশে ছুটিয়া বেড়াইতে পাই, তাহা হইলে প্রাণের সাধ মিটাইয়া একবার তাহাকে খুঁজিয়া দেখি। আর যদি তোমার ওই জগৎমাতান গলাখানি পাই—আর তোমার ওই নির্লজ্জতা পাই, তাহা হইলে আমার প্রাণের লুকান ব্যথা একবার বিশ্বময় গাহিয়া বেড়াই।

মাথার উপর পাখী ডাকিয়া গেল; গদাধর উদ্যানমধ্যে প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া তা' শুনিল। তখন প্রাতঃকাল, সদ্য অরুণোদয় হইয়াছে। আকাশময় পাখী, উদ্যানময় ফুল। গদাধর সুদূর আকাশপানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। এমন সময় একটা পাখী 'চোখ গেল' 'চোখ গেল' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে উন্মাদবৎ ছুটিয়া পলাইল। গদাধর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া পাখীপানে চাহিয়া দেখিল। পাখী মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। বিহঙ্গম যে মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল, গদাধর সেই মহাশূন্যপানে চাহিয়া নীরবে একাকী বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে গদাধর সহসা দেখিল, একটি মনুষ্য-ছায়া তাহার আসনপার্শ্বে আসিয়া স্থির হইল। গদাধর ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, এক জন অপরিচিত

ব্যক্তি একখানি পত্র হাতে লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গদাধর পত্রখানি লইয়া পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল,—"যদি তোমার ব্রজসুন্দরীকে আজও স্মরণ থাকে, তাহা হইলে এই পত্র-বাহকের অনুগমন করিবে।"

গদাধর স্তম্ভিত হইল। ব্রজবালার পত্র! এতকাল পরে আবার! পাঁচ ছয়বার পত্রটুকু পাঠ করিল। ছোট চিঠিখানা বারম্বার পড়িয়া বড় করিয়া লইল। তবু তাহার তৃপ্তি হইল না; যে এ পত্রখানা আনিয়াছিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। নয়ন ফিরাইয়া পুনরায় পত্র পাঠ করিল। তা'র পর স্পন্দিত হৃদয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। পত্র-বাহককে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমায় পাঠিয়েছেন?"

পত্রবাহক। আকাশের দেবী।

গদাধর। তিনি কোথায় আছেন?

পত্রবাহক। পাহাড়ে।

গদাধর। আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

পত্রবাহক। পারব।

গদাধর। তোমার সঙ্গে ঘোড়া আছে?

পত্রবাহক। না।

গদাধর তখন অশ্বশালা হইতে দুইটি ঘোড়া লইল; এবং উভয়ে তদুপরি আরোহণ করিয়া পর্ব্বত-সানুদেশে সত্বর উপস্থিত হইল। পর্ব্বত তত বড় নয় এবং নগর হইতে তত বেশী দূরেও অবস্থিত নয়। পর্ব্বত-তলে উপস্থিত হইয়া গদাধর অশ্ব হইতে অবতরণ করিল; এবং পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে স্বল্পকালমধ্যে এক নিভৃত প্রদেশে উপস্থিত হইল, পথপ্রদর্শক তথা হইতে বিদায় লইল। গদাধর দেখিল, পর্ব্বত-পৃষ্ঠে কোথাও জনমানব নাই। সে দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল, সহসা তাহার মনে হইল, কেন সে পরপত্নী ব্রজবালার আহ্বানে আসিল? ব্রজবালা তার কে? কেহ নয়। তবে ইহাও হইতে পারে, ব্রজবালা হয় ত কোন বিপদে পড়িয়া তাহাকে ডাকিয়াছে; ব্রজবালা হয় ত পথ হারাইয়া বীরজাওনের পথ খুঁজিতেছে। কিন্তু কই ব্রজবালা?

গদাধর আর একটু উঠিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল। দেখিল, একটু উর্দ্ধে, বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া শিলাতলে আকাশের দেবী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দুইখানি চরণ, দুইখানি শিলার উপর; কোমল বামবাহু তরু-দেহোপরি বিন্যস্ত। বৃক্ষপল্লব দেহের স্থানে স্থানে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—পুষ্পিত কদম্বশাখা মাথার উপর ছত্র ধরিয়াছে। গদাধর তাহার বাল্যসহচরী ব্রজবালাকে দেখিতে আসিয়াছিল, এক্ষণে দেখিল,—দেবী-প্রতিমা। জন্মান্ধ সহসা চক্ষু পাইয়া নবোদিত সূর্য্যের প্রতি যেমন চাহিয়া থাকে, গদাধর তেমনই স্পন্দহীন-নয়নে বিমুগ্ধচিত্তে ব্রজবালার পানে চাহিয়া রহিল। গদাধর দেখিল, তাহার মানসাঙ্কিত চিত্রের চেয়ে এ ব্রজবালা কত সুন্দর! কিশোরী ব্রজবালার চেয়ে নবযৌবনা ব্রজবালা কত উজ্জ্বল!

ব্রজবালা ডাকিল, "কুমার!"

গদাধর চমকিয়া উঠিল,—সঙ্গীতঝঙ্কারে তাহার সমাধিভঙ্গ হইল। ব্রজবালা বলিল, "কুমার, চিনিতে পার?"

গদাধরের দেহ একটু কাঁপিয়া উঠিল। তার পর স্থির হইয়া বলিল,—"ব্রজ—"

ব্রজবালা। ডাক, ডাক, আবার তেমনই ক'রে ব্রজসুন্দরী ব'লে ডাক।

গদাধরের বুকের রক্ত সহসা থামিয়া গেল; তাহার মনে হইল, এ কা'র সঙ্গে বাক্যালাপ করছি! এ ত আমার সে ব্রজসুন্দরী নয়! আমার ব্রজ অনেক দিন ম'রে গেছে—এ ত কালাচাঁদের ব্রজবালা।

ব্রজবালা শিলার উপর হইতে নামিয়া আসিল। গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কেন ডেকেছ, ব্রজবালা?"

ব্রজবালা। না না, আমি ব্রজবালা নই, আমি তোমার ব্রজসুন্দরী।

গদাধর। ছি ছি!

ব্রজবালা আর একটু অগ্রসর হইল। গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পথ হারিয়েছ? বীরজাওনে যেতে চাও?"

ব্রজবালা। না, না—সেখানে আর নয়।

গদাধর। তবে পিত্রালয়ে?

ব্রজবালা ভ্রূকুটি করিল; বলিল, "আমি তোমার কাছে এসেছি, কুমার!"

গদাধর কাঁপিয়া উঠিল; বলিল, "আমার কাছে?"

"হাঁ, তোমার কাছে। আশ্রয় দিতে তুমি কি কাতর?"

গদাধর শিলার উপর বসিয়া পড়িল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে তুফান উঠিল। অবশেষে বলিল, "ব্রজবালা, গৃহে ফিরে যাও—এখনও সময় আছে।"

ব্রজবালা। যে গৃহ ত্যাগ করেছি, সে গৃহে আর ফিরব না।

গদাধর। কেন গৃহত্যাগ করলে ব্রজবালা!—গৃহ যে মন্দির।

ব্রজ। কেন গৃহত্যাগ করলুম, শুনবে? কেন মাতাপিতা, স্বামী, আত্মীয়স্বজন, লজ্জা, ধর্ম্ম, কুল, মান ত্যাগ করলুম, শুনতে চাও? কুমার, আমি তোমার—

গদা। না, আমি শুনতে চাইনে—তুমি গৃহে ফিরে যাও।

ব্রজ। বলেছি ত গৃহে আর ফিরব না; আশ্রয় না দেও, পথে পথে বেড়াব।

গদা। তোমাকে এমন অধঃপতিত দেখ্‌ব, কখন তা ভাবি নি, ব্রজবালা। আমি যে অনেক উচ্চে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে তোমার প্রতিমা পূজা করতুম। তুমি কেন সে সিংহাসন ভাঙ্গলে, কেন সে প্রতিমা চূর্ণবিচূর্ণ করলে?

ব্রজ। তুমিও আমায় ঘৃণাভরে উপেক্ষা করলে? বেশ। কিন্তু স্মরণ রাখিও, গদাধর, আমি পাপ ক'রে থাকি, সে তোমার জন্য—অধর্ম্মাচরণ ক'রে থাকি, সেও তোমার জন্য। আমি চলিলাম—জীবনে আবার দেখা হবে—

বলিতে বলিতে ব্রজবালা দ্রুতপদে পর্ব্বত অবতরণ করিল এবং স্বল্পকালমধ্যে অদৃশ্য হইল।

গদাধর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং ব্রজবালার দিকে হস্তপ্রসারণ করিল। ব্রজবালা তখন অদৃশ্য হইয়াছে। গদাধর চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ব্রজবালা—ব্রজসুন্দরি।"

কোথায় ব্রজবালা? গদাধর হতাশভাবে শিলাপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অপ্

প্রেম

কালাচাঁদ ও দুলারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তখন বাঙ্গালার মসনদে সলিমন শা কররাণী অধিষ্ঠিত। সলিমন বীরপুরুষ—বাঙ্গালার রাজ্য বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন। যখন বাহাদুর শা ও জালালউদ্দীন ধরাধাম ত্যাগ করিল, তখন সলিমন শা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বাঙ্গালার উপর পড়িলেন; এবং মসনদে বসিয়া দিল্লীর বাদশাহের সহিত মিত্রত্ব স্থাপন করিলেন। সলিমন আগন্তুক ও বিদেশী হইলেও ন্যায়পরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন।

রাজধানী তখন গৌড়ে আদিশূরের গৌড় নয়—বল্লালসেনের গৌড়ে নয়—মুসলমানের গৌড়ে। এত বড় সমৃদ্ধিশালী নগরী ভারতে তৎকালে খুব কম ছিল। লক্ষ্মণাবতী ভাঙ্গিয়া—স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার রত্নরাজি লুঠিয়া মুসলমান এই গৌড় গড়িয়াছিল; এক দিনে নয়—তিন শত বৎসরে। সেই গৌড় আজ—সেই গর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত গৌড় আজ বসুধা-হৃদয়ে মুখ লুকাইয়াছে।

আজ মুখ লুকাউক, কিন্তু এক দিন গৌড় গর্ব্বস্ফীত-হৃদয়ে দুর্গচূড়ে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড়াইয়া মহানগরী দিল্লীকেও উপহাস করিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় মোগল দিল্লী গড়িতেছে মাত্র,—তখনও শক্তি ও যশোমণ্ডিত হয় নাই। যে দিল্লী আগ্রা সাজাইয়াছিল, ভারতে মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, সে তখন বইরাম খাঁর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিন্নভিন্ন রাজ্য গ্রথিত করিতেছে মাত্র। ভারতবর্ষে তখন চারিদিকে আগুন জ্বলিয়াছে। সে আগুনের ভিতরেও উড়িষ্যা, কোচবিহার, আসাম, কামরূপ হিন্দু-স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মুসলমান সহস্র চেষ্টা করিয়াও তথায় ইসলাম-বৈজয়ন্ত উড়াইতে পারে নাই যাহা বখ্‌তিয়ার খিলিজি বা সের শা পারে নাই, তাহা আর কে পারিবে? কিন্তু এক জন পারিয়াছিল। যে পারিয়াছিল, সে তখন বাঙ্গালায় জন্ম লইয়াছে।

সলিমন শা প্রত্যহ দরবার-গৃহে রত্নমণ্ডিত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। রাজকার্য্যে তাঁহার ঔদাস্য ছিল না। একদা প্রাতঃকালে তিনি সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময় এক জন প্রার্থী আসিয়া তাঁহার সিংহাসন-নিম্নে দাঁড়াইল। প্রার্থী বাঙ্গালী—তরুণবয়স্ক—সুদর্শন। তাহার পরিধানে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ, কটিতে রত্নমণ্ডিত বহুমূল্য তরবারি। কয়েক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সিংহাসন-নিম্নে উপবিষ্ট ছিলেন। তথা হইতে পেশকার উঠিয়া প্রার্থীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

প্রার্থী উত্তর করিল, "তোমার কাছে কোন প্রার্থনা নাই।"

পেশকার। তবে কার কাছে তোমার প্রার্থনা?

প্রার্থী বঙ্গের অধীশ্বর সুলতানের কাছে।

পেশ। একই কথা প্রার্থনা কিছু থাকে, নিবেদন কর—আমি বঙ্গেশ্বরের কাছে পেশ করিব।

প্রার্থী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুলতানের পানে চাহিয়া বলিল, "সুলতান, আমার প্রার্থনা আছে।"

সুলতান দেখিলেন, প্রার্থী বলিষ্ঠ, নির্ভীক ও তেজস্বী। তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রার্থনা কি? বিচার চাও?"

প্রার্থী। না।

সুল। জায়গীর চাও?

প্রার্থী। না—আমি কর্ম্মপ্রার্থী।

সুল। কর্ম্ম? পেশকারের পদ চাও?

প্রার্থী। না।

সুল। মন্ত্রিপদ?

প্রার্থী। না; আমি সামান্য সৈনিকের পদ প্রার্থনা করি।

সুল। তরবারি ধরিতে জান?

প্রার্থী। জানি।

সুল। পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ?

প্রার্থী। শস্ত্রবিদ্যায় আমাকে পরীক্ষা করিতে পারে, এমন লোক বাঙ্গালায় দেখি না।

সুলতান একটু হাসিলেন। তিনি নিজে এক জন মস্ত যোদ্ধা। সম্রাট্ আদিল শাকেও এক দিন তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল। এবম্বিধ যোদ্ধার সম্মুখে যুবকের স্পর্দ্ধা বাতুলতা মাত্র। সুলতান তাই একটু হাসিলেন; দেখাদেখি সভাসদেরাও হাসিল। সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

প্রার্থী। কালাচাঁদ রায়।

সুল। পিতা কে?

প্রার্থী। নয়ানচাঁদ রায়।

সুল। কোন্ নয়ানচাঁদ?

প্রার্থী। যে নয়ানচাঁদ, মোগল-সেনাপতি জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে তাড়াইয়া গৌড়ের দ্বার সম্রাট্ সের শার জন্য উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

সুল। বুঝিয়াছি; তুমি ফৌজদার নয়ানচাঁদের পুত্র। যে বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কালাচাঁদ, সে বংশের সম্মান-রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তোমাকে আমি তোমার পিতার পদ প্রদান করিলাম; তুমি গৌড়-নগরীর ফৌজদার-পদে নিযুক্ত হইলে। ভরসা আছে, তুমি তোমার পিতার নাম কলঙ্কিত করিবে না।

কালাচাঁদ তরবারি ঝটিতি কোষমুক্ত করিয়া ললাটে তিনবার স্পর্শ করাইল; এবং তাহা উন্মুক্ত অবস্থায় সিংহাসন-পদতলে রক্ষা করিয়া সসম্মানে বলিল, "বাদশাহের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।"

সুলতানের আদেশে উজির উঠিয়া আসিয়া কালাচাঁদকে তরবারি প্রত্যর্পণ করিলেন। কালাচাঁদ পুনরায় মস্তক নমিত করিয়া অভিবাদন করিল।

ফৌজদারের পদ মহাসম্মানিত। পূর্ব্বে সেন রাজাদের সময়ে নগর-পাল যে কার্য্য করিত, মুসলমান রাজত্বকালে ফৌজদার সেই কার্য্য সম্পন্ন করিত। নগর-রক্ষা ও দোষী ব্যক্তির বিচারের ভার তাহার উপর। রাজধানীর সমস্ত সৈন্য ও প্রহরী তাহার অধীন। তবে দুর্গের উপর তাহার কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

কালাচাঁদ এই মহাগৌরবান্বিত ফৌজদারের পদ পাইয়া কৃতার্থ হইল; এবং পরওয়ানা ও দণ্ড লইয়া মহাহৃষ্টান্তঃকরণে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফৌজদারের বাসের জন্য একটা অট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কালাচাঁদ তথায় আসিয়া উঠিল। অট্টালিকাটি রাজপ্রাসাদের সন্নিকট। প্রাসাদের পিছনে, কিয়দ্দূরে—মহানন্দা। কালাচাঁদ মুসলমানের নকরি গ্রহণ করিলেও হিন্দুয়ানী ছাড়ল না। প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া মহানন্দায় স্নান করিতে যাইত; স্নানান্তে ললাট মৃত্তিকা-চর্চ্চিত করিয়া বিষ্ণুস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে গৃহে ফিরিত। তৎকালে পূজাহ্নিকের বড় বেশী সময় পাইত না—তাড়াতাড়ি কাছারি যাইতে হইত।

তখন প্রাতে চারি দণ্ডের সময় কাছারি বসিত, এবং মধ্যাহ্নে ভাঙ্গিত। প্রথাটা ভাল কি না, জানি না, তবে স্বাস্থ্যকর বটে। আমাদের এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আহারান্তে পরিশ্রম করাটা ঠিক নয়। আহারের পর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ পরিশ্রমই নিষিদ্ধ। আমাদের প্রধান আহার মধ্যাহ্নকালে—শীতপ্রধান দেশস্থ জাতির প্রধান আহার সন্ধ্যার পর। আমরা মধ্যাহ্নভোজনের পর কার্য্যে ব্রতী হই—ইংরাজ প্রভৃতি জাতিরা সায়াহ্ন-ভোজনের পর আমোদ-প্রমোদে রত হ'ন। ফল এই দাঁড়াইতেছে, আমরা অম্লপিত্ত রোগ আহ্বান করিয়া লইতেছি, আর ইংরাজেরা স্বাস্থ্য ও শক্তির আশ্রয়-স্থল হইতেছেন।

প্রথাটা ভাল হউক বা মন্দ হউক, হিন্দু রাজাদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল; মুসলমানেরা তাহার কোনও ব্যতিক্রম করে নাই। অতএব কালাচাঁদকে রজনীপ্রভাতে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া কাছারি যাইতে হইত। মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া কালাচাঁদ পুনরায় স্নান করিত। কেন না, ম্লেচ্ছ-সংস্পর্শে আসিত বলিয়া সে আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করিত। কালাচাঁদ শুদ্ধাচারী, দশকর্ম্মান্বিত পরম বৈষ্ণব। হবিষ্যান্ন তাহার সচরাচর আহার ছিল—বিষ্ণু-পূজা ও পুরাণ-পাঠ তাহার নিত্য-কর্ম্ম ছিল।

তখনকার দিনে হিন্দুরা যে বেশে কাছারি যাইত, এখন সে বেশ লোপ পাইয়া আসিতেছে। হিন্দুরা ধুতি বহু প্রাচীন কাল হইতে পরিয়া আসিতেছে। তবে দেশ-বিদেশে প্রকারভেদ। মুসলমানের আমলে হিন্দুরা ধুতির উপর চোগা-চাপকান চড়াইত, মাথায় পাগড়ি লাগাইত। ইংরাজ-আমলে অনেক হিন্দু ধুতি ফেলিয়া পায়জামা পরিল; আর সব প্রায় ঠিক রহিল, তবে সে পাগড়ি অবস্থান্তরিত হইল।

কালাচাঁদ চোগা-চাপকান পরিত বটে, কিন্তু সেই চোগার উপরে কোমরে তরবারি বাঁধিত; পাগড়ি ফেলিয়া মাথায় উষ্ণীষ চড়াইত। চরণে একপ্রকার নাক-উঠান বিচিত্র পাদুকা। আবার পাদুকার উপরিভাগ স্থানে স্থানে কাটা; সম্ভবতঃ বাতাস প্রবেশের পথ রাখা হইত। কালাচাঁদ এইরূপ বেশভূষা করিয়া প্রত্যহ কাছারি যাইত।

এক দিন কালাচাঁদ মধ্যাহ্নকালে কাছারি হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, একটি বালক তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কালাচাঁদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা হ'তে আসছ?"

বালক উত্তর করিল, "বীরজাওন হ'তে।"

বীরজাওনের নাম শুনিয়া কালাচাঁদ একটু অন্যমনস্ক হইল। মাকে মনে পড়িল—পাপিষ্ঠা ব্রজবালার কথাও স্মরণপথে উদয় হইল; কিন্তু অভাগিনী ভূপবালার কথা একবারও মনে আসিল না। কালাচাঁদ বালককে নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা—মা কি তোমায় পাঠিয়েছেন?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"আপনি কি আর দেশে ফিরিবেন না?"

"না—জীবনে না।"

এবার বালক একটু অন্যমনস্ক হইল। কালাচাঁদ সেই অবসরে তাহাকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমায় পূর্ব্বে কখন দেখেছি ব'লে মনে হয় না; তোমার বাড়ী কি বীরজাওনে?"

বালক উত্তর করিল, "না, এখান হ'তে অনেক দূরে আমার বাড়ী; কিছু দিন পূর্ব্বে বীরজাওনে আমি এসেছি।"

কালাচাঁদ পোষাক-পরিচ্ছদ খুলিতে লাগিল। বালক বলিল, "তবে মাকে—মা ঠাকুরুণকে কেন এইখানে আনুন না?"

কালা। এখানে? অসম্ভব।

বালক। অসম্ভব কেন?

কালা। মুসলমানের ভয়ে হিন্দুরা এখানে পরিবার ল'য়ে বাস করে না।

বালক। ফৌজদারেরও কি সে ভয় আছে?

কালা। সম্পূর্ণ আছে; প্রতি মুহূর্ত্তে আমি পদচ্যুত ও নিগৃহীত হ'তে পারি।

বালক। তবে আমাকে এখানে থাক্‌তে হবে।

কালা। কেন?

বালক। মা ঠাকরুণের এইরূপ আদেশ আছে।

কালা। আমার কাছে থেকে কি কর্‌বে?

বালক। আপনার সেবা-যত্ন কর্‌ব।

কালা। কেন অকারণ দেশ ছেড়ে আমার কাছে প'ড়ে থাকবে?

বালক। ভূতের দেশ-বিদেশ সব সমান।

কালা। তুমি কি জাত?

বালক। ব্রাহ্মণ।

কালা। রাঁধতে পার?

বালক। পারি।

কালা। বেশ। আমি একটি ব্রাহ্মণ-ভৃত্য খুঁজিতেছিলাম; মধ্যাহ্নে আসিয়া স্বহস্তে আর রাঁধিয়া উঠিতে পারি না। তোমার নাম কি বালক?

বালক। নাম? লোকে বুনা বলিয়া ডাকে।

কালা। বনবিহারী বুঝি নাম ছিল?

বালক। হবে।

কালা। বেশ, বুনা, তুমি আমার কাছে থাক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুনাকে পাইয়া কালাচাঁদের অনেক কষ্টের লাঘব হইল। মধ্যাহ্নে কাছারি হইতে ফিরিয়া কালাচাঁদ দেখিত, নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত রহিয়াছে। শুধু রন্ধন করিয়াই বুনা ক্ষান্ত থাকিত না,—বুনা মধ্যাহ্ন-পূজার ফল ও গঙ্গাজল স্বয়ং আহরণ করিয়া রাখিত,

—কালাচাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদাদি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিত। প্রভাতে কালাচাঁদ নিজে ফুল আহরণ করিতেন ও নদীতে স্নান করিয়া কূলে বসিয়া পূজা সমাপন করিতেন। বুনা, কালাচাঁদের শয়ন-কক্ষ মার্জ্জনা করিত—যত্নের সহিত শয্যা-রচনা করিত—স্বহস্তে তাম্বূল প্রস্তুত করিয়া শয্যার উপর রাখিয়া দিত; কালাচাঁদের যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, বুনা তাহা স্বহস্তে সযত্নে সম্পন্ন করিত। কালাচাঁদ যতক্ষণ গৃহে থাকিত, বুনা ততক্ষণ ছায়ার ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। সন্ধ্যার পর কালাচাঁদ যখন পুরাণ পাঠ করিতে বসিত, তখন বুনা অদূরে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পুরাণ শুনিত। কালাচাঁদ শয়ন করিলে, তবে সে কালাচাঁদের সঙ্গত্যাগ করিয়া আহারাদি করিতে যাইত।

কালাচাঁদ অচিরে বুনার গুণে মুগ্ধ হইল। বুনার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন খাইয়া তৃপ্তি—বুনার পরিচর্য্যায় তৃপ্তি—বুনাকে পুরাণ শুনাইয়া তৃপ্তি। বুনা যে কাজটা না করিত, কালাচাঁদের সে কাজটা ভাল লাগিত না—বুনা পুরাণ শুনিতে না আসিলে কালাচাঁদ পুরাণ খুলিয়া বসিয়া থাকিত—বুনা আহারান্তে পদসেবা না করিলে কালাচাঁদের নিদ্রাকর্ষণ হইত না—বুনা সঙ্গে সঙ্গে না ঘুরিলে কালাচাঁদের কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। অল্পদিনের মধ্যে কালাচাঁদ বুনার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

এক দিন কালাচাঁদ, বুনাকে বলিল, "তোমাকে পেয়ে আমি বড় সুখে আছি; আমাকে ছেড়ে কোথাও যেও না, বুনা।"

বুনা উত্তর করিল না; মুখখানা একটু ফিরাইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কালাচাঁদ বলিল, "আমি বড় স্বার্থপর; না বুনা? তোমার আত্মীয়স্বজন কোথায় প'ড়ে রইল, আর আমি তোমাকে এখানে ধ'রে রাখ্‌লাম।"

বুনা মুখ নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "গুরুজনের নিকট শুনেছি, যিনি অন্নদাতা, তিনিই শ্রেষ্ঠ আত্মীয়।"

কালাচাঁদ। তোমার অন্নের অভাব কি বুনা? বাদশাও তোমার মত ভৃত্য পাইলে কৃতার্থ হ'ন।

বুনা অধোবদনে নিরুত্তর রহিল। কালাচাঁদ বলিল, "তোমাকে ভৃত্য বলা উচিত হয় না; তুমি আমার আত্মীয়। বুনা, আমার ভাই নাই, ভগ্নী নাই—জগতে মা ছাড়া আমার আর কেহ নাই। আজ এই বিদেশে তোমাকে পেয়ে আমি সকল দুঃখ ভুলেছি।"

বুনা আর বসিল না,—উঠিয়া কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

এক দিন কালাচাঁদ বুনাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বুনা, ঘোড়ায় চড়্‌তে পার?"

"না।"

"অস্ত্র ধর্‌তে?"

"না।"

"আমি তোমাকে শিখাব।"

কালাচাঁদ বুনাকে শিক্ষা দিতে লাগিল। অস্ত্র-বিশারদ গুরুর শিক্ষকতায় বুনা কয়েক মাসের মধ্যেই অশ্বারোহণে ও শস্ত্রচালনায় নিপুণতা লাভ করিল।

বুনা আর একটা জিনিসও শিখিল, সেটা লেখা-পড়া। বুনা এক এক দিন দেখিত, কালাচাঁদ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া পুরাণপাঠ বন্ধ রাখিত। কালাচাঁদের পাঠেচ্ছা থাকিলেও আর পারিয়া উঠিতেন না। কেহ যদি পড়িয়া শুনায়, তাহা হইলে কালাচাঁদ শুনিতে পারে। বুনার বাসনা হইল, পুরাণ পড়িয়া কালাচাঁদকে শুনাইবে, তাই বুনা গোপনে রাত্রি জাগিয়া লেখা-পড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। ফৌজদারের এক জন বৃদ্ধ হিন্দু-কর্ম্মচারী একটু একটু করিয়া সাহায্য করিত। বুনা ছয় মাসের মধ্যে অনেকটা আয়ত্ত করিয়া এক দিন পুরাণ খুলিয়া দেখিল। দেখিল, পুরাণপাঠ তত কঠিন নয়। দুই চারি দিন গোপনে অভ্যাস করিল; পরে এক দিন সাহস করিয়া কালাচাঁদের সম্মুখে পুঁথি খুলিল। সে দিন কালাচাঁদ বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; পড়িতে আরম্ভ করিয়া কালাচাঁদ পুঁথি বন্ধ করিল। বুনা বলিল, "আর পড়্‌বেন না?"

কালাচাঁদ। না, আজ আর পার্‌ছি না। তুমি যদি পড়্‌তে জান্‌তে!

বুনা। তা' হলে কি আপনি সুখী হতেন?

কালা। বড় সুখী হ'তাম, বুনা।

বুনা। তবে পুঁথি দিন, আমি পড়্‌ছি।

কালা। তুমি ত পড়্‌তে জান না।

বুনা। কিছু কিছু শিখেছি।

কালা। শিখেছ? আমি ত কোন দিন তোমার পড়্‌তে দেখি নি।

বুনা উত্তর না করিয়া অধোবদনে নীরব রহিল। কালাচাঁদ বলিল, "পড় দেখি।"

বুনা পুঁথি খুলিল। সে যে পড়িতে পারিবে, কালাচাঁদের তাহা কোনমতে প্রত্যয় হইতেছিল না। বুনা পারিলও না—কেমন সব গোল হইয়া যাইতে লাগিল। বুনা যত পরিষ্কার কণ্ঠে তাড়াতাড়ি

পড়িবার চেষ্টা করে, ততই তাহার কণ্ঠ বদ্ধ হইয়া আসে—পাঠেও ততই ভুল হয়। বুনার কান্না আসিল; অবশেষ বুনা পুঁথি বন্ধ করিয়া স্ফীতবক্ষে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সুলতানের মহিষীকে আমাদের আপাততঃ কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার কন্যাকে আমাদের সবিশেষ প্রয়োজন। কেন না, তিনি যুবতী ও সুন্দরী। সৌন্দর্য্যময়ী যুবতী না হইলে উপন্যাসের অঙ্গ সাজিবে কেন? এখন যদি আমরা বৃদ্ধা সুলতান-মহিষীকে আসরে টানিয়া আনি, তাহা হইলে অনেকেই হয় ত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এইখানেই পুস্তক-পাঠ বন্ধ করিবেন। সেরূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার যাহাতে সংঘটিত না হয়, আমাদের সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য, অতএব বৃদ্ধাকে ছাড়িয়া যুবতীর অবতারণা করিলাম।

সুলতান-তনয়াকে ইতিহাস যে নাম দিয়াছে, আমরাও তাঁহাকে সেই নাম দিলাম। নামটিও ভাল, দুলারী বিবি। দুলারী অবিবাহিতা।

দুলারী সপ্তদশবর্ষীয়া, বিকাশিতযৌবনা—ক্ষীণাঙ্গী—কমলিনীলাঞ্ছিতদুগ্ধফেনকবরণা; দুলারী নীলাম্বুবিলোলনয়না—শশহীনশশাঙ্কবদনা। দুলারী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা—পরমাসুন্দরী।

প্রাসাদমধ্যে দুলারীর স্বতন্ত্র মহল। এই মহলে সহসা এক দিন সন্ধ্যাকালে একটা গোল উঠিল। দুলারী তখন তাঁহার মহল-সংলগ্ন উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। সঙ্গে দুই জন দাসী বা সহচরী ছিল। এক জনের নাম চন্দনা, অপরার নাম ময়না। দুলারী বিবি তাহাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। উভয়েই শিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া। চন্দনা বলিতেছিল, "নবাব পুত্রি, বিবাহ কি কখন করবে না?"

দুলারী বিবি উত্তর করিলেন, "কি জন্যে? দাসী হবার জন্য?"

চন্দনা। বিবাহ করলেই কি দাসী হ'তে হয়? হিন্দুরা ত তা' বলে না।

দুলারী। সে চাষাদের কথা ছেড়ে দাও। তা'দের পুরুষগুলো সহধর্ম্মিণী খোঁজে, আর মাগীগুলো স্বামী স্বামী, দেবতা দেবতা ক'রে অস্থির। তা'দের সঙ্গে আমার তুলনা!

চন্দনা। তুমি কি স্বামী খোঁজ না?

দুলারী। না; আমি শাহাজাদী—নবাবপুত্রী—আমি ভৃত্য খুঁজি।

এমন সময় সেই পুরুষের অগম্য স্থানে এক জন রূপবান্ যুবক লতাকুঞ্জান্তরাল হইতে নির্গত হইয়া বলিল, "শাহাজাদী, ভৃত্য উপস্থিত।"

দুলারী সাতিশয় বিস্মিত হইয়া তীক্ষ্নয়নে যুবককে নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন, যুবকের পরিচ্ছদ যাবনিক। যুবক রূপবান্—তরুণবয়স্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

যুবক। শাহাজাদীর বান্দা; তদ্ব্যতীত আমার অন্য পরিচয় আপাততঃ নাই।

দুলারী। কেন এখানে মরিতে আসিলে?

যুবক। শাহাজাদীর রূপ-বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে আসিয়াছি, মরিতে পাইব না কি?

দুলারী। নিরাশ হইতে হইবে না—সে ব্যবস্থা এখনই করিতেছি।

বলিয়া, তিনি ময়নাকে ইঙ্গিত করিলেন। প্রহরী ডাকিতে সে চলিয়া গেল।

তখনও পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় নাই। সূর্য্য ক্ষণপূর্ব্বে নিবিয়া গিয়াছে; কিন্তু সন্ধ্যার ললাটে চাঁদ তখনও দীপ জ্বালে নাই। স্বর্গবালারা তখনও নীলাম্বুসলিলে দীপ ভাসায় নাই। তখনও মল্লিকা ফুটে নাই—কোকিল বা পাপিয়া তখনও নিবৃত্ত হয় নাই;—পাখীর গান তখনও বসন্তানিলে ভাসিয়া মল্লিকাকে জাগাইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আকাশের তখনও প্রভাত—পৃথিবীর তখন সন্ধ্যা। একের আশা—অপরের স্মৃতি। একের জন্ম—অপরের সমাধি। কিন্তু নির্ব্বাণ কোথাও নাই।

যুবক আকাশ বা পৃথিবী কিছুই দেখিল না—শুধু দুলারীকে দেখিল। নয়ন ভরিয়া দেখিয়া অবশেষে বলিল,—"শাহাজাদী, দূর হইতে—বহুদূর হইতে তোমার রূপের কথা শুনিয়াছিলাম। তাই জীবনকে বিপন্ন করিয়াও তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। দেখিলাম, তুমি অতি সুন্দর। নবাব-পুত্রি, আমার জীবন-যৌবন গ্রহণ করিবে কি?"

দুলারী উত্তর দিবার পূর্ব্বে চন্দনা বলিল, "উভয়ই অচিরে গৃহীত হইবে—ব্যস্ত হইও না।"

তাতারী প্রহরীর পদশব্দ শ্রুত হইল। যুবক সকলই বুঝিল। বলিল, "শাহাজাদী, অপরাধ ক'রে থাকি, তুমি শাস্তি দেও।"

দুলারী উত্তর না করিয়া প্রস্থানোদ্যতা হইলেন। যুবক বলিল, "আমাকে জল্লাদের হাতে দিতেছ? এ কি নবাব-পুত্রীর উপযুক্ত কাজ? যে ভালবাসে,

তাঁকে কখন কাঁদাইও না,—প্রাণে মারিও না। তুমিও হয় ত এক দিন কাহাকেও ভালবাসিবে—"

দুলারী বলিলেন, "ভালবাসতে হয়, তোমার মত কুকুর-বাচ্ছাকে নয়।"

যুবকের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে আর কিছু বলিল না; প্রহরীর অনুবর্ত্তী হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে কালাচাঁদ বিচারে বসিয়াছেন। তখনকার দিনে বিচারকার্য্য বড় অদ্ভুত প্রণালীতে হইত, আইন-কানুন বড় একটা ছিল না। বিচারকের বিবেচনা ও অভিরুচির উপর অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা নির্ভর করিত। সময় সময় পদস্থ ব্যক্তি বা মোল্লারা আ নয়া বিচারককে অনুরোধ উপরোধ করিতেন। বিচারককে সময় সময় বাধ্য হইয়া নির্দোষকে দণ্ড দিতে হইত ও দোষীকে ছাড়িয়া দিতে হইত। কিন্তু কালাচাঁদ এই সকল প্রচলিত নিয়মাদি লঙ্ঘন করিয়া নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করত অপরাধীর বিচার করিতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেকের অপ্রিয় হইতে হইয়াছিল। আজিকার ঘটনা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

এক জন হিন্দু-যুবক আজ প্রাতে অভিযুক্ত হইয়া কালাচাঁদের বিচারালয়ে আনীত হইয়াছে। অপরাধ আম-চুরি। অভিযোক্তা এক জন পাঠান আমির। তিনি স্বয়ং বিচারগৃহে উপস্থিত। তাঁহাকে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আসামীকে চেনেন?"

আমি। হাঁ—না—চিনি না।

কালা। কোথায় আম ছিল?

আমির। আমার বাগানে—গাছে।

কালা। চুরি করতে কে দেখেছে?

আমির। আমি ও আমার সাক্ষী।

কালা। আপনার সাক্ষী কই?

আমির। আসামী ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে; হতভাগার পয়সার জোর খুব।

কালা। আসামী ধনী?

আমির। এক জন বড় সওদাগর।

কালা। কি ক'রে জান্‌লেন?

আমির। অনেক দিন হ'তে আমি ওকে চিনি; আমার সঙ্গে দেনাপাওনা আছে।

কালা। কবে কোন্ সময়ে আম পেড়েছে?

আমির। কাল—রাত্রি ২টার সময়।

কালা। আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

আমির। আমার ঘরে।

কালা। কি ক'রে দেখলেন?

আমির। ফুট্‌ফুটে চাঁদ্‌নি রাত—

কালা। কাল তৃতীয়া গেছে—চাঁদ ছয় দণ্ড মাত্র ছিল—

আমির। আপনি কিছু জানেন না; আমি স্বচক্ষে দেখিছি—ফুট্‌ফুটে চাঁদনি রাত—আসামী গাছে উঠে আম পাড়্‌ছে—

কালা। আপনি মিথ্যা কথা বলছেন—আসামী খালাস।

আমির। (সক্রোধে) কি, আমি মিথ্যাবাদী!

এমন সময় নবাবের বখ্‌সি আসিয়া বলিল, "আমি দেখিছি, আসামী গাছে উঠে আম পাড়্‌ছে—উজির সাহেবও দেখে থাক্‌বেন, তিনি ব'লে পাঠালেন, আসামীকে যেন শূলে দেওয়া হয়। লোকটা ভয়ানক চোর—

কালা। আপনাদের কথায় বিশ্বাস করিলাম না।

আমির ও বখ্‌সি মহা কুদ্ধ হইয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় দুই জন তাতারী প্রহরী, অপরিচিত মুসলমান যুবককে লইয়া বিচার গৃহে প্রবেশ করিল। কালাচাঁদ, যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"তোমার বন্দী "

"তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরিচয় নাই?"

"থাকিতে পারে, কিন্তু বলিতে বাধ্য নই।"

ফৌজদার কালাচাঁদ মুস্কিলে পাড়লেন। বন্দীর চক্ষু ও ললাট দেখিলে তাহাকে সামান্য ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় না। সামান্য হইলে বন্দী পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বন্দীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিবাস এ দেশে বলিয়া অনুমান হয় না; কোথায় থাক?"

বন্দী। আপাততঃ ফৌজদারের বিচারালয়ে।

কালা। তৎপূর্ব্বে?

বন্দী। নবাবকন্যার উদ্যানে।

কালা। অপরাধ স্বীকার করিতেছ?

বন্দী উত্তর না দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। ফৌজদার বলিলেন, "বুঝিলাম, তুমি সহজে পরিচয় দিবে না।"

বন্দী। পরিচয়ের প্রয়োজন কি?

কালা। বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাহার

ছেলের প্রতি একরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়া থাকে, আর আমির ওমরাহের ছেলে হইলে—

বন্দী। এরূপ অবস্থায় চাষার ছেলের প্রতি কিরূপ দণ্ডাদেশ হইয়া থাকে?

কালা। সামান্য শাস্তি,—যথা বেত্রাঘাত।

বন্দী। আর আমির-ওমরাহের ছেলে হইলে?

কালা। মৃত্যুদণ্ড।

বন্দী। উত্তম। আমাকে কি বলিয়া মনে হয়?

কালা। আমির-ওমরাহের ছেলে।

বন্দী। কিসে সেটা অনুমান হয়?

কালা। তোমার নির্ভীকতা, তোমার তেজ, তোমার চক্ষু, তোমার ললাট ব্যক্ত করিতেছে, তুমি সামান্য ব্যক্তি নও।

বন্দী। আমার পরিচ্ছদ দেখিয়া কি অনুমান হয়?

কালা। তুমি ছদ্মবেশী।

বন্দী। বেশ—তবে মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা হউক।

কালা। কিন্তু তোমার তরুণ বয়স দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয়, চাপল্যবশতঃ যদি কিছু করিয়া থাক—

বন্দী। আমি দয়াপ্রার্থী নই, ফৌজদার সাহেব!

এমন সময় ময়না বিচার-গৃহে আসিয়া দর্শন দিল। কালাচাঁদ পূর্ব্বে কখন তাহাকে দেখেন নাই; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

ময়না অভিবাদন না করিয়া একটু তেজের সহিত বলিল, "আমি নবাবপুত্রীর বাঁদী।

কালা। এখানে কেন?

ময়না। বিবিসাহেবা পাঠিয়েছেন।

কালা। তোমার সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই—বন্দী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

ময়না। আমি সাক্ষ্য দিতে আসিনি।

কালা। তবে কি জন্যে এসেছ?

ময়না। শাহাজাদীর আদেশ শুনাতে এসেছি।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ফৌজদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আদেশ! কি আদেশ?"

ময়না। তিনি আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চোরের ন্যায় তাঁহার উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সে ব্যক্তি যেন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ফৌজদারের বদন আরক্তিম হইল।

বন্দী ময়নাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "নবাব-পুত্রীকে বলিবে যে, তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না, তাঁহার হৃদয় এত কুৎসিত। যে কুৎসিত, তাঁহার প্রতি আর আমি অনুরক্ত নই।"

ফৌজদার। বন্দি!

বন্দী। কি তিরস্কার করিবে ফৌজদার সাহেব? তোমার প্রভুকন্যাকে কুৎসিত বলিয়াছি, এই আমার অপরাধ? উত্তম, শাস্তি দাও—দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু মানুষে আর আমায় কি শাস্তি দিবে? দেবতা দেখিতে আসিয়া ডাইনি দেখিলাম—বিচারকের কাছে আসিয়া ধর্ম্মাধিকরণে জল্লাদ দেখিলাম। শাস্তি দাও—সামান্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দাও।

কথা কয়টা ফৌজদারের কাণে গেল কি না, জানি না। কিন্তু তাঁহার বদন তখনও আরক্তিম, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত, অধরোষ্ঠ বিযুক্ত। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ময়নার পানে চাহিয়া বলিলেন, "নবাবপুত্রীকে বলিবে, আমি বন্দীকে আপাততঃ কোনও শাস্তি দিতে পারিলাম না। যত দিন না তাহার পরিচয় পাই, তত দিন সে আমার অতিথিস্বরূপ আমার গৃহে অবস্থান করবে; কারাগৃহেও তাহাকে পাঠাইতে পারব না। এখন যাও।"

ময়না সাতিশয় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইল; বলিল, "উত্তম—নবাবপুত্রীকে শুনাইব, তুমি কিরূপে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছ।"

ফৌজদার রোষপরবশ হইয়া বলিলেন, "তাঁহাকে আরও শুনাইও যে, ফৌজদার রমণীর ভৃত্য নহে।"

ময়না কি উত্তর দিতে যাইতেছিল; কিন্তু ফৌজদারের গম্ভীর ভাব দেখিয়া কিছু বলিতে সাহস পাইল না। যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেল, "সাবধান ফৌজদার সাহেব, অন্তরে আগুন জ্বলিবে।"

ফৌজদার বন্দীর পানে ফিরিয়া বলিলেন, "যুবক, তুমি আমার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান করিতে প্রস্তুত আছ?"

বন্দী উত্তর করিল, "ফৌজদার সাহেব, হিন্দুকে এ যাবৎ কখন আমি শ্রদ্ধা করি নাই। হিন্দু কত বড় হইতে পারে, তুমি আজ তাহা দেখাইলে। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি, তোমার অনুমতি ব্যতীত তোমার গৃহের বাহিরে যাইব না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ময়নার নিকট সকল কথা শুনিয়া নবাবপুত্রী ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিলেন। কিন্তু সহসা কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিন দিনের মধ্যে নবাবের দর্শন মিলিল না। তখন দুলারী পিতাকে পত্র লিখিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। নবাব

প্রিয়তমা কন্যার আহ্বানে সত্বর আসিয়া দর্শন দিলেন। নবাব-পুত্রী বলিলেন, "পিতা, তোমার কন্যার অন্তঃপুরে যদি কোনও অপরিচিত যুবক বিনানুমতিতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাকে কি শাস্তি দাও ?"

"মৃত্যুদণ্ড।"

"যদি কেহ তোমার কন্যাকে অপমানিত করে, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে দণ্ডিত কর ?"

"যে দণ্ড আমার কন্যা প্রার্থনা করে।"

"উত্তম। একজন বিদেশী যুবক আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে ; তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কর। আর যে ব্যক্তি তাহাকে আশ্রয় দিয়ে আমাকে অবমানিত করেছে, তাহাকে অচিরে পদচ্যুত কর।"

"সে ব্যক্তি কে ?"

"ফৌজদার।"

নবাব চমকিত হইলেন। তাঁহার প্রিয় ফৌজদার এমন কাজ করিবে ? তা' হইতেও পারে। কাফের হিন্দুর অসাধ্য কিছুই নাই ; তা' ছাড়া ফৌজদারের বিরুদ্ধে অনেক আমির-ওমরাহ আজকাল অভিযোগ করিতেছেন। এমন কি, বখ্‌সি, পেশকার, সেরেস্তাদার প্রভৃতি অনেকেই ফৌজদারের পদচ্যুতি প্রার্থনা করিয়া নবাবের নিকট দরবার করিয়াছেন। তবু নবাব ভাবিলেন, "অপরাধী আর কেহ হ'ল না কেন ?"

দুলারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতার অভিপ্রায় কি ?"

নবাব বলিলেন, "ফৌজদার কে জান ?"

দুলারী। জানি—সে এক জন কাফের।

নবাব। কাফের বলিলে তাহার অমর্য্যাদা করা হয় ; যে বংশে নবাবেরা বিবাহ করিতে এ যাবৎ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, ফৌজদার কালাচাঁদ সেই বংশের অলঙ্কার-স্বরূপ।

দুলারী। সে কি বংশমর্য্যাদায় নবাবজাদীর চেয়েও বড় ?

নবাব। না, তা' নয়।

দুলারী। তবে যে ভৃত্য প্রভুকন্যার অবমাননা করে, তা'কে দূর কর।

নবাব। আমি এখনই ফৌজদারকে ডাকাইতেছি।

বলিয়া নবাব প্রস্থান করিলেন ; এবং ফৌজদারকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে উপবেশন করিলেন। ফৌজদার প্রাসাদেই ছিল, অচিরে আসিয়া অভিবাদন করিল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও ব্যক্তি নবাবজাদীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল কি ?"

ফৌজদার। অন্তঃপুরে নয়—উদ্যানে প্রবেশ করেছিল।

নবাব। একই কথা।

ফৌজ। একই কথা নয় ; বিদেশী অজ্ঞানতাবশতঃ উদ্যানে প্রবেশ করতে পারে।

নবাব। যাক্—তা'কে কি শাস্তি দিয়েছ ?

ফৌজ। তাহার বিচার স্থগিত আছে।

নবাব। কেন ?

ফৌজ। তাহার পরিচয় অভাবে।

নবাব। পরিচয়ের প্রয়োজন ? অপরাধী সকল অবস্থাতেই অপরাধী।

ফৌজ। তা' ঠিক নয়, সুলতান! একটা চাষার ছেলেকে বেত্রাঘাত করিতে পারি, কিন্তু নবাবজাদার গায়ে হাত তুলিতে পারি না। খোদা যাহাদের বড় করিয়াছেন, তাহারা চিরদিন বড় থাকিবে। এক জনের অবমাননা করিয়া সম্প্রদায়ের অবমাননা করিতে পারি না।

নবাব। তুমি কি মনে কর, এ ব্যক্তি কোনও ছদ্মবেশী নবাবজাদা ?

ফৌজ। আমার বিশ্বাস তাই।

নবাব, ফৌজদারকে তিরস্কার করিবার আর কোনও পথ পাইলেন না ; বরং তাহার নির্ভীক ও যুক্তিসঙ্গত উত্তরে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। নবাব, কালাচাঁদকে বিদায় দিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে দুইটি নীলোৎপলসদৃশ চক্ষু দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, দুলারী আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া কালাচাঁদকে বলিলেন, "তুমি নাকি সে ব্যক্তিকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছ ?"

ফৌজ। দিয়েছি।

নবাব। অন্যায় কায করেছ।

ফৌজ। অন্যায় ? এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবককে দস্যুতস্করের সাহচর্য্যে বাস করতে কারাগারে না পাঠিয়ে অন্যায় কাজ করেছি ?

নবাব। যদি সে পলায় ?

ফৌজ। তখন তাহার পরিবর্ত্তে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবেন।

নবাব আর কি বলিবেন ?—নিরুত্তর রহিলেন। ফৌজদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নবাবের আর কোনও আদেশ আছে কি ?"

নবাব দ্বার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। বিস্মিতনয়নে

দেখিলেন, দ্বার তখন ঈষন্মুক্ত নয়—অর্দ্ধমুক্ত; দুলারীর শুধু নয়ন দুইটি দৃষ্ট হইতেছিল না—সমস্ত দেহ দৃষ্ট হইতেছিল। ভাবিলেন, দুলারী ক্রুদ্ধ হইয়াছে। তখন তিনি কৃত্রিম রোষসহকারে ফৌজদারকে বলিলেন, "যাহা হউক, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছি। নবাবজাদীর ইচ্ছা, তোমাকে পদচ্যুত—"

ফৌজদার বাধা দিয়া বলিলেন, "উত্তম, আমি এখনি পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।"

নবাব। সহসা যেও না, আমি নবাবজাদীকে বুঝিয়ে দেখ্‌ব।

ফৌজদার। ক্ষমা করবেন জনাব। আমি স্ত্রীলোকের অধীনে নকরি করতে আসি নি।

বলিয়া তিনি কক্ষত্যাগ করিলেন। নবাব ঈষৎ রুষ্ট হইলেন। রোষটা শুধু ফৌজদারের উপর নয়—দুলারী বিবির উপরও কিছু। নবাব উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দুলারী আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল। নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?"

দুলারী পা না ছাড়িয়া উত্তর করিল, "বাবা, ফৌজদারকে ফিরাও—তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর।"

নবাব বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! তুমিই যে তাহার পদচ্যুতি প্রার্থনা করেছ!"

দুলারী। অন্যায় করেছি পিতা! ফৌজদার নিরপরাধ—দোষী আমি। আমায় ক্ষমা করুন—ফৌজদারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করুন।

নবাব। মরিতে চলিলাম, তবু নারী-চরিত্র বুঝিতে উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তোমার বাসনামত কার্য্য করিব।

বলিয়া নবাব প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কালাচাঁদের নকরি ছাড়া হইল না,—নবাব তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। ছদ্মবেশী বন্দীরও বিচার হইল না—অতিথিস্বরূপ কালাচাঁদের অট্টালিকায় সে ব্যক্তি অবস্থান করিতে লাগিল।

একদা প্রভাতে কালাচাঁদ মহানন্দা-সলিলে অবগাহন-স্নান করিয়া পদব্রজে গৃহে ফিরিতেছেন। পশ্চাতে দুই জন ভৃত্য কোষাকুষি, ফুলের সাজি প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছে। কালাচাঁদের পরিধানে শুভ্র কৌশিক বস্ত্র, স্কন্ধোপরি হরিনামাবলী, ললাটে মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্রক, বাহু চন্দনচর্চ্চিত, চম্পকনিন্দীবরণ, দেহের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত। অনির্ব্বচনীয় শোভা! কালাচাঁদের রূপ যেন উছলিয়া উঠিতেছিল।

কালাচাঁদ যে পথ বহিয়া যাইতেছিলেন, সে পথ প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে। দুলারী বিবি সৌধ-চূড়ায় উঠিয়া উদয়োন্মুখ ভানু দেখিতেছিলেন। সহসা কালাচাঁদের চন্দ্রবৎ সুন্দর মূর্ত্তি দুলারীর নয়নে পড়িল। তখন তিনি ভানু ছাড়িয়া চাঁদকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পার্শ্বে চন্দনা ও ময়না উভয়েই দণ্ডায়মান ছিল। ময়না কালাচাঁদকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "শাজাদী এই সে কাফের।"

দুলারী ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ঈষৎ তেজের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কাফের, ময়না বিবি?"

ময়না বিস্মিত হইয়া দুলারীর মুখ-প্রতি চাহিল। নবাবজাদীর ভাবটা ঠিক বুঝিল না; বলিল, "যে তোমার অপমান করেছিল"

দুলারী। আমার অপমান! কা'র সাধ্য বঙ্গেশ্বরের দুহিতাকে অপমান করে?

ময়না। অপমান করবার চেষ্টা করেছিল।

দুলারী। তুমি ফৌজদারের কথা বলছ? তিনি ত কোনও দিন আমার অবমাননা করেন নি। তুমি ভুল বুঝেছ; তিনি আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেছিলেন।

ময়না আরও বিস্মিত হইল। কিছু বলিল না; তীক্ষ্ণনয়নে দুলারীর প্রতি চাহিয়া রহিল। দেখিল, নবাবজাদী স্পন্দহীন-নয়নে কালাচাঁদকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ফৌজদার তখনও নয়নান্তরাল হয়েন নাই—অস্তগমনোন্মুখ চন্দ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছেন।

সহসা ময়নার মনের অন্ধকারমধ্যে আলো ফুটিয়া উঠিল। সে বুঝিল, কেন নবাবজাদীর চক্ষে ফৌজদার আজ নিরপরাধ। তাহার ওষ্ঠ-প্রান্তে একটু হাসি ভাসিয়া গেল কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। ময়না মনোভাব গোপন করিয়া কালাচাঁদের প্রতি চাহিতে চাহিতে বলিল, "কাফেরগুলা কি কুৎসিত! উলঙ্গ গায়ে মুখে কতকগুলো মাটী লেপেছে—যেন চিতেবাঘের মত দেখ্‌তে হয়েছে।"

দুলারী রাগিয়া উঠিলেন; কিন্তু কিছু বলিলেন না; শুধু একবার তীক্ষ্ণনয়নে ময়নার প্রতি চাহিলেন।

ময়না বুঝিল, নবাবজাদী তাহার প্রতি রোষান্বিত হইয়াছেন। তবু সে ছাড়িল না; বলিল, "রাগই কর আর যাই কর, কথাটা কিন্তু ঠিক।"

চন্দনা বলিল, "ফৌজদারকে কুৎসিত বল্লে নবাবজাদী রাগবেন কেন?"

ময়না সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "শুধু কুৎসিত! ভিক্ষুক—গোলাম—অসভ্য—বর্ব্বর—"

"ময়না!"

"কি নবাবজাদী?"

"তুমি মূর্খ।"

"এত দিনে জান্‌লে?

"তুমি মিথ্যাবাদী।"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি নিন্দুক।"

"তা'তে আর সন্দেহ নেই।"

দুলারী সরিয়া আসিয়া ময়নার সম্মুখীন হইলেন। নবাবজাদীর মুখ একটু আরক্তিম; নবোদিত ভানুর ছটা আবার সেই মুখের উপর পড়িয়া মুখখানাকে আরও লাল করিয়াছে। কর্ণভূষা দোলাইয়া সুলতান-তনয়া একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তুমি অসভ্য বর্ব্বর।"

"আর কি?"

"আর কি! শুনিতে চাও? তবে শুন—তুমি যাহাকে কুৎসিত বলিতেছ, তাহার মত রূপবান্ আমি সংসারে দেখি নাই; যাহাকে ভিক্ষুক গোলাম বলিতেছ, তাহার তুলনায় দিল্লীর সম্রাটও আমার নিকট তুচ্ছ। স্মরণ রাখিও বাঁদী! এই কাফের, এই ভিক্ষুক নবাবজাদীর খসম; সে ছাড়া নবাব-জাদীর আর দ্বিতীয় খসম নাই।"

ময়না একটু হাসিল; বলিল, "এ মূর্খ ক্ষণপূর্ব্বে তা' বুঝেছে; কিন্তু তুমিও স্মরণ রেখো নবাবজাদী, এ সম্মিলন অসম্ভব।"

দুলারী। কেন অসম্ভব, ভবিষ্যদ্দর্শী?

ময়না। ফৌজদার তোমায় গ্রহণ করবে না।

দুলারী। আমায—বঙ্গাধিপের একমাত্র দুহিতাকে গ্রহণ করবে না? যা'কে পা'বার জন্য দিল্লীশ্বর লালায়িত, তা'কে এক জন দরিদ্র ফৌজদার গ্রহণ করবে না? তুমি বুদ্ধি হারিয়েছ।

ময়না। তোমার গর্ব্বই অন্তরায় হবে।

দুলারী। তাই ব'লে কি আমায় বিস্মৃত হ'তে হবে, আমি কে?

ময়না। বিস্মৃত হ'তে না পারলে ভালবাসতেও পারবে না, ফৌজদার কালাচাঁদকেও পাবে না।

দুলারী। হুকুম করলে ফৌজদার ছুটে এসে পদপ্রান্তে লুটাবে।

ময়না। আগে পায়ের কাছে আন, তার পর বলিও, ময়না মিথ্যাবাদী।

আদরিণী কন্যা জননীর নিকট মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। নবাবমহিষী কন্যাকে অনেক বুঝাইলেন; বলিলেন, "শত শত সুলতান পুত্র যাহার করুণা প্রার্থনা করে, সে এক জন সামান্য বান্দার জন্য লালায়িত? ছি ছি, এ ঘৃণিত প্রস্তাব আর উত্থাপন করিও না। দিল্লীশ্বরের সহিত যাহাতে তোমার বিবাহ হয়, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতেছি।"

কন্যা বলিলেন "মা, ঐশ্বর্য্যে সুখ আছে বটে, কিন্তু ভালবাসায় যত সুখ, এত সুখ কিছুতেই নেই। আমি ঐশ্বর্য্য ছাড়তে পারব না—কালাচাঁদকেও ছাড়তে পারব না। তুমি যদি আমার আব্দার না রাখ, তবে কে আমার আব্দার রাখবে মা? আমি আর কা'র কাছে বলব, 'ওগো, আমার জীবন শ্মশান করো না —আমায় প্রাণে মেরো না'? তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে মা, আমার চোখে জল দেখলে কাঁদবে, আমায় মর্‌তে দেখলে মরবে?"

স্নেহময়ী জননীর প্রাণ গলিয়া গেল; তিনি স্নেহভরে কন্যাকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। দুলারী বুঝিলেন, জননীর আনুকূল্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। নবাবজাদী ভুল বুঝেন নাই। মহিষী মনে মনে স্থির করিলেন, "কন্যা যা'তে সুখী হয়, আমি তা' করব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তার পর কিছু দিন কাটিয়া গেল। নবাবকন্যা প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে ছাদের উপর আসেন; কালাচাঁদও প্রত্যহ পরিচারক-সমভি-ব্যাহারে স্নান পূজার্থে নদীতীরে গমন করেন। দুলারী অতৃপ্তনয়নে কালাচাঁদকে দেখেন; কালাচাঁদ নিম্ন-তুণ্ডে সম্মুখস্থ পথ দেখেন। দুলারী, কালাচাঁদ ছাড়া আর কিছু দেখেন না; কালাচাঁদ বাহেন্দ্রিয় নয়ন দ্বারা সম্মুখস্থ পথ ছাড়া আর কিছু দেখেন না।

এক দিন দুলারী বিবি সবিস্ময়ে দেখিলেন, কালা-চাঁদ যখন স্নান-পূজা সমাপন করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, তখন উজির খাঁজাহান লোডী অভিবাদন করিয়া কালাচাঁদকে কি বলিলেন। কালাচাঁদ প্রত্যুত্তর করা দূরে থাক্, উজিরের পানে ফিরিয়াও দেখিলেন না। তখন তিনি জগন্নাথস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

"দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥
ন যাচেঽহং রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং।
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্॥
সদাকালং কাম্যং প্রমথপতিনোদ্গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

উজির উত্তর না পাইয়া পুনরায় কালাচাঁদকে কি বলিলেন। কালাচাঁদ ফিরিয়াও দেখিলেন না। উজির তখন নীরবে কালাচাঁদের পশ্চাৎপশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উজির, ফৌজদারের অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত, তিনি ইচ্ছা করিলে কালাচাঁদকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে পারেন, সেই উজিরকে এক জন ফৌজদারের হাতে এরূপভাবে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া দুলারী সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, ফৌজদারের কি তেজ!

উজির আসিয়াছিলেন,—রাজাদেশ ফৌজদারের নিকট নিবেদন করিতে। তিনি ছাড়িলেন না, পশ্চাদনুসরণ করিয়া ফৌজদারের গৃহ পর্য্যন্ত গমন করিলেন। তথায় ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া ফৌজদারকে রাজ-সন্নিধানে লইয়া চলিলেন।

সুলতানের গুরুতর আদেশ। কক্ষের পর কক্ষ অতিক্রম করিয়া ফৌজদার অবশেষে এক নিভৃত ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে উপনীত হইলেন। সেখানে একখানি কুসুমোপম কোমল গালিচার উপর সুলতান উপবিষ্ট ছিলেন। নবাবের আদেশে উজির কক্ষত্যাগ করিলেন। এক জন খোজা ইঙ্গিত পাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। সুলতান বলিলেন, "ফৌজদার, বসো।"

কালাচাঁদ বসিলেন, কিন্তু দূরে—পৃথগাসনে। তাঁহার হৃদয়মধ্যে গভীর বিস্ময় ও চিন্তাস্রোত বহিতে লাগিল। সুলতান তাঁহাকে ডাকিয়াছেন কেন? কক্ষদ্বারই বা বন্ধ হইল কেন? কালাচাঁদ ভাবিবার অবসর পাইলেন না; সুলতান স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—"কালাচাঁদ, তুমি সদ্বংশজাত; তোমাদের গৃহের সহিত আমাদের কুটুম্বিতা পূর্ব্বাবধি চলিয়া আসিতেছে। তবে তোমাদের গৃহে কোনও নবাব কখন কন্যা দেন নাই—তাঁহারা কন্যা লইয়া আসিতেছেন। আমার বাসনা, শাহাজাদীকে তোমার হস্তে অর্পণ করি।"

কালাচাঁদ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি এরূপ প্রস্তাব এককালে প্রত্যাশা করেন নাই। সুলতানকে দ্বার বন্ধ করিতে দেখিয়া তিনি মুহূর্ত্তেকের জন্য ভাবিয়াছিলেন, সুলতান হয় ত তাঁহাকে অবমানিত করিবেন; কিন্তু এরূপ প্রস্তাব!—কালাচাঁদের কল্পনাতেও কোন কালে আসে নাই। আমির-ওমরাহ, এমন কি, নবাবেরাও এ প্রস্তাবে সম্মান ও গৌরব জ্ঞান করিতেন; কিন্তু ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী কালাচাঁদ ভাবিলেন, এ প্রস্তাব অপেক্ষা মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইলে ভাল হইত। তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তিও না করিয়া উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সুলতান কহিলেন, "কালাচাঁদ, তোমার পিতা আমাদের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে; তাঁহার তেজ, পরাক্রম তাঁহার সততা, বাস্তব চিরস্মরণীয়। তোমাকে দেখিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তুমি আমার অনুপযুক্ত জামাতা হইবে না। রাজ-জামাতার উপযোগী পদ, খিলাত, ইনাম তোমাকে অর্পণ করিব। আমি এখনও বিবাহের দিন স্থির করি নাই, পরে পরামর্শ করিয়া তোমায় জানাইব। এক্ষণে যাইতে পার।"

কালাচাঁদ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু স্থানত্যাগ করিলেন না। সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

কালাচাঁদ। জাঁহাপনার দয়া ও অনুগ্রহ যথেষ্ট। জাঁহাপনার আদেশে এ দাস হাসিতে হাসিতে জান্ দিতে পারে, কিন্তু—

নবাব। কিন্তু কি?

কালা। ক্ষমা করিবেন জাঁহাপনা! আমি বিবাহ করিতে পারিব না।

নবাব। পারিবে না? কেন?

কালা। আমি বিবাহিত।

নবাব। এই আপত্তি? পরিবারকে ত্যাগ করিলেই চলিবে।

কালা। আমার দুই স্ত্রী; এক জনকে ত্যাগ করেছি, অপরাকে জীবন থাক্‌তে ত্যাগ করতে পারব না।

নবা। কেন পারবে না?

কালা। সে নিরপরাধ।

নবাব ভাল, সে নবাবজাদীর বাঁদী হয়ে থাক্‌বে।

কালা। আরও এক আপত্তি আছে জাঁহাপনা!

নবাব। আপত্তি? রহস্য মন্দ নয়। ভাল, ফৌজদার সাহেবের আপত্তিটা শুনা যাক্।

কালা। জাঁহাপনা, আমি হিন্দু।

নবাব। আমি তাহা অবগত আছি। আমার আদেশে মোল্লা তোমাকে পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করবে।

কালা। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যের জন্যও আমি ধর্ম্মত্যাগ করতে পারব না।

পূর্ব্ব হইতে নবাবের ক্রোধোদ্রেক হইয়াছিল; এক্ষণে তিনি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না; গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি, পারবে না? শাহাজাদীর জন্যও পারবে না?"

কালা। না, জাঁহাপনা।

নবাব। তুমি মৃত্যুবাঞ্ছা করেছ।

কালা। ভয় দেখাবার প্রয়োজন নেই, সুলতান, আমি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। যে আপনার প্রজা, ভৃত্য, তা'কে ভয় দেখাবার প্রয়োজন কি?

নবাব উত্তর না করিয়া ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ভাল করেন নাই। এক্ষণে পিছাইলে মান-মর্য্যাদা থাকে না। কি, এক জন কাফের শাহাজাদীকে প্রত্যাখ্যান করিবে? কখনই নয়। যখন প্রস্তাব করিয়াছ, তখন ফৌজদার হয় বিবাহ করিবে, নয় ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিবে। নবাব চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইলেন।

তিনি কি স্থির করিলেন, জানি না, কিন্তু ক্ষণকাল পরে মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর শাহা-জাদী যদি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন?"

কালা। তা' হলেও তাঁকে গ্রহণ করতে পারব না।

নবাব। কারণটা ফৌজদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কালা। যে রমণীকে আমি অভিলাষ করি না, তাঁহাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না।

নবাব স্তম্ভিত হইলেন। এত বড় কথা তাঁহার মুখের উপর কেহ বলিতে পারিবে, তিনি কখন তা' ভাবেন নাই। নবাব দেখিলেন, কালাচাঁদ ভিতরের সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছে;—সে বুঝিয়াছে যে, সে দুলারী বিবির অভিলষিত এবং তাহারই বাসনানুসারে নবাব এ বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। বুঝিয়াই কালাচাঁদ ইঙ্গিতে দুলারী বিবিকে উপযাচিকা বলিতেছে—উপযাচিকা বুঝিয়াই তাহাকে ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেছে। নবাবের গর্ব্ব চূর্ণ হইল, উন্নত ফণায় বেত্রাঘাত পড়িল। তিনি যেন একটু অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুন ফৌজদার, এক দিকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পদ, অপর দিকে মৃত্যুদণ্ড; কোন্‌টা বরণ করিতে ইচ্ছা কর?"

কালাচাঁদ। মৃত্যুদণ্ড—সহস্রবার মৃত্যুদণ্ড।

নবাব। ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু—কিন্তু এই কি তোমার শেষ কথা?

কালা। শুন নবাব, তোমার দাসত্ব করতে এসেছি, শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তোমার কাজ করব। যাহা রাজা প্রজার নিকট, প্রভু ভৃত্যের নিকট, পিতা পুত্রের নিকট দাবী করতে পারে, তাই কর; তা'র বেশী অগ্রসর হও, তোমার তরবারি তোমাকে প্রত্যর্পণ করব। (তরবারি কোষমুক্ত করিয়া সুলতানের সম্মুখে রক্ষা করিলেন)। আমার দেহ তোমার, আমার জীবন তোমার; কিন্তু আমার মন বা ধর্ম্মের উপর তোমার কোনও অধিকার নেই। বাঙ্গালার নবাব, এই আমার শেষ কথা।

নবাব। দুই সপ্তাহ তোমায় সময় দিলাম; দুই সপ্তাহ পরে তোমার শেষ কথা শুনিব। এখন তরবারি গ্রহণ কর।

কালা। না নবাব, তোমার দাসত্ব আর করব না।

বলিয়া কালাচাঁদ অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিলেন। সুলতান যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহারই পরাজয় হইয়াছে।—"কিন্তু এ ব্যক্তির হস্তে যদি কন্যাকে অর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে অযোগ্য পাত্রে কন্যা ন্যস্ত হইত না। কি তেজ! কি গর্ব্ব? এ ত মানুষ নয়—যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আমি যদি পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় মনুষ্য-চরিত্র কিছুমাত্র বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি শতবার বলিব, কালাচাঁদের ন্যায় তেজস্বী ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী আমার রাজ্যমধ্যে বিরল। কিন্তু হায়, তাহাকে পুরস্কৃত না করিয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইতেছে।"

নবম পরিচ্ছেদ

"বুনা!"

"কি প্রভু?"

"আমার দোকানপাট উঠিল।"

"এখানকার?"

"এখানকার শুধু নয়—দুনিয়ার দোকানপাট উঠিল বুনা।"

বুনা এইবার কথাটা বুঝিল। সে জানিত, কালাচাঁদ রহস্য করিয়াও কখন মিথ্যা কথা বলিবেন না। তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে সেই নয়ন দুইটি কালাচাঁদের মুখের উপর স্থাপন করিয়া নীরব রহিল। কালাচাঁদ বলিলেন, "বুনা, আমার বিশ্বাস, তুমি আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। এত-বড় পৃথিবীতে তুমি ও মা ছাড়া আমার জন্য কেহ কাঁদিবে না। বুনা, নবাব আমাকে প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বুনা শিহরিয়া উঠিল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "অপরাধ?"

কালাচাঁদ। অপরাধ গুরুতর। তিনি তাঁহার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে সমুৎসুক, আমি গ্রহণ করিতে অসম্মত। তিনি আমার ধৃষ্টতার দণ্ডবিধান করিয়াছেন।

বুনা সহসা কোন উত্তর করিল না। কথাটা তলাইয়া বুঝিল। বুঝিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিল। তার পর নয়নদ্বয় অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি কেন সম্মত হলেন না?"

কালা। পারলুম না বুনা।

বুনা। শুনেছি, আপনার দুই বিবাহ।

কালা। তাই ব'লে কি যবনী বিবাহ করব?

বুনা। সে যদি হিন্দু হয়?

কালা। হিন্দুসমাজ সম্ভবতঃ তা'কে গ্রহণ করবে না।

বুনা। আর যদি করে?

কালা। তা হ'লেও পারব না।

বুনা। ক্ষমা করবেন,—কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

কালা। যে রমণী উপযাচিকা হয়ে আমায় বিবাহ করতে চায়, তা'কে আমি বিবাহ করতে পারি না,—তা' রাজ্যের জন্যে নয়—জীবন-রক্ষার্থেও নয়।

বুনা নিরুত্তর রহিল। কথাটা নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বুনার মনে হইল না। কিন্তু এখন ন্যায়-অন্যায়ের দিকে চাহিলে চলিবে না—প্রভুর জীবন রক্ষা করিতে হইবে। তার উপায় কি? বুনা চিন্তাসাগরে নিমজ্জিত হইল।

কালাচাঁদ তখন দুইখানা পত্র লিখিতে বসিলেন। একখানা মাকে লিখিলেন, অপরখানা গদাধরকে লিখিলেন। শেষোক্ত পত্রে লিখিলেন,—"ভাই গদাধর, আমার ভ্রম ঘুচেছে—আমাকে ক্ষমা কর। জীবনে সম্ভবতঃ আর সাক্ষাৎ ঘটবে না—আমি পৃথিবী ছেড়ে চল্লাম। আমার স্থান নিয়ে মাকে মা ব'লে ডেকো, আর—যদি পার, অভাগিনী ভূপবালাকে দেখো।"

পত্র দুইখানা শেষ করিয়া এক জন বাহকের দ্বারা তাহা পাঠাইয়া দিলেন। বুনা শুনিল, কোথায় পত্র যাইতেছে। সে একটু চমৎকৃত হইল। এমন সময় সহসা সিঁড়িতে পাদুকাধ্বনি হইল। বুনা বিস্মিত হইয়া কালাচাঁদের মুখপানে চাহিল। অট্টালিকার দ্বিতলে কাহারও আসিবার অধিকার নাই। যদি কেহ হুকুম লইয়া আসে, তা' সে ব্যক্তি পাদুকা পরিয়া আসিতে সাহস পায় না। বুনা ঝটিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং দুই এক পা অগ্রসর হইতে না হইতেই সম্মুখে দেখিল, একটি রূপ-যৌবনোৎফুল্লা যবনী চঞ্চল চরণে আসিতেছে। বুনা পূর্ব্বে এ রমণীকে দেখে নাই। বিস্মিত হইয়া একটু পিছাইয়া দাঁড়াইল। যবনী তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কালাচাঁদকে বলিল, "আদাব ফৌজদার সাহেব, মেজাজ সরিফ?"

কালাচাঁদ যবনীকে চিনিলেন। এই সে বাঁদী ময়না—কালাচাঁদের নিকট ঔদ্ধত্য হেতু এক দিন তিরস্কৃত হইয়াছিল। কালাচাঁদ ময়নাকে দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "কি জন্যে এখানে এসেছ?"

"এ কি ফৌজদার সাহেব, আপনার কোমরে তরওয়াল নেই কেন?"

"আমি নক্‌রিতে ইস্তফা দিয়েছি।"

"কেন?"

"সে কথা তোমার শুন্‌বার দরকার নেই।"

ময়না ঘা খাইয়াও দমিল না। সে বলিল, "আমি এখনি শাজাদীর নিকট চল্লাম। আমি তাঁকে বল্‌ব, আপনার নক্‌রি ছুটেছে; তিনি আজই আপনাকে মন্ত্রী ক'রে দেবেন।"

কালাচাঁদ উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে ইহাও তাঁহাকে জানাইও যে, কালাচাঁদ কাহারও কৃপা-প্রার্থী নয়।"

ময়না কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া কণ্ঠের একটু শব্দ করিল; অবশেষে বলিল, "আমার সে সব কথায় প্রয়োজন নেই। সুলতানা যা' বল্‌তে বলেছেন, আমি তাই বলি। তিনি শুনেছেন, আপনি প্রত্যহ পূজাহ্নিক করেন। শুনে আপনার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়েছে। বেগম সাহেবা বলেছেন যে, রাজোদ্যানে প্রত্যহ অনেক ফুল ফুটে বৃথা নষ্ট হয়ে যায়; ফৌজদার সাহেব যদি রোজ রোজ ফুল তুলে নিয়ে দেবতার

চরণে অর্পণ করেন, তা' হলে ফুলের জন্ম সার্থক হয়, বেগম সাহেবাও কৃতার্থ হ'ন।"

কালাচাঁদ এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কেহ যদি মণিমাণিক্য সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে আহ্বান করিত, তাহা হইলে তিনি সে আহ্বান, সে প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিতেন, কিন্তু দেবপূজার্থে পুষ্প-সংগ্রহ! কালাচাঁদ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বেগম-সাহেবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পরদিন কালাচাঁদ ফুল তুলিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বারে প্রতিহারী নাই—কবাটমুক্ত—উদ্যানেও জনপ্রাণী নাই। তিনি হৃষ্টচিত্তে রাশি রাশি ফুল সংগ্রহ করিয়া নদীতীরে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া দেবপূজা করিলেন। দ্বিতীয় দিবসেও কালাচাঁদ উদ্যানে কাহাকেও দেখিলেন না। তৃতীয় দিবসে তিনি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, ফুল্লকুসুমিত পদ্মবৃক্ষতলে একটি কুসুমাধিক কোমলা নবযৌবনোদ্ভাসিতা কিশোরী দাঁড়াইয়া উদয়োন্মুখ ভানুপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার ললাটে, অঙ্গে পুষ্পরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে—স্নেহাধিক কোমল বালারুণ তাহার দেহ জড়াইয়া ধরিয়াছে। কালাচাঁদ মুহূর্ত্তেকের জন্য তাহার পানে চাহিলেন; তার পর নিঃশব্দপদসঞ্চারে উদ্যান ত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ দিবস কালাচাঁদ আসিলেন না। পঞ্চম দিবসে উদ্যানে আবার আসিলেন। ভাবিয়াছিলেন, সে দিন উদ্যানে হয় ত কেহ থাকিবে না। ছিলও না। কিন্তু যখন তিনি পুষ্প সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তখন তিনি শুনিলেন, সন্নিকটস্থ লতাকুঞ্জান্তরাল হইতে কে যেন বলিতেছে,—"আপনিই কি ফৌজদার সাহেব?"

ফৌজদার দাঁড়াইলেন; চারিদিক পানে চাহিয়া দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; তখন তিনি আবার অগ্রসর হইলেন। পিছনে আবার কে কি বলিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, লতাকুঞ্জের দ্বারপথে সেই ভুবনমোহিনী কিশোরী দণ্ডায়মানা। কালাচাঁদ বুঝিলেন, এ রমণী সুলতান-তনয়া। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি আদেশ নবাবপুত্রি?"

"আপনি আমায় কিরূপে চিনিলেন ফৌজদার সাহেব?"

"অনুমানে বুঝেছি।"

"আমার রূপ দেখে?"

"আপনার যে রূপ আছে, তাহা আমি লক্ষ্য করি নি।"

বলিয়া কালাচাঁদ উদ্যান পরিত্যাগ করিলেন।

নবাব-কন্যা একখানি চিত্রের ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালাচাঁদের রূঢ় কথা, রূঢ় ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে বড়ই লাগিয়াছিল।

তার পর কালাচাঁদ উদ্যানে আর চার পাঁচ দিন আসিলেন না। চার পাঁচ দিন পরে এক দিন অতি প্রত্যূষে আসিয়া দেখিলেন, উদ্যানের দ্বার রুদ্ধ—দ্বারেও প্রহরী বসিয়াছে। কিন্তু কালাচাঁদ আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র প্রহরী সম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিল। কালাচাঁদ উদ্যানে প্রবেশান্তে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, লতাকুঞ্জের সন্নিকটে নবাবপুত্রী ভূপৃষ্ঠে কঠিন মৃত্তিকার উপর শয়ান রহিয়াছেন। কালাচাঁদ চমকিয়া দাঁড়াইলেন। একবার সেই ছিন্ন বল্লরী, সেই ছিন্ন বিদ্যুল্লতা পানে চাহিলেন; কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য,—পরমুহূর্ত্তেই তিনি উদ্যান ত্যাগ করিলেন। তার পর আর তিনি উদ্যানে আসিলেন না।

পঞ্চদশ দিবসে কালাচাঁদ নবাবের সমক্ষে আহূত হইলেন। সেই ক্ষুদ্র কক্ষ—সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবাব। নবাব স্থিরদৃষ্টে কালাচাঁদের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফৌজদার সাহেবের অভিপ্রায় কি?"

কালাচাঁদ। অভিপ্রায় শতবর্ষেও পরিবর্ত্তিত হইবার নয়, সুলতান!

নবাব। তবে দণ্ড গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছ?

কালা। সকল সময়ে প্রস্তুত, রক্তপিপাসু সুলতান!

নবাব। রক্তপিপাসু?

কালা। সহস্রবার রক্তপিপাসু।

নবাব। ফৌজদার—

কালা। যে মরিতে যাইতেছে, তা'কে কি ভয় দেখাইতেছ সুলতান!

নবাব। শূল-দণ্ডে তোমার মৃত্যু—

কালা। আমি তোমার কি করিয়াছি সুলতান, তুমি আমার যৌবনপ্রভাতে, আমার জীবন-প্রারম্ভে আমাকে হত্যা করিতে মানস করিয়াছ? আমি তোমার কি করিয়াছি সুলতান, আমাকে না মারিলে তোমার রাজ্য চলে না, সংসার চলে না, তোমার ধর্ম্ম থাকে না? আমি কবে তোমার কি অপকার করিয়াছি, তোমার কোন্ কার্য্যে কবে শৈথিল্য দেখাইয়াছি, কবে তোমার কোন্ আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি যে, আমাকে পৃথিবী হইতে অপসারিত না করিলে তোমার রাজধর্ম্ম, মনুষ্যধর্ম্ম সংরক্ষিত হয় না?

সুলতানের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নিরুত্তর রহিলেন। বাতায়ন-পথে সুদূর আকাশ দেখা যাইতেছিল; তিনি তৎপ্রতি চাহিয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মরিতে ভয় পাইতেছ, ফৌজদার?"

কালাচাঁদ। ভয় কাহাকে বলে, কালাচাঁদ জন্মাবধি জানে না। সংসারে আমার কোনও বন্ধন নাই—আমার জন্য কাঁদিবার কেহ নাই। আমি কি জন্যে বাঁচিতে চাহিব? বাঁচিয়া তোমার মত অবিবেচক অত্যাচারী সুলতানের দাসত্ব করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। তোমার জল্লাদকে ডাক—আমি প্রস্তুত আছি।

সুলতানের মাথা নামিয়া পড়িল। তিনি অবনতবদনে বলিলেন, "এখনও বিবেচনা করিয়া দেখ ফৌজদার! রাজাজ্ঞা ফিরিবার নয়।"

কালা। আমারও অভিপ্রায় পরিবর্ত্তিত হইবার নয়।

এমন সময় নবাবকন্যা দ্বারান্তরাল হইতে ছুটিয়া আসিয়া পিতার চরণোপরি আছাড় খাইয়া পড়িলেন; এবং প্রায়াবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "পিতা, ফৌজদারকে ছেড়ে দেও—আমি আর তাঁকে বিবাহ করতে চাই নে।"

সুলতান অপ্রসন্ন হইলেন। ক্ষণপূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে যে করুণাটুকু—যে দুর্ব্বলতাটুকু সমুদিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। তিনি মাথা নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি বিবাহ কর বা না কর, অবাধ্য প্রজা, অবাধ্য কর্ম্মচারীকে শাস্তি দিতে হবে।"

সুলতান-তনয়া পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তবে সেই সঙ্গে আমাকেও বিদায় দাও।"

নবাব এবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রোধটা শুধু কালাচাঁদের বা দুলারীর উপর নয়; কতক কতক ঘটনার উপর। তিনি একটু তেজের সহিত উত্তর করিলেন, "তা'ও দিতে পারি, কিন্তু নিজের আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারি না।"

দুলারী বিবি বলিলেন, "বেশ পিতা, বেশ সুলতান! আমারও আর ঐশ্বর্য্য আভরণে প্রয়োজন নাই, তোমার জিনিস তুমি লও।"

বলিয়া তিনি অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কারগুলি একে একে খুলিয়া পিতার চরণ-সমীপে রক্ষা করিলেন। তার পর কোনও দিকে না চাহিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সুলতানের মাথা আবার নামিয়া পড়িল; করুণাটুকু আসিয়া পুনরায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি মাথা না তুলিয়া বলিলেন, "ফৌজদার সাহেব, যে ব্যক্তি আমার কন্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আমার আদেশ অমান্য করেছে, সে ব্যক্তি কোন মতেই জীবিত থাকতে পারে না, সে বেঁচে থাকলে আমি আর মাথা তুলতে পারব না—আমার সিংহাসনও কণ্টকময় হবে। কিন্তু—কিন্তু কালাচাঁদ, আমি তোমাকে প্রকৃতই একটু স্নেহ—"

কালাচাঁদ বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি ঠিক করিতেছেন সুলতান, আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম; আমি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি।"

এবার দুর্ব্বলতা আসিয়া সুলতানের হৃদয়-কবাটে আঘাত করিতে লাগিল। সুলতান বলিলেন, "কালাচাঁদ, আমার অনুরোধ—আমার প্রার্থনা—"

"ক্ষমা করিবেন সুলতান।"

"আমার ভিক্ষা—"

"আর আমায় লজ্জা দিবেন না।"

দুর্ব্বলতা পুঁটুলি বাঁধিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। স্ত্রী করুণাও অনুবর্ত্তিনী হইবার অভিলাষ জানাইল। নবাব বলিলেন, "তুমি যা চাহিবে, তাহা দিব। বল, বল কালাচাঁদ—"

"বঙ্গরাজ্য বিনিময়েও যে তা' পারব না সুলতান"

দুর্ব্বলতা ও করুণা—স্বামি-স্ত্রী—পুঁটলি ঘাড়ে করিল। নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বল দেখি ফৌজদার, কেন তুমি নবাবজাদীকে গ্রহণ করতে অসম্মত?"

কালাচাঁদ। বলেছি ত নবাব, যে রমণীকে আমি অভিলাষ করি না, তাহাকে আমি গ্রহণ করতে পারি না।

দুর্ব্বলতা ও করুণা সবেগে প্রস্থান করিল। নবাব জল্লাদকে তলব দিলেন।

যেখানে সচরাচর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বধ করা হয়, সেখানে কালাচাঁদকে লইয়া যাওয়া হইল না। কেন না, কালাচাঁদকে গোপনে বধ করিতে হইবে; লোক জানাজানি হইলে রাজ-নন্দিনীর কলঙ্ক। অতএব বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদের একাংশে—উন্মুক্ত স্থানে—কালাচাঁদের জন্য বধ্যমঞ্চ ক্ষণকালমধ্যে নির্ম্মিত হইল। সুলতান তথায় আর আসিলেন না; এক জন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ও দুই জন ঘাতক মাত্র তথায় উপস্থিত রহিল। কালাচাঁদ বধ্যভূমিতে সহাস্যবদনে আসিলেন; এবং একবার আকাশের দিকে চাহিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "আমার কোনও দুঃখ নেই প্রভু—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

ঘাতক বলিল "প্রস্তুত হও।"

কালাচাঁদ। ঘাতক, আমাকে বাঁধিবার প্রয়োজন নাই, আমি অবনতমস্তকে রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিব।

ঘাতক। সে ত ভাল কথাই ; এখন হাঁটু গেড়ে বসো।

কালাচাঁদ স্থির হইয়া আদেশমত বসিলেন। ঘাতক খড়্গ উঠাইল, কিন্তু কর্ম্মচারীর হুকুম না পাইলে খড়্গ নামাইতে পারে না। এমন সময় এক উন্মাদিনী ছুটিয়া আসিয়া কালাচাঁদ ও খড়্গের মধ্যে পড়িল। ঘাতক স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?"

উন্মাদিনী উত্তর করিল, "আমি কে, পরে জানিবে। ঘাতক, আগে আমাকে বধ কর, পরে ফৌজদারকে মারিও।"

ঘাতক। স'রে দাঁড়াও, আগে এই লোকটাকে কোতল ক'রে নি।

উন্মাদিনী। আমি বেঁচে থাক্‌তে ফৌজদারকে কেহ মার্‌তে পার্‌বে না।

ঘাতক। তবে তুমিও ওর পাশে বসো, এক-সঙ্গেই সেরে নি।

কালাচাঁদ এ উন্মাদিনীকে চিনিলেন। যাহাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই এক্ষণে জল্লাদের খড়্গ বক্ষ পাতিয়া লইতে আসিয়াছে। কালাচাঁদ দেখিলেন, দুলারী বিবির অঙ্গে কোথাও একখানি অলঙ্কার নাই, পরিধানে সে মূল্যবান্ বসন বা কোর্ত্তা নাই। কালাচাঁদ ক্ষণকালের জন্য দুলারীর মুখপ্রতি একটু যেন মুগ্ধনয়নে চাহিয়া রহিলেন। তিনি দেখিলেন, শুভ্র ছিন্ন বসনমধ্য হইতে নবাব-নন্দিনীর রূপ যেন উছলিয়া উঠিতেছে। এত রূপ, অলঙ্কারের আবরণে এত দিন ঢাকা ছিল। কালাচাঁদ বলিলেন, "নবাব-পুত্রি, সরিয়া দাঁড়াও।"

রাজকর্ম্মচারী ও ঘাতকদ্বয় কুর্ণিশ করিতে করিতে বিশ হাত পিছাইয়া গেল। কালাচাঁদ বলিলেন, "নবাব-পুত্রি, আমার মৃত্যু ত অনেক পূর্ব্বেই হয়েছে ; সে যন্ত্রণাকে তীব্র করবার জন্যে আর কেন আমার জীবন-রক্ষার প্রয়াস পাচ্ছ ?"

নবাব-নন্দিনী। আপনার জীবন রক্ষা কর্‌তে আসি নি, ফৌজদার সাহেব! আপনাকে আমি চিনেছি। আমার অভিপ্রায়, যে এই সর্ব্বনাশের মূল, তার জীবন অগ্রে গৃহীত হউক।

সুলতান অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিলেন। কর্ম্মচারী সম্ভবতঃ তাহা জানিত। সে আদেশ প্রত্যাশায় সুলতানের দিকে ফিরিল। সুলতান তাহাকে কি ইঙ্গিত করিলেন। সে ঘাতকদ্বয় লইয়া প্রস্থান করিল।

কালাচাঁদ বা দুলারী কেহ তাহা লক্ষ্য করিলেন না। কালাচাঁদ তখন বলিতেছিলেন, "কেন জীবন দিবে, দুলারী বিবি? তোমার এই বয়স, এত রূপ—"

দুলারী। রূপ-যৌবন নিয়ে কি জীবন?

কালা। ঐশ্বর্য্য, পদ—?

দুলারী। ছি!

কালা। তবে কি নিয়ে?

দুলারী। আত্মসমর্পণ।

কালা। দুলারী বিবি, এত দিন তোমাকে আমি চিনতে পারি নি ; আমাকে গ্রহণ কর্‌বে কি ?

দুলারী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ; তার পর কালাচাঁদের চরণের উপর মাথা লুটাইয়া পড়িয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এত দিনে আমার পূজা গ্রহণ করিলে প্রভু ?"

কালাচাঁদের চরণদ্বয় শতবার চুম্বিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

নবাব-নন্দিনীর সহিত কালাচাঁদের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। পূর্ব্বে এ বিবাহে সুলতানের একটু অনিচ্ছা ছিল ; ক্রমে অনিচ্ছার স্থান আকাঙ্ক্ষা অধিকার করিয়াছিল ; পরে আকাঙ্ক্ষা জিদে পরিণত হইয়াছিল। হৃত রত্ন লাভ করিয়া লোকে যেরূপ আনন্দে তাহা বক্ষে ধারণ করে, সুলতানও সেইরূপ মহোল্লাসে কালাচাঁদকে বক্ষে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কালাচাঁদ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন না। দুলারী তাঁহাকে মুসলমান হইতে দিল না—সে নিজে হিন্দু হইল।

নবাব তাঁহার জামাতার বাসের জন্য এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রদান করিলেন। হিন্দু দাসদাসী নিযুক্ত হইল। কিন্তু কালাচাঁদ তথায় আহারাদি করিতেন না ; তিনি বুনার কাছে আহারের জন্য আসিতেন। গঙ্গাস্নান, পূজাহ্নিক, ত্রিপুণ্ড্রকের কোনই ত্রুটি হইল না। তথাপি হিন্দুসমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। দুলারীর কথা ত হিন্দুসমাজ বিবেচনার যোগ্যই মনে করিল না। নবাব কন্যার খাতিরে একটু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমাজ তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিল না। কালাচাঁদ স্বয়ং

অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বিফলমনোরথ হইলেন। গুণং-অধিপতির নিকট গমন করিয়া সমাজে স্থান ভিক্ষা করিলেন; তিনি বিদ্রূপ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। জননীকে পত্র লিখিলেন। জননী হরসুন্দরী প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—"তোমাকে ও নববধূকে বুকে লইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। আমার বাসের জন্য উদ্যানের এক প্রান্তে গৃহনির্ম্মাণ হইতেছে। তথায় আমি পুরমহিলাদের লইয়া সত্বর স্থানান্তরিত হইব। তুমি সত্বর আসিবে।"

সকল দিকে হতাশ হইয়া অবশেষে কালাচাঁদ গদাধরের শরণাপন্ন হইলেন। গদাধর তখন সাঁতোড়ে—শ্বেতায়। বহুকাল পরে উভয়ের সাক্ষাৎ। কালাচাঁদ বলিলেন,"ভাই, আমাকে ক্ষমা কর; আমি পাপিষ্ঠার জন্য অমূল্য রত্ন হারাতে বসেছিলাম।"

উত্তর না দিয়া গদাধর হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক কালাচাঁদকে বক্ষে ধারণ করিলেন। কালাচাঁদ চমৎকৃত হইলেন। আশা হইল, গদাধর তাঁহাকে বিমুখ করিবেন না। ক্ষণপরে বলিলেন, "গদাধর, তুমি আমায় গ্রহণ করবে কি?"

গদা। আমি কবে তোমায় ত্যাগ করেছি ভাই?

কালা। আজ আমি তোমার গৃহে অতিথি।

গদা। সাধ্যমত অতিথি-সৎকার করব।

কালা। বাল্যকালে দুই জনে যেমন এক পাত্রে আহার করতুম, তেমনি ক'রে আহার করবে ভাই?

গদা। তেমনটা ত আর হ'তে পারে না, কালাচাঁদ।

কালা। বুঝেছি, তুমিও আমায় ত্যাগ করলে।

গদা। ত্যাগ করি নি ভাই—বুকের ভিতর আরও জড়িয়ে ধরেছি; তুমি যে এখন দায়ে পড়েছ।

কালা। আমি দয়া চাই না—সমাজে স্থান চাই।

গদা। যবনীকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ?

কালা। না—শতবার না।

গদা। প্রায়শ্চিত্ত?

কালা। না। আমি এমন কোনও কাজ করি নাই, যে জন্য আমার অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন

গদা। তবে আমি কিছু করতে পারব না ভাই।

কালা। আগে জান্‌তাম না, সমাজ এত ভ্রান্ত, এত নিষ্ঠুর।

গদা। মানুষ নিয়ে যে সমাজ ভাই। মানুষের ধর্ম্মই ভ্রম, প্রকৃতিই নিষ্ঠুরতা।

কালা। এমন সমাজ ধ্বংস হউক।

বলিয়া কালাচাঁদ অনাহারে প্রস্থান করিলেন।

তার পর এক দিন তিনি পূজামানসে পাটলাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। পূজকেরা তাঁহাকে মন্দিরে উঠিতে দিল না। কালাচাঁদ ক্ষুব্ধহৃদয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবাব, কালাচাঁদের ক্ষত হৃদয়ের ব্যথা বুঝিলেন। তাঁহার সাধ্যমত ঔষধি লেপনের ব্যবস্থা করিলেন,—বিপুল জায়গীর, ধন, পদ, সম্মান অর্পণ করিলেন। কিন্তু ব্যথা মরিল না; উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

অবশেষে কালাচাঁদ পুণ্যময় শ্রীক্ষেত্রে যাইবার মানস করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

তেজ

আত্মাভিমান

কালাচাঁদ ও ব্রজবালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই কি সে উড়িষ্যা-ক্ষেত্র? এই কি 'সে সর্ব্ব-পাপহরণ' * পবিত্র ভূমি—যা'র নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, শৈলে শৈলে অগণ্য দেব-মন্দির?—যার নদীতে নদীতে ভক্তির কল্লোল, তৃণে তৃণে পবিত্র স্মৃতি, বায়ুতে আকাশে চির-মন্দ্রিত স্তোত্র ধ্বনি, এই কি সেই পুণ্যময় দেবলোক? †

এই কি সে আগ্রাহাট ‡—যেখানে পুণ্যশ্লোক পাণ্ডুবংশধর জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন? এই কি সে যযাতিকিশোরীর যজ্ঞপুর? § এই কি সে উত্তালতরঙ্গময়ী পাপহরা বৈতরণী? এই কি সে ললাট ইন্দ্রের নগরীশ্রেষ্ঠ মহাতীর্থ ভুবনেশ্বর? এই কি সে পঞ্চক্রোশী দেব-ক্ষেত্র, যাহার ললাটে উদয়গিরি, দেবলগিরি, নীলগিরি, খণ্ডগিরি?—যার হৃদয়ে পঞ্চসহস্র দেবমন্দির।

এই কি জগন্নাথ, তোমার লীলাভূমি? এই কি সে সমুদ্রকূল, যেখানে বসুশবর তোমার দারু ব্রহ্ম-মূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছিল? এই কি সে স্বপ্নময় রাজ্য, যেখানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সুখময় স্বপ্নে তোমার প্রেমময় সনাতন মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন?

এই পুণ্যময় দেশে, এই পবিত্র ক্ষেত্রেও কি আমার অপরাধ বিধৌত হইবে না? আমি যে জগন্নাথ, শান্তির আশায় তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমায় যে কেউ ঠাঁই দিলে না, প্রভু! তাই যে নাথ, তোমার কাছে এসেছি। যার কোনও আশ্রয় নেই, ভরসা নেই, তা'র তুমিই যে আশ্রয়, তুমিই যে গতি!

এক জন পথিক একাগ্রচিত্তে জগন্নাথদেবকে ডাকিতে ডাকিতে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে পদব্রজে চলিয়াছে। পথিক একাকী। তাহার সম্বলের মধ্যে একটা ঝোলা ও একগাছা যষ্টি; তাহার পরিধানে একখানি বস্ত্র, স্কন্ধে উত্তরীয়, নগ্নবক্ষে যজ্ঞোপবীত, চরণ পাদুকাবিহীন। পথিক আমাদের অপরিচিত নহেন তিনি সমাজচ্যুত নবাব-জামাতা কালাচাঁদ।

অদূরে শ্রীক্ষেত্রধাম দর্শন করিয়া কালাচাঁদ শ্রান্ত চরণকে বিশ্রাম দিবার অভিপ্রায়ে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। অস্পষ্টদৃষ্ট মন্দির-চূড়াপানে চাহিয়া কালাচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর, যবনী-বিবাহে কি এত অপরাধ? বিবাহ করেছি বটে, কিন্তু আমি ত যবন হই নি! অন্তর্যামী ভগবান্, তুমি ত জান, আমার হৃদয় তোমার চরণে লুণ্ঠিত। তবে কেন কোনও হিন্দু আমায় ঠাঁই দিলে না?—হিন্দু-সমাজ আমায় আশ্রয় দিলে না? আমি ত প্রাণ-রক্ষার্থে তা'কে বিবাহ করি নি—আমি যে আমার হৃদয় অর্পণ ক'রে তা'কে বিবাহ করেছি। ভগবান্, তবে আমার অপরাধ কি? তুমি যেমন আমাকে গড়েছ, তেমন কি যবনীকে গড় নি? সে কি

---

* কপিলা-সংহিতা।

† "This country belongs to the gods and from end to end is one region of pilgrimage-—Stirling's Orissa.

‡ কটকের চারিক্রোশ উত্তরে।

§ বর্ত্তমান যাজপুর।

তোমার সন্তান নয়? তবে তোমার রাজ্যে এ অবিচার কেন?"

কালাচাঁদের চক্ষু ক্রমে জলভারাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সুদূর মন্দির-চূড়া পানে চাহিয়া উদ্দেশে জগন্নাথদেবকে শত শত প্রণাম করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক জন পথিক আসিয়া কালাচাঁদের নিকটে দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি কালাচাঁদের নয়ন অশ্রুভারাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, কাঁদিতেছ কেন?"

কালাচাঁদ পথিকের পানে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু কোনও উত্তর করিলেন না। পথিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ক্ষুধার্ত্ত?"

কালাচাঁদ উত্তর না দিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। পথিক তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?"

কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্র পানে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিলেন।

"উদ্দেশ্য?—দেবদর্শন? না, রাজদর্শন?"

কালাচাঁদ পথিকের পানে ফিরিয়া তীক্ষ্ণনয়নে তাহাকে লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন, পথিকের বয়স তত বেশী নয়—ত্রিশ হইতে পারে। পথিক হিন্দু, তবে কোন্ দেশবাসী, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। পথিকের মাথায় জটা বা পরিধানে গৈরিক বস্ত্র না থাকিলেও তাঁহাকে সহসা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়। হস্তে একটি দণ্ড, এবং পরিধানে একখানি বস্ত্র ছাড়া আর কিছু তাঁহার সঙ্গে নাই। কালাচাঁদ যত তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন, জ্যোতিষ্মান্ পুরুষের প্রতি চাহিতে চাহিতে কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"সামান্য পথিক।"

"আপনি ত সামান্য নন।"

"আমার কি আছে বাবা?"

"আপনার শান্তি আছে।"

"তোমার কি তা' নেই?"

"না; শান্তি প্রার্থনায় ঠাকুরের কাছে যাচ্ছি।"

"তবে ফিরে যাও।"

"কেন?"

"ঠাকুরের হাত নেই, কাণ নেই।"

"চোখ ত আছে।"

"চোখ দিয়ে তোমার দুঃখ দেখেন—মোচন করেন না।"

"তা' কি হ'তে পারে? তিনি যে জগতের নাথ।"

"তিনি জগতের নাথ বটে, কিন্তু তিনি কর্ম্মময় নন।"

"তবে তিনি কি?"

"তিনি প্রেমময়। যে ব্যক্তি কামনা-পরিশূন্য হয়ে তাঁর কাছে আসতে পারে, তা'কে তিনি প্রেম-দান করেন।"

কালাচাঁদ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তবু আমি তাঁর কাছে যাব।"

"যেও না, ফের।"

"সে কি! আপনি হিন্দু হয়ে জগন্নাথদেব-দর্শনে নিষেধ করছেন?

"তুমি শ্রীক্ষেত্রে গেলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ হবে।"

কালাচাঁদ সাতিশয় বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার কথা অতি বিচিত্র! আমি এক জন সামান্য হিন্দু, জগন্নাথ-দর্শনে চলেছি, আমার আগমনে বিশাল হিন্দু-সমাজের—হিন্দুধর্ম্মের কি ক্ষতি হ'তে পারে?"

"অত কথা আমি জানি না; গুরুদেব যা' বলেছেন, তাই বলছি।"

"আপনার গুরুদেব কোথায়?"

"অনেক দূরে। তুমি আজ এখানে আসবে, ধ্যানে জেনে তিনি আমায় পাঠিয়েছেন।"

"তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় না?"

"একবার হয়েছিল, আর এক দিন হবে।"

কালাচাঁদ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনি বল্‌তে পারেন, আমি কখন শান্তি পাব কি না।"

"না—কখন পাবে না—চিরদিন অশান্ত হৃদয় নিয়ে জগৎময় ছুটে বেড়াবে।"

"তুমি যাও সন্ন্যাসী, তোমার কাজে যাও।"

কালাচাঁদ শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিবে না?"

"কিছুতেই না।"

"তবে যাও—নিয়তি অখণ্ডনীয়।"

কালাচাঁদ দ্রুতপদে শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে প্রধাবিত হইলেন। নগরমধ্যে যখন প্রবেশ করিলেন, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। আকাশ নির্ম্মল—মেঘশূন্য; পৃথিবী স্থিরা, বায়ুর গর্জ্জন-বিরহিতা। কালাচাঁদ নগরে প্রবেশ করিতে না করিতেই একটা বিরাট অন্ধকার কোন্ নিভৃত প্রদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত আকাশ-পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিল, সূর্য্যদেব রাহুকবলিত হইলে পৃথিবী যেমন একটা অস্পষ্ট অন্ধকারে আবৃত হয়, সেইরূপ একটা অন্ধকারে চতুর্দ্দিক অভিভূত হইল। আকাশ ধূম্রময়, পৃথিবী ধূম্রময়। কালাচাঁদ বিস্মিতনয়নে চারিদিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। পথে অনেক লোক চলিতেছিল। কালাচাঁদ

যেমন বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহারাও তেমনি বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতেছিল। অচিরে কালাচাঁদ শুনিলেন, চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কালাচাঁদ মন্দির-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কালাচাঁদ গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিলেন। অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হইয়া আসিল—ক্ষেত্রধাম যেন কালিমা-বেষ্টিত হইল। কালাচাঁদ স্তব্ধহৃদয়ে শুনিলেন, পশ্চাতে একটা কি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতেছে। তিনি কখন সমুদ্র দেখেন নাই, সমুদ্রের গর্জ্জনও শুনেন নাই। তিনি শুনিলেন, পশ্চাতে যেন লক্ষকণ্ঠে চীৎকার হইতেছে—যেন সেই উত্থিত চীৎকার তাঁহাকে মন্দির-প্রবেশে নিষেধ করিতেছে, সেই চীৎকারকে বহিয়া আনিতে দুরন্ত বায়ু পর্ব্বতগহ্বর হইতে ছুটিয়া আসিল, ধূলিকণায় গগন সমাচ্ছন্ন হইল—অন্ধকারের গায় কালিমা ব্যাপ্ত লইল—নীল মহাশূন্য, নীল বারিধি-হৃদয়ে অঙ্গ ঢালিল। সব একাকার হইল। কালাচাঁদ গরুড়স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, অসংখ্য মনুষ্য মন্দিরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; অসংখ্য নরনারী উচ্ছৃঙ্খলপদে সুদীর্ঘ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লইতে ছুটিয়াছে। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া কালাচাঁদ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে জলস্রোতে গা ভাসাইয়া সোপানাবলী অতিক্রম করত মন্দির-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইলেন।

তখন সহসা এক অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইল। মন্দিরের চূড়াসান্নদেশ হইতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়া ভীষণ শব্দ সহকারে প্রাঙ্গণে পড়িল। সে শব্দে সমস্ত পুরীধাম কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই বিপুল জনসঙ্ঘ স্তব্ধ, শঙ্কিতচিত্তে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সেই অগণ্য নরনারী-কণ্ঠ হইতে এক ভীষণ কোলাহল উঠিল। সে চীৎকার রাজার কাণে পৌছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজার নাম মুকুন্দদেব। লক্ষ্মণসেন যেমন বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা, মুকুন্দদেবও তেমনই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নৃপতি। তবে মুকুন্দদেব লক্ষ্মণ-সেনের ন্যায় বৃদ্ধ ও শক্তিহীন ছিলেন না। তাঁহার সাহস ও শক্তি ছিল।

উড়িষ্যা তখনও শক্তি হারায় নাই। উড়িষ্যার প্রত্যেক অধিবাসী দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। এক দিন উড়িষ্যা তাহার শক্তিপ্রভাবে বাঙ্গালার পাঠান-নৃপতিকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল—সম্রাট্‌কুলতিলক আকবরও তাহার শক্তিকে বরণ করিয়া তাহার সখ্য-কামনা করিয়াছিলেন। সেটা কিছু বেশী কথা নয়। যে জাতির রাজ্য উত্তরে ত্রিবেণী হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—যে জাতির পাইক তিন লক্ষ, অশ্বসাদী বিশ সহস্র, গজারোহী প্রায় ত্রি-সহস্র ছিল, সে জাতি বড় সামান্য ছিল না। সামান্য হইবার ত কথা নয়,—উড়িষ্যাবাসী যে আর্য্যবংশ-সম্ভূত। যে প্রবল জাতি এক দিন মধ্য-এসিয়া হইতে বন্যার ন্যায় আসিয়া ইউরোপ ও ভারতভূমি সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, উড়িষ্যাবাসীরা সেই জাতিরই বংশধর। আর্য্যেরা কেহ ইউরোপে গেলেন, কেহ ভারতে আসিলেন। যাঁহারা ভারতে আসিলেন, তাঁহারা উত্তরভারতে কিছুকাল অবস্থান করিলেন; পরে দক্ষিণভারতে যাইবার পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সমুন্নত বিন্ধ্যাচল মানদণ্ডস্বরূপ ভারতবর্ষকে বিভাগ করিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দণ্ডায়মান। দক্ষিণে প্রবেশ করিবার দুইটি পথ;—এক সুরাষ্ট্র, অপর বঙ্গদেশ। অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া সুরাষ্ট্রপথে দক্ষিণে গেলেন। যাঁহারা সে পথ অবলম্বন করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হইলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার পথ অবলম্বন করিয়া উড়িষ্যায় আসিলেন। উড়িষ্যায় যাঁহারা অবস্থান করিলেন, তাঁহারা উড্র প্রভৃতি আদিমবাসীদের দূরীভূত করিয়া নিজেরা রাজা হইলেন। বর্ত্তমান উড়িষ্যাবাসীরা তাঁহাদেরই বংশসম্ভূত। সুতরাং বীর্য্যে ও আভিজাত্যে তাঁহারা পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা হীন নহেন।

সেই মহাগৌরবান্বিত জাতির বর্ত্তমান অধিপতি, রাজা মুকুন্দদেব। তিনি সম্প্রতি গোলকন্দ-নরপতি ইব্রাহিম খাঁকে রাজমাহেন্দ্রীর মহাযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া জগন্নাথদেবের পূজামানসে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, তিনি বৎসরের অর্দ্ধাংশ রাজকার্য্যে ক্ষেপণ করিতেন, অপরার্দ্ধ নিদ্রায় যাপন করিতেন। * ঠিক কুম্ভকর্ণ না হইলেও তদ্বৎ একটা কিছু ছিলেন বলিয়া মনে হয়। আবার কেহ বলিয়াছেন, মুকুন্দদেবের চারিশত রাণী ছিল। † তিনি কি ছিলেন এবং তাঁহার কি

* Riyazu—S—Salatin.

† Iesuit Tieffenthaler.

ছিল, তাহা জানিবার এক্ষণে বিশেষ কোন উপায় নাই। তবে তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ দেখিলে—তাঁহার ত্রিবেণীর ঘাট ও মন্দির-নিচয়—তাঁহার বারোবাটী দুর্গ—তাঁহার সৈন্য ও প্রতাপ দেখিলে মনে হয়, তিনি শক্তিমান্ ও কীর্ত্তিমান্ রাজা ছিলেন। মানুষের সকল গুণ থাকে না,—মুকুন্দদেবেরও ছিল না। তিনি বিলাসী ও রমণী অভিলাষী ছিলেন।

প্রজার বিপদ-আপদে রাজা অবলম্বন। যখন মন্দির-চূড়ার পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন ভীত-জনসঙ্ঘ ত্রস্তপদে রাজদ্বারে ছুটিয়া আসিল। মন্দির হইতে প্রাসাদ বড় বেশী দূর নয়। রাজা সে সময় মধ্যাহ্ন আহারের পর শয্যায় শুইয়া বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন। প্রস্তরপতনের শব্দে তিনি চমকিত হইয়া দ্বারের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ ?"

প্রহরী জাতিতে পাহাড়ী। তাহার বাম বাহুতে কাষ্ঠের ঢাল, দক্ষিণ হস্তে সুদীর্ঘ তরবারি। রাজার প্রশ্ন শুনিয়া সে ঢাল আঁটিয়া ধরিল এবং তরবারি আস্ফালন করিতে লাগিল। একটা মার্জ্জারী তাহার নয়ন-পথবর্ত্তী হইবামাত্র প্রহরী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল; এমন সময় মন্দির-সান্নিধ্য হইতে একটা ভীষণ কোলাহল উঠিল। রাজা অবিলম্বে শয্যাত্যাগ করিলেন; এবং কক্ষ-বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত প্রাসাদ একটা কালিমায় সমাচ্ছন্ন। নিশাচর পক্ষীরা চীৎকার করিতে করিতে রাজার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। রাজার বীরহৃদয়ে একটা অব্যক্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইল। তিনি করযোড়ে জগন্নাথদেবকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

আসিয়া দেখিলেন, মন্ত্রী দনার্দ্দন বিদ্যাধর তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাজা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, দনার্দ্দন ?"

দনার্দ্দন। প্রজারা মহারাজের নিকট এসেছে।

রাজা। কেন ? কি হয়েছে ? শব্দ কিসের ?

দনা। মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে।

রাজা। মন্দিরের ? কোন্ মন্দিরের ?

দনা। জগন্নাথদেবের।

রাজা। সে কি ? আজ সাড়ে তিন শত বৎসরের উপর * যে মন্দির দাঁড়িয়ে আছে, তার চূড়া আমার রাজত্বকালে সহসা প'ড়ে গেল ? কি সর্ব্বনাশ !

দনা। মহারাজ, একটা অন্ধকার লক্ষ্য করেছেন কি ?

রাজা। হাঁ, হাঁ; চারিদিকে কেমন একটা কালিমা—কেমন একটা ধূম্রবরণ অস্পষ্ট অন্ধকার। কোথাও ত মেঘ নাই—সূর্য্যগ্রহণের সম্ভাবনা নাই, অথচ এত অন্ধকার! দেখ দেখ মন্ত্রি, সূর্য্য যেন নিবে যাচ্ছে, আকাশ যেন পৃথিবীর উপর ঝুঁকে পড়ছে, সমুদ্র যেন গর্জ্জে উঠে ক্ষেত্রধাম গ্রাস করতে আসছে। ওই শোন মন্ত্রি, চারিদিকে ক্রন্দনের রোল, মাথার উপর পেচকের চীৎকার, দূরে শৃগালের কলরব। জানি না, জগন্নাথদেব, উড়িষ্যার অদৃষ্টে কি লিখেছ।

দনা। মহারাজ, বেসর মহান্তিকে ডাকব কি ?

বেসর মহান্তিকে ডাকিতে হইল না, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজ-দর্শনে আসিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানা মোটা পশম কাপড়, কাঁধের উপর একটা মোটা গামছা, নগ্নদেহের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত। তা' ছাড়া অঙ্গে আর কোথাও কিছু নাই। নামাবলী সকল সময়ে তাঁহার অঙ্গে থাকে, কিন্তু এখন ছিল না। এই পুণ্যময়, প্রেমময়, জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষকে দেখিয়া রাজা প্রণত হইলেন। মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ করিলেন, "রাজ্যের মঙ্গল হউক।"

রাজা। মঙ্গল কোথায় মহান্তি, দেখ্ছ ত ?

মহান্তি। দেখ্ছি মহারাজ। আর তুমি যা দেখ নি, শুন নি, তাও দেখছি।

রাজা। আবার কি হয়েছে ?

মহান্তি। আমি মহাপ্রভুকে কাঁপতে দেখিছি—তাঁর অঙ্গ হ'তে বস্ত্র খ'সে পড়তে দেখিছি।

রাজা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। মহান্তি বলিলেন, "মহারাজ, এই বস্ত্র ষাট বৎসর পূর্ব্বে রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদেবের জন্য প্রস্তুত করিয়েছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ঠাকুরের অঙ্গে পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাপ্রভু নগ্ন ?"

মহান্তি। না, নামাবলী তাঁকে পরিয়ে দিয়েছি।

রাজা ক্ষণকাল নীরবতার পর ভূপৃষ্ঠে নয়ন স্থাপন করিয়া প্রায়াবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কেউ বল্তে পার, কেন এমনটা হ'ল ?"

মহান্তি। তা'ও পারি মহারাজ, আমি ধ্যানে কিছু কিছু জেনেছি।

রাজা। জেনেছ ? বল বল, কি জেনেছ ?

মহান্তি। আমি মনশ্চক্ষে দেখছি, বাঙ্গালা থেকে

* বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এক ব্যক্তি পদ হেঁটে শ্রীক্ষেত্রে আসছে। সে ক্ষেত্রভূমে পদার্পণ করতে না করতে সমস্ত ধাম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'ল। লোকটা মন্দির প্রাঙ্গণে যেমন প্রবেশ করেছে, আর মন্দিরগাত্র হ'তে পাথর খ'সে পড়ল। তার পর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ—

রাজা? আর বল্‌তে হবে না মহান্তি, আমি এখনই তা'র মাথা নিচ্ছি। মন্ত্রি, তুমি যাও—তা'কে ধ'রে নিয়ে এস।

মন্ত্রী। আমি কি ক'রে তা'কে চিন্‌ব মহারাজ?

রাজা, মহান্তির মুখ-পানে চাহিলেন। মহান্তি বলিলেন, "কি ক'রে চিন্‌বে? আচ্ছা, বলছি।" বলিয়া তিনি একটু অন্যমনস্ক হইলেন। তাঁহার প্রশান্ত নয়ন যেন একটু সঙ্কুচিত হইল। দৃষ্টি যেন কোনও অদৃশ্য বস্তুতে নিবদ্ধ হইল। ক্ষণপরেই দৃষ্টি ফিরিয়া পার্থিব বস্তুতে সন্নিকটে নিহিত হইল। মন্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তাঁহাকে এখনও শ্রীমন্দিরে পাবে।"

মন্ত্রী। লোকটা দেখ্‌তে কেমন?

মহান্তি। পরম রূপবান্।

মন্ত্রী। লোকটা বাঙ্গালী?

মহান্তী। হাঁ।

মন্ত্রী। কোন্ বর্ণ?

মহান্তি। বক্ষের উপর যজ্ঞোপবীত দেখেছি।

মন্ত্রী প্রস্থান করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহান্তি, লোকটা কি দুর্জ্জন?"

মহান্তি। না মহারাজ, তার মত ধার্ম্মিক এই পুণ্যময় দেশেও কম আছে।

রাজা। তোমার কথায় আমার অশঙ্কা জন্মাল।

মহান্তি। কি করব মহারাজ, মহাপ্রভু যদি আমার দৃষ্টিভ্রম ঘটিয়ে থাকেন? কিন্তু আমার মনে হয়, এই ব্যক্তি দেবদ্বিজের মহাশত্রু

রাজা। যাই হো'ক, চল আমরা বিচার-গৃহে যাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিচারালয়ে সিংহাসনোপরি বসিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

"কালাচাঁদ রায়।"

"কোন্ দেশবাসী?"

"বঙ্গদেশ।"

"কোন্ বর্ণ?"

"শ্রেষ্ঠ বর্ণ।"

"এখানে কি জন্যে এসেছ?"

"দেবদর্শনে।"

"আর কোন অভিপ্রায় নাই?"

কালাচাদ উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন। তদ্দৃষ্টে রাজা বলিলেন, "বন্দি, তুমি উত্তর দিতে—"

কালাচাঁদ বাধা দিয়া একটু তেজের সহিত বলিলেন, "বন্দী! আমায় বন্দী করে কে?"

রাজা। আমি কবি—আমি উড়িষ্যাধিপতি; আমার ইচ্ছা ব্যতীত তুমি এ স্থান ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বে না।

কালাচাঁদ শ্লেষের সহিত উত্তর করিলেন, "তুমি প্রকৃত রাজা বটে, নইলে যে দেব-দর্শনে এসেছে, তাকে বন্দী করবে কেন? শুনেছিলাম, এটা হিন্দু-রাজ্য, এখানকার নরপতি হিন্দু। তা' বেশ পরিচয় দিলে।"

বলিয়া কালাচাঁদ একবার কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, অনেক নরনারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যখন সেই বিস্তীর্ণ কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তখন জনতার গতি রুদ্ধ হইল। রাজা বলিলেন, "বন্দি, তোমার শ্লেষের কথা, তোমার তেজের কথা শুন্‌তে আমরা এখানে সমবেত হই নি—তোমার বিচার কর্‌তে আমরা এখানে এসেছি।"

কালা। কে বিচার করবে কর; পথমধ্যে দুইবার দস্যুহস্তে পড়েছিলাম, সেখানেও এইরূপ পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এবার তোমাদের হাতে—বেশ, বিচার কর।

রাজা। কোন্ অভিপ্রায়ে এখানে এসেছ?

কালা। তা' বল্‌তে বাধ্য নই।

রাজা। না বল, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে।

কালা। বৃথা ভয় দেখাচ্ছ রাজা, কালাচাঁদ রায় সংসারে কাউকে ভয় করে না।

রাজা। যে নির্ভীক, সে সত্যাশ্রয়ী।

কালা। মিথ্যা আজিও জীবনে বলি নি। কি জান্‌তে চাও, বল।

রাজা। তুমি কি সত্যই হিন্দু? সদাচারী?

কালা। হাঁ।

কক্ষের একপ্রান্ত হইতে কে বলিল, "মিথ্যা কথা।"

সকলে বক্তার পানে চাহিয়া দেখিল। ঘরের ভিতর আলো তত উজ্জ্বল নয়; তবু মুখাবয়ব বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সকলে দেখিল, ঘরের একপ্রান্তে—বাতায়নের সন্নিকটে দুইটি বাঙ্গালী

মেযে দাড়াইয়া রহিয়াছে। দুই জনের মধ্যে এক জন একটু অগ্রবর্ত্তিনী। যে অগ্রবর্ত্তিনী, সেই বক্তা। তাহার রূপ-যৌবন উছলিয়া উঠিতেছে। রাজা দেখিলেন, তাহার অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃত সুন্দর মুখখানি যেন সাদা মেঘঢাকা চাঁদের ন্যায় শোভা পাইতেছে। রাজা যতই রমণীকে দেখিতে লাগিলেন, ততই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। রমণীর বদন হইতে নয়ন আর ফিরে না ;—রাজা আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিলেন।

কালাচাঁদও প্রগল্ভা রমণীর পানে ঝটিত ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিবামাত্রই চিনিলেন, এ সেই কুলত্যাগিনী পাপিষ্ঠা ব্রজবালা। কালাচাঁদের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল ; ক্ষণকালের জন্য তিনি অতি তীব্রদৃষ্টিতে ব্রজবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না,—গর্ব্বিতা বাগ্মিনীর অন্তস্তল দগ্ধ হইয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া পিছাইয়া গেল। তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল, কালাচাঁদের নয়ন-নিঃসৃত জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা তাহাকে দগ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ব্রজবালা সঙ্কুচিতা হইয়া সঙ্গিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল।

রাজার তখন চমক ভাঙ্গিল। তিনি ব্রজবালাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতেছিলে ?"

উত্তর নাই, নির্লজ্জ মুখরা নিরুত্তর। পুনরপি প্রশ্ন হইল, "তুমি বলছিলে বন্দী মিথ্যা বলছে, তা'র সম্বন্ধে তুমি কি জান ?"

ব্রজবালা, সঙ্গিনীকে চুপি চুপি বলিল, "তুই বল্।" সহচরী তখন এক পা অগ্রসর হইল, গলা একটু পরিষ্কার করিয়া লইল, তা'র পর রাজার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মহারাজ, আপনার বন্দী মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, আচারভ্রষ্ট—"

কথা কয়টা রাজার কাণে পৌছিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বল্‌ছ, আমি শুন্‌তে পাচ্ছি না ; একটু বড় গলায় বল।"

সঙ্গিনী তখন আরও দুই পা অগ্রসর হইল, গলাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া লইল ; কিন্তু গলা বড় বেশী উঠিল না। সে বলিতে লাগিল, "মহারাজ, এই ব্যক্তি—এই কালাচাঁদ রায় ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম-গ্রহণ ক'রে আপনার শত্রু, দেশের শত্রু, মুসলমান-নবাবের দাসত্ব করছেন। নফরির খাতিরে এই হিন্দুকুলধুরন্ধর ধর্ম্মত্যাগ করতেও পশ্চাৎপদ হ'ন নি। পৃথিবীতে এমন কোন পাপকার্য্য নেই, যা' এই ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হ'তে পারে না। গৃহে ধর্ম্মশীলা জননী, পতিব্রতা ভার্য্যা, অক্ষুণ্ণ বংশমর্য্যাদা, সে সব পরিত্যাগ করেছে ; মুসলমানী বিবাহ ক'রে মুসলমান হয়েছে তাই তাহার চরণস্পর্শে পবিত্র ক্ষেত্রভূমি কালিমায় আচ্ছন্ন হয়েছে, জগন্নাথদেবের মন্দির চূড়া খ'সে পড়েছে প্রজারঞ্জক মহারাজ, ছদ্মবেশী ধর্ম্মত্যাগী কায়েরকে শাস্তি দেও—সনাতন-ধর্ম্ম রক্ষা কর।"

কালাচাঁদের পরিচয় পাইয়া সভাসদ স্তম্ভিত হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দি, এ সকল কথা সত্য ?"

কালাচাঁদ কোনও উত্তর করিলেন না। বক্ষের উপর বাহুদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া একবার শুধু রাজার পানে গর্ব্বস্ফীত নয়নে চাহিলেন। এত গর্ব্ব রাজা কখনও মানুষের নয়নে দেখেন নাই। এক জন সভাসদ বলিয়া উঠিল, "মহারাজ! এ মানুষ নয়—রাক্ষস ; অচিরে নিপাত করুন।"

রাজা, মন্ত্রীর পানে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রি, কর্ত্তব্য কি ?"

"প্রাণদণ্ড। অবধ্য মহারাজ।"

"এ কি ব্রাহ্মণ ?"

"এখনও ত গলায় উপবীত দেখ্‌ছি।"

"তবে কি কারারুদ্ধ করতে বল ?"

"না মহারাজ, এ রাজ্যে এ দুর্জ্জনকে স্থান দেওয়া হ'তে পারে না।"

মুকুন্দদেব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলের পানে বারেক চাহিয়া দেখিলেন ; কেহ কোনও পরামর্শ দিল না বা পরামর্শ দিতে সাহস করিল না। সহসা তাঁহার নয়ন বেসর মহান্তির প্রতি পড়িল। মহান্তি তখন মুদ্রিত-নয়নে একপার্শে উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা ডাকিলেন, "মহান্ত।"

মহান্তি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ?"

"নির্ব্বাসন।"

"এ ত অতি সামান্য দণ্ড, মহান্তি মহারাজ।"

রাজার বাক্য অবসান হইতে না হইতে কালাচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, 'তুমিই বেসর মহান্তি? তুমি সেই পুণ্যময় দেবতা, ভক্তিমান্ মহাপুরুষ? তবে ত তোমায় আমার মনের কথা জানাতে হবে না। তুমি ত সকলি জান্‌ছ বুঝ্‌ছ—ব'লে দেও ঠাকুর, কিসে আমার বাসনা পূর্ণ হবে ?"

মহান্তি। উপায় ত দেখছি না, যুবক।

কালাচাঁদ। উপায় নেই ? আমি বিনা কারণে, বিনা অপরাধে হিন্দু-সমাজ হ'তে বিতাড়িত হব ?

মহা। কারণ-অকারণের বিচারকর্ত্তা ত আমি নই, যুবক!

কালা। ব্রাহ্মণ, আমার স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ ?

মহা। মহাপ্রভুর প্রসাদ হ'লে পারি ? তাহা ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হ'লেও দুষিত হয় না।

কালা। আমি কি ম্লেচ্ছ ?

মহা। তা' জানি না ; তবে যে ব্যক্তি সমাজে স্থান হারিয়ে আশ্রয়ভিক্ষায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে আমি হিন্দু বলতে পারি না।

কালা। তুমিও এই কথা বললে মহাস্তি ? আমি যে তোমার স্থান অনেক উচ্চে দিয়াছিলাম।

মহা। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র ; আমার বুদ্ধি-বিবেচনা অতি সামান্য।

কালা। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনায় কি অনুমিত হয়, আমি সমাজে স্থান পাবার অনুপযুক্ত ?

মহা। হাঁ ?

কালা। হিন্দু ব'লে পরিচয় দিবারও অযোগ্য ?

মহা। হাঁ।

কালা। বেশ, আজ হ'তে তবে আর আমি হিন্দু নই,—আমি ম্লেচ্ছ—কাফের—আমি মুসলমান। যে যজ্ঞোপবীত আমি ধর্ম্ম, অগ্নি, নারায়ণের সমক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা আজ ত্যাগ করিলাম।

বলিয়া তিনি কণ্ঠ হইতে উপবীত উন্মোচন করত মহাস্তির চরণ-সমীপে নিক্ষেপ করিলেন। তখন তাঁহার নয়নের এক প্রান্তে জল, অপর প্রান্তে অনল ; জল সত্বর শুষ্ক হইল। তিনি উচ্চ, বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু স্মরণ রাখিও মহাস্তি, এ পাপ তোমার। তুমি আজ এক জন ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে—তার ইহকাল পরকাল কাড়িয়া লইলে। এক দিন এর জন্যে তোমাকে কাঁদিতে হইবে।"

পরে রাজার পানে ফিরিয়া বলিলেন, "আর যে নৃপতি এত বড় নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, ধর্ম্মদ্রোহী, তা'র রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে।"

বলিয়া কালচাঁদ কক্ষত্যাগ করিলেন। মন্ত্রী দনার্দ্দনের আদেশে চারি জন পাইক কালাচাঁদকে রাজ্য-বাহিরে নির্ব্বাসিত করিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কালাচাঁদ প্রস্থান করিলে পর ক্ষণকাল সভামধ্যে কেহ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না। দনার্দ্দন অবশেষে বলিল, "রাজ-জামাতা ভাবিয়াছেন, তাঁহার নূতন কুটুম্বের ভয়ে আমরা অস্থির হইয়া পড়িব।"

রাজা। এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়ে ভাল হয় নি।

দনা। কেন মহারাজ ?

রাজা। এ ব্যক্তি পাঠান-সৈন্য দেশে এনে অত্যাচার করতে পারে।

ভৃগুরাম-নামধেয় এক জন সভাসদ্ বলিল, "মশক-দংশনের আশঙ্কায় এত কাতর কেন মহারাজ ?"

মহাস্তি বলিলেন, "মশক-দংশন নয় ভৃগুরাম ! আমি দৃষ্টিহীন, দেখিতে পাইতেছি না ; কিন্তু আমার মনে হয়, এই ব্যক্তির অভিসম্পাত সত্যে পরিণত হইবে।"

কথা কয়টা রাজার কাণে গেল না ; তিনি তখন ব্রজবালাকে নির্নিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ব্রজবালার মুখের উপর তখন অবগুণ্ঠন নাই। সে তা'র সঙ্গিনীকে লইয়া ধীরে ধীরে বিচারালয় ত্যাগ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"ওহে অশ্বারোহী, ওহে ঘোড়সওয়ার, দাঁড়াও।"

অশ্বারোহী শুনিল না, অথবা শুনিতে পাইল না ; বিপরীত দিক্ হইতে অশ্ব ছুটাইয়া বেগে আসিতে লাগিল। বক্তা তখন পথমধ্যে দুই হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। অশ্বারোহী তথাপি অশ্ববেগ সংযত করিবার কোনরূপ প্রয়াস পাইল না। বক্তা পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ঘোড়সওয়ার, দাঁড়াও।"

এবার অশ্ববেগ শিথিল হইয়া আসিল। নিকটস্থ হইয়া অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি পথিক, আমার পথ রোধ করিতেছ ?"

পথিক উত্তর করিল, "পথরোধ করি নি, ক্ষণকাল দাঁড়াতে বলছি।"

অশ্বারোহী দাড়াইল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র, পৃথিবীতে ফুটন্ত জ্যোৎস্না। মন্দিরের মাথায়, গাছের মাথায়, তৃণের মাথায়, সকলের মাথায় জ্যোৎস্না—পৃথিবী কৌমুদী-বসনা। জ্যোৎস্নালোকে পথিক দেখিল, অশ্বারোহীর অঙ্গে যাবনিক পরিচ্ছদ। মূল্যবান্ পরিচ্ছদ বলিয়াই অনুমিত হইল। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, এখান হ'তে পুরী কতটা পথ ?"

পথিক। দেখছি, আপনি মুসলমান, হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজন কি ?

অশ্বারোহী। হিন্দু রাজার সহিত সাক্ষাৎ করব।

প। রাজদর্শন! সাবধান, হিন্দুকে বিশ্বাস করবেন না।

অ। বিচিত্র কথা হিন্দুর মুখে শুনলাম।

প। আমি হিন্দু নই—আমি মুসলমান।

অ। মুসলমান?

প। হাঁ; আমার উপবীত দেখতে পাচ্ছেন কি?

অ। সকল হিন্দু ত উপবীত ধারণ করে না।

প। সকলে না করুক, আমি করেছিলাম: এক দিন ব্রাহ্মণ ব'লেও পরিচয় দিয়েছিলাম। এখন আর আমি হিন্দু নই—আমি মুসলমান।

অ। সে সব কথা যাক্; এখন বলতে পার, পুরী কত দূর?

প। পদব্রজে আট দশ দণ্ড লাগতে পারে

অ। আর অশ্বারোহণে?

প। অশ্ব আপনি পাচ্ছেন না।

অ। কেন বল দেখি?

প। অশ্বে আমার প্রয়োজন আছে।

অ। তা থাকতে পারে, কিন্তু প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হও।

প। অকারণ সময় নষ্ট হচ্ছে, আমায় সত্বর তথায় পৌঁছিতে হবে।

অ। আমিও সেই দিক্ হ'তে আসছি। পথে তোমার মত দুই চারি জন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলাম। কিন্তু হাতে তরবারি থাকতে—

প। আমি দস্যু? তা দস্যুই বটে। এক্ষণে ধ্বংসই আমার কাজ। সাবধান যবন, অশ্ব ত্যাগ কর, নতুবা তোমার নিস্তার নেই।

অ। নিরস্ত্র পথিক, বৃথা দম্ভ—

প। আমি নিরস্ত্র নহি—অস্ত্র সংগ্রহ করেছি। কেমন ক'রে শুনবে? রাজার চারি জন পাইক রাজ্য-বাহিরে আমায় রাখতে এসেছিল। আমি তাদের নিকট একখানা অস্ত্র চাইলাম—কেহ দিল না; তখন এক জনের নিকট হ'তে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে অপর কয়েকজনকে সংহার করলাম। এই দেখ, সে রক্ত-মাখা তরবারি।

বলিয়া, পথিক বস্ত্রমধ্য হইতে তরবারি বাহির করিয়া দেখাইল। তদ্দৃষ্টে অশ্বারোহী স্বীয় কৃপাণ কোষমুক্ত করিয়া বলিল, "তবে সাধ্য থাকে, আত্মরক্ষা কর।"

পথিক মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "বাতুল! কালাচাদ রায়কে কৃপাণ দেখাইতেছ?"

সবিস্ময়ে অশ্বারোহী বলিয়া উঠিল, "আপনি কালাচাদ রায়?"

"লোকে সেই নামে জানে বটে।"

"নবাবের জামাতা?"

"সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।"

অশ্বারোহী তখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লম্ফত্যাগে ভূতলে পড়িলেন; এবং কালাচাদের সমীপস্থ হইয়া সসম্মানে বলিলেন, "ফৌজদার সাহেব, এক দিন আপনার বন্দী হ'য়ে আপনার গৃহে অবস্থান করে-ছিলাম। মনে পড়ে কি? আপনার নিকট যে আতিথ্য, শস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছি, তাহা বাঙ্গালায় কোথাও পাই নে। আপনি আমার জীবন, মান, ইজ্জত রক্ষা করেছেন; অবশেষে আমায় মুক্তি দিয়ে এসেছেন। ফৌজদার সাহেব, আপনি যা' করে ছেন, তা' আমি কখন বিস্মৃত হব না।"

কালাচাদ যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "অস্পষ্ট আলোকে আপনাকে আমি চিনতে পারি নি—ক্ষমা করবেন।"

"ফৌজদার সাহেব, আপনার নিকট আর আমি পরিচয় গোপন করব না,—আমি অতি হতভাগা—আমি সুলতান ইব্রাহিমের পুত্র।"

"আপনি সেই রাজ্যভ্রষ্ট নরপতির পুত্র করিম শা? সুলতান, আমার সেলাম গ্রহণ করুন।"

"ফৌজদার সাহেব, দোস্ত, তোমার নিকট আমি সুলতান বা বাদশাহ্ নই—আমি করিম শা মাত্র। যত দিন করিম জীবিত থাকবে, তত দিন সে তোমার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ থাকবে। তোমাকে দেবার আমার কিছুই নেই—রাজ্যধন সব গিয়েছে। যা' আছে, তা' দিতে চাই; আমার স্নেহ-প্রীতি নেবে কি ভাই?"

"আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট।"

"তবে ভাই আমার প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ এই অশ্বটি গ্রহণ কর।"

কালাচাদ এক পদ পিছাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি হয়, আপনি কিরূপে যাবেন?"

করিম শা। পদব্রজে।

কালাচাদ। কোথায় যাবেন?

করি। রাজ-সন্নিধানে।

কালা। কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

করি। আমার তরবারি তাকে দিতে।

কালা। বাঙ্গালায় আসুন না কেন?

করি। আবার বাঙ্গালায়?

কালা। পূর্ব্বে আপনার পরিচয় আমরা জানতুম না।

করি। এখন পরিচয় পেলে আপনার নবাব আমায় কোতল করবেন

কালা। আমি থাক্‌তে আপনার কোনও ভয় নেই।

করি। নিশ্চিন্ততাও নেই; সলিমন যে আমার পিতৃবৈরী।

কালাচাঁদ ভাবিয়া দেখিলেন, কথাটা ঠিক। সুতরাং নিরুত্তর রহিলেন। করিম খাঁ বলিলেন, "তবে এখন চলিলাম, ফৌজদার সাহেব। জীবনে হয় ত আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না।"

বলিয়া তিনি পদব্রজে পুর্ব্বার দিকে অগ্রসর হইলেন। কালাচাঁদও আর কালক্ষেপ না করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন।

— —

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমুদ্র-সৈকতে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর। অনন্তের ভালে বিন্দুমাত্র। সেই কুটীর-সম্মুখে ব্রজবালা বালুকার উপর উপবিষ্টা। তখন অপরাহ্ন। পার্শ্বে সঙ্গিনী নিম্মলা। নিম্মলার একটু পরিচয় প্রয়োজন। নিম্মলা গৃহস্থকন্যা—মাতৃহীনা—বালবিধবা। বৃদ্ধ পিতা পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিলেন; কিন্তু বালিকা কন্যার আর বিবাহ হইল না। পিতৃগৃহে সে দাসী হইয়া রহিল। বয়সের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল। তখন তৃপ্তির আশায় চারিদিকে চাহিতে লাগিল। এমন সময় ব্রজবালাকে সে অতিথিরূপে তাহাদের শান্তিশূন্য গৃহে পাইল ব্রজবালা তখন বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার পথ ধরিয়াছে। নিম্মলার গৃহ ত্যাগ করিয়া ব্রজবালা আবার যখন পথ চলিতে লাগিল, তখন নিম্মলাও তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল। নিম্মলা দুশ্চারিণী না হইলেও ব্রজবালার ন্যায় কুলত্যাগিনী।

নিম্মলা বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা, সুশ্রী ও যুবতী তবে ব্রজবালার রূপের কাছে—ভানুপার্শ্বে খদ্যোত প্রায়। বুদ্ধি বা শিক্ষাতেও ব্রজবালার সহিত কোন অংশে উপমিত হইতে পারে না।

সমুদ্র-সৈকতে পাশাপাশি বসিয়া নিম্মলা ব্রজবালাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এইবার ত তোমার উড়িষ্যার কাজ ফুরাল?'

"আরম্ভ হ'ল বল"

"সে কি?"

"মুসলমান কালাচাদ এবার প্রতিশোধ নিতে উড়িষ্যায় আস্‌বে।"

"কি রকমে?"

"সৈন্য-সামন্ত নিয়ে।"

নির্ম্মলা ভীত হইয়া পড়িল। সে একটু ভীরু-স্বভাবাপন্না। রক্ত দেখিলেই তার সাহস তিরোহিত হয়। তবে মাছ কুটিবার সময় অজস্র রক্তপাত দৃষ্টেও তা'র চিত্তবিকার ঘটিত না। মশকের রক্ত দৃষ্টেও সে ভীত হইত না। কিন্তু মানুষের রক্তদর্শন সে কখনও করে নাই; তবে রক্তারক্তি, যুদ্ধবিগ্রহের গল্প অনেক শুনিয়াছে। সে ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া বলিল, "আগুন ত জ্বেলেছ, এখন স'রে পড়া ভাল।"

"আর আগুন যদি নিবে যায়?"

নিম্মলা কথাটা ঠিক বুঝিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "নিব্‌বে কিরূপে?"

ব্রজবালা। উভয় দলে সন্ধি হ'তে পারে।

নিম্মলা। তা' তুমি থেকে কি কর্‌বে?

ব্র। আমি সন্ধি হ'তে দেব না।

নি। তুমি? সন্ধি রোধ কর্‌বে?

ব্র। হাঁ, আমিই কর্‌ব।

নিম্মলা একটু হাসিল। ব্রজবালা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "নিম্মলা, তুমি আমায় অল্পদিন দেখেছ, আমার শক্তির পরিচয় পাওনি। ক্ষেত্র অভাবে আমার শক্তি সুপ্ত রয়েছে।"

নি। তোমার শক্তির বেশ পরিচয় পেয়েছি; তুমি না সে দিন বিচারগৃহে ঘোমটা টেনে আমার পিছনে লুকিয়েছিলে?

ব্র। কি জানি কেন সে দিন আমার মানসিক দুর্ব্বলতা এসেছিল—

নি। দুর্ব্বলতাই স্ত্রী-সুলভ—তোমার প্রকৃতিগত।

ব্র। না, তা নয়। এর পর দিন দেখবে, উড়িষ্যার রাজা, রাজ্য আমার পদতলে লুণ্ঠিত হচ্ছে।

নি। তোমার বাসনা কি উড়িষ্যা-ঈশ্বরী? ভেবেছ কি উড়িষ্যায় রূপের অভাব?

ব্র। নিম্মলা, তুমি মূর্খ।

নি। নিশ্চয়।

ব্র। পৃথিবীতে একটা বই দু'টা ব্রজবালা নেই। যার বুদ্ধির শক্তি আছে, রূপের যৌবন আছে, সে কোনও কালে সম্বলশূন্যা নয়, নিম্মলা সুন্দরি!

নি। তুমি কত দিন গৃহত্যাগ করেছ ব্রজবালা?

ব্র। তিন চার বৎসর হবে।

নি। এর মধ্যে অনেক শিখেছ।

ব্র। গৃহেই শিক্ষা হয়; কোমল হৃদয়ে যে অঙ্কপাত হয়, তাহা সহজে মুছে না। আমার জীবন-কাহিনী শুন্‌বে?

ব্রজবালার চিন্তাস্রোত ফিরিল। একটা তরঙ্গ

ফেনমালা মাথায় বাঁধিয়া নাচিতে নাচিতে ব্রজবালার চরণ চুম্বন করিতে আসিতেছিল। সহসা অপর একটা বিপুলকায় তরঙ্গ তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে দলিয়া মারিল। ব্রজবালা দেখিল, প্রথম তরঙ্গের চিহ্নমাত্র নাই। বলিল, "নির্ম্মলা, তুমি কুরূপা নও, আমার চেয়ে বয়সে ছোট নও—তুমি আমার মনের ভাব কতকটা বুঝতে পারবে। বাল্যকালে আমার জ্ঞান হ'তে না হ'তেই আমি শুনতে লাগলাম, আমি পরম রূপসী। যে দেখত, সেই বলত, 'কি সুন্দর মেয়ে।' কেউ বলত, 'ডানাকাটা পরী।' আমার বয়স যত বাড়তে লাগল, ততই আমি চারিদিক্ হ'তে আমার রূপের পূজা পেতে লাগলাম। আমি যা' চাহিতাম, তাই পেতাম; আমার ইচ্ছার গতি কেহ রোধ করত না—"

এমন সময় একটা তরঙ্গ আছাড় খাইয়া ব্রজবালার চরণসমীপে পড়িল। বারিকণা ব্রজবালা ও নির্ম্মলার দেহ সিক্ত করিল। ব্রজবালা গ্রাহ্য করিল না; নির্ম্মলা সমুদ্রকে গালি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সমুদ্র শুনিল কি না জানি না, কিন্তু সে আবার একটা তরঙ্গ পাঠাইয়া ব্রজবালার চরণ সিক্ত করিল। এবার ব্রজবালা উঠিল। নির্ম্মলা বলিল, "দেখলে? যে উচ্ছৃঙ্খল, তার উপর আধিপত্য-স্থাপনের চেষ্টা বৃথা।"

ব্রজবালা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "কেন, বল না কেন, রূপের পদচুম্বন করিতে অনন্ত বারিধিও ছুটে আসছে।"

আবার একটা তরঙ্গ ঘোর গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিয়া ব্রজবালার চরণতলে আছাড় খাইয়া পড়িল। ফেনময় তরঙ্গ সরিয়া গেল; কিন্তু বালুকার উপর একটা ক্ষুদ্র মৎস্য রাখিয়া গেল। ব্রজবালা ছুটিয়া গিয়া মাছটাকে ধরিল। নির্ম্মলা বলিল, "ছেড়ে দেও।"

ব্রজ। সমুদ্রের দান ফিরাতে পারি না।

নির্ম্ম। মাছ খাবে না কি?

ব্রজ। না; রূপের আশায় বীজ পুতব।

বলিয়া ব্রজবালা সেই জীবন্ত মৎস্যকে বালুকার মধ্যে প্রোথিত করিল। নির্ম্মলা শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় এক জন রাজকর্ম্মচারী সমীপস্থ হইয়া ব্রজবালাকে নমস্কার করিল। ব্রজবালা বা নির্ম্মলা পূর্ব্বে তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে সহসা তাহাকে পার্শ্বে দেখিয়া উভয়ে একটু অপ্রতিভ হইল এবং মাথার কাপড় লইয়া নাড়াচাড়া করিল। কর্ম্মচারী বলিল, "মা-ঠাকরুণ, মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন।"

ব্রজবালা সহসা কোন উত্তর করিল না। সমুদ্র-পানে চাহিয়া কি ভাবিল; অধরপ্রান্তে একটু হাসিও ভাসিয়া গেল। তা'র পর কর্ম্মচারীর দিকে না ফিরিয়া উত্তর করিল, "মহারাজকে আমার সম্মান জানিয়ে বলবেন, আমি কুলকামিনী,—তাঁহার সহিত সাক্ষাতে অসমর্থ।"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল। ব্রজবালা ও নির্ম্মলা আবার সৈকতভূমে উপবেশন করিল। নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো উড়িষ্যার রাণি, আমার সঙ্গে আর কথা-টথা কবে কি?"

"নির্ম্মলা!"

"তবে বাল্য-কাহিনীটা বলতে থাক।"

"আজ আর নয়।"

"তবে আমি গান গাই?"

"গাও।"

নির্ম্মলা গান ধরিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব অস্তমিত। চন্দ্রদেব উদিত-প্রায়। তারকাসুন্দরী গৃহদ্বার খুলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বারিধি সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছেন। সন্ধ্যারাণী অবসাদের সুর ধরিলেন। সেই সুরে সুর মিশাইয়া নির্ম্মলা গান ধরিল—

"বহুদূর হ'তে সলিল বহিয়া,
আনিনু যতনে কলসী কলসী করি।
মরুতে ছিটায়, পল্লব রোপিব,
কুসুম ফোটাব প্রাণে কত আশা ধরি॥
সাগর শুকাল, মরু না ভিজল,
সকলি বিফল হ'ল গো সই।
যাহারে তুষিতে এতই যতন,
সেই অবশেষে সাধিল বাদ॥"

গান শেষ করিয়া নির্ম্মলা বলিল, "এবার তুমি একটা গাও।"

ব্রজবালা গান ধরিল। তখন চাঁদ আকাশে উঠিয়া অস্তগত ভানুর পানে উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। ব্রজবালা পণ্ডিতা, তিনি সহজ গান ধরিলেন না। বিদ্যাপতি কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা গাহিয়াছিলেন, ব্রজবালা সুরলয় সংযোজন করিয়া তাহাই গাহিলেন—

"সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহুগুণ, একদোষে নাশই,
এক গুণে বহু দোষ নাশা।
কি করব জপ-তপ, দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহ দীনে।
সুন্দর কুল শীল, ধন, জন, যৌবন,
কি করব লোচন-হীনে॥

গরল সহোদর, গুরুপত্নীহর,
রাহুবমন তনুকারা।
বিরহ হুতাশন, বারিদ নাশন,
শীলগুণে শশী উজিয়ারা।"

গীত শেষ হইতে না হইতে অদূরে রাজকর্ম্মচারী পুনরায় দর্শন দিল। তবে এবার একা নয়,—সঙ্গে দুই জন স্ত্রীলোক,পশ্চাতে একখানি শিবিকা। কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া বলিল, "রাণী-মা, আপনার জন্যে মহারাজ দোলা প্রেরণ করছেন।"

ব্রজবালা ধীরভাবে, মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি রাজদর্শনে আসি নি—দেবদর্শনে এসেছি।"

কর্ম্মচারী ফিরিয়া গেল। পরদিন প্রাতে এক জন ব্রাহ্মণ সঙ্গে লইয়া আবার আসিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মা, দেবদর্শনে চলুন।"

ব্রজবালা এবার বিনাবাক্যব্যয়ে নির্ম্মলাকে সঙ্গে লইয়া চলিল; এবং ক্ষেত্রধামের সমস্ত দেব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অপরাহ্নে ফিরিল। পথে ও মন্দিরে রাজাকে দুইবার দেখিয়াছিল। রাজা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; ব্রজবালা তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই।

পরদিন সন্ধ্যাকালে কর্ম্মচারী পুনরায় শিবিকা লইয়া আসিল; বলিল, "রাণী-মা, মহারাজ আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী।"

ব্রজবালা উত্তর করিল, "কিন্তু আমি তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী নই। যাহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি।"

কর্ম্মচারী ফিরিয়া গেল—আর আসিল না। কিন্তু এবার রাজা মুকুন্দদেব স্বয়ং আসিলেন। তদ্দৃষ্টে ব্রজবালা গৃহত্যাগ করিয়া দূরে সৈকত-ভূমে বসিল। রাজা অপ্রতিভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি নিরস্ত বা নিরুত্ত হইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"বাঙ্গলার নবাব, শাহন শাহ বাদশা।"

"কি পুত্র কালাচাঁদ ?"

"আমি ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে আপনার চরণ-বন্দনা করতে এসেছি।"

"বহুত খোব, বহুত খোব, আমি বড় খুসী হ'লাম। আমি তোমাকে বহুত এনাম ও জায়গীর দেব।"

"বাদশা, আপনার অনুগ্রহ যথেষ্ট।"

"আমি তোমাকে পাঁচ-হাজার সেনার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলাম।"

কালাচাঁদ ভূমি স্পর্শ করিয়া সেলাম করিতে করিতে বলিলেন, "পুত্রের প্রতি বাদশার অসীম দয়া। কিন্তু সেনা লইয়া কি করিব, যদি কার্য্যক্ষেত্র না পাই ?"

নবাব। উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে লও।

কালাচাঁদ। বহুত খোব। আমি বাসনা করছি, উড়িষ্যা জয় করব।

ন। উড়িষ্যা-জয় ?

কা। হাঁ, জাঁহাপনা।

ন। তা' ত সম্ভব নয়, বাচ্ছা।

কা। কেন জনাব ?

ন। কেন শুনবে ? আমার বিশ্বাস, উড়িষ্যা অপরাজেয়। তবে যদি তা'দের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ ঘটে, তবে আমি উড়িষ্যা-জয়ের ভরসা করতে পারি। নতুবা নয়—কিছুতেই নয়—এমন কি, দিল্লীশ্বরের সেনা নিয়েও নয়।

কা। জাঁহাপনা অবশ্য আমার চেয়ে ভাল জানেন; কিন্তু কৃষ্ণ রায় কি ইস্মাইল গাজির হস্তে পরাস্ত হ'ন নাই ?

ন। না, হ'ন নাই। কৃষ্ণ রায় যখন উড়িষ্যায় ছিলেন না, তখন ইস্মাইল গাজি তস্করের ন্যায় চুপি চুপি আসিয়া কটক, পুরী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তা'র পর কৃষ্ণ রায় উড়িষ্যায় ফিরিয়া আসিয়া ইসমাইলকে গলা টিপিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন। তুমি সে সকল কথা জান না, কালাচাঁদ; উড়িয়াদের মত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা এতদঞ্চলে দেখি নাই। আজ তিন শত বর্ষ ধরিয়া কত বড় বড় তাতার-যোদ্ধা, কত সুলতান বাদশা তাহাদের দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তা, কেহ কিছু করিতে পারেন নাই। তা'রাই বরং আমাদের রাজা, রাজধানী লুণ্ঠন করিয়াছে। তাই বলি, উড়িষ্যা- বিজয় অসম্ভব।

কা। চেষ্টা করিতে আপত্তি কি ?

ন। পরাজয়ের অপমান আমি সহ্য করিতে পারিব না।

কা। আপনি কি অবগত আছেন যে, আপনাকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট্ আকবর শাহ উড়িষ্যাধিপতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতেছেন ?

ন। কই, এমন কথা ত আমি শুনি নাই।

এমন সময় নবাব-পুত্র দাউদ খাঁ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কথাটা সত্য। আমি উজীর খাঁ জাহানের নিকট শুনেছি, আকবর শাহ এক জন

দূত মুকুন্দদেবের নিকট প্রেরণ করেছেন ; দূতের নাম হাসান খাঁ।

নবাব বলিলেন, "তবেই ত বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। উজীর ও সেনাপতিকে ডাকতে পাঠাও।"

অচিরে উভয়ে আসিয়া অভিবাদন করিলেন। উজীরের নিকট সকল কথা অবগত হইয়া নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ?"

সেনাপতি কতলু খাঁ উত্তর করিলেন, "আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে আক্রমণ করাই যুক্তিসঙ্গত।"

দাউদ খাঁ বলিলেন, "আমারও সেই মত ; দুই দল সম্মিলিত হইলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য।"

নবাব কোনও উত্তর করিলেন না। উজীর সাহেব, সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উড়িষ্যা-বিজয়ে কত সৈন্যের প্রয়োজন, সেনাপতি সাহেব ?"

কতলু খাঁ উত্তর করিলেন, "উড়িষ্যাধিপতির সৈন্য অনেক ; তাহারা ভীরু বা দুর্ব্বল নহে। পাঁচ লক্ষ সেনার কম উড়িষ্যা-বিজয় অসম্ভব।"

উজীর কহিলেন, "পাঁচ লক্ষ সৈন্য আমাদের নাই, অতএব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আর তুলিবেন না।"

সুলতান বলিলেন, "আর তুমি কালাচাঁদ, কত সেনা নিয়ে উড়িষ্যা জয় করতে পার ?"

কালাচাঁদ উত্তর করিলেন, "সুলতান, আমি কখন যুদ্ধ করি নি ; তবে আমার বিশ্বাস, সুলতানের এক জন সেনার সমকক্ষ দশ জন হিন্দু নয়।"

সুলতান, উজীরের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উজীর সাহেবের কি অভিপ্রায় ?"

উজীর। জাঁহাপনা, আমার বিবেচনায় যুদ্ধ অকর্ত্তব্য। সুপ্ত ব্যাঘ্রকে অনর্থক জাগাবার প্রয়োজন নেই।

নবাব চিন্তামগ্ন হইলেন। তদ্দৃষ্টে কালাচাঁদ একটু তেজের সহিত বলিলেন, "সুলতান, আপনি মুঙ্গের-প্রান্তরে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ত আপনার এত দ্বিধা-সঙ্কোচ ছিল না ; আবার যখন মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ বেহার হইতে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া বাঙ্গালা জয় করেন, তখন ত আপনার এ ইতস্তত-ভাব ছিল না। আজ আপনার এ দুর্ব্বলতা কেন ? আপনি বিস্মৃত হইতেছেন, আপনার তরবারিতে শক্তি কত। যিনি পর্ব্বত লঙ্ঘনে সমর্থ, তিনি ক্ষুদ্র বল্মীক দেখিয়া পশ্চাৎপদ হইতেছেন। সুলতান, আর দ্বিধা করিবেন না,—সম্মুখে যশঃ রাজ্য, বিজয়লক্ষ্মী ; যদি তাহা উপেক্ষা করিয়া নির্জীব বৃদ্ধ উজীরের পরামর্শমত নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে অচিরে হিন্দু ও মোগল-সৈন্যমধ্যে পিষ্ট হইয়া ধ্বংস হইবেন।"

সুলতান উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না, আর আমার দ্বিধা-সঙ্কোচ নাই—আমি কীর্ত্তিকে বরণ করিলাম। কালাচাঁদ, প্রস্তুত হও, আমি তোমাকে এই যুদ্ধের সেনাপতি পদে বরণ করিলাম ; কতলু খাঁও তোমার সঙ্গে থাকিবেন। কিন্তু তোমাকে আমি এক লক্ষের অধিক সৈন্য দিতে পারিব না।"

কালাচাঁদ। এক লক্ষ সৈন্য লইয়াই সুলতানের কার্য্য সম্পন্ন করিব।

কতলু খাঁ একটু হাসিলেন। উজীর মুখ ফিরাইলেন। নবাব বলিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি হিন্দু হইয়া হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিতে সমুদ্যত হইয়াছ ; তাই তোমাকে আজ একটা নূতন উপাধি দিলাম,—তোমাকে আজ হ'তে লোকে ইল্লাহাবাদ কালাপাহাড় বলিয়া জানিবে। প্রার্থনা করি, তোমার এই নূতন নাম বাঙ্গলায় অক্ষয় অমর হউক।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"বুনা !"

"কি প্রভু ?"

"তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দেব।"

"আজ আপনি নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরে এসেছেন, আজ ত কোন সংবাদই দুঃসংবাদ হ'তে পারে না।"

কালাচাঁদ নিরুত্তর হইলেন ; কি বলিতে যাইতে-ছিলেন, তাহা আর বলিতে পারিলেন না। বাক্‌পটু মহাবীর ক্ষুদ্র বালকের সম্মুখে মূক হইলেন। তিনি দুই এক পা হাটিয়া অবশেষে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

যখন কালাচাঁদ সুলতানের অনুমতি লইয়া একাকী উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন বুনা কালাচাঁদের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল ; কিন্তু কালাচাঁদ তাহাকে সঙ্গে লয়েন নাই। বুনা একা সেই শূন্য অট্টালিকায় পড়িয়া রহিল। দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। বুনা দিবসের অধিকাংশ সময় দ্বারে বসিয়া কালাচাঁদের প্রতীক্ষায় কাটাইত ; নিশাকালে শয়নকক্ষের দ্বারে হর্ম্ম্যতলে শয়ন করিয়া কোন রকমে যামিনী অতিবাহিত করিত। কোন কোন দিন বুনা নানারকম আহার্য্য উৎসাহসহকারে প্রস্তুত করিত, এবং পূর্ব্বে যেমন স্থান করিয়া পাত্রে পাত্রে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া দূরে বসিয়া থাকিত, সেইরূপ অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া যথাস্থানে রক্ষা করিয়া নিমীলিত-নেত্রে গৃহকোণে বসিয়া থাকিত, দণ্ডের পর দণ্ড অতিবাহিত হইয়া যাইত, বুনা সেই একই ভাবে বসিয়া থাকিত। অবশেষে সন্ধ্যাসমাগমে সেই

অন্নব্যঞ্জন' নদীতে ফেলিয়া দিয়া নিজে অনশনে নিশি কাটাইত।

বুনা কোন কোন দিন সায়ংকালে কালাচাঁদের জন্য শয্যা রচনা করিত; এবং দীপ জ্বালিয়া হর্ম্ম্য তলে বসিয়া পুরাণ পাঠ করিত, পাঠ করিতে করিতে কোন কোন দিন ঘুমাইয়া পড়িত। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পুঁথি তুলিত, শয্যা গুটাইত।

এক দিন বুনা নিশিশেষে স্বপ্ন দেখিল, কালাচাঁদ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আবার তাহাকে আদর করিয়া মাথায় হাত বুলাইতেছেন, বুনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বুনা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং নগরের দক্ষিণ দ্বার পথে গিয়া বসিল। বেলা এক প্রহরের সময় বুনা দেখিল, কালাচাঁদ অশ্ব ছুটাইয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন। জনাকীর্ণ নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কালাচাদ অশ্ব বেগ সংযত করিলেন। বুনা তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেখিল, কালাচাঁদ এক মোল্লার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বুনা দ্বার-সন্নিকটে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ যখন গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব অতি ভয়ঙ্কর,—মেঘ ও ঝড়ে মুখখানি ভরা। তদ্দৃষ্টে বুনা তাঁহার সম্মুখীন হইতে আর সাহস করিল না। কালাচাদ কোনও দিকে না চাহিয়া প্রস্থান করিলেন। বুনা মোল্লার গৃহে প্রবেশ করিল।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বুনা কালাচাঁদের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কালাচাঁদের আসিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল। প্রাঙ্গণে অশ্বপদশব্দ শুনিয়া বুনা বুঝিল, কালাচাঁদ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন সে ঝটিতি উঠিয়া গিয়া কালাচাঁদের চরণমূলে প্রণত হইল। কালাচাদ বুনার মস্তকে হস্ত-বিমর্ষণ করিয়া আদর করিলেন। বুনা সকল দুঃখ বিস্মৃত হইল।

কালাচাঁদ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দ্রব্যসম্ভার যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত রহিয়াছে। শয্যা পূর্ব্ববৎ রচিত রহিয়াছে,; পুঁথিগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—সযতনে সংরক্ষিত। পট্টবস্ত্র, নামাবলী, জপের মালা যথাস্থানে বিলম্বিত। কালাচাঁদ পলক-শূন্য-নয়নে স্বীয় অস্তিতুল্য প্রিয় জপের মালা পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর একটা ঝড় বহিয়া গেল; তিনি অস্থিরচিত্তে শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "বুনা, দুঃসংবাদের কথা শুনবে?"

বুনা। আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি প্রভু, আজিকার দিনে কোন সংবাদই দুঃসংবাদ হ'তে পারে না।

কালা। শুন বুনা, তুমি জান না, আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি।

বুনা। কি করেছেন?

কালা। আমি মু—মুসল—মুসলমান হয়েছি।

বুনা। বেশ করেছেন।

কালা। বেশ করেছি! তুমি হয় ত আমার কথাটা বুঝলে না বুনা! আমি বলছি যে, আমি হিন্দুধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছি।

বুনা। তাতে হয়েছে কি? আপনি ত আর ধর্ম্ম-ত্যাগ করেন নি—বাসগৃহ পরিবর্ত্তন করেছেন মাত্র।

কালা। তুমি এ কি বলছ বালক? আমি ধর্ম্মত্যাগ করি নি?

বুনা। না। আপনি সাধনার—আপনার উপাস্য-দেবতার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন মাত্র। হরি না ব'লে আল্লা বলছেন—গীতা পাঠ না ক'রে কোরাণ পাঠ করছেন। ধর্ম্মত্যাগ কোথায় হ'ল?

কালা। কে তুমি মহান্ শিক্ষাদাতা! ভৃত্যবেশে এসে আমার চক্ষু ফুটালে, আমায় শান্তি দিলে। এস বালক, এস শান্তিদাতা, আমার হৃদয়ে এস।

কালাচাদ বাহুপ্রসারণ করিলেন। বুনার মুখ আরক্তিম হইল, দেহ কাঁপিয়া উঠিল। বুনা আগ্রহভরে দেহ একটু বাড়াইয়া দিল। পরক্ষণেই আবার পিছাইয়া আসিল; এবং কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "প্রভু যাহা শিখিয়েছেন, ভৃত্য তাহাই তাহাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে।"

বুনা প্রস্থান করিল; এবং তৎপরতা সহকারে আহারের স্থান করিল। থালিতে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দিয়া কালাচাদকে ডাকিল। কালাচাঁদ আহারে বসিয়া প্রথমেই গণ্ডূষ করিলেন। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল, তিনি আর হিন্দু নহেন। কালাচাঁদ ঝটিতি গণ্ডূষ দূরে নিক্ষেপ করিয়া হস্ত প্রসারণ করিলেন। বুনা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, কিন্তু কিছু বলিল না। কালাচাদ যখন দেখিলেন, বুনা কিছু বলিল না, তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "দেখ বুনা, যে ধর্ম্ম অবলম্বন করা যায়, সে ধর্ম্মের নিয়মাদি পালন করা কর্ত্তব্য।"

বুনা তথাপি নিরুত্তর। তাহার বুকের ভিতর একটা ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদের তখন কাণ ছিল না—তিনি সে রোল শুনিতে পাইলেন না। তিনি ক্ষণকাল স্থির নীরব থাকিয়া একটু বিরক্তি-সহকারে বলিলেন, "বল না বুনা, অনিবেদিত অন্ন কিরূপে গ্রহণ করি?"

বুনা। নিবেদন করবেন বই কি।

কালা। নারায়ণকে দিতে পারছি কই?

বুনা। আল্লাকে দিন্, নারায়ণের কাছে পৌঁছবে অথবা নারায়ণকে দিন্, আল্লা গ্রহণ করবেন।

কালাচাদ বিমুগ্ধচিত্তে বুনার পানে চাহিয়া রহিলেন। বুনা অবনত-বদনে দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। কালাচাদ বলিলেন, "বুনা, তুমি কি সত্যই বালক? অনেক প্রবীণের মুখেও যে এমন কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় না।" বুনা নিরুত্তর রহিল। কালাচাদ অবশেষে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহার করিতে করিতে কালাচাদ বলিলেন, "দেখ, বুনা, তোমাকে দেখ্‌লে—জানি না কেন—আমার প্রথম যৌবনের একটা কথা মনে পড়ে। সে কথা আমি কিছুতেই বিস্মৃত হ'তে পারছি না।"

বুনা। সেটা এমন কি কথা?

কালা। আমি একটি নিরপরাধা বালিকাকে ত্যাগ ক'রে এসেছি।

বুনা। সে কে?

কালা। সে আমার স্ত্রী—আমার সহধর্ম্মিণী। তাঁকে উপেক্ষাভরে ত্যাগ ক'রে এসেছি, এ চিন্তা শত বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় নিয়ত আমাকে দগ্ধ করছে।

বুনা। নিশ্চয় তাঁর কোনও অপরাধ ছিল, নতুবা আপনি তাকে ত্যাগ করবেন কেন?

কালা। তাঁর কোনও অপরাধ ছিল না বুনা। সে নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধ। আমি তখন রূপান্ধ ছিলাম—আমি মাধুর্য্যকে ছাড়িয়া তখন সৌন্দর্য্যকে বরণ করিয়াছিলাম।

বুনা। যাক, ও সব কথায় এখন প্রয়োজন নেই—আহার করুন।

কালাচাদ ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোজন শেষ হইয়া আসিলে কালাচাদ বলিলেন, "দেখ বুনা, আমার মত দুঃখী সংসারে নাই। আমি যাহাকে ধরিয়াছি, তাহাকেই অবশেষে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। যাহাকে রত্নভ্রমে হৃদয়ে ধারয়াছিলাম, তাহাকে ঘৃণ্য পদার্থ বোধে দূরে পরিহার করিতে হইয়াছে। আবার দেখ, আজীবন পুষ্ট ভালবাসা দিয়া যে নারায়ণের পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাকেও ত্যাগ করিতে হইল। এখন বুনা, আমার আর কিছু নাই—শুধু তুমি আছ—এবার তোমাকেও ত্যাগ করিতে হইবে।"

বুনা স্তম্ভিত হইল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমাকে ত্যাগ করবেন কেন, প্রভু?"

কালা। বুনা, অধীর হয়ো না—বুঝে দেখ—এখন তোমার আমার মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান।

বুনা। কে—ন?

কালা। ধর্ম্মের ব্যবধান তুল্য ব্যবধান নেই, তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান—মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর; তুমি আর আমার কাছে থাক্‌তে পার না।

বুনার মুখ প্রফুল্ল হইল। সে এবার কণ্ঠস্বরও খুঁজিয়া পাইল; বলিল, "আমিও ত মুসলমান হয়েছি।"

কালাচাদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মুসলমান হয়েছ বুনা?"

কালাচাদের কণ্ঠ হর্ষ-বিমিশ্র। বুনা তাহা লক্ষ্য করিল; বলিল, "হয়েছি—আজই হয়েছি; আপনি যে মোল্লার নিকট ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছেন, আমিও তার নিকট দীক্ষিত হয়েছি।"

কালাচাদের প্রফুল্লতা নিবিয়া গেল; তিনি বলিলেন, "কেন এমন কাজ করলে বুনা?"

বুনা তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি তুলিয়া কালাচাদের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কোনও উত্তর করিল না। কালাচাদ একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বুঝেছি বুনা, তুমি আমারই জন্যে ধর্ম্মত্যাগ করেছ।"

বুনা উত্তর করিল, "আপনার জন্যে কেন করব? আমি বুঝে দেখ্‌লুম, হিন্দুধর্ম্মে কিছু নেই। কা'কে যে পূজা করব, তা'র ঠিকানা পাইনে। বলে কি না, তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা কর—নুড়ি পাথর পূজা কর আমি দেখে শুনে স্থির করেছি, ইসলাম-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—আল্লার আরাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।"

এ কৈফিয়তে কালাচাদ হইলেন না। তিনি বলিলেন, "না বুনা, তা' নয়; হিন্দুধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তুমি তা' জান, আমিও তা' জানি। হিন্দু ব'লে পরিচয় দেবার গৌরব আজ আমাদের ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে বুনা। কিন্তু নারায়ণ জানেন, আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিনি।"

বুনা। আমরা কি ত্যাগ করেছি? কিছুই ত নয়। সাড়ী ছেড়ে বুক্তা পরেছি, এই। বেশের পরিবর্ত্তন হয়েছে, আত্মার ত নয়

কালাচাদের বুকের উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। তিনি আবেগভরে বাহুপ্রসারণ করিয়া বলিলেন, "তবে এস বুনা, আমার হৃদয়ে এস—তোমার আমার মধ্যে সকল ব্যবধান তিরোহিত হইল।"

বুনার দেহ কাঁপিয়া উঠিল; তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যগ্র হইয়া কালাচাদের দিকে ঝুঁকিল; কিন্তু সেটা অল্পক্ষণের জন্য; অচিরে আত্মসংযম করিয়া বুনা বলিল, "আপনি আহার সমাপন করুন।"

কালা। বুনা, আমার ভাই, বন্ধু, পুত্র কিছুই নাই—তুমি সকল স্থান একা অধিকার করিয়াছ। এস বুনু, এস আমার জীবন-সহচর, হৃদয়ে এস।

বুনার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না—কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তা'র পর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বর্ষান্তে শরৎ আসিল। ব্রজবালা সেই সমুদ্র-সৈকতে কুটীর-বাসিনী। রাজা মুকুন্দদেবের চেষ্টার ত্রুটি নাই—কিন্তু ব্রজবালা নগরে আসিল না।

ব্রজবালা নগরে না আসুক, রাজা প্রত্যহ ব্রজবালার কুটীরে আসেন। তবে কোন দিন ব্রজবালার দর্শন পাওয়া যায়, কোন দিন পাওয়া যায় না। দর্শন মিলিলেও ব্রজবালা কোন দিন কথা কয়, কোন দিন কথা কয় না। কোন দিন দর্শনটুকু, কোন দিন কথাটুকু লইয়া রাজা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কত দ্রব্যসম্ভার রাজা, ব্রজবালার নিকট পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজবালা কোন উপহারই গ্রহণ করে নাই—সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিযাছিল। এক দিন বলরামের প্রসাদ আসিযাছিল; ব্রজবালা তাহা হইতে কণিকামাত্র উঠাইয়া লইয়া অবশিষ্টাংশ ফেরত দিযাছিলেন। রাজা তদবধি আর কিছু পাঠান নাই।

এক দিন নির্ম্মলা নগর হইতে সংবাদ লইয়া আসিল, যবনেরা শ্রীক্ষেত্র আক্রমণ করিতে আসিতেছে। নির্ম্মলা ভীত হইয়া পড়িল, ব্রজবালা আনন্দিত হইল। এমন সময় মহারাজ মুকুন্দদেব আসিয়া দর্শন দিলেন।

অন্যদিন ব্রজবালা রাজার পানে বড় একটা ফিরিয়াও দেখে না; আজ ব্রজবালা উঠিয়া দাঁড়াইযা রাজাকে অভ্যর্থনা করিল। রাজা পুলকিত-হৃদয়ে সমুদ্র-সৈকতে বালুকার উপর উপবেশন করিলেন। ব্রজবালা সহসা প্রগল্‌ভা হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "পাঠান না কি উড়িষ্যা আক্রমণ করতে আসছে?"

"হাঁ।"

"কি ব্যবস্থা করেছেন?"

"সীমান্তে সৈন্য পাঠিয়েছি।"

"কোথায়?"

"ত্রিবেণীতে।"

"কত সৈন্য?"

"ত্রিশ হাজার।"

"সেনাপতি কে?"

"মন্ত্রী দনার্দ্দনকে সেনাপতি ক'রে পাঠাব ভাবছি।"

"এ সময় মন্ত্রীকে দূরে কেন?"

"সে কাছে থাকলে গোল বাধাতে পারে—সিংহাসনের প্রতি তা'র লক্ষ্য আছে।"

"সে যদি রণক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে?"

"তাকে আমি নামে সেনাপতি করব, কার্য্যে নয়।"

"যাকে সন্দেহ হয়, তা'কে দূরে না রেখে কাছে রাখা ভাল।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "রাজনীতির তুমি কি জানিবে ব্রজবালা?"

ব্রজবালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাঠান কত সৈন্য লয়ে আসছে?"

রাজা। তা' ঠিক জানি না—দুই এক লাখ হ'তে পারে।

ব্রজ। এই দুই এক লাখ সৈন্যকে বাধা দিতে আপনার ত্রিশ হাজার সৈন্যই কি যথেষ্ট?

রাজা। হিন্দুর বাহুতে কত শক্তি, তা' ত তুমি জান না ব্রজবালা!

ব্রজ। আমি এইটুকু জানি, শত্রুকে তাচ্ছীল্য করা উচিত নয়।

রাজা। ঠিক তাচ্ছীল্য করছি না, কটকে মহানদী-উপকূলে সৈন্য রক্ষা করছি।

ব্রজবালা নীরব রহিল। ক্ষণকাল পরে রাজা বলিলেন, "ব্রজবালা, হয় ত জীবনে আর সাক্ষাৎ ঘটবে না।"

ব্রজবালা ঝটিতি ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ঘটবে না?"

রাজা। আমি যুদ্ধে চলিলাম—ফিরিব কি না, জানি না।

ব্রজ। ফিরিবেন বই কি; বিজয়-মাল্য গলায় পরিয়া গৃহে ফিরিবেন বই কি।

রাজা। ব্রজবালা, তোমার তবে ইচ্ছা, আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসি?

ব্রজবালা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি জানেন কি, এ যুদ্ধে পাঠান-সেনাপতি কে?"

রাজা। শুনেছি, নবাব-জামাতা কালাপাহাড়।

ব্রজ। কালাপাহাড়?

রাজা। হাঁ; কালাচাঁদ রায় এক্ষণে কালাপাহাড়।

ব্রজবালা চিন্তামগ্ন হইল। রাজা অতৃপ্তনয়নে ব্রজবালার রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। সুধা অনন্ত, কিন্তু সময় সান্ত। ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এক্ষণে কোথায় যাইতেছেন?"

"কটক।"

"আমিও যাব।"

"কটকে? আমার সঙ্গে?"

ব্রজবালা রাজার পানে চাহিয়া একটু হাসিল। রাজা কৃতার্থ হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড

মরুৎ

লালসা

মুকুন্দদেব ও ব্রজসুন্দরী

প্রথম পরিচ্ছেদ

"বুনা, ত্রিবেণীর নাম শুনেছ?"

"শুনেছি বই কি প্রভু।"

"দূরে সেই মুক্তবেণী।"

"চলুন না একবার দেখে আসি।"

"হিন্দুর তীর্থে আমাদের অধিকার কি বুনা?"

বুনা উত্তর করিল না। তখন রজনী প্রভাত। তবে সূর্য্যদেব তখনও উঠেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বগগন আরক্তিম। নদীবক্ষ স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না—একটা ধূম্রবরণ যবনিকায় সমাচ্ছন্ন। পিছনে অসংখ্য পাঠান শিবির। জনশূন্য মুক্ত প্রান্তর এক্ষণে জনাকীর্ণ। উভয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বুনা জিজ্ঞাসা করিল, "এখান হ'তে ত্রিবেণী কত দূর?"

"তিন চারি ক্রোশ।"

"হিন্দু-সৈন্য না কি ত্রিবেণীর সন্নিকটে অপেক্ষা করছে?"

"ঠিক সন্নিকটে নয়—দুই তিন ক্রোশ দূরে।"

উভয়ে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দক্ষিণে উন্মুক্ত প্রান্তর, বামে বালুকাময় নদীতট। কালাচাদ অগ্রগামী, বুনা পশ্চাতে। বুনা জিজ্ঞাসা করিল, "শুনেছি, উড়িষ্যার রাজা না কি ত্রিবেণীতে বিশাল ঘাট প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন?"

কালা। শুনেছি তাই।

বুনা। ঘাটের উপর দশ অবতারের মূর্ত্তি স্থাপন ক'রে দশটি বিষ্ণু-মন্দিরও না কি প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন?

কালা। হবে।

বুনা। চলুন না, একবার দেখে আসি।

কালা। এখন নয় বুনা।

বুনা। তবে কখন্?

কালা। যখন ধ্বংস কর্‌তে যাব।

সহসা দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কে বলিয়া উঠিল, "কীর্ত্তি কখন ধ্বংস হয় কি কালাচাঁদ?"

কালাচাঁদ ঝটিতি ফিরিয়া দেখিলেন, এক জন পথিক বৃক্ষাশ্রয়ে উপবিষ্ট। তাহার পরিধানে মূল্যবান্ পরিচ্ছদ—কটিতে অসি; কিন্তু যোদ্ধৃবেশ নয়, দেখিবামাত্র কালাচাঁদ তাহাকে চিনিলেন; বলিলেন, "গদাধর, তুমি এখানে?"

গদাধর উত্তর করিল, "আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—অদূরে আমার নৌকা।"

কালা। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ!

গদা। হাঁ কালাচাদ। জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি, তুমি এত সৈন্য নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

কালা। উড়িষ্যা ধ্বংস কর্‌তে।

গদা। উড়িষ্যার অপরাধ? যদি কেউ অপরাধ ক'রে থাকে ত সে মুকুন্দদেব। তার অপরাধে কেন সমগ্র উড়িষ্যাবাসীকে মার?

কালা। হিন্দুমাত্রেই আমার নিকট অপরাধী।

গদা। তোমার মাতাপিতা—যে পিতৃপুরুষের

রক্ত তোমার দেহে প্রবাহিত—তাঁহারা সকলেই কি তোমার নিকট অপরাধী ?

কালাচাঁদ সহসা কোন উত্তর করিলেন না; গদাধরের মুখ হইতে নয়ন অপসৃত করিয়া লইয়া সুদূর আকাশপানে চাহিলেন। রক্তমাখা রবি তখন নদীবক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছেন—রঙ্গবরণ যবনিকা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতেছে। বহুদূরবিস্তৃত সেনা নিবাস মানবকণ্ঠে প্রতিধ্বনিত—দিগ্‌দিগন্ত পক্ষীর ঝঙ্কারে মুখরিত। জবা পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়া সূর্য্যদেবের চরণে অর্ঘ্য ঢালিবার জন্য ব্যাকুল। মানুষ, পক্ষী, স্থাবর জঙ্গম তাহার প্রভাত আরতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জীবন—প্রেম, আনন্দ। কালাচাঁদের সেটা ভাল লাগিল না; কেমন একটা বিরক্তি ভাব আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি বলিলেন, "দেখ গদাধর, আমি কি করি বা না করি, তাহার কৈফিয়ৎ আমি কাহারও নিকট দিতে প্রস্তুত নই। আমি যখন আশ্রয় যেচে কাঙ্গালের মত হিন্দুর দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, তখন কি তোমরা একবার আমার কাছে এসেছিলে? আজ আমি বলযুক্ত—প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাই তোমরা এখন দলে দলে এসে আমার কৃপা ভিক্ষা করছ। আমি দয়াশূন্য, গদাধর। হিন্দু বা হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তির আমার নিকট পরিত্রাণ নেই বুঝেছ গদাধর?"

গদাধর। বেশ বুঝেছি—আর বুঝাতে হবে না। তোমার বৃদ্ধা জননী এখন তোমার শত্রু—তোমার বধ্য। আর যে সব দেবদেবীর মূর্ত্তি, তোমার পিতা পিতামহ ফুলচন্দন, চোখের জল, বুকের রক্ত দিয়ে পূজা ক'রে এসেছেন, সেই সব মূর্ত্তি এখন তুমি ধ্বংস করতে সমুদ্যত। বেশ বুঝেছি, কালাপাহাড়।

কালাচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল—চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তুমি কি করিতে গদাধর, যদি তোমাকে প্রত্যেক হিন্দু ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিত?—তোমার স্পৃষ্ট অন্ন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুকও গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হইত?—তোমাকে হিন্দুর গৃহ হইতে, হিন্দুর দেবালয় হইতে, হিন্দুর তীর্থ ক্ষেত্র হইতে কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত করিত? তুমি কি করিতে গদাধর, যদি তোমার জননী তোমার নামে ধিক্কার প্রদান করিত?—তোমার পরিণীতা ভার্য্যা তোমার জীবননাশার্থে শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করিত?—তোমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন তোমাকে আবর্জ্জনার ন্যায় বর্জ্জন করিত?"

গদাধর। আমি কি করিতাম জিজ্ঞাসা করিতেছ কালাচাঁদ? আমি আমার ইষ্টদেবকে বুকের ভিতর আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিতাম; আর কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে আত্মনির্ভর করিয়া বলিতাম, "মঙ্গলময়, তুমি যা' করাইতেছ, আমি তাই করিতেছি—পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সকলি তোমার।"

কালাচাঁদের চক্ষুমধ্যে যেখানে আগুন জ্বলিতেছিল, সেখানে সলিল ছুটিয়া আসিল; বিশাল ললাটে প্রসন্নতা আসিয়া বসিল। তিনি বলিলেন, "আমিও ত তাই করিতেছি গদাধর! সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া আমি প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত যখন গাছের পাতাটি পড়ে না, তখন আমি কে গদাধর?"

গদাধর। বেশ; তুমি যদি সত্যই আত্মনিবেদনে সমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার বলিবার আর কিছুই নাই। এখন চলিলাম—সময়ান্তরে আবার সাক্ষাৎ ঘটিবে।

কালাচাঁদ। কোথায়? শিবিরে?

গদাধর। হাঁ।

কালাচাঁদ। তোমার অপমান করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু নিরস্ত হইলে ভাল হইত।

গদাধর। সে কি কথা কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ। শুন গদাধর, আমি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি যখন উড়িষ্যা হইতে কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত হইয়া বাঙ্গালায় ফিরিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে পান্থশালায় এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আমার চারিদিকে যেন রক্তপ্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই স্রোতে সহস্র সহস্র দেবমূর্ত্তি, শত শত দেবমন্দির ভাসিয়া চলিয়াছে—আর আমি সেই প্রবাহমধ্যে অসংখ্য শবপরিবেষ্টিত হইয়া অগ্রসর হইতেছি। সহসা সম্মুখে তোমার মৃতদেহ দেখিলাম। লক্ষ মানুষ মারিয়া, সহস্র দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া প্রাণে যে ব্যথা পাই নাই, তোমার মৃতদেহ দেখিয়া তদধিক ব্যথা পাইলাম। কষ্টে যন্ত্রণায় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাই বলিতেছিলাম গদাধর, নিবৃত্ত হইলে ভাল হইত না?

গদাধর। তুমি আজও আত্মনিবেদনে সমর্থ হও নাই। আমি তোমারই কথায় উত্তর দিতেছি, তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত যখন গাছের পাতাটি পড়ে না, তখন আমি কে কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ। বেশ, তবে তুমি আমার পথে অগ্রসর হও। তুমি বা আমি এক জন নিশ্চয়ই এ যুদ্ধে মরিব। তুমি মরিলে তোমাদের ধর্ম্মের অনেক

ক্ষতি হইবে, কাঁদিবেও অনেকে; আমি মরিলে কাহারও ক্ষতি নাই, দুই জন ছাড়া জগতে কাঁদিবারও কেহ নাই। প্রার্থনা করি, যেন আমারই মৃত্যু হয়।

গদাধরের নয়ন সজল হইয়া আসিল। তিনি তথায় আর অপেক্ষা করিলেন না—ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

গদাধর অদৃশ্য হইতে না হইতে এক জন ছদ্মবেশী শ্মশ্রুধারী হিন্দু আসিয়া কালাচাঁদের সম্মুখে দাঁড়াইল। কালাচাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি উড়িষ্যাবাসী হিন্দু।"

"কি চাও?"

"আপনার নামে একখানি পত্র আছে।"

"কে দিয়েছে?"

"মহামন্ত্রী দনার্দ্দন।"

কালাচাদ পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে একটা ঘৃণা ও বিরক্তিভাব প্রকটিত হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তবে যাও হিন্দু, অধঃপাতে যাও।"

কথা কয়টি বুনার কাণে গেল। তাহার বুক ফাটিয়া একটা নিশ্বাস উঠিল; কিন্তু ঝড়ের চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মুক্তবেণী ত্রিধারায় সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছেন। যেন তিন ভগ্নী পরস্পরের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে নিজ নিজ সংসার পাতিতে চলিয়াছে। যাইবার সময় কত কাঁদিয়াছে—পরস্পরের অঙ্গে কত আছাড় খাইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বিলাপ করিতে করিতে চোখের জলে দুই গণ্ড সিক্ত করিয়া চলিয়াছে।

তমোময়ী রজনী। তবে অন্ধকার তত গাঢ় নয়। মানুষ চেনা যায় না; কিন্তু দেখা যায়। নদীবক্ষে গভীর জলে একখানি তরণী স্থির হইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে তাহা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। নিকটে আর কোন নৌকা দৃষ্ট হইতেছে না। নৌকার মাঝিরা নীরব; কিন্তু জাগ্রত ও সতর্ক। বড় বড় সৈনিক কর্ম্মচারীরা মাঝিমাল্লারূপে নৌকায় অবস্থান করিতেছিলেন। নৌকার ভিতরে কালাচাঁদ উপবিষ্ট। তিনি নীরবে মুদ্রিত-নয়নে উপবিষ্ট ছিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ—কোনও শব্দ নাই। এমন সময় সে নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া দূরবর্ত্তী কোনও নৌকা হইতে কে গাহিয়া উঠিল,—

'স্রোতে বহি যাও,
তরণী আমার স্রোতে বহি যাও।'

গান সহসা থামিল। কালাচাঁদের মনে হইল, সুরটা যেন স্রোতে ভাসিয়া গেল। তিনি উৎকর্ণ হইয়া গানের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণমধ্যেই আবার সুর উঠিল। কালাচাদ শুনিলেন,—

'দাড়াইও না আর, তরণী আমার,
দাড়াবার নাই অবসর, স্রোতে বহি যাও।
পিছু ফিরে চেও না, সাম্‌নে চেয়ে দেখো না,
আঁখি মুদে স্রোতে ভেসে যাও।
তরণী আমার স্রোতে বহি যাও।'

গান থামিল, কিন্তু সুর থামে নাই; তখনও সুর সেই নৈশ আকাশে ভাসিয়া চলিয়াছে। কালাচাঁদের গানের প্রতি আর লক্ষ্য নাই—তিনি সুর, গান সব বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে একটা নূতন সুর জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাহারই ঝঙ্কার নীরবে শুনিতেছিলেন। অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এস তবে দনার্দ্দন বাবু, উড়িষ্যার ভাগ্যে কি আছে দেখা যাক।"

বাক্যের অবসান হইতে না হইতে অদূরে একখানা নৌকার লোকেরা হাকাহাকি করিল। প্রথম নৌকা হাকিল, "কে?"

দ্বিতীয় নৌকা উত্তর করিল, "ভূপবালা।"

সাঙ্কেতিক কথা নৌকার লোকেরা জানিত না; শুধু কালাচাদ জানিতেন। তিনি আদেশ করিলেন, "নৌকা ভিড়িতে দাও।" অচিরে দুই নৌকা একত্র হইল, এবং দ্বিতীয় নৌকার আরোহী উড়িষ্যার মহামন্ত্রী দনার্দ্দন রায় প্রথম নৌকায় আরোহণ করিলেন।

নৌকার ভিতর-কক্ষে কালাচাদ একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। একটা পিত্তল দীপাধারে ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছিল। কক্ষের সম্পদাদি অতি সামান্য। অভ্যাগত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। তার পর তিনি কালাচাঁদকে অভিবাদন করিলেন। পাঠান সেনাপতি, উড়িষ্যার মহামন্ত্রীকে কোনরূপ আদর আপ্যায়ন করিলেন না; শুধু আসন পরিগ্রহ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। মহামন্ত্রী অবমানিত হইয়াও নীরবে উপবেশন করিলেন। কালাচাঁদ তাঁহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি কি উড়িষ্যার মহামন্ত্রী?

"হাঁ।"

"রাজমন্ত্রী মন্ত্রণাগার ছাড়িয়া সমরক্ষেত্রে কেন ?"

"প্রয়োজন হইলে উড়িষ্যার কৃষকও যে সমরক্ষেত্রে আসে।"

কালাচাঁদ ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জন্য আমার দর্শনপ্রার্থী হইয়াছেন ?"

দনা। আপনি কি জন্য এত সৈন্য লইয়া উড়িষ্যার রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইয়াছেন ?

কালা। উড়িষ্যা-বিজয় আমার উদ্দেশ্য।

দনা। আপনার এই সামান্য সৈন্য কি উড়িষ্যা-বিজয়ে সমর্থ ?

কালা। সংখ্যায় শক্তি নির্ণীত হয় না।

দনা। সে তর্কের এক্ষণে প্রয়োজন নাই—পাঠানের বারংবার পরাজয়ে ইতিপূর্ব্বে তাহা মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। আজ আমি একটা নূতন প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি।

কালা। কি ?

দনা। আপনার উদ্দেশ্য যদি সহজে সিদ্ধ হয় ?

কালা। তা' হ'লে রক্তারক্তির প্রয়োজন নেই।

দনা। রক্তারক্তির কিছু প্রয়োজন আছে। আমি এখানে সেনাপতি নই; তবে আপনাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিতে পারি।

কালা। কি করিতে পারেন ?

দনা। আমার অধীনে পাঁচ হাজার সেনা আছে; আমি তাহা লইয়া সময়মত সরিয়া দাঁড়াইব। তখন অনেকেই ভগ্নোদ্যম হইয়া আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

কালা। আপনাদের কত সৈন্য আছে ?

দনা। চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার। আপনি সহজেই ত্রিবেণী-যুদ্ধে জয়ী হইবেন।

কালা। তার পর ?

দনা। দ্বিতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা যজপুরে।

কালা। সেখানে সেনাপতি কে ?

দনা। লক্ষ সৈন্যের অধিনায়ক যুবরাজ রামচন্দ্র।

কালা। সেখানে আপনি কি করিতে পারেন ?

দনা। তা এখন ঠিক বলিতে পারি না; তবে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া রাজা মুকুন্দদেবকে বিব্রত রাখিতে পারিব।

কালা। মুকুন্দদেব কোথায় ?

দনা। কটকে।

কালা। কটকের দুর্গ না কি অজেয় ?

দনা। হাঁ; কটকের বারোবাটী দুর্গ অজেয়।

ক্ষণকাল চিন্তার পর কালাচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ সাহায্যের মূল্য কিরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ?"

দনা। উড়িষ্যার সিংহাসন।

কালাচাঁদের সমস্ত মুখখানিতে ঘৃণাবিমিশ্র বিরক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল। ক্ষীণালোকে দনার্দ্দন তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। কালাচাঁদ সহসা কোন উত্তর না করিয়া নীরবে একটু চিন্তা করিলেন। এমন সময় বহুদূর হইতে একটা সুরতরঙ্গ ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া কালাচাঁদের কাণে লাগিল। কালাচাঁদ শুনিলেন,—'তরণী আমার স্রোতে বহি যাও।'

কালাচাঁদ বলিলেন, "আপনাকে সিংহাসনে বসাইতে হইলে আপনার প্রভু ও প্রভুপুত্রকে হত্যা করিতে হয়। তা'তে আপনি প্রস্তুত আছেন ?"

দনা। যুদ্ধেও ত তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিতে পারে।

কালা। যদি না ঘটে ?

দনা। যদি না হয়, তখন—তখন কোনরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

কালাচাঁদ মুখ ফিরাইলেন। দনার্দ্দন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পাঠান-সেনাপতি, আপনি বয়সে নবীন—রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ। উড়িষ্যার ইতিহাস যদি আপনি অবগত থাকিতেন, তাহা হইলে আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরাইতে পারিতেন না। তেলেঙ্গু মুকুন্দদেব কিরূপে সিংহাসন পাইয়াছে, জানেন কি ? সে তাহার প্রভু নরসিংহ জেনাকে মারিয়া রুধিরাক্ত হস্তে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে। নরসিংহ আবার গোবিন্দ বিদ্যাধরকে দূর করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছে। গোবিন্দ আবার তাহার প্রভু প্রতাপরুদ্রের বত্রিশটি সন্তানকে মারিয়া ললাটে রাজটীকা ধারণ করিয়াছে। এইরূপে সিংহাসনের জন্য চিরদিনই দ্বন্দ্ব-কলহ চলিয়া আসিতেছে। কে রাজা ? কে প্রজা ? যে কৌশলে বা শক্তিতে সিংহাসনে বসিতে পারে, সেই রাজা; যে পারে না, সেই প্রজা। রাজনীতিতে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই।"

কালাচাঁদ। উত্তম—উড়িষ্যার মহামন্ত্রীর নিকট আজ অভিনব ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি শিক্ষা লাভ করিলাম।

দনা। বিদ্রূপ করিবেন না—রাজনীতি শিখিতে এখনও আপনার অনেক বিলম্ব—আপনি ত সবেমাত্র রাজ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন।

কালাচাঁদের বদন আরক্তিম হইল। দনার্দ্দন বলিলেন, "পাঠান-সেনাপতি যদি রাজনীতি অবগত

থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি কখন মনে করিতেন না যে, আমি বিনা পুরস্কারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে সমুদ্যত হইয়াছি।"

কালাচাঁদ। উড়িষ্যার উদারচেতা রাজনীতিজ্ঞ সম্ভবতঃ মনে করেন নাই যে, আমরা বিনা স্বার্থে এত লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

দনা। আপনাদের উদ্দেশ্য ত লুণ্ঠন?

কালা। সিংহাসন কি আমাদের লক্ষ্য হইতে পারে না?

দনা। উড়িষ্যার সিংহাসন? রহস্য মন্দ নয়! এ কি বাঙ্গালা? উড়িষ্যার সিংহাসনে কখন বিদেশী বসিতে পারে না।

কালা। সে কথা সত্য; কিন্তু আপনি যখন উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন উড়িষ্যার পতন অনিবার্য্য। আপনার সহিত বাক্যালাপে আমার আর প্রবৃত্তি নাই; সেনাপতি কতলু খাঁ বঙ্গেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ আপনার সহিত বাক্যালাপ করিবেন।

কালাচাঁদ গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিলেন; এবং কতলু খাঁকে কিছু উপদেশ দিয়া ভিতরে পাঠাইলেন। তিনি দনার্দ্দনের সকল প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "শ্রীক্ষেত্র জয়ের পর আপনাকে আমরা সিংহাসনে বসাইব—তৎপূর্ব্বে নয়। কিন্তু আপনাকে সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে—কর ও উপঢৌকন যথাযোগ্য দিতে হইবে।"

দনা। সম্মত আছি।

অতঃপর দনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিলেন; এবং নিজের নৌকায় উঠিয়া অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "আগে সিংহাসনে বসি, তার পর তুর্কীকে দেখ্‌ব—তুর্কীর জামাতাকেও দেখ্‌ব।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মহানদী ও কাঠ্‌জুড়ি নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রশস্ত ভূখণ্ডের উপর কটক-বারাণসী ও বারোবাটী দুর্গ। নগর কাঠ্‌জুড়ির উপর—দুর্গ মহানদীর উপর। নগর ও দুর্গের মধ্যে ব্যবধান দুই ক্রোশ মাত্র।

বারোবাটী ভূখণ্ডের উপর দুর্গ নির্ম্মিত বলিয়া দুর্গ বারোবাটী নামে পরিচিত। এক এক বাটীতে পঁচিশ বিঘা জমী। এক এক বিঘায় এক এক 'একার' অর্থাৎ এতদ্দেশীয় তিন বিঘা জমীরও কিছু বেশী। দুর্গের বর্ত্তমান আয়তন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, দুর্গ যে ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত, তাহা একশত বিঘারও কম। রাজপ্রাসাদ দুর্গ-পরিখার অপর পার্শ্বে পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই রাজপ্রসাদ ও দুর্গ লইয়া বারোবাটী।

কটক-বারাণসী, উড়িষ্যা রাজ্যের রাজধানী। কেশরী-বংশের রাজত্বকালে দশম শতাব্দীর শেষভাগে চৌদ্বার হইতে কটকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। তদবধি কটকই রাজধানী। কটক রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নগরী, সুদৃশ্য হর্ম্ম্যমালায় বিশোভিত। মুকুন্দদেব দুর্গ ও নগরকে নানা অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ (১) জগতে অতুলনীয় ছিল। ইহা বিস্তারে একখানি গ্রাম—উচ্চতায় নীলগিরি। কথিত আছে, ইহা নয় তোলা ছিল, (২) প্রস্তর ও ইষ্টকে গঠিত, ইহার কারুকার্য্য এক দিন জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে ইহার ধ্বংসাবশেষ একখানি ইষ্টকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জড়ের পরিণাম এইরূপ।

দুর্গ-প্রাকারের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত জল-প্রণালী বা পরিখা-প্রণালী কোথাও চব্বিশ হাত, কোথাও বা এক শত হাত প্রশস্ত। জল অতি গভীর—হাতীও তল পায় না। পরিখার উপরেই প্রস্তরনির্ম্মিত বিশালকায় প্রাচীর। প্রাচীর-গাত্রে একটিমাত্র দ্বার; এই দ্বার ব্যতীত দুর্গপ্রবেশের অন্য পথ নাই। আর একটি গুপ্তদ্বার আছে; সেই দ্বারপথে শেষ মহারাষ্ট্র-নরপতি ইংরাজ-আগমনে নৌকায় উঠিয়া বিপুল অর্থ সহ পলায়ন করিয়াছিলেন। পরিখার উপর একটি অপ্রশস্ত সেতু। সূর্য্যাস্তের পর সেতু উঠাইয়া লওয়া হয়।

দুর্গের বাহিরে—পরিখার অপর পার্শ্বে রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদের নয়টি পল্লী বা প্রাঙ্গণ। প্রত্যেক পল্লীতে বহুসংখ্যক গৃহ। প্রথম প্রাঙ্গণে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও উষ্ট্র; দ্বিতীয় পল্লীতে কামান, বন্দুক, অস্ত্রাগার ও সৈন্যাবাস; তৃতীয় প্রস্থে প্রাসাদরক্ষক সৈন্য অবস্থান করিত; চতুর্থে শিল্পী ও কর্ম্মকার; পঞ্চমে বন্ধনশালা; ষষ্ঠে রাজার দরবার-গৃহ ও রাজকর্ম্মচারীদের আবাসস্থল; সপ্তমে গুপ্ত পরামর্শের গৃহশ্রেণী; অষ্টমে মহিলা-নিবাস; নবমে রাজা ও রাজ-পরিবারবর্গের শয়নাগার। (৩)

গৃহের সাজসজ্জাও প্রাসাদানুরূপ। দরবার ও

---

(১) ষ্টালিং সাহেবের মতে এই প্রাসাদ দেখিতে Windsor Castleএর মত।

(২) আইন ই আকবরি।

(৩) W Bruton.

মন্ত্রণাগৃহে যে সকল প্রস্তরগঠিত পুত্তলি ও দীপাধার ছিল, তাহা বা তদনুরূপ কিছুই এক্ষণে পাওয়া যায় না। সে রকম নিপুণ শিল্পী এক্ষণে আর কোন দেশে জন্মায় না। ভুবনেশ্বর মন্দিরাঙ্গে উড়িষ্যার ইতিহাস, তাজমহলের দেহে সমস্ত কোরাণ লিখিতে এখন আর কোন্ দেশের কোন্ শিল্পী পারে?

উড়িষ্যার শিল্প ছিল, শক্তি ছিল; কিন্তু সাহিত্য ছিল না। দুই এক জন লেখক মধ্যে মধ্যে "বিচিত্র রামায়ণ," বা "রসকল্লোল" বা "গোপীবল্লভ নাটক" লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সাহিত্য গঠিত হয় নাই। উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ কবি উপেন্দ্র ভঞ্জের "চন্দ্রলেখা" প্রভৃতি বহুতর উপন্যাস ও "লাবণ্যবতী" প্রভৃতি কাব্য উড়িষ্যার সাহিত্যের কিছুই করিতে পারে নাই।

উড়িষ্যার সাহিত্য ছিল না, কিন্তু ধর্ম্ম ছিল। প্রত্যেক নগর তীর্থক্ষেত্র। এমন গ্রাম ছিল না, যেখানে মন্দির বা বিগ্রহ ছিল না। উড়িষ্যা-ভূমিতে পদার্পণ করিলেই মনে হয়, যেন বসুন্ধরা ছাড়িয়া কোন পুণ্যময় রাজ্যে সমুপস্থিত হইয়াছি। আকবরের মুসলমান-সেনাপতি উড়িষ্যাজয় করিতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"এ দেশ ঈশ্বরের—মানুষের নয়।" ভাগবতে যজপুর সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান।
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি সেই স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গাম।"

উড়িষ্যার এক্ষণে কিছুই নাই,—ধর্ম্ম, শক্তি, শিল্প সব গিয়াছে। আছে শুধু ক্ষীণকায়া স্মৃতি। তাও সাহিত্যের অভাবে চিতাশায়িনী হইতে বসিয়াছে, "মাদলা পঞ্জী" ছাড়া উড়িষ্যার আর ইতিহাস নাই। তাহাও আবার অলীক ও অসম্ভব ঘটনায় পূর্ণ।

উড়িষ্যাবাসীর মুখে না শুনিয়া আমরা অপরের কাছে শুনিয়াছি, উড়িষ্যা একদিন ঐশ্বর্য্য ও শিল্পে, ধর্ম্ম ও শক্তিতে ভারতের বরেণ্য ছিল। মুকুন্দদেবের বিস্তীর্ণ প্রাসাদের কথা আমরা অপরের নিকট শুনিয়াছি, উড়িষ্যা নিজে বড় কিছু বলে নাই।

সেই প্রাসাদের দরবার-গৃহ একদিন পরিব্রাজকের দ্রষ্টব্য ছিল। গৃহের একধারে বক্ষতমস উচ্চবেদীর উপর রত্নসিংহাসন। বেদীর নীচে দুই পার্শ্বে বহুতর স্বর্ণ ও রৌপ্যমণ্ডিত আসন। মধ্যে মধ্যে বিচিত্র দীপাধার। কোন দীপাধার স্তম্ভাকৃতি, কোন দীপাধার নগ্ন নারীমূর্ত্তি। সকল দীপাধারই মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত। কোন দীপাধার শত শাখা, কোন দীপাধার পুরাণকথিত কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। শাখা বা বাহু রৌপ্যমণ্ডিত। দীপাধার হইতে দীপাধারে স্বর্ণ-শৃঙ্খল বিলম্বিত।

গৃহকোণে বৃহদাকার মনুষ্যমূর্ত্তি। কোনটা উড়িষ্যার পাহাড়ীর মূর্ত্তি, কোনটা বাগুরা, কোনটা ধানুকী, কোনটা বা পাইকের মূর্ত্তি। কাহারও হস্তে ঢাল ও খাঁড়া, কাহারও হস্তে অস্ত্রনিক্ষেপকারী যন্ত্রবিশেষ, কাহারও হস্তে ধনুর্ব্বাণ; কাহারও পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, দেহ হরিদ্রাক্ত, মুখমণ্ডল লাল মৃত্তিকায় রঞ্জিত। গৃহের কোন অংশে দণ্ড-বিস্তারী বৃহদাকার হস্তিমূর্ত্তি। কোথাও বা অশ্বমূর্ত্তি, আবার কোথাও বা গর্দ্দভ। হস্তিপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশী খাণ্ডাইত বা ভঞ্জের মূর্ত্তি, অশ্বপৃষ্ঠে দুর্দ্ধর্ষ মাল বা ধীবরের মূর্ত্তি, গর্দ্দভোপরি কোন পরাজিত মুসলমান-সেনাপতির মূর্ত্তি। মূর্ত্তিনিচয় পাষাণময়ী।

গৃহপ্রাচীরগাত্রে নানামূর্ত্তি ক্ষোদিত। এক স্থানে দেখা যায়, এক ভীষণদর্শন বন্দুকধারী দীর্ঘাকার মনুষ্য জগন্নাথদেবকে কক্ষে লইয়া পলাইতেছে। আর এক স্থানে মহারাজ প্রতাপকেশরী, যবনদের উড়িষ্যা হইতে দূরীভূত করিতেছেন, তাহার চিত্র লেখা আছে। আর এক স্থানে গরুড় স্তম্ভপাদমূলে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব আত্মবিহ্বলচিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এইরূপে প্রাচীরগাত্রে নানাবিধ চিত্র লিখিত রহিয়াছে দেখা যায়।

এই সভাগৃহে এক সহস্র ব্যক্তির বসিবার উপযোগী আসন আছে। আরও দুই সহস্র ব্যক্তি গৃহমধ্যে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। রাজা মুকুন্দদেব অদ্য প্রাতে যখন সভাগৃহে আসিয়া দর্শন দিলেন, তখন সেই বৃহৎ কক্ষটি লোকে পরিপূর্ণ। রাজকীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, মণিমুক্তাখচিত তরবারি হস্তে রাজা যখন সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন, তখন চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। কিন্তু রাজার বদন বিষণ্ণ, চিন্তাক্লিষ্ট। রাজা আসন পরিগ্রহ করিলে রাজকর্ম্মচারী ও সভাসদবৃন্দ স্ব স্ব মর্য্যাদা অনুসারে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা তখন বলিলেন, "আপনারা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন, ত্রিবেণীর যুদ্ধে আমরা পরাস্ত হইয়াছি। আমি সংবাদ-বাহককে এখানে আসিতে আদেশ করিয়াছি; আপনারা তাহার প্রমুখাৎ সকল বৃত্তান্ত অবগত হইবেন।"

রাজার বাক্য অবসান হইতে না হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া সিংহাসনতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল;

এবং নাসিকা-কর্ণ স্পর্শান্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সম্বোধিত হইয়া বলিল, "মহারাজ অবধান করুন্ত, খাণ্ডাইত অবধান করুন্ত। জগন্নাথ প্রভু জানন্তি, মু কি পার লড়াই করিযাছি। দু' হজার মুসলমান মু একা মারিযাছি। আউ দু' হজার মারিথান্তি, তা' মারি কিস্ হব ? দু' হজার মলে বিশ হজার আসন্তি।"—

এক জন খাণ্ডাইত বলিয়া উঠিলেন, "তোমার বীরত্বের কথা পরে হবে—এখন যুদ্ধের কথা বল।"

সংবাদ-দাতা একটু অপ্রতিভ হইয়া চারিদিক্ পানে চাহিতে লাগিল। কাহারও নিকট কোনরূপ সহানুভূতি পাইল না। তখন বলিল, "যুদ্ধের আর কি হবে ? আমরা হারলুম। আমরা চল্লিশ হাজার ছিলুম, আর তারা চল্লিশ লাখ্। কালাপাহাড়ের সঙ্গে কতলু খাঁ ছিল। দুই জনে মিলে আমাদের মধ্যিখানে ফেল্লে। আমরা এক এক জনে এক এক হাজার মেরেছি। মহামন্ত্রী তাঁর পাইকদের রক্ষা ক'রে খুব পালিয়েছেন। সকলে পালাল, কিন্তু এক জন পালাল না; সে বাঙ্গালী। তিন চার শত পাইক নিয়ে সে একা কতলু খাঁকে দাড় করিয়ে রেখেছিল। পরে কালাপাহাড এসে তাঁকে তাড়ালে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সেই বাঙ্গালী ?"

"তা' জানি না। লোকে বল্‌তে লাগ্‌ল, এ কান্ বাঙ্গালা দেশের রাজার ছেলে"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অকস্মাৎ এক ব্যক্তি জনতা ঠেলিয়া ব্যস্তভাবে সভাগৃহে প্রবেশ করিল। তাহার বস্ত্র কর্দমাক্ত, অঙ্গ ধূলিধূসরিত। রাজা উৎকণ্ঠা তীব্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ দূত ?"

দূত উত্তর না দিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ন করত যথারীতি প্রণাম আরম্ভ করিল; এবং কর্ণ, নাসিকা ইন্দ্রিয়াদি স্পর্শান্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূত, সংবাদ কি ?"

দূত উত্তর করিল, "মহারাজ, পাঠান অগ্রসর হইতেছে। কালাপাহাড় ময়ূরভঞ্জের দিকে যাইতেছে—কতলু খাঁ যাজপুর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। যুবরাজ অনুমান করিতেছেন, কালাপাহাড় ময়ূরভঞ্জে উপস্থিত না হইলে কতলু খাঁ যাজপুর আক্রমণ করিবে না। যাজপুর রক্ষা করিবার জন্য আরও সৈন্যের প্রয়োজন হইবে। তিনি আপনার নিকট আরও এক লক্ষ পাইক প্রার্থনা করিয়াছেন।"

রাজা সহসা কোনও উত্তর দিলেন না। সভাসদ্‌বর্গের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে পরামর্শ চলিতে লাগিল। কেহ কাহারও কথা শুনে না। জনতার মধ্যে একটা কোলাহল উঠিল। রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কলরব তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল—সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন, "খাণ্ডাইতগণ, আপনারা প্রস্তুত হউন—আমার যাবতীয় সৈন্য প্রস্তুত হউক—আমি স্বয়ং ময়ূরভঞ্জে যাইব।"

কুজঙ্গাধিপতি বলিলেন, "আমরা থাকিতে আপনি কেন যাইবেন ? আপনি বরোবাটী দুর্গ রক্ষা করুন। আমরা এক লক্ষ সৈন্য লইয়া ময়ূরভঞ্জে যাইতেছি।"

রাজা। উত্তম—তাহাই হউক। গণকঠাকুর, পঞ্জিকা-দৃষ্টে যাত্রার লগ্ন স্থির কর।

গণকঠাকুর সিংহাসন-নিম্নে একখানি পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ঠিক শুনেন নাই, রাজা কোন্ কার্য্যের জন্য লগ্ন স্থির করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তখন লড়াইয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করত বড়ই ভীত হইয়া ভাবিতেছিলেন, এক্ষণে কটক ছাড়িয়া সপরিবারে পলায়ন বিধেয় কি না? এমন সময় রাজার আদেশ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি চমকিত হইয়া রাজার পানে ফিরিলেন; এবং ক্রোড়স্থ পঞ্জিকাপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন, "মহারাজ, পলায়নের উপযুক্ত লগ্ন সমুপস্থিত; এ সকল কার্য্যে বিলম্ব অবিধেয়।"

রাজা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আপনাকে পলায়নের লগ্ন স্থির করিতে বলা হয় নাই।"

গণক। তবে সপরিবারে পলায়ন বিধেয় কি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?

রাজা রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভীরু ব্রাহ্মণ—"

জনতার ভিতর হইতে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, "মহারাজ, ব্রাহ্মণ ভীরু নয, ভীরু আপনি।"

সকলে চমকিত হইয়া ধৃষ্ট বক্তার পানে ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, বক্তা বাঙ্গালী। তাহার অঙ্গে বর্ম্ম—কটিতে অসি—মস্তকে শিরস্ত্রাণ। বক্তার এক জন সহচর ছিল, সেও বাঙ্গালী—যোদ্ধৃবেশী। তাহার স্কন্ধের উপর ভর দিয়া আপাত-বক্তা ধীরে ধীরে সিংহাসন অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?

"আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ভীরু নই। আমার গৃহে

চোর প্রবেশ করিলে তাহাকে তাড়াইবার জন্য আমি শুভ লগ্নের অপেক্ষা করি না।"

রাজা কহিলেন, "ব্রাহ্মণ, তুমি প্রগল্‌ভ।"

ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "মহারাজ, আপনি আজীবন চাটুকারের কথা শুনিয়া আসিতেছেন; সত্য কথা কখন শুনেন নাই—স্তাবক বা প্রতারক ব্যতীত প্রকৃত মানুষ কখন দেখেন নাই। মহারাজ আপনার গৃহে তস্কর প্রবেশ করিয়াছে; এক্ষণে আপনি জ্যোতির্ব্বিদের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সেনাপতিকে আহ্বান করুন।"

এক জন সভাসদ্ বলিয়া উঠিলেন, "বাঙ্গালী আসিকিরি মোদোর কাপুরুষ কইছন্তি।"

তেজস্বী ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "সত্যই বাঙ্গালী আসিয়া তোমাদের কাপুরুষ বলিতেছে। ত্রিবেণীতে তোমরা লড়াই কর নাই—কেবল পলাইয়াছ। মহামন্ত্রী যেমন তাঁহার সৈন্যসহ সরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি তোমরা সকলে পলায়ন আরম্ভ করিলে। একবার পলায়ন শিক্ষা করিলে আর কখন লড়াই করিতে পারিবে না।"

সভাসদ্। কেন, এইমাত্র আমাদের সংবাদদাতা বলিয়া গেল, আমাদের পাইকরা এক এক জনে এক এক হাজার পাঠান মারিয়াছে; আর তুমি বল কি না লড়াই হয় নাই। মহারাজ, বাঙ্গালীরা বড় মিথ্যাবাদী।

ব্রাহ্মণ। মিথ্যাকথায় বাঙ্গালী কখন তোমাদের অতিক্রম করিতে পারিবে না।

সভাসদ্। তুমি কি ত্রিবেণীর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলে?

ব্রাহ্মণ। ছিলাম—লড়াইও করেছি।

রাজা বলিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছ—বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কি অস্ত্র ধরিতে শিখিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ। শিখিয়াছে অনেক দিন, কিন্তু এক্ষণে ভুলিয়া আসিতেছে।

রাজা। আমি জানিতাম, বাঙ্গালী শুধু নতি ও পদলেহনে পটু।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ বিদ্রূপ করিবেন না আপনারা অক্ষতদেহে গৃহে বসিয়া বাঙ্গালীর নামে অযথা কলঙ্ক অর্পণ করিতেছেন, আর সেই বাঙ্গালী সুদূর বাঙ্গালা হইতে হিন্দুধর্ম্মরক্ষার্থ উৎকলভূমে ছুটিয়া আসিয়াছে—দেহের রক্ত ত্রিবেণীর ক্ষেত্রে ঢালিয়াছে। এই দেখুন মহারাজ, আমার অঙ্গে এখনও শত অস্ত্রের লেখা—"

বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ নিজের দেহ হইতে বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। তখন সকলে বিস্মিতনয়নে দেখিল, ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র রুধিররঞ্জিত—মস্তকে ও ললাটে অস্ত্রচিহ্ন—অঙ্গে সর্ব্বত্র ক্ষত। ক্ষত-মুখ হইতে তখনও রক্ত নির্গত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সেই বাঙ্গালী, যাহার কথা দূত স্বর্ণপুরে বলিতেছিল?"

ব্রাহ্মণ মস্তক আন্দোলনে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এবার বিপদ্ বড় সামান্য নয়,—প্রতিহিংসাপরায়ণ বাঙ্গালী, পাঠানবাহিনী লইয়া পুণ্যময় উৎকলভূমি ধ্বংস করিতে আসিয়াছে। আমি আর কি করিতে পারি মহারাজ? কতিপয় অনুচর লইয়া আপনাকে সাহায্য করিতে আসিয়াছি।"

মুকুন্দদেব সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিলেন; বলিলেন, "আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করুন। আপনার ন্যায় আত্মত্যাগী, আপনার ন্যায় যোদ্ধা বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তা' আমার ধারণা ছিল না। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

"আমার পরিচয় অতি সামান্য। নিবাস বঙ্গভূমি—জন্ম ব্রাহ্মণকুলে—পিতা এক জন ভূস্বামী—আমার নাম গদাধর।"

"আপনার সঙ্গে কত অনুচর আছে?"

"ছিল পাঁচ শত; এক্ষণে দুই শত মাত্র অবশিষ্ট আছে।"

"আপনাকে আমি পঞ্চসহস্র সৈন্যের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলাম।"

গদাধর উত্তর করিলেন, "আপনার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু আমি কি করিতে পারি মহারাজ, যদি আপনার সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতক হয়?"

রাজা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সৈন্যেরা বিশ্বাসঘাতক?"

গদা। ত্রিবেণী-ক্ষেত্রে স্বচক্ষে যা' দেখেছি, তাই আপনার নিকট নিবেদন করছি।

রাজা। আমি নিজের চক্ষে দেখিলেও যে বিশ্বাস করিতে পারি না, উড়িষ্যাবাসী নিজের গৃহ, প্রাণের ইষ্টদেবকে যবনের হাতে তুলিয়া দিতেছে।

গদা। বাঙ্গালা-পতনের পূর্ব্বে আমরাও বিশ্বাস করিতে পারি নাই, বাঙ্গালী কোন দিন আত্মগৃহ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে।

রাজা সে কথায় কাণ না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিশ্বাসঘাতক কে? সকলে কি?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "না; এক জনমাত্র বিশ্বাসঘাতক। সে ব্যক্তি কিন্তু অনেক উচ্চে অধিষ্ঠিত।

রাজা চিন্তামগ্ন হইলেন। গদাধর বলিলেন, "তাই বলিতেছিলাম মহারাজ, আর বিলম্ব করিবেন না—বিদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে বাঁধিয়া আনিতে আপনি স্বয়ং সসৈন্যে যাত্রা করুন।"

রাজা বলিলেন, "হায়, কে জানিত যে, উড়িষ্যায় কোন দিন স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক জন্মিবে।"

রাজার বামপার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, অনুমতি করুন, আমি সেই উড়িষ্যার কলঙ্ক বিশ্বাসঘাতককে বাঁধিয়া আনি।"

এই ব্যক্তি সম্রাট্ ইব্রাহিমের হতভাগ্য পুত্র করিম শা। রাজা বলিলেন, "উত্তম পরামর্শ। আপনি দশ হাজার সৈন্য লইয়া সে বিদ্রোহী প্রজাকে ধরিয়া আনিতে অনতিবিলম্বে যাত্রা করুন।"

করিম শা। মহারাজ, সে বিদ্রোহী কে? তাহাকে কোথায় পাইব?

রাজা সহসা কোন উত্তর না দিয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। সকলে নীরব—উৎকর্ণ। রাজা বলিলেন, "সে ব্যক্তি—"

রাজার বাক্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি জনতা ভেদ করিয়া ত্বরিতপদে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, আবার এক ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত। মহামন্ত্রী দনার্দ্দন বিদ্রোহ-পতকা উড়াইয়া দেশমধ্যে ভীষণ আগুন জ্বালিয়াছেন। দলে দলে নির্ব্বোধ প্রজা তাঁহার পতাকা-নিম্নে সমবেত হইতেছে।"

সভাসদবৃন্দ চমকিত ও স্তম্ভিত হইল। সেই বিশাল কক্ষমধ্যে একটা অস্ফুটধ্বনি উঠিল,—উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুর্গ হইতে নগর দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নগরের এক প্রান্তে—যেখানে কাঠ্‌জুড়ি নদী বাঁকিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে—বাঁকের মাথায় একটি সুরম্য উদ্যান দৃষ্ট হয়। উদ্যানের মধ্যে সর্ব্বশোভাময়ী ক্ষুদ্র অট্টালিকা। গৃহ বা উদ্যান নদীগর্ভ হইতে দৃষ্ট হয় না। বড় বড় গাছ নদীর ধারে এমনই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে, দূর হইতে এ উদ্যানকে নিবিড় অরণ্য বলিয়া মনে হয়। অট্টালিকা তেমন উচ্চ বা প্রশস্ত নয়, কিন্তু অতি সুন্দরভাবে গঠিত ও সজ্জিত। বিলাসিতা যাহা কিছু কল্পনা করিতে পারে, তাহা এই ক্ষুদ্র বাটিকায় সংরক্ষিত হইয়াছে। এই গৃহ রাজা মুকুন্দদেবের বিলাসাগার; এক্ষণে ব্রজবালার বাসস্থান।

অট্টালিকার চারিধারে বিস্তীর্ণ উদ্যান। উদ্যানে ফুলের অভাব নাই—অভাবের সম্ভাবনাও নাই। যে দেশে ধর্ম্ম আছে—দেবদেবীর পূজা আছে, সে দেশে ফুল আপন হইতেই জন্মায়।

উদ্যানের দুই ধারে কাঠ্‌জুড়ি নদী। নদী তত বড় নয়। তবে এখন যেমন নিদাঘে দেখা যায়, আগে তেমন ছোট ছিল না। এখন বৈতরণীতে নৌকা চলা ভার, কিন্তু উড়িষ্যার সুদিনে বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ বক্ষে লইয়া বৈতরণী সানন্দে ছুটিত। এক্ষণে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গা, পদ্মা, বৈতরণী সকলেই বিশাল দেহ সঙ্কুচিত করিতেছে। মানুষের দেহ-মনও ছোট হইয়া আসিতেছে।

উদ্যানের একপ্রান্তে কাঠ্‌জুড়ির উপর পাথর-বাঁধা ঘাট। একদা অপরাহ্নে ব্রজবালা তাঁহার সঙ্গিনী সহ সেই ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর মেয়ে দুই বেলা গাত্র ধৌত করে। সাজিবার আগে স্নান। প্রাতে গৃহ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার সাজে, সন্ধ্যার পুণ্যভূমি শয্যা-গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে ভিন্ন প্রকারে সাজসজ্জা করে। ব্রজবালার গৃহকর্ম্ম নাই—শয্যা-গৃহও নাই। তবু ব্রজবালা সংস্কারবশে দুই বেলা দুই রকম সাজসজ্জা করে।

নির্ম্মলা আবক্ষ নিমজ্জমানা ব্রজবালাকে বলিল, "সন্ধ্যার সময় একটু দূর হইতে যদি কেহ তোমাকে দেখে, তাহা হইলে তাহার ভ্রম হয়।"

অবগাহিনী এক মুখ জল লইয়া নির্ম্মলার মুখের উপর কুলি করিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভ্রম হয় রে?"

নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "যেন একটি পূর্ণবিকশিত কমল ফুটিয়া রহিয়াছে।"

কমলাধার বড় বেশী প্রীত হইলেন না, কেন না, তাঁহার মুখের সঙ্গে পার্থিব কোন বস্তুর তুলনা হইতে পারে, ইহা তিনি মনে করিতেন না। তবে কমল জিনিসটা নিতান্ত মন্দ নয়। ব্রজবালা তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি মুখের উপর ইতস্ততঃ ছড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর এই চুলগুলো?"

নির্ম্মলা একটু মুস্কিলে পড়িল। বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় কোন কালে হয় নাই। কি বলিবে, স্থির করিতে পারিল না। ভাবিল, "কালি বলি; না, কালি বলিলে মুখের অবমাননা করা হয় মুখে কালি, ছি! তবে

কি বল্‌ব ? মেঘ ? কালো মেঘের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র। উপমাটি বেশ, কিন্তু এখানে ঠিক খাটে না। মুখখানাকে যে কমল বলেছি। তবে কি বলি ?"—

"বল্ না আমার চুলগুলো তবে কি ?"

"যেন—যেন ভৃঙ্গদল মধুলোভে কমলের উপর আসিয়া বসিয়াছে।"

ব্রজবালা হাসিয়া বলিল, "এতগুলো ভ্রমর কমলের উপর বসিলে সে বেচারী আর বাঁচে না।"

নির্ম্মলা। আচ্ছা, কমল যদি হ'তে না চাও, তবে আলো হও।

ব্রজবালা। সে কি রকম ?

নি। অন্ধকারময়ী রজনীতে তরুদেহে যেন উজ্জ্বল আলোক।

ব্র। অন্ধকার রাত্রিতে গাছ দেখ্‌ব কেমন ক'রে মূর্খ ?

নি। তবে আর পারলুম না, যা' হয় একটা হয়ে পড়।

ব্র। আমি কি হব জানিস ?—

নি। বল।

ব্র। আমি উড়িষ্যার চাঁদ হব—রূপে গুণ 'শশী উজিয়ারা'।

অদূরে কি একটা ভাসিয়া যাইতেছিল; নির্ম্মলা নিবিষ্টচিত্তে তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল; কোন উত্তর দিল না। একটু পরে নির্ম্মলা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "দেখ, দেখ, একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে।"

ব্রজবালা ফিরিয়া দেখিল। দেখিল, সত্যই একটা শব আকাশের দিকে মুখ করিয়া মুদ্রিত নয়নে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার মুখ অনাবৃত। পরিধানে একখানি বস্ত্র মাত্র। দেহ ক্ষীণ, বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। মস্তক মুণ্ডিত, বর্ণ শ্যাম, মুখাবয়ব কুৎসিত নহে। তাহার চরণাগ্রভাগ দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু হস্ত অদৃশ্য। নির্ম্মলা শবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যাও, স্রোতে ভেসে যাও, এখন আর আকাশের দিকে তাকালে কি হবে ?"

কথাটায় বিদ্রূপের ভাব ছিল না। কি ছিল, তা' নির্ম্মলাই জানে। বায়ুহিল্লোলে যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল।

ব্রজবালা নিশ্বাস বা উক্তি কিছুই শুনিল না, সে তীক্ষ্ণনয়নে শব লক্ষ্য করিতে লাগিল। শব স্রোতে ভাসিয়া ব্রজবালাকে অতিক্রম করিয়া দূরে চলিয়া গেল; ব্রজবালা তবু নয়ন উঠাইল না, শব প্রতি চাহিয়া রহিল। নির্ম্মলা ব্রজবালার ভাব দৃষ্টে একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একদৃষ্টে কি দেখ্‌ছ ?"

ব্রজবালা নয়ন না ফিরাইয়া উত্তর করিল, "লোকটা মরে নি ব'লে মনে হচ্ছে।"

"সে কি ! না ম'রে মানুষ কখন ভাসতে পারে ?"

"পারে—যে সন্তরণে দক্ষ, সে পারে।"

"আমি ত এমন মানুষ কখন দেখি নি।"

"তুমি সংসারের কি বা দেখেছ ? আমিই এখনি তোমায় দেখাতে পারি, জ্যান্ত মানুষ কিরূপে মড়ার মত ভেসে যেতে পারে।"

"আচ্ছা, সেটা না হয় মেনে নিলুম। এখন লোকটার খামকা এ রকম ক'রে যাবার মতলব কি হ'তে পারে ?"

ব্রজবালার নয়ন ভাসমান শবপ্রতি। সেটা তখন দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং স্বল্পকালমধ্যে বাঁকের অন্তরালে গিয়া পড়িল। ব্রজবালা তখন নয়ন ফিরাইয়া বলিল, "উদ্দেশ্য কি বল্‌তে পারি না। দেশে শত্রু এসেছে—ছদ্মবেশী গুপ্তচর নানা ভাবে ঘুরতে পারে।"

নির্ম্মলা মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমি পাগল, তাই পচা মড়ায় ছদ্মবেশী গুপ্তচর দেখ্‌ছ।"

ব্রজবালা কোনও উত্তর দিল না। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, অস্তপ্রায় রবি পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া রোদনোন্মুখ নয়নে জগতের নিকট বিদায় লইতেছেন। ব্রজবালা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, স্থানটি বিরল; একটু দূরে—সহরের দিকে অনেক লোক। বাঁকের মাথায় মানুষ বা নৌকা দৃষ্টিগোচর হইল না। ব্রজবালা বলিল, "চল না কেন দেখি, মানুষটা কতদূর গেল ?"

"তীর দিয়ে ত যাবার পথ নেই।"

"সাঁতার কেটে চল।"

"আবার উজান বয়ে ফিরতে হবে না কি ?"

"না; বাঁকের ও ধারে একটা মেটে ঘাট আছে; সেইখানে উঠে ঘরে যাব।"

বলিয়া ব্রজবালা স্রোতোমুখে দেহ ভাসাইল; নির্ম্মলাও অনুবর্ত্তিনী হইল। উভয়ে সন্তরণপটু; কিন্তু ব্রজবালার মত দক্ষতা লাভ করিতে নির্ম্মলা পারে নাই। নির্ম্মলা বিস্মিত-নয়নে দেখিল, মৃতদেহ যে ভাবে ইতিপূর্ব্বে ভাসিয়া গিয়াছিল, ব্রজবালাও সেই ভাবে ভাসিয়া চলিল। জলের উপর কোনরূপ হিল্লোল নাই—দেহাগ্রভাগেও বিশেষ কোন স্পন্দন নাই।—যেন একটি অম্ভোজিনী খরস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে; বড় দ্রুত নয়, তেমন ধীরেও নয়। নির্ম্মলাও তাহার পাশে পাশে যাইতে লাগিল—যেন

একটি ভৃঙ্গ-পরিবীত কমল মৃণালসহ আর একটি কমলের অনুবর্ত্তন করিয়া চলিল। নৈশ অন্ধকার তখনও পৃথিবীতে উপনীত হয় নাই—পাখীর গান তখনও নীরব হয় নাই। নিকটে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্ট হইতেছিল না, কিন্তু মানবকণ্ঠনিঃসৃত কলরব শ্রুত হইতেছিল। স্রোতস্বতী চঞ্চল, পৃথিবী চঞ্চল, আকাশ চঞ্চল। আবার যাহারা চঞ্চলা স্রোতস্বতী-হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া চলিয়াছে, তাহারাও চঞ্চল। স্বল্পকাল-মধ্যে ব্রজবালা ক্লান্ত হইয়া পড়িল; জিজ্ঞাসা করিল, "বাঁক কত দূর?"

"এখনও অনেকটা।"

ব্রজবালা তখন ঘুরিয়া সহজভাবে সন্তরণ আরম্ভ করিল; এবং সলিলরাশি বিদলন করিতে করিতে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয়ে স্বল্পসময়-মধ্যে বাঁকের অপর পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইল। ব্রজবালা যে ঘাটের কথা বলিয়াছিল, সে ঘাটে আসিয়া উভয়ে দাঁড়াইল। সম্মুখে, পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, কোথাও সে মৃতদেহ দৃষ্ট হইল না, তখন তাহারা ঘাটের উপর উঠিল। উঠিয়া দেখে, মানুষের পায়ের দাগ কোমল মৃত্তিকার উপর অঙ্কিত রহিয়াছে। যে যে স্থানে দাগ পড়িয়াছে, সেই সেই স্থান জলসিক্ত। দেখিলেই মনে হয়, একটা লোক স্বল্পকাল পূর্ব্বে জল হইতে উঠিয়া ঘাট বহিয়া চলিয়াছে। ব্রজবালা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল এবং তীক্ষ্ণনয়নে জলের সন্নিকটস্থ ভূখণ্ড পর্য্যবেক্ষণ করিল। অবশেষে পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। নির্ম্মলা একটু ভীত হইয়াছিল; বলিল, "তুমি যা' বলেছিলে, তাই হ'লো। এখন সে গেল কোথা?"

গেল কোথা, ব্রজবালাও তাই ভাবিতেছিল। নিকটে লোকালয় নাই—জনমানবও নাই। এ ঘাট কাহারও ব্যবহারে সচরাচর লাগে না—পথও বড় সুবিধাজনক নয়। নদীতট বালুকাময়। বালুকার উপর পায়ের দাগ অনুসরণ করিয়া ব্রজবালা চলিতে লাগিল; অবশেষে নিজের উদ্যান-মধ্যে গিয়া পড়িল। সেখানে কিয়দ্দূর পদচিহ্ন পাইল; তার পর সহসা সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। ব্রজবালা বুঝিল, যে স্থানের মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কঠিন, লোকটা সেই স্থানের উপর পা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। লোকটা যে বিশেষ চতুর এবং সে যে অসদভিপ্রায়ে নদী-পারে আসিয়াছে, তদ্বিষয়ে ব্রজবালার মনে কোন সন্দেহই রহিল না। ব্রজবালা তীক্ষ্ণনয়নে একবার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিল—কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। অতঃপর ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়াই ব্রজবালা এক জন পুররক্ষীকে ডাকাইল। সে আসিলে তাহাকে বলিল, "তুমি এখনি মহারাজের কাছে যাও তাঁহাকে আমার নমস্কার দিয়া বলিবে, আমি তাঁহার দর্শনপ্রার্থী।"

রক্ষী প্রস্থানোদ্যত হইলে ব্রজবালা আবার বলিল, "তাঁহাকে কক্ষান্তরে ব্যাপৃত দেখিলে আমার এই অঙ্গুরীয় তাঁহাকে দিও—আর কিছু বলিতে হইবে না।"

বলিয়া রক্ষীর হস্তে ব্রজবালা একটি অঙ্গুরীয় দিল। পুররক্ষী প্রণামান্তে বিদায় হইল এবং অশ্বারোহণে প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রক্ষীকে পাঠাইয়া ব্রজবালা সোপানোপরি আসিয়া বসিল, নির্ম্মলাও কাছে আসিয়া বসিল। সে বিশেষ ভীত হইয়া পড়িয়াছিল; মুহূর্ত্তের জন্যও সে ব্রজবালার সঙ্গ পরিত্যাগ করে নাই। দুই জনে নীরবে ক্ষণকাল বসিয়া রহিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। কোথাও একটু সামান্য শব্দ হইলে নির্ম্মলা ভীত হইয়া চারিদিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল। পক্ষীর চীৎকার, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-শব্দ, তাহাও নির্ম্মলার অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে বলিল, "আলো আন্‌তে বল্‌ব?"

"না।"

"তবে ঘরে চল।"

"সেখানে বড় গরম।"

নির্ম্মলা নিরুত্তর হইল। ক্ষণপরে পুনরায় বলিল, "এখানে আমার বড় ভয় করছে। যদি চোরটা—"

ব্রজবালা। চোর কা'কে বলছ নির্ম্মলা? যে এসেছে, সে চোর নয়—ছদ্মবেশী গুপ্তচর। ভাবছ, সে এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছে? তা নয়, সে হয় ত এতক্ষণ নগরে বা দুর্গে প্রবেশ করেছে

নি। তাই যদি হবে, তা' হ'লে সে সহজভাবে নৌকা ক'রে আসতে পারত ত—

ব্রজ। না, তা' পারত না। নদীর ধারে—চারিদিকে—প্রত্যেক ঘাঁটিতে এমন কড়া পাহারা বসেছে যে, বাহিরের কোনও লোক সহজে নগরে প্রবেশ করতে পারে না। প্রবেশের অনুমতি যদি অনেক হাঙ্গামা ক'রে পায়, তা' হ'লেও তাকে অনেক জবাবদিহি করতে হয়।

নি। তা' লোকটা রাত্রে এলেই ত পারত, আমরা তা' হ'লে ত তা'কে দেখ্‌তে পেতাম না।

ব্রজ। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নগর ও দুর্গের দ্বার যে বন্ধ হয়ে যায়, তা বুঝি জান না?

নি। তবে এই লোকটা কি ক'রে নগরে ঢুক্‌বে?

ব্রজ। পরিচয় দিতে হবে—সাঙ্কেতিক কথা বলতে হবে—

এমন সময় অশ্বশালার দিকে একটা গোল উঠিল। নির্ম্মলা ভয়ে জড়সড় হইয়া ব্রজবালার গা ঘেঁসিয়া বসিল। ব্রজবালা বলিল, "দেখে এস, কিসের গোল।"

নির্ম্মলা একটুও না নড়িয়া উত্তর করিল, "দেখ্‌তে হবে কেন, চোরটা ধরা পড়েছে।"

ব্রজবালা। সম্ভব নয়; আমার অনুমান, ঘোড়া চুরি গেছে।

ব্রজবালার অনুমান সত্য হইল। দুই তিন জন অশ্বরক্ষক পরস্পর কলহ করিতে করিতে আসিয়া ব্রজবালাকে সেই সংবাদ দিল। ব্রজবালা কোনওরূপ বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, "তোমাদের এক জন এখনি নগরপালের কাছে যাও; তাঁহাকে এই অপহরণের সংবাদ দিয়ে বলো, লোকটা সম্ভবতঃ দুর্গের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নগরে বা দুর্গে যেখানে তা'কে পাওয়া যায়, এখনি যেন তাকে ধ'রে আনা হয়। বলো, আমার আদেশ।"

অশ্বরক্ষীরা প্রণাম করিয়া নীরবে প্রস্থান করিল। নির্ম্মলা বলিল, "দেখ, তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হ'লেও, তোমার প্রতি আমার ভক্তি-শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়ছে। তুমি যথার্থই রাণী হবার উপযুক্ত। আজ হ'তে আমিও তোমাকে রাণী ব'লে ডাকব।"

ব্রজবালাকে সকলেই রাণী বলিয়া ডাকিত। দেশের প্রথানুসারে রাজার উপপত্নীমাত্রই রাণী নামে অভিহিত। বিবাহিতা স্ত্রী যে সম্মান পাইত, রাজার উপপত্নীরাও সেই সম্মানের অধিকারিণী। তবে যিনি পাটরাণী, তিনি মহারাণী নামে অভিহিত হইতেন। ব্রজবালা ও নির্ম্মলা, এ প্রথার অস্তিত্ব অনবগত ছিলেন। ব্রজবালা রাজার উপপত্নী ছিলেন না। অথচ তিনি মহিষীর সম্মান লাভ করিতেন। সুরম্য অট্টালিকা, অগণ্য দাসদাসী, রাজার ভালবাসা সকলই তিনি পাইয়াছিলেন; তবু তিনি রাজাকে দূরে রাখিতেন। রাজা যত নিকটে আসিতে চেষ্টা করিতেন, ব্রজবালা তত দূরে তাঁহাকে ঠেলিয়া রাখিতেন। রাজা বিতথপ্রয়াস হইয়াও ব্রজবালার আশা পরিত্যাগ করেন নাই।

নির্ম্মলার কথা শুনিয়া ব্রজবালা ভাবিল, সে কি কখন রাণী হইতে পারিবে? রাণী হইতে হইলে ত মুকুন্দদেবকে বিবাহ করিতে হইবে? বিবাহ ত হ'তে পারে না। তবে কি সে মুকুন্দদেবের উপপত্নী হইবে? কখনই না। তবে কি? কোন্ আশা বুকে ধরিয়া, কোন্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ব্রজবালা রাজাকে মুগ্ধ, করায়ত্ত করিতে যত্নবতী হইতেছে? ব্রজবালা ভাবিয়া কূল পাইল না। সহসা দূরে অশ্বপদধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিল। ব্রজবালা বলিল, "রাজা আসছেন।"

নির্ম্মলা একটু উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। শব্দে বুঝিল, অনেকগুলি ঘোড়া আসিতেছে। রাজা কখন একা আসেন না; দশ বারো জন শরীর-রক্ষী তাঁহার সঙ্গে আসে। রাজা উদ্যানে প্রবেশ করিলে তাহারা দেউড়ীতে অপেক্ষা করে। বিশেষ এখন যুদ্ধের সময়—রাজা সতত সতর্ক।

অশ্বপদশব্দ শুনিয়া ব্রজবালা উঠিল এবং কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া একখানি বৃহৎ দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইল। স্থানভ্রষ্ট কেশগুচ্ছ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া অলঙ্কারের পেটরা খুলিল। কণ্ঠে মুক্তার হার, প্রকোষ্ঠে হীরকবলয়, বাহুতে কেয়ূর, নাসিকায় বেসর, কটিদেশে স্বর্ণ মেখলা, কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিল। আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি তখনও সিক্ত ছিল; কেশ আর বাঁধা হ'ল না। ব্রজবালা সেই নীরদতুল্য কেশের মধ্যে মধ্যে নানা জাতীয় ফুল বাঁধিয়া দিল। মুকুট লইয়া নাড়া-চাড়া করিল, কিন্তু তাহা পরিল না। চক্ষে অঞ্জন, ভ্রূযুগের মধ্যে সিন্দূর-বিন্দু চরণে অলক্তক দিতে ভুলিল না। ওষ্ঠাধর বা ভ্রূযুগল রঞ্জিত করিবার কোনই প্রয়োজন হইল না। ওষ্ঠাধর কমলদলতুল্য সতত রক্তিমাভ; ভ্রূদ্বয় যেন নিপুণ চিত্রকরের দ্বারা পটেতে অঙ্কিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবালার রূপ আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী এক্ষণে বর্ষাসমাগমে বিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে। যে বিকাশোন্মুখ মুকুলটিকে দেখিয়া কালাচাঁদ ও গদাধর এক দিন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, সে মুকুল এক্ষণে পূর্ণবিকশিত—সৌন্দর্য্য-ভারাবনত।

সর্ব্ব-আয়ুধে ভূষিত হইয়া ব্রজবালা যখন হাসিতে হাসিতে আকর্ণবিস্তৃত নীলোৎপলতুল্য চক্ষু দুইটি তুলিয়া নির্ম্মলার পানে চাহিল, তখন নির্ম্মলাও ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃত হইল। পরে বলিল, "আর কেন, যে ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, তাহাকে মারিবার জন্য আর এ রণবেশ কেন?"

"তুই যা—রাজাকে বল্ গে—আমি যাচ্ছি।"

নির্ম্মলা প্রস্থান করিল। ব্রজবালা আবার দর্পণ-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অলকাগুচ্ছ আবার ঈপ্সিত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিল। অঞ্চল দিয়া মুখখানি বারবার মুছিল; দর্পণের উপর উহা একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। দর্পণমধ্যস্থ মনুষ্যাকে নানারূপ মুখভঙ্গিমা দেখাইল; মুখ টিপিয়া একটু হাসিল; তার পর গম্ভীর হইল এবং গজেন্দ্রগমনে কক্ষান্তরে রাজেন্দ্রদর্শনে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা একটি বড় ঘরে বিস্তৃত শয্যার উপর উপবিষ্ট ছিলেন। ঘরটি বেশ সাজান। মাঝে মাঝে পাথরের থাম, আর সেই সব থামের গায়ে বহুসংখ্যক সুগন্ধদীপ জ্বলিতেছে। প্রাচীরের গাত্রে অনেক চিত্র; নগ্ন রমণীর চিত্রের সংখ্যাই কিছু বেশী। ফুলের মালার কোন ত্রুটি ছিল না,—চারিদিকে নানাবিধ ফুলের মালা ঝুলিতেছে।

ব্রজবালা ধীরে ধীরে রাজার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। রাজা বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য, তুমি আমার দর্শনেচ্ছু হয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ—"

ব্রজবালা যখন অগ্রসর হইয়া ক্রমে আলোক-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী হইল, তখন তাহার সমগ্র রূপবিভা রাজার নয়নগোচর হইল। রাজা অভিভূত হইয়া পলকশূন্য নয়নে ব্রজবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা তাহা লক্ষ্য করিল; এবং তাহার ওষ্ঠের উপর একটু হাসি ভাসিয়া গেল। একটু হাসি লইয়াই সে ঘরের ভিতর আসিয়াছিল; কিন্তু এখন সে ধারকরা হাসির স্থানে একটু গর্ব্বের, একটু আনন্দের হাসি ভাসিয়া গেল। ব্রজবালা রাজার দিকে ঠিক পিছন ফিরিল না, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া দূরে দাঁড়াইল। রাজার লালসানলে আহুতি পড়িল।

তিনি ডাকিলেন, "ব্রজবালা!"

উত্তর নাই।

"রাণি!"

"কে রাণী? আমি আপনার রাজ্যের এক জন সামান্য প্রজা মাত্র।"

"তুমি প্রজা! আমি যে তোমারই আশ্রিত—অনুজীবী—দাসানুদাস।"

ব্রজবালা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "শুনেছি, মহারাজের পাঁচশত মহিষী আছে—"

রাজা। মোটে পাঁচশত! সে কি ব্রজবালা?

ব্রজ। আপনার মহিষী-ভাণ্ডার অক্ষয় হউক।

রাজা। তোমার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। এখন তুমি কবে আমার মহিষী হবে?

ব্রজ। বলেছি ত যত দিন না যুদ্ধ শেষ হয়, তত দিন আমার ব্রত উদ্‌যাপিত হবে না। আমি আপনার সামান্য দাসী মাত্র, আমার উপর পীড়াপীড়ি কেন?

অকস্মাৎ রাজার প্রফুল্লতা নিবিয়া গেল; এবং গাম্ভীর্য্য ও বিষাদ আসিয়া তাহার মুখমণ্ডল অধিকার করিল। রাজা বলিলেন, "এ জীবনে বুঝি তবে তোমাকে পাইলাম না।"

ব্রজবালা বুঝিল, রাজার বেদনা কোথায়। রাজ্য, রাণী, প্রাণ সব যাইতে বসিয়াছে। রাজার দুঃখ বোধ হয় তাহার অন্তর স্পর্শ করিল; বলিল, "আমি ত চিরদিনই আপনার।"

রাজা। তবে এস আমার রাণী—

ব্রজবালা শয্যার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, "বসো।" ব্রজবালা বসিলেন না; বলিলেন, "আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে।"

রাজা। ব্রজবালা, অনেক দিন পরে তোমাতে আমাতে আজ সাক্ষাৎ, আজ আর রাজ্যের কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কথা—

ব্রজ। না শুন্‌লে চল্‌বে কেন? এক জন গুপ্তচর—

রাজা। সে কি?

ব্রজ। সব বল্‌ছি। নির্ম্মলা!

নির্ম্মলা আসিল। ব্রজবালা বলিলেন, "রাজার এক জন শরীররক্ষীকে ডাক।"

নির্ম্মলা প্রস্থান করিল। ব্রজবালা নতজানু হইয়া রাজার অদূরে বসিল। রাজা আনন্দে আপ্লুত হইয়া বলিলেন, "রাণি, মুকুট পর নাই কেন?"

ব্রজবালা নতমুখে উত্তর করিল, "আপনি যখন পরাইবেন, তখন পরিব।"

রাজা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন; এবং হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে মুকুট অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময় নির্ম্মলা আসিয়া সংবাদ দিল, দ্বারে রক্ষী দণ্ডায়মান। রক্ষী এক জন সম্মানপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী।

ব্রজবালার ইচ্ছাক্রমে কর্ম্মচারী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং নতমুখে তাঁহার আদেশ অপেক্ষায়

দাঁড়াইলেন। ব্রজবালা বলিলেন, "এক জন গুপ্তচর ক্ষণপূর্ব্বে ছদ্মবেশে নগরমধ্যে প্রবেশ করেছে, সম্ভবতঃ দুর্গের আশে পাশে ঘু'র বেড়াচ্ছে। আপনি দুর্গস্বামী দীনকৃষ্ণকে বলুবেন, লোকটাকে যেন ধ'রে অচিরে এখানে পাঠান হয়। বাজা অপেক্ষায় আছেন।"

কর্ম্মচারী প্রস্থান করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রাণি?"

ব্রজবালা তখন ঘটনাটি আদ্যন্ত বলিলেন। রাজা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; এবং রাণীর বুদ্ধি বিবেচনার অনেক সুখ্যাতি করিলেন। এমন সময় নগরপালের নিকট যে লোকটা প্রেরিত হইয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—অশ্ব বা অশ্বারোহী কাহাকেও পাওয়া গেল না।

রাজা একটু উদ্বিগ্ন হইলেন; বলিলেন, "দেখিতেছি, আমার চেয়ে দনার্দ্দন চতুর—তার লোকেরা আমার লোকের চেয়ে ধূর্ত্ত ও কর্ম্মঠ। আমার কপালগুণে দুর্গস্বামী, নগরপাল, সবাই সকলেই অকর্ম্মণ্য—"

"মহামন্ত্রী দনার্দ্দন নাকি বিদ্রোহী হয়েছে?"

"তা' কি তুমি জান না?"

"তা'কে ধ'রে আনবার কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

রাজা সহসা কোন উত্তর করিলেন না। ব্রজবালা দেখিল, রাজার সমস্ত বক্ষ আন্দোলিত করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বলিল, "রাজা!"

"কি রাণি?"

"এত কাতর কেন?"

"ভাবিতেছিলাম, আজ যদি দনার্দ্দন বিদ্রোহী না হ'ত, তা' হ'লে এ কাফেরগুলাকে ফুৎকারে উড়ায়ে দিতাম।"

"রাজা, ভবিতব্য অলঙ্ঘনীয়; পুরুষকারেরও প্রয়োজন। আপনি কি ব্যবস্থা করেছেন?"

"কি আর করব ব্রজবালা? বিদ্রোহীকে বেঁধে আনতে করিম শাকে পাঠিয়েছি।"

"ভুল করেছেন।"

"কি ভুল করেছি?"

"হিন্দু-বিদ্রোহ দমনার্থ মুসলমানকে পাঠান ভুল হয়েছে।"

রাজা কোনও উত্তর না দিয়া ব্রজবালার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা বলিল, "মুসলমানকে দেখিলে হিন্দুরা জ্বলিয়া উঠিবে—যাহারা এখনও বিদ্রোহীর দলে যোগ দেয় নাই,—ইতস্ততঃ করিতেছে, তাহারাও অতঃপর যোগ দিবে। যে আগুন নিবাইতে প্রয়াস পাইতেছেন, সে আগুন আরও জ্বলিয়া উঠিবে।"

রাজা। ঠিক বলিয়াছ ব্রজবালা। যে কথা আমার সভাসদেরা বলে নাই, আমার বুদ্ধিতে যোগায় নাই, সে কথা আমি তোমার মুখে শুনিলাম। এখন তুমি আমায় কি পরামর্শ দেও?

ব্রজ। আপনি স্বয়ং বিদ্রোহদমনার্থ যাত্রা করুন। আপনাকে দেখ্‌লে অনেকে অস্ত্র পরিত্যাগ করবে; যাহারা ইতস্ততঃ করছে, তাহারা আপনারই পক্ষে অস্ত্র ধারণ করবে। অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ-আগুন নিবে যাবে—আপনার প্রজা আপনারই হবে।

রাজা। আমি কেমন ক'রে যাই? কতলু খাঁ যাজপুরে, কালাপাহাড় ময়ূরভঞ্জে, গৃহে গুপ্তশত্রু, আমি এ অবস্থায় রাজধানী ছেড়ে কেমন ক'রে দূরে যাই?

ব্রজ। রাজধানীর ভার আর কাহারও হাতে দিয়ে যান।

রাজা। এ সময় যে পুত্রকেও বিশ্বাস ক'রে রাজধানীর ভার দিতে পারি না।

ব্রজ। আমাকে বিশ্বাস করেন কি?

রাজা। তোমাতে আমাতে ত প্রভেদ নেই ব্রজবালা।

ব্রজ। তবে আমার উপর রাজধানীর ভার দিন।

রাজা। তোমার উপর? ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার উপর?

ব্রজ। বালিকা বটে, কিন্তু নির্ব্বোধ নই। আপনার ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বলিয়া ব্রজবালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বলিলেন, 'রাগ করো না ব্রজবালা। কিন্তু তুমি রাজ্য, যুদ্ধ, দেশ শাসন এ সকলের ত কিছুই বুঝ না।"

ব্রজ। উড়িষ্যার রাজমহিষীর যতটা বুঝা উচিত, ততটা বুঝি না বটে, কিন্তু আপনার দুর্গস্বামী ও নগরপালকে এখনও অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারি।

রাজা উত্তর করিলেন না। ব্রজবালা বুঝিল, রাজা তাহার কথা প্রত্যয় করিলেন না। বলিল, "বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করুন।"

রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে পরীক্ষা করব?—তলওয়ার ধ'রে?"

ব্রজবালা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিল; বলিল, "তলওয়ার ধরতে পারলেই মানুষ এক জন বড় রাজনীতিজ্ঞ বা দেশশাসক হ'ল না। পশুবল নিকৃষ্ট বল।

সেনাপতি লড়াই করে না—রাজার তরবারি কোমর হ'তে হাতে উঠে না। যাহারা নিকৃষ্ট বলের অধিকারী, তাহারাই লড়াই করে। আজ যদি আপনার রাজ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ থাকিত, তাহা হইলে সে বিশ্বাসঘাতক দনার্দ্দনকে নিকটে না রাখিয়া দূরে সেনাপতি করিয়া পাঠাইত না—হিন্দুবিদ্রোহ দমন করিতে মুসলমানকে নিযোজিত করিত না। আপনারা বিস্মৃত হইয়াছেন; শাণিত বুদ্ধি তীক্ষ্ণধার কৃপাণ অপেক্ষাও কার্য্যকরা; বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়াই আপনাদের পরিব্যাপিত অঙ্কুর আজ এই বিষময় ফল প্রদান করিতেছে—"

রাজা একটু হাসিয়া বলিলেন, "রাণি, আজ তোমাকে মহামন্ত্রীর শূন্যপদে নিযুক্ত করিলাম।"

ব্রজ। বিদ্রূপ করিবেন না। আজ এই যে একটা গুপ্তচর আপনার রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তা' কা'র অনবধানতায়? কা'র অনবধানতায় সে লোকটা এখনও ধৃত হ'ল না? সৈন্য সামন্ত নিয়ে বড় বড় যোদ্ধারা যাহা ক'রতে পারেন নাই, তাহা এই ক্ষুদ্র বালিকা এইখানে বসিয়া করিতে পারে। ছিঃ, আপনারা তরবার ধরিবার বড়াই করিবেন না।

রাজা। তুমি কি কর্‌তে পার ব্রজবালা?

ব্রজ। আমি এখনই তা'কে ধ'রে আন্‌তে পারি।

রাজা। আচ্ছা, তোমার ক্ষমতা দেখা যাক্‌

ব্রজবালা তখন তাহার এক জন ভৃত্যকে ডাকিল। ভৃত্য আসিল। তাহার বয়স বেশী নয়—বিশ বৎসর হইবে। ছোঁড়াটাকে দেখিলেই খুব চতুর বলিয়া মনে হয়। তাহার নাম শান্ত; কিন্তু শান্তভাব তা'র মুখে চোখে কোন স্থানেই লক্ষিত হয় না। ব্রজবালাকে সে অত্যন্ত ভয় করিত, ভক্তিও করিত। ভয় করিত তাহার রাণীত্বকে, ভক্তি করিত তাহার রূপকে।

ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে শান্ত, তুই ঘোড়ায় চড়্‌তে পারিস?"

শান্ত একটু হাসিয়া উত্তর করিল, 'আমরা পাহাড়ী, পেট হ'তে পড়েই ঘোড়ার ঘাড় ধরি।"

ব্রজ। বেশ করিস্‌। এখন সেই সঙ্গে অন্ধকারে দেখাটাও কি অভ্যাস করেছিস্‌?

শান্ত। দিনের চেয়ে রাতে ভাল দেখতে পাই, রাণী-মা।

ব্রজ। আরও ভাল। সাঁতার জানিস্‌?

শান্ত। আমার সঙ্গে সাঁতার কাটতে মাছও হার মেনে যায়।

ব্রজ। বাঃ, তুমি একটি রত্ন। এখন ঘোড়ায় চ'ড়ে দুর্গে যাও। ভিতরে যেও না—বাইরে থাক্‌বে। যেখানে যেখানে গড়খাই স্বল্প প্রশস্ত দেখবে, সেই সেই স্থানে অনুসন্ধান করবে। ভাল ক'রে খুঁজলেই দেখ্‌তে পাবে, একটা মানুষ জলের ভিতর লুকিয়ে আছে। কোন রকম শব্দ না ক'রে মাছের মত সাঁতার কেটে যাবে। যদি জলে তা'কে দেখ্‌তে না পাও, তা' হ'লে দেয়ালের পানে চেয়ে দেখ্‌বে। যেখানে দেখবে একটা দড়ির মই ঝুলছে, সেইখানে লোকটাকে পাবে।

শান্ত যদি সেখানে না পাই?

ব্রজ। নিশ্চয় পাবে। বেশী রাত্রি না হ'লে লোকটা দুর্গের ভিতর যাবে না

শান্ত। লোকটাকে পেলে কি করব?

নির্ম্মলা থাকিতে পারিল না,—বলিল, "ভেজে চড়চড়ি ক'রে খাবে।"

শান্ত অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল, "আমরা ছোট লোক, মানুষ খাই না।"

নির্ম্মলা কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু রাজার পানে চাহিয়া আত্মসংবরণ করিল; এবং মনকে প্রবোধ দিল যে, বারান্তরে শান্তকে সে কথাটা শুনাইয়া মনের জ্বালাটা মিটাবে।

ব্রজবালা বলিল, "লোকটাকে পেলে বেঁধে এখানে আন্‌বে, একা না পার, দু'চার জন পাইক ডেকে নেবে—"

শান্ত নিজের বলিষ্ঠ দেহপ্রতি একবার সগর্ব্বে নেত্রপাত করিয়া বলিল, "লোক ডাক্‌তে হবে না; রাণী-মার হুকুম পেলে আমি গড়খাই তুলে আন্‌তে পারি।"

নির্ম্মলা বলিল, "বাহবা! কলা খেতে পার?"

শান্ত। পক হ'লে পারি; আর দগ্ধটা লোকবিশেষকে খাওয়াতে পারি

নির্ম্মলা। আ মর পোড়ারমুখো—

ব্রজবালা বলিল, "শান্ত, আর দেরী করিস্‌ না—যা"

শান্ত। হা রাণী-মা, লোকটা দেখতে কেমন?

ব্রজ তা'তে তোমার দরকার কি? যা'কে চোরের মত লুকিয়ে থাক্‌তে দেখ্‌বে, তা'কে ধর্‌বে।

শান্ত। যে আজ্ঞা।

শান্ত প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাজা এতক্ষণ নীরব ছিলেন—বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেন নাই। শান্ত প্রস্থান করিলে পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেমন ক'রে জানলে ব্রজবালা, লোকটা দুর্গের ধারে লুকিয়ে আছে?"

"তার হাতে মই আছে ব'লে।"

"তা'তে কি হ'ল?"

"গুপ্তচরের হাতে যখন মই, তখন সে দুর্গপ্রবেশের উদ্দেশ্যেই এসেছে—লোকের ঘরে সিঁদ দিতে আসে নি।"

"লোকটা যদি গুপ্তচর না হয়ে সাধারণ চোর হয়?"

"সাধারণ চোর মড়ার মত ভেসে আসত না—সাধারণ পথে সহজে নগরে প্রবেশ করত।"

রাজা কথাটা একটু তলিয়ে বুঝিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তা'র হাতে মই দেখেছিলে?"

ব্রজ। না।

রাজা। তবে কেমন ক'রে জানলে, তার হাতে মই ছিল?

ব্রজ। লোকটা ঘাটের উপর উঠে নদীর দিকে ফিরে একটু দাঁড়িয়েছিল। তা' তার পায়ের দাগ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, পরে একটা কি টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; সে জিনিসটার শেষে লোহার আংটা ছিল; তারও দাগ মাটীর উপর ছিল। ভাবে বুঝেছিলাম, লোকটা জলের ভিতর দিয়ে একটা দড়ির মই টেনে আনছিল। যে এমনই ভাবে গোপনে মই টেনে আনে, তার উদ্দেশ্য কি, তা'ও বুঝেছিলাম।

রাজা চিন্তামগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া ব্রজবালার পানে চাহিলেন বলিলেন, "ব্রজবালা, জানিতাম, নারী-জাতি আমাদের সখের, বিলাসের সামগ্রী—গৃহের অলঙ্কারস্বরূপা—অন্তঃপুরে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্যই তাহাদের সৃষ্টি; এখন দেখিতেছি—"

ব্রজবালা মাথা নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে জন্মি নি।"

ব্রজবালা একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাথার কাপড় কখন্ যে পড়িয়া গেল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। মস্তক-সঞ্চালনে হীরকমণ্ডিত কর্ণভূষা দুলিয়া উঠিল এবং নিষ্প্রভ আলোক তাহার চক্ষুর ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বিপুল কেশভার ইতস্ততঃ ছুটিয়া আসিয়া ব্রজবালার মুখ চোখে পড়িল কেশগুচ্ছের মাঝে মাঝে ফুল—যেন ফণীর মাথায় মণি; আর যেন তাদের দুরন্ত শিশুরা এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ব্রজবালার চোখ-মুখের উপর হ'তে চুলগুলা সরাইয়া দিয়া পুনরায় বলিল, "আমি অন্তঃপুরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে জন্মি নি।"

রাজার কর্ণদ্বয় কথা কয়টা গ্রহণ করিল কি না, জানি না; কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় সে সময় বড় ব্যস্ত ছিল,—রাজা মুগ্ধনয়নে ব্রজবালাকে দেখিতেছিলেন। অবশেষে বলিলেন, "ব্রজবালা, তুমি রাগ কর বা কৌতুক কর, সকল অবস্থাতে তুমি সুন্দর। তুমি নিত্যসুন্দর—তুমি চিরসুন্দর।"

ব্রজবালার উত্তেজনা মুহূর্ত্তে নিবিয়া গেল; হাসিতে মুখখানি নাচিয়া উঠিল। তখন সে বুঝিল যে, তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে। একটু ব্যস্ততাসহ কাপড়টা আবার উঠাইয়া দিল। রাজার তখন চমক ভাঙ্গিল। ডাকিলেন, "ব্রজবালা!"

ব্রজবালা মুখের উপর কাপড় টানিল।

"অনঙ্গশিখারূপিণী—"

"তুহিনবিমণ্ডিত গিরিশিখর—"

"তুহিন-বিশুদ্ধ—কাছে এস।"

"ক্ষমা করিবেন।"

"তোমাতে কি নারীত্ব একটুকুও নাই?"

"এত দিনে তাহা জানিলেন?"

এমন সময় নিস্তলা আসিয়া সংবাদ দিল, দুর্গস্বামী গুপ্তচরের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

ব্রজবালা রাজার পানে চাহিল। রাজা তাহা লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "ব্রজবালা, বিধাতা তোমাকে অতুল রূপের, অশেষ বুদ্ধিবিবেচনার অধিকারিণী করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে হৃদয় দেন নাই।"

ব্রজবালা। উত্তম করিয়াছেন। হৃদয় দিলে হয় ত মাথা দিতেন না। তা'র চেয়ে আমি এ বেশ আছি।

অকস্মাৎ বাহিরে একটা গোল উঠিল। ক্ষণমধ্যেই নিস্তলা চঞ্চলচরণে আসিয়া সংবাদ দিল, শান্ত চোর ধ'রে এনেছে, ব্রজবালার বদন উৎফুল্ল হইল; রাজা বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। এ দিকে বাহিরে শান্ত বড় গোল করিয়া উঠিল। বোধ হয়, অযাচিতভাবে চোরটাকে উত্তম-মধ্যম কিছু প্রদান করিতেছিল; কিন্তু সে এ অকাতর দানের প্রতিবাদ করিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছিল। রাজার আদেশ পাইয়া নির্ম্মলা তাহাদের কক্ষমধ্যে আনিল।

চোরের দুই হাত গামছায় বাঁধা ছিল। নির্ম্মলা

আলোকে তাহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "এই সে চোর—মর্ মিন্‌ষে, মড়ার মত জলের উপর ভাস্‌ছিলি কেন ?"

লোকটা হাসিয়া উঠিল—পাগলের মত বিকট-ভাবে হাসিয়া উঠিল। রাজা চমকিয়া উঠিলেন; ব্রজবালা তীক্ষ্ণনয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

হাসি থামিবার আগেই লোকটা কাঁদিয়া উঠিল; এবং করুণস্বরে বলিল, "আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

শান্ত বলিল, "এত খাওয়ালাম, তবু পেট ভরে নি? আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর—বাইরে গিয়ে আবার কিছু দিচ্ছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে কোথায় পেলে শান্ত?"

"গড়খাইয়ের ভিতর মহারাজ!"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কি করছিল?"

"চুল বাঁধ্‌ছিল।"

"আ মর্ হতভাগা, আমার সঙ্গে ঠাট্টা!"

"আজ্ঞে না, আপনার সঙ্গে ও-কাজ ক'রতে পারি?"

পাগলের মস্তক মুণ্ডিত—গোঁফ-দাড়ি কিছু নাই। গাত্র উলঙ্গ—কোমরে একখানা সিক্ত বস্ত্র। লোকটা কৃশ, কিন্তু সবল। চক্ষু তীক্ষ্ণ, চিবুক ও নাসিকা বুদ্ধি-ব্যঞ্জক। মুখশ্রী অসুন্দর নহে। ব্রজবালা মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত লক্ষ্য করিয়া রাজাকে বলিল, "লোকটা অতি ধূর্ত্ত।"

শান্ত বলিল, "ঠিক বলেছেন রাণী-মা; লোকটা আমায় বড় বেগ দিয়েছে। আমি গিয়ে দেখি, এক-জন বাঙ্গালী গড়খাইয়ের ধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাকে চোর মনে ক'রে পিছন হ'তে জাপ্‌টে ধরলুম, সে-ও আমাকে ধরলে; আমি প'ড়ে গেলুম।"

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "জোরে বুঝি পারলি নি? তার পর কি হ'ল?"

শান্ত। তা'র পর আর কি হবে? তা'তে আমাতে খুব ভাব হ'য়ে গেল। সে তা'র নাম বল্লে, আমি আমার পরিচয় দেলাম—কাজের কথাও বল্‌লাম। সে তখন বল্লে, একটা মানুষকে গড়-খাইতে নামতে দেখে অনেকক্ষণ ধ'রে সে পাহারা দিচ্ছে। দুজনে তখন জলে নেমে দু'দিক্ থেকে তাড়া দিয়ে এই পাগলাটাকে ধরলুম। কি বল্‌ব রাণী-মা, সমস্ত পথটা হতভাগা আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে।

পাগল তখন সহসা মাটীতে শুইয়া পড়িয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিল। শান্ত দুই এক ঘা দিবার উপক্রম করিতেছিল: কেন না, এরূপ প্রহারের সুযোগ সচরাচর ঘটে না। কিন্তু রাজার দিকে চাহিয়া নিবৃত্ত রহিল।

ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "মই পেয়েছ শান্ত?"

"হাঁ, পেয়েছি—ওর হাতেই ছিল।"

পাগল তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল। নির্ম্মলা ভীত হইয়া ব্রজবালার কাছে সরিয়া গেল। ব্রজবালা নির্ম্মলার কাণে কাণে কি বলিল। নির্ম্মলা বাহিরে চলিয়া গেল এবং অচিরে দুই জন পাইক লইয়া কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিল। ব্রজবালা পাইকদের আদেশ করিলেন, "তোমরা এই লোকটাকে বেঁধে নিয়ে যাও এবং লোহা পুড়িয়ে গায় ছেঁকা দেও। যখন অপরাধ স্বীকার করতে রাজি হবে, তখন আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে। যদি পালায়, তা হ'লে তোমাদের কারও মাথা থাক্‌বে না—যাও।"

রাজা এতক্ষণ নীরব ছিলেন—ব্রজবালার কার্য্য-কলাপ নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এক্ষণে অবি-চার হয় দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কেন পাগলাটাকে শাস্তি দিচ্ছ রাণি? ছেড়ে দাও।"

ব্রজ। কা'কে আপনি পাগল বল্‌ছেন?

রাজা। কেন, এই লোকটা পাগল নয় কি?

ব্রজ। কোন কালে নয়। এর মত ধূর্ত্ত বদ-মায়েস খুব কমই আছে; (পাইকদের প্রতি) যাও—আমার হুকুম তামিল কর গে।

লোকটা তখন নাচ বন্ধ করিয়া দিয়া তীক্ষ্ণনয়নে ব্রজবালার পানে চাহিল; এবং পরক্ষণে মাটীতে পড়িয়া যুক্তকরে বলিল, "রাণী-মা, মারিতে হয় মারুন—কিন্তু আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে আমি কখন দেখি নি। আমি সকল অপরাধ স্বীকার করছি।"

রাজা বিস্মিত হইয়া বক্তার পানে চাহিলেন। ব্রজবালা ইঙ্গিত করিল,—প্রহরীরা কক্ষের বাহিরে দ্বারপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবালা তখন শয্যার উপর বসিয়া অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল, "সকল কথা এখন খুলে বল।"

"আমার নাম নটবর; আমি দনার্দ্দন রায়ের গুপ্তচর।"

"কি জন্যে এখানে এসেছ?"

"ক্ষমা করবেন রাণী মা; আমার নিজের অপ-রাধ স্বীকার করেছি, আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন্; কিন্তু অপরের নিকট বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারব না।"

রাজা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তোকে এখনি শূলে দেব।"

ব্রজবালা রাজাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নটবর, তুমি কা'র প্রজা ?"

নট। মহারাজের।

ব্রজ। যে দেশে তুমি ও তোমার স্ত্রীপুত্র জন্মেছে, সে দেশকে তুমি ভালবাস ?

নট। খুব বাসি।

ব্রজ। কে তোমার দেশকে নষ্ট করতে, তোমার স্ত্রী-পুত্রকে মেরে ফেল্‌তে এসেছে ?

নট। মুসলমান।

ব্রজ। সেই মুসলমানকে তুমি ভালবাস কি ?

নট। না—কখনই না।

ব্রজ। আর যে ব্যক্তি সেই মুসলমানকে সাহায্য করছে, তা'কে ভালবাস কি ?

নট। না—সে আমার শত্রু, আমার দেশের শত্রু।

ব্রজ। তোমার সেই শত্রু দনার্দ্দন বিশ্বাস-ঘাতকতা করছে—তোমার দেশকে শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে, তা কি তুমি জান না ?

নট। না, রাণী-মা, এত দিন তা বুঝতে পারিনি। শুনেছিলাম, দুর্গস্বামী দীনকৃষ্ণ ও বিদেশী সেনাপতি দু'টাকে মারবার জন্য এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে। মা, তুমি আমার ভ্রম ঘুচালে—আজ হ'তে তুমি আমার মা। মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাজা তখন নটবরকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। নটবর বিনা সঙ্কোচে এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র-রহস্য প্রকাশ করিল। সে বলিল, "দুর্গ ও প্রাসাদমধ্যেও অনেক ষড়যন্ত্রকারী আছে। দনার্দ্দন তাহাদের পত্র দিয়াছে; পত্রগুলি নটবর এক বৃক্ষকোটরমধ্যে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ষড়যন্ত্রকারীরা প্রত্যহ রাত্রি এক প্রহরের সময় সেই বৃক্ষকোটরে পত্রের অনুসন্ধান করে। নটবর সেই সকল ব্যক্তির নাম জানে না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আদেশমত পত্রগুলি সন্ধ্যার পর রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, অদ্য রজনী তৃতীয় প্রহরে দনার্দ্দন দুর্গ আক্রমণ করিবে। তাহার উপর দুর্গদ্বার মুক্ত রাখিবার ভার পড়িয়াছে, দুর্গদ্বার মুক্ত পাইলে দনার্দ্দন দুই চারি হাজার সৈন্য লইয়া চুপি চুপি দুর্গে প্রবেশ করিবে এবং তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা যোগদান করিবে।"

রাজা ও ব্রজবালা সকল কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। রাজা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য বলছিস্ ?"

নটবর উত্তর করিল, "মিথ্যা বলবার ইচ্ছা থাক্‌লেও আমার মায়ের কাছে মিথ্যা বলব না। আমার বড় দর্প ছিল, আমার মত বুদ্ধিমান্ পৃথিবীতে নেই; কিন্তু আজ আমি গুরু পেয়েছি—আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে।"

রাজা। দনার্দ্দন কোথায় আছে ?

নট। আজ কোথায় আছে, জানি না; দুই দিন আগে বিশালের উপকণ্ঠে করিম খাঁকে ঘিরে ফেল্‌তে দেখে এসেছি।

রাজা। দনার্দ্দনের সঙ্গে কত লোক ?

নট। অনেক লোক, কিন্তু সকলকে আন্‌বে না—বেশী সৈন্য আন্‌লে গোল হয়ে পড়বে—বাছা বাছা দু'চার হাজার আন্‌বে।

রাজা নিরুত্তর হইলেন। ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের সাঙ্কেতিক কথাটা কি ?"

"মহাপ্রভু।"

ব্রজবালা বলিল, "আচ্ছা যাও নটবর, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম; কাল সকালে যেখানে তোমার ইচ্ছা হয়, চ'লে যেও।"

নটবর বিস্মিত হইয়া ব্রজবালার পানে চাহিল। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া করযোড়ে বলিল, মা, আমাকে শাস্তি দেও—আমি মহাপাপিষ্ঠ। তোমাকে নিয়ে পালাবার ষড়যন্ত্র হয়েছে, তা'তেও আমি লিপ্ত আছি।"

ব্রজবালা। তা' হোক; তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি—তোমার ইচ্ছামত স্থানে যেতে পার।

নটবর। এতেও তোমার রাগ হ'ল না ? তুমি কে মা ? এত দয়া ত জগতে দেখি নি। আমাকে চরণে আশ্রয় দেবে কি ? আমি কোথাও আর যেতে চাই না।

রাজা বলিলেন, "এখানে থেকে ষড়যন্ত্রের সুবিধা কর্‌তে চাও বুঝি ?"

নটবর ক্ষুণ্ণমনে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রজবালা বলিলেন, "নটবর, তুমি আমার কাছে থাক—আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম।"

নটবর তৎক্ষণাৎ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল এবং সজল-নয়নে বলিল, "মা, আজ হ'তে জীবনে মরণে আমি তোমার চরণে বাঁধা রইলাম, আমার প্রাণ দিয়েও তোমাকে রক্ষা করব। নিশ্চিন্ত থাক মা।"

হরি হরি! নটবর কিরূপে রক্ষা করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে উভয়ে শিহরিয়া উঠিতেন।

নবম পরিচ্ছেদ

সকলকে বিদায় দিয়া রাজা ব্রজবালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি রাণি ?"

ব্রজবালা কি ভাবিতেছিল; সহসা কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি স্থির করিয়াছেন ?"

রাজা। আমি এখনও কিছু স্থির করি নি; বিপদ যত ঘনীভূত হচ্ছে, আমার বুদ্ধিও তত লোপ পাচ্ছে।

ব্রজ। তবে আমার পরামর্শমত কাজ করুন। এক জন লোককে দনার্দ্দনের কাছে পাঠিয়ে দিন; তাকে যেন নটবর পাঠিয়ে দিচ্ছে, এমনি ক'রে শিখিয়ে দেবেন। লোকটা গিয়ে যেন বলে, দুর্গদ্বার খোলা আছে। সাঙ্কেতিক কথা 'মহাপ্রভু' ব'লে দিতে ভুলবেন না।

রাজা। দনার্দ্দনের সাক্ষাৎ কোথায় সে পাবে ?

ব্রজ। কেন, নদী পার হয়ে মাটীতে কাণ পাতলেই বুঝা যাবে, কোন্ দিক হ'তে বিদ্রোহী সেনা আসছে।

রাজা। ব্রজবালা, তোমার বুদ্ধি অসাধারণ—

ব্রজ। আর একটা কথা স্মরণ রাখবেন। দুর্গের বাহিরে যেন দনার্দ্দনকে আক্রমণ করা না হয়। দুর্গদ্বার খুলে রাখ্‌বেন। যখন দেখ্‌বেন, দনার্দ্দন সসৈন্যে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করছে, তখন দুর্গদ্বার বন্ধ ক'রে তাদের আক্রমণ করবেন—একটা মানুষও যেন জীবন্ত ফিরে না যায়। তা' যদি পারেন, তা' হ'লে দনার্দ্দনের পিছনে আপনাকে আর ছুট্‌তে হবে না।

রাজা। তুমি ত বালিকা নও ব্রজবালা !

ব্রজবালা একটু হাসিল।

রাজা। তুমি ত সামান্যা নও রাণি।

ব্রজ। যে আপনার শিষ্যা, সে কি কখনও সামান্যা হ'তে পারে ?

রাজা। তুমি আমার শিষ্যা নও—তুমি আমার রাণী, আমার রাজ্যেশ্বরী। মহিষি, প্রাসাদে চল।

ব্রজ। সেখানে কেন ?

রাজা। যাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিব, তিনি এখানে থাকিতে পারেন না।

ব্রজবালার নয়ন জ্বলিয়া উঠিল—অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল, আত্মসংবরণ করিয়া ব্রজবালা বলিল, "আপনার দয়া—"

রাজা। আমার দয়া নয় ব্রজবালা। তুমি যে দেশে আসিয়াছ, সে দেশে বিশ্বাস ব'লে কোনও পদার্থ নাই। রাজ্যলাভে পুত্র পিতাকে, ভৃত্য প্রভুকে হত্যা করে। কোনও কর্ম্মচারী হয় ত মহিষীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে বিষ খাওয়াইতে পারে; পুত্র হয় ত কালাপাহাড়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিতে পারে। আমি বিশ্বাস ন্যস্ত করিতে পারি, এমন কোনও ব্যক্তি সংসারে আমার নাই। আমি সকলকে ভালবাসিতে চাই, কিন্তু কেহ আমাকে ভালবাসে না। আমি স্নেহ নিয়ে যাই, তারা স্বার্থ নিয়ে আসে। ব্রজবালা, আমি বড় দুঃখী। আমার মত দুঃখের বোঝা নিয়ে সিংহাসনে আজ পর্য্যন্ত কেহ বসে নাই। তুমিই কেবল একমাত্র নিঃস্বার্থ হৃদয় লইয়া আমার এই দুর্দ্দিনে, আমার বন্ধুরূপে, আমার শক্তিরূপে আসিয়া আমাকে বরণ করিয়াছ।

ব্রজবালা কাঁপিয়া উঠিল। তাহার দেহমধ্যে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। সে নিরুত্তর রহিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাসাদে কবে যাবে রাণি ?"

কম্পিতকণ্ঠে ব্রজবালা উত্তর করিল, "যবে আদেশ করিবেন।"

রাজা। বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এ স্থান এক্ষণে আর তত নিরাপদ নহে। দুই এক দিনের মধ্যে আমি সকল ব্যবস্থা করিব। উড়িষ্যার রাণী যে আদর, যে সম্মান কখন পান নাই, আমি সেই আদর, সেই সম্মানের ব্যবস্থা করিব।

বলিয়া রাজা প্রস্থান করিলেন।

ব্রজবালা ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতেই ব্রজবালা সংবাদ পাইল, দনার্দ্দন ধরা পড়ে নাই। দুই সহস্র সৈন্য লইয়া দনার্দ্দন দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই সে নিজে আক্রান্ত হইয়াছিল। অর্দ্ধেক সৈন্য রণক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দনার্দ্দন পলায়ন করিয়াছিল। শুনিয়া ব্রজবালা বড় ব্যথিত হইল। বুঝিল, তাহার উপদেশমত সকল কার্য্য করা হয় নাই। সত্যই তা করা হয় নাই। রাজা যখন প্রস্তাব করিলেন যে, দুর্গদ্বার খুলিয়া রাখিয়া দুর্গমধ্যে দনার্দ্দনকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হউক, তখন দীনকৃষ্ণ প্রভৃতি বড় বড় মহারথীরা কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না।

তাঁহারা বলিলেন, শত্রুকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতে পারে না। রাজা অবশেষে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ছয় হাজার সৈন্য লইয়া নদীপারে দনার্দ্দনকে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

গদাধরের প্রস্তাবও গৃহীত হয় নাই। তিনি যখন প্রস্তাব করিলেন যে, ছয় হাজার সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক দল পশ্চাৎ হইতে, অপর দল সম্মুখ হইতে দনার্দ্দনকে আক্রমণ করুক, তখন দীনকৃষ্ণ আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, অন্ধকার রাত্রে আমরা সৈন্য ছত্রভঙ্গ করিতে পারি না। রাজাও দীনকৃষ্ণের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। না দিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। তিনি সতত শঙ্কিত, পাছে সেনাপতিরা অসন্তুষ্ট হইয়া বিদ্রোহি-দলে যোগদান করে।

নদীপারে দনার্দ্দন আক্রান্ত হইয়া স্বল্পকাল যুদ্ধের পর পলায়ন-তৎপর হইল। পশ্চাৎ উন্মুক্ত, সহজেই পলায়নে সমর্থ হইল। অন্ধকার রাত্রে তাহার পশ্চাদ্ধাবন সেনাপতিরা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তাঁহারা দনার্দ্দনকে দূরীভূত করিয়া বিজয়গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু এ জয়ে ফললাভ কিছুই হইল না। দনার্দ্দন যেমন মুক্ত ছিল, তেমনই মুক্ত রহিল—বিদ্রোহীর দল যেমন পুষ্ট হইতেছিল, তেমনই পুষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে রাজা যুদ্ধের তৃতীয় দিবস প্রভাতে বিদ্রোহ-দমনার্থ সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তৎপূর্ব্বদিবস সন্ধ্যাকালে একবার ব্রজবালার গৃহে আসিয়া দর্শন দিলেন। ব্রজবালাও জানিত যে, রাজা তাহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া স্থানান্তরে যাইবেন না।

আজ আর ব্রজবালার বেশভূষার পারিপাট্য নাই। যাহা সচরাচর পরিয়া থাকে, তাহাই পরিয়া সে রাজদর্শনে আসিল। দর্পণে একবার মুখখানাও দেখিল না। রাজা সাক্ষাৎমাত্রেই বলিলেন, সত্যই ব্রজবালা, তলওয়ার ধরতে পারলেই মানুষ এক জন বড় রাজনীতিজ্ঞ বা দেশশাসক হ'ন না। তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য।"

ব্রজবালার অধরে একটু হাসি আসিল, কিন্তু ফুটিল না। রাজা বলিলেন, "তোমার পরামর্শানুসারে দনার্দ্দনকে যদি দুর্গের ভিতর আসিতে দিতাম, তাহা হইলে আজ এই বিপদের দিনে রাজধানী ছাড়িয়া বিদ্রোহীর পিছনে আমাকে ছুটিতে হইত না।"

ব্রজ। ভবিতব্য কে খণ্ডন করিতে পারে মহারাজ?

রাজার সমস্ত দেহ কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল; ব্রজবালা শিহরিয়া উঠিল; বলিল, "রাজা, হতাশ হবেন না—পুরুষকারে অদৃষ্টলিপি পরিবর্ত্তিত করুন।"

রাজা। সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হতেছে রাণি! বৈতরণী-তীরে কতলু খাঁর হস্তে কুজঙ্গাধিপতি পরাস্ত হয়েছেন।

রাণী। তা'তে আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। এখনও আমাদের যে সৈন্য আছে, তা'তে আমরা অনায়াসে পাঠানদের গঙ্গাপারে রেখে আসতে পারি। ভয় কি?

রাজা। তোমার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া চলিলাম রাণি। তুমি যাহা হয় করিও। আমার রাজ্য, আশা, সুখ—আমার ইহকালের যা' কিছু, সকলই তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া চলিলাম। কিন্তু—কিন্তু রাণি, জা'ন না, জীবনে আবার সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না।

রাণী। এত আশঙ্কা! তবে আপনি স্বয়ং না গিয়া আর কাহাকেও পাঠান।

রাজা। কা'কে আর পাঠাব রাণি? করিম শাকে পাঠালুম; সে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বিদেশী গদাধরকে পাঠাই, তা' তোমার ইচ্ছা নয়। খাওাইতদের মধ্যে এমন কোনও উপযুক্ত ব্যক্তি নেই, যা'কে আমি বিশ্বাস করতে পারি। যা'কে পাঠাব, সে-ই হয় ত বিদ্রোহিদলে যোগ দিয়ে বসবে। আমার বিপদ্ যত ঘনীভূত হয়ে আসছে, ততই সকলে স'রে দাঁড়াচ্ছে। এত অল্পদিনের মধ্যে এতটা পরিবর্ত্তন সম্ভবপর ব'লে কখন ভাবি নি।

ব্রজ। তবে এ সময় রাজধানী ছেড়ে দূরে যাবেন না।

রাজা। এখানে থাকলেই কি আমি পরিত্রাণ পাব? দুই চারি দিনের মধ্যে হয় ত গুপ্তঘাতকের হাতে আমার প্রাণ দিতে হবে। দূরে স'রে গেলে ষড়যন্ত্রটা কম হ'তে পারে। তুমিও সাবধানে থেকো রাণি, দুই জন বিদেশী ছাড়া বড় একটা কাউকে বিশ্বাস করো না।

ব্রজ। বিদ্রোহ কি তবে রাজধানীতেও বিস্তার লাভ করেছে?

রাজা। করেছে বই কি। সভাসদেরা যখন দুর্বিনীত ও অবাধ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাহারাও বিদ্রোহী বই কি। আজ যখন আমি আদেশ প্রচার করলুম, রাণী ব্রজবালা আমার অনুপস্থিতিতে আমার প্রতিভূস্বরূপ রাজ্যশাসন করবেন, তখন

এক জন মন্ত্রী স্পষ্টই ব'লে উঠ্‌ল, 'উড়িষ্যার সিংহাসন দুর্ব্বলচিত্ত রাজার ক্রীড়নক নয়—আমরা যাকে সিংহাসনে বসাইব, সেই সিংহাসনে বসিবে।'

ব্রজ। মন্ত্রীটা কে?

রাজা। ভৃগুরাম।

ব্রজ। আচ্ছা, আমি তাঁকে আর তার দলকে দেখে নেব—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা। যখন দেখিব, উড়িষ্যা আর রক্ষা হয় না, তখন পাঠানদের সঙ্গে সন্ধি করিব; উত্তর ভাগ তাদের দিয়ে দক্ষিণ ভাগ আমি লইব। তাই আমি দনার্দ্দনকে মারিয়া দক্ষিণ ভূমি নিষ্কণ্টক করিতে চলিলাম।

ব্রজ। আমিও কতকটা সেই উদ্দেশ্যে আপনাকে দক্ষিণে পাঠাইতেছি। আপাততঃ আমি উত্তর ভাগের ভার লইলাম। যত দিন না আপনি বা যুবরাজ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তত দিন আমি রাজধানী রক্ষা করিব।

রাজা উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসিল। তিনি কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "ব্রজবালা, একটা কথা তোমায় ব'লে যাই—হয়ত আর বলা হবে না। আমি তোমাকে যে ভাবে আগে দেখিতাম, এখন আর সে ভাবে দেখি না। আমার সে মোহ, সে রূপ-লিপ্সা কাটিয়া গিয়াছে—এখন তুমি আমার সে বিলাসের কামিনী, অন্তঃপুরচারিণী মহিষী নও—এখন তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী, সুখদুঃখভাগিনী সহধর্ম্মিণী।"

ব্রজবালার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল—একটা অননুভূতপূর্ব্ব তাড়িতপ্রবাহ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বহিয়া গেল; নীলপদ্ম দুইটি বারিভারে ধীরে ধীরে অবনত হইয়া আসিতে লাগিল। ব্রজবালা ভূপৃষ্ঠে সহসা বসিয়া পড়িল।

রাজার চক্ষু শুষ্ক ছিল না। তিনি বলিলেন, "ব্রজবালা, যখন দেখিবে, বিপদ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, রাজ্য আর রক্ষা হয় না, তখন তুমি আমার কাছে ছুটিয়া আসিবে। আমি রাজ্য ছাড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া, তোমায় লইয়া কোন এক দূরদেশে পলায়ন করিব। আমি সব ছাড়িতে পারি, কিন্তু তোমায় ছাড়িতে পারি না, ব্রজবালা! তুমি আমার সর্ব্বস্ব।"

ব্রজবালার বক্ষঃপঞ্জর কাঁপিয়া উঠিল; সমস্ত বুকখানার ভিতর একটা ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের আঘাতে উৎস-মুখের আবরণ সরিয়া গেল,—ব্রজবালা চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে স্রোত-স্তাড়নে আবর্জ্জনাও ভাসিয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "ব্রজবালা, কেঁদো না—তোমার কান্না দেখ্‌লে বুক ফেটে যায়।"

চক্ষের অঞ্চল না সরাইয়া ব্রজবালা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ক্ষমা করুন—আপনার পায়ে ধরি, আমার প্রতি আর দয়া দেখাবেন না।"

"দয়া কেন ব্রজবালা! আমার প্রেম, শ্রদ্ধা, ভক্তি—"

ব্রজবালার কান্না আরও বাড়িয়া উঠিল। বলিল, "আপনি জানেন না, আমি কে?"

রাজা। জানি বই কি ব্রজবালা! তুমি নির্ম্মল স্বচ্ছ অকলঙ্ক বারিধির জল—নানা ভাবে সতত উদ্বেলিত—নানা ভঙ্গিমায় চিরমনোহারিণী।

ব্রজ। আমার জীবন-কাহিনী শুনুন; শুনিলে আপনি আমায়—

রাজা। বারিধি-বক্ষে অনেক আবর্জ্জনা ভাসিয়া যায়, তবু লোকে তাকে প্রণাম করে। ব্রজবালা, তুমি আমার নমস্য।

ব্রজ। ছি ছি, অমন ক'রে বলবেন না—আমি মহাপাপিষ্ঠা। আমি স্বামী ত্যাগ ক'রে পরের নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করেছিলাম। সেখানেও উপখ্যাত হয়েছি। পরে আপনার নিকট স্বার্থপূর্ণ হৃদয় নিয়ে—

রাজা। ব্রজবালা, আমি এক দিন বেসর মহান্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমাতে আমাতে বিবাহ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কি না। মহান্তি উত্তর করেছিলেন, 'বিবাহ কতকটা হৃদয়ের বন্ধন, কতকটা সামাজিক বন্ধন—আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নেই।' ব্রজবালা, আমাকে বিবাহ করবে?

কথাটা ব্রজবালা ঠিক বুঝিল না; তাহার বুকের ভিতর তখন ঝড় বহিতেছিল। রাজা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল ব্রজবালা, আমাকে বিবাহ করিবে?—আমার পাটরাণী হইবে?"

এবার ব্রজবালা কথাটা প্রণিধান করিল। সে তখন চক্ষু হইতে অঞ্চল নামাইয়া মুখ তুলিল; এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে রাজার পানে চাহিয়া রহিল। রাজা বলিলেন, "ব্রজবালা, তুমি শতবার আমার নমস্য; তুমি দেবী।"

ব্রজবালা উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং রাজার পানে চাহিতে চাহিতে দুই এক পা পিছাইয়া গেল। পরক্ষণে অগ্রসর হইয়া রাজার সমীপবর্ত্তিনী হইল। রাজা সমস্ত প্রাণের চীৎকার কণ্ঠে আনিয়া ডাকিলেন, "আমার ব্রজসুন্দরি!"

ব্রজবালা ঝটিকামুখে বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার একখানি হাত তুলিয়া লইয়া নিজের মুখের উপর স্থাপন করিল। যে ব্যক্তি ব্রজবালার চরণাঙ্গুলি স্পর্শ করিতেও কখন অধিকার বা সাহস পায় নাই, সে আজ কম্পিতদেহা বেপমানা ব্রজবালাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া ব্রজবালার নয়ন হইতে অজস্রধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ব্রজবালা একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। রাজা বলিলেন, "ব্রজ, আর আমার যুদ্ধে যাওয়া হ'ল না।"

"কেন মহারাজ?"

"তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মন সর্‌ছে না।"

"আমি ত আপনার সঙ্গেই থাকিব। ভাবিবেন, রণক্ষেত্র আপনার কেলি-গৃহ, নররক্ত কুঙ্কুমের দাগ। আপনার বটিচর্ম্ম, আমার ভুজলতা, আপনার শাণিত কৃপাণ আমার দেহ। আর শত্রু-সৈন্যকে আমার সপত্নীবৃন্দ ভাবিবেন। আকাশকে আপনার রাজচ্ছত্র, পাহাড়কে আপনার রাজদণ্ড মনে করিবেন। অরণ্য-নদীকে আপনার প্রমোদগৃহের চিত্রাবলী ভাবিবেন। আপনি ত আপনারই গৃহে থাকিবেন মহারাজ!"

পঞ্চম খণ্ড

ব্যোম

আত্মবিসর্জ্জন

মানবী ও দেবী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহানদী-উপকূলে বহুদূর-বিস্তৃত বিশাল রাজ-প্রাসাদ। প্রাসাদটি একটি নগর-বিশেষ। তার পল্লী বা প্রাঙ্গণ আছে। আবার প্রত্যেক পল্লীর মধ্যে বড় ছোট অনেকগুলি বাড়ী। বাড়ীগুলি স্বতন্ত্র,—একের সহিত অপরের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। মহিলাবাস অষ্টম পল্লীতে। ব্রজবালা এই পল্লীতে স্থান পাইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহটি একটি প্রাসাদ-বিশেষ। ব্রজবালা এই প্রাসাদের নামকরণ করিয়াছিলেন—'চিত্রা।'

চিত্রা, নদীর ধারে—মধ্যে প্রাচীর ব্যবধানমাত্র। প্রাচীরের গায় ব্রজবালা একটা দ্বার ফুটাইয়া লইয়াছিলেন। সেই পথে রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ ও গুপ্তচরেরা রাণী ব্রজবালার আদেশমত যাতায়াত করিত। চিত্রার অপর তিন পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর উঠাইয়া ব্রজবালা তাঁহার প্রাসাদটিকে অন্যান্য মহিলাবাস হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন।

স্বতন্ত্র করিয়া ব্রজবালা প্রাচীরের ধারে ধারে প্রহরী বসাইয়াছিলেন। নদীর দিকে একমাত্র চিত্রা-প্রবেশের পথ ছিল; সেই পথে সকল সময়ে সতর্ক প্রহরিবৃন্দ থাকিত। সেই সব প্রহরিদলের নেতা গদাধর। রাণীর আজ্ঞা ব্যতীত গদাধর কাহাকেও ভিতরে আসিতে দিতেন না। তবে অনুগৃহীত অনুচর ও গুপ্তচরের গতিবিধি অবারিত ছিল।

চিত্রার একাংশে রাণীর মন্ত্রণাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে অংশে তিনি বাস করিতেন, সে অংশের সহিত মন্ত্রণাগারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। ভৃত্য বা প্রহরী মন্ত্রণাগারের অংশে থাকিত; দাসীরা রাণীর কাছে থাকিত।

চিত্রার চারি ধারে সুরম্য পুষ্পোদ্যান। উদ্যানমধ্যে নানা বর্ণের প্রস্তর স্থানে স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। কোথাও কৃত্রিম পাহাড়, কোথাও প্রস্রবণ; কোন স্থানে কৃষ্ণ প্রস্তরের বেদী, কোথাও মর্ম্মর-গঠিত স্তম্ভ। কোথাও রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত রমণীয় রমণী-মূর্ত্তি, কোথাও বা ধূসরবর্ণ প্রস্তরগঠিত বরণীয় বীরের মূর্ত্তি। শিল্প-কৌশল অতি চমৎকার। তাহার কিছু কিছু নিদর্শন ভুবনেশ্বরের অন্নপূর্ণা-মন্দিরগাত্রে আজও পাওয়া যায়।

এই বিশাল সৌধ, এই চিত্রতুল্য উদ্যান এক্ষণে ব্রজবালার। সে যা' চাহিয়াছিল, তাহাই পাইয়াছে। কিন্তু ব্রজবালা আর সে ব্রজবালা নাই—একদিনে সে বৃদ্ধা হইয়াছে তাহার চঞ্চল চক্ষু এক্ষণে স্থির হইয়াছে; গাম্ভীর্য্য আসিয়া তাহার মুখখানিকে আশ্রয় করিয়াছে। একটা দৃঢ়তা, একটা কমনীয়তা, একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ তাহার বদনমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে; যেন উষার দীপ্তি, যেন সন্ধ্যারতির দীপচ্ছটা প্রতিমার মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ব্রজবালার মাথার উপর একটা রাজ্যের দায়িত্ব-ভার। ব্রজবালা সে বোঝা অকাতরে মাথায় ধরিয়াছে। তবে যুবতী বৃদ্ধা হইয়াছে।

শুধু তাই নয়, ব্রজবালার হৃদয় ভিজিয়াছে। পাষাণী এক্ষণে সলিলপ্রবাহিনী। অভিমান, গর্ব্ব, তেজ, সলিল-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে; ব্রজবালা ভালবাসিতে শিখিয়াছে।

ব্রজবালা প্রাসাদে আসিয়া বেশ জমকাইয়া বসিয়াছে। প্রথমে রাজকর্ম্মচারীরা একটু মাথা নাড়া দিয়া ব্রজবালাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রজবালা চতুরতার সহিত তাহাদের মধ্যে কলহ বাধাইয়া দিয়া দুই দলের সৃষ্টি করিল। তখন সাহায্য ও পুষ্টির আশায় উভয় পক্ষ ব্রজবালার মুখাপেক্ষী হইল। অবশেষে এমনই অবস্থা দাঁড়াইল যে, ব্রজবালার হুকুম পালন করিবার জন্য উভয় পক্ষই ব্যাকুল ও লালায়িত হইল। এক পক্ষকে কোনও একটা কার্য্যভার দিলে, অপর পক্ষ ঈর্ষ্যান্বিত হইত। ব্রজবালা ঈর্ষ্যা জ্বালাইয়া দিয়া তখনই আবার তাহা নিবাইত। এইরূপে রাজ-প্রতিনিধি মহারাণী ব্রজবালা দুর্বিনীত মন্ত্রী ও সেনাপতিদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

রাণীর যদি মনোহারী রূপ না থাকিত, তাহা হইলে তিনি কৃতকার্য্য হইতেন কি না সন্দেহস্থল। রূপেতে ব্রহ্মাণ্ড আকৃষ্ট হয়। রূপ পুরুষ, গুণ শক্তি। রাণী যখন রূপ ও শক্তি লইয়া মন্ত্রণাগারে সিংহাসনে বসিতেন, তখন তাঁহার হুকুম অমান্য করিবার প্রবৃত্তি বা সাহস কাহারও হইত না। সেনানায়ক গদাধর সবিস্ময়ে দেখিতেন, রাজা মুকুন্দদেব যে সকল রাজ্য কর্ণধারকে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই, ব্রজবালা কয়েক দিনের মধ্যে তাহাদের বশীভূত করিয়াছে।

এক দিন অপরাহ্নে উদ্যানমধ্যে লতাকুঞ্জতলে কৃষ্ণপ্রস্তর-বেদীর উপর বিদ্যুল্লতার ন্যায় ব্রজবালা শয়ান রহিয়াছে। পার্শ্বে নির্ম্মলা বীণহস্তে উপবিষ্টা। কতকগুলা পাখী অনেক উচ্চে নীল আকাশের গায় ভাসিয়া যাইতেছে; আবার কতকগুলা পাখী আহার-অন্বেষণে পৃথিবীর উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে। ব্রজবালা একমনে পাখী দেখিতেছিল। বীণহস্তা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে বল দেখি?"

শায়িতা উত্তর করিলেন, "শুয়ে আছি ব'লে বলছ? কাল সমস্ত রাত্রি, আজ সমস্ত দিন একবারও শুইনি; তবু অভিযোগ।"

নির্ম্মলা। না গো, তা' নয়; তুমি কি এক রকম হয়ে গেছ।

ব্রজবালা। কি হয়েছে, বলে দেখ?

নির্ম্ম। তুমি বুড়োকে ভালবেসেছ।

ব্রজ। কা'কে, রাজাকে?

নির্ম্ম। হাঁ গো হাঁ। অমন কন্দর্প তুল্য দিগ্বিজয়ী স্বামী গেল, এখন কি না একটা বুড়োকে—

ব্রজ। ছি।

নির্ম্ম। কেন গো?

ব্রজ। যাঁর নিকট আমরা সকল বিষয়ে ঋণী, তাঁকে তাচ্ছীল্য করো না।

নির্ম্ম। বটে! এতদূর?

ব্রজ। আমার মনে হয়, আমি ছাড়া তাঁর জগতে কেহ নাই; সৈন্য, পুত্র, মহিষী সকলেই স্বার্থান্বেষী—

নির্ম্ম। আর তুমি বুঝি নিঃস্বার্থ?

ব্রজ। না, না; আমার মত প্রবল স্বার্থ ও দুরভিসন্ধি লয়ে কেহ কখন রাজদ্বারে আসে নি। আমি যা'কে প্রতারণা করতে এসেছিলাম, তার নিকট অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা পেয়েছি।

নির্ম্ম। তবে?

ব্রজবালা উত্তর করিলেন না। কথাটা তাঁর কাণে গেল কি না, বলা যায় না। কিন্তু তিনি কেমন একটু অন্যমনস্ক হইলেন। নির্ম্মলা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল; যখন দেখিল, কোনও উত্তর পাওয়া গেল না, তখন সে বলিল, "তবে আমি গান গাই।"

"গাও।"

নির্ম্মলা বীণা বাজাইয়া গান ধরিল,—

"কাঁহা মেরা মাধব, কাঁহা মেরা কান,
কাঁহা মেরা হৃদয়ক ধন;
অব ছিল নিয়ড়ে, কাঁহা গেল ভাগই,
অজানত ছিনু লেই মন।
সো মেরা নয়ন, সো মেরা গেয়ান,
সো বিনা কি কাজ জীবনে;
তমালে ছাড়ি লতা, চাঁদ ছাড়ি কমল,
কানু বিনে রাধা বাঁচে কি পরাণে।
মেরা লাজ সরম, মেরা ধরম করম,
সব ডারছু চরণে তাকর;
সো পুন আসবে, রাধা বলি ডাকবে
সো আশে রইছে পরাণ হামার।"

গান থামিল; কিন্তু ব্রজবালা নীরব রহিল। নির্ম্মলা সম্ভবত একটু সুখ্যাতি প্রত্যাশা করিয়াছিল। তাহা পাইল না দেখিয়া অথবা দ্বিতীয় গীত আরম্ভ করিবার অভিপ্রায়ে বীণার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। ব্রজবালা একটু বিরক্তির সহিত হস্তান্দোলনে তাহাকে নিষেধ করিলেন। নির্ম্মলা ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রজবালার পানে চাহিলেন; দেখিলেন, তাঁহার নয়ন মন একটা ফুলের প্রতি আবিষ্ট

রহিয়াছে। ফুলটি ক্ষুদ্র, কিন্তু সুন্দর—ছোট গাছের একটি কোমল শাখার মাথায় ফুটিয়া রহিয়াছে। পবন-হিল্লোলে শাখাটি প্রতিনিয়ত দুলিতেছে—কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন সম্মুখে, কখন বা পিছনে। একটা ভ্রমর সেই রূপময় মধুভরা ফুলটির উপর বসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছে না। যখনই ভ্রমর ব'সিতে যাইতেছে, তখনই ফুল হেলিয়া পড়িতেছে। ভ্রমর গুণ্ গুণ্ রবে সরিয়া আসিয়া আবার ফুলের উপর বসিবার প্রয়াস পাইতেছে। ফুল আবার দুলিয়া উঠিতেছে। ভ্রমর ক্রমে রাগিয়া উঠিল। তখন সে গুঞ্জন ছাড়িয়া ঝঙ্কার আরম্ভ করিল। ফুল তবুও চুম্বন দিল না। ভ্রমর একটু উপরে উঠিয়া গেল, তার পর তীব্রবেগে ফুলের উপর পড়িল। ফুল ঠিক সময়ে সরিয়া গিয়া ভ্রমরের আলিঙ্গন হইতে আত্মরক্ষা করিল। ভ্রমর তখন আত্মহারা হইয়া ফুলকে দলিত করিবার চেষ্টা পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ফুলকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ভ্রমরের ক্রোধ ও আগ্রহ ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ঝঙ্কারও ক্রমে তীব্র হইতে লাগিল। সে ঝঙ্কারের শব্দ ব্রজবালার কাণে বড় মধুর শুনাইতে লাগিল। সহসা ব্রজবালা বলিয়া উঠিল, "আমার একটা সুর মনে পড়েছে—বীণা দাও।"

নির্ম্মলা। সুর, না গান?

ব্রজবালা। গান নয়, সুর।

ব্রজবালা যে লতাকুঞ্জতলে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই কুঞ্জমধ্যে ছোট পাখীতে বাসা বাঁধিয়াছিল। একটা শাবক নীড়ের ভিতর হইতে ছিট্‌কাইয়া সহসা মাটীতে পড়িয়া গেল। ব্রজবালা তদ্দৃষ্টে বীণা রাখিয়া দিলেন এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া শাবককে লঘু-হস্তে তুলিলেন। দেখিলেন, সে বিশেষরূপে আহত হয় নাই। তখন তিনি অতীব যত্নসহকারে তাহাকে তাহার নীড়ে পুনঃ স্থাপন করিলেন। নির্ম্মলা তদ্দৃষ্টে বিস্মিত হইল।

এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "সেনাপতি গদাধর দর্শনপ্রার্থী হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান।"

ব্রজবালা বীণা পুনরায় রাখিয়া দিলেন। একটু কি ভাবিলেন; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার প্রয়োজন?"

"অত্যাবশ্যকীয় রাজকার্য্য।"

"মন্ত্রণাগৃহে তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বল গে—সেইখানে যথাসময়ে আমার দর্শন পাইবেন।"

দাসী প্রস্থান করিল, ব্রজবালা একটু অন্যমনস্ক হইলেন। নির্ম্মলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এখানে আসতে বল না কেন।"

ব্রজবালা উত্তর করিলেন না। নির্ম্মলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মনের জোর কতটা ভাব্‌ছ বুঝি?"

ব্রজবালা। তুমি আজও আমায় চিন্‌তে পারুলে না নির্ম্মলা! মনের গতি রোধ কর্‌তে কখন শিখি নি, চেষ্টাও করি নি। মন আমায় গৃহত্যাগ করিয়েছে; গদাধরের নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করিয়েছে; সেই মন এখন আমায় ব'লে দিচ্ছে যে, এই পক্ষি-শাবক অপেক্ষা গদাধর আমার নিকট প্রিয় নহে।

নির্ম্ম। তবে সঙ্কোচ কেন?

ব্রজ। সঙ্কোচ আমার মনে নেই; কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, গদাধর কেন সব ছেড়ে এখানে এসেছে?

এমন সময় কোথা হইতে নটবর ছুটিয়া আসিয়া রাণীর চরণে প্রণত হইল। ব্রজবালা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমায় আজ আমি কয়দিন দেখিনি নটবর।"

"মা, কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম।"

"বেশ। নির্ম্মলা, তুমি বাহিরে অপেক্ষা কর গে, এখানে যেন কেহ না আসে—সতর্ক থাকিও।"

নির্ম্মলা প্রস্থান করিল। রাণী তখন নটবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

নটবর মা, সংবাদ বড় গুরুতর। কতলু খাঁ নরাজের নিকটে এসে ছাউনি করেছে।

ব্রজ। বল কি?

নট। হাঁ মা।

ব্রজ। নরাজ পাহাড়ের নীচে হ'তেই না কাঠজুড়ি, মহানদীর গা ভেঙ্গে বেরিয়েছে?

নট। হাঁ মা।

রাণী। কতলু খাঁ কোন্ নদীর ধারে অবস্থান করছেন?

নট। কাঠজুড়ি। সেইখানে থাকাই সুবিধা। ইচ্ছা কর্‌লেই ছোট নদী পার হতে পারবেন। সেতু বাঁধবার আয়োজন হচ্ছে।

রাণী। তার পর?

নট। তার পর আর কি মা! নরাজ ত এখান হইতে বেশী দূরে নয়।

রাণী (চিন্তান্তে)। সেতু প্রস্তুত হতে কত সময় লাগ্‌তে পারে?

নট। ছোট নদী, কাল সন্ধ্যার মধ্যে শেষ হ'তে পারে।

রাণী আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

তাহাকে বিদায় দিতে না দিতে দ্বিতীয় চর আসিয়া সংবাদ দিল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ হ'তে প্রায় পনর হাজার বিদ্রোহী সেনা নিযে দনার্দ্দন, রাজধানী আক্রমণ করতে আসছে।

রাণী স্তম্ভিত হইলেন। বিপদের উপর বিপদ। রাণীর ত্রিশ হাজারের বেশী সৈন্য নাই; সম্মিলিত শত্রু-সৈন্যকে কিরূপে তিনি বাধা দিবেন?

তৃতীয় চর দ্বিজবর ক্ষণপরে আসিয়া সংবাদ দিল, দনার্দ্দন পতরক-গ্রামে অবস্থান করছে।

ব্রজ। পতরক কোথায়?

দ্বিজ। কাঠজুডির অপর পারে—চৌঘর হ'তে কিছু দূরে। এখান হ'তে দশ বারো ক্রোশ হতে পারে। আমার মনে হয়, রাজধানীর ভাবগতিক না বুঝে দনার্দ্দন চৌঘর অতিক্রম ক'রে বড় বেশী অগ্রসর হবে না।

দ্বিজবর বিদায় হইল। আরও দুই চারি জন চর আসিযা রাণীকে নানা সংবাদ দিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চরেদের বিদায় দিয়া রাণী সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। ভ্রমরের গুঞ্জন, ফুলের দুষ্টামি সকলই তিনি বিস্মৃত হইলেন। সূর্য্য অস্ত গেল—অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ঘিরিল, রাণীর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। দণ্ডের পর দণ্ড অতীত হইল—রাণী আত্মবিস্মৃতা; নির্ম্মলা অদূরে দণ্ডায়মানা।

অবশেষে রাণী চিন্তায় কূল পাইলেন। একটু হাস্য-রেখা তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে ভাসিযা উঠিল। তিনি মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, পৃথিবী অন্ধকারাভিভূতা। ডাকিলেন, "নির্ম্মলা!" নির্ম্মলা আসিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজার নিকট হ'তে লোক আসে নি?"

"কখন্ এসেছে। রোজ আসে, আর আজ আসবে না!"

"তাকে পাঠিয়ে দেও।"

সংবাদ-বাহক অচিরে আসিয়া প্রণাম করিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?"

"সংবাদ শুভ—রাজা ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছেন; বাধা দিতে বড় বেশী লোক নেই।"

ব্রজবালা বলিলেন, "সংবাদ অশুভ বল। যা হোক, রাজাকে সত্বর ফিরতে বলবে। তাঁকে জানিও যে, ধূর্ত্ত দনার্দ্দন ভূরিভাগ সেনা নিয়ে পাশ কাটিয়ে রাজধানীর কাছে চ'লে এসেছে। কয়েক সহস্রমাত্র বিদ্রোহী সেনা রাজাকে ভুলিয়ে ক্রমে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ দিকে কতলু খাঁ নরাজে উপস্থিত; দুই দল একত্র হয়ে কটক আক্রমণ করতে আসছে। বিপদ গুরুতর।"

সন্দেশবাহক বিদায় হইল। রাণী তখন উঠিয়া শয্যাগৃহে গমন করিলেন এবং উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত হইলেন। মাথায় মুকুট, কণ্ঠে মণিময় হার, প্রকোষ্ঠে হীরক-বলয় যত্নসহকারে পরিলেন। তিনি জানিতেন, ঐশ্বর্য্যবিমণ্ডিত রূপের বিশ্ববিমোহন শক্তি। তাঁহার দেশের মৃন্ময় প্রতিমা দেখিয়াই হয় ত তাঁহার এ ধারণা জন্মিযাছিল।

তিনি রূপ ও ঐশ্বর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া মন্ত্রণাগৃহে দর্শন দিলেন। যে বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাগৃহে রাজা বসিতেন, সেখানে রাণী বসেন না—রাজার সিংহাসনেও রাণী উপবেশন করেন না। রাজার মণিমুক্তাখচিত সিংহাসনখানি আনাইযা রাণী তাঁহার মন্ত্রণাগৃহের একটা উচ্চস্থানে স্থাপন করিয়াছেন; এবং সেই সিংহাসনের পাদদেশে একটা ক্ষুদ্র রত্নময় আসনে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

রাণী আসিযা তাঁহার আসনের উপর উপবেশন করিলেন। বসিবার পূর্ব্বে একবার রাজার সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, ইঙ্গিতে বুঝি প্রণাম করিলেন।

মন্ত্রণাগৃহে দীনকৃষ্ণ, গদাধর, করিম শা প্রভৃতি কয়েক জন সেনাপতি, ভৃগুরাম প্রভৃতি দুই চারি জন মন্ত্রী উপবিষ্ট ছিলেন। রাণী তথায় দর্শন দিবামাত্র সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; এবং রাণী আসন গ্রহণ করিলে সভাসদ্‌বর্গ স্ব-স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

এক জন সেনাপতি উঠিয়া দেখিয়া আসিলেন, মন্ত্রণাগৃহের চতুর্দ্দিকে প্রহরীরা সতর্ক আছে কি না। আর এক জন উঠিয়া দেখিয়া আসিলেন, মন্ত্রণাগৃহের দুইটি দ্বার ভিতর হইতে উত্তমরূপ অর্গলবদ্ধ ও তালা-বদ্ধ আছে কি না। তৃতীয় ব্যক্তি উঠিয়া প্রত্যেককে চুপি চুপি সাঙ্কেতিক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কাণে কাণে তাহার উত্তর দিলেন। তথায় তের জন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এই তের জনের সকলেই সকলকে চিনেন ও জানেন। তথাপি তিন জন কর্ম্মচারী উঠিয়া চিরপ্রথানুসারে তিনটি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অতঃপর সকলে

আসন পরিগ্রহ করিয়া অবনত-বদনে রাণীর আদেশ-প্রতীক্ষায় মৌনী হইয়া রহিলেন।

রাণী তখন ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। তাঁহার লজ্জাটা ঠিক তখনও ভাঙ্গে নাই। এতগুলা বড় বড় কর্ম্মচারীর সম্মুখে মুখ খুলিয়া কথা কহিতে কেমন একটু বাধ-বাধ ঠেকে। আগে কপালের উপর একটু কাপড় টানিতেন, এখন তার সে বাপড়টুকু নাই।

রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্যের কুশল ?"

সকলে একবাক্যে উত্তর করিলেন, "কুশল।"

রাণী। ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ?

সকলে। অক্ষুণ্ণ।

রাণী। রাজ্যে অশান্তি নাই ?

সকলে। নাই।

তার পর কার্য্যারম্ভ হইল। সেনাপতি দীনকৃষ্ণ বলিলেন, "কতলু খাঁ নবাব উপস্থিত হয়েছে।"

রাণী। আমি সে সংবাদ অবগত আছি।

সকলে বিস্মিত হইয়া রাণীর পানে চাহিলেন। রাণী বলিলেন, "আপনারা বোধ হয় একটা সংবাদ অবগত নহেন—"

সকলে। (একবাক্যে) কি, কি সংবাদ ?

রাণী। দনার্দ্দন রায় পনর হাজার সেনা নিয়ে পত্তরকে উপস্থিত।

সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

এ দিকে কথাটা শেষ করিয়াই রাণী অলক্ষ্যে ভৃগুরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তাহার বদন উৎফুল্ল, ক্ষণমধ্যেই সে আত্মসংবরণ করিয়া লইল। রাণীও নয়ন সরাইয়া লইয়া গদাধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কাল রাত্রিতে দনার্দ্দনকে চুপি চুপি আক্রমণ করতে হবে; আপনার উপর সে আক্রমণের ভার দিব স্থির করেছি।"

দীনকৃষ্ণ বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "রাণী-মা, রাজ্য বুঝি আর রক্ষা হয় না। এক দিকে কতলু খাঁ, অপর দিকে দনার্দ্দন। এ যাত্রা আমাদের আর রক্ষা নাই।"

রাণী একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "হস্তীর চতুর্দ্দিকে কুক্কুরের দল চীৎকার করে, কিন্তু সে কখন ভীত হয় না। আপনি কেন শঙ্কিত হইতেছেন সেনাপতি ? দুই দিনের মধ্যে দেখিবেন, শত্রু-সেনা ঝটিকা-মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে।"

বৃদ্ধ সেনাপতি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তা যদি করতে পার মা, তা' হ'লে চিরদিন তোমার সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে তোমার দাসত্ব করব।"

মন্ত্রী ভৃগুরাম ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন, "সেনাপতি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন,—স্ত্রী-কন্যার উপর নির্ভর না করিলে আর চলে না।"

ভৃগুরামের কথাটা কাণে না তুলিয়া দীনকৃষ্ণ বলিলেন, "এক দিন রাণী-মা, তোমার কথার অবাধ্য হয়ে দনার্দ্দনকে হারিয়েছি—রাজাকে বিপন্ন করেছি; আর কখন তোমার অবাধ্য হব না। কি করতে হবে আদেশ কর—আমার বিশ হাজার সেনা আছে।"

রাণী। তাই যথেষ্ট।

ভৃগুরাম থাকিতে পারিল না, বলিল, "তা' বই কি। কতলু খাঁর ত্রিশ হাজার বই ত আর সেনা নাই, আর দনার্দ্দনের মোটে পনর হাজার। আমাদের বিশ হাজার সেনাই যথেষ্ট।"

এ অবজ্ঞাপ সকলেই বুঝিল, কিন্তু কেহই তাহার কথার উত্তর করিল না। রাণী ক্রোধ দমন করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, "শুনেছি, মন্ত্রী ভৃগুরাম এক জন বড় যোদ্ধা। ভরসা আছে, তিনি আগামী কল্য রজনীতে আমাদের বিশেষ সাহায্য করিবেন।"

ভৃগুরামের বদন উৎফুল্ল হইল। তিনি বলিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি। আমার প্রতি কি আদেশ হয় ?"

"তা' কাল সন্ধ্যায় শুনিবেন।"

ক্ষণপরে সভাভঙ্গ হইল—কক্ষদ্বার উদঘাটিত হইল। একে একে সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেবল দীনকৃষ্ণ, গদাধর ও করিম খাঁ রহিলেন; রাণীর ইঙ্গিতানুসারেই তাঁহারা অবস্থান করিলেন। রাণী গদাধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি সৈন্য সহ প্রস্তুত থাকিবেন। এক সহস্র অশ্বারোহী লইবেন—পদাতিক লইবেন না। আগামী কল্য অপরাহ্ণে যাত্রা করিতে হইবে; তৎপূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাযথ উপদেশ লইবেন। এখন যাইতে পারেন।"

গদাধর প্রস্থান করিলেন। করিম খাঁ অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে রাণী বলিলেন, 'আপনিও আপনার সেনা নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন।"

"কোথায় যেতে হবে রাণীমা ?"

"তা' কাল সন্ধ্যায় শুনবেন।"

"আপনার হুকুমে আমি জাহান্নমে যেতে প্রস্তুত।"

করিম খাঁ প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বশেষে দীনকৃষ্ণ অগ্রসর হইলেন। রাণী বলিলেন, "আগামী কল্য মধ্যাহ্নে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

আপাততঃ এক শত তীরন্দাজ সেনা দয়াপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন—এখনই প্রয়োজন।"

"যথা আজ্ঞা" বলিয়া দীনকৃষ্ণ প্রস্থান করিলেন। গৃহ শূন্য হইল। রাণী তবু উঠিলেন না। তিনি নগরপালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য এক জন অনুচরকে অশ্বারোহণে পাঠাইলেন। এক দণ্ডের মধ্যে নগরপাল আসিয়া অভিবাদন করিলেন। রাণী কহিলেন, "আপনি এক জন রাজভক্ত প্রবীণ কর্ম্মচারী; আপনার উপর গুরুতর কার্য্যভার দিতেছি। কাঠজুড়ি নদী পারাপার হইয়া কাহাকেও যাইতে বা আসিতে দিবেন না।"

নগরপাল। সাঙ্কেতিক কথা বলিলেও না?

রাণী। সাঙ্কেতিক কথা বলিলেও না। আমার বিশেষ আদেশ বা আমার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র ভিন্ন কাহাকেও যাইতে আসিতে দিবেন না। যদি কেহ বলপূর্ব্বক অথবা লুকাইয়া যাইবার চেষ্টা করে, তা' হ'লে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিহত করিবেন। মোট কথা, নগর-বাহিরে আমার গুপ্তচর ও সৈন্য ছাড়া আর কেহ যায়, এটা আমার ইচ্ছা নয়।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

রাণী। আর এক কথা। আজ রাত্রে এক ব্যক্তি প্রাসাদ হইতে কোনও পত্র লইয়া গোপনে বাহির হইবে। আপনি তাহাকে ধরিয়া বন্দী করিবেন; এবং তাহার বস্ত্রমধ্যে যে পত্র থাকিবে, তাহা লইয়া আমার নিকট আসিবেন।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

রাণী। আরও একটি অনুরোধ আছে। যেখানে যত নৌকা পাবেন, সব ধরে এনে নগরতলে কাঠজুড়িতে রাখ্‌বেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সব নৌকা ঘাটে যেন প্রস্তুত থাকে।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা।

নগরপাল বিদায় হইতে না হইতেই এক জন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, একশত ধানুকী আদেশ অপেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান। রাণী তাহাদের দলপতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দলপতি আসিয়া অভিবাদন করিল।

রাণী তীক্ষ্ণনয়নে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছি, আপনি বালক"—

দলপতি। বয়সে জ্ঞান বা বুদ্ধির পরিমাপ হয় না, মহারাণি।

রাণী পরিতুষ্ট হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অধীনে কত তীরন্দাজ আছে?"

দলপতি। একশত।

রাণী। তাহারা শিক্ষিত?

দলপতি। তাহাদের লক্ষ্য অভ্রান্ত।

রাণী। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ?

দলপতি। আমার আদেশ পেলে তা'রা আমার পিতামহ দীনকৃষ্ণকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না।

রাণী। আপনি সেনাপতির পৌত্র? তবে আর আমার কোন সঙ্কোচ নাই। আপনার উপর গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিতেছি; ভরসা আছে, দীনকৃষ্ণের বংশধর কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না।

দলপতি নতমুখে রাণীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাণী বলিলেন, "আপনি বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, নরাজে কতলু খাঁ ও পতরকে দনার্দ্দন এসে ছাউনি করেছে। কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্ব অবগত নহে। আমার উদ্দেশ্য, তাহারা যেন সে সংবাদ অনবগতই থাকে। আপনি আপনার সেনা নিয়ে নরাজের চারি পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে এমনই ভাবে দূরে দূরে সেনা সংস্থাপন কর্‌বেন যে, নরাজের দিক্ হ'তে কোনও লোক পশ্চিমে না আস্‌তে পারে—পশ্চিমের লোকও নরাজের দিকে না যেতে পারে।"

দল। উত্তম; যদি কেহ যেতে চেষ্টা করে?

রাণী। নিষেধ কর্‌বেন; না শুনে, হত্যা করবেন।

দল। আর কিছু আদেশ আছে?

রাণী। আছে—মন দিয়া শুনুন। আগামী কল্য রাত্রি এক প্রহর বা দেড় প্রহরের সময় আপনি মাটীতে কাণ পেতে শুন্‌বেন। যখন বুঝবেন, অনেক সৈন্য আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন আপনি নদীর দিকে স'রে যাবেন। তাহারা আপনার অবস্থিতির স্থান অতিক্রম ক'রে চ'লে গেলে আপনি নিঃশব্দে নরাজের দিকে অগ্রসর হবেন। পথে সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন আপনি তাঁহার আদেশমত চলিবেন।

দল। মহারাণীর আদেশ শিরোধার্য্য—আমি এখনই যাত্রা করিলাম।

রাণী। নদীপার হবার সময় ছাড়্‌পত্র প্রয়োজন হবে—আপনি তা' নিয়ে যান।

বলিয়া রাণী তাঁহাকে একখানা ছাড়-পত্র লিখিয়া দিলেন। দলপতি বিদায় হইলেন। রাণী তখন নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া উড়িষ্যার মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাণী যখন মন্ত্রণা-গৃহ হইতে উঠিলেন, তখন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। দ্বিতলে শয়নকক্ষে আসিয়া দেখিলেন, নির্ম্মলা হর্ম্ম্যতলে নিদ্রাভিভূতা। রাণীর চক্ষে নিদ্রা নাই; তিনি বাতায়নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্রি, কৃষ্ণা দ্বাদশী। আকাশময় নক্ষত্র—পৃথিবীময় অন্ধকার। রাণী একখানা আসন টানিয়া লইয়া বাতায়নে বসিলেন।

রাণীর দৃষ্টি আকাশে,—যেখানে আলো, সেখানে দৃষ্টি। ভবিষ্যতে কি আছে, আলোকে বুঝি দেখা যায়। কিন্তু সামান্য আলোকে বুঝি তা' দেখা যায় না। রাণীর সমস্ত দেহ কাঁপাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, নগরপাল আদেশ প্রতীক্ষায় নিম্নতলে দণ্ডায়মান। রাণী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিলেন, নগরপাল প্রণাম করিয়া দাসীর হাতে একখানা পত্র দিল; বলিল, "রাণীমা যা' বলেছিলেন, তা' যথার্থ।"

রাণী দাসীর হাত হইতে পত্রখানা লইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন, পরে নগরপালের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রবাহককে বন্দী করেছেন?"

"হাঁ।"

"তাকে ছাড়্বেন না। সে কিছু স্বীকার করেছে?"

"সে বলেছে যে, মন্ত্রী ভৃগুরাম তা'কে দনার্দ্দনের নিকট পাঠিয়েছেন।"

রাণী একটু চিন্তাপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অধীনে কত শান্তি-রক্ষক সেনা আছে?"

নগরপাল। চারি হাজার তিন শত এগার।

রাণী। এই চারি হাজার সেনা আপনি কাল সন্ধ্যার সময় নদীর ধারে একত্র করবেন। দুর্গ হ'তেও কিছু সাহায্য পাবেন। এই সমবেত সৈন্য পশ্চিম-দিকে সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তার ক'রে নদীর ধারে ধারে স্থাপন করবেন। পরে অন্য উপদেশ দেব।

নগ। কোন্ নদী রাণী-মা?

রাণী। কাঠজুড়ি।

নগ। রাণী-মার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

রাণী। আপনি এখন যেতে পারেন। সাবধান, ছাড়পত্র না দেখালে কাউকে নগরবাহিরে যেতে দেবেন না।

নগরপাল প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাণীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া নগরপালের বড়ই শ্রদ্ধা-ভক্তি জন্মিয়াছে। তাঁহার এক্ষণে আশা হইয়াছে যে, রাণীর বুদ্ধিবলে রাজ্য-রক্ষা হইলেও হইতে পারে। তিনি রাণীর আদেশমত কার্য্য করিতে প্রাণপণে সচেষ্টিত।

রাণী পত্রখানা লইয়া আলোক-সাহায্যে পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"আগামী কল্য রজনীতে আপনি যখন অসতর্ক থাকিবেন, তখন বাঙ্গালী সসৈন্যে আপনাকে আক্রমণ করিবে। সাবধান।" পত্রের নিম্নদেশে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল, "কতলু খাঁ নরাজে উপস্থিত হয়েছে। রাজ্য আপনার, কিন্তু বাঙ্গালিনী আমার।"

শেষ ছত্রটা পড়িবামাত্র রাণীর বদন আরক্তিম হইল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "বটে!"

পত্রের নিম্নাংশ রাণী কাটিয়া ফেলিয়া দিলেন। প্রথমার্দ্ধ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়া উপরে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। রাণী দাসীকে ডাকিলেন; বলিলেন, "বোধ হয়, আমার অনুচরেরা ফিরিয়া আসিয়াছে; দেখ, বাহিরে কে?"

রাণীর অনুমান যথার্থ। চরেরা নগর-বাহিরে যাইতে পায় নাই, তাই ছাড়পত্র লইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। নগরপালের সতর্ক প্রহরায় রাণী পরিতুষ্ট হইলেন। সকলকে বিদায় দিয়া রাণী দুই জনকে রাখিলেন। এক জন নটবর, অপর দ্বিজবর। রাণী বাহিরে নটবরকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বিজ-বরকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। দাসী বাহিরে প্রহরায় রহিল। দ্বিজবর বুঝিল, একটা গুরু কার্য্যভার তাহার উপর অর্পিত হইবে। তাহার অনুমান যথার্থ। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিজবর, তোমার স্ত্রী-পুত্র কোথায়?"

দ্বিজবর। এই নগরে আছে রাণী-মা।

রাণী। দেশে মুসলমান এসেছে শুনেছ?

দ্বিজ। শুনেছি বই কি।

রাণী। তা'রা কি করতে এসেছে জান?

দ্বিজ। দেশ লুঠ করতে।

রাণী। শুধু তাই নয়; তোমার স্ত্রী-পুত্রকে মারতে, তোমার মন্দির ভাঙ্গতে, তোমার ঠাকুর-দেব-তাকে পোড়াতে তা'রা এ দেশে এসেছে। এখন ভরসা ভগবান্।

দ্বিজ। আর ভরসা আপনি রাণী-মা। আমায় কি করতে হবে, আদেশ করুন; আমার প্রাণ দিয়াও আপনার আদেশ পালন করব।

রাণী। তুমি এই পত্রখানা নিয়ে পতরকের পথ ধ'রে অশ্বারোহণে যাও। পতরকে যাবার দুটা পথ; যে পথ চৌদ্বরের ভিতর দিয়ে গেছে, সেই পথে যাবে। পতরক পর্য্যন্ত যেতে হবে না, পথমধ্যেই —সম্ভবত চৌদ্বরে—তুমি মুসলমান-বন্ধু দনার্দ্দনের সাক্ষাৎ পাবে। তাঁকে এই পত্রখানা দিয়ে বল্‌বে, মন্ত্রী ভৃগুরাম চিঠিখানা দিয়েছে। বুঝেছ কি?

দ্বিজ। বেশ বুঝেছি মহারাণি!

রাণী, দ্বিজবরের হস্তে ভৃগুরামের লিখিত পত্রখানা দিয়া বলিলেন, "দনার্দ্দন যদি জিজ্ঞাসা করে, কতলু খাঁ কতদূরে, তা হ'লে তুমি ব'লো ময়ূরভঞ্জে। পত্রখানা তুমি প'ড়ে দেখ। কি লেখা আছে, তোমার জেনে রাখা ভাল; কি জানি যদি পত্রখানা পথে হারিয়ে যায়। তখন তুমি বাচনিক সব বল্‌তে পার্‌বে।"

দ্বিজবর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্। মূর্খকে রাণী কখনও কোন কার্য্যভার দিতেন না। তিনি মানুষ অনেকটা চিনিতে পারিতেন। দ্বিজবর পত্রখানা পড়িয়া বিস্মিত হইল; বলিল, "চিঠিখানা কি সত্যই মন্ত্রী ভৃগুরামের লেখা?"

রাণী। হাঁ, দনার্দ্দন দেখিলেই ভৃগুরামের হস্তাক্ষর চিনিবে।

দ্বিজ। তবে এ চিঠি কেন দিতে যাচ্ছি মহারাণি? দনার্দ্দন যে সতর্ক হবে।

রাণী। আমার উদ্দেশ্য পরে বুঝ্‌বে। এখন একখানা চিঠি লিখতে হবে; আমি ব'লে যাই, তুমি লেখ।

দ্বিজবর কাগজ ও কলম সংগ্রহ করিয়া লইয়া লিখিতে বসিল। রাণী উৎকল-ভাষা শিখিয়াছিলেন, কিন্তু ভাল লিখিতে পারিতেন না। রাণী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, দ্বিজবর লিখিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে পত্র লেখা শেষ হইল। রাণী পড়িলেন,—

"মহামহিমান্বিত বীরকুলধুরন্ধর শ্রীযুক্ত দীনকৃষ্ণ রায় সেনাপতি বরাবরেষু।

আমাদের আশীর্ব্বাদ জানিবেন। আপনি বিদ্রোহী দনার্দ্দনকে বিতাড়িত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। আপনি এক্ষণে এখানে না ফিরিয়া আপনার সাত হাজার সৈন্যসহ চৌদ্বরে অপেক্ষা করিবেন। অদ্য রজনীতে আপনার সাহায্যার্থ পঞ্চ সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইবে। আপনি এই সমবেত সৈন্য লইয়া নরাজে কতলু খাঁকে আক্রমণ করিবেন। রাজধানী-রক্ষার্থে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য প্রস্তুত আছে; সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। ইতি—"

পত্রপাঠান্তে রাণী তদুপরি স্বাক্ষর করিলেন,—"রাণী ব্রজসুন্দরী"।

দ্বিজবর বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না রাণী-মা।"

রাণী পত্রখানা রাখিয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, "কাল রাত্রে বুঝতে পার্‌বে দ্বিজবর—আজ যাও।"

রাণী তাহাকে বিদায় দিয়া নটবরকে ডাকিলেন। কক্ষদ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ হইল। রাণী বলিলেন, "নটবর, সকলে আমাকে রাণী ব'লে ডাকে, তুমি কিন্তু মা ছাড়া আর কিছু বল না। সত্যই কি তুমি আমাকে মায়ের মত দেখ?"

নটবর। মহাপ্রভু জানেন, আপনাকে আমি মায়ের চেয়ে বড় দেখি। আপনি আমার স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয় দিয়েছেন—আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আমাকে ধন-দৌলত দিয়েছেন—

রাণী। বেশ; তবে আজ পুত্রের কাজ কর।

নট। কি আদেশ মা?

রাণী। বড় গুরুতর কাজ,—তোমার জীবনকে বিপন্ন করতে হবে।

নট। যে দিন মা, তোমার কাজে জীবন দিতে পারব, সে দিন আমার জীবন সার্থক হবে।

রাণীর নয়ন সজল হইল। তিনি বলিলেন, "রাজকার্য্যে তোমাকে পাঠাচ্ছি নটবর,—আমার কাজ হ'লে তোমায় পাঠাতুম না।"

রাণী তখন নটবরকে সবিশেষ উপদেশ দিলেন; বলিলেন, "তুমি আমার দূত—পতরকে সেনাপতির নিকট প্রেরিত হয়েছ। তুমি ভুল ক'রে পাঠান-শিবিরের নিকট গিয়ে পড়েছ। সেখানে তুমি ধৃত হ'লে এবং কতলু খাঁর সম্মুখে আনীত হ'লে, তোমার বস্ত্রমধ্যে এই পত্রখণ্ড পাওয়া গেল—"

বলিয়া রাণী, যে পত্রখানা ইতিপূর্ব্বে দ্বিজবর তাঁহার উপদেশানুসারে লিখিয়াছিল, তাহা নটবরকে পড়িয়া শুনাইলেন; এবং সেখানা তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন সব বুঝেছ? তোমার নিকট লুকাইবার কিছু নাই।"

নটবর। আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন মা। পুত্র কার্য্যোদ্ধার ক'রে আবার মায়ের চরণে প্রণাম করবে।

রাণী। অপরাহ্নে পাঠান-শিবিরের কাছে যাবে—তৎপূর্ব্বে নয়। কার্য্য গুরুতর; কিন্তু তোমার বুদ্ধি ও শক্তিও অসামান্য। এখন যেতে পার।

ছাড়-পত্র দিয়া রাণী তাহাকে বিদায় দিলেন। তখন পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরাজ-পাহাড়ের পাদমূলে পাঠান-শিবির। শিবির বহুদূরব্যাপী। অশ্বারোহী, পদাতি, গোলন্দাজ প্রভৃতি সকল রকমের সৈন্যে শিবির সমলঙ্কৃত। এই বাহিনীর নেতা প্রসিদ্ধ যোদ্ধা কতলু খাঁ।

শিবিরের এক প্রান্তে নদী-উপকূলে কতলু খাঁর বস্ত্রাবাস। তন্মধ্যে বিলাসিতার কোনও ত্রুটি নাই। সুন্দর গালিচা, সুন্দরী রমণী, কোমল শয্যা, মখমল-মণ্ডিত আসন, কিছুরই অভাব নাই। উত্তম সরাপ, সুগন্ধি তামাকু, আতর, গোলাব সকলই আছে। আবার সেই শয্যা ও আসনের আশে-পাশে শাণিত কৃপাণও রহিয়াছে। মুসলমান যেমন বিলাসী, তেমনই শক্তিশালী। আজিকার দিনে শক্তি গিয়াছে, বিলাসিতা আছে।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনাব পরদিন অপরাহ্নে কতলু খাঁ তাঁহার শিবিরে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সরাপও কিছু কিছু চলিতেছিল। কতলু খাঁর শিবিরে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী উপবিষ্ট ছিলেন। দুই চারি জন চাটুকারও ছিল।

কতলু খাঁ এক জন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "সেতু কি এখনও হয় নি, কাসিম?"

"না।"

"আর বিলম্ব কত?"

"রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে যে শেষ হয়, এমন অনুমান হয় না।"

"তবে আজও রাত্রি আমাদের এখানে কাটাতে হবে?"

এক জন চাটুকার বলিয়া উঠিল, "সে ত খুব মজা—যুদ্ধ ত আছেই।"

আর এক জন বলিল, "তবে নাচ্‌নেওয়ালী ডাকি?"

কতলু খাঁ রমণী ও সরাপের বড়ই অনুরাগী ছিলেন। যেখানে যাইতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দুই বস্তুই চলিত। যখনই কোন কাজ না থাকিত, তখনই সরাপ ও নৃত্যগীতাদি চলিত।

কতলু খাঁ একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, সহসা কোন উত্তর করিলেন না। চাটুকার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "নাচ্‌নেওয়ালী ডাকি?"

এমন সময় এক জন প্রহরী আসিয়া এত্তেলা করিল, "দুই জন গুপ্তচর ধরা পড়েছে।"

কতলু খাঁ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুপ্তচর? আমার শিবিরে!"

প্রহরী নিরুত্তর রহিল। এক জন কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ক'রে জান্‌লে, তা'রা গুপ্তচর?"

"এক জনের বস্ত্রমধ্যে একখানা চিঠি পাওয়া গেছে।"

"চিঠি কোথায়?"

"মনসবদারের কাছে।"

তখন মনসবদার ও বন্দিদ্বয়ের তলব হইল। তাহারা অচিরে আসিল। বন্দীদের এক জন পুরুষ, অপরা স্ত্রী। যে পুরুষ, সে আমাদের পরিচিত—নটবর। স্ত্রীলোকটিব সহিত আমাদের আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য পূর্ব্বে ঘটে নাই। কিন্তু নটবরের ঘটিযাছিল। কেন না, সে নটবরের অর্দ্ধাঙ্গিনী। নটবর তাহার ছেলেমেয়ে দুইটিকে রাণীর দ্বারদেশে ফেলিয়া রাখিয়া সস্ত্রীক এই বিপজ্জনক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। স্ত্রী ললাটী সানন্দে স্বামীর সঙ্গে আসিয়াছে। স্ত্রী, স্বামীর উপযুক্তা। সাহস ও চাতুরতায় স্ত্রী, স্বামী অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে—বরং একটু উপরে উঠে। সে কৃশা, কিন্তু সবলা; কৃষ্ণকায়া, কিন্তু সুন্দরী; বিগতযৌবনা, কিন্তু লাবণ্যময়ী।

নটবর বস্ত্রাবাসমধ্যে প্রবেশ করিয়াই সাষ্টাঙ্গে কতলু খাঁকে প্রণাম করিল—ললাটী, মনসবদারের দেখাদেখি সেলাম করিল। নটবর বলিল, "হুজুর!"

ললাটী ডাকিল, "বাদশা!"

কতলু খাঁ নিঃশব্দে তাহাদের আপাদমস্তক লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। পরে মনসবদারের দিকে ফিরিয়া ইঙ্গিত করিলেন। সে সেলাম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া সেনাপতির হস্তে পত্রখণ্ড দিল তিনি তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া অবশেষে কাসিম খাঁকে নিকটে ডাকিলেন। কাসিম উৎকল-ভাষা শিখিয়াছিল। কতলু খাঁ লিখিতে পড়িতে পারিতেন না, কিন্তু ভাষা বুঝিতে পারিতেন। সে সময় অনেক হিন্দু, মুসলমান, উৎকল-ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। সকলেরই লক্ষ্য তখন উৎকলের প্রতি। কেন না, একমাত্র উৎকলই সে সময় হিন্দু-স্বাধীনতা সগর্ব্বে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল।

সে যাহা হউক, দ্বিজবরের হস্তলিখিত পত্রখানা এক্ষণে কাসিম খাঁ কর্ত্তৃক সভামধ্যে পঠিত হইল। পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া সকলে চমকিত হইলেন। কতলু খাঁ কিছু বলিলেন না। নটবর তখন কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল এবং যুক্তহস্তে বলিল, "হুজুর, বাদশা, আমি কিছু জানিনে—"

"পত্র নিয়ে কোথায় যাচ্ছিলে ?"

"হুজুর, তা জানি নে।"

"কার কাছে যাচ্ছিলে ?"

"বাদশা, আমি কিছুই জানি নে।"

এক ভীষণ চপেটাঘাত নটবরের পৃষ্ঠোপরি পড়িল, আঘাতকারী আর কেহ নয়, তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গিনী। চড় খাইয়া নটবর "হুজুর" "হুজুর" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। ললাটী মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "বাদশার সাম্‌নে মিছে কথা! বাদশা যখন দেশে এসেছেন, তখন তোর রাণীর রাজত্ব উঠে গেছে। সত্যি কথা বল্।" পরে কতলু খাঁর দিকে ফিরিয়া বলিল, "বাদশা, ও সব জানে।"

কতলু খাঁ, ললাটীর ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি জান, বল ত।"

ললাটী তখন বলিতে লাগিল, "আমাদের দেশে একটা বাঙ্গালী মেয়ে এখন রাজা হয়েছে না? এই মিন্‌ষে তা'কে খুব ভালবাসে; যেখানে সেখানে তা'র চিঠি নিয়ে যায়। আমি কিছুতেই হতভাগাকে ঘরে ধ'রে রাখ্‌তে পারি নে। আজ ক'দিন ঘরে আসে নি, তাই ধ'রে আন্‌তে গিছলুম। নগরের কাছে দেখা হ'ল। হতভাগা কিছুতেই আমার সঙ্গে আসবে না; বলে, আমি চৌঘরে যাব। আমি বলি সামুটী যাবে। ও পশ্চিমে যাবে; আমি পুবে যাব, তা' বাদশা, আমার সঙ্গে ও পারবে কেন, আমি এতদূর টেনে এনেছি। এখান থেকে আমার বাড়ী বেশী দূর নয়।"

কতলু খাঁ এতক্ষণে বুঝিলেন, চৌঘরের দিকে না গিয়া নরাজের দিকে কেন আসিয়া পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্দি, সত্য বল, কার কাছে পত্র নিয়ে যাচ্ছিলে ?"

বন্দী কাঁদিতে লাগিল। বন্দিনী মুখভঙ্গী করিয়া তাহার মুখের কাছে হাত-পা নাড়িল; বলিল, "কেমন, এখন যাও তোমার সেনাপতির কাছে।" তা'র পর কতলু খাঁর দিকে ফিরিয়া তিন সেলাম ঠুকিল; বলিল, "ও মিন্‌ষে সেনাপতির কাছে যাচ্ছিল। তিনি একটা মস্ত যুদ্ধ জিতে চৌঘরে ব'সে হাওয়া খাচ্ছেন। বাদশা-মশাই, কোন রকমে এই বাঙ্গালী মেয়েটাকে আমাদের দেশ হ'তে তাড়াতে পার ? মেয়েটা মন্ত্রী-গুলোকে ভেড়ো করেছে, রাজাকে তাড়িয়েছে, দনার্দ্দনকে বন্দী করেছে, মেয়েটা সব পারে।"

কতলু খাঁ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন বলছ, তখন তাকে তাড়াব। এখন তোমরা বাইরে যাও।"

ললাটী যুক্তকরে বলিল, "বাদশা-মশাই, আজ আমাদের এখানে থাক্‌তে দিন। যদি নিতান্তই এখানে স্থান না দেন, তা হ'লে একটা লোকের হুকুম হোক—আমাদের সঙ্গে যাবে, মিন্‌ষেটাকে আর টেনে নিয়ে যেতে পারছি নে।"

কাসিম খাঁ হাসিয়া বলিলেন, "আজ তোমরা দুজনেই বাদশার অতিথি হয়ে এইখানেই থাক।"

ললাটী প্রফুল্ল-বদনে "বেশ" বলিয়া প্রহরীর সঙ্গে বাহিরে আসিল, নটবরও অবশ্য তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল। কিন্তু তাহারা বন্দী হইয়া রহিল না—শুধু নজরবন্দী রহিল। নটবর ও ললাটী উভয়েই জানিত, কোন কারাগার বা প্রহরী তাহাদের দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিতে সমর্থ নহে।

বন্দীদের বিদায় দিয়া কতলু খাঁ মন্ত্রণা আঁটিতে বসিলেন। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, আপাততঃ রাজধানী আক্রমণ করিতে যাওয়া বৃথা প্রয়াস; কেন না, তথায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য অবস্থান করিতেছে। তা' ছাড়া শত্রুকে পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। দীনকৃষ্ণ রায় বারো হাজার সৈন্য লইয়া পিছনে থাকিলে রসদ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। বড় বড় সৈনিক কর্ম্মচারীরা পরামর্শ দিলেন, "দীনকৃষ্ণ আমাদের আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আমরাই আগে তাহাকে আক্রমণ করি।" পরামর্শটা কতলু খাঁ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। জনৈক সৈনিক বলিলেন, "দীনকৃষ্ণের বারো হাজার সেনা আমরা ফুৎকারে উড়ায়ে দেব।"

এক জন চাটুকার বলিল, "কিন্তু নাচটা হ'ল না।"

কতলু খাঁ সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু অন্ধকারে লুকিয়ে চুপি চুপি আক্রমণ করতে হবে। আমাদের সৈন্য বেশী ক্ষয় না হয়, সেটাও ত দেখ্‌তে হবে।"

পরামর্শটা স্থির হয়ে গেল। তখন পথপ্রদর্শক-দের তলব পড়িল। তাহারা বলিল, "চৌঘর বেশী দূর নয়—পাঁচ সাত দণ্ডের মধ্যে তথায় পৌঁছন যেতে পারে।

এখন পাঠানবাহিনী সাজিতে লাগিল। রাজধানী আক্রমণের কথাটাই সৈন্য-দলের মধ্যে প্রচার রহিল। রাত্রি যখন একপ্রহর, তখন কতলু খাঁ প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া চৌঘরের পথ ধরিলেন। শিবির-রক্ষার্থে দুই হাজার সৈন্য রহিল। অন্ধকার রাত্রি—পথ দেখা যায় না; তবু কতলু খাঁ নির্ভয়ে অজ্ঞাতপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নটবর

সস্ত্রীক কিছুদূর পিছনে পিছনে আসিয়াছিল; তার পর সুবিধামত স্থানে সরিয়া পড়িল; এবং রাণীকে সংবাদ দিতে অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে ধাবিত হইল।

ঠিক সেই সময়ে চৌঘরে দনার্দ্দন রায় চমৎকার কৌশলে সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক বলিতেছিলেন,"আজ বাঙ্গালীকে জালে ফেল্‌বে,পঞ্চাশ হাজার সেনা নিয়ে এলেও তার নিস্তার নেই।"

দনার্দ্দনকে আমরা একবার বহুপূর্ব্বে ত্রিবেণী-ক্ষেত্রে দেখিয়াছিলাম। তখনও সর্প, এখনও সর্প। তবে তখন পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন ছিল, এক্ষণে প্রকাশ্য রাজপথে বিচরণ করিতেছে। ভৃগুরাম আজও প্রচ্ছন্নতা ত্যাগ করে নাই। দনার্দ্দনের বড় ইচ্ছা, ভৃগুরাম সদলে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। তাই দনার্দ্দন, ভৃগুরামের পত্রোত্তরে লিখিয়াছিল,"আপনার পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম, বাঙ্গালীর অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইবে। আপনি স্বয়ং আসিয়া দেখিবেন, ইহা আমার সবিশেষ অনুরোধ।"

দ্বিজবর, ভৃগুরামের পত্র বহিয়া আনিয়াছিল; আবার উত্তরও লইয়া গিয়াছিল। যখন সে উত্তর লইয়া রাজধানীতে পৌঁছিল, তখন সূর্য্যদেব নীলাচলের অন্তরালে লুকাইয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাণী ব্রজবালা বড়ই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, নটবরের কার্য্যতৎপরতার উপর তাঁহার বিপুল আয়োজনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। যদি তাহার দৌত্য নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে রাজ্য অধিকতর বিপন্ন হইবে। কিন্তু নটবর কি অকৃতকার্য্য হইবে? রাণী যখন নটবরের পুত্রকন্যার নিকট শুনিলেন, নটবর সস্ত্রীক গিয়াছে, তখন তিনি কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। রাণী জানিতেন, ললাটী স্থিরবুদ্ধিশালিনী। তিনি তদ্ধেতু তাহাকে একটু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহার বসবাসের জন্য নগরমধ্যে দিব্য একটি বাড়ী দিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে রাণী প্রাসাদ চূড়ায় উঠিয়া অস্থিরচিত্তে পাদচালনা করিতেছিলেন। এক একবার দূরবর্ত্তী পথপানে দেখিতেছিলেন। নটবর বা দ্বিজবর কাহাকেও না দেখিয়া আবার পরিক্রমণ করিতেছিলেন। একবার চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, সূর্য্য রক্তবদন; নীলাচল অবগুণ্ঠিত; মহানদী রোরুদ্যমানা। নগর নীরব, স্তম্ভিত। দুর্গ চকিত, সন্ত্রস্ত। একটা ভয়, একটা বিষাদ, একটা আতঙ্ক যেন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রবল শত্রু দ্বারে—আক্রমণোদ্যত। কেহ কেহ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারা এক জনের মুখ চাহিয়া আজও আছে। সেই এক জন আবার রমণী, বয়সে তরুণী। রাণী সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া একবার আকাশপানে চাহিলেন। বুঝি বা শক্তি খুঁজিতেছিলেন।

রাণীর হাতে একখানি উড়িষ্যার মানচিত্র ছিল। পতরক, নরাজ, চৌঘর প্রভৃতি স্থান কোথায়, কোন্ দিকে, তাহা শতবার দেখিয়াছেন; তবু সে মানচিত্রখানি ছাড়িতে পারেন নাই। বারম্বার তাহা দেখিতেছিলেন। যখন অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, তখন রাণী সেখানি গুটাইয়া লইয়া ছাদের উপর বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "মন্ত্রণাগৃহে সেনাপতি দীনকৃষ্ণ, গদাধর, করিম শা, ভৃগুরাম, নগরপাল প্রভৃতি মহারাণীর অপেক্ষা করিতেছেন।" রাণী উঠিলেন না—বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। ক্ষণপরে দ্বিতীয় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "দ্বিজবর প্রণাম করিতে আসিয়াছে।" রাণী তখন ঝটিতি উঠিয়া ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্বপরিচিত ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বিজবরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একখানি ছোট চৌকীর উপর কুসুমকোমল শয্যা বিস্তৃত ছিল, রাণী তদুপরি উপবেশন করিলেন।

দ্বিজবর, রাণীর চরণে প্রণাম করিয়া দনার্দ্দনের পত্র দিল। ঘরে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। রাণী তদালোকে পত্র পাঠ করিলেন। পাঠান্তে রাণীর বদন প্রফুল্ল হইল; তাঁহার মনে আবার শক্তি ও সাহস ফিরিয়া আসিল। তিনি ভাবিলেন, "যখন এক স্থানে কৃতকার্য্য হয়েছি, তখন অপর স্থানেও কৃতকার্য্য হব—নিশ্চয় হব।"

রাণী তখন দ্বিজবরকে বিদায় দিয়া নগরপালকে ডাকিলেন, এবং চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিলেন। নগরপাল ফিরিয়া গিয়া ভৃগুরামকে বলিলেন, "রাণী মা আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন।"

সর্ব্বাগ্রে ভৃগুরামের খাতির। সে গরবে ফুলিয়া উঠিল। বক্রভাবে দীনকৃষ্ণের প্রতি একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভৃগুরাম, নগরপালের অনুগমন করিল। কিন্তু নগরপাল তাহাকে রাণীর নিকট না

লইয়া গিয়া অন্য একটা ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন ; এবং তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে দুই জন সশস্ত্র প্রহরী দ্বারের দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল, ভৃগুরাম বিনা গোলযোগে সকলের অজ্ঞাতসারে বন্দী হইলেন।

রাণী তখন দানকৃষ্ণ প্রভৃতিকে একে একে ডাকিয়া পাঠাইয়া চুপি চুপি উপদেশ দিতে লাগিলেন। গদাধরের ডাক পড়িল, সকলের শেষে। রাণী তাঁহাকে যথাযথ উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। কিন্তু গদাধর নাড়লেন না—দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি ?"

গদাধর। শুনিতেছি, পতরকে শত্রু নাই—নগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তা' আমি পতরকে শত্রুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া কি করিব ?

রাণী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। গদাধর বলিলেন, "যাহারা যুদ্ধব্যবসায়ী, তাহাদের মতামত লইয়া কার্য্য করা উচিত। আপনি কখন উলঙ্গ কৃপাণও—"

রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার নিকট উপদেশ চাহি নাই—উপদেশ দিতে আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আদেশ-প্রতিপালনে আপনার অনিচ্ছা থাকে, আপনি এই মুহূর্ত্তে উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন—উড়িষ্যার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

গদাধর দাঁড়াইয়া স্থিরদৃষ্টে ব্রজবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। ব্রজবালা তদ্দৃষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি স্থির করিলেন ?"

গদাধর উত্তর করিলেন, "স্থির করিলাম, সাত বৎসর পূর্ব্বে যাহাকে ক্ষুদ্র পল্লীমধ্যে দেখিয়াছিলাম, তাহাকেই আজ সম্মুখে দেখিতেছি। আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিলাম ; কিন্তু রাজ্য যেন উৎসন্ন না যায়—এক রাত্রির মধ্যে উড়িষ্যার স্বাধীনতা যেন বিলুপ্ত না হয়।"

রাণী চমকিয়া উঠিলেন। সত্যই কি তিনি ভুল বুঝিয়া রাজ্য উৎসন্ন দিতে বসিয়াছেন ? রাণী চিন্তামগ্ন হইলেন। নিজের সুখসমৃদ্ধির প্রতি তাঁহার আর লক্ষ্য নাই ; নিজের আগে—রাজার আগে, এক্ষণে উড়িষ্যা।

রাত্রি একপ্রহর তদবস্থায় অতিবাহিত হইল। সহসা এক জন দাসী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাণীর চিন্তাস্রোতে বাধা দিল। রাণী একটু বিরক্ত হইলেন। দাসী বলিল, "রাজার নিকট হ'তে দূত এসেছে।"

রাণী তাহাকে আসিতে ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন। দূত আসিয়া অভিবাদনান্তে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি রাজার। রাণী পড়িলেন,—

"আমার রাজ্যেশ্বরী আমার সর্ব্বস্বধন !"

রাণীর চক্ষে জল আসিল। দাসী ও দূতকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রাণী পুনরায় পত্রপাঠে মনোযোগী হইলেন। পড়িলেন,—"আমার রাজ্যেশ্বরী আমার সর্ব্বস্বধন ! রাজ্যময় তোমার সুনাম, তোমার যশ। যাহাদের আমি আয়ত্ত করিতে পারি নাই, তাহারা তোমার বশীভূত। যে একতা স্থাপন করিতে এতকাল আমি বৃথা চেষ্টা করিয়াছি, তুমি স্বল্পকালমধ্যে তাহা স্থাপন করিয়াছ। ব্রজসুন্দরি, তুমি অতুলনীয়া।

"কিন্তু আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা। উড়িষ্যার পতন অনিবার্য্য। বেসর মহান্তি এক দিন বলিয়াছিলেন, 'যখন উড়িষ্যায় স্বদেশবৈরী বিশ্বাসঘাতক জন্মিবে, তখন উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে।' আজ সে দিন সমাগত। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের বৃথা প্রয়াস রাণি !

"আর শুনিলাম, কতলু খাঁ বহু সৈন্যসহ রাজধানীর সন্নিকটে পৌঁছিয়াছে। দনার্দ্দনও প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার সৈন্য লইয়া নগর আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে। এই বিপুল শত্রুবাহিনীকে বাধা দিবার উপযোগী সেনা রাজধানীতে নাই। আমি ও যুবরাজ ভূরিভাগ সৈন্য লইয়াছি। অতএব এক্ষণে রাজধানীতে অবস্থান নিরাপদ নহে। তুমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তোমার সৈন্যসহ আমার সহিত সম্মিলিত হইবে। উড়িষ্যার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা ঘটিবে—তুমি বা আমি রোধ করিতে পারিব না। যদি কখন সুবিধা ও সুযোগ পাই, তখন আবার চেষ্টা দেখিব।

"আমি ফিরিলাম—তোমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আমি রাজধানীর দিকে ফিরিলাম। তুমি আসিবে। রাজ্যের চেয়ে—সকলের চেয়ে তুমি বড়। তুমি আসিও।—তোমার মুকুন্দ—"

ব্রজবালার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ হইতে বিনির্গত হইল, "ছি ! ছি !"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এ দিকে কতলু খাঁ বড় মুস্কিলে পড়িলেন। চৌঘরের সন্নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বুঝিলেন, তিন দিক্ হইতে শর নিক্ষিপ্ত হইতেছে। পশ্চাৎ উন্মুক্ত ; কিন্তু

পাঠান সহজে পশ্চাৎ ফিরে না। তিনি পিছু ফিরিলেন না; বরং দ্রুতপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া শত্রুর সমীপস্থ হইতে চেষ্টা করিলেন। তখন তিনি ব্যূহ-রচনা করিয়া বন্দুকধারী সৈন্যদের সম্মুখে ও পার্শ্বে আনিলেন। তাঁহার দুইটা কামান ছিল; কিন্তু তিনি তাহা সঙ্গে আনেন নাই—শিবিরে রাখিয়া আসিয়াছেন। অতএব বন্দুকের উপর নির্ভর করিয়া গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে বড় ফললাভ হইল না; কেন না, শত্রু অদৃশ্য।

কতলু খাঁর সঙ্গে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তিনি সেই সৈন্যদের সঙ্গে লইয়া বেগভরে অগ্রসর হইলেন। অচিরে শত্রুর দর্শন মিলিল; তখন পাঠান-সৈন্য বিপুল উৎসাহে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সে সময় যদি কেহ পাঠানদের বলিত, 'তোমরা এ কি করিতেছ?—মিত্র দনার্দ্দনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছ?' তাহা হইলেও তাহারা তখন ফিরিত না। কেন না, তাহারা দাঁড়াইয়া মার খাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পাঠান ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল; দনার্দ্দন রায় হটিতে লাগিল। এ দিকে পাঠানের পার্শ্বদেশে মাটীতে শুইয়া যাহারা শরনিক্ষেপ করিতেছিল, তাহারা যুদ্ধের ভাব বুঝিয়া সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু পাঠান সরিতে দিল না। পাঠান-বাহিনীর বিসর্পিত বিপুল দেহ ঘুরিয়া ধানুকীদের বেষ্টন করিল। ধানুকীদের বড় বেশী কেহ পলাইতে পারিল না। জঙ্গল নিকটে ছিল না, নদীও দূরে। যাহারা নদীর দিকে ছিল, তাহাদের কিছু সুবিধা হইল; তাহারা ছুটিয়া গিয়া নদীর জলে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল।

দনার্দ্দন যখন বুঝিল, 'বাঙ্গালী' তাহাকে আক্রমণ করে নাই—পাঠান-বাহিনী আক্রমণ করিয়াছে, সে তখন যুদ্ধ বন্ধ করিতে মনস্থ করিল; কিন্তু বন্ধ করিলে নিজেই মুহূর্ত্তে ধ্বংস হইয়া যায়। দনার্দ্দন দুই একবার কতলু খাঁর নিকট আত্মপরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। তখন দনার্দ্দন অনন্যোপায় হইয়া পলায়নতৎপর হইল। সে উদ্যমে দনার্দ্দনের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হইল। অব-শিষ্টাংশ লইয়া দনার্দ্দন যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে পলায়ন করিল। শ্রান্ত পাঠান-সৈন্য অন্ধকারের ভিতর আর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল না।

দনার্দ্দন পথে যাইতে যাইতে পশ্চাতে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইল। ভাবিল, পাঠানেরা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছে। সে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। দুই এক দণ্ড পরে কামানের শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। তখন সে নিতান্ত ভীত হইয়া অশ্ব ছুটাইল। তাহার অশ্বারোহী সেনা অল্পই ছিল। যাহারা অশ্বে ছিল, তাহারা দনার্দ্দনের সঙ্গে চলিল। পদাতিক সৈন্য যখন দেখিল, দনার্দ্দন তাহাদের ছাড়িয়া পলাইয়াছে, তখন তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিল। অনেকে নদীজলে লাফাইয়া পড়িয়া অপর পারে গিয়া উঠিল। তাহাদের বিশ্বাস, পাঠান তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। নৈশ নিস্তব্ধতায় দূরের শব্দ নিকটে শুনায়।

এ দিকে দনার্দ্দনকে বড় বেশী দূর যাইতে হইল না। পতরকে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সে আক্রান্ত হইল। তখন পূর্ব্বাকাশে একটু অরুণরাগ দেখা দিয়াছে। দনার্দ্দন সহসা বুঝিল না, কে তাহাকে আক্রমণ করিল। আক্রমণের ভাব দেখিয়া বুঝিল, শত্রু বড় চতুর। দুই এক দণ্ডের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইল। দনার্দ্দন শতাধিক সৈন্যসহ ধৃত হইল। দুই তিন শত মাত্র পলায়নে সমর্থ হইল। অবশিষ্ট নিহত হইল।

রজনীপ্রভাতে দনার্দ্দন তাহার শত্রুকে চিনিল,—এ সেই চক্ষুঃশূল বাঙ্গালী। একবার ত্রিবেণীক্ষেত্রে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। তদবধি উভয়ে উভয়কে ঘৃণা করিত। এক্ষণে সেই ঘৃণাস্পদ বাঙ্গালীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইল দেখিয়া দনার্দ্দন মরমে মরিয়া গেল, কিন্তু উপায় নাই; গদাধরের পশ্চাতে বন্ধনাবস্থায় রাজধানী-অভিমুখে দনার্দ্দনকে যাইতে হইল।

গদাধরও দনার্দ্দনকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিন প্রহর রজনী শত্রুশূন্য পতরকে অতিবাহিত করিয়া গদাধর, রাণীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তা'র পর যখন তিনি অকস্মাৎ দূরে অশ্বপদশব্দ শুনিলেন, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া ক্ষিপ্রতাসহ ব্যূহরচনা করিলেন; এবং মনে মনে রাণীর অনেক প্রশংসা করিলেন। পরে দিবালোকে যখন দনার্দ্দনকে দেখিলেন, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তিনি রাণীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কতলু খাঁ এক বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার এক বিপদে পড়িলেন। তিনি দনার্দ্দনকে পরাস্ত করিয়া নরাজ-অভিমুখে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় সহসা তিনি আক্রান্ত হইলেন। কে কোন্ দিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল, বুঝিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এক সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইল। তাঁহার বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতা ও রণকৌশল অসাধারণ। তিনি সত্বর ব্যূহরচনা করিয়া শক্রর সম্মুখীন হইলেন।

শক্র এবার নগণ্য নয়,—স্বয়ং দীনকৃষ্ণ। তিনি দশ সহস্র সৈন্যসহ যথাসময়ে রাণীর আজ্ঞামত পাঠানকে আক্রমণ করিয়াছেন। পাঠানের সংখ্যা তখনও প্রায় বিংশতি সহস্র। সুতরাং যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইল না—পূর্ণতেজে চলিতে লাগিল। এমন সময় নৈশ আকাশ মথিত করিয়া সহসা কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। উভয় দল চমকিত হইয়া ক্ষণেকের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। এ কি পাঠানের কামান? না, হিন্দুর কামান? সকলে বুঝিল, যা'র কামান, তার জয়।

কা'র কামান বলিতে হইলে আমাদের করিম শার অনুসরণ করিতে হয়। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় করিম শা পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ নরাজে আসিয়া দেখিলেন, দুই সহস্র সৈন্যমাত্র তথায় অবস্থান করিতেছে। তিনি আচম্বিতে তাহাদের আক্রমণ করিয়া কতক নিহত ও কতক বন্দী করিলেন। দুইটা কামান শিবিরে ছিল। তিনি তাহা সঙ্গে লইয়া রাণীর আজ্ঞামত চৌঘর-অভিমুখে ছুটিলেন এবং চুপি চুপি পাঠান-বাহিনীর পার্শ্বদেশে আসিয়া কামান দাগিলেন। তিনি গোলা-বারুদ বেশী আনিতে পারেন নাই; তাহা যখন নিঃশেষিত হইল, তখন তিনি অসি-হস্তে ভীত ত্রস্ত পাঠানের পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিলেন। পাঠান-বাহিনী দুই দিকে ভীষণ বেগে আক্রান্ত হইয়া সত্বরই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িল; তবু তাহারা যুদ্ধ করিতে ছাড়িল না। কতলু খাঁ ব্যূহরচনা করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। ব্যূহ একবার ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা পুনর্গঠন সহজসাধ্য নহে—বিশেষতঃ অন্ধকারে। পাঠান-সেনা তখন পলায়নপর হইল। দুই পার্শ্ব উন্মুক্ত,—পশ্চাৎ ও নদীর দিক্। পশ্চাতে দনার্দ্দন আছে; অনেকে নদীর দিকে ছুটিল। কতলু খাঁ ত্রিসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ হিন্দু-সৈন্য ভেদ করিয়া কোনও মতে পলায়নে সমর্থ হইলেন। তখন অরুণোদয় হইয়াছে।

যাহারা নদী পার হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার এক বিপদে পড়িল। নদীপারে স্থানে স্থানে নগরপালের শান্তিরক্ষক সেনা ছিল। হিন্দু বা পাঠান যে যখন নদীপারে আসিতেছে, সে তখন নিঃশব্দে ধৃত হইতেছে। যে সন্তরণে অপটু, সে নদীগর্ভে প্রাণ দিতেছে। এইরূপে অধিকাংশ পলাতক হিন্দু ও পাঠান প্রাণ বা স্বাধীনতা হারাইল।

পরদিবস প্রাতে রাজধানীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। চারিদিক্ হইতে জয়ের সংবাদ আসিতে লাগিল। কেহ বলিল, পাঠান ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে; কেহ বা বলিল, বিদ্রোহী দলের নেতা দনার্দ্দন ধৃত হইয়াছে। দীনকৃষ্ণ রায় অচিরে চারি পাঁচ হাজার পাঠান বন্দী সহ নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন লোকের আর উৎসাহ ধরে না। চারিদিকে রাণী ব্রজবালার জয় গীত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে গদাধর দনার্দ্দনসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। তদ্দৃষ্টে জনতা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দনার্দ্দনের হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ। তাহার সহচরদের অবস্থাও তদ্রূপ। সকলে নিম্নতুণ্ডে রাজ-সেনা-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। গদাধর তাঁহার বন্দীদের লইয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

প্রাসাদ-সান্নিদেশে এত জনতা যে, গদাধর প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পথ পাইলেন না। আবার যখন নগরপাল পাঁচ ছয় হাজার বন্দী লইয়া উপস্থিত হইলেন, তখন নগরের যাবতীয় লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়া প্রাসাদতলে দাঁড়াইল। যখন সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল, তখন যে পারিল, সে গাছে উঠিল। গাছেও যখন আর স্থান হইল না, তখন অনেকে নৌকা টানিয়া আনিয়া নদী'পরে দাঁড়াইল। এই বিপুল জনসঙ্ঘ আনন্দে অস্থির, ক্ষিপ্ত। তাহারা মুহুর্মুহুঃ ব্রজবালার জয়োচ্চারণ করিয়া আকাশতল প্রকম্পিত করিতে লাগিল।

ক্ষণপরে দেখা গেল, মানুষে দুইখানা শকট টানিয়া প্রাসাদাভিমুখে আসিতেছে। জনতা সরিয়া পথ দিল। শকটোপরি কি আছে, তাহা বুঝা গেল না; কেন না, তাহা বস্ত্রাচ্ছাদিত। শকটের আগে আগে করিম শা আসিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদমূলে আসিয়া শকটের বস্ত্র টানিয়া দিলেন। তখন সকলে দেখিল, দুইটা কামান দুইখানা গাড়ীর উপর রহিয়াছে। এরূপ কামান বা গাড়ী উড়িষ্যায় দেখা যায় না। জনতা বুঝিল, কামান পাঠানের—হিন্দুর

জয়লব্ধ ধন। তখন সেই বিপুল জনসঙ্ঘের উন্মত্ত চীৎকারে আকাশ মেদিনী কম্পিত হইল।

সেনানায়কেরাও পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। গদাধর জানিতেন না যে, দীনকৃষ্ণ দশ হাজার সেনা লইয়া বিশ হাজার পাঠানের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াছিলেন। দীনকৃষ্ণও জানিতেন না যে, গদাধর পনর হাজারের নায়ক দনার্দ্দনকে ধরিতে এক হাজারমাত্র সেনা লইয়া গিয়াছিলেন। করিম শা, পাঠানকে আক্রমণ করিতে হইবে, এইটুকুই শুধু জানিতেন। নগরপাল নদীতটে লোকই শুধু ধরিতেছিলেন। জলে ভাসিয়া কোথা হইতে লোক আসিতেছিল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতেছিলেন না। তবে নদীপারে লড়াই চলিতেছিল, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রাসাদমূলে সকলে সম্মিলিত হইয়া আত্মকার্য্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাণী ব্রজবালা যাহাকে যেটুকু না বলিলে নয়, সেটুকু ছাড়া আর কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি জানিতেন, মন্ত্রণা পাঁচ কাণ হইলে তাহা গোপন থাকে না। শুধু তাই নয়; রাণী যে মতলব আঁটিয়াছিলেন, তাহা যদি তিনি পাঁচ জন সেনানায়কের সম্মুখে ব্যক্ত করিতেন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিয়া উঠিত। এক্ষণে মন্ত্রগুপ্তির ফলে এই হইল যে, তাঁহার কার্য্যোদ্ধার হইল, আর উপহাসের পরিবর্ত্তে তিনি ভক্তি-শ্রদ্ধা লাভ করিলেন।

কিন্তু কি করিয়া যে এত বড় ঘটনাটা ঘটিল, তাহা সেনানায়কেরা কেহই বুঝিলেন না। কতলু খাঁ কেন শিবির ছাড়িয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল, দনার্দ্দন বা কেন কয়েক শত মাত্র সৈন্য লইয়া পলাইতেছিল, তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহারা স্থির করিলেন, ইহার ভিতর রাণীর কৌশল আছে।

রাণী তখন ভক্তিবিনম্রচিত্তে পশ্চিম-দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উদ্দেশে জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিতেছিলেন। যে ভক্তি ব্রজবালার হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, আজ সেই ভক্তি, বন্যাপ্রবাহের ন্যায় আসিয়া জয়বিযুক্তা রাণীকে ভাসাইয়া দিল। তিনি রোমাঞ্চিত-কলেবরে অশ্রুসিক্ত-নয়নে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া জগন্নাথ দেবকে বারংবার উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জনতা সহস্রমুখে 'রাণী-মা', 'রাণী-মা', শব্দে চীৎকার করিতেছে। সে চীৎকারে প্রাসাদ ফাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্রজবালার হৃদয়ে সে চীৎকার পৌঁছিতেছে না। তিনি তখন ধূল্যবলুণ্ঠিতা, আত্ম-বিস্মৃতা। এক অভিনব ভাব-প্রবাহে তাঁহার হৃদয় তখন তরঙ্গায়িত। তিনি আর যশের আকাঙ্ক্ষী নহেন; সমস্ত বাসনা সে সময়ে তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তিনি আর রূপের কাঙ্গাল নহেন; এক অপূর্ব্ব রূপ-জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয় তখন আলোকিত। তাঁহার হৃদয় হইতে তেজ, গর্ব্ব, রাজ্যলিপ্সা অপসৃত হইয়াছে; তিনি তখন সিংহাসনা-রূঢ় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পদতলে সাশ্রুনয়নে দীনচিত্তে উপবিষ্টা।

তিনি যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন, "এত দিনে প্রভু আমাকে বুঝাইলে ভোগ আমাদের ভোগ করে, আমরা ভোগকে ভোগ করি না; তৃষ্ণাকে আমরা ক্ষীণ করি না, তৃষ্ণা আমাদের ক্ষীণ করে।" বলিয়া তিনি কাঁদিয়া ভাসাইলেন। তিনি ক্ষণপরে সুস্থির হইয়া নগরপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নগরপাল আসিলেন এবং নতজানু হইয়া অভি-বাদন করিলেন। ব্রজবালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুই পক্ষে কত সৈন্য হতাহত হয়েছে?"

নগরপাল। ত্রিশ হাজার হ'তে পারে।

রাণী স্তম্ভিত হইলেন। নগরপালকে বিদায় দিয়া তিনি উঠিলেন এবং শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া এক-খানি পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্রখানা রাজার বরাবর লিখিলেন,—

"আপনার রাজ্য আপাততঃ নিষ্কণ্টক। আপনি সত্বর আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন।

"রাজ্য-পরিচালনা স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে—পুরুষের। আমি এক দিন ভুল বুঝিয়াছিলাম, তাই রাজ্যভার চাহিয়াছিলাম। এক্ষণে ভুল ভাঙ্গিয়াছে। লোক মারিতে হয়, আপনি মারুন, আমাকে অব্যাহতি দান করুন।

"জগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার মানস করিয়াছি; আপনি সত্বর আসিবেন।"

পত্র পাঠাইয়া দিয়া রাণী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। বাহিরে তখন মহা কলরব হইতেছিল। নিম্মলা আসিয়া সংবাদ দিল, "সেনাপতি দর্শনপ্রার্থী হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।" রাণী নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন।

সেনাপতি দীনকৃষ্ণ ভক্তিবিগলিতচিত্তে রাণীকে প্রণাম করিলেন; বলিলেন, "মা, পুত্রের একটা আবেদন আছে।"

রাণী। কি?

দীনকৃষ্ণ। প্রজাদের একবার দেখা দিতে হবে। তাহারা অনেকেই আপনাকে দেখেনি। এখন একবার দেখ্‌বার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

রাণী। দেখা দিতে আমার আপত্তি নেই,

কিন্তু যশের ভাগ নিতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। যাঁহারা বুকের রক্ত ঢালিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যশোবিমণ্ডিত হউক, আর যে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ অপ্রত্যাশিত দয়া দান করিয়াছেন, তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক; আমি কে?

"মা—"

"পাটরাণীকে পাঠাচ্ছি—আমাকে ক্ষমা করুন।"

ব্রজবালার বিনীত অনুরোধে পাটরাণী ও প্রায় দুই শত রাজমহিষী প্রাসাদচূড়ায় উঠিলেন।* কিন্তু প্রজারা তাহাদের দেখিয়া পরিতুষ্ট হইল না। তাহারা বাঙ্গালী রাণীকে দেখিতে চায়। প্রজাদের আব্দার সকল দেশের সকল রাজাকে শুনিতে হইয়াছে। যিনি শুনেন নাই, তিনি প্রাণ বা সিংহাসন হারাইয়াছেন। ব্রজবালা উঠিলেন, কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রাসাদচূড়ায় উঠিবার পূর্ব্বে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, প্রজারা উড়িষ্যার রাণীকে দেখিতে চাহিয়াছে—ভিখারিণীকে দেখিতে চায় নাই। তখন তিনি বসন ভূষণ আনাইয়া সজ্জিতা হইলেন। মাথায় মুকুট, কণ্ঠে মণিময় হার, কপালে সিন্দুরের বিন্দু পরিলেন; এবং রত্নোজ্জ্বল পট্টবস্ত্র-পরিহিতা হইয়া সেই বিপুল জনসঙ্ঘের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তে কোলাহল থামিয়া গেল। লক্ষ মানুষের নিশ্বাসের শব্দ, প্রবাহিনীর সলজ্জ অস্ফুট গান, বিহঙ্গমের মঙ্গলগীত সব থামিয়া গেল। রহিল শুধু নয়ন ও প্রাণ।

প্রজারা উদ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। তাহারা মানুষ দেখিতে চাহিয়াছিল, রাণী দেখিতে চাহিয়াছিল,—এক্ষণে দেখিল দেবী-প্রতিমা। ক্ষণেকের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিল; মনে হইল, যেন আকাশ পৃথিবীর সংযোগস্থলে উষাদেবী সমুদিতা। ব্রজবালার পাশে পাশে অনেক রমণী, অনেক মহিষী; কিন্তু নরনারীর মানুষের নয়ন চাঁদের পানে—নক্ষত্রের পানে না।

তার পর স্মৃতি ফিরিয়া আসিল,—লক্ষাধিক কণ্ঠে সহসা জয়ধ্বনি উঠিল—আকাশ পৃথিবী প্লাবিত করিয়া জয়ধ্বনি উঠিল। যাহারা দূরে, অনেক দূরে ছিল, তাহারা রাণীর মুখাবয়ব দেখিতে পাইল না। তাহারা দেখিল শুধু একখানি প্রতিমা—একটা ছটা, একটা জ্যোতিঃ। তাহারাই রাণীকে ভাল দেখিল।

গদাধর আজ ভূমিষ্ঠ হইয়া রাণীকে প্রণাম করিলেন। করিম শা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া সেলাম করিলেন। দীনকৃষ্ণের গণ্ডবক্ষ বহিয়া আঁখিধারা গড়াইতে লাগিল।

* উড়িষ্যার বা বাঙ্গালার তখন যাবনিক অবরোধ প্রথা ছিল না। গ্রন্থান্তরে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর দনার্দ্দন ও ভৃগুরামের বিচার হইল। নগরপাল বিচার করিয়া তাঁহাদের দোষী সাব্যস্ত করিলেন; এবং প্রাণদণ্ডের আদেশে দণ্ডিত করিলেন। রাণীর নিকট তাহারা কৃপা ভিক্ষা করিল। রাণী প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিয়া তাহাদের দুর্গের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

তার পর রাণী মন্ত্রণাগারে বসিয়া প্রচার করিলেন, তিনি সত্বর জগন্নাথদেব-দর্শনে যাত্রা করিবেন। দীনকৃষ্ণ আপত্তি তুলিলেন। রাণী বলিলেন, "রাজা বা রাজকুমার আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ না করিলে তিনি যাইবেন না।" অগত্যা দীনকৃষ্ণকে নিরুত্তর হইতে হইল।

সেই দিন ভোরে রাজার নিকট হইতে দূত পত্র লইয়া আসিল। রাণী পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—"আমার ব্রজসুন্দরী—শুনিলাম, তুমি উড়িষ্যা রক্ষা করিয়াছ—দনার্দ্দনকে বন্দী করিয়াছ—শত্রুর পঞ্চাশ হাজার সৈন্য মুহূর্ত্তে ধ্বংস করিয়াছ।

"তুমি উড়িষ্যার শক্তি—উড়িষ্যার লক্ষ্মী। তোমাকে দিবার কিছু নাই—তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিবার অনেক আছে। তোমার দাসানুদাস মুকুন্দদেবের ভিক্ষা, তুমি চিরদিন উড়িষ্যায় অবস্থান কর।

"তুমি এখন শুধু আমার জীবনসঙ্গিনী, আমার হৃদয়েশ্বরী নও, তুমি এখন আমার শক্তি—আমার লক্ষ্মী—আমার উপাস্যদেবী।

"আমি ফিরিলাম—তোমাকে দেখিতে ফিরিলাম। কিন্তু শুনিতেছি, বিদ্রোহীরা আবার দল বাঁধিতেছে। দনার্দ্দনের পুত্র হরিবর্দ্ধন এক্ষণে তাহাদের নেতা।

তোমার মুকুন্দদেব।"

ক্ষণপরে যুবরাজের নিকট হইতে দূত আসিয়া সংবাদ দিল, "যুবরাজ, কালাপাহাড়ের হস্তে পরাস্ত হইয়া ছিন্নভিন্ন সৈন্যসহ রাজধানী-অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।"

এত বড় গুরুতর সংবাদ শুনিয়াও রাণীর বদনে চিন্তার কোনও লক্ষণ প্রকটিত হইল না। তিনি শুধু আকাশের দিকে চাহিলেন। তথায় কি দেখিলেন, জানি না, কিন্তু তাঁহার প্রশান্ত বদন দেখিয়া দাসীরা ভাবিল, উড়িষ্যার কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা নাই। অচিরে সে সংবাদ প্রাসাদময় প্রচার হইল; এবং স্বল্পকালমধ্যে নগরের ভিতরে অতিরঞ্জিত অবস্থায় ছড়াইয়া পড়িল। তখন সকলে নিশ্চিন্ত হইল।

পরদিবস যুবরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সওর হাজার সৈন্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে বিশ হাজার মাত্র অবশিষ্ট আছে। রাণী তদ্দৃষ্টে তৎক্ষণাৎ নূতন সৈন্যদল গঠনের আদেশ প্রচার করিলেন। দীনকৃষ্ণ ও নগরপাল অর্থ চাহিলেন। এক বৎসরকাল যুদ্ধের ব্যয় বহন করিয়া কোষাগার প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। রাণী তখন নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া দিলেন। অঙ্গে যাহা ছিল, তাহাও দিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত অন্য কোনও পুরমহিলা অনুসরণ করিলেন না; কিন্তু নগরের গৃহস্থ-কন্যারা করিলেন। তাঁহারা রাণী ব্রজবালার হিংসা করেন না—তাঁহাকে ভক্তি করেন

যুবরাজ আসিয়াই সকল কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইলেন। রাণীর মন্ত্রণাগার বন্ধ করিয়া রাজার মন্ত্রণাগারে নিজের আসন পাতিলেন; এবং সিংহাসনে উপবেশন করিয়া স্বেচ্ছামত আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। যেন রাণীর প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াই এরূপ করিতে লাগিলেন। রাণী সব বুঝিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যুবরাজকে দূরীভূত করিতে পারিতেন: কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি পুরুষোত্তম-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

যুবরাজ, রাণীর আদেশ প্রত্যাহার করিয়া দনার্দন ও ভৃগুরামকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। দীনকৃষ্ণ ও নগরপাল গোপনে পরামর্শ স্থির করিলেন, "মা যাহাদের অব্যাহতি দিয়াছেন, আমরা তাহাদের মরিতে দিব না" তাহারা বন্দিদ্বয়ের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিলেন। তাহারা পলায়ন পূর্ব্বক বিদ্রোহিদলে যোগদান করিল।

অচিরে রাজার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহীর সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের পিছনে রাখিয়া রাজা রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। তিনি আরও কিছু সৈন্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। যুবরাজ সাহায্য না পাঠাইয়া পত্রোত্তরে জানাইলেন যে, "এখানে সৈন্য অল্পই আছে।"

রাণী সেই দিবস সন্ধ্যার পর অতি গোপনে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। সঙ্গে নিৰ্ম্মলা ও শান্ত ছিল। নগরবাসীরা কেহ জানিল না যে, তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রস্থান করিতেছেন।

কিন্তু নটবর সংবাদ পাইল। সে নগর-বাহিরে গিয়া রাণীকে ধরিল। তিনি শিবিকায় ছিলেন। নটবর জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ফিরিবে ত?"

রাণী। মহাপ্রভুর ইচ্ছা।

নট। তোমার কি ইচ্ছা মা?

রাণী। মানুষের ইচ্ছায় কি হয় বাবা?

নট। বুঝেছি; যুবরাজ আসিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছে। বেশ, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

রাণী। ছেলেদের নেবে?

নট। না, নিবে। এখানে থেকে আর কি করব মা? রাজবাটী ত শীঘ্রই শত্রুর করাগত হবে।

নটবর ফিরিল: এবং পরদিবস সস্ত্রীক পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিল। যাইবার আগে দীনকৃষ্ণকে বলিয়া গেল, "আপনাদের লক্ষ্মী ছেড়েছেন, সময় থাকতে আপনারাও পালান।"

দীনকৃষ্ণ স্তম্ভিত হইলেন; বুঝিলেন, রাণী আর ফিরিতেছেন না, সুতরাং উড়িষ্যার আর রক্ষা নাই।

দীনকৃষ্ণের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। পাঁচদিনের মধ্যে সংবাদ আসিল, রাজা মুকুন্দদেব বিদ্রোহিহস্তে নিহত হইয়াছেন। তা'র কয়েক দিন পরে কালাপাহাড় সদলবলে আসিয়া রাজধানী ও দুর্গ বেষ্টন করিলেন। প্রজারা আকুল প্রাণে সাশ্রুনয়নে ডাকিতে লাগিল, "কোথায় তুমি মা? আমরা যে বিপদে পড়েছি, তুমি কি তা' দেখ্‌তে পাচ্ছ না?"

নবম পরিচ্ছেদ

মা তখন পুরুষোত্তমে। সমুদ্র সৈকতে যে কুটীরে ব্রজবালা এক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরে আশ্রয় লইলেন। শান্তকে বিদায় দিলেন, নিৰ্ম্মলাকেও দিতেছিলেন, কিন্তু সে গেল না; বলিল, "জগতে আমার আর স্থান নাই।" ব্রজবালারই কি আছে? তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, আছে বই কি। শান্তিময় সমুদ্র-সৈকতে অনন্তের পদতলে স্থান আছে বই কি।

রাজা মুকুন্দদেবের মৃত্যুসংবাদ নিৰ্ম্মলা ও ব্রজবালা পাইলেন। নিৰ্ম্মলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; কেন না, তাহাদের অশ্রয়স্থল ধ্বংস হইল।

রাজার শোক ব্রজবালার হৃদয়ে বড়ই লাগিল; তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। এ কাতরতা নিজের জন্য নয়—রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য। তিনি মানস নয়নে দেখিলেন, উড়িষ্যা পাঠান চরণে দলিত হইতেছে—পুরুষোত্তমেরও বুঝি নিস্তার নাই।

ব্রজবালা কিছুতেই মুকুন্দদেবকে ভুলিতে পারিল না। যাহার নিকট হইতে প্রেম-শিক্ষা লাভ হয়, তাহাকে ভোলাও বড় সহজ নয়। সমুদ্রতীরে যেখানে বসিয়া এক দিন ব্রজবালা রাজার সহিত

কথোপকথন করিয়াছিলেন, সেইখানে বসিয়া তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। সম্মুখে সেই সমুদ্র, পিছনে সেই কুটীর, মাথার উপর সেই আকাশ। কিন্তু ব্রজবালা আর সেই নাই। প্রবাহিনী আছে, কিন্তু তা'র জল সরিয়া গিয়াছে; নূতন জল, নূতন তরঙ্গ আসিয়া প্রবাহিনী-বক্ষ হিল্লোলিত করিতেছে।

একদা অপরাহ্ণে ব্রজবালা কুটীর-সম্মুখে বালুকার উপর উপবিষ্ট থাকিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গের নর্ত্তন দেখিতেছিলেন। নির্ম্মলা কাছে বসিয়া রাজপ্রাসাদের রাজভোগের কথা ভাবিতেছিল। বোধ হয়, তৎকালে তাহার ক্ষুধা পাইয়া থাকিবে। ব্রজবালা এক্ষণে একাহারী, নির্ম্মলাকেও বাধ্য হইয়া একাহারী হইতে হইয়াছে; নির্ম্মলা ভাবিতেছিল, কি করিলে আবার তেমনটি হয়। ব্রজবালা ভাবিতেছিল, কি করিলে "তেমনটির" স্মৃতি মুছিয়া যায়।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

"কিসের পর?"

"এইখানে এই অবস্থায় কি চিরদিন কাটাতে হবে?"

"জগন্নাথদেবের ইচ্ছা।"

"তোমার ইচ্ছা কি?"

"মানুষের ইচ্ছায় আবার কি হয়?"

"কি-ই বা না হয়? তুমি যা' করেছ—"

ব্রজবালা শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ছি, ছি! আমি কে?"

সেটা কিন্তু ব্রজবালার মুখের কথা। তাহার আমিত্ব—স্বাতন্ত্র্য তখনও ডুবে নাই। ডুবাইবার চেষ্টায় মুখে শতবার বলেন, "আমি কে?" ডুবাইতে পারিলে অনুতাপ থাকে না—বোঝার ভার থাকে না। সংসারের কয়টা লোক জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে পাপ-পুণ্যের ভার ভগবৎ-চরণে কায়মনোবাক্যে সমর্পণ করিয়া বলিতে পারে, "তুমি হৃষীকেশ, আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া যাহা করাইতেছ, তাহাই আমি করিতেছি?" যে পারে সে ত নিশ্চিন্ত। এই নিশ্চিন্ততাই ব্রজবালা খুঁজিতেছিলেন।

নির্ম্মলা জিজ্ঞাসা করিল, "মনে পড়ে কি রাণি, এইখানে এক দিন বালুকার মধ্যে তুমি একটা জীবন্ত মৎস্য প্রোথিত করেছিলে? বালি সরিয়ে দেখ না, তা'র কাঁটা হয় ত আজও দেখ্‌তে পাবে।"

ব্রজবালা শিহরিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া গেলেন; গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "নির্ম্মলা, অতীতের কোনও কথা আমার সাক্ষাতে তুলিও না।"

"ভবিষ্যতের কথা?"

"বলেছি ত ভবিষ্যৎ তাঁর হাতে।"

"বেশ; অতীতের কথা তুলব না, ভবিষ্যতের কথা বলব না। তবে কোন্ কথা আলোচনা করব?"

ব্রজবালা উত্তর করিলেন, "বর্ত্তমান।"

নির্ম্মলা। বর্ত্তমান কতটুকু!

ব্র। টুকু নয়—অনন্ত।

নি। অনন্ত?

ব্র। হাঁ, বর্ত্তমানই যে তুমি।

নি। আর অতীত?

ব্র। সসীম।

নি। বুঝলাম না।

ব্র। স্মৃতিটুকুর বাইরে আর অতীত নেই।

নি। ভবিষ্যৎ?

ব্র। ভগবান্ স্বয়ং।

নির্ম্মলা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তোমার কাছে নূতন কথা শুনিলাম; এত কথা তোমায় শিখাইল কে?"

ব্রজবালা উত্তর করিলেন, "কেহ কাহাকে কিছু শিখায় না নির্ম্মলা! শিখায় মন—শিখায় ঘটনা।"

পিছন হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছ মা। আমি এই দুই মাসে যা শিখেছি, তা' হাজার পণ্ডিতে এক কল্প ধ'রে শিখালেও আমি শিখ্‌তে পারতুম না।"

ব্রজবালা ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, অদূরে ললাটী তাহার শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তা'র পিছনে—একটু দূরে—নটবর তাহার অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান। তদ্দৃষ্টে রাণীর হৃদয়ে একটা আনন্দ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "এ কি ললাটী, নটবর, তোমরা এখানে?"

"মা যেখানে, ছেলে-মেয়েরাও সেখানে।"

প্রবাহটা তখন হৃদয় হইতে নয়নে আসিল। রাণী অশ্রুভারাকুল-নয়নে ললাটীর ক্রোড় হইতে তাহার শিশুপুত্রটিকে লইলেন এবং বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। রাণীর সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

নটবরের কন্যাটি ধীরে ধীরে আসিয়া রাণীর চরণে প্রণতা হইল। রাণী তাহার হাত ধরিয়া বুকে উঠাইয়া লইলেন। রাণীর দুই ক্রোড়ে দুই শিশু—নয়নে বারিধারা। যেন অনন্তের উপকূলে সনাতন ধর্ম্ম দণ্ডায়মান—ক্রোড়ে শান্তি, ভক্তি—নয়নে মুক্তি।

নটবর ও ললাটী রাণীকে প্রণাম করিল—ধুলায়

লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তাহাদের নয়নে রুদ্ধ বারিধারা, হৃদয়ে অস্ফুট ভাষা। ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর ললাটী কহিল, "জগন্মাতা কি আমাদের এমনি ক'রে কোলে নিবেন না?"

সহসা কোমল, অথচ উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রিত হইল, "নিয়ে ত রয়েছেন।"

কে এ কথা বলিল? সকলে বিস্মিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিলেন। নিকটে কাহাকেও দেখা গেল না। ব্রজবালার মনে হইল, দূরে যেন এক সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে।

ব্রজবালা বিস্মিত হইলেন, একটু অন্যমনস্কও হইলেন। মেয়েটি ক্রোড় হইতে নামিয়া পড়িল। ছেলেটি দেখিল, সে আর আদর পায় না; তখন সে-ও মায়ের কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। ব্রজবালা তখন সুপ্তোত্থিতার ন্যায় চমকিতা হইয়া শিশু দুইটিকে পুনরায় ক্রোড়ে লইলেন; এবং কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজের জন্য যে অন্নব্যঞ্জন ছিল, তাহা শিশু দুইটিকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা সবিস্ময়ে দেখিল, ব্রজবালা ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া অস্পৃশ্য জাতির স্পৃষ্ট অন্ন স্পর্শ করিতেছেন। নির্ম্মলার মনে একটা ঘৃণা জন্মিল; সে ভাবিল, একটা সুবিধামত স্থান জুটিলে সে এ ম্লেচ্ছ-সংসর্গ ত্যাগ করিবে।

ছেলেদের খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া ব্রজবালা বাহিরে আসিলেন। সন্তানদ্বয় তৃপ্ত হইয়াছে দেখিয়া মাতাপিতা নিজেদের ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইল।

নটবর প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে থাকিবার স্থান আছে?"

"তোমার ছেলের আবার স্থানাভাব? যদি হুকুম কর, রাজবাড়ী এখানে উঠিয়ে আন্‌তে পারি।"

রাণী একটু হাসিলেন।

সেই দিন গভীর রাত্রে রাণী অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ সুপ্তাবস্থায় শুনিলেন, কে যেন সমুদ্র সৈকতে বসিয়া গাহিতেছে—

"প্রভু, হৃদয়-মন্দিরে জাগো,
পিতৃরূপে মাতৃরূপে পুত্ররূপে কন্যারূপে
হৃদয়েতে জাগো,
প্রভু, হৃদয়-মন্দিরে জাগো।
সখারূপে ভার্য্যারূপে, ভ্রাতারূপে ভগ্নীরূপে
হৃদয়েতে জাগো,
প্রভু, হৃদয়-মন্দিরে জাগো,
সখা, মানস-মন্দিরে জাগো।
শ্রদ্ধা ভক্তি, স্নেহ মায়া, সখ্য প্রেম প্রীতি দয়া
স্বরূপে জাগো,
মানস-মন্দিরে জাগো,
নিদ্রা-জাগরণে জাগো,
জীবনে মরণে জাগো,
সকল সময়ে জাগো,
প্রিয়, মানস-মন্দিরে জাগো।
শক্তিরূপে শান্তিরূপে, জ্ঞানরূপে বুদ্ধিরূপে,
আমার হৃদয়ে জাগো,
নাথ, অহরহ জাগো,
ভিতরে বাহিরে জাগো,
আমার সুখে, দুঃখে জাগো,
প্রভু, মানস-মন্দিরে জাগো॥"

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাণী বলিলেন, "নির্ম্মলা আজ দেবদর্শনে যাব।"

নির্ম্মলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতকাল কি হয়েছিল?"

ব্রজ। এতকাল অধিকার পাইনি।

নির্ম্ম। সহসা আজ অধিকার জন্মিল কিরূপে?

ব্রজ। শিশু-স্পর্শে।

নির্ম্ম। সে কি রকম?

ব্রজ। আমি পূর্ব্বে কখন শিশু ক্রোড়ে করিনি। শিশু আমার নিকট ঘৃণাস্পদ ছিল। আজ আমি শিশু ক্রোড়ে ক'রে পবিত্র হয়েছি।

নির্ম্ম। কথাটা বুঝলাম না।

ব্রজ। আজ আমার মাতৃপ্রাণ জাগরিত হয়েছে।

নির্ম্ম। বাহবা! তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ভৈরব মানে কি, তুমি বল্‌লে কালভৈরব।

ব্রজ। তোমার যে আজও বুঝ্‌বার ক্ষমতা হয়নি, নির্ম্মলা!

নির্ম্ম। হয়েও কাজ নেই। কি না দুটো ধূলোমাখা, পোটাপড়া, কুৎসিত ছেলে কোলে করলুম, আর আমি পবিত্র হয়ে গেলুম। আমি এমন পবিত্রতা চাইনে।

ব্রজ। বেশ, তবে তুমি কুটীরে থাক, আমি মন্দিরে যাই।

নির্ম্ম। একা যাবে না কি?

ব্রজ। না, ললাটী এখন আস্‌বে।

নির্ম্ম। সে আসে আসুক, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

তখন উভয়ে স্নানার্থে সমুদ্রে নামিলেন। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া অঙ্গের মলা ধুইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মনের মলা ধুইয়া দিবার শক্তি বুঝি জড়ের নাই। ব্রজবালা সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বারিধি, তুমি কত বড়, আমি কত ক্ষুদ্র। কিন্তু তুমি সীমাবদ্ধ—আমার সীমা নাই। তুমি সসীম—আমি অনন্ত। তুমি বিশাল হৃদয় লইয়াও চপল—সামান্য ঝটিকাঘাতে অস্থির, বিকম্পিত। আমি ক্ষুদ্র হইয়াও গম্ভীর—সহস্র প্রবৃত্তি-তাড়নেও অবিকম্পিত। বৃথাই তোমার শক্তির গর্ব্ব। তোমার শক্তি পাশবিক, ধ্বংসকারী—"

এমন সময় নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একটা তরঙ্গ আসিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় নির্ম্মলাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ব্রজবালা তাহাকে ধরিলেন। নির্ম্মলা উঠিয়া সমুদ্রকে গালি পাড়িতে লাগিল। গালি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আবার একটা তরঙ্গ আসিয়া স্খলিতপদ নির্ম্মলাকে ফেলিয়া দিল; এবং অতি নিষ্ঠুরভাবে অস্তরশুক্ত বালুকার উপর টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ব্রজবালা কহিয়া উঠিলেন, "বারিধি, তুমি দয়ামায়া-বিবর্জ্জিত, তাই তুমি এত ছোট।"

দুই জনে সমুদ্রকে গালি দিতে দিতে স্নান সমাপন করিলেন; এবং কোটাকে সঙ্গে লইয়া অচিরে মন্দির-দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ রাণীকে সম্বর্দ্ধনা করিল; আবার কেহ কেহ ব্রজবালার রূপরাশি সন্দর্শন করিয়া আত্মপরিতৃপ্তি লাভ করিল। রাণী বা ব্রজবালা কোনও দিকে না চাহিয়া শ্রী-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। মন্দিরাভ্যন্তর অস্পষ্টালোক। রাণী প্রাঙ্গণ পথে ক্ষীণালোকে দেখিলেন, এক দীর্ঘকায়, তেজঃপুঞ্জ, জটাবিমণ্ডিত সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ব্রজবালার মন ভক্তিতে আপ্লুত হইল। বুঝিলেন, এই সন্ন্যাসীই পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দর্শন দিয়াছিলেন। ব্রজবালা, সন্ন্যাসীকে প্রণাম না করিয়া অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি তোমার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি মা।"

"অপেক্ষা করুন, আগে ঠাকুর দেখিয়া আসি।"

ব্রজবালা এক পদ অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন, "সেখানে গিয়ে কি করবে মা? ঠাকুর যে বিকলাঙ্গ।"

ব্রজ। তা'তে কি?

সন্ন্যা। যদি বাসনা কামনা ছেড়ে যেতে পার, তবে যাও; নতুবা যেও না।

ব্রজ। আমার যা আছে, তাই নিয়ে ঠাকুরের কাছে যাব।

সন্ন্যা। তোমার কি আছে মা?

ব্রজ। কিছুই নাই।

সন্ন্যা। পুণ্য?

ব্রজ। না।

সন্ন্যা। ভক্তি?

ব্রজ। না।

সন্ন্যা। পাপ?

ব্রজ। না।

সন্ন্যা। তবে যাও মা, প্রেমময়ের চরণ-দর্শনে তোমার অধিকার জন্মেছে।

অপরাহ্নে কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া ব্রজবালা দেখিলেন, নটবর তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ নটবর?"

নটবর উত্তর করিল, "সংবাদ আর কি দেব, মা?—মুসলমান বরোবাটী অধিকার করেছে।"

রাণী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীক্ষেত্র কি তাহাদের লক্ষ্যস্থল? ভুবনেশ্বরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে কি?"

নটবর। তা ঠিক জানি না।

রাণী। যুবরাজ রামচন্দ্র কোথায়?

নট। নিহত।

রাণী। দনার্দ্দন ও ভৃগুরাম?

নট। কালাপাহাড়ের পদতলে।

রাণী। দীনকৃষ্ণ?

নট। নিহত।

রাণী। আর গদাধর?

নট। ভুবনেশ্বরে।

রাণী। সেখানে কি করছেন?

নট। সৈন্য-সংগ্রহ। পাহাড়ীরা দলে দলে তাহাদের তীর্থক্ষেত্র রক্ষা করতে আসছে।

রাণী। আর খাণ্ডাইতরা?

নট। তারা আসছে না। সকলেই নেতা হতে চায়—নেতৃত্ব স্বীকার করতে কেহ চায় না।

রাণী। অধঃপতনের মূলই গর্ব্ব।

নট। তুমি একবার চল না, মা।

রাণী। আমি? আর না।

নট। উড়িষ্যা যে তোমার মুখ চেয়ে আছে, মা।

রাণী। আমি কে? এই সমুদ্রের বিম্ব মাত্র,—জগৎপিতার ইচ্ছায় সৃষ্ট হই, আবার তাঁরই ইচ্ছায় বিলীন হই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড় কটক-বারাণসী অধিকার করিয়া কতলু খাঁকে বিজিত প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন; এবং স্বয়ং দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চৌদ্বার, বারোবাটী তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত। দনাদ্দন, ভৃগুরাম তাঁহার পদলেহনে ব্যাপৃত। দনাদ্দন সিংহাসন চাহিয়াছিল, কালাপাহাড় তাহাকে অপমান সহকারে বিদায় করিয়াছিলেন।

কটকে হিন্দুর বলিতে আর কিছু রহিল না। মন্দির, বিগ্রহ সব ধ্বংস হইল। যাহা অধ্বংসনীয়, তাহাই রহিল।

কটকে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে হিন্দু রহিল না। যাহারা রহিল, তাহাদের বলপূর্ব্বক মুসলমান করা হইল। রাজভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল। পাঠান সেনা-নায়কেরা রাজমহিষীবৃন্দ বণ্টন করিয়া লইলেন। বাঙ্গালীমহিষীকে অনেক অনুসন্ধান করিল, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এ দিকে দনাদ্দন বিশ্বাসভূত হইয়া ক্রোধে গর্জ্জিতে লাগিল; কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কেমন একটা আত্মগ্লানি জন্মিয়াছিল; সেই আত্মগ্লানির সঙ্গে বিফল ক্রোধ সংমিশ্রিত হইয়া দনাদ্দনকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দনাদ্দন গদাধরের সঙ্গে যোগ না দিয়া নিজে সৈন্যদল গঠিত করিতে লাগিল কিন্তু তাহার কৌশল বা রাজত্ব ছিল না। এক দিন কতলু খাঁ আচম্বিতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও নিহত করিলেন। ভৃগুরাম ভুবনেশ্বরের দিকে পলাইল।

ভুবনেশ্বরে গদাধর ও করিম শা সসৈন্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ভৃগুরাম আসিয়া আশ্রয় যাচ্ঞা করিল, গদাধর তাহাকে সৈন্যদলভুক্ত করিয়া লইলেন কিন্তু সে তথায় অবস্থান করিল না ব্রজবালাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল; যখন তাঁহাকে পাইল না, তখন ভুবনেশ্বর ত্যাগ করিয়া চলিল।

অনুতপ্ত বিদ্রোহীর দল স্বদেশ-রক্ষার্থ গদাধরের পতাকা নিয়ে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিকীর্ত্তন আসিলেন। গদাধর তাঁহাকে নেতৃত্ব প্রদান করিলেন। তিনি এক জন সদ্বংশজাত উৎকলবাসী অন্বেষণ করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর নেতৃত্ব স্বীকার করিতে সকলে সম্মত নহে। খাণ্ডাইত হরিকীর্ত্তন বয়সে নবীন হইলেও বংশ ও পদমর্য্যাদায় মহাসম্মানিত। গদাধর তাঁহাকে সেনাদলের মাথায় বসাইয়া নিজে মাথা হইয়া বসিলেন।

ভুবনেশ্বরে বেশ একটা ছাউনি সজ্জিত হইল। লোকের অভাব হইল না, কিন্তু অস্ত্রের অভাব হইল। অস্ত্রের অভাবে গদাধর ধানুকী দলের সৃষ্টি করিলেন; এবং পার্ব্বত্যপথে স্থানে স্থানে প্রস্তর স্তূপীকৃত করিলেন। দুইটা কামান ছিল, তাহা দুর্গপ্রাকারে স্থাপন করিলেন। আট দশ হাজার বন্দুক ছিল; তরবারি ও ভল্ল যথেষ্ট ছিল। গদাধর দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সেই সব অস্ত্র নূতন সৈন্যদলকে সজ্জিত করিলেন।

গদাধর তাঁহার ধানুকী সৈন্য সহ পার্ব্বত্য পথ রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। করিম শা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নগর হইতে কিছু দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন হরিকীর্ত্তন দুর্গ ও নগর রক্ষার ভার লইলেন

কালাপাহাড় সসৈন্যে ভুবনেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্ব্বত্য পথ ছাড়া আর একটা পথ ছিল। সে পথে আসিতে হইলে দুইটা নদী পার হইতে হয়; নদীর উপর সেতু ছিল; গদাধর দুইটা নদীরই সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। কালাপাহাড় তথাপি পার্ব্বত্য-পথ অবলম্বন না করিয়া উন্মুক্ত নদীর পথ ধরিলেন। গদাধর তখন পাহাড় ছাড়িয়া নদীর ধারে আসিয়া বসিলেন

কালাপাহাড় চন্দ্রভাগা উপকূলে আসিয়া দুই দিবসের মধ্যে সেতু প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। সন্নিকটে বড় বড় গাছ থাকিলে সেতু বাঁধিতে বিলম্ব হয় না। গদাধর বাধা দিয়া রাখিতে পারিলেন না; কালাপাহাড় চন্দ্রভাগা পার হইয়া বরুণার তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন বরুণা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। সেখানে পুনরায় বাঁধ দিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল; কিন্তু এমন সুবিধা হইল না কালাপাহাড় উক্ত স্থান পছন্দ করিয়াছিলেন; তথায় বন্দুকের সম্মুখে ধানুকী দাঁড়াইতে পারিল না। সঙ্গে কামান থাকিলে ভাল হইত; কিন্তু হরিকীর্ত্তন কামান আনিতে দেন নাই

কিন্তু গদাধর সহজে পরাজিত হইবার নন যে দিন সায়াহ্নে সেতু নির্ম্মিত হইয়া গেল, সেই দিন গভীর নিশীথে গদাধর সেতুর অদূরে বালুকার উপর গভীর খাল নিঃশব্দে খনিত করিলেন এবং সেই খাদের ভিতর বাছা বাছা দুই শত ধানুকী সৈন্য রক্ষা করিলেন। খাদের গভীরতা প্রায় তিন হাত পরিমাণ।

পরদিন প্রভাতে পাঠান-সৈন্য আসিয়া সেতুর উপর দাঁড়াইল, তখন খাদের ভিতর হইতে

দুই শত শর নিক্ষিপ্ত হইল। একশত পাঠান অচিরে ধরাশায়ী হইল। তাহাদের স্থান লইতে আবার এক-শত পাঠান ছুটিয়া আসিল। তাহারাও ভূশয্যা গ্রহণ করিল। আবার পাঠান আসিল, তাহারাও মরিল। তখন কালাপাহাড়ের কাছে সংবাদ গেল। তিনি তখন শিবিরমধ্যে বসিয়া হরিকীর্ত্তনের এক-খানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্রে লেখা ছিল,— "আসুন, আপনাতে আমাতে উড়িষ্যা বণ্টন করিয়া লই। আপনি আমাকে দক্ষিণ-উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন; আপনি উড়িষ্যার সকল দ্বার উন্মুক্ত পাইবেন।"

পত্র পাঠ করিয়া কালাপাহাড় পত্র-বাহককে ডাকিলেন। সে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দুর্দ্দান্ত পাঠান-সেনাপতির সম্মুখে দাঁড়াইল। কালাপাহাড় তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কে পাঠিয়েছে?"

"খাণ্ডাইত হরিকীর্ত্তন।"

"তিনি কোথায়?"

"পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া ভুবনেশ্বরে অপেক্ষা করিতেছেন।"

"তাঁহাকে বল গে, আমি অচিরে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইব।"

দূত বিদায় হইল। তখন কালাপাহাড় শুনিলেন, পাঠান-সৈন্য কোনমতে সেতু পার হইতে পারিতেছে না। কালাপাহাড় জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ঝটিতি শিবির ত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণ করিলেন। সেতুমুখে আসিয়া দেখিলেন, গভীর খাদমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া হিন্দু-সৈন্য শরক্ষেপে অগ্রবর্ত্তী পাঠান-সৈন্য বিনাশ করিতেছে। কালাপাহাড় মুহূর্ত্তমধ্যে সম্যক্ অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পাঁচ শত পাঠান বন্দুক লইয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল; দুই শত বক্ষে হাঁটিয়া সেতু পার হইতে লাগিল। এই দুই শতকে মারিতে হিন্দু-সৈন্য যখন ধনুক উঠাইল, তখন খাদের ভিতর তাহাদের সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইল। ফল এই হইল যে, তাহাদের মুণ্ড অপর তীরস্থ পঞ্চশত বন্দুকধারী পাঠানের লক্ষ্যস্থল হইল। ধনুতে শর যোজিত হইবার পূর্ব্বেই ধানুকী-সৈন্যের অধিকাংশ, গুলীতে আহত হইয়া গহ্বরমধ্যে লুটাইয়া পড়িল।

তখন গদাধর অনন্যোপায় হইয়া খাদ ত্যাগ করিলেন; এবং অসিহস্তে সেতুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে চল্লিশ পঞ্চাশ জন ধানুকী-সৈন্য ছিল; তাহারা স্বল্পকালমধ্যে গতপ্রাণ হইল। কিন্তু গদাধর অক্ষতদেহে উলঙ্গ কৃপাণ ঘুরাইয়া একাকী অগণিত পাঠানের পথ রোধ করিয়া সেতু-মুখে দাঁড়াইলেন। পাঁচ সাত জন পাঠান তরবারি-আঘাতে জীবন ত্যাগ করিল। কালাপাহাড় দূর হইতে তাহা দেখিলেন; এবং অশ্ব ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। তিনি একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া অঙ্গুলি-হেলনে পাঠান-সৈন্যকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। পাঠান নীরব নিস্পন্দ হইয়া অপর পারে দাঁড়াইল। কিন্তু এক জন কোনও নিষেধ শুনিল না; সে বুনা। তাহার গতি সর্ব্বত্র অবারিত। বুনা আসিয়া কালাপাহাড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড় বলিলেন, "গদাধর, আবার দেখা।"

গদাধর উত্তর করিলেন, "হাঁ, কিন্তু এইবার শেষ।"

কালা। কেন প্রাণ দিতে এসেছ গদাধর?

গদা। প্রাণে আর প্রয়োজন কি ভাই?

কালা। এত দিন ছিল?

গদা। হাঁ।

কালাচাঁদের বক্ষঃ আলোড়ন করিয়া একটা নিশ্বাস পড়িল। গদাধর তাহা লক্ষ্য করিলেন; সে নিশ্বাসের মর্ম্মও বুঝিলেন। বলিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি এত অসুখী?"

কালাচাঁদ প্রত্যুত্তর করিলেন, "সে সব কথার প্রয়োজন নাই—অস্ত্র ধর।"

দুইজনে লড়াই বাধিল। দুই জনই তুল্য নিপুণ, তুল্য বলশালী। অর্দ্ধদণ্ড যুদ্ধ চলিল, কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। উভয়ে ক্ষণকাল বিশ্রামার্থে অসি-অগ্রভাগের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কালাপাহাড় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের এক জন আজ নিশ্চয়ই মরিবে; কিন্তু কে মরিবে গদাধর?—তুমি না আমি?"

গদা। আমি।

কালা। না, না, তুমি বেঁচে থাক—তুমি হিন্দু, হিন্দুধর্ম্মরক্ষক—

গদা। তুমিই কি হিন্দু নও, কালাচাঁদ?

কালা। ও কথা ব'ল না, গদাধর। আমার যজ্ঞোপবীত নেই, আমি গায়ত্রী জপ করি না—

গদা। গায়ত্রী ত জপ করবার নয়—ধ্যান করবার—ধ্যানের বস্তু। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে সর্ব্বশক্তিময় দেবতা বিরাজ করছেন, এ

চিন্তাই ত গায়ত্রী ; তা' হিন্দুর বেশ ধারণ করেই কর, আর মুসলমানের পোষাক পরেই কর।

ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া কালাচাঁদ কহিলেন, "আমি ত ঠাকুর-দেবতার—তোমাদের ঠাকুর-দেবতার কখন ধ্যান করি না।"

গদাধর। তিনি ত ধ্যানের বস্তু ন'ন—তিনি অনুভবের বস্তু, কালাচাঁদ!

বুনার নয়ন অশ্রুভারাবনত হইল। কালাচাঁদ সুদূর আকাশপ্রান্ত-পানে চাহিয়া নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার প্রতীতি হইল, যেন একটা বিশ্বব্যাপী শক্তি তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল ; বহুদূর হইতে শব্দতরঙ্গে বাহিত হইয়া মধুর বীণাধ্বনি তাঁহার কর্ণমূলে ঝঙ্কৃত হইল ; পরে তাঁহার দশ ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত হইল—তিনি সেই শক্তিসাগরে সংমিশ্রিত হইয়া গেলেন।

পর-মুহূর্ত্তেই কালাচাঁদ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন ; এবং মাথা নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমায় কালাচাঁদ ব'লে ডেকো না—কালাপাহাড় বল।"

গদা। তুমি চিরদিনই কালাচাঁদ—হিন্দু—

কালা। না, না, অস্ত্র ধর—

উভয়ে পুনরায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসিচালনা করিতে করিতে গদাধর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি কি ভাব, তোমার অনতিক্রম্য শক্তিপ্রভাবে তুমি এই হিন্দুর দেশ জয় করিতেছ?"

"না, তা' মনে করি না ; আমি কে?"

"তবে তুমি সহস্রবার হিন্দু ; এ ভাব শুধু হিন্দুরই।"

কালাচাঁদ একটু উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, "না, না, আমি হিন্দু নই—আমি হিন্দুর দুষমন।"

এই উত্তেজনা কালাচাঁদকে অসতর্ক করিল ; গদাধর কালাচাঁদকে কাটিতে তরবারি উঠাইলেন—বুনা তদ্দৃষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিল ; নদীর অপর পার হইতে একটা গুলী ছুটিয়া আসিয়া গদাধরের বক্ষঃ বিদ্ধ করিল—উদ্যত খড়্গ হস্তচ্যুত হইল। কালাচাঁদ গদাধরের পতনোন্মুখ দেহ বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া ভূশয্যায় স্থাপন করিলেন ; পরে পিছন ফিরিয়া নদীর অপর কূলের দিকে নেত্রপাত করিলেন। দেখিলেন, এক জন পাঠান বন্দুক নামাইতেছে। কালাচাঁদ ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া গেলেন এবং সেই বন্দুকধারী সৈনিককে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিলেন। তাহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না ; তিনি তাহার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অবশেষে পদাঘাতে নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন।

উন্মত্ত-হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়া কালাচাঁদ দেখিলেন, গদাধরের ক্ষতস্থানে বুনা বারিসিঞ্চন করিতেছে। অনেক শুশ্রূষার পর গদাধর নয়নোন্মীলন করিলেন। সস্নেহে কালাচাঁদ গদাধরের ভূলুণ্ঠিত দেহ ক্রোড়োপরি তুলিয়া লইলেন। গদাধর ডাকিলেন, "কালাচাঁদ!"

"কি ভাই?"

"এক ভিক্ষা আছে।"

"তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ভাই?"

গদাধর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, "ভাই, ব্রজবালাকে দেখিও।"

কালাচাঁদ চমকিয়া উঠিলেন ; সহসা কোন উত্তর করিলেন না। গদাধর কহিলেন, "কালাচাঁদ, আমার সময় অতি অল্প।"

কালাচাঁদ। বেশ, আমি তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম।

গদাধরের নয়নপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। ধীরে, অতি ধীরে কহিলেন, "কালাচাঁদ, তুমি যা' মনে করেছ, সে তা' নয়। এক দিন আমার মত তোমারও ভুল ভাঙ্গবে।"

কালাচাঁদের ক্রোড়ে শুইয়া নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সন্তান গদাধর প্রাণত্যাগ করিলেন। কালাচাঁদ বরুণার উপকূলে স্বহস্তে চিতা সাজাইয়া গদাধরের দেহ ভস্মীভূত করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড়ের গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। করিম শা সেই দিবস অপরাহ্ণে প্রায় পঞ্চসহস্র সৈন্য লইয়া বাধা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু কালাপাহাড় তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৃথা লোকক্ষয় করিও না, সম্রাট্‌পুত্র! তোমার এ মুষ্টিমেয় সৈন্য আমি একাই সংহার করিতে পারি। আজ আমার সম্মুখে আসিও না—পলাও।"

করিম শা উত্তর করিলেন, "গর্ব্ব, শক্তি নয়, পাঠান-সেনাপতি! যদি বাহুতে শক্তি থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করুন।"

"দিতেছি—সত্বরই দিতেছি।"

"আপনি হয় ত বিস্মৃত হইয়াছেন, আমার অস্ত্রগুরু কে? আজ সেই গুরুর নিকট অস্ত্রশিক্ষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।"

"পরিচয় লইবার অবসর নাই, সম্রাট্‌পুত্র! আর এটাও স্মরণ রাখিবে, গুরু শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু শক্তি ও চক্ষু দিতে পারে না— আত্মরক্ষা কর।"

কালাপাহাড়ের প্রথম আঘাতেই করিম শার খড়্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাঠান-সেনাপতি, করিম শাকে কাটিতে খড়্গ উঠাইলেন। করিম শা প্রফুল্ল-মুখে কালাপাহাড়ের উদ্যত অস্ত্র-নিম্নে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমায় মার, সেনাপতি, আমার এ অপ্রয়োজনীয় জীবনের শেষ ক'রে দেও।"

কালাপাহাড় উদ্যত খড়্গ নামাইয়া কহিলেন, "দ্বিতীয় অস্ত্র গ্রহণ কর, সম্রাট্‌পুত্র!"

করিম শা দ্বিতীয় অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "আজ আমার জীবন সার্থক; বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-বিশারদ—"

বাক্য শেষ হইতে না হইতেই করিম শা অশ্বসহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে লটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কালাপাহাড় ভুবনেশ্বরের দ্বারে সমুপস্থিত হইলেন। শোকোন্মত্ত পাঠান সেনাপতি আজ ভীষণদর্শন—নয়নে বিদ্যুৎ, বদনে নিবিড় মেঘ, কণ্ঠে গম্ভীর গর্জ্জন। মূঢ় হরিকীর্ত্তন এ মেঘ বা বিদ্যুৎ দেখিতে পাইল না। সে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, পারিষদবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় বহ্নি-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং হাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া বলিল, "পাঠান-সেনাপতি, স্বাগত! আপনার অভ্যর্থনার্থে নগর সুসজ্জিত হইয়াছে।"

বলিতে বলিতে তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বারংবার পাঠান-সেনাপতিকে সেলাম করিতে লাগিলেন। পাঠান-সেনাপতি কিন্তু অশ্ব হইতে নামিলেন না; তিনি তদুপরি অবস্থান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাণ্ডাইত, আপনি সিংহাসন চাহিয়াছেন না?"

অতি প্রফুল্লকণ্ঠে হরিকীর্ত্তন উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা হাঁ জাঁহাপনা।"

কালাপাহাড় কহিলেন, "আপনি আপনার পিতার উপযুক্ত পুত্র—আপনাকে সত্বরই সিংহাসনে বসাইতেছি।"

বলিয়া তিনি এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিলেন। সে ব্যক্তি দলবলসহ আসিয়া হরিকীর্ত্তনকে বেষ্টন করিল। জল্লাদ অগ্রসর হইয়া ভূগর্ভে শূলদণ্ড প্রোথিত করিল। তদ্দৃষ্টে হরিকীর্ত্তন কাঁপিয়া উঠিল। এক জন পাঠান বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "সিংহাসনটা কিছু উঁচু হ'ল, না?"

আর এক জন বলিল, "বাপের দুর্দ্দশা দেখেও যাঁর শিক্ষা হ'ল না, তার শূলে যাওয়াই ভাল।"

হরিকীর্ত্তন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমি ত সমস্ত রাজ্য চাইনি—"

কালাপাহাড় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "যে স্বদেশবৈরী বিশ্বাসঘাতক, তার আসন শূলের উপর—সিংহের উপর নয়।"

সহসা কালাপাহাড় শুনিলেন, তাঁহার কাণের কাছে কে বলিয়া গেল, "আর তোমার আসন কোথায় কালাপাহাড়?" তিনি চমকিয়া উঠিলেন; মুখ আরও গম্ভীর করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

দুর্গপ্রাচীরনিম্নে সকলের সম্মুখে কম্পিতকলেবর হরিকীর্ত্তনকে সমুচ্চ শূলের উপর বসান হইল। উৎকলবাসীরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কালাপাহাড় সসৈন্যে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং বিনা কালব্যয়ে হিন্দুমন্দিরধ্বংসে প্রবৃত্ত হইলেন। শালগ্রাম কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল—বিগ্রহ পদতলে মর্দ্দিত হইল—পুত্তলিকা খড়্গাঘাতে ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হইল। সে চিত্র অঙ্কনে কোন প্রয়োজন নাই। সকলেই অবগত আছেন, কালাপাহাড় হিন্দু-মন্দির কিরূপে উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, আসাম ও কাশী-ধামে ধ্বংস করিয়াছিল। এখনও দেশমধ্যে প্রবাদ আছে, "কালাপাহাড়ের কাড়া-নাগরা বাজিলে দেব-মূর্ত্তিসকল কম্পিত হইত।"

ভুবনেশ্বর ধ্বংস করিয়া কালাপাহাড় শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইলেন। কুজঙ্গ-অধিপতি, মুকুন্দদেবের দ্বিতীয় পুত্র ছকড়ি রায়কে টানিয়া আনিয়া গৌড়িয়া গোবিন্দ নাম দিয়া তাড়াতাড়ি সিংহাসনে বসাইলেন; এবং বিগ্রহ-রক্ষার্থ বিপুল আয়োজন করিলেন। কিন্তু নগর রক্ষার্থ তেমন ব্যবস্থা হইল না; জগন্নাথদেবকে লইয়াই সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তা' হইলেও নগরে এত লোক, এত অস্ত্র সমবেত হইয়াছিল যে, কালাপাহাড়কে পনর দিবসকাল নগরদ্বারে বসিয়া নানা কৌশল উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। পনর দিন পরে কালাপাহাড় যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, তখনও তাঁহাকে প্রত্যেক পাদভূমি নররক্তে রঞ্জিত করিয়া শবস্তূপের উপর দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

পথে পথে এইরূপ তিন দিন যুদ্ধ করিয়া কালা-পাহাড় অবশেষে একদা মধ্যাহ্নে গরুড়স্তম্ভের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইবার অবসর পাইলেন না। মন্দির-প্রাচীরের উপর অগণিত

ধানুকী সৈন্য ভল্ল, তীর ও শূল-হস্তে দণ্ডায়মান ছিল; তাহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র কালাপাহাড়কে অস্থির করিল। সহস্র সহস্র উৎকল-যোদ্ধা বিস্তীর্ণ মন্দির-প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছিল। কালাপাহাড় একটু পিছাইয়া সোপানাবলীর সম্মুখে একটা কামান বসাইলেন। উৎকলযোদ্ধা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পিছাইল না। মহাপ্রভুর নামোচ্চারণ করিতে করিতে একে একে প্রাণ দিল, কিন্তু এক জনও নড়িল না। কালাপাহাড় যখন সোপানতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন শবস্তূপে তাঁহার পথ রুদ্ধ। মৃতদেহ সরাইয়া কালাপাহাড়কে পথ করিতে হইল।

উপরে—মন্দির-প্রাঙ্গণে—কালাপাহাড়কে বিপুল বাধা পাইতে হইল। সেখানে কামান বা বন্দুক চলিল না; খড়্গ ও শূল লইয়া হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে হইল। পাঠান হটিল; আবার অগ্রসর হইল; আবার পিছাইল। অবশেষে পাঠানকে ফিরিয়া আসিয়া গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইতে হইল। ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া কালাপাহাড় উলঙ্গ কৃপাণ-হস্তে পুনরায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পিছনে বাছা বাছা দুই হাজার পাঠানযোদ্ধা চলিল।

এবার কালাপাহাড়ের গতি কেহ রোধ করিতে পারিল না। তাঁহার সুদীর্ঘ খড়্গাঘাতে শতাধিক হিন্দুযোদ্ধা লুটাইয়া পড়িল। ক্ষণমধ্যে শবস্তূপে প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। কিন্তু হিন্দু পিছাইল না; হিন্দু বিগ্রহ-রক্ষার্থে প্রাণ দিতে আসিয়াছিল,—প্রাণ লইয়া পলাইতে আসে নাই। যে হিন্দুর অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল, সে মৃত যোদ্ধার হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। যাহার সে সুযোগ হইল না, সে মুষ্ট্যাঘাতে পাঠান মারিতে লাগিল। যে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল, সে পতনকালে এক জন না এক জন শত্রুকে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িল। এইরূপে হিন্দু, দেবতার শত্রুকে মারিয়া প্রাণ দিতে লাগিল। কিন্তু প্রাণ দিয়াও হিন্দু, বিগ্রহ রক্ষা করিতে পারিল না; পাঠান শ্রীমন্দিরের দ্বারে গিয়া উঠিল

সেখানে মুষ্টিমেয় হিন্দু যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহা পাঠান পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। শবস্তূপে দ্বারপথ বন্ধ হইয়া গেল; হিন্দু সেই স্তূপের উপর উঠিয়া লড়াই করিতে লাগিল। হিন্দুর শ্রান্তি নাই, ভয় নাই। পাঠান এক দল শ্রান্ত হইয়া পিছাইয়া যায়, নূতন দল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। দশ জন পাঠান ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়ে, বিশ জন পাঠান তাহার স্থান গ্রহণ করে। কিন্তু হিন্দু মরিলে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। অবশেষে পাঠান শবরাশি সরাইয়া মন্দিরের ভিতর গিয়া উঠিল। সেখানে অন্ধকার; কালাপাহাড়ের আদেশে শত দীপ ক্ষণমধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। কালাপাহাড় দাঁড়াইল, মূর্ত্তিপানে চাহিল।

এই কি সেই লোকবিশ্রুত জগন্নাথ? এই কি সেই পদ্মপত্রায়তনয়ন শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধারী শান্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি? এই কি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার সনাতনী প্রতিমা? অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত রূপ লুকাইয়া রাখিয়া এ কি ভয়াবহ মূর্ত্তিতে দর্শন দিতেছ নাথ?

কালাপাহাড় মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দহীন-নয়নে প্রতিমা-পানে চাহিলেন। তার পর দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার চরণ ধরিয়া সবলে টানিলেন। প্রতিমা কাঁপিয়া উঠিল। এক ব্যক্তি বেদীর পিছন হইতে সহসা অগ্রসর হইয়া কালাপাহাড়ের সম্মুখীন হইল; এবং পাঠান-সেনাপতির হস্তধারণ করিয়া বলিল, "মুসলমান, ক্ষান্ত হও।"

কালাপাহাড় বলিলেন, "কে, বেসর মহান্তি? এখনও জীবিত আছ?"

মহান্তি। প্রভুর ইচ্ছা, তাই বেঁচে আছি।

কালাপাহাড়। দেখি, তোমার প্রভু কেমন তোমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারেন?

বলিয়া তিনি এক জন পাঠানকে ইঙ্গিত করিলেন। পাঠান অগ্রসর হইয়া মহান্তিকে কাটিতে খড়্গ উঠাইল; কিন্তু খড়্গ নামিল না। মহান্তি গদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "মুসলমান, তুমি আজও বুঝ নাই, খোদাতালার ইচ্ছা ব্যতীত একটি পিপীলিকাও পদতলে মর্দ্দিত হইতে পারে না।"

কালাপাহাড় ফিরিয়া দেখিলেন, পাঠান সৈনিকের উত্থিত হস্ত শূন্যে রহিয়াছে—পাঠান হাত নামাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেছে না। সে একটু ভীত, ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেনাপতি দ্বিতীয় পাঠানকে ইঙ্গিত করিলেন। সে হাত উঠাইল, কিন্তু নামাইতে পারিল না। কালাপাহাড় দেখিলেন, এক বৌদ্ধ ভিক্ষু দ্বিতীয় পাঠানের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ভিক্ষুর মূর্ত্তি কালাপাহাড়ের নয়ন হইতে দূরে অপসৃত হইতে না হইতেই মন্দির পরিপূরিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে নিনাদিত হইল,—"কালাচাঁদ, প্রণাম কর—জগন্নাথ সুভদ্রা বলরামকে প্রণাম কর—বুদ্ধ ধর্ম্মসঙ্ঘের সম্মুখে মস্তক নমিত কর—শান্ত ভক্তি মুক্তিকে বরণ কর।"

কালাপাহাড়ের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মস্তক নমিত হইয়া আসিল, সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল;

তিনি ক্ষণেকের জন্য আত্মবিহ্বল হইলেন, তা'র পর সেই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা দূর করিয়া ফেলিয়া কালাপাহাড় মেঘমন্দ্র-কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"মূর্ত্তি উঠাও।"

বিশ ত্রিশ জন পাঠান বেদীর উপর উঠিল ; এবং জগন্নাথদেবকে ধরিয়া নীচে নামাইল। তার পর 'আল্লা' 'আল্লা' রবে ক্ষেত্রভূমি ফাটাইয়া মূর্ত্তি বহিয়া লইয়া সমুদ্র-অভিমুখে চলিল। কালাপাহাড় অশ্বারোহণে সকলের আগে ; বুনা তাঁহার পিছনে—দ্বিতীয় অশ্বে। কালাপাহাড় নয়ন ফিরাইয়া চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, কিন্তু পথে কোনও স্থানে তাঁহার দর্শন পাইলেন না। কালাপাহাড় যেন একটু নিরাশ হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

স্থির হও বারিধি, স্থির হও। চঞ্চল চরণে আর বহিও না, গর্ব্বে আর স্ফীত হইও না, হুঙ্কারে আর গগন ফাটাইও না। ফিরিয়া দেখ, তোমার তটে সান্ধ্যগগন আলোকিত করিয়া কাহার চিতা জ্বলিতেছে। যাহার ইচ্ছায় তুমি সৃষ্ট, যাহার পূত চরণ স্পর্শ করিয়া তোমার এত অহঙ্কার, যাহার পূজার্থে তুমি নিয়ত পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতেছ, আজ তাঁহার চিতা তোমার তটে জ্বলিতেছে। লক্ষ লক্ষ চিতা তোমার তটে জ্বলিয়াছে, কোটি কোটি শব তোমার গর্ভে নিহিত রহিয়াছে ; কিন্তু তোমার রাজা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির চিতা প্রজ্বলিত হইতে কখন দেখিয়াছ কি ? চিতা ধূ-ধূ জ্বলিতেছে—চাহিয়া দেখ—বিশ্বে যে যেখানে আছ, কোটি নয়নে চাহিয়া দেখ—বিশ্বপিতার চিতা আজ সমুদ্র-উপকূলে পুড়িতেছে।

যেখানে জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি পুড়িতেছিল, তাহার অদূরে ব্রজবালার ক্ষুদ্র কুটীর। ব্রজবালা তখন সৈকতভূমে দণ্ডায়মানা। তিনি প্রাতঃকালেই শুনিয়াছিলেন, মন্দির পাঠান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। উৎকর্ণ হইয়া ব্রজবালা সমস্ত দিন গগনভেদী সমর-কোলাহল শুনিতেছিলেন। সন্ধ্যাকালে ললাটীর নিকট শুনিলেন, পাঠান শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক বলতে পার কি ললাটী, শ্রীবিগ্রহ হ্রদ-গর্ভে লুকিয়ে ফেল্‌্যু হয়েছে কি না ?"

"না মা—আমি জানি নে ; নগরের ভিতর আমি ত যেতে পারছি না।"

এমন সময় নটবর রক্তাক্ত-কলেবরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "প্রতিমা লুকান হয় নি—তোমার কথা কেহ শুনে নি মা ! শীঘ্রই প্রতিমা দেখ্‌তে পাবে।"

বলিতে বলিতে নটবর ছুটিয়া পলাইল এবং অন্ধকার-ক্রোড়ে সত্বর অদৃশ্য হইল। ললাটী চিন্তিতান্তঃকরণে তাহার অনুসরণ করিল। দূরের কোলাহল নিকটতর হইল ; মশালের আলোকে মনুষ্যাবয়ব দৃষ্ট হইতে লাগিল। নির্ম্মলা কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা ছিল ; সে ভীত হইয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজবালা একাকিনী সমুদ্র-সৈকতে দণ্ডায়মান থাকিয়া কোলাহল শুনিতে লাগিলেন।

এমন সময় অকস্মাৎ এক ব্যক্তি অন্ধকারের ভিতর হইতে আসিয়া ব্রজবালার হাত চাপিয়া ধরিল ; এবং ব্যস্ততাসহ বলিল, "রাণি, রাণি, শীঘ্র পালিয়ে এস।"

রাণী কণ্ঠস্বরে চিনিলেন, এ ব্যক্তি ভৃগুরাম ! তিনি রোষভরে বলিলেন, "ভৃগুরাম, এত স্পর্দ্ধা !"

"এখন কে তোমায় রক্ষা করবে ব্রজসুন্দরি ?"

এইরূপে অভিহিত হইয়া ব্রজবালা জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং সবলে হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন, এখনি তা দেখবে, পাপিষ্ঠ !"

যে-বেগে রাণী হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সে বেগ ভৃগুরাম সহ্য করিতে পারিল না—তাহার চরণ টলিয়া উঠিল। এমন সময় একটা তরঙ্গ আসিয়া ভৃগুরামকে আঘাত করিল। ভৃগুরাম বালুকার উপর পড়িয়া গেল ; সে আর উঠিতে পারিল না। তরঙ্গ একবার টানিয়া লইয়া যায়, আবার নির্ম্মমভাবে টানিয়া আনিয়া কূলের উপর আছড়াইয়া ফেলে। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্রজবালার বড় কষ্ট হইল। তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভৃগুরাম অন্ধকারে সে প্রসারিত হস্ত লক্ষ্য করিতে পারিল না। ব্রজবালার দৃষ্টি ও মন সহসা অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, কয়েক জন পাঠান জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আনিয়া বেলাভূমির উপর স্থাপন করিল। পুরোভাগে অশ্বারোহণে কালাপাহাড়। তাঁহার চতুর্দ্দিকে বহুতর ব্যক্তি প্রজ্বলিত মশাল লইয়া চলিয়াছে। সৈন্যেরা সমুদ্রকূলে আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে ব্যূহরচনা করিল। ব্রজবালা দূর হইতে দেখিলেন, কালাপাহাড় অশ্ব হইতে নামিয়া বেলাভূমিতে দাড়াইলেন। তাঁহার পার্শ্বে আর এক জন কে দাড়াইল ; এ ব্যক্তি বুনা। কিন্তু ব্রজবালা তাহাকে চিনিতে পারিলেন না ; অথচ পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তা'র পর সহসা প্রতিমা জ্বলিয়া উঠিল। ব্রজবালা আত্মবিস্মৃত হইয়া মহাপ্রভুর প্রজ্বলিত মূর্ত্তি প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

ব্রজবালার সে সমাধি নটবর ভঙ্গ করিল। সে বলিল, "প্রতিমা পুড়্‌ছে, তাই দেখ্‌ছ মা? দেখ, দেখ—নয়ন ভ'রে দেখ—উড়িষ্যার ভাগ্য, সুখ, ধর্ম্ম পুড়্‌ছে দেখ; ভস্মাবশেষ কিছু কি ফিরে পাব না? ওই যে মেঘ উঠ্‌ছে—"

ব্রজবালা সহসা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ক্রমে বুঝিলেন, নটবর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, আর ভৃগুরাম পায়ের কাছে লুটাইতেছে। তিনি ভৃগুরামকে রক্ষা করিতে পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিলেন। নটবর জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে মা?"

"ভৃগুরাম।"

"তা'র এমন দুর্দ্দশা কেন?"

"জগন্নাথদেবের ইচ্ছা; অপরাধ—আমার হাত ধরেছিল।"

"আমার মায়ের হাত—"

মুখের কথা শেষ না করিয়াই নটবর, ভৃগুরামকে জল হইতে টানিয়া তুলিল; এবং বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানা ক্ষুদ্র খড়্গ বাহির করিয়া তাহার বক্ষোমধ্যে আমূল প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। নটবর ক্ষণেকের জন্য নীরব নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইল। তার পর বিকট হাস্য করিয়া খড়্গ উঠাইয়া লইল; এবং টলিতে টলিতে জলের উপর দিয়া প্রতিমার দিকে ছুটিল। ব্রজবালা দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিলেন, তা'র পর নটবরের অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

এমন সময় সমস্ত বিশ্ব চমকিত করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। পাঠান শিহরিয়া উঠিল; সমুদ্রের উপর মেঘের গর্জ্জন পাঠান কখন শুনে নাই। কিন্তু কালাপাহাড় নির্ভীক বুনা ভীতচিত্তে সরিয়া আসিয়া কালাপাহাড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইল। আবার মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল—আকাশ পৃথিবী উদ্ভাসিত করিয়া তড়িল্লতা খেলিয়া গেল। সেই আলোকে কালাপাহাড় দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে—অদূরে এক জটাজুট-সমন্বিত মহাতেজঃপুঞ্জ দীর্ঘাকার সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তিনি ডাকিলেন, "কালাচাঁদ।"

সেনাপতি চমকিয়া উঠিলেন যিনি মেঘের ডাক গ্রাহ্য করেন নাই, তিনি এখন অন্তরমধ্যে কাঁপিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই সন্ন্যাসীকেই যেন তিনি ক্ষণপূর্ব্বে বৌদ্ধভিক্ষুরূপে মন্দিরমধ্যে দেখিয়াছিলেন। কালাচাঁদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন সন্ন্যাসী ডাকিলেন—"কালাচাঁদ।"

কালাচাঁদ। তোমাকে চিনেছি সন্ন্যাসি! তুমিই এক দিন বাল্যকালে আমার করেরখা দেখে বিষপ্রয়োগে আমাকে সংহার করতে জননীকে পরামর্শ দিয়েছিলে।

সন্ন্যাসী। পরামর্শটা কি অন্যায় হয়েছিল, কালাচাঁদ?

কালাচাঁদ। যা'র বিশ্বাস, ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাটি পড়ে না, তা'র পক্ষে এ পরামর্শ অন্যায় হয়েছিল।

সন্ন্যাসী। তোমার যদি বিশ্বাস থাকিত, বাক্য মনঃ সকলই তিনি, তাহা হইলে তুমি এ কথা বলিতে না। তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ—গর্ব্বই তাহার অন্তরায়। তুমি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু তোমার গর্ব্ব পর্ব্বতপ্রমাণ। আজ তোমার দর্প চূর্ণ হইবে—তাঁহারই ইচ্ছায় এই দারুময়ী প্রতিমা তোমার কবল হইতে রক্ষা পাইবে।

কালাচাঁদ। পৃথিবীর শক্তি একত্র হইলেও এই প্রতিমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

সন্ন্যাসী। এখনও গর্ব্ব! বেসর মহাস্তির কাছে শিক্ষা পাইয়াও কি চৈতন্য হয় নাই? বিংশতিসহস্র-সৈন্য-পরিবেষ্টিত দুর্দ্দান্ত পাঠান-সেনাপতি, এক জন অস্ত্রহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট পরাস্ত হইল; ইহা দেখিয়াও কি বুঝিলে না, তোমার শক্তি কত সামান্য—তুমি কত ক্ষুদ্র? তবে দেখ, গর্ব্বি—

তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে আকাশ ভীম-গর্জ্জনে ডাকিয়া উঠিল; সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। অচিরে প্রজ্বলিত প্রতিমার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। অনেক মশালও নিবিয়া গেল। পাঠান কেমন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কালাপাহাড় চীৎকার করিয়া আদেশ করিলেন, "তবু জগন্নাথের রক্ষা নাই প্রতিমা সমুদ্রজলে ডুবাও।"

বিশ পঁচিশ জন পাঠান আসিয়া প্রতিমা ধরিল এবং বহিয়া লইয়া সমুদ্রজলে ফেলিতে চলিল। তখন অনেক মশাল নিবিয়া গিয়াছিল; কয়েকটা মাত্র সেনাপতির অদূরে জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে মৃদু ও অস্পষ্ট আলোকে কিছুই ভাল দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টিও মুষলধারে পড়িতেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি বুকে হাঁটিয়া দন্তে খড়্গ ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে কালাপাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। লোকটা তাহার পিছনে আসিয়া হস্তে খড়্গ লইল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। তা'র পর কালাপাহাড়ের পৃষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া খড়্গ উঠাইল। কিন্তু সে খড়্গ কালাপাহাড়ের পৃষ্ঠে পড়িল না—আর এক জনের বক্ষে পড়িল। সেনাপতি সচকিতে ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, ব্রজবালা

ভূলুণ্ঠিত, আর তাহার সন্নিকটে এক ব্যক্তি রুধিরাপ্লুত-দেহে দণ্ডায়মান ;—এ ব্যক্তি নটবর।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কালাপাহাড় বুঝিলেন, ব্রজবালা তাঁহার জীবন-রক্ষার্থে প্রাণ দিয়াছে। কেন সে প্রাণ দিল? যা'র নির্য্যাতনই ব্রজবালার ব্রত ছিল, এখন তা'র জীবন-রক্ষার্থে কেন সে তা'র স্বার্থভরা প্রাণ দিল? কালাচাঁদ স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বিকলচিত্তে ব্রজবালার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। যে মুখ তিনি আর দেখিবেন না স্থির করিয়াছিলেন, সেই মুখপানে পলকশূন্য নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

এই কি সেই ব্রজবালা? যা'র এক বিন্দু প্রীতি পাইলে আজ এই শুষ্ক মরুভূমি কুসুম-উদ্যানে পরিণত হইত—উড়িষ্যা আজ অক্ষত থাকিত—বাঙ্গালা পাঠানশূন্য হইত, এই কি সেই লোকললামভূতা দীপ্তিময়ী ব্রজবালা?

বুনা একটা মশাল লইয়া ত্বরিতপদে কালাপাহাড়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুনা দেখিল, ব্রজবালার হৃদয়মধ্যে তখন খড়্গ প্রোথিত রহিয়াছে। বুনা খড়্গ উঠাইতে সাহস করিল না—কি জানি, যদি রক্তস্রাবে ব্রজবালার মৃত্যু ঘটে। ব্রজবালা সজ্ঞান, হাস্যমুখী। বুনা তাঁহাকে নাড়িতে সাহস করিল না; সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কালাচাঁদের মুখপ্রতি চাহিল। দেখিল, তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানবিরহিত,—অনিমেষ-নয়নে ব্রজবালার প্রীতিভরা মুখখানি দেখিতেছেন। এ প্রীতি ব্রজবালার নয়নে বা বদনে পূর্ব্বে তিনি আর কখন দেখেন নাই। ব্রজবালাও সমস্ত প্রাণটা নয়নে আনিয়া কালাচাঁদকে দেখিতেছিলেন।

এমন সময় নটবর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ হয়েছে, মা—বেশ হয়েছে; যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল। তুমিই ত আমার মাথা খেয়েছ। শিখালে ধর্ম্ম, শিখালে দেশ-প্রীতি, এখন তা'র ফল ভোগ কর।"

তা'র পর পাঠান-সেনাপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "কালাপাহাড়, দেশের শত্রু' ধর্ম্মের শত্রু! আমি তোমাকে মারতে এসেছিলাম; তোমাকে না মেরে, যে আমার ধর্ম্ম অপেক্ষা, দেশ অপেক্ষা বড়, তা'কে মেরেছি—আমাকে শাস্তি দাও।"

কালাপাহাড় নড়িলেন না, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না—যেমন অবস্থায় ব্রজবালার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই জন পাঠান নটবরকে লইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্রজবালার মস্তক বুনা কোলের উপর উঠাইয়া লইল; তখন ব্রজবালার দৃষ্টি সহসা বুনার মুখপ্রতি পড়িল। তিনি বলিলেন, "দিদি—ভূপবালা, তুমি?"

বুনা মুখ ফিরাইয়া লইল; এবং সজল ক্ষমাপ্রার্থী চক্ষু দুইটি উঠাইয়া কালাচাঁদের বদন প্রতি স্থাপন করিল। কিন্তু কালাচাদ সে দিকে লক্ষ্য করিলেন না,—তাঁহার নয়ন-মন ব্রজবালার প্রতি। মৃদুকণ্ঠে একবার ডাকিলেন,—"ব্রজ, আমার ব্রজরাণী—"

ব্রজবালার নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—বদনময় একটা জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল।

এমন সময় সন্ন্যাসী দূর হইতে সমুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "ওই দেখ কালাচাঁদ, অর্দ্ধদগ্ধ প্রতিমা তরঙ্গশিরে ভাসিয়া চলিয়াছে, আর বেসর মহাশক্তি মূর্ত্তির চরণ ধরিয়া যাইতেছে। মহাশক্তি প্রতিমা রক্ষা করিবে, আবার স্বস্থানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে। তোমার গর্ব্ব বৃথা, শক্তি বৃথা।"

কালাচাঁদের সমাধি-ভঙ্গ হইল,—তিনি সমুদ্রপানে নয়ন ফিরাইলেন; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সব অন্ধকার—নিবিড় অন্ধকার। সন্ন্যাসীর কণ্ঠ আবার গর্জ্জিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "অন্ধকার ভেদ করিতে অসমর্থ হইলে কালাচাঁদ? তবে কেন শক্তির গর্ব্ব কর? ওই দেখ—সম্মুখে, নিকটে চাহিয়া দেখ—আমি তোমাকে চক্ষু দিতেছি, চাহিয়া দেখ—মহাশূন্যে তোমার মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে—ওই দেখ, তোমার হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ জিহ্বা একে একে খসিয়া পড়িতেছে—"

কালাপাহাড় শিহরিয়া উঠিলেন। ভূপবালার হাতের আলো নিবিয়া গেল—একে একে সকল মশালই নিবিয়া আসিল। চারিদিক্ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। সেই নিবিড় অন্ধকার কাঁপাইয়া, সমুদ্র-গর্জ্জন ডুবাইয়া সন্ন্যাসীর গগনভেদী কণ্ঠ আবার উঠিল। হিন্দু, পাঠান সকলে শুনিল, সন্ন্যাসী বলিতেছেন,—"আবার দেখ—দূরে চাহিয়া দেখ—গগনস্পর্দ্ধী সমুচ্চ মন্দিরচূড়া—মন্দিরমধ্যে লক্ষ শালগ্রামের উপর প্রেমময় জগন্নাথদেবের সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি। দেখ, ত্রিলোক দেবদর্শনে ছুটিয়া চলিয়াছে—ওঙ্কার মূর্ত্তি ধরিয়া প্রতিমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বেদ, গীতা, ধর্ম্ম, সজ্জরূপে পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে,—ওই দেখ, জয় জগন্নাথ!"

সমাপ্ত

বঙ্গসংসার

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

(তৃতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত)

চঞ্চলাধিপতি মহানুভব

শ্রীযুক্ত রাজা শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী

বাহাদুর মহোদয়েষু—

মহাত্মন্,

বাঙ্গালার অনেক দেশ ঘুরিয়াছি, অনেক রাজা-মহারাজার পরিচয় পাইয়াছি , কিন্তু আপনার ন্যায় কেহই আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এ জেলায় আসিয়া যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই আপনার কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়, চতুর্দ্দিকে আপনার যশোগান শ্রুত হয়। আমি ভক্তিবিহ্বলচিত্তে নিষ্কলঙ্কচরিত্র আদর্শ পুরুষকে, প্রজারঞ্জক আদর্শ জমীদারকে, বিনয়সৌজন্যের অবতার মহামহিমময় মানুষকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম। কৃপা করিয়া গ্রহণ করিবেন কি ?

মালদহ,
কার্ত্তিক, ১৩২৮

গুণমুগ্ধ
গ্রন্থকার

বঙ্গসংসার

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভাগীরথী-উপকূলবর্ত্তী কোন অট্টালিকার ছাদে বসিয়া একদা অপরাহ্নে স্বামী স্ত্রীকে বলিতেছে, "কেন, বিলি, আবার বাপের বাড়ী যাবার কথা বলিতেছ?"

বিজলী ওরফে বিলি উত্তর করিল, "কেন, তা' ত তোমায় বলেছি! দাদা একটু ভাল হ'লেই আবার আসব।"

স্বামী বলিল, "আসবে তা' ত বুঝিলাম। কিন্তু যত দিন না এস, তত দিন?"

বিলির চোখে জল আসিল; একটু কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তত দিন তোমার যা', আমারও তাই!"

স্বামী। তবে কেন দু'টি প্রাণ কাঁদাইয়া যাইতে চাও?

স্ত্রী। কেন চাই, তাহা ত বার বার বলেছি। যদি পিত্রালয়ে গেলে প্রাণে ব্যথা পাও, তবে যাব না।

স্বামী নির্ম্মলকুমার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ব্যথা পাব কি না, তাহা তুমি নিজের হৃদয় দিয়া বুঝিতে পার না? ভাইকে দেখিবার সাধ করিয়াছ, আমি তোমার সে সাধে বাধা দিব না।"

ক্ষণকাল উভয়ে নীরব। বিলির যেন কান্না আসিল, কিন্তু কি বলিয়া, কি ভাবিয়া কাঁদিবে, তাহা খুঁজিয়া পাইল না। অস্থির মনকে শান্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিল, "আমি যাব না।"

স্বামী। কেন, বিলি?

স্ত্রী। তুমি কেন হাসিতে হাসিতে আমায় ছেড়ে দিতেছ না?

স্বামী। হাসি যে আসছে না, বিলি!

স্ত্রী। অন্যবারে ত' এমন কর না?

স্বামী। এবার আমার প্রাণ কাঁদছে; জানি না, কপালে কি আছে।

আবার উভয়ে নীরব। উভয়ের হৃদয়ে বৈশাখী মেঘ—বাহিরে গাম্ভীর্য্যময়ী সন্ধ্যা।

বিলি বলিল, "তুমিও কেন সঙ্গে চল না?"

এই অনুরোধে একটা কথা নির্ম্মলের মনে পড়িল। এক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মলকুমার একবার শ্বশুরালয়ে গিযাছিলেন। সে সময় বিলির ভ্রাতৃজায়া, নির্ম্মলের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। সে প্রার্থনা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। নির্ম্মল তদবধি শ্বশুরালয়ে গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিলি এ সকল কথা জানিত না, নির্ম্মল কাহাকেও কিছু বলেন নাই। এক্ষণেও সে সকল কথা না তুলিয়া বলিলেন, "মাকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।"

এ কথাটাও প্রকৃত। নির্ম্মল মাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতেন না। শ্বশুরালয়ে দুই এক দিনের বেশী থাকিতে পারিতেন না। কোথাও বেশী দিন থাকিতে হইলে মাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

বিলি উত্তর করিল, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দুই দিন থাক।"

নির্ম্মল সহসা কোন উত্তর করিলেন না। বুঝি তাঁহার প্রাণে একটু ব্যথা লাগিল। ক্ষণকাল পরে স্নেহভরা কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কবে ফিরিবে বিলু?"

স্ত্রীর অপ্রসন্নতা দূর হইল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমায় ছাড়িয়া আমি কত দিন থাকিতে পারিব?"

স্বামী বলিল, "যত শীঘ্র পার ফিরিও।"

স্ত্রী সানন্দে স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। লাল রবির লাল আভা বিজলীর মুখে, গণ্ডে, বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় উষার ন্যায় বিজলীর ছবিখানি নীল আকাশপটে কে যেন আঁকিয়া দিয়াছে। নির্ম্মল দেখিলেন, বিজলীর মুখখানি অতি সুন্দর। একবার

সাধ হইল, বিলিকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলেন, "বিলি, আমায় ছেড়ে যেও না।"

বলিলে হয় ত সকল গোল মিটিয়া যাইত—বিলি পিতৃ-গৃহে যাইত না। কিন্তু বিলির প্রফুল্ল ও ব্যগ্র মুখখানি দেখিয়া নির্ম্মল সে ইচ্ছা দমন করিলেন। তবু আশাকুলিত প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলে যে?"

বিজলী বলিল, "একটা চুমো।"

নির্ম্মল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিলির রক্তরাগরঞ্জিত ওষ্ঠের উপর স্বীয় ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন। সুদীর্ঘ চুম্বনে বিলিকে বুঝাইয়া দিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কেন তাঁহার প্রাণ এত কাতর।

বিলি কাঁদিয়া ফেলিল; একবার ভাবিল, "এমন প্রেমময় স্বামী ছাড়িয়া কোথাও যাব না।" কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তিত মনোভাব মুখ দিয়া ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল বলিলেন, "বিলি, প্রত্যহ চিঠি লিখিবে ত? তোমার দাদা কেমন থাকেন, লিখিও।" বিলির মন আবার পিতৃগৃহের পানে ছুটিল। সে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাটোয়ার উত্তরে ভাগীরথীর উপকূলে বধূগ্রাম নামে এক সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম আছে। গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন করা যখন আজকাল প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরাও সেই মহাজন-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন করিলাম। কিন্তু প্রকৃত ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই বধূগ্রামে অবনীশচন্দ্র বসু নামে এক জন প্রজারঞ্জক জমীদার ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র রাখিয়া অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহোদর ভ্রাতা অমরীশচন্দ্র ব্যতীত নিকটাত্মীয় আর কেহ ছিল না; সুতরাং বিষয়-রক্ষণাদির ভার অমরীশ বাবুর উপর পড়িল। অমরীশ বাবু নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে একটু তীব্রদৃষ্টি রাখিতেন। তিনি নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মলকুমারের বিষয়াদি কিয়ৎপরিমাণে নীলামের ডাকে নিজের নামে কিনিয়া লইলেন। তবে কতক সম্পত্তি নির্ম্মলের রহিল। গ্রামের জমীদারী, দু' একখানা তালুক, প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা, প্রজার ভালবাসা, বংশখ্যাতি নির্ম্মলের রহিল।

অবনীশ বাবুর বিধবা স্ত্রী অন্নপূর্ণার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মলের বিদ্যাশিক্ষালাভ ও চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। অন্নপূর্ণা উচ্চকুলোদ্ভবা, শিক্ষিতা মহিলা। তিনি নির্ম্মলের ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া দশম-বর্ষীয়া বধূ বিজলীকে ঘরে আনিয়া জীবনের সাধ মিটাইয়াছিলেন।

এখন নির্ম্মলের বয়স বিংশতি বৎসর। তাঁর চেয়ে বিজলী তিন বৎসরের ছোট। বিজলীর রূপে নির্ম্মলের হৃদয় সুখ-পরিপ্লুত। কিন্তু তা'র রূপের চেয়ে গুণ বেশী। সে বড়মানুষের মেয়ে হইয়াও গৃহস্থালীর কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করে না—শাশুড়ীর যত্নসেবা করিতে কখনও অবহেলা করে না—কাঙ্গাল-গরীবকে অর্থ বা আহার্য্য দিয়া সাহায্য করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হয় না। স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতি তাহার ভালবাসা ও ভক্তি, গ্রামের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।

বিজলী চলিয়া গেলে পর নির্ম্মল গঙ্গাবক্ষ-পানে চাহিয়া একাকী ছাদে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে দেখিলেন, একখানি ছোট বজরা তাঁহার অট্টালিকা-সংলগ্ন খিড়কীর ঘাট পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুখে বাদাম তুলিয়া ছুটিল। উন্মুখ হইয়া দেখিলেন, বজরার গবাক্ষে বিজলী বসিয়া রহিয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধ-উৎক্ষিপ্ত জলভারাকুল নয়ন ব্যগ্রভাবে সৌধচূড়ায় কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তদ্দৃষ্টে নির্ম্মলের চোখে জল আসিল—প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। চক্ষু মুছিয়া নির্ম্মল আবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বিজলী গলায় কাপড় দিয়া যুক্তকরে তাঁহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে। নির্ম্মল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিলিকে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে ক্ষিপ্রপদে সৌধচূড়া হইতে অবতরণ করিলেন। দ্বিতলে আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির ধারে একটি বালক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নির্ম্মলকে দেখিয়া বালক বলিল, "নূতন দাদা, মা তোমায় ডাকছে—একবার এস।"

নির্ম্মল বলিলেন, "কেন—যাচ্ছি।"

নির্ম্মল তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় অন্নপূর্ণা ডাকিলেন, "বাবা নির্ম্মল, ওদের বাড়ী বড় বিপদ; তুমি এখনি যাও।"

নির্ম্মল দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা, কি হয়েছে?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সোহাগের বাপ বুঝি বাঁচে না।" "যাইতেছি" বলিয়া নির্ম্মল নীচে ছুটিয়া আসিলেন। ঘাটের ধারে আসিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া দেখিলেন; কিন্তু বজরা কোথাও দেখা গেল না। বজরা তখন বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে।

নির্ম্মল ক্ষণকাল যে দিকে বজরা গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নির্ম্মল শূন্যহৃদয়ে, ক্ষুব্ধান্তঃকরণে গৃহে ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁর মাযের কাছে সেই বালক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তাহার প্রার্থনাও মনে পড়িল। বালকের বাড়ী আনন্দপুরে; তথায় যাইতে হইলে নৌকাপথই প্রশস্ত। নির্ম্মল তাই নৌকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন।

নির্ম্মলের একখানি বজরা ও দুইখানি ছোট নৌকা ছিল। জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশিতে বিজলীকে বজরায় লইয়া গঙ্গার উপর নির্ম্মল কখনও কখনও বেড়াইতেন। নিজে হাল্ ধরিতেন, কখনও কখনও গান করিতেন। বিজলী কাছে বসিয়া গান শুনিত। আর কেহ থাকিত না। বজরা নিম্মলের বিলাসের সামগ্রী। সেই বজরা, আর সেই বিজলী এখন কত দূরে!

বালককে সঙ্গে লইয়া নির্ম্মল একখানি নৌকায় উঠিলেন। ঘাট ছাড়িয়া নৌকা দক্ষিণদিকে ছুটিল; এবং সত্বর আনন্দপুরের ঘাটে আসিয়া পৌছিল।

আনন্দপুর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। বধূগ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নির্ম্মলকুমার দিবসে এই পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিয়া থাকেন। রাত্রিতে অথবা সঙ্গে লোক থাকিলে সচরাচর নৌকাপথই অবলম্বন করিতেন।

ঘাটের সন্নিকটেই সোহাগের বাপের বাড়ী। নির্ম্মল পথে যাইতে যাইতে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেম, তোমার কেদার জ্যেঠা কি তোমার বাপকে দেখতে এসেছিলেন?"

হেম বলিল, "না, ও বাড়ীর কেউ দেখ্‌তে আসেনি। মা কেবল কাঁদ্‌ছেন।"

বালক চুপ করিল। বালকের নাম হেম; বয়স দশ বৎসর মাত্র।

অতঃপর দুই জনে একটা একতল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটা পুরাতন, বহুদিন সংস্কার হয় নাই। কক্ষ সকল অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন; প্রাঙ্গণে ময়লা, বারান্দায় আবর্জ্জনা।

অন্তঃপুরস্থ একটি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল দেখিলেন, সোহাগের বাপ একটা পালঙ্কের উপর শুইয়া রহিয়াছেন, আর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পত্নী ও কন্যা পরিচর্য্যা করিতেছে। নির্ম্মলকে দেখিয়া সকলেরই একটু ভরসা ও আনন্দ হইল। নির্ম্মল মুমূর্ষুর পার্শ্বে বসিয়া একবার নাড়ী টিপিলেন, একবার গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন; পরে ডাক্তার আনিতে নৌকার মাঝিকে পাঠাইয়া দিলেন।

রোগীর চৈতন্য ও বাক্‌শক্তি সম্পূর্ণ ছিল। সে বলিল, "বাবা নিম্মল, এখন ডাক্তার আসিয়া আমার কি করিবে? এখন তোমাকে আমার প্রয়োজন। জগতে আমার বন্ধুর মত বন্ধু বলিতে কেহ নাই। তোমার মত নিঃস্বার্থ পরোপকারী সংসারে বিরল; তাই তোমায় ডাকাইযাছি। বাবা, এ সময় যদি আমার প্রার্থনা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হও, তাহা হইলে আমি সুখে মরিতে পারি।"

নির্ম্মল বলিলেন, "কালী খুড়ো, আমার নিকট আপনি এত সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? আপনার যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

কালী বাবু বলিলেন, "বাবা, আমার জীবনের কাহিনী সকলই জান। মদ খাইয়া মকর্দ্দমা করিয়া সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়াছি। সমস্তই কেদার নিয়েছে। বাপের অগাধ বিষয়ের সামান্যই এখন আছে। আছে কি না, তাহাও ঠিক জানি না। আজ দুই মাস শয্যাগত, কিছুই দেখি নাই। কোনখান হইতে এক পয়সাও পাই নাই। স্ত্রীর গহনা বেচিয়া খাইতেছি ও নিজের চিকিৎসা করাইতেছি।"

কালী বাবু নীরব হইলেন; সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

ক্ষণপরে মন একটু শান্ত হইলে তিনি বলিলেন, "সোহাগের বিবাহ দিব ব'লে কিছু টাকা রাখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও মদ ও মকর্দ্দমায় নষ্ট হইয়াছে। এখন আমি নিঃস্ব। যখন অর্থ ও আয়ু দুই ফুরাইল, তখন আমার জ্ঞান জন্মিল। এ জ্ঞান কেবল আমায় যাতনা দিতে আসিয়াছে। এক্ষণে তুমি ভিন্ন এ অনাথ বালকবালিকার উপায়ান্তর নাই। আমার স্নেহের সোহাগ ও হেমকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। দেখো বাবা, তারা যেন এক মুঠা অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া না বেড়ায়।"

নির্ম্মলের চক্ষে জল আসিল। ভাবিলেন, সেই কালীনাথ মিত্র—যাহার প্রতাপে আনন্দপুর এক দিন কাঁপিত,—সেই কালী খুড়ার আজ এই দশা! যৌবনে পিতার সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি পাইয়া কালী বাবু বাসনার স্রোতে দেহ-মন ভাসাইয়া দিলেন।

কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাসকালে কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল; তাহাদের নিকট মদ খাইতে শিখিয়া গ্রামে আসিয়া খোলা ভাঁটী খুলিলেন। মধুর গন্ধে চারিদিক্ হইতে মক্ষিকা আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সরিক কেদার বাবুর সঙ্গে এক কাঠা জমী লইয়া মকদ্দমা বাধিল। সেটা চুকিতে না চুকিতে একটা ভাঙ্গা প্রাচীর লইয়া মকদ্দমা লাগিল। এইরূপে আজীবন মকদ্দমা চলিল। সঞ্চিত অর্থ সত্বর ফুরাইয়া আসিল। অবশেষে ঋণ করিয়া, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, মদ ও মকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। মধুভাণ্ড শূন্য হইলে মক্ষিকানিচয় সরিয়া পড়িল। প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হইবার সম সময়ে মকদ্দমার প্রবৃত্তি মিটিল। মদ ও মকদ্দমায় আজীবন মগ্ন থাকিয়া, এক্ষণে সন্তান-সন্ততিদিগকে অকূলে ভাসাইয়া, অনুতপ্তহৃদয়ে মহাবিচারকের নিকট সমুপস্থিত হইবার জন্য কালীনাথ যাত্রা করিলেন।

নির্ম্মলকে নীরব দেখিয়া কালী বাবু একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। বলিলেন, "বাবা, এদের ভার নিতে ইতস্ততঃ করিতেছ? তুমি সহায় না হইলে এরা যে অকূলে ভাসিবে, বাবা। আর যে আমার কেহ নাই—ভগবান্‌ও যে আমায় ছেড়েছেন।"

নির্ম্মল বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আমার যতদূর সাধ্য, ছেলেদের জন্য আমি ততদূর করিব। আজ হইতে আমি ইহাদের ভাই বোন্ ব'লে গ্রহণ করিলাম। যত দিন আমার এক মুঠা অন্নের সংস্থান থাকিবে, তত দিন এরাও খাইতে পাইবে।"

মুমূর্ষু কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "বাবা, তুমি চিরসুখী হও, ভগবান্ তোমায় রাজরাজেশ্বর করুন। তুমি ইহাদের রহিলে, আর এদের কিছুই রহিল না। আর—আর—যে কখনও আমায় তিরস্কার করে নাই, কটু বলে নাই, কখনও অপ্রসন্ন মুখ দেখায় নাই, সেই অনাথিনী বুড়ীকে একটু দেখিও।"

কালীনাথের কণ্ঠ ক্ষীণতর হইয়া আসিল—ক্রমে বাক্‌রোধ হইল। এমন সময় ডাক্তার বাবু আসিয়া পৌছিলেন। ডাক্তার নাড়ী টিপিয়া গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থারই প্রতীক্ষা হইতেছিল। নির্ম্মলের আহ্বানে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পৌছিল। ক্রন্দনের রোলের মধ্যে মুমূর্ষুর দেহ বহন করিয়া গঙ্গার ঘাটে আনা হইল। জাহ্নবীনীরে দেহ অন্তর্জ্জলি করা হইলে মুমূর্ষু ভাবিল, "এই পবিত্র তোয়ে কি আমার পাপরাশি ধৌত হবে? ভগবান্, আজীবন কখন তোমায় ডাকি নাই, ব'লে দাও প্রভু, ঐ উপরের আকাশে তুমি আছ কি না, আর এই নীচের জল তোমার পদ নিঃসৃতা ভাগীরথী কি না? যদি তাই হয়, তা' হ'লে তোমার পাদোদক সর্ব্বাঙ্গে মেখে, তোমার পানে চেয়ে মরিতে পারিলে আর ভয় কি, প্রভু।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিজলীকে পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিয়া বজরা চারি দিন পরে ফিরিয়া আসিল। মাঝিদের হাতে বিজলী একখানা পত্র দিয়াছিল। নির্ম্মল ব্যগ্রচিত্তে পত্র খুলিয়া পড়িলেন,—

"আমার জীবনসর্ব্বস্ব!

তোমায় ছাড়িয়া আসিয়া ভাল করি নাই। সমস্ত পথ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। এখানে আসিয়াও কান্নার বিরাম নাই। মায়ের আদর, ভাইয়ের স্নেহ কিছুই তোমার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভুলাইতে পারিতেছে না। প্রাণটা যেন শূন্য—শুধু হাহাকারময়। দু'দিন এখানে থাকিলে যদি মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে দাসী ছুটিয়া গিয়া সত্বর তোমার চরণে—মায়ের চরণে উপস্থিত হইবে। ইতি—

তোমারই বিজলি।"

নির্ম্মল একবার, দুইবার, দশবার পত্র পাঠ করিলেন। অতৃপ্তনয়নে পত্রপানে চাহিয়া রহিলেন। চক্ষুর জলে পত্র সিক্ত হইল। অবশেষে পত্রখানি বুকে ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠ ও কান্নার পর চিন্তা আসিয়া জুটিল। চিন্তায় কিছু সুখ পাইলেন। উঠিয়া গবাক্ষে দাঁড়াইলেন। নীচে জাহ্নবীর জল হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়াছে। আশা ও উৎসাহে নির্ম্মলের প্রাণ উছলিয়া উঠিল। ভাবিলেন, "বিজলি—আমার জীবনাধিক—আমার জীবনসর্ব্বস্ব বিজলি আমার জন্য এত কাতর।"

এমন সময় মা ডাকিল; পুত্র ছুটিয়া মায়ের কাছে গেল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বউমা কি লিখিয়াছেন, আমায় বলিলে না ত?"

মায়ের ইচ্ছা চিঠিখানা প'ড়ে শুনান হয়,—বুড়ীদের দশাই ঐ।

ছেলে আদুরে, সুতরাং লজ্জাহীন; স্বচ্ছন্দে চিঠিখানা মায়ের কাছে ফেলিয়া দিল। মা চিঠিখানা উঠাইয়া লইয়া পড়িলেন। তার পর পিছন ফিরিয়া লুকাইয়া চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। অবশেষে

গলা পরিষ্কার করিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তুমি কেন বাবা, একবার বিশালপুরে যাও না ?"

নির্ম্মল বলিলেন, "পরের বাড়ী থাকিতে আমার বড় কষ্ট হয়—আমি কোথাও যেতে পারিব না !"

অন্নপূর্ণা বুঝিলেন, পুত্র স্থানান্তরে যাইতে কেন অসম্মত। তবু বলিলেন, "তুমি না হয় বজরায় থাকিও।"

নির্ম্মল উত্তর করিলেন, "ঝড়-তুফানের দিন বজরায় থাকিতে সাহস হয় না।"

ফাল্গুন মাসে ঝড়-তুফান ! অন্নপূর্ণা আর কিছু বলিলেন না। শুধু গর্ব্বভরে প্রীতমনে একটু হাসিলেন। ভাবিলেন, "আমায় ছেড়ে বাছা বউকেও দেখিতে যেতে চায় না।"

এমন সময় হেম রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। উভয়ে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, হেম ?"

হেম বলিল, "নূতন দাদা, শীগ্‌গির এস, দিদি বুঝি বাঁচে না।"

বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া নির্ম্মল অশ্বশালার দিকে ছুটিয়া গেলেন। স্বহস্তে অশ্ব সজ্জিত করিয়া তদুপরি হেমকে লইয়া লম্ফত্যাগে উঠিলেন এবং অত্যল্পকালমধ্যে আনন্দপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। কালী খুড়োর গৃহসন্নিকটে সমুপস্থিত হইবামাত্রই অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং গৃহমধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ধূলার উপর সোনার সোহাগ গড়াগড়ি যাইতেছে, আর পাশে বসিয়া সোহাগের মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।

সোহাগের আমরা পরিচয় দিই নাই। তাহার নাম শুনিয়াছি মাত্র ; ভাল করিয়া দেখি নাই। তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর ; কিন্তু দেহ এই বয়সেই প্রায় পূর্ণায়ত। অযত্নরক্ষিত মলিনবস্ত্রাচ্ছন্ন রূপরাশি এই বয়সেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। নববর্ষসমাগমে যেমন বিল্ব-বৃক্ষদেহ নবপত্রে সমাচ্ছন্ন হয়, তেমনই নব-যৌবন-সম্ভাষণে সোহাগের দেহতরু নবশোভায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে উদ্যানমধ্যে প্রস্ফুটিত-প্রায় মল্লিকা দেখিলে এই বালিকার রূপের কথা মনোমধ্যে স্বতঃই জাগিয়া উঠে ; কিন্তু মল্লিকার ন্যায় বালিকা চঞ্চলা নয়—স্থিরা, গম্ভীরা, বুদ্ধিমতী—মলয়ার সাধ্য নাই তাহাকে বিচলিত করে।

সোহাগের অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মল বুঝিলেন যে, সোহাগ মূর্চ্ছিত হইয়াছে। ঘাড়ে, মুখে জলের ছিটা দিতে দিতেই সোহাগের চৈতন্য-সঞ্চার হইল। পিতার মৃত্যুদিনে এই রোগ সূচিত হয়। আজ হইতে তাহা বদ্ধমূল হইল।

সোহাগকে সুস্থ করিয়া নির্ম্মল কেদার জ্যেঠার বাড়ীতে গেলেন। জ্যেঠা তখন বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেস্ দিয়া এক জন খাতকের দেনা-পাওনা হিসাব করিতেছিলেন। খাতক কিছু সুদ ছাড়িবার জন্য কেদার জ্যেঠাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিল ; কিন্তু জ্যেঠা মোলায়েম হাসির সহিত খাতককে বুঝাইতেছিলেন যে, সুদ ছাড়িলে তিনি খাইতে না পাইয়া মারা যাইবেন। এমন সময় সেখানে নির্ম্মল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল ; জ্যেঠা "এস, বাবা এস" বলিয়া আদর করিয়া নির্ম্মলকে বসাইলেন।

জ্যেঠার বাড়ীটি বেশ, অবস্থাও খুব ভাল। চক্‌মিলান বাড়ী, সাম্‌নে পূজার দালান, তাহাতে মহামায়ার পূজা হয়। অন্দরমহল স্বতন্ত্র। বৈঠক-খানা, উমেদার-খাতক ও প্রজায় সতত পরিপূর্ণ।

জ্যেঠার কিছু তালুক-মুলুক আছে। তেজারতিও বেশ চলে। যে খাতক একবার দু'টাকা লইয়াছে, সে আর দেনা শোধ করিয়া উঠিতে পারিত না। তাই বলিয়া জ্যেঠা অধার্ম্মিক নহেন। তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকে সুদীর্ঘ শিখা, গাত্রে হরিনামাবলী, কণ্ঠে তুলসীর মালা। সুতরাং এই ত্রিবিধ আয়ুধসমন্বিত জ্যেঠার প্রকৃতি ও চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না।

তাঁহার তিন সংসার, তন্মধ্যে দুই পত্নী বর্ত্তমান। জ্যেঠা নিঃসন্তান অবস্থায় গত হইয়াছেন। মধ্যমার একটি পুত্র। কনিষ্ঠার দুইটি কন্যা। পুত্রের নাম হরিকিঙ্কর। কিঙ্কর বিবাহিত, বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যক্ষম।

জ্যেঠার বৈঠকখানাটি সেকালের ধরণে সাজান। ঢালা বিছানা, তার উপর একখানি ছোট গালিচা। গালিচার উপর একটি তাকিয়া বালিশ। তদগ্রে জ্যেঠা উপবেশন করেন। গালিচার উপর বড় একটা কাহারও বসিবার হুকুম নাই। তবে নির্ম্মলের কথা স্বতন্ত্র। জ্যেঠা তাঁহাকে আদর করিয়া গালিচার উপর বসাইয়া নিজে পার্শ্বে বসিলেন।

কেদার জ্যেঠা দন্তহীন বদনে আকর্ণ হাস্য বিস্তার করিয়া বলিলেন, "আজ আমার ঘর আলো হ'ল, বাবা। তোমরা সব ছেলেমানুষ, তোমরা সব কি জান্‌বে। (ক্রন্দনের সুরে) আজ যদি তোমার স্বর্গীয় পিতা বেঁচে থাক্‌তেন, তা হ'লে (চোখের জল মুছিয়া)—আহা ! তিনি আমায় কত ভালবাসতেন।"

"কেদার জ্যেঠা, একটা কথা আছে, গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি।"

জ্যেঠা একটু থতমত খাইলেন। বলিলেন, "তা বই কি, কথা থাকবেই ত। স্বর্গীয় কর্ত্তা যে কত কথা আমায় বল্‌তেন।"

জ্যেঠার ইঙ্গিতে অনুচরবর্গেরা সরিয়া পড়িল। তখন নির্ম্মলকুমার কালী খুড়ার বিষয়ের কথা পাড়িলেন এবং গোলমাল মিটাইয়া লইতে জ্যেঠাকে অনুরোধ করিলেন। জ্যেঠা আকাশ হইতে পড়িলেন, এবং কালী খুড়ার জন্য একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেন। পরে নামাবলীর অংশবিশেষ দ্বারা ধীরে ধীরে শুষ্ক চক্ষু পরিষ্কৃত করিয়া বলিলেন, "গোলমাল কি বাবা, গোলমাল কা'কে বলে, তা ত আমি জানি না। আমি হরিনাম জপি, আর দু'টো আলোচাল খাই। হরি বল, হরি বল।" ইত্যাদি।

নির্ম্মল জ্যেঠাকে সবিশেষ চিনিতেন। তিনি সে কথায় না ভুলিয়া বলিলেন, "যিনিই গোল করুন, এখন গোল করিতে হইলে আমার সঙ্গে গোল করিতে হইবে। আপোষে মিটাইলে ভাল হয়।"

আরও কিছু কথাবার্ত্তা হইল। নির্ম্মলের যুক্তি-তর্কের উত্তরে জ্যেঠা হরিনাম শুনাইলেন। অবশেষে নির্ম্মল একটু বিরক্ত হইয়া বিদায় হইলেন।

নির্ম্মল চলিয়া গেলে কেদার, পুত্র হরিকিঙ্করকে বলিলেন, "কালীর যাহা লইয়াছি, তাহার কিছুই ছাড়িতে পারিব না,—নির্ম্মল বলিলেও না, ভগবান্ বলিলেও না। নির্ম্মল সমাজপতি, সে রাগিলে আমার ক্ষতি হইতে পারে; তা কি করিব? তাই ব'লে বিষয় ছাড়িতে পারি না। সে যা হোক, এখন কালীর বিধবার সঙ্গে একটু আত্মীয়তা দেখাতে হবে—কেন, তা' পরে বলিব।"

পুত্র বলিল, "নির্ম্মল বাবু একটু শাসাইয়া গিয়াছেন। কালী খুড়ার বিষয় লইয়া নির্ম্মল বাবুর সহিত গোল বাধিতে পারে।"

কেদার বলিলেন, "তাহাতে ডরাই না। যাহা লইয়াছি, তাহা আইনসিদ্ধ করিয়া লইয়াছি। সহজে কিছু ছাড়িব না—ছাড়াইতেও কেহ পারিবে না।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমরা একবার বিলিকে দেখিতে যাইব। সঙ্গে সঙ্গে পাঠককেও যাইতে হইবে; অসম্মত হইলে এ আখ্যায়িকা-পাঠ বন্ধ করা ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর দেখি না।

গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী একটি সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রামে বিলির পিত্রালয়। গ্রামের প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া তাহাকে আমরা বিশালপুর নামে অভিহিত করিব। এ গ্রাম মুর্শিদাবাদের সন্নিকট, এবং বধূগ্রাম হইতে নৌকাপথে প্রায় দেড় দিনের পথ।

বিলির পিতা নাই। ভ্রাতা রমেশচন্দ্র এক্ষণে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর। মাতা সংসারে স্পৃহাশূন্যা। রমেশচন্দ্র দুরন্ত জমীদার। কেহ তাঁহাকে ভয় করে, কেহ বা ভালবাসে; তাঁহার নাম, যশ খুব,—নিকটে বা দূরে সকলেই তাহাকে চিনে।"

বিলি মাকে দেখিল, ভাইকে দেখিল; কিন্তু তাহার মন সুস্থ হইল না। স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এমন সময় ভাইয়ের অসুখ বাড়িল। তখন বিলি ফিরিয়া যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃসেবায় মন দিল।

রমেশের শ্বশুরালয় হইতে তাঁহার শ্যালক ও শাশুড়ী আসিল; মাতুলালয় হইতে আত্মীয়-স্বজন আসিল; যে যেখানে কুটুম্ব বা সুহৃদ্ ছিল, সে সেখান হইতে ধনবান্ আত্মীয়কে দেখিতে ছুটিয়া আসিল। গ্রামস্থ বৈদ্য ও ডাক্তারে গৃহ পরিপূর্ণ হইল—দূরদেশ হইতে চিকিৎসক ও বৈদ্য আহূত হইল—বহরমপুর হইতে সাহেব ডাক্তার আনীত হইল।

এই গোলমালের ভিতর নির্ম্মলকে প্রত্যহ পত্র লিখিতে বিলি বিস্মৃত হইত না। রুগ্ন ভাইয়ের শয্যা-পার্শ্বে বসিয়াও বিলি সতত নির্ম্মলকে ভাবিত। তাঁর কথা যে আপনা হইতেই সতত মনে আসিত, চেষ্টা করিয়া ভাবিতে হইত না। নির্ম্মলের পত্রও প্রত্যহ আসিত সব কাজ ফেলিয়া বিলি আগে নির্ম্মলের পত্র পড়িত।

রমেশের যখন শ্বশুরবাড়ী আছে, তখন তাঁহার বিবাহ ঘটিয়া থাকাও সম্ভব। স্ত্রীর নাম জ্যোৎস্না-সুন্দরী, বয়স বিংশতি বৎসর। পিত্রালয় সন্নিকটস্থ রুদ্রপুর গ্রামে। জমীদারগৃহিণীর যেমন রূপ ও গর্ব্ব থাকা উচিত, জ্যোৎস্নারও তেমনই ছিল। তবে গর্ব্বটা যেন কিছু বেশী বেশী। তা' হইবারই ত কথা; যে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের মধ্যে কখনও ঐশ্বর্য্য দেখে নাই, রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকামধ্যে অবস্থান করিয়া রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিলে সে কেন না গর্ব্বিত হইবে?

জ্যোৎস্নার ভাইটিও অনেকটা ভগ্নীর মত। হারাণচন্দ্র কখনও অট্টালিকায় বাস করে নাই; সুতরাং ভগ্নীর নিকট আসিলে অট্টালিকাবাসীর চাল-চলন অবলম্বন করিবার প্রয়াস পাইত। হারাণচন্দ্রের

বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে। সে নিতান্ত মূর্খ নয়—কিছু লেখাপড়া জানিত; অনেক নাটুকে কথা শিখিয়াছিল। চারি-বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া হারাণ দুইখানি নাটক ও একখানি নভেল লিখিয়াছিল। কিন্তু জগতে সেই অত্যুপাদেয় গ্রন্থ কয়খানি প্রচারিত হইবার পুর্ব্বেই ভগ্নী জ্যোৎস্না তাহা অনঙ্গদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। ক্ষোভে, অভিমানে হারাণ তদবধি পুস্তক লেখা বন্ধ করিয়াছিল। না জানি সে অভিমানের ফলে বঙ্গ-সাহিত্যের কি অনিষ্ট সংঘটিত হইল। তা' বাঙ্গালার ভাগ্যে যাই হউক, হারাণ বই লেখা বন্ধ করিল। বন্ধ করিয়া একটি "ক্লব" খুলিল। সেখানে চাঁদা দিলে সকল শ্রেণীর, সকল জাতির লোক প্রবেশ করিতে পাইত। এই "ক্লবে" রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যাপার সকলই আলোচিত হইত—সুরা, চা উদরস্থ হইত। এখানে সভ্যেরা দাড়াইয়া গ্লাস-হস্তে "হেল্‌থ" পান করিতেন—সিগারেট-মুখে চেয়ারে বসিয়া দেশ উৎসন্ন যাইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিতেন—মেজের উপর গড়াগড়ি দিতে দিতে দেশের অবস্থা ভাবিয়া অশ্রু ও উদরস্থ ভুক্ত দ্রব্য ত্যাগ করিতেন।

ক্লবের সভাপতি হারাণচন্দ্র দেশপূজ্য। কেন না, তিনি বিশালপুরের জমীদার ধনবান্ রমেশ বাবুর শ্যালক। হারাণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়; তার উপর ভগ্নীর সাহায্যে হারাণের বাবুগিরিটা স্বচ্ছন্দে চলিয়া আসিতেছিল।

হারাণ ভাবিত, তাহার মত রূপবান্ পুরুষ দেশে বিরল। সেই কারণেই হউক, অথবা যে জন্যেই হউক, সে মনে করিত যে, প্রত্যেক রমণী তাহার রূপে মুগ্ধা। যদি পথমধ্যে বা বাতায়নস্থিত কোনও রমণী ঘটনাক্রমে একবার হারাণের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে হারাণ তাহার পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বলিত, "দেখ, আমাকে দেখে মেয়েটা একেবারে মরেছে।" ইত্যাদি।

হারাণ মাকে সঙ্গে লইয়া ভগ্নীপতিকে দেখিতে আসিল। রুগ্ন ভগ্নীপতির শয্যাপার্শ্বে হারাণ যাহা দেখিল, সে তাহা ভুলিল না; অনিমেষনয়নে বিলির অসামান্য সৌন্দর্য্য-পানে চাহিয়া রহিল। বহুদিন পুর্ব্বে হারাণ বিলিকে একবার দেখিয়াছিল; কিন্তু সে বিলি, আর এ বিলি? অনেক প্রভেদ। প্রতিমার খড়ে মাটী লেপিতে দেখিয়াছিলাম, আর আজ সেই প্রতিমা নানাবর্ণচিত্রিতা পুষ্পালঙ্কার-ভূষিতা দেখিলাম। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদ দেখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে শারদাকাশে পুর্ণিমার চাঁদ দেখিলাম। এক দিন যে স্থান তৃণাবৃত দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা পুষ্পময় উদ্যানে পরিণত দেখিলাম। হারাণ অনিমেষ-নয়নে বিলির পানে চাহিয়া রহিল।

হারাণের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া বিলি বউদিদির কাছে উঠিয়া গেল। জ্যোৎস্না তখন কক্ষান্তরে কৌচের উপর অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় 'চন্দ্র-শেখর' উপন্যাস পড়িতেছিলেন। বিলিকে দেখিয়া জ্যোৎস্না বই রাখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "চ'লে এলি যে?"

বি। লোক এসেছে।

জ্যো। কে?

বি। হারাণ বাবু।

জ্যো। দাদাকে দেখে আবার লজ্জা!

বি। কি জানি ভাই, কেমন লজ্জা এ'ল।

জ্যো। দেখিস্, এর পরে যেন নিজের দাদাকে দেখে লজ্জায় জড়সড় হ'সনে।

বি। লজ্জাটা ত' আর হাত-ধরা নয়।

জ্যো। না, সেটা পায়ে ধরা; পায়ে ধর্‌লে তবে লজ্জা ভাঙ্গে, না?

বি। সেটা ভাই তুমি ভাল জান। দুনিয়াটাকে পায়ে ধরিয়ে এখন লজ্জা ছেড়েছ।

জ্যো। লজ্জা করিলে কি জমীদারী চলে? দেওয়ান, নায়েবকে কে হুকুম দিবে?

বি। কেন, দাদা?

জ্যো। ছোট-খাট জমীদারী হ'লে পুরুষে চালাতে পারে। তুই এ সব কি বুঝ্‌বি, বল্।

বি। আঃ, বাঁচলুম! আমার পিতার জমীদারী তোমার মত দেওয়ান পেয়ে এত দিনে রক্ষা হইল।

উভয়ে যেন পরস্পরের প্রতি কেমন একটু অপ্রসন্ন হইল। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিলির অপরাধ এই যে, সে হারাণের তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। বিলি কোনও কালেই জ্যোৎস্নার প্রতি অনুরক্ত ছিল না। জ্যোৎস্নার লজ্জাহীনতা দেখিয়া বিলি বিরক্ত হইত।

বিলি উঠিয়া মায়ের কাছে গেল। মা তখন হরিনামের মালা লইয়া ব্যস্ত। দু'চারিটা কথার পর বিলি নিজের কক্ষে উঠিয়া আসিল। পিত্রালয়ে সে দুইটি ঘর পাইত; এখনও তাহা পাইয়াছিল। বসিবার ঘরটি বেশ সুসজ্জিত। কাষ্ঠাসন আছে, পালঙ্ক আছে—পালঙ্কের উপর কার্পেট বিস্তৃত রহিয়াছে। বড় বড় আয়না, ফ্রেমে আঁটা বড় বড় ছবি দেয়ালের গায় বিলম্বিত রহিয়াছে। কোনখানি

দশমহাবিদ্যা, কোনখানি বা দশ অবতারের ছবি; কোনখানি প্রেমময় চৈতন্যদেবের, কোনখানি বা কর্ম্মময় কংসারি শ্রীকৃষ্ণের। ছবি ছাড়া ঘরে আরও অনেক জিনিস আছে;—আলমারি, দেরাজ, আন্‌লা প্রভৃতি কিছুরই অপ্রতুল নাই।

ঘরে আসিয়া বিলি এক জন দাসীকে ডাকিল। রেবতী নাম্নী এক জন পরিচারিকা বিলির সঙ্গে বধুগ্রাম হইতে আসিয়াছিল। বিগতযৌবনা হইলেও রেবতী বড় রসবতী। বুঝি বা যৌবনের ঝঙ্কার শ্রুত হয় না বলিয়াই রসের যোগান ধার করিয়া আনিতে হইয়াছে। আঁখিতে সকল সময়েই বিলোল কটাক্ষ বিরাজমান—ওষ্ঠোপরি রসের হাসি সতত কম্পিত। পুরুষ-সমক্ষে কটাক্ষটা যেন আরও মর্ম্মঘাতী হইত, হাসিটা যেন আরও মিষ্ট হইত। দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্য বশতঃ তাহার কটাক্ষে পাখী বা ছাগল ছাড়া মানুষ মরিত না, হাসিতে ডোবার জল ছাড়া আর কিছু গলিত না।

রেবতী শ্যামবর্ণা, কৃশা। বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। চক্ষু দুটি আয়ত। শুভ্র দন্ত, মিশি-রঞ্জিত—যেন সাদা কাগজে কে কালীর আঁচোড় পাড়িয়াছে। কেশ নিতম্ব-বিলম্বিত। মদনমন্দিরদ্বয় ভূমিসাৎ; তবে চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

রেবতী আসিল। দাদার কক্ষে কেহ আছে কি না, দেখিবার জন্য বিলি তাহাকে পাঠাইয়া দিল। রেবতী গিয়া দেখিল, রমেশের কাছে হারাণ বসিয়া রহিয়াছে। হারাণের উপর দু' চারিটা ভীষণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে রেবতী ত্রুটি করিল না। পাছে সেই কটাক্ষ-অনলে হারাণ দগ্ধীভূত হয়, এই আশঙ্কায় কিছু হাস্যসুধাও বর্ষিত হইল। হারাণ ভাবিল, বুঝি বা সে ওয়াটার্লু বা পাণিপথ জয় করিল।

রেবতী আসিয়া বিলিকে সংবাদ দিল। বিলি তখন অনন্যকর্ম্ম হইয়া স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অপরাহ্ণে বিলি দাদার কাছে আসিয়া বসিল। রমেশ শয্যায় শয়ান; বিলিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতক্ষণ তুমি আসনি কেন, দিদি?"

বিলি। তুমি কি আমায় খুঁজেছিলে দাদা?

রমে। তোমায় আবার খুঁজি নি? তুমি ছিলে না ব'লে আমার যে কিছু খাওয়া হয় নি, বিজু।

বিলি দুধ গরম করিয়া আনিয়া দাদাকে খাওয়াইল। রমেশ বলিলেন, "জান না কি, তুমি না খাওয়াইলে আমার খাওয়া হয় না, বিজু? একটু আগে খানিকটা ঠাণ্ডা দুধ নিয়ে জ্যোৎস্না আমায় খাওয়াইতে আসিয়াছিল। অক্ষুধায় অছিলায় আমি তাহা খাই নাই।"

এমন সময় হারাণ সেখানে আসিল। মাথার কাপড় একটু টানিয়া বিলি বসিয়া রহিল; হারাণ যাহা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা দেখিতে পাইল। বিলির লাজ-রঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া হারাণ আত্মহারা হইল;—সব ভুলিয়া সেই মুখখানি পানে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিল। হারাণের তীব্র দৃষ্টি বিলি অনুভব করিল; বিলি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ বলিলেন, "আবার কোথায় যাচ্ছ, বিজু?"

বিজু বসিল; তবে এবার ঘোমটায় মুখ সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করিল। রমেশ বিস্মিত হইয়া কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। হঠাৎ হারাণের পানে দৃষ্টি পড়িল। দেখিয়া সবই বুঝিলেন। বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "হারাণ, তুমি এখন বাহিরে যাও।"

অগত্যা হারাণ চলিয়া গেল। রমেশ তখন দেওয়ানকে ডাকাইলেন। দেওয়ান আসিলে বিলি কক্ষান্তরে গেল। রমেশ বলিলেন, "দেওয়ান, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধব যাঁহারা আমায় দেখিতে আসিয়াছেন, বহির্ব্বাটীতে তাঁহাদের স্থানের অভাব আছে কি?"

দেওয়ান। আজ্ঞে না।

রমেশ। উত্তম, যাঁহারা আমায় দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের বলিও যে, এক্ষণে আমি বিশেষ কাতর। আমার অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও আমার মহলে আসিতে দিবে না।

দে। হারাণ বাবুকেও না?

রমে। সকলের পক্ষে একই আদেশ।

দে। অন্দরমহলে প্রবেশ নিষেধ কি?

রমে। আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে অন্দর-মহল পূর্ব্ববৎ অবারিত রহিল।

দেওয়ান বিদায় হইল। বিলি আসিলে রমেশ বলিলেন, "বিজু, একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি তা' আমায় মনে করাইয়া দিলে। এ বাড়ীতে লজ্জা-সরম ঠাঁই পায় না। স্ত্রীলোকদের যে লজ্জা করিতে হয়, তা-ও আমার মনে ছিল না।"

বিলি কিছু বলিল না; মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। রমেশ যুবা-পুরুষ। কিন্তু খর্ব্বকায় ও কুৎসিতদর্শন। নিজে শিক্ষিত, এবং মেম রাখিয়া

স্ত্রীকেও উচ্চ শিক্ষা দিয়াছিলেন। লেখা-পড়া শিখিয়া স্ত্রী বিলাস শিখিল; বিলাসের সামগ্রীতে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। স্ত্রী যাহা চাহিল, স্বামী সানন্দে তাহাই যোগাইলেন। অবশেষে স্ত্রী স্বাধীন হইল—পুরুষের সাম্‌নে ঘোম্‌টায় মুখ ঢাকিয়া রাখিতে ঘৃণা বোধ করিল। তবে দয়া করিয়া অন্দর ছাড়িয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিল না। স্বাধীন হইয়া জমীদারী কার্য্য দেখিতে লাগিল; রোকড়-খতিয়ান না বুঝিয়াই নায়েব-গোমস্তার কৈফিয়ৎ তলব করিল।

জ্যোৎস্না দরিদ্রের কন্যা হইলেও অসামান্যা রূপসী। রূপে সংসার মুগ্ধ হয়। যত দিন রূপের মোহ থাকে, তত দিন আমরা দোষগুণ-বিচারে অক্ষম হইয়া রূপের পানে চাহিয়া থাকি. তবে রূপের মোহে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়; সংসর্গে শয্যা-সঙ্গিনীর রূপের নূতনত্ব বিনষ্ট হয়—মোহ ক্রমে ঘুচিয়া যায়। রমেশের এক্ষণে মোহ ঘুচিয়াছে—তিনি রূপের পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রমেশ এক্ষণে উপাসক ন'ন—তিনি এখন সমালোচক।

রমেশ দুরন্ত ও বুদ্ধিমান; কিন্তু স্ত্রীর কাছে শান্ত ও অল্পভাষী। তিনি উন্নতচেতা ও আত্মসংযমী। তবে ক্রোধে কখনও কখনও আত্মহারা হইতেন। সে কথা থাক্; এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি।

হারাণ রমেশের কক্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভগ্নীর নিকট উপস্থিত হইল। হারাণ বলিল, "দত্ত মহাশয় কেমন আছেন?"

জ্যোৎস্না। তুমি দেখে এস না।

হা। সেখানে আমার যাবার উপায় নাই।

জ্যোৎ। কেন?

হা। সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়াছি।

জ্যো। সে কি? কে তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছে?

হা। দত্ত মহাশয়।

জ্যো। কেন?

হারাণ সকল কথা বলিল,—একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল। ক্রোধে জ্যোৎস্নার কপালের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। বিলির উপরই রাগটা বেশী হইল। বলিলেন, "দাদা, তুমি আবার যাও; কোনও চিন্তা নাই—আমি পিছু পিছু যাইতেছি।"

হারাণ ইতস্ততঃ করিল, যাইতে সাহসে কুলাইল না। কিন্তু বিলির সেই মুখখানি মনে পড়িল। হারাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না—উঠিল।

যে খণ্ডে রমেশ আছেন, সে মহল দ্বিতল। উপরে উঠিবার পূর্ব্বেই হারাণ বাধা পাইল। দেখিল, সিঁড়িতে প্রহরী। সে পথ ছাড়িল না। হারাণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পথ রুদ্ধ কেন?"

প্র। হুজুরের হুকুম।

হা। আমার পক্ষেও?

প্র। সকলের পক্ষে।

হা। তবে কেমন করিয়া বাবুর কাছে যাব?

প্র। হুজুরের হুকুম হইলে পথ ছাড়িয়া দিব।

হা। আমি এখানে আটক রহিলাম—কেমন করিয়া হুকুম আনিব?

প্র। আমি আনাইতেছি।

প্রহরী এক জন দাসীকে প্রভুর নিকট পাঠাইল। যথাসময়ে অনুমতি আসিল। হারাণ রমেশের কক্ষে গিয়া দেখিল, তথায় বিজলী নাই। ব্যাকুল-নয়নে চারিদিকে চাহিল; যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা কোথাও দেখিতে পাইল না।

হারাণের এ ব্যাকুলতা রমেশ লক্ষ্য করিলেন। একটু কর্কশস্বরে বলিলেন, "কি জন্য এখানে এসেছ?"

হা। আপনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য জ্যোৎস্না আমায় পাঠাইয়া দিয়াছে।

র। তিনি যখন স্বয়ং আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন, তখন তোমায় পাঠাইবার প্রয়োজন কি?

হা। তা' জানি না।

র। তিনি কোন্ কাজে ব্যস্ত?

হা। পিয়ানো বাজাইতেছেন।

র। উত্তম। তুমি ত একটু পূর্ব্বেই আমায় দেখিয়া গিয়াছ, এর মধ্যে ফিরিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?

হা। তখন কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

র। আমায় জিজ্ঞাসা না করিয়া ডাক্তার-বৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করিলে সঠিক সংবাদ পাইতে পারিতে ত?

হারাণ নিরুত্তর। তখন রমেশ শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ হারাণ, তোমায় যখন প্রয়োজন হইবে, তখন ডাকাইয়া পাঠাইব। না ডাকিলে বুঝিবে, তোমার এখানে আসিবার প্রয়োজন নাই। বুঝেছ ত? এখন যাও।"

হারাণ চলিয়া গেল। হারাণকে রমেশ বেশ চিনিতেন। হারাণের ভগ্নীকেও রমেশ যে একেবারে চিনিতেন না, এমন নহে; ইদানীং কতকটা চোখ ফুটিয়াছিল। তবে ঘরের কথা পাছো বাহিরে যায়, এই ভয়ে রমেশ নীরব থাকিতেন। তদ্ভিন্ন এরূপ অবস্থায় গত্যন্তর কি?

পথমধ্যে হারাণ ভগ্নীর সাক্ষাৎ পাইল। জ্যোৎস্নাকে সকল কথা বলিল। রাগে জ্যোৎস্না জ্বলিয়া উঠিল। স্কন্ধ হইতে বস্ত্রাঞ্চল খসিয়া পড়িল; কবরী হইতে দুই চারিটা গোলাপ ফুল, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া গেল, দাসদাসী শঙ্কিত হইয়া চারিদিকে ছুটি। পলাইল পদভরে হর্ম্যতল কাঁপাইয়া অলঙ্কারশিঞ্জিতে প্রতিধ্বনি উঠাইয়া জ্যোৎস্নাময়ী কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া জ্যোৎস্না দেখিলেন, রমেশ মুদিতনয়নে শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। কক্ষে আর কেহ নাই। স্ত্রী ডাকিল, "রমেশ!"

কোন উত্তর নাই। শিক্ষিতা স্ত্রী রুগ্ন স্বামীর শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আবার ডাকিল, "রমেশ!" এবারও কোন উত্তর নাই। বুদ্ধিমতী স্ত্রী বুঝিল, নিদ্রা কৃত্রিম; তখন গর্ব্বস্ফীতা রমণী ক্রোধভরে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রমেশের কক্ষে পরদিন জ্যোৎস্নার উদয় হইল না। রমেশও শান্তি পাইলেন। অষ্ট প্রহর জ্বরের যন্ত্রণার উপর মানসিক অশান্তি সহনাতীত। তাই সুখ ও শান্তির আশায় তিনি সকল সময়েই বিজলীকে কাছে বসাইয়া রাখিতেন বিজলী ঔষধ খাওয়াইত, পথ্য দিত; মাথা টিপিত, গল্প করিত। বিজলীর মত কেহ কিছু পারিত না; মামী বা শাশুড়ী, মামাত বা পিসতুত ভগ্নীরা কাছে বসিয়া পরিচর্য্যা করিলে রমেশের ভাল লাগিত না। বিজলী যাহা করিত না, তাহা রমেশের পছন্দ হইত না।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিজলী নিজের ঘরে প্রত্যহ একটু বসিত। আজও যথাসময়ে ঘরে গিয়া পালঙ্কের উপর বসিল। নির্ম্মলকুমারের একখানি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি বিলির নিকট ছিল। একটি ক্ষুদ্র আধার হইতে ছবিখানি বাহির করিয়া বিলি নির্নিমেষনয়নে তাহা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষে জল আসিল। জল ক্রমে ছাপাইল, অবশেষে গণ্ড বাহিয়া গড়াইতে লাগিল।

ছবিখানি আধারমধ্যে রাখিয়া বিলি চক্ষু মুছিল। একটি হস্তিদন্ত বিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কৌটার মধ্যে কয়েকখানি চিঠি ছিল। বিলি একে একে তাহা পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে কত কাঁদিল; চক্ষু মুছিয়া আবার পড়িতে লাগিল। চিঠিগুলি নির্ম্মলের লিখিত; সুতরাং না কাঁদিয়া তাহা পাঠ করা বিলির পক্ষে অসম্ভব।

তার পর বিলি পত্র লিখিতে বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিলি পত্র লিখিল, নির্ম্মলকে সান্ত্বনা দিল, কাঁদিতে নিষেধ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বিলি পত্র সমাপ্ত করিল।

পত্র সমাপ্ত করিয়া বিলি দাদার ঘরে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, একটা ক্ষুদ্র প্রলয় বাধিয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী কক্ষমধ্যে দ্বাদশ রবির তেজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা-স্রোতে পীড়িত স্বামীকে প্লাবিত করিতেছেন। বিলিকে দেখিয়া সে প্রবাহ যেন বায়ুর সহায়তা পাইয়া আরও গর্জ্জিয়া উঠিল।

কক্ষে অপর কেহ নাই। জ্যোৎস্নার ভাব দেখিয়া আত্মীয়স্বজন সরিয়া পড়িয়াছিল। জ্যোৎস্না বলিতেছিলেন, নিজের গৃহে পাইয়া যে অতিথিকে অপমান করে, অত্মীয়-কুটুম্বকে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত করে, সে শিক্ষিত ভদ্রলোক নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। যাঁহারা দয়া করিয়া আমাদের বিপদের সময় আমাদের দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সম্মানের পাত্র; বর্ব্বরের হস্তে কেবল তাঁহাদের নির্য্যাতন সম্ভব। এই গৃহ, (বিলির পানে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া) এই সংসার, পাপ-স্পৃষ্ট হইয়াছে। পাপ লজ্জার আবরণ খুঁজে, ধর্ম্ম নিঃসঙ্কোচে বিনা আবরণে দাঁড়ায়। যাহাদের গুপ্ত জীবন ও প্রকাশ্য জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহারা ভদ্রসংসারের মধ্যে প্রবেশ করিলে সংসারের সুখ, শান্তি বিনষ্ট হয়। এতদিন এ সংসারে সুখ-শান্তি ছিল, অধুনা—"

রমেশ বাধা দিয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্ন, আমার জ্বর বাড়িয়াছে, কোন কথা এখন আমার ভাল লাগিতেছে না।"

জ্যো। উচিত কথা চিরকালই তোমার ভাল লাগে না।

র। গোলমাল বিরক্তিকর হইতেছে।

জ্যো। উচিত কথায় তোমার চিরকালই বিরক্তি জন্মে। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্ত ভগ্নীর কথা অমৃতবর্ষণ করে।

র। জ্যোৎস্ন—

জ্যো। কি বল?

র। ধৈর্য্যের সীমা আছে।

জ্যো। আমায় তাড়াবে নাকি?

র। জ্যোৎস্ন, তোমায় স্বাধীনতা দিয়াছি, আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ কর?

জ্যো। তুমি আমার ভ্রাতাকে দুরীভূত করিবে, আমায় পদে পদে অপমানিত করিবে, আর তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করিতে আসিয়া আমি মন্দ হইলাম ?

র। তোমার ভাই আমার কাছে না আসিলেই পারেন।

জ্যো। (ব্যঙ্গস্বরে) গৃহস্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য। আমার পক্ষে কি হুকুম হয় ?

র। জ্যোৎস্না, ক্ষান্ত হও—আমায় ক্ষমা কর, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

রোষভরে জ্যোৎস্না তখন কক্ষ ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় বিলির পানে একবার জ্বালাময় কটাক্ষপাত করিয়া গেলেন।

জ্যোৎস্না আপন কক্ষে গিয়া দ্বার অর্গল-বদ্ধ করিলেন। দুই দণ্ড পরে দ্বার খুলিয়া হারাণকে ডাকাইলেন। হারাণ আসিলে ভাই-ভগ্নীতে অনেক পরামর্শ হইল। নিম্নে তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি।

হারাণ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রত্যহ চিঠি আসে ?"

জ্যো। প্রত্যহ আসে।

হারাণ। ঠিক জান ?

জ্যো। অন্দরের সব চিঠি আগে আমার কাছে আসে, আমি আবার ঠিক জানি না ?

হা। কাল চিঠি এলে আটক রাখিও।

জ্যো। তা'র পর ?

হা। তা'র পর আমার বিদ্যে ত তোমার জানাই আছে।

জ্যো। দেখিও যেন কোনও বিপদে পড়ো না।

হা। সে ভয় নাই ; এ ত আর কোন দলীল নয়।

জ্যো। যদি বিপদাশঙ্কা না থাকে, তবে যা' ইচ্ছা করিও—এ কার্য্যে আমার সহানুভূতি আছে।

হা। তবে আর কি !

জ্যো। কিন্তু রেবতী ?

হা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

জ্যো। টাকার জন্য ভেব না, যত লাগে, আমি দিব। যেমন ক'রে পার, বিলির সর্ব্বনাশ কর—তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাও ; তার পর তা'কে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে এ বাড়ী থেকে তাড়াব। আমার বাড়ীতে আমার অপমান ! আমার ভাইয়ের অপমান ! তা'র মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

শুধু তাই নয় ; জ্যোৎস্নার রাগের আরও একটা কারণ ছিল। জ্যোৎস্না এক সময়ে উপযাচিকা হইয়া নির্ম্মলের প্রণয় যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। লজ্জায়, রোষে জ্ঞানশূন্যা হইয়া জ্যোৎস্না তদবধি অন্তরে অন্তরে পুড়িতেছিলেন। আজ বৈরনির্য্যাতনের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাই জ্যোৎস্না আজ হিংসাময়ী পিশাচী।

পর দিন প্রাতে কতকগুলি পত্র আসিল। অন্দরের পত্র জ্যোৎস্নার নিকট প্রেরিত হইত। আজও তাই হইল। বিজলীর নামে একখানা পত্র ছিল। জ্যোৎস্না সেই পত্রখানা রাখিয়া বাকী পত্রগুলা দাসীর হস্তে বিতরণের জন্য অর্পণ করিলেন।

বিলি সে দিন স্বামীর পত্র পাইল না। না পাইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেওয়ানের নিকট রেবতীকে পাঠাইল। দেওয়ান কোনও সংবাদ দিতে পারিল না।

অবশেষে বিলি কাঁদিতে কাঁদিতে পত্র লিখিতে বসিল। কিন্তু জলে চক্ষু ভরিয়া গেল। পত্র লেখা হইল না। চক্ষু মুছিয়া আবার লিখিতে বসিল। আবার জল আসিল ; চক্ষু ছাপাইয়া গণ্ড বহিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অবশেষে অনেক কষ্টে চক্ষের জলে পত্র সিক্ত করিয়া বিলি পত্র সমাপ্ত করিল। সমাপ্ত করিয়া ডাকঘরে দিবার জন্য রেবতীর হস্তে প্রদান করিল।

রেবতী পত্র লইয়া সদরে চলিল। পথিমধ্যে হারাণকে দেখিতে পাইয়া একটু দাঁড়াইল। তা'রপর মাথার কাপড় একটু টানিয়া, মিশিরঞ্জিত দন্তে তাম্বুল-রাগারঞ্জিত কৃষ্ণাধর টিপিয়া, একটু মধুর হাসি হাসিয়া হারাণের উপর কটাক্ষের উপর কটাক্ষ বর্ষণ করিল। হারাণও একটু হাসিল। তা'র পর একটু অগ্রসর হইয়া হারাণ বলিল, "রেবতী, তোমার চোখ দুটি অতি সুন্দর।"

রেবতী গলিয়া গেল। এমন কথা অনেক দিন কেহ যে রেবতীকে বলে নাই।

হারাণ রেবতীকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। ঘরটি সদরে ; বেশ বড়, সুসজ্জিত। চেয়ার টেবিল, কৌচ, সোফা, ঘড়ি, আলমারি প্রভৃতির অপ্রতুলতা নাই। এক পাশে, সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা বিস্তৃত রহিয়াছে। একখান কৌচের উপর রেবতীকে বসাইয়া হারাণ নিকটে বসিল। বিস্মৃতপ্রায় মনোহর সঙ্গীতের স্মৃতির মত যৌবনের সুখস্বপ্ন একে একে রেবতীর মনে জাগিয়া উঠিল। রেবতী ভাবিল, "এত দিনে মনের মত পুরুষ পাইলাম।"

রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে এখানে আনিলে কেন? ওমা, লোকে দেখলে বলবে কি?"

হারাণ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিল, "রেবতী, তুমি কি সুন্দর! তোমার মত সুন্দর বুঝি তোমার মুনিব ঠাকুরুণও নন্।"

এবার রেবতী আহ্লাদে আটখানা হইল। তাহার চোখের তারা, স্বা। কেন্দ্র ছাড়িয়া এমন ভাবে ঘুরিতে লাগিল যে, চক্ষের নিরাপদত্ব সম্বন্ধে আতশয় আশঙ্কা জন্মিল; সুমধুর হাস্যে ওষ্ঠাধর এমনই ভাবে আকর্ণ-বিস্তৃত হইল যে, মুখের পূর্ব্বাবস্থা-প্রাপ্তির জন্য হারাণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। হারাণ বলিল, "তোমার হাতে ওখানা কি, রেবতী?"

চক্ষু ও ওষ্ঠাধর স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াইল। রেবতী উত্তর করিল, "চিঠি।"

হা। কার চিঠি?

রে। বউ-দিদির।

হা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

রে। ডাকে দিতে।

হা। কা'কে লিখেছেন?

রে। তা জানি না; ঠিকানা প'ড়ে দেখ।

হা। (প'ড়িয়া) নির্ম্মলকুমার বুঝি তোমার দাদা-বাবুর নাম?

রে। হাঁ। আমি যাই—অনেক দেরি হ'ল, বউদিদি কি মনে করবেন?

হা। তা' কষ্ট করে' ডাকঘরেই বা তোমার যাবার দরকার কি? টেবিলের উপর রেখে যাও, আমার চিঠির সঙ্গে ডাকঘরে পাঠিয়ে দেব।

রে। আঃ বাঁচলাম। বউদিদির আবার কাউকে বিশ্বাস হয় না, আমাকেই ডাকঘরে চিঠি নিয়ে যেতে হয়।

হা। এটা তাঁর অন্যায়। তোমার মত ভদ্র-ঘরের যুবতী মেয়ে কেমন ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে চিঠি দিতে যায় বল দেখি।

রে। আমার কদর কি বউদিদি বুঝেন? তা' হ'লে আর দুঃখ কি? এই রকম আমায় রোজ চিঠি নিয়ে যেতে হয়!

হা। প্রত্যহ পত্র যায়?

রে। তবে আর বলছি কি!

হা। ভাল কথা, প্রত্যহ তুমি পত্র আমার কাছে নিয়ে এস—আমি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

রে। তুমি কেন আমার জন্য এতটা করবে?

হা। আমি যে এই সুযোগে প্রত্যহ তোমায় একবার দেখতে পাব; তাই যে আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

রেবতী বলিল, "আজ হ'তে আমি তোমার দাসী হ'লাম।" পরে পত্র রাখিয়া সে চলিয়া গেল।

রেবতী চলিয়া গেলে হারাণ পত্রখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল; তার পর খামের উপর একটু জল লাগাইয়া আবরণ উন্মোচন করিল। ফলে পত্র অপহৃত হইল, তদ্বিনিময়ে হারাণের লিখিত অপর পত্র রক্ষিত হইল। বিলি, তোমার অশ্রুনিষিক্ত পত্রখানির দুর্দ্দশা দেখিয়া যাও। তোমার এই পত্র-খানি পাইলে নির্ম্মলের কত আনন্দ হইত! তাহা না পাইয়া যে পত্র নির্ম্মল পাইল, তাহা পাঠান্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নির্ম্মলের দিন কাটিল।

বিলিরও কাঁদিতে কাঁদিতে দিন গেল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানা ভিজাইয়া রাত্রি কাটাইল।

কষ্টের রাত্রিও প্রভাত হয়। এই দুঃখের রাত্রিও অবসান হইল। প্রাতে উঠিয়া ডাকের চিঠির আশায় বিলি পথপানে চাহিয়া রহিল। অবশেষে চিঠি আসিবার সময় হইল; বিলি তখন আকুল প্রাণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ডাক আসিয়াছে কি না দেখিবার জন্য, লোকের উপর লোক বাহিরে পাঠাইতে লাগল। ডাক আসিল; বিলির নামে একখানি পত্র আসিল ঠিক সেই পত্রখানা না পাইলেও বিলি একখানা পত্র পাইল। পত্র পড়িয়া বিলি স্তম্ভিত হইল। তাহাতে লেখা ছিল:—

আমার বিলিটুকু,

কোন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, তাই কাল তোমায় পত্র লিখিতে পারি নাই। যদি মধ্যে মধ্যে পত্র না যায়, তাহা হইলে রাগ করিও না। আমার অবসর কম—কাজ অনেক।

তোমারই——নির্ম্মল।

পত্র পড়িয়া বিলির মুখ মলিন হইয়া গেল;—যেন উষালোকিত নদীবক্ষে হঠাৎ কালো মেঘের ছায়া পড়িল। সেই প্রেমময় স্বামীর এই পত্র! যাহার স্নেহপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্র পড়িতে পড়িতে বিলির হৃদয় নাচিয়া উঠিত, চোখে জল আসিত,—তাহার এই ক্ষুদ্র নীরস পত্র? বিলির মাথা ঘুরিতে লাগিল, ক্রমে কাঁধের উপর মাথা ঢলিয়া পড়িল—যেন মৃণালভঙ্গে কমলিনী জলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আমরা এক জনের পরিচয় দিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তাই তাড়াতাড়ি আনন্দপুরে ফিরিয়া আসিলাম। কেদার জ্যেঠার পুত্র হরিকিঙ্করের কথা বলিয়াছি, কিন্তু তাঁহার পুত্রবধূ নীহারের কথা বলি নাই।

নীহার অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী। নীহার শান্ত, নম্র, পতি-প্রাণা। বোধোদয় শেষ করিবার পূর্ব্বেই নীহারের বিবাহ হইয়াছিল। পতিগৃহে কয়েকখানা নাটক নভেল ভিন্ন আর কিছু পড়া ঘটিয়া উঠে নাই। নীহার গান জানিত, কিন্তু গাহিতে পারিত না। পঞ্চমী ব্রত, বীরাষ্টমী ব্রত করিত। রাত্রে রামায়ণ পড়িয়া স্বামীকে শুনাইত। কখনও কখনও স্বামীর সঙ্গে দশ পঁচিশ বা তাস খেলিত। স্বামী যে জিনিসটি ভালবাসিত, তাহা সংগ্রহ করিয়া ঘরে আনিয়া রাখিয়া দিত। কিঙ্কর তামাক খাইত,—নীহার স্বহস্তে গসি মাজিয়া, জল ফিরাইয়া, কলিকায় উত্তম তামাকু সাজিয়া স্বামীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত; স্বামী ঘরে আসিলে টিকায় আগুন ধরাইয়া স্বামীর হাতে সটকা তুলিয়া দিত। বৈশাখের দিনে খিড়কীর বাগান হইতে অসংখ্য যুঁই মল্লিকা তুলিয়া তদ্দ্বারা ছোট বড় মালা গাঁথিয়া, স্বামীকে মনোমত করিয়া সাজাইত। নীহার স্বামী ছাড়া কোনও খেলা ধূলা জানিত না। স্বামীকে প্রফুল্ল করা ব্যতীত তাহার আর কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল না—স্বামী ছাড়া তাহার আর কোনও চিন্তা ছিল না।

একদিন অপরাহ্ণে নীহার আপন কক্ষে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল। চুল বাঁধা শেষ হইলে পক্ষবিস্তারী উড্ডীয়মান বিহগতুল্য ভ্রূযুগের মধ্যে টিপ পরিল, আয়ত-নয়নের নীল তারার নীচে সুর্ম্মা পরিল; সিঁথির মাঝে সিন্দূরের সূক্ষ্ম রেখা সযত্নে পাড়িল। তার পর মুকুরে আপন মুখ দেখিয়া একটু হাসিল। তাম্বূল-রাগে অধর রঞ্জিত করিয়া, কণ্ঠে ও কেশে অলঙ্কার পরিয়া আবার দর্পণে মুখ দেখিল। মনে মনে ভাবিল, "এত'তেও তাঁর মত সুন্দর হইতে পারিলাম না।"

এমন সময়ে সহসা মুকুরের মধ্যে স্বামীর মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিল। নীহার চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল দেখিল, পিছনে দাঁড়াইয়া হরিকিঙ্কর টিপি-টিপি হাসিতেছে। লজ্জায় জড়সড় হইয়া নীহার আবার দর্পণের দিকে চাহিল। দেখিল, দর্পণের মধ্যেও সেই দুষ্ট দুষ্ট হাসি, মিঠা মিঠা চাহনি। তখন নীহার মুকুর উল্টাইয়া ঘোম্‌টা টানিয়া বসিল। হরিকিঙ্কর কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "নীহার, তুমি এত সুন্দর, তাহা আমি জানিতাম না।"

নীহার ঘোমটা দূর করিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিল। নয়নে লজ্জা, প্রেম। সৌন্দর্য্য বাড়াইতে আর কি চাই? কিঙ্কর আত্মহারা হইয়া চাহিয়া রহিল।

নীহার চক্ষু নামাইল; আবার ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিল। গবাক্ষপথে আকাশ দেখা যাইতেছিল। নীহার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক, দুই, তিন, চারি—কত পাখী উড়িয়া যাইতেছে, নীহার তাহাই দেখিতে লাগিল—অনন্যমনে যেন তাহাই গণিতে লাগিল।

কিঙ্কর ডাকিল, "নীহার।"

নীহার চক্ষু নামাইয়া স্বামীর পানে চাহিল। কিঙ্কর বলিল, "কি ভাব্‌ছ, নীহার?"

নী। বল দেখি, কি ভাবছি?

কি। আমি জানি না—তুমি বল।

নীহারের চক্ষু দু'টি নত হইল—রাঙ্গা রাঙ্গা ঠোঁটের উপর একটু লজ্জার হাসি ভাসিয়া গেল। নীহার অবশেষে বলিল, "তা' আমি বল্‌তে পারব না।"

কি। তবে আমি চলিলাম।

নী। ব'স, বল্‌ছি।

নীহার, স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া পাশে বসাইল। আবার একটু হাসি অধরোপরি ভাসিয়া গেল, আবার চক্ষু দুইটি নত হইল, বলিল, "ভাবছিলাম, এই তুমি—" আর বাক্য সরিল না।

কি। বলিবে না? তবে আমি চলিলাম।

না। না, না, বল্‌ছি। এই—এই তুমি কি সুন্দর।

কিঙ্কর সাদরে নীহারের চিবুক উঠাইয়া বলিল, "আর তুমি, নীহার?"

সে কথার উত্তর না দিয়া নীহার বলিল, "আরও ভাবিতেছিলাম যে—"

কি। কি, বল।

না। যদি তুমি সুন্দর না হয়ে কুৎসিৎ হ'তে।

কি। তা' হ'লে কি হইত, নীহার?

না। তা' হ'লে তোমায় বোধ হয় আরও ভাল বাসিতাম।

কি। কেন বল দেখি?

নী। তা' ঠিক জানি না। বোধ হয়, তুমি

কুৎসিত হ'লে আমি ছাড়া আর কেহ তোমায় ভালবাসিত না।

কি। সে কি, নীহার?

নী। জগৎ তোমায় সুন্দর দেখে, বা তুমি জগৎকে সুন্দর দেখ, এটা আমার সহ্য হয় না। তোমাকে আমাতেই লুকাইয়া রাখিতে চাই।

কি। এখন তা পার না কেন?

নী। এখন তোমার ওই মন-ভুলান রূপ শুধু আমার নয়। প্রত্যেক রমণীর চোখে তুমি এখন সুন্দর, প্রত্যেক রমণীর কণ্ঠে এখন তোমার রূপের কথা।

কি। কিন্তু যদি কেহ আমার নিকট তোমার রূপের প্রশংসা করে, তাহা হইলে আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়।

নী। পুরুষের মুখে আমার রূপব্যাখ্যা শুনিলে কি তোমার আনন্দ হয়?

কি। হয় বই কি?

নী। তবে তুমি আমায় ভালবাস না।

কি। আমি ভালবাসি না?

এমন সময় এক জন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "দাদা-বাবু, তোমায় কর্ত্তা ডাকছেন।"

দাসী চলিয়া গেল। হরিকিঙ্করও উঠিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "কাহার কত ভালবাসা, এক দিন বুঝা যাবে, নীহার।"

নবম পরিচ্ছেদ

হরিকিঙ্কর উঠিয়া সত্বরে পিতার কাছে আসিল। পিতা বলিলেন, "কিঙ্কর, তুমি এখন উপযুক্ত হইয়াছ। আমি আর সংসারে ক-দিন আছি? তোমার সম্পত্তি তুমি দেখিয়া লও। আমি বৃন্দাবনে চলিলাম। হরিবোল! হরিবোল!"

গত দশ বৎসর হইতে কেদারনাথ বৃন্দাবনে যাইবার জন্য দিনস্থির করিতেছেন; কিন্তু যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিতেছে না। মকর্দ্দমায় হারিলে বা গৃহিণীর নিকট লাঞ্ছিত হইলে, অথবা অন্য কোনও কারণে মনঃপীড়া পাইলে বৃন্দাবনে যাইবার কথা উঠে। কিঙ্কর সেটা জানিত; বুঝিল, পিতার মনে কোনও কারণে কষ্ট হইয়াছে। বলিল, "কেন, কি হইয়াছে বাবা?"

কেদার বলিলেন, "হবে আর কি? নির্ম্মলকে যতটা শান্ত-শিষ্ট মনে করেছিলাম, এখন দেখছি, সে তেমন নয়। তুমি ত জানই যে, আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি কালীর সঙ্গে ভাগাভাগি হওয়াতে আমার বড় অসুবিধা হ'য়েছিল। ষোল আনা সম্পত্তি, হয় কালী লউক, নয় আমি লই। তা' সে ত আর নিতে পারলে না। এখন বিষয়টা আমি নিতে চাই। তা'তে নির্ম্মল বাধা দেয় কেন? কেন বাপু, আমি যদি বিষয়টা পাই, তা'তে তোমার ক্ষতিটা কি? তোমার ত আর পৈতৃক সম্পত্তি নয়।"

কিঙ্কর বলিল, "নির্ম্মল বাবু কি করেছেন?"

কেদার। একটা মহালের প্রজা ভাঙ্গাইয়া নাবালক হেমের নামে কবুলতী লেখাইয়া লইতেছে।

কিঙ্কর। তবে ত বড় গোল—এখন উপায়?

কে। উপায়ের কথা পরে হইবে, এখন তুমি এক কাজ কর।

কি। বলুন।

কে। হেমেদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা কর। আসা-যাওয়া ক'তে ক'তে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে পড়বে। তখন জজের কাছে নাবালকের অছি হ'বার জন্য দরখাস্ত করব।

কি। মা বর্ত্তমান থাকতে আপনি কেমন ক'রে অছি হবেন?

কে। মাকে পাগল ব'লে এফিডেভিট কল্লুব

কি। নির্ম্মল বাবু বাধা দিতে পারেন।

কে। ওদের সঙ্গে এমনি আত্মীয়তা দেখাব যে, নির্ম্মলও তা'তে ভুলে যা'বে।

পিতার পরামর্শানুসারে কিঙ্কর কালী খুড়ার বাটীর দিকে গেল। উভয় বাটী পাশাপাশি। মধ্যে প্রাচীর ব্যবধান। কালী ও কেদার উভয়ে জ্ঞাতি, উভয়ের প্রপিতামহ একই ব্যক্তি। কালীর বাড়ী জীর্ণ, পতনোন্মুখ; কেদারের বাটী মেরামতের গুণে নূতন অবস্থায় আছে।

খুড়ীকে ডাকিতে ডাকিতে কিঙ্কর অন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, খুড়ী সোহাগের চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে; আর হেম পাশে ব'সিয়া শিশু-শিক্ষা পড়িতেছে; মাঝে মাঝে দিদির কাছে কঠিন স্থানের অর্থ করিয়া লইতেছে।

কিঙ্কর একটু মুখচোরা, একটু লাজুক; নূতন লোকের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে বা আলাপ করিতে হইলে কিঙ্করের কথা যোগাইত না। বন্ধুদের মধ্যে কিঙ্করের বড় একটা লজ্জা থাকিত না; স্ত্রীর কাছে একেবারে না। কিন্তু কথাগুলা গুছাইয়া ঠিক করিয়া সকল সময় বলিতে পারিত না। কিঙ্কর নিতান্ত আশিক্ষিত নয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া

অবশেষে পিতার কাছে জমীদারীর কাজ শিখিতেছিল। কিঙ্করের বয়স তেমন বেশী নয়; চব্বিশের মধ্যে হইবে। দেখিতেও বেশ,—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর সুশ্রী মুখ; সুতরাং নীহার তাহাকে পরম রূপবান্ বলিয়া মনে করিত।

কিঙ্কর খুড়ীকে দেখিল, হেমকে দেখিল, তার পর সোহাগকে দেখিল। আলুলায়িত নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, গণ্ড প্লাবিত করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইতেছে। কিঙ্কর দেখিল, সেই কেশদামের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র মুখ; যেন অমাবস্যা নিশীথে মেঘ-প্রতিবিম্বিত বাপী-হৃদয়ে কে উজ্জ্বল দীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছে—যেন খণ্ড খণ্ড কাল মেঘ পূর্ণিমার চাঁদকে ঘিরিয়াছে। এত সৌন্দর্য্য বুঝি কিঙ্কর আর কখনও দেখে নাই। গঙ্গাবক্ষে অলুলায়িতকুন্তলা ভগবতী-প্রতিমা দেখিয়াছে, আকাশপটে নিবিড় মেঘের কোলে বিদ্যুদ্দাম দেখিয়াছে, সরসীর তলে নক্ষত্র ফুটিতে দেখিয়াছে, কিন্তু একাধারে এত সৌন্দর্য্য সে কখনও দেখে নাই। কিঙ্কর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিল।

খুড়ী সোহাগের চুল ছাড়িয়া কিঙ্করকে বসিতে আসন দিল। সোহাগ উঠিল না, সলজ্জভাবে বসিয়া রহিল। কিঙ্কর বহুকাল এ বাড়ীতে আসে নাই—বহুকাল সোহাগকে দেখে নাই। শৈশবে ধূলা মাখিয়া সোহাগ যখন খেলিয়া বেড়াইত, তখন তাহাকে কিঙ্কর দেখিয়াছিল; কিন্তু তখন ভাবে নাই যে, সে কানন-লতিকা একদিন মুকুলিত হইয়া অরণ্য উদ্ভাসিত করিবে।

কিঙ্কর বড় একটা কথা কহিতে পারিল না; যা কিছু কহিল, তা' হেম ও খুড়ীর সঙ্গে; সোহাগের সহিত বাক্যালাপও করিল না; স্বল্পকাল তথায় বসিয়া কিঙ্কর উঠিয়া গেল।

রাত্রি কিছু বেশী হইলে কিঙ্কর ঘরে শুইতে আসিল। নীহার জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রি হ'ল কেন?

কিঙ্কর বলিল, "খেলা করিতেছিলাম।"

মিথ্যা কথা। কিঙ্কর সোহাগের চিন্তায় বিভোর হইয়া তা'র মুখখানা ভাবিতে ভাবিতে জ্যোৎস্নাময়ী নিশিতে গঙ্গার ধারে বেড়াইতেছিল। কিন্তু কিঙ্কর সে কথা গোপন করিয়া একটা মিথ্যা বলিল।

কিঙ্করকে অন্যমনস্ক দেখিয়া স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত বিষণ্ন কেন?"

কিঙ্কর বলিল, "মাথা ধরেছে।"

আবার মিথ্যা! কিঙ্কর আগে স্ত্রীকে প্রতারণা করিত না; এক্ষণে অসঙ্কোচে পতিপ্রাণা স্ত্রীকে মিথ্যা কথায় ভুলাইল। যে বিশ্বাসঘাতক—তা'র আবার মিথ্যা বলিতে সঙ্কোচ? যে মানুষ মারে, সে পদতলে পিপীলিকা দলিত হইল কি না, ফিরিয়া দেখে কি?

অবশেষে কিঙ্কর পিতার আদেশ নীহারকে জানাইল। খুড়ীর সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার আবশ্যকতা স্ত্রীকে বুঝাইল। স্ত্রী তাহা বুঝুক বা নাই বুঝুক, স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিল এবং পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সোহাগকে ডাকিয়া লইয়া গঙ্গাস্নানে চলিল।

গ্রাম্যপথ আলো করিয়া দুই জনে গঙ্গাস্নানে চলিল। তখনও জ্যোৎস্নার আলো সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই, তখনও ঊষার অরুণরাগ সম্পূর্ণ ফুটিয়া উঠে নাই। ঊষার আলো চাঁদের গায়ে পড়িয়াছে, জ্যোৎস্নার ম্লান আভা ঊষার ললাটে প্রতিফলিত হইয়াছে। পৃথিবীর সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে যেন পতি-প্রেম-উৎফুল্লা, লাজ-রঞ্জিতা ঊষা-রাণী—গৃহ-বহিষ্কৃতা, পতি-লাঞ্ছিতা সতিনী চন্দ্রিকার ম্লান মুখপানে গর্ব্বভরে চাহিয়া টিপি-টিপি হাসিতেছে; তা'র সে গরবের হাসি দেখিয়া চাঁদ যেন আরও ম্লান হইয়া পর্ব্বতান্তরালে বা গাছের আড়ালে বিষণ্ন বদন লুকাইবার অভিপ্রায়ে ছুটিয়া পলাইতেছে। দুই-ই সুন্দর। তবে যে আদর হারাইয়াছে, তার সৌন্দর্য্য দেখিবে কে?

সেই দিবা-রাত্রির সন্ধি সময়ে, ঊষা-জ্যোৎস্নার সম্মিলিত আলোকে—শান্ত, স্থির ভাগীরথীর উপকূলে দাঁড়াইয়া এক জন অপরকে বলিতেছে, "দেখ, ঊষা উঠিতেছে।"

অপর উত্তর দিল, "দেখ, জ্যোৎস্না কেমন ডুবিয়া যাইতেছে।"

জ্যোৎস্না ঊষার হাত ধরিয়া বলিল, "দেখ, ঠাকুরঝি, তুমি এত সুন্দর, তা' ত কখন জানিতাম না।"

ঊষা বলিল, "বউদিদি, তোমার গায়ের আলো আমার মুখে পড়েছে, তাই আমায় সুন্দর দেখাইতেছে।"

দশম পরিচ্ছেদ

নির্ম্মলের মনে সুখ নাই। বিলি আর পত্র লেখে না। আগে প্রত্যহ পত্র আসিত; ক্রমে পত্রের সংখ্যা কমিয়া দুই দিন, চারি দিন অন্তর এক আধখানা আসিতে লাগিল। এক আধখানা যাহা আসে, তাহাও

কর্কশ, স্নেহশূন্য। আজ কয়েক দিন কোনও পত্র আসে নাই। নির্ম্মলও অভিমানভরে পত্র লেখেন নাই।

যদি বিলির পত্র একেবারে না আসিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ নির্ম্মল এতটা কাতর হইতেন না। কিন্তু তাহা না ঘটিয়া মাঝে মাঝে এমনই মর্ম্মান্তিক তীব্র ভাষায় লিখিত দুই একখানি পত্র আসিত যে, তাহা পড়িতে নির্ম্মলের প্রাণ ফাটিয়া যাইত। একবার পড়িয়া কোনখানা দুইবার পড়িতে সাধ হইত না। কোনখানা বা দুই এক ছত্র পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। পত্রপাঠকালে অভিমানে অন্ধ হইয়া তিনি একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতেন না যে, এরূপ কঠিন পত্র লেখা বিলির পক্ষে সম্ভব কি না। অভিমান-অনল যাহার হৃদয়ে জ্বলে, তাহার বিচারশক্তি কোথায়?

তাই বলিতেছিলাম, এখন নির্ম্মলের মনে কোনও সুখ নাই। নির্ম্মল এখন নৌকায় চড়িয়া গঙ্গার উপর বেড়াইতে যান না—বন্দুক লইয়া শীকারে বাহির হ'ন না—অশ্বারোহণে আর তেমন আনন্দ অনুভব করেন না বিষয়কর্ম্মাদিও দেখেন না। তবে সোহাগের বাপের বিষয় উদ্ধার করিবার আগ্রহ পূর্ব্ববৎ প্রবল ছিল। সে উদ্যমে পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত বা কাতর হইতেন না। সেটা যে পরের কাজ।

মা ছেলের জন্য বড় কাতর হইলেন। ছেলে কোথাও যায় না—কোনও কাজ করে না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হয়। মা বুঝাইতে গেলে ছেলে হাসিয়া উঠে। মা সেই হাসি দেখিয়া চোখের জল লইয়া ফিরিয়া আসেন।

মা ব্যাকুল হইয়া বধূর তত্ত্ব লইবার মানসে দুই জন দাসী পাঠাইলেন—ফিরিয়া আসিবার জন্য বধূকে মিষ্ট কথায় অনুরোধ করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

দাসীরা আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বধূ আসিল না; বলিয়া পাঠাইল, দাদা ভাল হইলে ফিরিব।

কিন্তু নির্ম্মলের প্রাণ ফাটিয়া গেল। বিলির নিষ্ঠুরতা নির্ম্মলের হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। যাহাকে ভাবিয়া সুখ, দেখিয়া শান্তি, সে নির্ম্মলের পানে চাহিয়া দেখিল না—নির্ম্মলের যাতনা বুঝিল না। বিলি কেন এমন হ'ল! বিলি যে নির্ম্মলের চো'খে জল দেখিলে পাগল হয়ে বেড়াত, নির্ম্মলের মুখ একটু ম্লান দেখিলে বিলি যে কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইত,—সে বিলি কেন এমন হ'ল?

নির্ম্মল একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ছাদে বসিয়া ভাগীরথীর তরঙ্গলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। তবে বাতাস প্রবল। রবিকর-প্রতিভাত উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গমালা অবিরাম অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে। জাহ্নবী কুঞ্চিত কেশে মণিমাণিক্য বিজড়িত সাঁথি পরিয়া স্ফীতবক্ষে স্বামি-সম্ভাষণে ছুটিয়া চলিয়াছেন—আঁখিজলে ঘাট মাঠ প্লাবিত করিয়া, প্রাণের ব্যথার প্রতিধ্বনি উঠাইয়া উন্মত্তহৃদয়ে ছুটিয়া চলিয়াছেন। আকাশপ্রান্তে হরিৎ-বিটপীর পাদমূলে আছাড় খাইয়া, মর্ত্ত্যে স্বর্গ মিশাইয়া, ক্ষিপ্তা জাহ্নবী হাহাকার করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

ক্রমে অন্ধকার টিপি-টিপি আসিয়া গাছপালা-পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল; আকাশরাজ্যে রসিকা রূপসীরা একে একে চুপি চুপি পথ হাঁটিয়া অভিসারে চলিল; তাহাদের রূপজ্যোতির আলোকে পৃথিবীর ঘনান্ধকার কতকটা দূরীভূত হইল। সেই নক্ষত্রদীপ্ত অস্পষ্টালোকে নির্ম্মল ছাদে শুইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। পুরাতন কথা একে একে নির্ম্মলের মনে পড়িতে লাগিল;—এই ছাদে শুইয়া বিলির হাত বুকের উপর লইয়া, নির্ম্মল কতদিন নক্ষত্রপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন—তাহা নির্ম্মলের মনে পড়িল। নক্ষত্রনিচয়কে অভিসারিকা বলিয়া বিলি কত বিদ্রূপ করিয়াছিল, নির্ম্মলের তাহা মনে পড়িল; কোন্ নক্ষত্রকে বিলি কি নামে ডাকিত—সন্ধ্যাতারা দিবালোক থাকিতে থাকিতে সকলের আগে অভিসারে যাইত বলিয়া বিলি তাহাকে নির্লজ্জা বলিয়া কত উপহাস করিত, তাহা নির্ম্মলের মনে পড়িল একদিন নিবিড় মেঘের কোলে মরালকে উড়িতে দেখিয়া নির্ম্মল, বিলির দেহযষ্টি নীলাম্বরী শাড়ীতে আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে লজ্জাভিভূতা বিলি কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া মরালকে কত গালি দিয়াছিল, কত শাসাইয়াছিল, নির্ম্মলের তাহা মনে পড়িল, অতীতের ছবি একে একে নির্ম্মলের স্মৃতিপটে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দুঃখের দিন, সুখের ছবি মনোপ্রাণে স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিল; কতদিনের কত সুখের ছায়া মানসসলিলে একে একে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নির্ম্মল সহস্রবার মনে মনে প্রশ্ন করিলেন, "সে বিলি কেন এমন হইল?" তীব্র যন্ত্রণায় চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কয়েক দিন পরে একদা মধ্যাহ্নে নির্ম্মল একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি জাল, কিন্তু বিলির লিখিত বলিয়া নির্ম্মলের ভ্রম হইল। নির্ম্মল শুষ্ক-নয়নে, শুষ্কহৃদয়ে পড়িলেন, "তোমার প্রতি আমার যেমন কর্ত্তব্য আছে, অপরের প্রতিও আমার সেইরূপ কর্ত্তব্য আছে। তাহাতে যদি রাগ কর, আমি নাচার। না লইয়া যাও, এইখানেই থাকিব। তাহাতে সুখী বই দুঃখী নই। তুমিও যে সুখী হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিজলী।"

পত্র পাঠ করিয়া অভিমানী কিশোরের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। অভিমান ও ক্রোধে অন্ধ হইয়া নির্ম্মল একবার ভাবিলেন না যে, এরূপ পত্র লেখা বিলির পক্ষে অসম্ভব। পাঠান্তে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পত্রখানা খণ্ড খণ্ড করিয়া গবাক্ষপথে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শতধাছিন্ন পত্র বায়ুপ্রবাহে উড়িয়া গেল। নির্ম্মল ভাবিলেন, "সব উড়ে যায়, স্মৃতি যায় না কেন? সুখ, সাধ, ভালবাসা ঝড়ের মুখে তৃণের ন্যায় উড়ে গেল,—আমার যা কিছু ছিল, সব একে একে গেল, তবু স্মৃতি যায় না কেন? সে বোঝা কি নামান যায় না? সেটা কি এতই ভার?"

এমন সময়ে নায়েব কতকগুল কাগজপত্র লইয়া হাজির হইল নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি?" নায়েব খাজনা মকর্দ্দমার কথা পাড়িল। নির্ম্মল বলিলেন, "ও সব কথা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না।"

নায়েব। না শুনিলে বিষয় থাকিবে কি প্রকারে?

নির্ম্মল। না থাকে, যাক্।

না। আমি কর্ত্তার আমল থেকে আছি—কর্ত্তাদের বিষয় নষ্ট হ'বে, তা' আমি চোখে দেখিতে পারিব না।

নি। না দেখিতে পার—চ'লে যাও।

না। তাও পার্'ছি কই? যে কয়টা দিন বেঁচে থাকি, সে কয়টা দিন এইখানেই কাটাব।

নি। যখন কাকা বিষয় গ্রাস করেছিলেন, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

না। তিনিও যে আমার মনিব।

নি। ভাল, তবে এখন তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে যাও।

না। বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?

নি। তাই বটে।

না। তার পর?

নি। তার পর? তার পর আবার কি?

না। মায়ের দশা কি হ'বে?

নি। কাশীবাস।

নায়েব নীরব হইল। সে বুদ্ধিমান্ ও প্রভুভক্ত; মনিবকে বেশ চিনিত। চিনিত বলিয়াই কথাটা চাপা দিল; এবং একটু পরে ধীরে ধীরে বলিল, "কেদারনাথ বাবু, জজের বরাবর একটা দরখাস্ত করিয়াছেন।"

নি। কিসের দরখাস্ত?

না। নাবালকের অছি হইবার জন্য।

নি। নাবালক কে?

না। কালীনাথের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ।

নি। মা বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কিরূপে অছি হইবেন?

না। মাকে পাগল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

নি। মিথ্যা কথা টিকিবে কেন?

না। মকর্দ্দমার জবাব না দিলে টিকিবে বই কি।

নি। মায়ের পক্ষে তুমি জবাব দিবে।

না। কি করিতে হইবে, আমায় উপদেশ দিন্।

নি। নাবালকের মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, পরে উপদেশ দিব।

নায়েব বিদায় হইল। নির্ম্মল অশ্বারোহণে অল্প-কালমধ্যে আনন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। কালী খুড়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হেমের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে এক জন দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে হেমকে ডাকিয়া দিল। হেম তখন খিড়কীর পুকুরে মাছ ধরিতেছিল।

দাসী অনেক দিন হইতে কালী বাবুর বাড়ীতে চাকুরী করিতেছে। এখন বেতন পায় না, তবু চাকুরী ছাড়ে না। কালী খুড়ার ইদানীং ভৃত্য রাখিবার সামর্থ্য ছিল না। সম্প্রতি নির্ম্মল এক জন ভৃত্য বা দ্বারবান রাখিয়া দিয়াছেন; সে অভিভাবক-স্বরূপ গৃহের পাহারায় থাকিত।

হেম আসিয়া দাঁড়াইলে নির্ম্মল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কোথায়?"

হেম। কেদার জ্যেঠার বাড়ী।

নি। আর সোহাগ?

হে। সেইখানে।

নি। কেন গিয়াছেন? নিমন্ত্রণ হইয়াছে কি?

হে। না। অমনি বেড়াতে গেছেন।

নি। প্রত্যহ যান কি?

হে। দিদি যান; মা রোজ যান না।

নি। যাও—মাকে ডেকে নিয়ে এস।

বস্তুতই সোহাগ এক্ষণে কেদার জ্যেঠার বাটীতে প্রত্যহ বেড়াইতে যায়। যদি কোন দিন না যায়, তা হ'লে নীহার নিজে ডাকিতে আসে। সোহাগ কাহারও অনুরোধ এড়াইতে পারে না—কাহারও মনে কষ্ট দিতে জানে না। নীহারও সোহাগকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না।

উভয়ে প্রত্যুষে উঠিয়া একত্র গঙ্গাস্নানে যায়; আবার মধ্যাহ্নে আহারান্তে একত্র খেলিতে বসে। কোন দিন তাস, কোনও দিন দশ-পঁচিশ। খেলাটা নীহারের কক্ষেই প্রত্যহ হয়। শুধু নীহার ও সোহাগের মধ্যেই যে খেলা চলিত, এমন নহে। তাহাদের আরও সঙ্গী ছিল। তৃতীয় সঙ্গী—হরিকিঙ্কর; চতুর্থ সঙ্গী—প্রতিবাসি-কন্যা যমুনা।

যমুনার বাপের বাড়ী আনন্দপুরে। সুতরাং যমুনা চুল এলো ক'রে দাগা ষাঁড়ের মত গ্রামময়, এ বাড়ী ও-বাড়ী করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যমুনা বয়সে—যুবতী, রূপে—বায়সী। অমাবস্যা-বরণার মুখকান্তি মনোমত না হওয়াতে মূর্খ স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছে। তদবধি যমুনা পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছে।

হরিকিঙ্করের সহিত খেলিতে সোহাগ প্রথমে সম্মতা হয় নাই। পরস্পর সম্পর্কে ভাই-ভগ্নী হইলেও সম্বন্ধ অতি দূর। তা ছাড়া ঘনিষ্ঠতাও খুব কম। এমন কি, সোহাগ, কিঙ্করকে চিনিত না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় কিঙ্করের সহিত খেলিতে সোহাগ বড়ই লজ্জিতা হইল। সোহাগও এখন বালিকা নয়।

প্রথম দিন, কোনও মতেই সোহাগ খেলিতে পারিল না। দ্বিতীয় দিন, মায়ের অনুমতি লইয়া নীহারের পীড়াপীড়িতে খেলিল। ক্রমে লজ্জা কমিয়া আসিল; এখন আর তত বাধ-বাধ ঠেকে না।

বাধ-বাধ না ঠেকিলেও সোহাগ বড় একটা কথা কহিত না। সোহাগ চুপ করিয়া নীরবে খেলিত। কিঙ্করের পক্ষভুক্ত হইয়া কিঙ্করের সামনে বসিয়া তাহাকে প্রত্যহ খেলিতে হইত। সোহাগ কখনও মাথা তুলিয়া কিঙ্করের পানে চাহিয়া দেখিত না—বাধ্য না হইলে কখনও কথা কহিত না।

সোহাগ প্রত্যহ খেলায় হারিত। দোষটা কিন্তু কিঙ্করের। সে বড় ভুলিত। বিন্তি, পঞ্চাশ হাতে আসিলে কিঙ্কর হাঁকিতে ভুলিয়া যাইত—চোদ্দর উপর গোলাম মারিতে কিঙ্করের স্মরণ থাকিত না! কিঙ্করের ভুল দেখিয়া নীহার হাসিত—যমুনা ঠাট্টা করিত; কিন্তু সোহাগ কিছু বলিত না।

কিঙ্করের ভুলটা কিছু বিচিত্র নয়। খেলাতে কিঙ্করের মন থাকিত না—হার-জিতের দিকেও তার লক্ষ্য ছিল না। কোনও দিকে সে চাহিত না—সোহাগের দিকেও নয়। বিহ্বলচিত্তে যন্ত্রতাড়িত পুতুলের মত কিঙ্কর তাস ফেলিয়া দিয়া যাইত। সোহাগ কথা কহিলে কিঙ্কর উৎকর্ণ হইয়া শুনিত। যে দিন সোহাগ দুই চারিটা কথা কহিত, সে দিন কিঙ্কর কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ ভাবিবার জন্য গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাইত।

সোহাগকে দেখিবার জন্য কিঙ্কর ব্যাকুল হইয়া থাকিত। সাক্ষাৎ পাইলে কথা স্ফুটিত না—চক্ষুও সোহাগের মুখপানে উঠিত না। কিন্তু দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া ছুটাছুটি করিত। এ আকুলতা কিঙ্করকে উন্মত্ত করিয়া তুলিত। প্রবৃত্তিতাড়নায় কিঙ্কর ভাসিয়া চলিল। দুর্বল হৃদয় প্রবল তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তরঙ্গাঘাত প্রতিরোধ করিতে কিঙ্করের শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই।

দ্বিতলের কক্ষবিশেষের গবাক্ষ হইতে সোহাগদের গৃহাভ্যন্তর কিয়দংশ দেখা যাইত কিঙ্কর সুবিধা পাইলেই সেই গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইত। সেই স্থান হইতে সোহাগকে লুকাইয়া দেখিত; দেখিয়া প্রবৃত্তিতে আহুতি দিত। একে গুণশূন্য হৃদয়, তাহাতে প্রবল বাসনানল—কিঙ্করের হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইল।

যখন মন একবার উচ্ছৃঙ্খল হয়, তখন তাহার শৃঙ্খলাবন্ধন সহজসাধ্য নয়। যখন একবার তুফানে গা ভাসাইয়া দিই, তখন ধর্ম্মের মুখের দিকে চাহি না। কিঙ্কর প্রতারণায় নীহারকে ভুলাইতে একটুও ইতস্ততঃ করিত না—যতটুকু আদর না করিলে নীহারের সন্দেহ জন্মিতে পারে, তাহাকে ততটুকু আদর করিত; কিন্তু মনে মনে নীহারকে ঘৃণা করিত। নীহার কেন সোহাগের মত সুন্দর হ'ল না? নীহারের কেন সোহাগের মত মিষ্ট কথা হ'ল না? নীহার কেন সোহাগ হ'ল না?

কিন্তু নীহারের মনে কোনও অশান্তি ছিল না। সে সোহাগকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছিল। সোহাগ শান্ত, নম্র ও মিষ্টভাষিণী। সোহাগ আত্মীয়কন্যা, সুচরিত্রা অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকা মাত্র। নীহার তাহাকে ভালবাসিত। এক দিন সোহাগের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া নীহার বলিয়াছিল, "তোমাকে আমি সব দিতে পারি।"

স্বামীর সংসর্গে রূপসী যুবতীকে আসিতে দেওয়া নীহার পছন্দ করিত না। যমুনা কুরূপা; সুতরাং

এ দিকে নীহারের কোনও ভয় ছিল না। নীহার যে ঠিক ভয় করিত, এমন নহে; তবে কিঙ্কর কাহাকেও সুন্দর দেখিলে বা কাহারও সহিত মিষ্ট করিয়া দুটা কথা কহিলে, নীহার সহ্য করিতে পারিত না—জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিত।

বর্ত্তমান অবস্থায় নীহারের কোনও জ্বালা নাই; বেশ মনের সুখে নাচিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। মধ্যাহ্নে খেলাটা প্রত্যহ চলিত। আজও চলিতেছিল। তবে সোহাগের হারটা আজ বড় গুরুতর হইয়াছিল। দুইখানা ছক্কা, তিনখানা পঞ্জা ধরিয়া নীহার স্বামীকে বেশ দুকথা শুনাইতেছিল। যমুনাও ব্যোম ধরিবে বলিয়া শাসাইতেছিল। এমন সময় তথায় হেম আসিয়া উপস্থিত হইল। হেম বলিল, "দিদি, নূতন দাদা এসেছে।"

সোহাগ তাস ফেলিয়া উঠিল। কিঙ্কর হেমের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নূতন দাদাটা কে?"

নীহার উত্তর করিল, "নির্ম্মল বাবু।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিঙ্কর বলিল, "তা তিনি আসিয়াছেন ব'লে সোহাগ উঠে' যায় কেন?"

নীহার কি উত্তর দিল, তাহা সোহাগ শুনিল না। সে চলিয়া গেল।

—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সোহাগ উঠিয়া গেলে কিঙ্করও উঠিল। একটু এ-দিক ও-দিক করিয়া কিঙ্কর পূর্ব্বকথিত গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে সোহাগদের গৃহাভ্যন্তর দেখিতে পাইল। দেখিল, নির্ম্মল দালানে বসিয়া সোহাগের মার সহিত কথা কহিতেছেন। সেখানে হেম আছে, সোহাগ নাই। দূরত্ববশতঃ সকল কথা কিঙ্কর শুনিতে পাইতেছিল না। মাঝে মাঝে এক একটা কথা তাহার কাণে যাইতেছিল। নির্ম্মল বলিতেছিলেন, "সোহাগের বিয়ের কথা তোমায় ভাবিতে হবে না, আমি বুঝিব।"

সোহাগের মা বলিল, "মেয়ে আর রাখা যায় না, না ভেবে করি কি?"

নি। এত দিন ভাব নাই; আর আজ শ্রাদ্ধের পর পনর দিন যেতে না যেতে ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়্‌লে?

সো, মা। ও-বাড়ীর ভাশুর (কেদার) সোহাগের একটি সম্বন্ধ করিতেছেন।

নি। পাত্র কে?

সো, মা। ভাশুরের গোমস্তার ছেলে। পাত্রটির একটু বেশী বয়স হয়েছে, তা' ব'লে আর কি করব।

নি। সোণার প্রতিমা, বানরের অঙ্কে তুলিয়া দিতে পারিব না।

সো, মা। তা হ'লে উপায়?

নি। সে ভাবনা আমার। খুড়ার মৃত্যু-শয্যায় যাহাকে ভগ্নী ব'লে গ্রহণ করেছি, তাহার বিবাহের ভাবনা আমার, ব্যয়ও আমার। আমার ভগ্নীর উপযুক্ত পাত্রে সোহাগকে দান করব।

এ কথা কয়টি নির্ম্মল একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিয়াছিলেন। অন্তরালে কিঙ্করের কাণে কথা কয়টা পৌঁছিল। সে নির্ম্মলকে উদ্দেশ করিয়া মনে মনে বলিল, "পাত্র কে? তুমি স্বয়ং না কি? সেই জন্যই কি স্ত্রীকে সরাইয়াছ?" যে বংশে বহুবিবাহ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, সে বংশের বংশধর এরূপ ভাবিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

এমন সময়ে কিঙ্কর দেখিল, সোহাগ আসিয়া নির্ম্মলের হাতে তাম্বূল দিল। তার পর নির্ম্মলের পাশে বসিয়া নির্ম্মলকে ব্যজন করিতে লাগিল। নির্ম্মল আদর করিয়া সোহাগের মুখের উপর হইতে স্থানভ্রষ্ট কেশগুচ্ছ সরাইয়া দিলেন। সোহাগ বলিল, "দাদা, এতদিন আসনি কেন?"

নির্ম্মল একটু হাসিয়া বলিলেন, "আসিলে ত তোমাদের দেখা পাই না।"

হেম বলিল, "পনর দিনের মধ্যে তুমি একবারও আসনি, দাদা।"

কিন্তু সোহাগ কিছু বলিল না। সে নির্ম্মলের শেষ কথাটা ভাবিতেছিল; ভাবিয়া ভাবিয়া অবশেষে বুঝিল যে, নীহারের বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়াতে দাদা একটু বিরক্ত হইয়াছেন। সোহাগ স্থির করিল, তথায় আর যাইবে না।

নির্ম্মল উঠিলেন। বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, "একটা কথা বলিতে আসিয়াছিলাম; তাহা আজ আর বলা হ'ল না—কাল আবার আসিব।"

কিঙ্কর গবাক্ষ ত্যাগ করিল,—হৃদয়ে হলাহল লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সোহাগ খেলিতে আসিল না। নীহার নিজে ডাকিতে গেল, তবু সোহাগ আসিল না,—বলিল, "দাদা আস্‌বেন।" নীহার রাগ করিয়া চলিয়া গেল। স্বামীর কাছে, সোহাগের দেমাক্ হইয়াছে বলিয়া, নিন্দা করিল। যমুনা সেখানে ছিল। সে বলিল, "না রে, দেমাক্ নয়।"

নী। তবে কি?

য। তোরা যেমন নেকি; ভিতরের কথা বুঝ্‌তে পারিস্ না।

নী। ভিতরের কথা আবার কি?

য। সোহাগরা আগে খেতে পে'ত?

নী। কষ্টে সংসার চলিত বটে।

য। এখন কষ্ট পাওয়া দূরে থাক্, দেউড়ীতে দরওয়ান বসাইয়াছে।

নী। নির্ম্মল বাবু খরচ যোগাইতেছেন।

য। আ মর্, আমিও ত তাই বল্‌ছি।

এতক্ষণে নাহার কথাটার মর্ম্ম প্রণিধান করিল। তখন সে স্কন্ধে চিবুক সংস্পর্শ করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিল, "ও মা, আমি কোথায় যাব! নির্ম্মল বাবু এমন! তাই বুঝি তিনি সোহাগের বিয়ে দিচ্ছেন না?"

যমুনা বলিল, "তবে আর বল্‌ছি কি? এখন বাবুকে ফেলে তোমার সঙ্গে কি সোহাগ তাস খেল্‌তে আস্‌বে?"

কিঙ্কর সেখানে আর বসিল না। উঠিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিল। দেখিল, পথি-পার্শ্বে বৃক্ষতলে নির্ম্মলের ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে। ফিরিয়া দ্বিতলে উঠিল। পূর্ব্বকথিত গবাক্ষপথ দিয়া সোহাগদের গৃহমধ্য পর্য্যবেক্ষণ করিল। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া কিঙ্কর আবার নীচে আসিল। দেখিল, নির্ম্মলের অশ্ব পূর্ব্ববৎ বাঁধা রহিয়াছে। তখন কিঙ্কর নিজের কক্ষে আসিয়া বসিল। দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিল।

যে ঘরে কিঙ্কর বসিল, সে ঘর সদরে। এ কক্ষের সহিত বাটীর অন্যান্য অংশের বড় একটা সংস্রব ছিল না; কদাচিৎ কেহ কখন এখানে আসিত। তবে সন্ধ্যার পর দুই চারি জন বন্ধু-বান্ধব কখনও কখনও আসিয়া বসিত। আজ এখন কেহ ছিল না। কিঙ্কর একাকী বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

পাপকলুষিত হৃদয়ের চিন্তা বা কল্পনার অনুসরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সত্য গোপন করিতেও আমাদের বাসনা নাই। যে হেতু উপন্যাস-লেখকের মত সত্যবাদী জগতে বিরল।

প্রায় দুই দণ্ডের পর কিঙ্কর চিন্তা ছাড়িয়া কলম ধরিল। দুই চারিখানা কাগজ ছিঁড়িয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি খাড়া করিল :—

"মাননীয়া শ্রীমতী বিজলীবালা দাসী—

আপনাকে জানাইব না ভাবিয়াছিলাম—আপনার প্রাণে ব্যথা দিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে আপনাকে না জানাইলে আর চলিতেছে না।

কালীনাথের কন্যা সোহাগ আপনার পরিচিতা; শুনিয়াছি, পূর্ব্বাবধি আপনাদের বাড়ীতে সে যাতায়াত করিত। এক্ষণে কালীনাথ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যদি আপনার স্বামী নির্ম্মলকুমার সহায় না হইতেন, তাহা হইলে কালীনাথের বিধবা, সন্তান সন্ততি-সহ না খাইয়া মরিত। যদি নিঃস্বার্থভাবে নির্ম্মলকুমার এ কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁহার স্বার্থ গুরুতর, বাসনা নীচোচিত, কামনা জঘন্য।

সোহাগ বালিকা নয়; সে এক্ষণে ভুবনমোহিনী তরুণী। রূপানলে সব পুড়ে—নির্ম্মলের ধর্ম্ম পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। নির্ম্মল রক্ষক হইয়া অনাথা বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।

আপনি সত্বর আসিয়া না পড়িলে, কি ঘটে, বলা যায় না। শুনিতেছি, উভয়ের মধ্যে বিবাহ হইবারও প্রস্তাব চলিতেছে।

আমি আপনার অপরিচিত; সুতরাং নাম স্বাক্ষর বৃথা বোধে করিলাম না। ইতি ২৯শে চৈত্র।"

পত্রখানা ডাকযোগে বিশালপুরে প্রেরিত হইল। যথাসময়ে বিজলি তাহা পাইল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পত্রখানা তৎপূর্ব্বে জ্যোৎস্না ও হারাণ কর্ত্তৃক অধীত হইয়াছিল। জ্যোৎস্না যাহা খুঁজিতেছিল, এ পত্রে তাহা মিলিল। নির্ম্মলের স্ত্রীর সুখ, শান্তি নষ্ট করা জ্যোৎস্নার উদ্দেশ্য; তাহা এইবার সম্যক্ সাধিত হইল। বিজলির ধর্ম্ম নষ্ট করা হারাণের অভিপ্রেত; তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সে কথা এখন থাক্।

পত্র পাঠাইয়া কিঙ্কর ভাবিতেছিল যে, পত্র পাইবামাত্র বিজলী ছুটিয়া আসিবে। পাঁচ দিন অতীত হইল, তবু বিজলী আসিল না। সোহাগও আর খেলিতে আসে না। তখন কিঙ্কর আর স্থির থাকিতে পারিল না, সে এক বৃদ্ধার শরণাপন্ন হইল।

বৃদ্ধার নাম গ্রামস্থ লোকেরা ঠিক জানে না। সকলে তাহাকে হালদার-বউ বলিয়া ডাকিত। সেই নামেই সে সংসারে পরিচিত ছিল। হালদারণীর পেশা কি, লোকে ঠিক বলিতে পারিত না। কেমন করিয়া তাহার উদরের কার্য্য চলিত, তাহা গ্রামের মহামহোপাধ্যায়েরা ভাবিয়া নির্ণয় করিতে পারে নাই। তবে গ্রামের পাঁচ জনে আঁচাআঁচি করিয়া হালদার-বউয়ের পবিত্র নামে কত কি বলিত। তাহাতে তাহার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না; সে গ্রামস্থ

ভদ্রমহিলাদের নিকট হইতে পূর্ব্বাবধি যেরূপ সম্মান পাইয়া আসিতেছিল, তাহা অক্ষুণ্ণ ও অটুট ছিল।

হালদার-ঠাকুরাণীর কেহ ছিল না; একাকিনী একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিত। একটি পুষ্টকায় মার্জ্জার ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণী আপাততঃ তাহার শয্যাসঙ্গী ছিল না। গৃহকার্য্যে সাহায্য করিবারও কেহ ছিল না। তা'তেও বড় আসিয়া যায় না; কিন্তু কথা কহিবার দোসর না থাকায় ঠাকুরাণীর বড়ই কষ্ট হইত। হালদারণী একটু বেশী কথা কহিতে ভালবাসিত। একটা কথা শুনিয়া আসিলে, যতক্ষণ না ঠাকুরাণী সেই কথাটার অন্যূন পঞ্চম সংস্করণ জগতে প্রচার করিতে পারেন, ততক্ষণ তিনি স্ফীত উদরে এক বিন্দুও জল গ্রহণ করিতেন না। মূল কথাটা যে প্রত্যেক সংস্করণে কিছু বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সকল গৃহেই তাঁহার যাতায়াত ছিল,—সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। হালদার-ঠাকুরাণীর গতিরোধ করিতে পারে বা তাঁহাকে অসম্মান দেখাইতে পারে, এমন মহিলা গ্রামে ছিল না। তিনি তুষ্ট থাকিলে গ্রামের সংবাদ ঘরে বসিয়া প্রত্যহ জানা যাইতে পারে। তিনি রুষ্ট হইলে ঘরের কথা—সত্য হউক বা মিথ্যা হউক—গ্রামমধ্যে নানাভাবে প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং গ্রামস্থ রমণীবৃন্দ, হালদার-বউয়ের নামে—ভক্তিতে হউক বা ভয়ে হউক—দিশেহারা হইত। হালদার-ঠাকুরাণীর অপ্রীতিকর কোনও কথা বলিতে বা কার্য্য করিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে ঠাকুরাণী গ্রাম শাসন করিতেন।

কিঙ্কর অনন্যোপায় হইয়া, এই প্রবল-পরাক্রমশালিনী রমণীকুল-ভাগ্য-বিধাত্রীর শরণাপন্ন হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিলির এখন কাঁদিয়া দিন যায়। দুই চারি দিন অন্তর নির্ম্মলকুমারের এক আধখানি পত্র বিলির হস্তগত হয়। পত্রগুলি নীরস, কঠিন। বিলি যদি এককালে পত্র না পাইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে এতটা কাতর হইত না।

হৃদয়ের ব্যথা বিলি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিল না। বুকের ভিতর তুষানল চাপিয়া ধরিয়া বিলি অন্তরে অন্তরে পুড়িতে লাগিল। আগুনে জল ঢালিবার কেহ নাই। যে নিবাইতে পারে, সেই ত এ অনল জ্বালাইয়াছে। সুতরাং নিবায় কে?

এক দিন একখানা পত্র পাইয়া বিলির যাতনা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। পত্রখানি জাল—হারাণের লিখিত। কিন্তু সে কথা বিলি অবগত ছিল না। ইদানীং যতগুলি পত্র নির্ম্মল বা বিলি, পরস্পর পরস্পরকে লিখিত, সে সমস্তই অপহৃত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে জাল পত্র প্রেরিত হইত। নির্ম্মল যেমন ভুলিয়াছিলেন, বিলিও তেমনই প্রতারিত হইয়াছিল। কথিত পত্রে এক স্থানে লেখা ছিল:—

"তুমি সুখে আছ; আমি কেন আমার দুঃখের কথা লইয়া তোমার সে সুখ নষ্ট করি? কিন্তু আমি তোমার সুখের কথা শুনিতে চাই না—তোমার পত্রও চাই না। তুমি সুখে থাক; আমি আর তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী নই।"

বিলি পত্রখানি একবার ভিন্ন দ্বিতীয়বার পাঠ করিল না। একবার পাঠ করিয়াই অবসন্ন হইয়া পড়িল। বুক ফাটিয়া কান্না আসিল; স্বামীর প্রতিকৃতি বুকের উপর ধরিয়া বিলি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কেন প্রভু, দাসীর উপর এত রাগ করেছ? দাসী জিদ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—তাহার এ অপরাধ কি মার্জ্জনীয় নহে? এত কাঁদিলাম, তবু সে পাপ ধৌত হ'ল না? কতবার কত অপরাধ করিয়াছি—তুমি ত দাসীর প্রতি রুষ্ট হইতে না। আজ কেন দয়াময়, দাসীকে এত কাঁদাইতেছ? তুমি আদর দিয়া দাসীকে বাড়াইয়াছ—তাই দাসীর এত গর্ব্ব, এত তেজ। তুমি দয়া করিয়া দাসীকে ভালবাস—তাই দাসীর এত সাহস, এত অনুযোগ, নতুবা আমি কে? যতক্ষণ তোমার পদতলে পড়িয়া থাকিতে পাই, ততক্ষণ আমার গর্ব্ব, ততক্ষণ আমার সৌন্দর্য্য। তুমি পদতলে দাসীকে স্থান না দিলে—" আর কথা সরিল না। বিলি কাঁদিয়া শয্যা ভাসাইল।

কিছুকাল পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বিলি স্বামীকে

একখানি পত্র লিখিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে অনেক কথা লিখিল; কিন্তু ক্ষমা চাহিল না। এক স্থানে লিখিল, "তোমায় ছাড়িয়া কি আমি সুখে থাকিতে পারি? বৃক্ষ-আলিঙ্গনে লতার সুখ ও সৌন্দর্য্য; নতুবা লতার ভাগ্যে পদতলে নিষ্পেষণ।"

পাঁচ দিন পরে এই পত্রের উত্তর বিলির হস্তগত হইল। তাহাতে এক স্থানে লিখিত ছিল, "যে লতা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া নিষ্পেষিত করিবার উপক্রম করে, সে লতা পরিত্যাজ্য।"

বিলি এ পত্রের উত্তর দিল না; কেবল নীরবে কাঁদিয়া শয্যা ভিজাইল। অনেক কান্নার পর বিলি স্থির করিল, "ভয় কি, মরিব।" কিন্তু কি করিয়া মরিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। না পারিয়া রেবতীকে ডাকিল। রেবতী আসিলে বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রে, কি ক'রে মানুষ মরে?"

রেবতী একটু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া বলিল, "এক রকমে কি সকল মানুষ মরে বউদিদি! কেউ ওলাউঠায় মরে, কেউ বা জ্বরবিকারে মরে, কেউ বা পেটের জ্বালায় মরে। আমার স্বামী যে মরেছিল, বউদিদি, (হাস্য) সে কথা কি আর বলব (বিকট হাস্য)। তুমি সে কথা শুনলে হেসেই ম'রে যাবে।"

বিলি বলিল, "হেসে আবার মানুষ মরে নাকি?"

রেবতী বলিল, "কথাটা শুনলেই বুঝতে পারবে। (চুপি চুপি) এক দিন আমার রাগ হয়েছিল—আমি ঘর থেকে রাত্রে উঠে গিয়েছিলাম—তাইতে আমার স্বামী গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। শুনলে?"

এই তুচ্ছ কথায় একটা অনেক দিনের কথা বিলির মনে জাগিয়া উঠিল; একদা রাত্রে সোফায় বসিয়া বিলি এক জোড়া কার্পেটের জুতা বুনিতেছিল। জুতা—নির্ম্মলের জন্য; কিন্তু ছয় মাসেও তাহা শেষ হয় নাই। তা' সেটা নির্ম্মলের দোষ—বিলির নয়। বিলি বুনিতে বসিলে নির্ম্মল কাঁটা চুরি করিয়া, পশম ছিঁড়িয়া গোল বাধাইয়া দিতেন। যাহা হউক, কথিত রাত্রে, সুদীর্ঘ কাল বিলম্বের জন্য নির্ম্মল একটু বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। বিদ্রূপে বিলির মান হইয়াছিল,—রাত্রি দুই প্রহরেও বিলি কার্য্যে ক্ষান্ত না হইয়া কার্পেটের উপর ফুল তুলিতেছিল। শুইবার জন্য নির্ম্মল কত ডাকিয়াছিলেন, তবু বিলি আসে নাই। অবশেষে নির্ম্মল উঠিয়া, বিলির হস্তস্থিত চুঁচ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, এবং দুই হস্তে বিলিকে সোফা হইতে শূন্যে উঠাইয়া শয্যার উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে বিলির দারুণ অভিমান জন্মিয়াছিল। অভিমানের প্রথম কারণ—বুনিতে না দেওয়া; দ্বিতীয় কারণ,—শূন্যে উত্থান; তৃতীয় কারণ,—শূন্যে ভ্রমণকালে বিলির পরিহিত বসন একটু বিস্রস্ত হইয়াছিল। ত্রিবিধ কারণে বিলির দুর্জ্জয় মান গর্জ্জিয়া উঠিয়াছিল;—বিলি পালঙ্ক হইতে নামিয়া হর্ম্ম্যতলে ধূলার উপর শুইয়া পড়িয়াছিল। নির্ম্মল তখন বিলিকে স্বীয় অঙ্কোপরি টানিয়া লইয়া কত রকমে, কত আদরে বিলির মান ভাঙ্গিয়াছিলেন; সে সব কথা বিলির মনে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল। সে আদর, সে সোহাগ মনে হওয়াতে বিলির দেহ কাঁপিয়া উঠিল—চোখে জল আসিল। হায়, সে আদর এখন কোথায় গেল!

রেবতী মনে করিয়াছিল, না জানি বউদিদি কত হাসিবে। এক্ষণে বিলিকে কাঁদিতে দেখিয়া রেবতী বিস্মিত হইল। বিস্ময় ক্ষণকালের জন্য। পর-মুহূর্ত্তে রেবতী সুর ফিরাইয়া অঞ্চলাগ্রে চোখের কোণ মুছিতে মুছিতে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল, "তা বউদিদি, কাঁদবারই কথা। জলজ্যান্ত মানুষটা দেখতে দেখতে ম'রে গেল—ব্যারাম নয়, কিছু নয়—"

বিলি নীরবে অতীতের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিতে লাগিল। রেবতী আপন মনে কত কি বকিয়া যাইতে থাকিল। এমন সময় এক জন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাবুর জ্বর বাড়িয়াছে। বিলি তখন চোখের জল মুছিয়া দাসীর অনুসরণ করিল।

সত্যই রমেশের রোগ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আগে চিন্তার তত কারণ ছিল না; কিন্তু এক্ষণে জ্বরের সঙ্গে কতকগুলা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। যখন ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল, তখন জ্যোৎস্না স্বামীর পার্শ্বে জাঁকিয়া বসিলেন। কড়া হুকুমে দেওয়ান, গোমস্তা, দ্বারবান প্রভৃতিকে শশব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, ডাক্তার আনিতে হারাণকে পাঠাইলেন। রুদ্রপুর গ্রামে এক জন কাম্বেল-পাশকরা নবীন ডাক্তার ছিল। হারাণ তাহাকে লইয়া আসিল। জমীদার-ভবনে তখনও কয়েক জন ডাক্তার-বৈদ্য ছিলেন। রোগ বর্দ্ধিত হওয়ায় জ্যোৎস্না তাহাদের কাহাকে কাহাকে জবাব দিলেন এবং এই নবীন চিকিৎসককে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

জ্বর যখন বাড়িত, রমেশের তখন চৈতন্য থাকিত না; জ্বর কমিয়া আসিলে রমেশ এত অবসন্ন হইয়া পড়িতেন যে, কথা কহিতে তাহার কষ্ট বোধ হইত। জ্যোৎস্নার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বিবাদ করিবার শক্তি এক্ষণে রমেশের নাই। সুতরাং তিনি নীরব থাকিতেন।

বিলি দেখিত, শুনিত, কিন্তু নীরব থাকিত। যখন

দাদা নীরব, তখন প্রতিবাদ করিবার বিলির অধিকার কি? কিন্তু নবীন ডাক্তারের চিকিৎসা বিলি পছন্দ করিল না।

প্রথম দিনেই একটু গোল বাধিল। ডাক্তার জোলাপ ব্যবস্থা করিয়াছে। বিলি তাহা খাইতে দিবে না। বলিল, "এ দুর্ব্বল অবস্থায় রোগীকে জোলাপ খাইতে দিতে পারি না।"

জ্যোৎস্না ঔষধপূর্ণ পাত্র হস্তে শয্যার উপর বসিয়া স্বামীকে জোলাপ খাওয়াইতে উদ্যত, বিলি তাহাতে প্রতিবাদিনী। অন্যান্য পুরমহিলারা হর্ম্যতলে বসিয়া এই বিচিত্র কলহ শ্রবণ করিতেছিলেন। রোগী শয্যাশায়িত—জাগ্রত কি নিদ্রিত, কেহই বুঝিতে পারিতেছিল না।

জ্যোৎস্না বলিলেন, "দেখিতেছি, তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রেও পণ্ডিতা। তবে তুমিই কেন চিকিৎসার ভার গ্রহণ কর না?"

বিলি উত্তর করিল, "যে রকম ব্যবস্থা দেখিতেছি, হয় ত বা আমাকেই ভার নিতে হয়।"

জ্যো। কেন, কি দেখিলে?

বি। সব তাড়াইয়া এখন এক মূর্খ ডাক্তারের চিকিৎসা! বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি, সাহেব ডাক্তারকে আনাও।

জ্যো। যখন পরামর্শ চাহিব, তখন দিও। সাহেব আসিলে বিশ খান মোহর দিতে হবে, তা' জান?

বি। দাদার টাকার অভাব কি?

জ্যো। পরের টাকা লোকে অনেক দেখে।

বি। না হয় আমি টাকা দিব।

জ্যো। তুমি কোথায় পাবে? এক পয়সার জিনিস পাঠাইয়াও যাহার কেহ তত্ত্ব লয় না, সে বিশ খান মোহরের কথা মুখে আনিলে হাসি পায়।

কথাটা বিলির প্রাণে লাগিল, সে যে এখন বড় দুঃখী। বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া বিলি ধীরে ধীরে বলিল, "না হয় গহনা বেচিয়া দিব।"

জ্যো। সে কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে।

বি। আমি জোলাপ খাইতে দিব না।

জ্যো। আপত্তি করিবার তোমার অধিকার কি?

বি। আছে কি না, দাদা জানেন।

জ্যোৎস্না একটু টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার উপর তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বই কি, আমি কে?"

বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া বিলি বলিল, "যদি একান্তই জোলাপ খাওয়াইতে হয়, তা হ'লে গ্রামের ডাক্তার ডাকিয়া পরামর্শ লওয়া হউক।"

এ প্রস্তাবে জ্যোৎস্না হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বধুগ্রামে গিয়া তোমার মতামত প্রকাশ করিও।"

এমন সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, রমেশ শয্যার উপর উঠিয়া বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। আজ দুই দিন একবারও যে উঠিয়া বসে নাই, সে সহসা উঠিয়া বসে কেন? বিলি তাড়াতাড়ি রমেশের মাথা ধরিয়া উপধানের উপর রক্ষা করিল। রমেশ বলিলেন, "জোলাপ কই?"

জ্যোৎস্না হাত বাড়াইয়া পাত্র দিল। দিবার সময় বিলির পানে একটু কটাক্ষপাত করিল—গর্ব্বে ওষ্ঠ ফুলাইয়া একটু হাসিল। বিলির মুখ শুকাইয়া গেল।

পাত্র হাতে লইয়া রমেশ তাহা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত ভিনাসের মূর্ত্তির উপর পড়িয়া কাচপাত্র শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। তদ্দৃষ্টে জ্যোৎস্নার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সেখানে আর বসিলেন না,—নয়নাগ্নিতে রমেশকে দগ্ধ করিতে করিতে বিনা বাক্যব্যয়ে জ্বালাময়ী উল্কার ন্যায় দ্রুতপাদবিক্ষেপে কক্ষত্যাগ করিলেন। রমেশ তখন দেওয়ানকে ডাকাইলেন। দেওয়ান আসিলে বিলি কক্ষান্তরে যাইবার উপক্রম করিল। রমেশ বলিলেন, "বিজলি, আমার কাছে বোস।"

বিলি বসিল—একটু ঘোমটা টানিয়া বসিল। রমেশ বলিলেন, "দেওয়ান, এ সংসারে তুমি অনেক দিন আছ; আমার ভগ্নী বালিকা বিজলীকে মনে পড়ে কি?"

দেওয়ান বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, বেশ মনে আছে।"

রমেশ বলিলেন, "বিজলী আজি হইতে তোমার জননী। তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালন করিবে। আমার আদেশের উপর—সকলের আদেশের উপর তাঁহার আদেশ প্রবল থাকিবে।"

দেওয়ান সানন্দে বলিল, "যে আজ্ঞা।"

রমেশ বলিলেন, "বিজু, দেওয়ান বৃদ্ধ—আমাদের পিতৃতুল্য। তাঁহার সহিত কথা কহিতে সঙ্কোচ করিও না।"

বিজলী কিছু বলিল না—সে সেই ভাবেই বসিয়া রহিল।

একটা কথা সহসা রমেশের মনে উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "আমি মৃত্যুশয্যায় শুইয়াছি—বাঁচিবার আশা খুব কম। আমি মরিলে কে আমার বিষয় পাইবে? জ্যোৎস্না? জ্যোৎস্না আমার কে? পরিণীতা ভার্য্যা। কিন্তু জ্যোৎস্না কি আমার

সহধর্ম্মিণী, আমার সুখদুঃখভাগিনী? কিছুকাল রমেশ নীরবে চিন্তা করিলেন। পরে একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "দেওয়ান, সত্বর উইল করিব ইচ্ছা করিয়াছি—সুবিধামত তোমায় উপদেশ দিব।"

অবসন্ন হইয়া রমেশ শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে বিলি ব্যাকুল হইয়া ডাক্তার সাহেবকে আনিতে দেওয়ানকে অনুরোধ করিল। সেই রাত্রেই বিশদেড়ে পান্‌সী সাহেবকে আনিতে বহরমপুর-অভিমুখে ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটা বড় ভুল হইয়াছে;—রমেশের বাড়ীটা কেমন, তাহা কিছু বলা হয় নাই। বহির্ব্বাটীর সহিত আমাদের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। সুতরাং অন্তঃপুরের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেই লেখকের অব্যাহতি; পাঠকেরও নিষ্কৃতি।

অন্তঃপুর চারি মহল; তা' ছাড়া আর একটি মহল আছে; সেটাকে অন্তঃপুরের মধ্যে ধরিব কি না, স্থির করিতে পারিতেছি না। এ মহল—সদর ও অন্দরের মধ্যে অবস্থিত। যাঁহারা নিকটাত্মীয়, দুই চারি দিবসের জন্য আসিতেন,—তাঁহারা এই মহলে স্থান পাইতেন। হারাণ এই মহলে দুইটি ঘর পাইয়াছিল।

এই মহল পার হইয়া ডাহিনে গৃহিণীর খণ্ড। এ অংশ পুরাতন, রমেশের পিতা পূর্ব্বে এই অংশে বাস করিতেন। এক্ষণে রমেশের মা তথায় থাকেন। বিলি যখন পিত্রালয়ে আসিত, তখন এই অংশে মায়ের কাছে থাকিত।

এই খণ্ডের সম্মুখে দ্বিতীয় মহল আত্মীয়-কুটুম্ব-কন্যাগণ এই মহলে বাস করিতেন। এই খণ্ড পুরাকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং কক্ষনিচয় ক্ষুদ্র, অনুচ্চ ও গবাক্ষহীন।

তার পর তৃতীয় মহল। এটা প্রথম মহলের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। বিবাহের পর রমেশ এই অংশ নির্ম্মাণ করেন। নানাদেশ হইতে কারিগর ও মিস্ত্রী আনাইয়া রমেশ এই খণ্ড সৌন্দর্য্যময় করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যময়ী স্ত্রী লইয়া রমেশ এই মহলে পূর্ব্বে বাস করিতেন। এই অংশ দ্বিতল। নিম্নে পরিচারিকারা থাকিত; উপরে সুসজ্জিত শোভাময় বৃহদায়তন কক্ষনিচয়। রমেশ তথায় সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি অনেক আশা করিয়া এই ঘরগুলি সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তথায় আর বাস করেন না, জ্যোৎস্না একাকিনী তথায় অধিষ্ঠান করেন।

এই মহলের পুরোভাগে—সদর খণ্ডের সন্নিকটে—চতুর্থ বা নূতন মহল। এই অংশ—জানি না কেন—এক বৎসর পূর্ব্বে রমেশ নিজের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। অন্যান্য মহলের সহিত ইহার সম্বন্ধ খুব কম। মহলটি দ্বিতল। উপরে ছয়টি বড় ঘর। মধ্যস্থলে সুপ্রশস্ত অত্যুচ্চ হল। এই হল-ঘরের পূর্ব্বদিকে তিনটি ও পশ্চিমদিকে তিনটি ঘর, দক্ষিণে বারাণ্ডা; উত্তরে সিঁড়ি। হল-ঘর ভিন্ন এই কক্ষনিচয়ে প্রবেশ করিবার অন্য পথ নাই।

রমেশ পূর্ব্বদিকের গৃহনিচয়ে অবস্থান করিতেছেন। মধ্যের ঘর তাঁহার শয্যাগৃহ। ঘরটি খুব বড়। এই ঘরের ভিতর দিয়া পার্শ্বস্থিত দুইটি ঘরে যাওয়া যায়। সে ঘর দুইটির উল্লেখে প্রয়োজন নাই।

শয্যাগৃহে সাজ-সজ্জার বড় একটা ঘটা নাই। কার্পেটমণ্ডিত মেঝের উপর সোফা বা কোচের আড়ম্বর নাই; ভিত্তিগাত্রে টাণার বা রেনল্‌ড্‌স্‌-লিখিত ছবি নাই। শুভ্র প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি;—রমেশের পিতৃপুরুষের প্রতিকৃতি ঘরের চারি কোণে পাথরের চারিটি বড় পুতুল: এক দিকে একখানি বড় আয়না, কয়েকটি কেতাবের আলমারী, একটা ঘড়ি, একখানি পালঙ্ক, কয়েকখানি মখমল-মণ্ডিত কাষ্ঠাসন, দুইটি টেবিল, কয়েকটা দেওয়াল গিরি কক্ষের শোভা বৰ্দ্ধন করিতেছে।

হল-ঘরের অপর দিকে এই রকম তিনটি ঘর আছে। আজ দুই দিন হইতে বিলি ও তাহার মা এইখানে বাস করিতেছেন। রমেশের পীড়া বাড়িয়াছে, দূরে থাকিলে এখন চলে না।

সদর হইতে রমেশের মহলে আসিতে হইলে অন্যান্য মহল অতিক্রম করিতে হয় না। অন্যান্য খণ্ড বা চক্ হইতে এই মহলে আসিবার বিভিন্ন পথ আছে।

রমেশের মহলে আমাদের একটু প্রয়োজন আছে, তাই তাহার একটু বিস্তৃত বর্ণনা করিলাম। আমরা এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলিতে আর কোনও আপত্তি নাই।

পরদিন মধ্যাহ্নে ডাক্তার সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া রোগীর বগলে থার্ম্মমেটার লাগাইলেন—ষ্টেথেস্কোপ দ্বারা বুক পিঠ পরীক্ষা করিলেন—ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী ও শ্বাস গণিলেন। অবশেষে গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন, "কেস্‌ সিরিয়স্‌" (রোগ কঠিন)।

জ্যোৎস্না স্বামীর পার্শ্বে শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয় আছে কি, সাহেব ?"

সাহেব একবার শয্যাশায়িত অচৈতন্যপ্রায় রোগীর পানে চাহিয়া দেখিলেন,—একবার জ্যোৎস্নার সদ্যঃস্নাত, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সন্নিভ, অশ্রুসিক্ত উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি পানে চাহিয়া দেখিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় কি, বিবি ? রোগী ভাল হইবে ;—আপনি কাঁদিবেন না। আমার চিকিৎসা এত দিন চলিলে রোগী সুস্থ হইত।"

কক্ষে দেওয়ান ও দুই এক জন ডাক্তার ছিল। বিলি পাশের ঘরে দ্বার-অন্তরালে থাকিয়া সকলই শুনিতেছিল।

জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিনে রোগী সুস্থ হইতে পারেন ?"

সাহেব। চার পাঁচ দিন কাটিয়া না গেলে ঠিক্ বলিতে পারি না।

জ্যো। তবে এই চার পাঁচ দিন রোগীর জীবন সংশয়াপন্ন বলুন ?

সা। ঠিক তা নয়। জ্বর কমিবার সময় একটু সতর্ক থাকা প্রয়োজন—কি জানি, যদি নাড়ী ছাড়ে। প্রতীকারার্থ আমি একটা ঔষধ দিতেছি।

জ্যো। আপনার বাক্স হইতে ঔষধ দিতে হইবে না ; এ গ্রামে ঔষধ পাওয়া যায়।

সা। পাওয়া যাইতে পারে,—কিন্তু এমন টাট্‌কা ঔষধ মিলিবে না।

জ্যো। আপনার অনুগ্রহে কৃতার্থ হইলাম ; কিন্তু গ্রামের ঔষধালয়ে আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ।

সাহেব ঔষধের বাক্স খুলিয়াছিলেন ; এক্ষণে তাহা বন্ধ করিয়া কয়েকটা ব্যবস্থাপত্র লিখিতে বসিলেন। লেখা হইলে দেওয়ানকে কিছু উপদেশ দিয়া হল ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইত্যবসরে বিলি পাশের ঘরে দেওয়ানকে ডাকাইল। দেওয়ান আসিলে বিলি বলিল, "দুইটি কথা বলিতে আপনাকে ডাকাইয়াছি। আপনি পিতৃতুল্য, অপরাধ লইবেন না।"

দেওয়ান বলিল, "আজ্ঞা করুন।"

বিলি। সাহেব যাহাতে প্রত্যহ একবার করিয়া আসেন, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। টাকার মায়া করিবেন না।

দে। যে আজ্ঞা। দ্বিতীয় আদেশ কি ?

বি। গ্রামের ঔষধ লওয়া হইবে না, সেগুলো তত টাট্‌কা নয়।

দে। সাহেবের নিকট হইতে ঔষধ লইব ?

বি। তাহাই আমার অভিপ্রায়। যদি সকল ঔষধ সাহেবের নিকট না থাকে, তাহা হইলে বহরমপুরে লোক পাঠাইয়া দিন।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া দেওয়ান বিদায় লইল ; এবং বিলির ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহেব বিদায় হইলে জ্যোৎস্না নিজের কক্ষে উঠিয়া আসিলেন। তথায় বাতায়ন-সন্নিধানে বসিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিয়া যখন একটা মতলব স্থির হইল, তখন তিনি হারাণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হারাণ আসিয়া একখানা কৌচে বসিল। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনেছ" ?

হারাণ। কি ?

জ্যো। উইল হবে।

হা। কা'র ?

জ্যো। কা'র আবার ? বাবুর।

হা। ব্যায়রাম কি তবে সাংঘাতিক ?

জ্যো। তা ঠিক নয় ; তবে কঠিন বটে।

হা। উইলের উদ্দেশ্য ?

জ্যো। প্রকৃত ওয়ারিশকে ফাঁকি দিবার অভিপ্রায়।

হা। প্রকৃত ওয়ারিশ কে ?

জ্যো। আমি।

হা। সম্পত্তি কাহাকে দেওয়া উদ্দেশ্য ?

জ্যো। সম্ভবত বিজলীকে।

হারাণ চুপ করিয়া রহিল। উইলের উপর নিজের ইষ্টানিষ্ট কতটা নির্ভর করিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া লইল। দেখিল, বিষয় ভগ্নীর থাকিলে তাহার থাকিবে। অতএব স্থির করিল, যেমন করিয়া হউক, বিষয় রাখিতে হইবে। জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি উইল করিবার পূর্ব্বে বাবু মারা যান, তা হ'লে—?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "আমিও তাই ভাবিতেছিলাম। ডাক্তারকে ডাক, একটা পরামর্শ এখনই স্থির করিতে হইবে।"

কিছু পরে ডাক্তার আসিল। জ্যোৎস্নার মহলে পুরুষমানুষকে আসিতে দেখিলে কেহ বিস্মিত হইত

না। নায়েব, গোমস্তা প্রায় সকল সময়ে আসিত, যাইত। ডাক্তারও হারাণের সঙ্গে পূর্ব্বাবধি আসিত, এখনও আসিল।

ডাক্তারের বাড়ী রুদ্রপুরে। তাহার কিছু জমী-জমা আছে; কিন্তু তাহাতে কুলায় না। ক্যাম্বেলে পাশ করিয়া এখন সে স্বগ্রামেই ডাক্তারী করিতেছে। ডাক্তারের নাম নবীন। সে বয়সেও নবীন। ডাক্তারের রূপের অভাব নাই, কিন্তু গুণের অভাব ছিল। বেশ ও কেশের পারিপাট্যের ত্রুটি নাই। পরিধানে মিহি সিমলার ধুতি, গায়ে বেল্‌দার পিরাণ, হাতে ছড়ি, সুরঞ্জিত কেশ, অধরপ্রান্তে মৃদুহাসি প্রভৃতি আয়ুধে সজ্জিত হইয়া ডাক্তার জ্যোৎস্নার কক্ষে উদিত হইল।

জ্যোৎস্না একখানি পালঙ্কের উপর শয়ান ছিলেন; শুভ্র শয্যার উপর শুভ্র লতিকা—যেন জ্যোৎস্নার কোলে বিদ্যুল্লতা। ডাক্তারকে দেখিয়া জ্যোৎস্না শয্যোপরি উঠিয়া বসিলেন এবং মাথার কাপড় উঠাইয়া দিবার একটু ভাণ করিলেন। কাপড় তত উর্দ্ধে উঠিল না—কবরী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াই শান্ত হইল।

ডাক্তার একখানা কাষ্ঠাসনের উপর উপবেশন করিল। চারা বাহিরে পাহারায় রহিল। সকলই হইল, কিন্তু কি বলিয়া কথা তুলিতে হইবে, জ্যোৎস্না ঠিক করিতে পারিলেন না; সুতরাং নীরব রহিলেন। ভাব দেখিয়া ডাক্তার একটু বিস্মিত হইল। লজ্জাহীনা মুখরা জ্যোৎস্নার এমন ভাব কেন? ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবনার ফল কি মিলিবে না, জ্যোৎস্না? দয়া কি হবে না?"

জ্যোৎস্না। যাহা এক বৎসরে উপায় করিতে পার না, তাহা দিবার জন্য রুদ্রপুর হইতে তোমায় আনিয়াছি ইহা কি যথেষ্ট দয়া নয়?

ডা। কৈশোরে যাহার লোভ দেখাইয়াছিলে, তাহাই আমি চাই; তা'র নিকট তোমার ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার অতি তুচ্ছ।

জ্যো। আত্মবিস্মৃত হইও না, ডাক্তার।

ডা। দর্পণে কি নিজের মুখ কখনও দেখ নাই? যদি দেখিতে, তাহা হইলে তুমিও আত্মবিস্মৃত হইতে।

কথাটায় জ্যোৎস্না প্রীত হইলেন। বলিলেন, "বাল্যকালের কথা আজও ভুল নাই?"

ডা। তাহা ভুলিতে পারি, কিন্তু যৌবনের বেলা?

জ্যো। বিবাহের পর নির্জ্জনে তোমার সহিত কখনও দু'টা কথা কহি নাই।

ডা। সে কথা বলিতেছি না; যৌবনে তোমার রূপবিকাশের কথা বলিতেছি।

জ্যো। দেখিতেছি, তুমি রূপোন্মাদ। ছিঃ!

ডা। সে উন্মত্ততা কি দূষণীয়? তাই যদি হয়, তবে ঠাকুর দেবতাকে সুন্দর করিয়া সাজাই কেন?

জ্যো। আত্মতৃপ্তির জন্য।

ডা। আমারও তাই। তোমাকে ভাবিলে আমি তৃপ্তি পাই, দেখিলে উন্মত্ত হই। এত রূপ বুঝি ঠাকুর-দেবতারও নাই।

জ্যো। যে পরস্ত্রীকে ভালবাসে, সে কি ধার্ম্মিক?

ডা। ধর্ম্ম! ধর্ম্ম, শান্তি—তোমার রূপানলে অনেক দিন ভস্মীভূত হইয়াছে।

জ্যো। তবে আর আছে কি?

ডা। আছে কামনা।

জ্যো। সেটা পুড়ে নাই?

ডা। না, সেটা অবিনশ্বর।

জ্যো। কামনাপূর্ণ দগ্ধীভূত হৃদয় আমায় দিতে আসিয়াছ?

ডা। আমার সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে ঢালিতে আসিয়াছি

জ্যো। সর্ব্বস্ব দিবে?

ডা। সর্ব্বস্ব দিব।

জ্যো। ভাল, পরীক্ষা করা যাইবে।

ডা। এখনি কর।

জ্যো। এখনি? এখনি কেমন করিয়া পরীক্ষা করি?

বলিয়া জ্যোৎস্না একটু ভাবিলেন। কর্ণপরে কর্ণদুল দোলাইয়া, মধুর হাসিতে রক্তরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ও সুবিস্তৃত উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি উদ্ভাসিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার স্বামীকে রোগমুক্ত করিয়া তোমার ভালবাসার পরিচয় দাও।"

ডা। তিনি ত আমার চিকিৎসাধীন নন

জ্যো। গোপনে চিকিৎসা চলিতে পারে।

ডা। সে কিরূপ?

জ্যো। এই মনে কর, তুমি আমায় একটা ঔষধ দিলে, আমি তাহা গোপনে অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে শিশির ভিতর মিশাইয়া দিলাম।

ডাক্তার তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। জ্যোৎস্নার এ কথাটা তাহার ভাল লাগিল না। মনে কেমন একটু খট্‌কা জন্মিল। স্বল্পকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "একটা ঔষধে যদি রোগ সারাইতে পারিতাম, তাহা হইলে জগতে আমি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইতাম।"

জ্যো। শুনিয়াছি, এমন একটা ঔষধ আছে যে, তাহা সেবন করাইবামাত্র জ্বরত্যাগ হয়।

ডা। একটা কেন, এমন কয়েকটা ঔষধ আছে।

জ্যো। তবে আর ভাবনা কি?

ডা। ভাবনা সম্পূর্ণ। এ ঔষধ সকল রোগীকে দেওয়া নিরাপদ নয়।

জ্যো। কেন?

ডা। দুর্ব্বল রোগীর নাড়ী ছাড়িতে পারে।

জ্যো। তা' হ'লে?

ডা। তা' হ'লে মৃত্যু।

জ্যো। উত্তেজক ঔষধে বাঁচান যায় না?

ডা। সেটা রোগীর বলের উপর নির্ভর করে।

জ্যো। যে রোগীর কথা হইতেছিল, তাঁহাকে বোধ হয় এ ঔষধ খাওয়ান যাইতে পারে?

ডা। খাওয়ান সম্পূর্ণ বিপজ্জনক।

জ্যো। কেন?

ডা। মৃত্যু সুনিশ্চিত।

উভয়ে নীরব। ক্ষণপরে জ্যোৎস্না বলিলেন, "আমার সন্দেহ হয়, ডাক্তার সাহেব ঐ রকম একটা কি ঔষধ দিয়াছেন। ঔষধের নাম কি?"

ডাক্তার তীব্রদৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার মুখের পানে একবার চাহিয়া দেখিল। জ্যোৎস্নার মনোভাব ডাক্তারের অবিদিত রহিল না। জ্যোৎস্নাও তাহা বুঝিলেন। ডাক্তার উত্তর করিল, "কই, ঔষধের নাম ত মনে হচ্ছে না; কেতাব দেখিলে বলিতে পারি।"

জ্যো। কেতাব সঙ্গে আছে?

ডা। সে কেতাবখানা বুঝি সঙ্গে আনি নাই।

এবার জ্যোৎস্না তীব্রদৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া দেখিলেন। ডাক্তারের দৃষ্টির কোনও ব্যতিক্রম নাই, তবে চক্ষু দু'টা যেন আরও উজ্জ্বল। জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধ তোমার কাছে আছে?"

ডা। আছে।

জ্যো। দিতে পার?

ডা। পারি, কিন্তু—

জ্যো। কিন্তু কি?

ডা। এখন নয়।

জ্যো। কখন্? কোথায়?

ডা। রাত্রি দ্বিপ্রহরে, এইখানে।

লজ্জায়, ঘৃণায় জ্যোৎস্নার মুখ আরক্তিম হইল। ডাক্তারের স্পর্দ্ধা ও প্রগল্‌ভতা দেখিয়া জ্যোৎস্নার যে রাগ হইল না, তা' বলা যায় না; তবে ততটা নহে। কেন না, জোর কম।

যাই হউক, জ্যোৎস্নার রাগিলে চলে না। তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঔষধের কি মূল্য নাই?"

ডা। মূল্যই ত চাহিয়াছি।

জ্যোৎস্না আর কোনও উত্তর করিলেন না—নীরবে বসিয়া রহিলেন। ডাক্তার উঠিয়া একটা গবাক্ষ-সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্যোৎস্না চিন্তার অবসর পাইলেন। তিনি একখানি সংবাদপত্র চোখের সম্মুখে ধরিয়া চিন্তা-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন।

ইত্যবসরে ডাক্তার গবাক্ষ ছাড়িয়া, একখানি চিত্রসন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্রখানি—ক্লিওপেট্রার। সেখানি অতি সুন্দর। দেখিল, অনন্তব্যাপী সমুদ্রতলে কুসুম-লতামণ্ডপমধ্যে ভুবন-মোহিনী সুন্দরী ক্লিওপেট্রা। উপরে নীলাকাশ, নীচে নীল জল; পশ্চিম বারিধিবক্ষে ভানু অস্ত-প্রায়; মধ্যাকাশে বসন্ত। সেই অনন্তের তলে, সেই অনন্তের কূল—বিহঙ্গ-কূজিত, নবপত্র-বিশোভিত কুসুমিত লতামণ্ডপমধ্যে -পুষ্পিত লতা-পুঞ্জের উপর অর্দ্ধশায়িতা স্থান-অলঙ্কৃতা, পূর্ণ-বিকাশিত যৌবনা। সম্মুখে বারিধিবক্ষে স্বর্ণ কোক-নদ, মাথার উপর—গগনোপরি চন্দ্রাতপ ছত্র। হাস্যময়ী প্রকৃতির হাস্যময় উদ্যান-মধ্যে বিবশা, অর্দ্ধনগ্না, ফুলযৌবনা, প্রেম-পাগলিনী ক্লিওপেট্রা। পুষ্পিত লতিকা-নিচয় সেই ফুল্লকুসুমিত দেহকে অবলম্বন করিবার আশায় চারিধার হইতে হেলিয়া প'ড়য়াছে। সেই সৌন্দর্য্যময়ী স্বর্ণপ্রতিমার সংস্পর্শে, সেই পুষ্পমালা যেন ফুলের পাশে পাতার ন্যায় মলিন হইয়া প'ড়য়াছে। বায়ুসঞ্চালিত, কৃষ্ণকুঞ্চিত আলুলায়িত কুন্তলরাশি অনাবৃত বক্ষের উপর বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যেন স্মরহর গঙ্গাধরশিরোভূষণ ভুজঙ্গনিচয় মদনমন্দির ভস্ম করিবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

চিত্র দেখিয়া ডাক্তার মুগ্ধ হইল। আঁখি ফিরাইয়া পার্শ্বস্থিত জীবন্ত প্রতিমা পানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, চিত্র ও প্রতিমায় সাদৃশ্য আছে—উভয়ের মুখেই বাসনা ও ভোগলিপ্সা পরিব্যক্ত হইতেছে।

ধর্ম্মাধর্ম্ম কাহাকে বলে, জ্যোৎস্না তাহা জানে না। জ্যোৎস্না ভাবিত, নিজের বাসনা-পরিতৃপ্তিই জীবধর্ম্ম; তদ্ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই। বাসনা-পরিতৃপ্তির প্রথম সোপান—ঐশ্বর্য্য। সেই ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির পথে কেহ কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলে, জ্যোৎস্না সর্ব্বধর্ম্ম পদদলিত করিয়া সেই কণ্টকোদ্ধার করিতে সঙ্কুচিত হইত না। মানাপমান, পদগৌরব, এ সকল বিষয়ে জ্যোৎস্নার বেশ লক্ষ্য ছিল। কে কোন্ কথায় তাহাকে অপমান করিল, কে কোন্ কার্য্যের দ্বারা তাহাকে অসম্মান দেখাইল, জ্যোৎস্না তাহা

লক্ষ্য রাখিত। জ্যোৎস্না দাসদাসীদের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিত না; ভাবিত, তাহাতে বুঝি বা মানের খর্ব্বতা ঘটিবে। একদা এক জন ভৃত্য ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া গিয়াছিল; তদ্দৃষ্টে রমেশ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে করিয়া লইয়া স্বহস্তে তাহার ক্ষত বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। এই অপরাধে জ্যোৎস্না রমেশকে 'ছোট লোক' বলিয়া গালি দিয়াছিল।

জ্যোৎস্না পতিব্রতা না হইলেও, ঠিক কলঙ্কিনী নয়। ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া যে জ্যোৎস্না সতী ছিল, তাহা নয়; সম-অবস্থাপন্ন প্রণয়াস্পদ মিলিত না বলিয়া সম্ভবতঃ জ্যোৎস্না সতী ছিল। দেওয়ান-নায়েবের, বা নবীন ডাক্তারের মত অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত প্রেম করা জ্যোৎস্নার পক্ষে অগৌরবের কথা। এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যোৎস্না মনের মত প্রণয়াস্পদ পাইয়াছিল। পাইয়া তাহার পায়ে যথোচিত ভালবাসা ঢালিয়াছিল; কিন্তু প্রতিদান মিলে নাই। এ প্রণয়াস্পদ— নির্ম্মলকুমার। নির্ম্মলের রূপে মুগ্ধ হইয়া জ্যোৎস্না কুরূপ স্বামীর শয্যা ত্যাগ করিয়া, ফুটন্ত রূপ-যৌবন লইয়া, নির্ম্মলের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিল। নির্ম্মল প্রথমে ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নাকে বুঝাইয়াছিলেন, পরে জ্বালাময়ী তীব্র ভাষায় জ্যোৎস্নার অযাচিত ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রমেশ কোন রকমে ব্যাপারটা জানিতে পারিয়াছিলেন; নতুবা কেন তিনি সেই সময় হইতে স্বতন্ত্র মহলে অবস্থান করিবেন? যাই হউক, এই ঘটনার পর হইতে নির্ম্মলকুমার শ্বশুরালয়ে যাতায়াত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তদবধি জ্যোৎস্না নির্ম্মলের শত্রু—বিষম শত্রু। সে কথা এখন থাক্।

এক্ষণে জ্যোৎস্নাকে রুষ্টা হইবার সাদৃশ্য দেখিয়া ডাক্তারের সাহস বাড়িয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে আসিয়া পালঙ্কের উপর জ্যোৎস্নার পার্শ্বে বসিল। জ্যোৎস্না তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "তোমার ঔষধে প্রয়োজন নাই—তুমি দূর হও।"

ডাক্তার উঠিল না, সেই ভাবেই বসিয়া রহিল। একটু হাসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "রাগ করিও না, জ্যোৎস্না; তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। কিন্তু তোমার আশা কোনও মতে ছাড়িতে পারিব না।"

জ্যো। এখন আমার মন স্থির নাই—তুমি যাও।

ডা। তবে আবার কখন্ এখানে আসিব?

জ্যো। এখানে? কেন? এখানে আর নয়।

ডা। তবে কোথায়?

জ্যো। কোথাও না। বলিয়াছি ত, ঔষধে আর প্রয়োজন নাই।

ডা। প্রয়োজন না থাকিলেও আমি ঔষধ দিব। তুমি না লও, তোমার স্বামীকে দিয়া আসিব। তাঁহাকে বলিব, তুমি চাহিয়াছিলে।

জ্যোৎস্নার মুখ শুকাইয়া গেল। নিজেই এ বিপদ্ ডাকিয়া আনিয়াছেন, এক্ষণে উপায়ান্তর কি? জ্যোৎস্না বলিলেন, "যাহাকে ভালবাস বলিতেছ, তাহার উপর অত্যাচার কর কেন?"

ডা। ভালবাসি বলিয়াই অর্থ না চাহিয়া তোমায় চাহিয়াছি।

জ্যোৎস্না চিন্তাভিভূতা হইলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা মতলব আঁটিয়া বলিলেন, "ভাল, ঔষধ আনিও।"

ডা। কোথায় আনিব? এইখানে?

জ্যো। না; এখানে নয়;—উদ্যানমধ্যে ঘাটের উপর—বকুলতলায়।

ডা। কখন্ আসিব?

জ্যো। রাত্রি দ্বিপ্রহরে।

ডা। কেমন করিয়া তথায় প্রবেশলাভ করিব?

জ্যো। উদ্যানের দ্বার উন্মুক্ত রাখিব।

ডাক্তার কক্ষ ত্যাগ করিল। তখন হারাণ আসিয়া দেখা দিল, "কি হইল জ্যোৎস্না?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "সে কথা পরে বলিব। আগে আমার কথা মন দিয়া শুন।"

তখন ভ্রাতা ভগ্নীতে অনেক কথা হইল। ফলাফল কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। পরামর্শ স্থির হইলে জ্যোৎস্না বলিলেন, "আগামী কল্য প্রত্যূষে ডাক্তারকে তাহার প্রাপ্য দিয়া বিদায় করিয়া দিতে দেওয়ানকে বলিবে। ডাক্তার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে আসিতে দিবে না।"

উপদেশমত কার্য্য করিতে হারাণ চলিয়া গেল। চিন্তাকুলহৃদয়ে জ্যোৎস্না স্বামীর কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেখানে আসিয়া জ্যোৎস্না দেখিলেন, বধূগ্রাম হইতে দুই জন দাসী দ্রব্যসম্ভার লইয়া আসিয়াছে। নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী,—বেদানা, কিস্‌মিস্, নাসপাতি, আপেল, আঙ্গুর, মিছরী, বাতাসা,—রমেশের কক্ষমধ্যে বিস্তৃত রহিয়াছে। বিজুর শ্বশ্রূ-প্রেরিত দ্রব্যনিচয় রমেশ সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শয্যায় শয়ান, বিজু পদতলে উপবিষ্টা। দাসীরা হর্ম্ম্যতলে বসিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতেছে। জ্যোৎস্না

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে, দাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। জ্যোৎস্না বলিলেন, "কি গো, এত দিন পরে মনে পড়েছে? ভেবেছিলাম, আমাদের বুঝি তোমরা ত্যাগ করেছ।"

এ কটাক্ষপাত বিজলীর উপর—রমেশ তাহা বুঝিলেন; কিন্তু দাসীরা বুঝিল না। তাহাদের মধ্যে যে প্রাচীনা, সে বলিল, "মা, আমরা আপনাদের চরণের দাসী, আমাদের অমন কথা বলবেন না।"

জ্যো। আমাদের এত বড় বিপদ, তোমাদের বাবু একবার আমাদের খোঁজও নিলেন না। স্ত্রী পাঠিয়ে দিয়ে কি তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন?

দা। তিনি একটু গোলে পড়েছেন, কোথাও গেলে চলে না।

জ্যো। গোলটা কি?

দাসী তখন কালী খুড়ার মৃত্যুশয্যায় নিম্মলের দায়িত্ব-গ্রহণের কথা, সোহাগের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা, বিষয় লইয়া কেদার জ্যাঠার সহিত মামলা-মোকদ্দমার কথা, সবিস্তারে বিবৃত করিল।

শুনিয়া জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোহাগের বয়স কত?"

দা। বয়েস তের-চোদ্দ হবে।

জ্যো। দেখিতে কেমন?

দা। যেন চিত্তির করা দুর্গা ঠাকরুণ। এমন সুন্দর মেয়ে দেখিনি, মা।

জ্যোৎস্না একটু হাসিলেন। একবার বিলির পানে একটু কটাক্ষপাত করিলেন। বিলি সেটুকু লক্ষ্য করিল। তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল।

জ্যোৎস্না দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগা, সোহাগ কি আমাদের পাল্টি ঘর? আমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় না? তার প্রথম স্ত্রী মারা গেছে।"

দাসী। তা' মা বলতে পারি না। শুনেছি, বাবু বলেছেন, 'আমার বোন্ থাক্‌লে যেমন ঘরে তা'র বিয়ে দিতুম, তেমনি ঘরে সোহাগের বিয়ে দেব।'

এমন সময়ে রমেশের মা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। আবার নূতন করিয়া কুটুম্ব-বাড়ীর কুশল সংবাদ দিল। তা'র পর বস্ত্রাঞ্চল হইতে দুইখানি পত্র লইয়া গৃহিণীর চরণ-সমীপে রক্ষা করিল। দুইখানিই নিম্মলের মায়ের লিখিত। একখানি গৃহিণীর, অপরখানি বিজলীর শিরোনামাঙ্কিত। দুইখানিতেই এক কথা;—বিজলীকে লইয়া যাইবার জন্য সকাতর প্রার্থনা।

পত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া রমেশ অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিলেন, "নিম্মলের মা আমার মায়ের মত। তাঁহার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। তাঁহার জিনিস তিনি লইয়া যাইবেন, সে জন্য আমার মতামতের প্রয়োজন কি? যখন তাঁহার ইচ্ছা হইবে, তখনই তিনি বিজুকে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু—এ যাত্রা আমার নিস্তার নাই,—সে এখন চলিয়া গেলে, তাহার সহিত এ জন্মে আর দেখা হইবে না।"

গৃহিণী চৈত্রমাসে বিজুকে পাঠাইতে সম্মতা হইলেন না। বিশেষতঃ সংক্রান্তি মাথার উপর। দাদার পীড়া গুরুতর; এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া যাইতে বিজুরও ইচ্ছা নাই। ইঙ্গিতে বিজু তাহা জানাইল। বিজুর মনোভাব অবগত হইয়া রমেশ আনন্দে পরিপ্লুত হইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

অন্যান্য অনেক কথা হইল। তার পর বিজলী গৃহের বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিতে দাসীদের ডাকিল। তাহারা আসিলে, বিলি নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া তাহাদের বসাইল এবং একে একে শ্বশুরালয়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিল, কেবল স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিল না। এটি লজ্জাবশতঃ নয়। দাসীদের সম্মুখে বিলি স্বামীর সহিত কথা কহিত, বসিত, হাসিত, গঙ্গাবক্ষে বেড়াইত। স্বামীর প্রসঙ্গ দাসীদের নিকট উত্থাপন করিতে বিলি কখনও লজ্জিতা হইত না। তথাপি এক্ষণে সকলের কথা তুলিল, কেবল স্বামীর কথা তুলিল না। উদ্যানের মালার কথা তুলিল, লাল ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিল, মাঝি-মাল্লা-বজরার কথা তুলিল, কিন্তু স্বামীর কথা তুলিল না। তুলিল না বটে, কিন্তু সকল কথার চেয়ে স্বামীর কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র। অন্য কথার প্রসঙ্গে স্বামীর কথা উঠিলে, বিলি উৎকর্ণ হইয়া শুনে; স্বামীর কথা ফুরাইলে বিলির ব্যাকুলতাও নিবিয়া যায়। কাহার কথা, কি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহাও বিলির স্মরণ থাকিতেছে না। যাহা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে। যাহা দুইবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহা অশান্তপ্রাণে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে। যাহা শুনিতেছে, তাহাও বুঝিতেছে না। স্বামীর কথা, স্বামীর প্রসঙ্গ ছাড়া বিলি আর কিছুই বুঝিতেছে না। যাহা বুঝিতেছে না, তাহাও বুঝিবার চেষ্টা বা ইচ্ছা করিতেছে না। কেবল অধীর-হৃদয়ে, আকুলি-বিকুলি করিয়া প্রসঙ্গের উপর প্রসঙ্গ তুলিতেছে। স্বামীর কথা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করা হইল

না, দাসীরাও কিছু বলিবার নাই বলিয়া, বলিল না। অবশেষে বিলি—অনন্তকে ক্ষুদ্র-মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর সকলি ভাল—সকলেই বেশ খায় দায় বেড়ায়?"

দাসীরা বুঝিল না যে, স্বামীই বিলির 'সকলি'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গভীরা রজনী। শুক্লাষ্টমীর চাঁদ অস্তমিতপ্রায়। সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যানমধ্যে জ্যোৎস্না একাকিনী। সব স্থির, নিঃশব্দ।—যেন সকলকে ঘুম পাড়াইয়া চাঁদ ঘুমাইতে যাইতেছে।

চারিদিকে ফুলের গাছ; মধ্যস্থলে মণিমুক্তাখচিত নীলাম্বরী শাটীর মত বিস্তৃত বাপীসলিল। রমণীর ন্যায় কটিতে শাটী জড়াইয়া উদ্যান হাসিয়া উঠিয়াছে। সেই সবসনা, পুষ্পালঙ্কারা, ক্ষীণচন্দ্রকরদীপ্ত উদ্যান-মধ্যে জ্যোৎস্না একাকিনী বৃক্ষাশ্রয়ে উপবিষ্টা।

পৃথিবী অবসাদময়ী—ক্লান্ত, সুপ্ত। সুপ্ত হইলেও অস্ফুটস্বরে যেন কাহাকে কি বলিতেছে—যেন ঘুম-ঘোরে স্বপ্নাবেশে কাহাকে চুপি চুপি সম্ভাষণ করিতেছে।

আকাশ নির্ম্মল নক্ষত্রখচিত। কোথাও একটু আধটু শুভ্র মেঘ দৃষ্ট হইতেছিল। নক্ষত্রনিচয়, যেখানে শুভ্রমেঘাবৃত, সেখানে—অবগুণ্ঠনান্তরালে রমণীকটাক্ষের ন্যায় আরও সমুজ্জ্বল

উদ্যানের সৌন্দর্য্যময় ফুলরাশি স্তবকে-স্তবকে, পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়া রহিয়াছে! যে বিকশিত-যৌবনা, সে উন্নমুখে সান্ধ্য গগনের সহিত প্রকাশ্যভাবে প্রেম সম্ভাষণ করিতেছে। যাহার দিন গিয়াছে, সে নিম্নমুখে অবগুণ্ঠন টানিতেছে।

চন্দ্রমা আলস্যময়, -আবেগে ঢলিয়া, ধীরে ধীরে ঘুমাইতে চলিয়াছে। সৌরভরাশি—ভাসিয়া ভাসিয়া, নাচিয়া নাচিয়া, চাঁদের গায়ে মাখিয়া আপন ভাবে অধৈর্য্য হইয়া মজাইতে চলিয়াছে।

ঘাটের উপর বকুলতলায় জ্যোৎস্না একাকিনী উপবিষ্টা। জ্যোৎস্নার পরিধানে নীলাম্বরী শাটী।—শুভ্র বরণ নীলবসনে বেষ্টিত—যেন শুভ্রবরণ চাঁদকে নীলাকাশ জড়াইয়া ধরিয়াছে। জ্যোৎস্না আজ চাঁদ দেখিতেছিলেন না, ফুল দেখিতেছিলেন না। তাঁহার মনে আজ সুখ নাই—শান্তি নাই। তাঁহার মুখ আজ বৈশাখের মেঘের মত গম্ভীর।

যত গোল বিলি বাধাইয়াছে। জ্যোৎস্না বেশ সুখে ছিল;—গৃহের কর্ত্তৃত্ব, জমীদারীর কর্ত্তৃত্ব, রমেশের উপর কর্ত্তৃত্ব, সকলই তাঁহার ছিল। এখন একে একে সকলই হস্তস্খলিত হইয়াছে; অবশেষে অতুল ঐশ্বর্য্যও যাইতে বসিয়াছে।

জ্যোৎস্না প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু সম্পত্তির ভাগ কাহাকেও দিতে পারে না। সে যে সম্পত্তির খাতিরে রমেশকে বিবাহ করিয়াছিল। যে সম্পত্তির লোভে কুৎসিতদর্শন রমেশকে শয্যা-প্রান্তে স্থান দিয়াছিল, সে সম্পত্তি হারাইলে জ্যোৎস্না প্রাণে বাঁচিবে না।

গাছের তলায় বেদীর উপর বসিয়া জ্যোৎস্না ভাবিতেছিলেন, "কেন এমন হইল? আগে ত আমার সকলই ছিল। এখন একে একে সব যাইতে বসিয়াছে। হায়, হায়! অবশেষে কি না এক জন নীচকুলোদ্ভব অপদার্থ কামুকের নিকট দেহ বিক্রয় করিতে বসিয়াছি।"

জ্যোৎস্না একবার উদ্যানের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন মনুষ্যাদের কোথাও দৃষ্ট হইল না। জ্যোৎস্না আবার চিন্তামগ্ন হইলেন; অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, "বাল্যকালের প্রেম? সে কথা এখন কেন? যখন আমার জ্ঞানোদয় হয় নাই, যখন আমার বিবাহ হয় নাই, যখন আমি দরিদ্র ছিলাম, তখন আমি কাহাকে কি বলিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ নাই। তখন আর এখন? এখন আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী রাণী শিরোমণি, আর সে পদলেহন-কারী দরিদ্র ভিক্ষুক। আমি রাজা, সে প্রজা। 'আমি তার ভাগ্য-বিধাতা', সে পদানত অনু-গ্রহাকাঙ্ক্ষী। তবু সে! আমার কাছে প্রেম যাচ্ঞা করে! আগে কারাগারে প্রেরণ করি, তার পর তাহাকে বুঝাইব, আমি কে?"

এমন সময়ে এক মনুষ্যমূর্ত্তি সন্নিকটবর্ত্তী হইল। সে ব্যক্তি ডাক্তার। জ্যোৎস্না তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার জ্যোৎস্নার কাছে আসিয়া বলিল, "জ্যোৎস্না, এখানে আসিতে বড় ভয় পাইয়াছিলাম। পথে যেন কে আমার পাছু লইয়াছিল।"

জ্যোৎস্না। যে পাছু লইয়াছিল, সে কোথায় গেল?

ডাক্তার। তা' জানি না, সম্ভবতঃ বাগানের মধ্যে কোথাও লুকাইয়াছে।

জ্যো। ঔষধ আনিয়াছ?

ডা। আনিয়াছি—এই যে।

ঔষধ লইবার অভিপ্রায়ে জ্যোৎস্না ব্যগ্র হইয়া ডাক্তারের আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। ডাক্তার

তখন বাহু-বিস্তার করিয়া জ্যোৎস্নাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া আবেগভরে আলিঙ্গন করিল। অন্ধকারে জ্যোৎস্নার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু জ্যোৎস্না নড়িল না,—ডাক্তারের বাহুমধ্যে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ রহিল। সেই অবস্থাতেই জ্যোৎস্না পুনরায় ঔষধ চাহিল। এবার ডাক্তার একটা কাগজের মোড়ক জ্যোৎস্নার হাতে দিল।

এমন সময়ে ডাক্তার সভয়ে দেখিল, সন্নিকটস্থ লতাকুঞ্জের অন্তরাল হইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তি নির্গত হইয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন ডাক্তার মনুষ্যমূর্ত্তি পানে দ্বিতীয়বার না চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বিপরীত দিকে পলায়ন করিল।

আগন্তুক—হারাণ। জ্যোৎস্নারই উপদেশ অনুসারে সে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইল; ঔষধ মিলিল, এবং ডাক্তারের ঘৃণিত আলিঙ্গন হইতে জ্যোৎস্নাও রক্ষা পাইল। হারাণ জ্যোৎস্নার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেবতীর দেখা পাইয়াছিলে?"

হারাণ বলিল, "হ্যাঁ; হল-ঘরের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে রেবতী স্বীকৃত হইয়াছে।"

তখন ভ্রাতা ও ভগ্নী বিভিন্ন পথে উদ্যান ত্যাগ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। রমেশ শয্যায় শুইয়া বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। রমেশের মা হর্ম্যতলে নিদ্রিতা। পালঙ্কের পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বিজলী বসিয়া রহিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর সাবধানে বাতি জ্বলিতেছে। তন্নিকটে কয়েকটি ঔষধপূর্ণ শিশি।

আজ রমেশের বড় বিপদ গিয়াছে। রাত্রি এক-প্রহরের সময় রমেশের নাড়ী বড়ই ক্ষীণ হইয়াছিল। স্থানীয় ডাক্তারেরা নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে সে যাত্রা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে রমেশ অপেক্ষাকৃত অনেক সুস্থ; কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হয় নাই।

এই তিন প্রহর রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া একটু পূর্ব্বে রমেশ নিদ্রিত হইয়াছেন। এ নিদ্রাটুকুও সুনিদ্রা নয়—কেবল স্বপ্নপূর্ণ। বিজলি অনেক কষ্টে দাদাকে ঘুম পাড়াইয়া নিজে একটু বিশ্রাম করিতেছিল। বিজলির আবার বিশ্রাম কোথায়? রমেশের শুশ্রূষা করিয়া যেটুকু অবসর পাইত, সেটুকু তাহার নিজের ভাবনা ভাবিতেই কাটিত। আজ বিজলির ভাবিবার অনেক কথা আছে। আজ বিজলি শাশুড়ীর পত্র পাইয়াছে—স্বামীর সংবাদ পাইয়াছে।

শাশুড়ীর পত্রে এক স্থানে লেখা ছিল, "বউমা, তোমাকে ছাড়িয়া নির্ম্মল কি ভাবে দিন কাটাইতেছে, তাহা যদি বুঝিতে তা' হলে তুমি সেখানে এক দিনও আর থাকিতে না।" এ কথা কয়টি বিজলি শতবার পড়িয়াছিল, শতবার মনে মনে আন্দোলন করিয়াছিল। দাদার পাশে বসিয়া বিজলি ভাবিতেছিল, "আমি পাখী হইয়া একবার দেখিয়া আসিতে পাই না, তিনি আমায় ছাড়িয়া কি করিতেছেন?" কতবার কত সাধ মনে জাগিতেছিল, কতবার কত কল্পনা জল-বুদ্বুদের ন্যায় মানস-সলিলে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কখন বিজলি ভাবিতেছিল, "একবার কি ছদ্মবেশে দেখিয়া আসিতে পাই না, তিনি রাত্রে ঘরে আসিয়া কি করেন? ঘরে আসিয়া কি আমায় খুঁজেন? শয্যা শূন্য দেখিলে আমাকে কি তাঁহার মনে পড়ে?" কখন বিজলি ভাবিতেছিল, "বেল মল্লিকা কি তেমনই ফুটিতেছে? ফুল দেখিলে কি আমার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়? এখন কার গলায় তিনি মালা পরাইয়া দেন?" সে কথা ছাড়িয়া বিজলি আবার ভাবে, "আচ্ছা, আমাকে কি তাঁর একবারও মনে হয় না? হয় বই কি। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গকালে আমাকে আদর করিয়া শয্যা ত্যাগ করিতেন; মধ্যাহ্ন-আহারান্তে আমাকে সোহাগ করিয়া কাছারীবাটী যাইতেন; অপরাহ্নে আমাকে আদর করিয়া অশ্বারোহণে বহির্গত হইতেন,—এখন তিনি কি আমায় একবারও খুঁজেন না? একবারও কি দাসীকে মনে করেন না? যদি করিতেন, তাহা হইলে তিনি কেন দাসীদের হাতে একখানা পত্রও দিলেন না? দু'ছত্র লিখিতেও কি তাঁহার সময় হ'ল না? বিদায়-কালে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমায় পত্র লেখা ভিন্ন আমার যে আর কোনও কাজ থাকিবে না, বিজলি।' তিনি কেন এমন নিষ্ঠুর হ'লেন? তিনি যে দেবতা। রাধাবল্লভ, বলিয়া দাও—আমার দেবতা কেন এমন হ'লেন?

বিজলি ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অবশেষে ক্লান্ত হইয়া পালঙ্ক-পার্শ্বস্থিত একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। অরুণ-কিরণ-প্রতিভাত মৃণালতুল্য ক্ষুদ্র ভুজবল্লীর উপর কাদম্বিনী পরিবেষ্টিত-চন্দ্র-সদৃশ

ক্ষুদ্র কপোল রক্ষা করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলি নিদ্রিত হইল।

একটু পরে বিলি ঘুমঘোরে শুনিল, যেন কে 'বিজু!' 'বিজু!' বলিয়া ডাকিতেছে। দুই তিন ডাকে বিলির ঘুম ভাঙ্গিল। চক্ষু খুলিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন। অজ্ঞাত ভয়ে নিপীড়িত হইয়া বিলি নীরব নিশ্চল রহিল। এমন সময়ে বিলি সবিস্ময়ে দেখিল, যেন কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদিত মনুষ্যমূর্তি গৃহমধ্য হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইল। বিলি আরও ভীত হইল। রমেশ ডাকিলেন, "বিজু!"

বিলি। তুমি ডাক্‌ছিলে, দাদা?

রমেশ। হাঁ, দিদি।

বি। কেন, দাদা?

র। দেখেছ কি?

বি। কি, দাদা?

র। যেন কি একটা অন্ধকারের মত ঘর থেকে চ'লে গেল।

বিলিও তাই দেখিয়াছিল; কিন্তু কিছু বলিল না। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, আলো নিবাইল কে?'

রমেশ বলিলেন, "তা' ত আমি জানি না। ভেবেছিলাম, তুমি নিবাইয়াছ "

বিলি মাকে উঠাইল। মা আলো জ্বালিল। তখন রমেশ ও বিলি সবিস্ময়ে দেখিল যে, সামাদানে প্রচুর বাতি রহিয়াছে; অথচ আলো নিবিয়া গিয়াছে। কোনও দিক হইতে বাতাস আসিবারও পথ নাই। তবে আলো নিবিল কেন? বিলি ভাবিল, এ কি ভৌতিক কাণ্ড? স বাত্রে আর কেহ কিছু বলিল না। আপন আপন চিন্তা লইয়া উভয়ে নীরব রহিল।

রজনী প্রভাত হইলে রমেশ প্রহরীকে ডাকাইলেন। প্রহরী পশ্চিমদেশীয়, নাম লালসিংহ। সে বহুকাল হইতে রমেশের গৃহে চাকুরী করিতেছে; স্বদেশীয় ভাষা ও রীতি-নীতি এক্ষণে কতকটা বিস্মৃতপ্রায়। মৎস্যাদি ভক্ষণও চলে—তবে গোপনে! যাহা হউক, এক্ষণে সিংহ মহাশয় পাগড়ী ও দাড়ি ঠিক করিয়া লইয়া প্রভুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষে আর কেহ ছিল না। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কত দিন হইতে এ বাড়ীতে নোক্‌রী করিতেছ?"

লা। তেইশ বরষ হোগা, মহারাজ।

র। কত দিন হইতে অন্দরের পাহারায় আছ?

লা। তিন বরষ,-হুজুর।

র। বাড়ীর সকলকে চেন?

লালসিংহ একবার চারিদিকে চাহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল, "সবকইকো পছন্‌তা, মহারাজ।"

র। বেশ, কাল রাত্রে তুমি আমার মহলে পাহারায় ছিলে?

লা। হুজুর!

র। রাত্রি দুইটার পর কাহাকেও উপরে আসিতে দেখিয়াছিলে?

লালসিংহ এবার একটু মুস্কিলে পড়িল। রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত উপরে আসিতে কাহাকেও দেখে নাই; দুইটার পর একটু নিদ্রা আসিয়াছিল। তখন সে প্রাচীরাশ্রয়ে একটু ঘুমাইয়াছিল। তাহার নিদ্রিতাবস্থায় উপরে কেহ গিয়াছিল কি না, সে বলিতে পারে না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এ কথা বলিতে সিংজির সাহসে কুলাইল না, মনিবের নিকট মিথ্যা বলিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং সে 'হুজুর' 'হুজুর' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া রমেশের মনে সন্দেহ জন্মিল। রমেশ বলিলেন, "লালসিংহ, তুমি আমার পুরাতন বিশ্বাসী নোকর, তাই তোমায় আমার মহলে পাহারায় রাখিয়াছি; তুমি কেন আমার কাছে কথা লুকাইতেছ?"

লালসিংহের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সে তখন কম্পিতকণ্ঠে স্বীয় ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল।

রমেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন; একটু বিশ্রাম লইয়া বলিলেন, "ভবিষ্যতে সতর্ক থাকিও—এখন যাও।"

কিন্তু লালসিংহ নড়িল না। রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?"

লা। হুজুর, কহকো কিসিনে আনে নেহি দেখা, মগর্‌ যানে দেখা।

র। কাহাকে যেতে দেখেছ?

লা। বহু-মাকো।

পুরাতন দাসদাসীরা জ্যোৎস্নাকে বউ-মা বলিয়া ডাকিত। রমেশ তাহা জানিতেন। প্রহরীর উত্তর শুনিয়া রমেশ নীরব হইলেন ক্ষণান্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার কাপড়ের রং কেমন দেখেছিলে?"

লালসিং ভাবিয়া চিন্তিয়াও ঠিক করিতে পারিল না। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত রাত্রে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়াছ?"

প্রহরী বলিল, "তিন পহরকা বাদ।"

আর কিছু তাহার বলিবার নাই দেখিয়া রমেশ তাহাকে বিদায় দিলেন।

বেলা এক প্রহর হইলে ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তিনি রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের শিশি কয়টি পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, সকল ঔষধ উপযুক্তপরিমাণে সেবন করান হয় নাই। তা' ছাড়া আরও দেখিলেন, একটা শিশির ঔষধ বিবর্ণ ও বিকৃত হইয়াছে। সাহেব বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু কারণনির্ণয় করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিশ্চয় কোনও দ্রব্য এই ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করা হইয়াছে।"

রমেশ ঔষধের শিশিটি চাহিয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন। তখন কক্ষাভ্যন্তরে সাহেব ও দেওয়ান ব্যতীত অপর কেহ ছিল না; সুতরাং জ্যোৎস্না কিছুই জানিতে পারিলেন না।

সাহেব চলিয়া গেলে, রমেশের আদেশে উইল প্রস্তুত হইল। বিজলীর গর্ভজাত পুত্র, তদভাবে বিজলী স্বয়ং রমেশের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দিষ্ট হইল। কয়েক জন বিশ্বাসী কর্মচারীর সম্মুখে রমেশ উইলে স্বাক্ষর করিলেন। উইলে কি লেখা ছিল, হারাণ ব্যতীত বড় একটা কেহ জানিল না। হারাণকে ইচ্ছাপূর্ব্বকই জানান হইয়াছিল। অপর সকলে কেবলমাত্র জানিল যে, রমেশের উইল হইয়াছে। যাহা হউক, উইল করিয়া রমেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তার পর আরও কয়েক দিন অতীত হইয়াছে। রমেশ আজ পঞ্চাশ দিনের পর অন্ন পথ্য পাইয়াছেন। পথ্য পাইয়াছেন বটে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল। সাহায্য ব্যতীত উঠিয়া বসিবার তাঁহার সামর্থ্য নাই। আত্মীয় স্বজন যে যেখান হইতে রমেশকে দেখিতে আসিয়াছিল, সে সেখানে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু হারাণ যায় নাই। আগামী কল্য যাইবার দিন স্থির করিয়াছে।

ভ্রাতার কল্যাণে বিলি শরীরপাত করিয়াছে। শরীরপাত সার্থক হইয়াছে ভাবিয়া তাহার মন আজ একটু প্রফুল্ল। কিন্তু তাহার সে প্রফুল্লতাটুকুও সত্বর বিনষ্ট হইল।

রমেশের আহারসমাপনান্তে বিলি নিজের কক্ষে আসিয়া বসিল। বিলি এক্ষণে নির্ম্মলের পত্র পায় না—পত্রেরও অপেক্ষা করে না। তবে ডাকে পত্র আসিবার সময় বিলির বুকের ভিতর কেমন কাঁপিয়া উঠে। আজ বিলি কোনও পত্রের প্রত্যাশা করে নাই; কিন্তু ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার নামে একখানি পত্র আসিয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে পত্র উঠাইল। সবিস্ময়ে দেখিল, শিরোনামা অপরিচিতের হস্তলিখিত, নির্ম্মলের নয়। পত্র উন্মোচন করিতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। পরে হঠাৎ মনে হইল—বুঝি বা নির্ম্মল পীড়িত হইয়াছেন, তাই অপর কেহ বিলিকে এই দুঃসংবাদ দিয়াছে। বিলি ক্ষিপ্রহস্তে পত্র উন্মোচন করিয়া পড়িল। পড়িয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। আবার পড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু আর পারিল না,—চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

পত্রখানি কিঙ্করের লিখিত। সে যাহা লিখিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তাহার যাহা উদ্দেশ্য ছিল, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কেবল অকারণ একটি কানন বল্লরী হলাহলে জর্জ্জরিত হইল।

চৈতন্যোদয়ে বিলির আবার সকল কথা মনে পড়িল। অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া বিলি মনুষ্যচক্ষু-অন্তরালে উদ্যানমধ্যে আশ্রয় লইল। তথায় বেদী ছাড়িয়া ধরার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অনেক কাঁদিল।

বিলির কান্না এক জন লুকাইয়া দেখিল। উদ্যানের উপর জ্যোৎস্নার মহল; সেই মহলের একতম বাতায়নে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না বিলির অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন। পাষাণে কর্দ্দম নাই, জ্যোৎস্নার হৃদয়েও দয়া নাই। বাণাহত হরিণীর যাতনা দেখিয়া ব্যাধ যতটুকু মনঃপীড়া পায়, বিলির হৃদয়বিদারক কান্না দেখিয়া জ্যোৎস্নার মনে ততটুকু দুঃখ হইল। যেমন ব্যাধ জালে আবদ্ধ কুরঙ্গীর কাতরতা অপরকে ডাকিয়া দেখায়, তেমনই বিলির ফাটা প্রাণের রোদনোচ্ছ্বাস দেখাইবার জন্য জ্যোৎস্না পুলকিতহৃদয়ে হারাণকে ডাকিলেন। হারাণ আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে বিমোহিত হইল। দেখিল, মাটীর উপর অশ্রু নিষিক্ত মুখখানি রক্ষা করিয়া বিলি অবিরত কাঁদিতেছে; উচ্ছ্বাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া তাহার মৃণালসদৃশী দেহলতা উঠিতেছে, নামিতেছে—আলুলায়িত কেশরাশি মুখখানি ঢাকিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেন মধুলুব্ধ ভ্রমরকুল-সমাচ্ছাদিতা কমলিনী হিল্লোলতাড়নে বারিসিক্ত হইয়া মৃণালোপরি উঠিতেছে নামিতেছে।

হারাণ গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া উদ্যানে আসিল। লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া একবার গবাক্ষপানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তথায় জ্যোৎস্না বা অপর কেহ নাই। তখন সে সরিয়া আসিয়া বিলির কাছে দাঁড়াইল। বিলি তখন বাহ্যজ্ঞান-বিরহিতা। হারাণ

ডাকিল, "বিজলি!" উত্তর নাই। পুনঃ পুনঃ ডাকিল, তথাপি উত্তর নাই। তখন হারাণ পাপ-পঙ্কিল হস্তে বিলির বাহু স্পর্শ করিল। স্পৃষ্ট হইবামাত্র বিলি চক্ষু উন্মীলিত করিল। প্রথমে ঠিক চিনিতে পারিল না, ঠিক বুঝিতে পারিল না—শূন্য-নয়নে হারাণের পানে চাহিয়া রহিল। হারাণ আবার ডাকিল—আবার বাহু স্পর্শ করিল। এবার বিলি সকলই বুঝিল। বুঝিবামাত্র বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। তার পর হংসীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া, কল্লোলিনীর ন্যায় দেহ ফুলাইয়া, অঙ্গুলি হেলাইয়া ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দূর হও।"

বিলি কি বলিল, হারাণ ঠিক বুঝিল না। হারাণ তখন আত্মহারা হইয়া সেই সর্ব্বশোভাময়ী দেবী-প্রতিম মূর্ত্তি পানে চাহিয়া ছিল। বিলির বস্ত্রাঞ্চল ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছে—আলুলায়িত কুন্তলরাশি গণ্ড, বক্ষ, নিতম্বের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দক্ষিণ চরণ ঈষৎ অগ্রে স্থাপিত—বাম হস্ত শূন্যে উৎক্ষিপ্ত,—লতাকুঞ্জতলে বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইয়া বিলি অঙ্গুলি হেলাইয়া ক্রোধ-কম্পিত-স্বরে বলিতেছে, "দূর হও।" কুসুমিতা লতিকা বিলির মাথার উপর হেলিয়া পড়িয়াছে—শ্যামোজ্জ্বল পত্ররাশি অঙ্গের উপর অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে—রবিকরচ্ছটা ক্রোধরঞ্জিত মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সদ্যঃস্নাত বিস্ফারিত নয়নদ্বয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ করিতেছে—গোপিকাবল্লভালিঙ্গন-বদ্ধা কাঞ্চনবরণা রাধিকার দেহলতা তুল্য সেই শ্যামোজ্জ্বল পত্ররাশিমধ্যে বিলির দেহ আবেগভরে ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে, হেলিতেছে, দুলিতেছে—অলক্তক-রঞ্জিত-স্ফুরদোষ্ঠাধর-মধ্যপরিদৃষ্ট মুক্তাবিনিন্দিত দন্তরাজি,—বাল-তপন-মধ্যারূঢ়া দামিনীলতার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছে। সেই ফুলদল-প্রফুল্ল উদ্যান-মধ্যে, বাপীতটে, লতাবিতানতলে দণ্ডায়মানা সেই ভুবনমোহিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া হারাণের বাসনানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "বিজলি, বিজলি, তুমি কি সুন্দর! এত সৌন্দর্য্য বুঝি স্বর্গেও নাই।"

ঘৃণায় বিলির ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। অঙ্গুলী হেলাইয়া আবার বলিল, "দূর হও, এখনি উদ্যান ত্যাগ কর।"

হারাণ বলিল, "চলিয়া যাইতে আসি নাই—তোমায় একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বিলি। তোমার কোনও কথা শুনিতে চাই না—তুমি দূর হও।

হা। তোমার স্বামীর কথা তোমায় বলিতে আসিয়াছি। আনন্দপুর হইতে এক জন কর্ম্মচারী খাজনা লইয়া আসিয়াছে। তাহার নিকট নির্ম্মল বাবুর চরিত্রের কথা শুনিলাম।

বিজলী কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া গজেন্দ্রগমনে অন্তঃপুরাভিমুখে অগ্রসর হইল। তাহাকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া হারাণ বলিল, "একটা কথা শুন—তার পর তুমি যাইও। রমেশ বাবু তাঁহার সমস্ত বিষয় তোমাকে দান করিয়াছেন; তুমি এক্ষণে নির্ম্মলের মুখাপেক্ষী নও। তবে তুমি কেন পাষণ্ড স্বামীর হাতে লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ কর?"

বিজলীর দেহ ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, "যে পুণ্যময় নাম উচ্চারণে দেবতারাও পবিত্র হন, সে নাম তোমার কণ্ঠে শুনিতে চাই না।"

হারাণ একটু হাসিয়া বলিল, "যিনি তোমার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরী স্ত্রী ছাড়িয়া বিশ্বাসন্যস্তা অনূঢ়া বালিকার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, তিনি পুণ্যময়? আর এই পুণ্যময়কে যে পাষণ্ড বলে, সে পাপিষ্ঠ? শুন বিজলি, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমি আত্মহারা হইয়াছি—তোমাকে পাইবার আশায় আমি—"

বিজলী আর শুনিল না। অপমানে, ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে বিজলী জ্ঞানশূন্যা হইল। বলিল, "তুমি অদ্যই এ গৃহ হইতে কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত হইবে।"

বিজলীর ক্রোধ দেখিয়া হারাণ একটু হাসিল। বলিল, "রমেশ বাবুকে এ কথা বলিলে আগুন জ্বলিবে সত্য; কিন্তু আমরাও দুর্ব্বল নই। বুঝিয়া কার্য্য করিও—তাঁহাকে যাবিও না।"

বিলি চলিয়া গেল। হারাণ দন্তে দন্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "এক দিন বিজলী, তোমার এ দর্প চূর্ণ করিব—এক দিন তুমি আমার হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আজ বধূগ্রামে বড় ধূম। বাসন্তী পূজা শেষ হইয়াছে; আজ প্রতিমা-বিসর্জ্জন। গঙ্গার ঘাটে সারি দিয়া প্রতিমা-নিচয় সংরক্ষিত হইয়াছে সর্ব্বাগ্রে জমীদারবাড়ীর প্রতিমা। কিন্তু জমীদার কোথায়?

নির্ম্মল তখন আপন চিন্তারাশি লইয়া ছাদে বসিয়া আছেন। যে বিজয়া উপলক্ষে তাঁহার আনন্দ উছলিয়া উঠিয়া বধূগ্রামকে মাতাইয়া তুলিত, আজ সে বিজয়ায় নির্ম্মলের আনন্দ নাই। গৃহিণীর মনেও সুখ নাই। উভয়ের মনে একই কথা জাগিতেছিল

উভয়েই ভাবিতেছিলেন,—যে প্রেমময়ী জীবন্ত সোণার প্রতিমা পাষাণহৃদয়া মৃন্ময়ী দশভুজা-মূর্ত্তি প্রদাক্ষিণ করিয়া বরণ করিত, আজ সে প্রতিমা কোথায়?

বিলি আসে নাই। তাহাকে আনিতে বৈশাখের প্রারম্ভে দাস-দাসী আবার প্রেরিত হইয়াছিল; তবু বিলি আসে নাই। তা ছাড়া বিলি একটা কড়া কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিল। বিলি বলিয়াছিল যে, "শাশুড়ীকে প্রণাম জানাইয়া বলিও যে, বধুগ্রামে যাইবার এক্ষণে আমার বাসনা নাই—প্রয়োজনও দেখি না। যখন যাইবার ইচ্ছা হইবে, তখন তাঁহাকে জানাইব। বার বার অনর্থক লোক পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই।" নির্ম্মলকে বলিতে বিলি কিছু বলিয়া দেয় নাই—একটা স্নেহের কথা কাহাকেও জানাইতে বলে নাই। বিলির নির্দ্দয় আঘাতে নির্ম্মলের কিশোর-হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

বিবাহাবধি নির্ম্মল কখনও দশ দিনের উর্দ্ধকাল একাদিক্রমে বিলিকে ছাড়িয়া থাকেন নাই। বিলি যখন পিত্রালয়ে যাইত, নির্ম্মল সময়ে সময়ে সঙ্গে যাইতেন; এবং দুই চার দিন তথায় থাকিয়া বিলিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেন। বিলিকে ছাড়িয়া থাকা নির্ম্মলের সাধ্যাতীত। বিলি তাঁহার সংসার—বিলি তাঁহার সুখ।

বিলি জিদ্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; নির্ম্মল তাহার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। বিলি দুই দিন থাকিয়া ফিরিবে বলিয়া গিয়াছিল, দুই মাস অতীত হইল, বিলি ফিরিল না তবু—নির্ম্মল এ অপরাধও বিস্মৃত হইতে পারেন। কিন্তু বিলির নিষ্ঠুর পত্র, মমতাশূন্য ব্যবহার নির্ম্মলের সহনাতীত।

হৃদয় লুটাইয়া যাহাকে ভালবাসিলাম, ধর্ম্মকর্ম্ম সংসার ভুলিয়া হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া কৈশোর হইতে যাহার পূজা করিলাম, স্ফুটনোন্মুখ যৌবন লইয়া অপরের ছায়াবর্জ্জিত অকলঙ্কিত হৃদয় যাহার চরণে উৎসর্গ করিলাম—সে আজ নির্দ্দয় ব্যবহারে আমার প্রেমোন্মত্ত হৃদয় মথিত করিল, আমার নব-যৌবনোদ্গত সুখসাধ দগ্ধ করিল। সংসার ঘুরিয়া রত্নরাজি সংগ্রহ ও গ্রথিত করিয়া যাহার গলায় পরাইলাম, সে ঘৃণাভরে মালা ছিন্ন করিয়া পদতলে দলিত করিল—আমার এ কোমল হৃদয়ের নূতন সাধ, নূতন আশা প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই হলাহলে তাহা জর্জ্জরিত করিল।

নির্ম্মল আজীবন কখনও প্রাণে ব্যথা পান নাই। শৈশবে মাতৃস্নেহে লালিত, বর্দ্ধিত; কৈশোরে প্রেমময়ী পত্নীর আদরে সঞ্জীবিত। আজ এই প্রথম আঘাত। আঘাত কোমল হইলেও প্রথম আঘাত ক্ষেত্রবিশেষে বড়ই বাজে। তাই নির্ম্মল বিলিকে দুই দিন না দেখিয়া, দুই দিন তাহার পত্র না পাইয়া, দুইটা কঠিন কথা পত্রে পড়িয়া, অভিমানোন্মত্ত-হৃদয়ে সংসারময় হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন।

নির্ম্মলের জীবন এক্ষণে লক্ষ্যহীন। উৎসাহ নাই, আশা নাই; নির্ম্মলের উল্লাস, স্ফূর্ত্তি, সংসারস্পৃহা, সকলই নিবিয়া গিয়াছে; কিন্তু কর্ত্তব্য-জ্ঞান যায় নাই।

নির্ম্মল এক্ষণে কাঁদিয়া শয্যা সিক্ত করেন না, কিন্তু সাধের শয্যাগৃহ-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ফুলমালা আর গলায় পরেন না, পুষ্পোদ্যানে আর বসেন না, সুখের স্মৃতিপূর্ণ বজরায় আর পদার্পণ করেন না, ছাদে বসিয়া অমাবস্যার সন্ধ্যাকাশে আর নক্ষত্র গণনা করেন না। সে নিষ্প্রয়োজনে হাসি, অর্থশূন্য কথা, নয়নের আনন্দ এক্ষণে আর নাই। গভীর গাম্ভীর্য্যময় বিষাদরাশি সে সদাপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে।

নির্ম্মল সকলই ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু ছাদের উপর পবিভ্রমণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যেখানে বসিয়া বিলিকে বিদায় দিয়াছিলেন, নির্ম্মল সেইখানে বসিয়া, যে দিকে গঙ্গা বহিয়া বিলির বজরা গিয়াছিল, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া দিবাযামিনী অতিবাহিত করিতেন। দূরে গঙ্গাবক্ষে, কোন বজরা উত্তর দিক্ হইতে আসিতে দেখিলে, নির্ম্মলের হৃদয় আশার সঞ্চারে কাঁপিয়া উঠিত; আবার বজরা বধূগ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলে নির্ম্মলের হৃদয় বিষাদে মগ্ন হইত। দিবারাত্রের মধ্যে নির্ম্মলের হৃদয় এইরূপে শতবার আশায় উৎফুল্ল হইত, আবার শতবার নিরাশায় নিমজ্জিত হইত।

আজ অপরাহ্নে ছাদে বসিয়া নির্ম্মল সুদূর গঙ্গা-প্রান্ত পানে চাহিয়া আছেন। নিকটে—জাহ্নবী-হৃদয়ে সুসজ্জিত তরণীর উপর সংখ্যাতীত সুশোভিতা দেবী-প্রতিমা। নীল চন্দ্রাতপতলে দশদিকব্যাপিনী, অনন্ত-প্রসারিণী, হিংসাদলনী বাসন্তী-প্রতিমা। নির্ম্মলের দৃষ্টি সে দিকে ছিল না। যেখানে তরঙ্গশিরে এক-খানি প্রকাণ্ড বজরা, বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়ার ন্যায় ধীরে ধীরে গঙ্গা বহিয়া আসিতেছিল, নির্ম্মলের দৃষ্টি সেইখানে। বজরা ক্রমে নিকটস্থ হইল, ক্রমে বধূগ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মল দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সহসা নির্ম্মলের সম্মুখে মনুষ্য-ছায়া পতিত হইল; তিনি ফিরিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সম্মুখে জীবন্ত

সজীব দেবীপ্রতিমা জননী অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে আসিয়া পুত্রের পাশে দাঁড়াইলেন।

উভয়ে নীরব, কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। ক্রমে অন্ধকারে জাহ্নবী-বক্ষ ঢাকিয়া আসিল—তরণী-নিচয়ে অসংখ্য দীপ জ্বলিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা, তুমি কেন একবার বিশালপুরে যাও না।"

নির্ম্মল। সেখানে যাইতে আমার আর ইচ্ছা নাই।

অন্ন। ছি, বাবা, ছেলেমানুষের উপর রাগ কর্‌তে আছে?

নির্ম্ম। মা, বাপের বাড়ী গেলে কি লোকে ছেলেমানুষ হয়?

কথাটা কি, অন্নপূর্ণা বুঝিলেন। নির্ম্মলের নিকট বিজলী প্রেমময়ী যুবতী; পিত্রালয়ে প্রেমশূন্যা বালিকা। তাই নির্ম্মলের এ অনুযোগ।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আমার বউ তেমন মেয়ে নয়। কে কি ওষুধ করেছে; তাই বলি, একবার তুমি নিজে যাও।"

নি। আমি গিয়ে কি করব মা? যদি কেউ ওষুধ ক'রে থাকে, আমি গেলে তার কি প্রতীকার হবে, মা?

অ। বউমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে।

নি। না, মা, আমি তা' পার্‌ব না। যদি তিনি নিজের ইচ্ছায় কখনও এখানে আসেন, তবেই তাঁহাকে গ্রহণ কর্‌ব।

অ। গ্রহণ কর্‌বে! কি বল্‌ছ? কা'কে ত্যাগ করেছ যে, গ্রহণ করবার কথা বল্‌ছ? যে লক্ষ্মীর চেয়েও সুন্দর, সরস্বতী অপেক্ষাও গুণবতী, সাবিত্রীর চেয়ে সতী, শিশুর মত সরল,—তা'কে কি তুমি ত্যাগ করেছ যে, গ্রহণ কর্‌বার কথা বল্‌ছ? যাকে পেয়ে আমার শ্বশুরকুল উজ্জ্বল, আমার গর্ভজাত সন্তান পবিত্র, তা'কে তুমি গ্রহণ কর্‌বে কি না ভাব্‌ছ?

নি। না, মা, আমি সে কথা ভাবি নাই, সে কথা বলি নাই। আমার মনের কথা আমি ঠিক তোমায় বুঝাতে পারি নাই। আমার বলার উদ্দেশ্য যে, অনর্থক অভিমানের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

অ। তুমি সেখানে যাইতে চাহিতেছ না, কেন বল দেখি? সেটা কি তোমার অভিমান নয়?

নির্ম্মল নিরুত্তর। মনে ভাবিয়া দেখিলেন, মায়ের কথা অনেকটা ঠিক।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "কি স্থির করিলে, নির্ম্মল? তুমি না যাও, আমি যাব।"

নির্ম্মল বলিলেন, "রাগ করিও না, মা; তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে আজ রাত্রিশেষে যাত্রা কর।"

নির্ম্মল মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বিশালপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে নির্ম্মল বিশালপুরে উপনীত হইলেন। ঘাটে বজরা রাখিয়া নির্ম্মল তটে উঠিলেন; এবং ধীরপাদবিক্ষেপে জমীদার-ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে রমেশের জনৈক ভৃত্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া নির্ম্মল জানিলেন যে, রমেশ সপরিবারে বজরায় উঠিয়া বায়ুসেবনার্থ গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতেছেন।

নির্ম্মল ফিরিলেন। ঘাটে আসিয়া গঙ্গাবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সন্নিকটে একখানি বজরা দেখিতে পাইলেন। বজরাখানি রমেশের। তদ্দৃষ্টে, জানি না কেন, নির্ম্মল গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী উদ্যানমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

তখন সূর্য্য ডুবিয়াছে; কিন্তু অন্ধকার হয় নাই; দ্বাদশীর চাঁদ আকাশে দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু জ্যোৎস্না তখনও ফুটে নাই।

যে ঘাটে নির্ম্মলের বজরা লাগিয়াছিল, সে ঘাট জমীদার ও তৎপরিজনবর্গ ব্যতীত অপর কাহারও কর্তৃক ব্যবহৃত হইত না। এই ঘাটের অতি সন্নিকটেই জমীদার-ভবন। দুই ধারে রমেশের স্বহস্তরোপিত পুষ্পোদ্যান; মধ্যে প্রশস্ত পথ। এই পথ ঘাট হইতে সোজা গিয়া জমীদার-ভবনের খিড়কী-দ্বারে পড়িয়াছে।

ক্ষণপরে নির্ম্মল রমেশের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। নির্ম্মলের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল,—রমেশের সঙ্গে যে বিজলি আছে।

রমেশ আজও দুর্ব্বল। ডাক্তারের পরামর্শানুসারে সমস্ত দিন গঙ্গাবক্ষে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। সঙ্গে বিজলি ও জ্যোৎস্না থাকিতেন; আজও ছিলেন। যখন তাঁহারা ঘাটে পৌঁছিলেন, তখন নির্ম্মলের বজরা দৃষ্টিপথে পড়িল। বিজলি সেই চিরপরিচিত বজরাখানি দেখিবামাত্র চিনিল। উল্লাসে বিজলির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

আবার পরমুহূর্ত্তে, মেঘসমাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায়, গভীর বিষাদে সেই চন্দ্রমা-বিনিন্দিত মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল।

নির্ম্মল আসিয়াছেন শুনিয়া রমেশ ব্যস্তভাবে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে জ্যোৎস্না ও বিলি। পথের ধারে উদ্যানমধ্যে, সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে, যেখানে বৃক্ষাশ্রয়ে নির্ম্মল বসিয়া আছেন, বিলি তাহার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। নির্ম্মলকে কেহ দেখিল না; কিন্তু নির্ম্মল সকলকে দেখিলেন। সকলের মধ্যে, নির্ম্মল বিলিকেই কেবল দেখিলেন। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া শুদ্ধশ্বাসে নির্ম্মল বিলিকে দেখিতে লাগিলেন।

এই কি আমার সেই বিলি? আমার স্মৃতির আধার, সুখের পারাবার, হৃদয়াকাশের পূর্ণশশধর—এই কি সে? যে আমার কৈশোর-উদ্যানে ফুল ফুটাইয়াছিল, যৌবনগাঙ্গে তরঙ্গ উঠাইয়াছিল, হৃদয়-সরসীতলে তারকা জ্বালাইয়াছিল—এই কি সেই? যাহাকে লইয়া আমার বিলাসে আনন্দ, ভোগে তৃপ্তি, চিন্তায় সুখ—এই কি আমার সেই?

বিলি দাঁড়াইল না—চলিয়া গেল। অচিরে অন্ধকারমধ্যে তাহার দেহ লুকাইল—যেন সুখের স্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গে অস্পষ্ট স্মৃতিটুকু রাখিয়া অনন্তের কোলে মিলাইয়া গেল। বিলির শুভ্র বসন লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মল সেই দিকে অনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে বসন আর দেখা যায় না, তবু নির্ম্মলের দৃষ্টি সেই দিকে; ব্যগ্রতায় অন্ধকার ভেদ করিয়া বাঞ্ছিতের বসনখানিমাত্র দেখিবার জন্য চেষ্টিত।

নির্ম্মল অনেকক্ষণ সেইখানে সেইভাবে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত জনৈক ভৃত্য আসিয়া তাঁহাকে ভবনমধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল।

রমেশ নির্ম্মলকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিলেন; এবং মহাসমাদরে নূতন মহলের একতম কক্ষে নির্ম্মলের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে নির্ম্মলের প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি হইল। বিলি তখনও আসে নাই। কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। দ্বার পানে চাহিয়া, বিলির প্রত্যাশায় নির্ম্মল শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল; তবু বিলি আসিল না। নির্ম্মলের বুকের মধ্যে ঝড় উঠিল, নির্ম্মল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—উঠিয়া গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, আকাশ নিবিড়-মেঘাচ্ছন্ন—চন্দ্র, নক্ষত্র নিবিয়া গিয়াছে। উদ্যান, জাহ্নবী অন্ধকারে লুকাইয়াছে—গভীর অন্ধকারে স্থাবর-জঙ্গম সকলই আচ্ছন্ন হইয়াছে। গবাক্ষ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন। আবার শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষের নিম্নে উদ্যানমধ্যে কি একটা শুভ্র পদার্থ নির্ম্মলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন নির্ম্মল বিস্মিত-নয়নে দেখিলেন যে, ইহা কোনও শুভ্রবসনা রমণীমূর্ত্তি। দেখিতে দেখিতে মনুষ্যমূর্ত্তি সরিয়া অন্ধকারে লুকাইল। নির্ম্মলও শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ক্ষণকাল পরে কক্ষদ্বারে ঈষৎ শব্দ হইল। আশা-প্রফুল্লপ্রাণে নির্ম্মল শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। একটু একটু করিয়া দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; দ্বার-পথে একটি অবগুণ্ঠনাবৃতা রমণী আসিয়া দাড়াইল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণী ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল। নির্ম্মল দেখিলেন, এ বিলি নয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া রমণী বলিল, "ইহার মধ্যে ভুলে গেছ?"

নির্ম্মল বিস্মিতনয়নে দেখিলেন, সম্মুখে জ্যোৎস্না। নির্ম্মলের সাধ, আশা চূর্ণ হইল। কোথায় রৌদ্রে পুড়িয়া গৃহে ফিরিলাম—পিপাসায় পীড়িত হইয়া গৃহিণীর নিকট জল চাহিলাম—জলের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম, এমন সময় গৃহে আগুন লাগিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সকলই পুড়িয়া গেল।. জলের আশা বুকে চাপিয়া শঙ্কিতচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "এখানে কেন, জ্যোৎস্না?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "একবার দেখিতে আসিলাম। ঠাকুরঝি অনেক দিন পরে স্বামীর আদর পেয়ে কি কর্‌ছে। এ কি, ঠাকুরঝি কোথায়?"

নির্ম্মল নিরুত্তর। জ্যোৎস্নার বিম্বাধরে ঈষৎ হাস্য-রেখা মুহূর্ত্তের জন্য স্ফুরিত হইয়া মিলাইয়া গেল।

জ্যোৎস্না বলিলেন, "ঠাকুরঝি আসে নি? ছি, ছি, আজ তুমি এসেছ, আজকেও বাগানে যাওয়া। গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

নির্ম্মল নীরব। কথা বলা দূরে থাক্, তাঁহার ভাবিবার শক্তিও তখন বিলুপ্তপ্রায়। কার কথা ভাবিব? কি ভাবিব? বিলি আমার কুপথগামিনী—তাই ভাবিব? হা ভগবান্, বাক্য, ভাষা দগ্ধ কর—স্মৃতি মুছিয়া দাও—ভাবিবার শক্তি নিবাইয়া দাও।

এই সময়ে কি একটা কথা মনে পড়িল। নির্ম্মল বিদ্যুদ্বৎ উঠিয়া গবাক্ষসন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

জ্যোৎস্নাও নির্ম্মলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ে দেখিলেন, গবাক্ষনিম্নে উদ্যানমধ্যে কি একটা শুভ্র পদার্থ। লক্ষ্য করিতে করিতে পদার্থটি ক্রমে মনুষ্যমূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইল। জ্যোৎস্না তখন মূর্ত্তির পানে অঙ্গুলি হেলাইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বুঝি কোনও স্ত্রীলোক।"

মূর্ত্তি চঞ্চলপদবিক্ষেপে দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইল। জ্যোৎস্না বলিলেন, "এ কি!—ঠাকুরঝি না কি। এস ঠাকুরজামাই, আমরাও বাগানে একবার যাই।"

নির্ম্মল নীরব। কথা কহিবার ক্ষমতা, চিন্তা করিবার শক্তি তখন তাঁহার নাই। নির্ম্মলের প্রকোষ্ঠ, জ্যোৎস্না হস্তমধ্যে গ্রহণ করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

রমেশ আরোগ্যলাভ করিলে বিলি নূতন মহল ছাড়িয়া পুরাতন মহলে মায়ের সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাতন মহলে বিলির জন্য দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে একটিতে শুইত, অপরটিতে দিবসে বসিত। পার্শ্বস্থিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রেবতী শুইত। নির্ম্মলকে লইয়া রমেশ যখন আদর-অভ্যর্থনায় ব্যস্ত, বিলি তখন শয়ন-কক্ষে। রাত্রি আন্দাজ এক প্রহর বিলি শয়ন করে নাই, শুইবার উদ্যোগও করে নাই। রেবতী কাছে বসিয়া পাখা করিতেছিল, আর কত কি বকিতেছিল। সকল কথা বিলি শুনিতেছিল কি না, জানি না; কিন্তু একটি কথা বিলির মন আকর্ষণ করিয়াছিল। কথাটা গোড়া হইতে বলাই ভাল।

এ কথা সে কথার পর রেবতী বলিল, "মনে আছে কি, বউদিদি, এক বছর আগে তুমি একবার এখানে এসেছিলে? সেবার তোমার সঙ্গে বাবু এসেছিলেন। এবার তুমি একা এসেছ।"

বিলির মনেও সেই কথার প্রতিধ্বনি উঠিল। এবার বিলি একা এসে একা হয়েছে; স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া বিলি এবার একা। সত্যই কি বিশ্বাস হারাইয়াছে? ঠিক তা' নয়। যার উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত, অভিমান তাহাকে নড়াইয়া দিয়াছে।

রেবতী বলিল, "কিন্তু সেবার যা দেখেছি বউদিদি, তা' তোমায় কি বলব। এক বছর আগে এই ঘরে, এমনি সময়ে দাদাবাবু তোমার ভাজকে নিয়ে যে কাণ্ডটা করেছিলেন, তা' দেখে শুনে কত লোকে কত কি বলেছিল।"

বিলি চুপ করিয়া রহিল। কথাটা কি, জানিবার ঔৎসুক্য থাকিলেও, স্বামীর গ্লানিকর কথা দাসীকে জিজ্ঞাসা করিতে বিলির রুচি হইল না। কিন্তু রেবতী ছাড়িল না। সে শূন্যমার্গে এক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এক বিচিত্র আখ্যায়িকা আরম্ভ করিল। অতিরঞ্জিত করিয়া, নিজের মনের মত করিয়া সাজাইয়া, নির্ম্মল-জ্যোৎস্নার প্রেমাভিনয়ের কথা রেবতী বলিল। সে ক্ষেত্রে নির্ম্মলের বস্তুতঃ কোনও অপরাধ ছিল না, তবু তাহাকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সমান অপরাধী করিয়া প্রেমাভিভূত নায়কের চিত্রে চিত্রিত করিতে রেবতী ছাড়িল না। কথাটা দাসীরা কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছিল; তাহাও রেবতী বলিল। বিলি স্তব্ধ-হৃদয়ে সকল কথা শুনিল, কিন্তু কিছু বলিল না। বিলিকে নীরব দেখিয়া রেবতী আহার করিতে চলিয়া গেল। বিলি চিন্তামগ্ন হইল।

স্বামী আজ আসিয়াছেন, নূতন মহলে শুইয়াছেন; বিলি তাহা জানে। স্বামীর কাছে যাইতে বিলিকে কেহ বলে নাই, বলিবারও কেহ নাই মা উদাসীন, ভাই নীরব, ভ্রাতৃজায়া অনিচ্ছুক। বলিতে আর কে আছে?

যাহা হউক, বলিবার অপেক্ষা বিলি রাখে না। পিত্রালয়ে কাহারও সঙ্কোচ থাকে না, বিলিরও ছিল না। স্বামি-সন্দর্শনে যাইতে আবার লজ্জা কি? কিন্তু বিলি গেল না।

রাত্রি ক্রমে দেড় প্রহর হইল। বিলি তখনও পালঙ্কের উপর বসিয়া রহিয়াছে। কক্ষে দীপ জ্বলিতেছে। বিলি ভাবিতেছিল, "রেবতী যা বলিল, তা' কি সত্য? না, সত্য হ'তে পারে না। কখনই সত্য নয়। তিনি যে দেবতা, এ যে পশুর কাজ। ছি, ছি, আমি কর্‌ছি কি? তাঁকে পশু ভাব্‌ছি। যাক্—এ কথা আর মনে তুল্‌ব না। তবে এখন আমি করি কি? তাঁর কাছে যাব? না, যাব না—তাঁর কাছে শোব না। যিনি আমায় চান না, কেন তাঁর কাছে যা'চিয়া যাব? যিনি অন্যত্র সুখ খুঁজেন, কেন তাঁকে দুঃখ দিতে জোর ক'রে যাব? আচ্ছা, সত্য কি তিনি অন্যত্র সুখান্বেষণ করেন? আমায় খুঁজেন না? সত্য কি তিনি আমায় ভালবাসেন না? আমি ত জ্ঞানতঃ কোনও অপরাধ করি নাই, তবে আমার দেবতা কেন এমন হলেন? তিনি যে ছুটে ছুটে সকল সময়ে আমায় দেখিতে আসিতেন—তাঁর সাধ, সুখ সকলই যে আমায় নিয়ে

ছিল—আমি ছাড়া যে তাঁর আর কোন চিন্তা, বাসনা ছিল না। রাধাবল্লভ, দীনবন্ধু, আমার সে স্বামী কেন এমন হলেন? আমি কেন আমার মাথা খেযে তাঁকে ছাড়িযা আসিলাম? কেন আমি তাঁর কথা শুনিলাম না? আমার গতি কি হবে, দযাময়?"

বিলি কাঁদিযা ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "একবার তাঁহাকে দেখিতে সাধ হয়—একবার তাঁর পাযে ধরিযা ক্ষমা চাহিতে ইচ্ছা হয়; তিনি দযার সাগর, ক্ষমা চাহিলে দাসীকে ক্ষমা করিবেন। যাই, তাঁর কাছে যাই, সকল ব্যথা তাঁহাকে জানাই। কিন্তু —কিন্তু তিনি ত আমায দেখিতে আসেন নাই, দাদাকে দেখিতে আসিযাছেন।"

বিলি এবার চোখের জল মুছিয়া উঠিযা দাঁড়াইল। চুলের গোছা মুখের উপর হইতে সরাইযা দিযা কাপড়টা গুছাইযা পারল। পরিযা কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিযা বেড়াইতে লাগিল। ক্ষণপরে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিযা শয্যায আসিযা শুইল। শুইযা, আবার কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিল, "তবে কি এ জীবনে তাঁহার সঙ্গে আর দেখা করব না? এইখানে এমনি ভাবেই কি জীবনটা কাট্‌বে? কি নিযে থাকব? আমার যে সাধ, আশা, উল্লাস তাঁহাতেই নিহিত—আমার কাম্য, ভোগ্য, উপাস্য, সকলই যে তিনি—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ঈশ্বর সকলই যে আমার স্বামী। দেবতার দেবতা স্বামীকে ছাড়িযা, এই কর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন জীবন লইযা কি করিব? যাঁর সেবার জন্য এই দেহ, যাঁর তৃপ্তির জন্য আমার রূপ, যাঁর সুখের জন্য আমার জীবন, তাঁর ভোগে যদি এ জীবন না লাগিল, তবে এ নিষ্ঠীবন-তুল্য জীবন ধারণে ফল কি?"

বিলি কাঁদিযা শয্যা ভিজাইল। কাঁদিযা, হৃদয-বেদনা কিছু উপশমিত হইলে, বিলি শয্যায় উঠিযা বসিল; ভাবিল, "একবার তাঁর কাছে যাই—একবার তাঁকে দেখে আসি। যদি তিনি আদর না করেন, তবে চ'লে আসব।"

বিলি শয্যা ত্যাগ করিযা উঠিযা দাঁড়াইল; দীপহস্তে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। কপাট উন্মোচন করিবার অভিপ্রাযে অর্গলে হাত দিল; কিন্তু দ্বার না খুলিযা স্থির হইযা দাঁড়াইয়া রহিল। কি ভাবিল, আবার শয্যায আসিযা বসিল। আবার কত কি ভাবিল, আবার স্বামীকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। অবশেষে ভাবিযা চিন্তিযা স্থির করিল যে, অন্তরাল হইতে একবার স্বামীকে দেখিযা আসিব। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইযা বিলি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিল।

বিলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর এক ব্যক্তি চলিল। এ ব্যক্তি হারাণ। বিলির শযনকক্ষের পাশের ঘরে রেবতী শুইত। রেবতীর ঘরে থাকিযা হারাণ আপন সুযোগ খুঁজিতেছিল। স্বামি-স্ত্রীর সম্মিলনে বিঘ্ন ঘটান সম্ভবতঃ হারাণের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিলি যখন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইল, হারাণও তখন অদৃশ্য থাকিযা বিলির অনুসরণ করিল।

এই উদ্যান অন্তঃপুরসংলগ্ন—গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই উদ্যানের একাংশে নির্ম্মল কিছু পূর্ব্বে বৃক্ষান্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। এই উদ্যান-মধ্যে এক দিন জ্যোৎস্না নবীন ডাক্তারের সহিত নিশাকালে সাক্ষাৎ করিযাছিলেন। এই উদ্যানের এক ভাগে একদা বিজলী, হারাণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইযাছিলেন। এই উদ্যান সুবিস্তৃত, নানাবিধ পুষ্প-লতায পরিপূর্ণ। মধ্যস্থলে দীর্ঘিকা। পাড়ের উপর অগণিত নানাবর্ণের ফুল ফুটিযা রহিযাছে। কিন্তু এক্ষণে অন্ধকার-কোলে পাতা-লতা, ফুল-ফল সকলই লুক্কাযিত। সব নিস্তব্ধ; চারিদিকে বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার; আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন; ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে সব স্থির। যেখানে গাছ-পালা, সেখানে আরও অন্ধকার—যেন অন্ধকারের ভিতর মূর্ত্তিমযী তামসী ফুটিযা রহিযাছে।

বিলি সেই অন্ধকারে সেই জনশূন্য উদ্যানে নির্ভীকচিত্তে একাকিনী প্রবেশ করিল। দ্বিতলোপরি কক্ষে নির্ম্মল বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কক্ষের একতম গবাক্ষ-নিম্নে বিলি আসিযা দাঁড়াইল। অদূরে বৃক্ষান্তরালে হারাণও লুকাইল।

নির্ম্মলের কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—গবাক্ষও উন্মুক্ত ছিল। ক্ষণপরে বিজলী গবাক্ষপথে নির্ম্মলের মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র বিলির দেহমধ্যে তাড়িত ছুটিল; পরক্ষণেই অবসাদে অবসন্ন হইয়া বিলি মাটীতে বসিয়া পড়িল।

তুমি কে? গবাক্ষ-পথ উদ্ভাসিত করিযা নবগ্রহের রূপ ধরিয়া তুমি কে? অনেক দিন পূর্ব্বে তোমায দেখিয়াছিলাম, তখন তোমার চারিধারে আলো ছিল, তোমায স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, এখন তোমায স্পষ্ট দেখিতে পাই না কেন? এখন তোমার সামনে অন্ধকার, পিছনে আলো কেন?

অন্ধকার ছাড়িযা একবার তুমি আলোকে এস; তোমায প্রাণ ভরিয়া দেখি। অনেক দিন তোমায় দেখি নাই, একবার তোমায় দেখি। যে রূপে আগে দেখা দিতে, সেই রূপে একবার—একবারমাত্র দেখা

দেও। আমি যে তোমায় না দেখিলে বাঁচিতে পারি না; তুমি যে মেঘ, আমি যে নিদাঘ-সন্তপ্ত বিশুষ্ক তড়াগ। তুমি যে পূর্ণিমার শশধর, আমি যে তমসাবৃত অরণ্যমধ্যে পথহারা পথিক। কোথায় আমার শান্তি, কোথায় আমার আলো, একবার এস—একবার আমায় দেখা দাও—একবার আমার মরুদগ্ধ প্রাণ শীতল কর।

আমি যে তোমা বই আর কিছু জানি না—তোমার চিন্তা বই আর কিছু শিখি নাই। প্রভাতে উঠিয়া পূর্ব্ব-আকাশে তোমারই ছটা দেখিয়া তোমাকে প্রণাম করি; মধ্যাহ্নে তোমার অন্ধকারশূন্য ছিদ্রহীন জ্যোতির্ম্মণ্ডিত মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া দেখি—নিশাকালে স্নিগ্ধচন্দ্র-করোদ্দীপ্ত পুষ্পময় উদ্যানমধ্যে তোমারই গন্ধে প্রফুল্ল হইয়া, তোমারই রূপ অঙ্গে মাখিয়া, তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া, তোমাতেই মিশাইয়া যাই। তুমি যে আমার কর্ম্ম, তুমি যে আমার জ্ঞান।

ক্ষণকাল আত্মহারা হইয়া বিলি গবাক্ষ-পথমধ্যবর্ত্তী নির্ম্মলের মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, "এত রাত্রি হইয়াছে, তবু এখনও শয়ন করেন নাই কেন? আমার জন্য? আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি কি জাগরণে নিশা অতিবাহিত করিতেছেন?" এই সুখের চিন্তাটুকু হৃদয়ে লইয়া নির্ম্মলের মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিল; চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিলির গণ্ড-বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা ছুটিল; অভিমান, গর্ব্ব, নিরাশা ভাসিয়া গেল।

বিলি আর স্থির থাকিতে পারিল না,—স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইবার আশায় উন্মাদিনীর ন্যায় সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে ছুটিল। কিন্তু উদ্যান অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তরুলতা পায়ে লাগিয়া পড়িয়া গেল। পায়ে বড় ব্যথা লাগিল; কিন্তু বিলি তখন জ্ঞানশূন্যা, ব্যথা অনুভব করিবার শক্তি তাহার ছিল না। উঠিয়া আবার ছুটিল। সত্বর উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। উদ্যানমধ্যে অন্ধকার, প্রাঙ্গণে অন্ধকার, ভবনমধ্যে আরও ঘনীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে বিলি সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সিঁড়িতে আলো ছিল, কিন্তু ক্ষণপূর্ব্বেই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়াছে,—দীপ তখনও অগ্নিমুখ। বিলির কোনও দিকে লক্ষ্য নাই; চোখে আলো অন্ধকার কিছুই ঠেকিতেছে না। জ্যোতির্ম্ময় রূপ হৃদয়ে ধরিয়া, সুখের আশায় আকুল হইয়া বিলি ছুটিয়াছে। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান নিবিয়া গিয়াছে। বিলি উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয়ে, উন্মত্তপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইল; দুই তিন ধাপ উঠিতে না উঠিতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। মাথায় দারুণ আঘাত লাগিল, কপাল ফাটিয়া রুধিরধারা ছুটিল। কিন্তু বিলি তাহা জানিল না, যন্ত্রণাও অনুভব করিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া আবার অগ্রসর হইল। এবার নির্ব্বিঘ্নে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া হলঘরের দ্বারসন্নিধানে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু দ্বার খোলা পাইল না—ভিতর হইতে রুদ্ধ। বিলি অনেক ঠেলিল, কিন্তু দ্বার খুলিল না। অবশেষে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, তবু কেহ দ্বার খুলিয়া দিল না। হতাশ হইয়া বিলি হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল। করযোড়ে, কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "প্রভু, দয়াময়, স্বামিন্, দ্বার খুলে দাও; আমি তোমায় দেখিতে আসিয়াছি, আমায় দেখিতে দাও। আর আমি তোমার উপর অভিমান কর্‌ব না, আমায় ক্ষমা কর। আমার সব অপরাধ ভুলে গিয়ে, আমায় একবার দ্বার খুলে দাও, আমি একবার তোমার কাছে গিয়ে তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখি।"

দ্বার কেহ খুলিল না। নয়নজলে, দেহের রক্তে হর্ম্ম্যতল সিক্ত হইল, তবু কেহ দ্বার খুলিল না। বিলি জানিত না যে, কিছু পূর্ব্বে জ্যোৎস্না সিঁড়ির আলো নিবাইয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

হঠাৎ বিলির স্মরণ হইল যে, উদ্যান হইতে গবাক্ষপথে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলে স্বামী দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন। এই নব আশা মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইবামাত্র বিলি হর্ম্ম্যতল ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি নামিয়া আবার উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিলি উদ্যানে ফিরিয়া কথিত জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিবার পর গবাক্ষপথে স্বামীকে দেখিতে পাইল। কিন্তু এ কি! স্বামীর পাশে এ কে? শিহরিয়া দেখিল, স্বামীর পাশে একটি রমণীমূর্ত্তি। মুহূর্ত্তে বিলি তাহাকে চিনিল। চিনিবামাত্র বিলির আশা, উল্লাস নিবিয়া গেল—বুকের উপর যেন পাষাণ চাপিয়া বসিল। দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া বিলি অবসন্নদেহে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল।

পরমুহূর্ত্তে গবাক্ষপথাগত জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বর বিলির কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই স্বর শুনিবামাত্র বিলি বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং গবাক্ষপানে আর একবার চাহিয়া দেখিল। দেখিল, এক জন অপরের অঙ্গের উপর ঢলিয়া পড়িয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে

বিলিকে দেখাইতেছে। তখন রেবতীর কথা বিলির স্মরণপথে উদিত হইল। বিলি সেখানে আর দাঁড়াইল না—ক্ষিপ্রপদে সে স্থান ত্যাগ করিল; অসহ্য যন্ত্রণায় অধীর হইয়া অন্ধকারমধ্যে ছুটিয়া পলাইল!

আর এক জন বিলির পিছু ছুটিল। এ ব্যক্তি হারাণ। সে বরাবর অদৃশ্য থাকিয়া বিলির অনুসরণ করিতেছিল। কিন্তু বিলি যখন ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হারাণ তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই। উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অবশেষে হতাশহৃদয়ে হারাণ গৃহমধ্যে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময় শুভ্রবসনা উন্মাদিনীর মূর্ত্তি হারাণের নয়নপথে পড়িল। হারাণ নীরবে বিলির পাছু পাছু ছুটিল। দূর হইতে জ্যোৎস্না লক্ষ্য করিল, দ্বিতীয় মনুষ্যমূর্ত্তি বিলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে।

এমন সময় আকাশে ঝড় উঠিল। গগনপ্রান্ত হইতে অগণিত কৃষ্ণকেশী ভীষণদর্শনা পিশাচীর দল মধ্যাকাশাভিমুখে ধাবিত হইল। সেই হুঙ্কারশব্দে প্রকৃতি শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া, চক্ষের রোষাগ্নিতে স্থাবর-জঙ্গম দগ্ধ করিয়া উন্মত্ত রাক্ষসীর দল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া চলিল। জীব, জন্তু, যে কেহ তাহাদের বিশ্ববিনাশন হুঙ্কারধ্বনি শুনিল, সেই সভয়ে আশ্রয়ান্বেষণে ছুটিল। কেবল বিলি আশ্রয়প্রার্থিনী নয়। ক্ষিপ্তা রাক্ষসী অপেক্ষা ক্ষিপ্তচরণে বিজলী ছুটিল। অশ্রুজলে বসন সিক্ত, গাত্র শোণিতার্দ্র, বসন স্খলিত-প্রায়; নিরাশানিপীড়িত, তমসাচ্ছন্ন হৃদয়খানি লইয়া তমসাময়া ঘনঘটাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা, উন্মত্তপাদবিক্ষেপে ক্ষিপ্ত-জাহ্নবী-সলিলে সহনাতীত যাতনা নিবাইবার উদ্দেশে ছুটিল।

এমন সময় পিছন হইতে কে আসিয়া বিলির হাত চাপিয়া ধরিল। বিলি না ফিরিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে দাও; আমায় ধ'রে রেখ না, মরতে দাও।"

যে হাত ধরিয়াছিল, সে হারাণ। হারাণ বলিল, "কেন মরিবে বিজলি? কি দুঃখে, এই নবীন বয়স, এই অতুলনীয় রূপ, ডুবাইয়া দিতে ছুটিয়াছ? যাঁকে দেখিলে জগতের দুঃখ ঘুচে, তাঁ'র আবার দুঃখ কি? যাঁ'র নয়নের পলকে পলকে সংসারের সুখ, জগতের সৌন্দর্য্য, ত্রিদিবের সুধা সৃজিত হয়, তাঁ'র আবার দুঃখ? রমণীর সার, সংসারের সার, সৃষ্টির সার, এস, আমার হৃদয়ে এস; নীল আকাশে চাঁদ যেমন ফুটিয়া থাকে—সরসীবক্ষে নলিনী যেমন বাপীদেহ আলোকিত করে, তেমনই তুমি আমার হৃদয় আলোকিত কর।"

কাহাকে কি বলিতেছ, হারাণ। আর কি বিলির চেতনা আছে? স্বর্গের যে ফুলটি পাপাকুল হৃদয়ে টানিয়া, ছিঁড়িয়া গলায় পরিবার বাসনা করিয়াছ, তোমার পাপদগ্ধ হৃদয়ের ঝঙ্কার শুনিবার পূর্ব্বেই সেই সদাপ্রফুল্লা কাননলতিকা, বজ্রাহতা হইয়া চৈতন্যশূন্য হইয়াছে।

বিলির চেতনাহীন, পতনোন্মুখ দেহ, বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া হারাণ ধীরে ধীরে উদ্যানের কাঁকরের উপর শোয়াইল। জল আনিয়া বিলির চৈতন্য সম্পাদন করিবে কি না, ভাবিতেছিল, এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া একবার বিদ্যুৎ চমকাইল। সেই বিদ্যুদালোকে হারাণ একবার ধরালুণ্ঠিতা দামিনী-লতার পানে চাহিয়া দেখিল,। মরি, মরি, কি সুন্দর! আকাশে জলভরা জলদের মাঝে জলমাখা বিজলীর খেলা, হারাণ অনেক দেখিয়াছে—কল্লোলিনীহৃদয়ে ধারাসিক্ত ঝটিকাচ্ছিন্ন কমলিনীর কান্না অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য হারাণ কখন দেখে নাই; হারাণ মুগ্ধ, বিমোহিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার পশুভাব দূরে গেল; সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "আহা, কি সুন্দর! সংসারে বুঝি এমনতর আর কিছুই নাই।"

জলধারায় সিক্ত হইয়া বিলির সহজেই চৈতন্যোদয় হইল,—বিলি উঠিয়া বসিল। জ্ঞানের সঙ্গে আবার স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, হারাণ হাত ধরিয়া বসাইল। এমন সময় চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া আবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া উঠিল। সেই বিদ্যুদালোকে বিজলী ও হারাণ, দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি নিকটে দেখিল। দুই জনেই তাহাদের চিনিতে পারিল। চিনিবামাত্র হারাণ ছুটিয়া পলাইল। আর বিজলী? বিজলী সেই ভাবেই সেইখানে চেতনাবিহীন প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিল। সে কিছুই বুঝিতেছিল না—তার চোখের সামনে সব ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

আগন্তুকদ্বয়—নির্ম্মল ও জ্যোৎস্না। তাঁহারা বিদ্যুদালোকে হারাণ ও বিজলীকে পাশাপাশি বসিয়া থাকিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। বিদ্যুৎ নিবিয়া গেল, হারাণও পলাইল। অপর তিন জন সেই ঝড়-বৃষ্টিময়া তমসার মধ্যে নীরব। মাথার উপর অজস্র বৃষ্টিধারা, চারি পাশে প্রভঞ্জন-হুঙ্কার, সম্মুখে জাহ্নবীর গর্জ্জন, চারিধারে দিক্-প্রতিধ্বনিত

বজ্রনির্ঘোষ,—আর সেই শব্দময়ী উন্মত্তা প্রকৃতির কোলে উন্মত্ত হৃদয়ে তিন জনে নীরব।

বিলির পাশে হারাণকে দেখিবেন, জ্যোৎস্না এতটা আশা করেন নাই। বলিলেন, "এই যে ঠাকুরঝি। আমরা তোমায় সমস্ত বাগান খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ বৃষ্টির মধ্যে এমন সময়ে এখানে কেন?"

বিলি নিরুত্তর। নির্ম্মল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান্, এ দৃশ্য দেখিবার পূর্ব্বে আমায় অন্ধ করিলে না কেন? বিলি মরিল না কেন? এই কি আমার সেই বিলি?"

জ্যোৎস্না বলিলেন, "ছি, ছি, ঠাকুরঝি, তোমার এই কাজ? আমি যে লোকের কথা বিশ্বাস না ক'রে তোমায় ভাল ব'লে জানতাম।"

জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বরে বিলির চমক ভাঙ্গিল। বিলি উঠিয়া ধীরে ধীরে একবার জ্যোৎস্নার সমীপস্থ হইল, অন্ধকারের মধ্যে একবার জ্যোৎস্নার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। পরমুহূর্ত্তে ভাগীরথীগর্জ্জন, বায়ুর হুঙ্কার ডুবাইয়া ভাঙ্গা গলায় মন্দদগ্ধপ্রাণে চীৎকার করিয়া উঠিল, "সব গেল—ওগো, আমার সব গেল।" চীৎকার করিতে করিতে পাগলিনী গঙ্গার দিকে ছুটিয়া পলাইল।

জাহ্নবীজলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গার উপকূলে আসিয়া বিলি দাঁড়াইল। তার পর ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, একটু একটু করিয়া জলে নামিল। নির্ম্মল একটু পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, বিলি তাহা শুনিয়াছিল মাত্র—অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এক্ষণে সেই কথা কয়টির অর্থ একটু একটু করিয়া মনোমধ্যে ফুটিয়া উঠিল। যখন অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি হইল, তখন বিলি থমকাইয়া দাঁড়াইল—আর নামিল না। আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। কিছুই দেখিতে পাইল না। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; সম্মুখে অন্ধকারময় অজ্ঞাত অনন্ত জলরাশি,—অনন্ত যাবার পথ মুক্ত। পিছনে অন্ধকারের মধ্যে স্মৃতির আলো। বিলি চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন সে অন্ধকারাবৃতা জাহ্নবী, তমসাচ্ছন্ন গগনতল, কিছুই দেখিতে পাইল না; দেখিল, কেবল অনন্ত আকাশ জুড়ে, অনন্ত আকাশ আলো ক'রে—নির্ম্মলের মূর্ত্তি। নির্ম্মল যেন অঙ্গুলি হেলাইয়া ঘৃণার সহিত বলিতেছে, "ছি, ছি, এই কি সেই বিলি।"

বিলি আর সহ্য করিতে পারিল না,—ফিরিল। জল ছাড়িয়া ডাঙ্গায় আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া ভাবিল, "উনি আমাকে বিশ্বাসঘাতিনী ভাবিলেন, এ কলঙ্ক লইয়া আমি মরিতে পারিব না। আমি মরিলে গেলে, কে তাঁহার এ ভ্রম ঘুচাইবে? একবার তাঁহার কাছে যাই, একবার তাঁকে ব'লে আসি, আমি কলঙ্কিনী নই, আমি তোমা বই আর কিছু জানি না। কিন্তু আমি তোমাতে কলঙ্ক দেখিয়া আজ মরিতে চলিলাম।"

বিলি ফিরিয়া আবার উদ্যানমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে খুঁজিল, কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইল না। জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, নির্ম্মলের ঘর অন্ধকার। ধীরে ধীরে ডাকিল, "আমি এসেছি, একবার একটা কথা শুন।" কাহারও কোন সাড়া পাইল না। বিলি সেখান হইতে নিরাশহৃদয়ে ফিরিয়া, নির্ম্মলকে উদ্যানমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ক্ষীণকণ্ঠে উদ্যানমধ্যে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, একবার এস; একবার একটা কথা শুন।" ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন, ঝড়বৃষ্টিময় নিশীথে সেই বৃক্ষলতাসমাকুল উদ্যানমধ্যে বিলি উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা কোথাও পাইল না। অবশেষে নিরাশা-ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া উদ্যানমধ্যে পড়িয়া গেল—যেন শিশির-নিষিক্ত পদ্মটি, ঝটিকাবিচ্ছিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময়ে নির্ম্মল বজরায় উঠিয়া বজরা ছাড়িয়া দিলেন জ্যোৎস্না সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হালদার ঠাকুরাণী এক্ষণে সোহাগদের বাড়ীতে ঘন ঘন যাতায়াত করেন। সোহাগের জন্য তাহার মায়া-মমতা সহসা উথলিয়া উঠিয়াছে। তিনি সর্ব্বস্থানে বলিয়া বেড়াইতেন যে, সোহাগের বিবাহ দিয়া দিতে না পারিলে তাঁহার মনে আর সুখ নাই। আহা, এত বড় মেয়ে, আজও বিবাহ হয়নি; মা দেখে না, পাড়ার লোকেরা দেখে না, মেয়ে যে আজও ঘ'রে আছে, এই ঢের—ইত্যাদি।

দ্রব্যসম্ভার উপহার দিতেও হালদারণীর ত্রুটি ছিল না। তবে সেগুলি অতি সামান্য। কখন দু'টা বেগুন, কখন বা একটা লাউ আনিয়া ঠাকুরাণী সোহাগের মাকে দিতেন। তা' ছাড়া সাংসারিক দুই একটা কাজেও সাহায্য করিতে হালদারণী উদাসীন ছিলেন না।

ঠাকুরাণীর এবম্প্রকার নানাবিধ গুণে মুগ্ধ হইয়া সোহাগের মা বলিতেন, "ঠাকুরাণি, আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে?" ঠাকুরাণী প্রত্যুত্তরস্বরূপ বস্ত্রাঞ্চলে চোখের কোণ মুছিয়া নাকি সুরে বলিতেন, "এ সংসারে আর ক'দিন আছ, বোন্? তোমায় দেখ্‌ব না ত কা'কে দেখ্‌ব বল?"

এইরূপে কয়েক দিন কাটিল। আজ বৈকালে ঠাকুরাণী দু'টা লাউয়ের ডগা ও একটা বেল হাতে করিয়া আসিয়াছে। গৃহিণী পরম আপ্যায়িত হইয়া সযত্নে তাহা ঘরে তুলিলেন। হালদারণী, সোহাগের চুলের রাশি লইয়া কবরীবন্ধনে ব্যাপৃত হইল। সেকালের মেয়ে হ'লেও হালদারণী চুল বাঁধিতে বড় দক্ষ ছিল। খোঁপাটি বেশ বাঁধা হ'ল—দেখ্‌তে ঠিক যেন চিড়িতনের টেক্কা। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে টিপ দিয়া হালদারণী বলিল, "তোর মুখখানি খুব সুন্দর, যেন হরতনের টেক্কা।" সোহাগ শুধু একটু হাসিল।

টিপ পরাইয়া হালদারণী, সোহাগকে বলিল, "আয়, আমাদের পাড়ায় কাপড় কাচ্‌তে যাবি আয়।" সোহাগ উত্তর না দিয়া মায়ের পানে চাহিল।

মা বলিলেন, "তা যাও না কেন, জেঠাইয়ের সঙ্গে যাবে, তা'তে আর দোষ কি?"

সোহাগ একখানা কাচা কাপড় হাতে লইয়া ধীরে ধীরে হালদারণীর পাছু পাছু চলিল। জানালা হইতে কিঙ্কর তাহা দেখিল।

ঠাকুরাণীর বাড়ী সন্নিকটে। তবে সড়ক ছাড়িয়া নির্জ্জন পথ ধরিলে একটু দূর হয়। ভদ্রঘরের মেয়েরা সচরাচর নির্জ্জন পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। হালদার ঠাকুরাণী তাহাই করিল।

বাড়ীতে আসিয়া হালদারণী ঘরের চাবি খুলিল। ঘরখানি ছোট খাট, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দাওয়াতে রান্না হয়। সাম্‌নে বেশ একটু বড় উঠান। তাতে একটা লাউমাচা, একটা লেবুগাছ, তার পাশে দুটা বেল, দুটা পিয়ারা ইত্যাদি কয়েকটা গাছ আছে। ঘরের পাশে গোটা কয়েক লঙ্কা গাছ—তার পাশে মঞ্চের উপর তুলসী গাছ; গাছের মাথায় ঝারা; তাহা হইতে অবিরাম জল পড়িয়া নিদাঘ-সন্তপ্ত তুলসীকে শীতল করিতেছে।

হালদারণী, ঘর-দ্বার, গাছপালা সকলই সোহাগকে দেখাইল। দেখাইয়া দত্তদের পুকুরে গা ধোয়াইতে লইয়া চলিল। পুকুরটি বেশ বড়, শানবাঁধান ঘাট; চারিদিকে আম কাঁটালগাছ। জলও বেশ পরিষ্কার। পাড়ার যুবতীরা জলের লোভেই হউক অথবা যে কারণেই হউক, বৈকালে এই পুকুরে আসিয়া পুকুরের জলে তরঙ্গ উঠাইত। দীর্ঘিকায় কুমুদিনী কহ্লার ছিল না; কিন্তু সুন্দরীরা যখন বুকে ঘড়া দিয়া জলের উপর ভাসিত, তখন মরি রে! ছার কুমুদিনী কহ্লার! পারিজাতও বুঝি সে রূপের কাছে হারি মানে;—তাই বুঝি বা সে মনের দুঃখে ধরা ছাড়িয়া স্বর্গগত হইয়াছে। আবার যখন সন্ধ্যাকালে ভামিনীকুল আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া হাসির ফোয়ারা ছুটাইত, তখন শতচন্দ্র সরসীবক্ষে ফুটিয়াছে বলিয়া স্বর্গসুন্দরীদের ভ্রম হইত, যতক্ষণ না সেই রূপসীদল বাপীতট ছাড়িয়া অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিত, ততক্ষণ তারকাকুল রূপগর্ব্ব খর্ব্ব ভয়ে আকাশের মধ্যে শঙ্কিতান্তঃকরণে লুকাইয়া থাকিত। যখন চন্দ্রাননীরা সরসীমুকুর-প্রতিবিম্বিত রূপবিভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিত, তখন বাপীতটস্থিত বৃক্ষশাখাবলম্বী বিহঙ্গমকুল, শত শশধরের একত্র সম্মিলন দেখিয়া আনন্দে কলরব করিত; কিন্তু যখন ললনাকুল সন্ধ্যাসমাগমে সরসী ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিত, তখন পাখীর দল পুষ্করিণীর আলো, তা'দের চোখের আলো নিবিয়া গিয়াছে ভাবিয়া শোকে নীরব হইত।

আজও বৈকালে নানা রকমের নানা মেয়ে ঘাটে গা ধুইতে আসিয়াছিল। যা'র খোঁপার বাহারটা

কিছু বেশী, সে পিছন ফিরিয়াই কথা কহিতেছে। আবার যার সামনেটা খুব গুলজার, সে সম্মুখ ছাড়া পিছন দেখাইতেছে না। যাহাকে ভগবান্ মারিয়াছেন, সে পরের চুল লইয়া কোন রকমে কবরীর সাধ মিটাইয়াছে। ঘাটে সম্মিলিত হইয়া কেহ বা বয়স্যার কাছে স্বামীর রূপ-গুণের পরিচয় দিতেছে; কেহ বা গহনা দেখাইতেছে, আর ঘরে কি কি গহনা আছে, তাহারও ফর্দ্দ দিতেছে। আবার যে সীমন্তিনী স্বামীর নিকট দু'চারিটা রসিকতা শিখিয়া আসিয়াছে, সে তাহা স্থানে অস্থানে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেছে। কোন মসীবরণা ভামিনী, অঙ্গে সাবান ঘষিতেছে, কোন পক্কবিম্বাধরা, ওষ্ঠপ্রান্ত কাপড় দিয়া মাজিতেছে। কেহ বা খামকা জল ছিটাইয়া সঙ্গিনীদের ব্যতিব্যস্ত করিতেছে।

এমন সময় ঘাটের উপর হালদারণী ও সোহাগ আসিয়া দাঁড়াইল। প্রসিদ্ধা ঠাকুরাণীর সঙ্গে সোহাগকে দেখিয়া যুবতীদলমধ্যে বড় গোল পড়িয়া গেল। কেহ বা অধর টিপিয়া একটু হাসিল, কেহ বা বয়স্যাকে আঁখি ঠারিল, কেহ বা সঙ্গিনীর গা টিপিল। ইঙ্গিতে, ইসারায় অনেক ঠাট্টা, বিদ্রূপ চলিল। হালদারণী বুড়া মাগী—সে সকলই বুঝিল। কিন্তু সোহাগ সরল-প্রাণা, নিষ্কলঙ্কা বালিকা মাত্র; সে কিছুই বুঝিল না। একধারে সঙ্কুচিতভাবে কাপড় কাচিয়া ঘাটের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। অঙ্গ বহিয়া জলধারা ছুটিল। সিক্ত বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তপ্তকাঞ্চন গৌরবরণ ফুটিয়া উঠিল। সকলে দেখিল, সোহাগ সুন্দরী বটে। ঈর্ষ্যায় হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। সোহাগ চলিয়া গেলে রমণীদলে সোহাগের নিন্দা উঠিল কুৎসার মত এমন তৃপ্তিকর, চিত্ত-আকর্ষক আর কি আছে? সকলে প্রাণ ভরিয়া গরল উদ্গিরণ করিতে লাগিল। আমাদের সে সকল জঘন্য কথায় প্রয়োজন নাই।

হালদারণীর উঠানে দাঁড়াইয়া সোহাগ ভিজা কাপড় ছাড়িল। তা'র পর ঠাকুরাণী সোহাগকে কিছু জল খাইতে ঘরের ভিতর ডাকিল। ঘরের ভিতর আসিয়া সোহাগ আহারে বসিল। এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তির ছায়া দ্বারদেশে পড়িল। সোহাগ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, কিঙ্কর! ঠাকুরাণী কিঙ্করকে ঘরের ভিতর টানিয়া লইল; এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল। সোহাগ কিছু বুঝিতে না পারিয়া সঙ্কুচিতভাবে ঘরের এক পাশে সরিয়া গেল। তখন সূর্য্যাস্ত হইয়াছে; কিন্তু অন্ধকার হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশালপুর হইতে নির্ম্মল পূর্ব্ব-রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া দাস-দাসী, নায়েব, গোমস্তা সকলেই ভয় পাইল। মায়ের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, মাকে প্রণাম না করিয়া নির্ম্মল শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন। যে কক্ষে নির্ম্মল বিজিকে লইয়া কত সুখের নিশি অতিবাহিত করিয়াছেন, আজ সেই কক্ষ—সেই বহু স্মৃতিপূর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মলের মন একবার একটু চঞ্চল হইল, তার পর সব স্থির যেমন সরসীবক্ষে লোষ্ট্রনিক্ষিপ্ত হইলে সরসীদেহ একবার কাঁপিয়া উঠে, তার পর সব স্থির, প্রশান্ত, তেমনই নির্ম্মলের হৃদয় একবার স্পন্দিত হইয়া সব স্থির হইল মা আসিয়া ডাকিল; ছেলে সাড়া দিল না, দ্বারও খুলিল না। মা চলিয়া গেল; ভাবিল, ছেলে ঘুমাইয়াছে। কিন্তু মায়ের প্রাণ সুস্থির হইল না; কেন না, ছেলে আসিয়া অবধি দেখা করে নাই। মা আবার দুই চারি দণ্ড পরে ছেলের তত্ত্ব লইতে আসিল। দেখিল, দ্বার উন্মুক্ত, ঘরে নির্ম্মল নাই। এ-ঘর সে-ঘর খুঁজিয়া কোথাও নির্ম্মলের সাক্ষাৎ পাইল না, তখন অন্নপূর্ণা ব্যাকুলান্তঃকরণে, ক্ষিপ্রপদে ছাদে উঠিলেন।

ছাদে আসিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, কাপড়, জামা, পুস্তক, পত্র, পুতুল, পশম প্রভৃতি নানাবিধ বিজির ব্যবহৃত দ্রব্য নির্ম্মলের সম্মুখে স্তূপীকৃত রহিয়াছে। নির্ম্মল সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিতে উদ্যত; এমন সময় অন্নপূর্ণা পিছন হইতে ডাকিলেন, "নির্ম্মল!" নির্ম্মল নিরুত্তর। অন্নপূর্ণা আবার ডাকিলেন, "নির্ম্মল!" এবার নির্ম্মল সাড়া দিলেন; কিন্তু উঠিলেন না। মায়ের পানে ফিরিয়া না চাহিয়া তিনি সেই পত্ররাশিতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। সেই স্তূপমধ্যস্থিত প্রত্যেক পত্র নির্ম্মল কতবার বক্ষোপরি ধারণ করিয়াছেন—কতবার আঁখিজলে সিক্ত করিয়াছেন। আজ সেই অতীতের স্মৃতিটুকু ডুবাইবার আশায় নির্ম্মল প্রাণতুল্য প্রিয় পত্রগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিলেন পত্ররাশি জ্বলিয়া উঠিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "নির্ম্মল, এ কি করিতেছ?"

নির্ম্মল উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন মা ছেলেকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে, বাবা?"

নির্ম্মল মুখ ফিরাইয়া লইলেন—কোন উত্তর

করিলেন না। মার প্রাণ তখন অমঙ্গল-আশঙ্কায় কাঁদিয়া উঠিল। সকাতরে নিম্মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন. "আমার কাছে ত কোন কথা কখন লুকাতে না, বাবা; তবে আজ এমন করিতেছ কেন? বউমা কেমন আছেন? তাঁকে আন নাই কেন, বাবা?"

নিম্মল এবার উত্তর করিলেন। তাঁহার স্বর অবিকম্পিত। বলিলেন, "সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আজ হইতে ভাবিও, তোমার পুত্রবধূ মরিয়া গিয়াছে।"

অন্ন। ষাট, ষাট, সে কথা কি বল্‌তে আছে? আমার বৌমা ভাল আছেন ত?

নি। ভাল আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিতেছ? যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা না দেখিয়া যদি তাহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিতাম, তাহা হইলে অধিকতর সুখী হইতাম।

অন্ন। সে কি! এ কি বল্‌ছ? আমি তোমার কোন কথা বুঝিতে পারিতেছি না।

নি। মা, সেই পাপিষ্ঠা কুলকলঙ্কিনীর কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না।

অন্নপূর্ণা নিম্মলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কা'র কথা বলছ নির্ম্মলকুমার? আমি বউ-মার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

নি। আমিও সেই মহাপাপিষ্ঠার কথা বলিতেছি।

অন্ন। স্থির হও; আত্মবিস্মৃত হইও না, নিম্মলকুমার।

নি। আত্মবিস্মৃতি এখন আর নাই, এত দিনে ঘুচিয়াছে।

অন্ন। তুমি ক্ষেপিয়াছ, নইলে এতটা মতিভ্রম মানুষে সম্ভব নয়।

নি। ক্ষেপিতে পারিলেও সুখের হ'ত, মা; তা হ'লেও যে সে কুলটাকে সময়ে সময়ে ভুলিতে পারিতাম।

অন্ন। কুলটা? কুলটা বল্‌ছ? আমার বৌমাকে কুলটা বল্‌ছ? তুমি অধঃপাতে গিয়াছ। আপন ধর্ম্মপত্নীকে যে কলঙ্কিনী মনে করে, সে নারকী।

নি। আমি নিজের চোখে যা' দেখেছি, তা' আমায় অবিশ্বাস কর্‌তে বল্‌ছ?

অন্ন। তোমার চোখ? শুধু তোমার চোখ কেন,—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলে যদি বলে—আকাশের তেত্রিশ কোটি দেবতা যদি একবাক্যে বলে,—আমার বউমা অসতী, পাপস্পৃষ্টা, তা হ'লেও আমি বলিব যে, ব্রহ্মাণ্ডের মানুষ ও দেবতা মিথ্যাবাদী—তোমারই ন্যায় ভ্রান্ত ও দুর্ব্বলচিত্ত।

নির্ম্মল বিস্মিত হইলেন; মুগ্ধচিত্তে মায়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, চারিদিকে অন্ধকার, মধ্যস্থলে—পত্র, পুস্তক, বস্ত্র প্রভৃতি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই আলোকে নির্ম্মল দেখিলেন, মায়ের মুখের উপর এক অপূর্ব্ব ছটা পড়িয়াছে। সে ছটা, সে জ্যোতি এ পৃথিবীর নয়। তাঁহার মনে হইল, যেন স্বর্গ হইতে কোন দেবীমূর্ত্তি মরুভূমিতে জল ছিটাইতে, শ্মশানে মৃতসঞ্জীবনী ঢালিতে অন্ধকারমধ্যে আলোকময়ী-রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ভক্তিতে নিম্মলের প্রাণ আপ্লুত হইল—তিনি মায়ের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "তোমার পায়ে পড়ি মা, ব'লে দাও, চোখে যা' দেখেছি, তা' কেমন ক'রে ভুলে যাব?"

অন্ন। ভুলতে তোমায় বলি নাই—কি দেখেছ, তা'ও শুনিতে চাই না; সে জঘন্য কথা তোমারই হৃদয়ে লুকান থাক্। কিছু দিন বাদে তুমি নিজেই তোমার ভ্রম বুঝিতে পারিবে। কিন্তু এখন এ কি করিতেছ?

নি। চিহ্ন মুছিয়া ফেলিতেছি।

অন্ন। স্মৃতি মুছিতে পারিবে কি?

নিম্মল নিরুত্তর। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "তবে এ বাতুলতা কেন? পাগলামী ছাড়িয়া আমার একটা কথার উত্তর দেও,—বউ-মার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কি?"

নিম্মল। না।

অন্ন। তবে তুমি আবার বিশালপুরে যাও।—বৌমার সহিত সাক্ষাৎ ক'রে সকল কথা তাকে খুলিয়া বল; তিনি তোমার অলীক সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন।

নি। আবার সেখানে? এ জীবনে আর নয়, মা।

মাতাপুত্রে তা'র পর অনেক কথা হইল। অনেক কথার পর নিম্মলকে কতকটা শান্ত করিয়া, গুরু-ভার হৃদয়ে লইয়া অন্নপূর্ণা চলিয়া গেলেন।

বস্ত্রাদি পুড়িয়া শেষ হইল। নিম্মল সেই ভস্ম-রাশির মধ্যে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, নিম্মলকুমার অশ্বা-রোহণে সোহাগদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হই লেন। সোহাগ তখন হালদারণীর সঙ্গে দত্তদের

পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। নির্ম্মল বলিলেন, "সোহাগকে এখনই চাই—তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছে—আজ সন্ধ্যার পর পাত্র স্বয়ং ক'নে দেখিতে আসিবে।"

সোহাগকে ডাকিবার জন্য হেমের তলব হইল; কিন্তু কোথাও হেমের দেখা পাওয়া গেল না। তখন প্রহরিস্বরূপ বাড়ীতে যাহাকে রাখা হইয়াছিল, তাহাকে পাঠান হইল। তাহার নাম শিউরতন মিছির। লোকটা পশ্চিমদেশীয়; গয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি গয়াধাম পবিত্র করিয়াছেন। তবে বহুকাল হইতে বাঙ্গালা মুলুকে বাস করায় বাঙ্গালীর মত চালচলন কতকটা হইয়া গিয়াছে। কথাবার্ত্তাতেও বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি বেশ দেখা যাইত।

শিউরতন মিছির মহাশয়ের ভাষাজ্ঞান যাহাই হউক, তিনি এক জন পরাক্রমশালী বীরপুরুষ,—এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য। তাঁহার ওজন এক মণ তের সের—দীর্ঘ ও প্রস্থে তিনি গির্জ্জার চূড়ার মত—রূপে কন্দর্প—বয়সে মান্ধাতা।

নির্ম্মলের পিতার আমল হইতেই মিছির মহাশয় নকরি করিতেছেন। প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী বলিয়া মিছিরের একটু খ্যাতি ছিল; সেই দর্পেই হউক অথবা স্বভাবগত দোষের বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, মিছির মহাশয় একটু ক্রোধী ছিলেন; এবং কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে বলিলে তিনি হাতকড়া লাগাইয়া আনিতেন। তবে ক্ষমতায় না কুলাইলে তিনি বীর-বেশে রণাঙ্গন হইতে অপসৃত হইতেন

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মিছির মহাশয় চারিহস্ত-পরিমিত এক সুদীর্ঘ লগুড় ঘাড়ে করিয়া সোহাগকে ডাকিতে চলিলেন। মাথায় পেকাণ্ডকায় পাগড়ী, পায়ে নাগরা জুতা, পরিধানে থান। বস্ত্রখানি এমনভাবে কোমরের চারিধারে বেষ্টিত হইয়াছে যে, কাপড়ে আগুন লাগিলে মিছিরের পরিত্রাণের উপায় নাই—বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে।

মিছির মহাশয়ের আহারের লোভটা কিছু বেশী ছিল। পরের ঘাড়ের উপর দিয়া আহারের ব্যাপার চালাইবার জন্য তিনি অহর্নিশি চেষ্টিত থাকিতেন। আজ একটু সুযোগও হইল।

হালদারণীর বাড়ীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে মিছির মহাশয়ের সহিত এক গোপনন্দনের পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। গোপনন্দনের ঘরখানি রাস্তার উপর। সে তখন আপন দাওয়ায় বসিয়া তামাকু সাজিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময় মিছির মহাশয় পথের উপর দর্শন দিলেন। তখন যোষজা করযোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল, "মিছির ঠাকুর, অনেক দিন তোমায় দেখি নি; আমার গাছে আঁব পেকেছে, দু'টো খাবে কি?"

মিছির ঠাকুর গম্ভীর-বদনে বলিলেন, "লে আও।"

গোপনন্দন তখন মিছির ঠাকুরকে গৃহমধ্যে আনিয়া বসাইল। দুইটা আম্র উদরস্থ করিয়া মিছির ঠাকুর বলিলেন, "চূড়া হ্যায়?"

"বহুত হ্যায়" বলিয়া গোপনন্দন সেরটাক চূড়া লইয়া আসিল। চিঁড়ে আসিল দেখিয়া মিছির ঠাকুর "দহি" চাহিলেন। দধি না থাকায় দুধ আসিল; দুধ আসিল দেখিয়া মিছির ঠাকুর আরও আম চাহিলেন। ঘরে যাহা কিছু আম ছিল, বিপন্ন গোপনন্দন তাহা আনিয়া যোগাইল। ইচ্ছামত সকল দ্রব্য পাইয়া মিছির ঠাকুর তখন স্তিমিতনয়নে উদরের সেবায় ব্যাপৃত হইলেন।

এ দিকে সোহাগের ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া নির্ম্মল স্বয়ং অশ্বারোহণে তাহাকে ডাকিতে চলিলেন; এবং সত্বরই হালদারণীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মিছির ঠাকুর গাছ হইতে দু'টা লঙ্কা তুলিতেছেন। নির্ম্মল বলিলেন, "এ কি করছ, মিছির?"

গাছের লঙ্কা গাছে রহিয়া গেল, যাহা তোলা হইয়াছিল, তাহাও হাত হইতে পড়িয়া গেল। মিছির ঠাকুর তাড়াতাড়ি মনিবের সমীপস্থ হইলেন। বলি-লেন, "হুজুর, এ ঘরমে কহি নাহি হ্যায়, আধা ঘণ্টা হিয়া হাম খাড়া হ্যা।"

এটা কিন্তু মিছিরের মিথ্যা কথা। সেরভর চিঁড়া উদরস্থ করত মিছির মহাশয় সবেমাত্র আসিয়া লঙ্কাগাছে হাত দিয়াছেন। নির্ম্মলও কতকটা তাহা বুঝিলেন। কিন্তু তাঁহার মন আর সে দিকে নাই। তিনি দেখিলেন, গৃহদ্বারের শিকল সহসা একটু নড়িয়া উঠিল। নির্ম্মল ঘোড়া হইতে নামিলেন এবং একটু আগু হইয়া রোয়াকের নীচে দাঁড়াইলেন। তখন গৃহ-মধ্যাগত মনুষ্যকণ্ঠ স্পষ্ট শ্রুত হইল। বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া নির্ম্মল রোয়াকের উপর উঠিলেন এবং দ্বারে করাঘাত করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "কে আছ, দ্বার খোল।"

কেহ কোন উত্তর করিল না, দ্বারও খুলিল না। কিন্তু গৃহমধ্যে মনুষ্য-পদশব্দ শ্রুত হইল।

নির্ম্মল আরও উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "শীঘ্র দ্বার খোল—নতুবা ভাঙ্গিয়া ফেলাম।"

সব স্থির, নিস্তব্ধ—কেহ দ্বার খুলিল না। নির্ম্মল

তখন দ্বারে পদাঘাত করিলেন ; অর্গল ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া গেল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন, সোহাগ পালঙ্কোপরি শায়িতা ; তাহার মুখ, কাপড়ে বাঁধা ; হাত বাঁধিবার চেষ্টা চলিতেছিল,—হালদারণী, সোহাগের একখানা হাতের উপর বসিয়া হাতে কাপড় বাঁধিতেছিল। কিঙ্কর সম্ভবত দ্বারে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া পাহারা দিতেছিল ; কিন্তু যখন নির্ম্মল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন সে পালঙ্কের নিম্নে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ম্মল সকলই দেখিয়া লইলেন ; দেখিয়া সকলই বুঝিলেন। ক্রোধে, ঘৃণায় নির্ম্মলের মুখ বিকৃত হইল। নির্ম্মল হালদারণীকে কেশে ধরিয়া সজোরে ভূমিতে পাতিত করিলেন ; এবং সোহাগের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া কিঙ্করকে ধরিলেন। কিঙ্কর তখন লাফাইয়া উঠিয়া নির্ম্মলের হাতে কামড়াইয়া দিল। নির্ম্মল তাহা গ্রাহ্য না করিয়া কিঙ্করকে যষ্টির মত ভূমি হইতে উঠাইয়া দ্বার হইতে সজোরে উঠানের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

ক্ষণকাল পরে কিঙ্কর ভগ্নহস্ত লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার-কোলে লুকাইল। পলায়নকালে কিঙ্কর, মিছির মহাশয়ের লগুড়ের আস্বাদন কিছু পাইয়াছিল। মিছির মহাশয় সময় বুঝিয়া বীররসের অবতারণা করিয়াছিলেন ; কেন না, শত্রু রিক্তহস্ত, দুর্ব্বল ও পলায়মান।

কিঙ্করকে তাড়াইয়া মিছির গৃহমধ্যে সদর্পে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় দেখিল,—হালদারণী, নির্ম্মলের পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "আমায় ক্ষমা করুন—আমার কোন অপরাধ নাই—কিঙ্করকে ডাকি নাই, সে আপনি আসিয়াছিল। আমায় পুলিসে দেবেন না, আমি বড় গরীব, আমার কেহ নাই। আপনি আমার বাপ-মা, আমায় রক্ষা করুন।"

নির্ম্মল দারুণ ঘৃণাভরে বলিলেন, "তোমার মত পাপিষ্ঠার মুখ দর্শন করিতেও আমার আর ইচ্ছা নাই। তোমাকে পুলিসে দেওয়া দূরে থাক্, তোমার সংস্রবে সোহাগ যে কখন আসিয়াছে, এ কথাও কাহাকে জানিতে দেওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। যদি কখন এ কথা প্রচার হয়, তা হ'লে তোমাকে এ গ্রাম হ'তে তাড়াইব। বুঝেছ ?"

হালদারণী। আমার উপর আপনার যথেষ্ট দয়া। আপনি যেমন বলিবেন, আমি তেমনি করিব।

নির্ম্মল। তোমাকে বলিবার আমার আর কিছুই নাই। কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাস্য যে, নিজে আকণ্ঠ পাপে ডুবিয়া পাপের পথ কত সুখের, তা' দেখিয়াছ ; তবে এক জন নিরপরাধা বালিকার সর্ব্বনাশ সাধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে কেন ?

হাল। আপনি ত সকলি বুঝিতেছেন—পোড়া পেটের জ্বালায় সকলি করিতে হয়।

নি। আমার কাছে ভিক্ষা চাহিলে না কেন ?

হাল। যেখানে ভিক্ষায় পাঁচ পয়সা মিলিবে, সেখানে এরূপ কার্য্যে আমি পাঁচ টাকা পাইতে পারিব।

সোহাগ কাঁদিতে কাঁদিতে মৃদু কণ্ঠে বলিল, "দাদা, বড়ী চল।"

"চল, দিদি।"

উভয়ে সে পাপগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। নির্ম্মল সোহাগের হাত ধরিয়া পদব্রজে চলিলেন। মিছির ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আসিবার সময় মিছির লঙ্কাগাছটি উপড়াইয়া আনিতে বিস্মৃত হইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সোহাগের উদ্ধার সহজে হইল বটে ; কিন্তু ফল অনেক দূর গিয়া দাঁড়াইল। কিঙ্কর ছাড়িল না,—সর্পের মত কামড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। পিতার নিকট বেশ একটা ছোট গল্প সাজাইয়া বলিল। বলিল যে, লম্পট নির্ম্মল হালদারণীর অনুপস্থিতিকালে তাহার গৃহে সোহাগকে লইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিঙ্কর তাহা অবগত হইয়া সোহাগকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিল ; এবং অবশেষে দ্বারবান্ কর্তৃক প্রহৃত হইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। দ্বারবান্ না থাকিলে নির্ম্মলের সাধ্য কি, কিঙ্করের কিছু করিয়া উঠিতে পারে ?

সকল কথা শুনিয়া সেই রাত্রিতেই কেদারজ্যেঠা হালদারণীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিঙ্কর গোপনে যাহা শিখাইয়া দিল, হালদারণী কেদারের কাছে তাহাই বলিল। জ্যেঠা সে রাত্রিতে কাহাকেও কিছু বলিলেন না। একটা মতলব ঠিক করিয়া পরদিন প্রভাতে নির্ম্মলের খুড়া অমরীশ বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেশময় সকলেই জানে, অমরীশ বাবু, ভ্রাতুষ্পুত্র নির্ম্মলকুমারের কতক বিষয়-সম্পত্তি গ্রাস করিয়া

লইয়াছেন। এ জন্য উন্নতচেতা ব্যক্তিমাত্রেই অমরীশ বাবুকে ঘৃণা করিতেন। গ্রামের দুই চারি জন লোক ছাড়া সকলেই নির্মলের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু সেই দুই চারি জন লোক অমরীশ বাবুর কথায় উঠিত বসিত। কেদার জ্যেঠা সাহায্য প্রার্থনা করিলে অমরীশ বাবু তাহাদের ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিল এবং কি করিতে হইবে জানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

কেদার জ্যেঠাও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে অমরীশ বাবু বলিয়া দিলেন, "দেখ কেদার-দা, আমি এর ভিতরে আছি, যেন কোন মতে প্রকাশ না পায়, কেন না, তুমিই বোঝ না কেন—জান্‌তে পারলে নির্মল কি মনে করিবে।"

পরদিন কেদার জ্যেঠা, হালদারণীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কাটোয়াতে নালিশ রুজু করিয়া আসিলেন। হালদারণী বাদী। অনধিকারপ্রবেশ, মারপিট প্রভৃতি অপরাধে নির্মল ও মিছির অভিযুক্ত। কিঙ্কর প্রভৃতি দশ পনর জন লোক, অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য বাদিনীর পক্ষে সাক্ষিরূপে দাঁড়াইল। আসামীদের নামে সমন বাহির হইল। ঘটনার পনর দিন পরে মোকর্দ্দমার দিন ধার্য্য হইল।

কিন্তু সমন ধরান সহজ হইল না। মিছির জোরার; নির্মল প্রবল জমীদার। কেদার জ্যেঠা সহস্র চেষ্টা করিয়াও নির্মলের উপর সমন জারি করাইতে পারিলেন না। যে পিয়াদা সমন লইয়া আসিয়াছিল, সে দুই দিন বসিয়া রহিল, তবু কিছু হইল না। তৃতীয় দিবস জ্যেঠার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিনে আসামী হাজীর না হওয়ায় ওয়ারেণ্ট বা গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইল। নির্মল ধরা দিলেন এবং পাঁচ শত টাকা জামীনে খালাস পাইলেন।

আত্মরক্ষার্থ নির্মল কোন চেষ্টা বা উদ্যোগ করিলেন না। ফলাফল সম্বন্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণ উদাসীন দেখিয়া মায়ের প্রাণ অজ্ঞাত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা পরামর্শ করিবার জন্য নায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নায়েব আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মোকর্দ্দমার কি বুঝিতেছ?"

নায়েব বলিল, "দেখ্‌ছি এবার ঘোর বিপদ্।"

অন্ন। কিসে বুঝলে?

নায়েব। শুনছি, ছোট কর্ত্তাও যোগ দিয়াছেন।

অন্ন। ঠাকুরপো? বাছাকে জেলে দিবার জন্য ঠাকুরপো যোগ দিয়াছেন?

না। শুনছি ত তাই।

অন্ন। শুনা কথায় আমি প্রত্যয় করি না। প্রমাণ পেয়েছ?

না। পেয়েছি। তাঁহার অনুগত কয়েক জন লোক, বাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষী আছে।

অন্ন। তবে বিপদ্ গুরুতর বটে।

না। শুধু তাই নয়, গিন্নী মা; তারা আবার গ্রামময় বাবুর নিন্দা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে।

অন্ন। তা'তে তাদের লাভালাভ কি?

না। যিনি পৃষ্ঠপোষক, তাঁহার লাভ আছে।

নায়েবকে বিদায় দিয়া অন্নপূর্ণা চিন্তামগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর একটা যুক্তি স্থির হইল। তখন তিনি পত্র লিখিতে বসিলেন। পত্রখানি রমেশের উদ্দেশে লিখিত তাহাতে লেখা ছিল:—

"বাবা রমেশ,

পত্র পাইবামাত্র এখানে আসিবে। নির্মল বড় বিপদে পড়িয়াছে। তুমি ভিন্ন আর আমাদের কেহ নাই—তাই তোমাকে ডাকিলাম। ইতি

তোমার মা অন্নপূর্ণা।

পুনশ্চ—পার ত বধূমাতাকে সঙ্গে আনিও।"

বিশ্বাসী ভৃত্যহস্তে বাহিত হইয়া পত্র যথাকালে রমেশের হস্তগত হইল। পত্রপাঠান্তে, রমেশ বড়ই চিন্তিত হইলেন। পত্রবাহককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ পরে মোকর্দ্দমার বিবরণ আদ্যন্ত জানিয়া লইয়া বলিলেন, "বুঝিতেছি, হালদারণী দুশ্চরিত্রা; কিন্তু সোহাগের চরিত্র কেমন?"

ভৃত্য উত্তর করিল, "হুজুর, আমি গরীব মানুষ, কার কি রকম চরিত্র, আমি কেমন ক'রে জানব?"

রমেশ। গরীব হ'লে চরিত্র কেমন জানা যায় না?

ভৃত্য। হুজুর, আমার বাপ আমায় লেখা-পড়া শিখায় নি, কাজেই ও-সব গোলমেলে কথা আমার ঠাওর হয় না।

রমেশ। ভাল, তোমার বাবুর চরিত্র কেমন?

ভৃত্য। বাবুকে আজকাল কেমন কেমন দেখ্‌ছি।

রমেশ মনে মনে বলিলেন, "আমিও তাহাকে কেমন কেমন দেখ্‌ছি। তার পর ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, 'তুমি আনন্দপুর দেখেছ?"

ভৃত্য বলিল, "অনেকবার দেখেছি, হুজুর।"

রমেশ তখন তাহাকে আনন্দপুরের মানচিত্র অঙ্কিত করিতে আদেশ করিলেন। পাঁচ বছরের

ছেলেরা যেমন আঁক পাড়ে, ভৃত্য সেইরূপ আঁক পাড়িয়া আনন্দপুরের এক অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিল। রাস্তাগুলা লাঠির মত—গঙ্গানদী ঠিক একটা বড় পাশ-বালিসের ন্যায়—গাছ-পালা এক একটা ছাতার মত করিয়া আঁকিল। যাহা হউক, সোহাগের বাড়ী ও হালদারণীর বাড়ী কোথায়, কোন্ দিকে, রমেশ তাহা উত্তম করিয়া বুঝিয়া লইলেন।

তখন তিনি মাঝি-মাল্লাকে প্রস্তুত হইবার আদেশ দিয়া বিজির অন্বেষণে অন্তঃপুরমধ্যে দেখা দিলেন। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা সচরাচর রমেশের সাক্ষাৎ পান না। এক্ষণে তিনি অন্দরমধ্যে পূর্ণিমার শশধররূপে সমুদিত হইয়াছেন দেখিয়া পিপাসী চকোরীর দলমধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। একে একে সকলে আসিয়া রমেশকে ঘিরিল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া রমেশ নীরবে তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিতে লাগিলেন

কোনও কমলিনী সত্যযুগে ফুটিয়াছিলেন; এক্ষণে শীর্ণা, বিবর্ণা। তিনি সম্বন্ধে রমেশের মামীর দেবরের পিসতুত ভাইয়ের বিধবা শ্যালিকা। তিনি রমেশের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আহা, বাবা, তোমার শরীরে আর কিছু নেই, শুকিয়ে সিকিখানা হয়ে গেছে; কি ব্যায়রামই হয়েছিল। আমি ঠাকুর-দেবতার কাছে কত মানত করেছি—কত মাথা খুঁড়েছি। বেঁচে থাক বাবা—আমার চুল যত, তোমার তত পেরমাই হো'ক (বক্তীর মাথায় চুল ছিল না, যা ছিল, তাও সম্প্রতি মুণ্ডিত হইয়াছে।) তা' বাবা, তোমার কাছে বলব না ত কার কাছে বলব? আমার মায়ের বেটার একটি ছেলে হয়েছে। তা' কিছু খরচ করা ত আমার উচিত। তুমি না দিলে আমি কোথায় পাব, বাবা!" ইত্যাদি।

আর এক জন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমার জামাইএর ঘরখানি প'ড়ে গেছে, না ছাইলে বর্ষায় ছানা-পানা সব মারা যাবে। তুমি বাবা না দিলে"—ইত্যাদি। এইরূপে রামী, শ্যামী বামী সকলে আসিয়া রমেশের পীড়ার সময় কে কত ঠাকুরের নিকট মানত করিয়াছিল, তাহা জানাইল, এবং পারিশ্রমিকস্বরূপ কিছু কিছু যাচ্ঞা করিল। রমেশ সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া উদ্যানাভিমুখে চলিলেন। সেখানে বিজির সাক্ষাৎ মিলিল।

এখন সে প্রাবৃটের কূলপ্লাবিনী পূর্ণযৌবনা ক্ষিপ্তা তটিনী নাই, সে ঝঙ্কার, সে নৃত্য, সে সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। সকলই হিমানীসমাগমে কোথায় লুকাইয়াছে। সঙ্কুচিতা, মর্ম্মপীড়িতা, দুঃখিনী তটিনীকে দেখিলে কার প্রাণ না ফাটিয়া যায়? সে সোহাগভরা আশাভরা হৃদয়খানি শুকাইয়া চক্ষুর অন্তরালে বালুকামধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। সে কলকল নিনাদ, সে প্রেমোচ্ছ্বাস, সে যৌবনগর্ব্ব, কিছুই নাই; কেবল স্মৃতিটুকু বুকে চাপিয়া, তটিনী আঁখিজলে ধরা সিক্ত করিয়া যাতনানিষ্পিষ্টহৃদয়ে পড়িয়া রহিয়াছে।

বিজির সব ফুরাইয়াছে; সে হাসি নাই, সে রূপ নাই। তেজ, গর্ব্ব কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। সব গিয়াছে, তবু আজও মরিতে পারে নাই; স্বামীকে না বলিয়া তাহার মরা হয় নাই। স্বামী তাহাকে কলঙ্কিনী ভাবিয়াছেন; কেমন করিয়া সে নিদারুণ অপবাদ মাথায় করিয়া বিজি মরিবে?

চম্পকলতিকা বিজলী উদ্যানমধ্যে বেদীর উপর শুইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিয়াছে; ভাবিতেছে, "যখন ইচ্ছা করিব, তখনই মরিতে পারিব; তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? তিনি আমার গুরু, প্রভু; এ দেহ, এ প্রাণ তাঁহার। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত এ দেহ-প্রাণ কেমন করিয়া বিসর্জন করিব? কেমন করিয়া কলঙ্কিনী অপবাদ লইয়া মরিব? তিনি যে আজীবন আমার নামে ধিক্কার দিবেন, আমায় ঘৃণা করিবেন—সে ত আমার প্রাণে সহিবে না। আবার যখন দারপরিগ্রহ করিয়া নবপরিণীতা ভার্য্যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করিয়া ধিক্কার দিবেন, তখন যে স্বর্গেও আমার নরকবাস হইবে।"

এমন সময় রমেশ আসিয়া ডাকিলেন, "বিজু!"

বিজু উঠিয়া বসিল। তাহার শীর্ণ কাতর মুখখানি দেখিয়া রমেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে বিজুর পাশে আসিয়া বসিলেন; ধীরে ধীরে অলকগুচ্ছ কপোল হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন, "বিজু, দিদি আমার, কেন তুমি এত রোগা হইতেছ? ডাক্তার বৈদ্য তোমার রোগ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। অথচ তুমি দিন-দিন শুকাইয়া যাইতেছ; বিজু, লক্ষ্মী আমার, আমার কাছে কোনও কথা লুকাইও না। তুমি বই সংসারে আর যে আমার কেউ নাই।"

বিজু কাঁদিয়া ফেলিল। চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার শরীরে কোন অসুখ নাই ত দাদা।"

রমেশ মুখ ফিরাইলেন—কিছু বলিলেন না। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "বিজু, আমি বধুগ্রামে যাইতেছি।"

বিজু চমকিয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দাদা?"

রমেশ বলিলেন, "তোমার শাশুড়ী ডাকিয়াছেন।"

বিজু নীরব রহিল। রমেশ বলিলেন, "তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তোমার শাশুড়ী আদেশ করিয়াছেন। যাইবে কি?"

বিজু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা ডাকিয়াছেন, দাদা?"

রমেশ উত্তর করিলেন, "নির্ম্মল বড় বিপদে পড়িয়াছেন, তাই মা আমায় ডাকিয়াছেন।"

বিজুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; আবেগভরে বলিল, "দাদা, আমি যাব।"

রমেশ বলিলেন, "চল দিদি, তু'জনেই যাব।"

বিজু উঠিয়া দাড়াইল। রমেশও উঠিয়া দাড়াইলেন। ভগিনী সরিয়া আসিয়া ভাইয়ের সম্মুখে দাড়াইল; রমেশের মুখপানে চাহিয়া বিজি কম্পিতকণ্ঠে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বিপদ দাদা?"

রমেশ বলিলেন, "সকলে কুশলে আছেন, সে চিন্তা নাই। বিপদটা কি জান? নিম্মল একটা মোকর্দ্দমায় অভিযুক্ত হইয়াছেন।"

বিজু অমঙ্গল-আশঙ্কায় কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "অভিযোগটা কি?"

রমেশ তুই কথায় সেটা বুঝাইয়া দিলেন। বুঝাইয়া অবশেষে বলিলেন, "আমার বিবেচনায় সোহাগ ও নিম্মল উভয়েই নিরপরাধ।"

বিজু ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বেদীর উপর বসিল। রমেশ ডাকিলেন, "বিজু, এস।"

বিজু বলিল, "আমি যাব না—তুমি একা যাও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রমেশ বধগ্রামে আসিয়া আগে অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রমেশকে দেখিয়া অন্নপূর্ণার বল বাড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমার বৌমা কই?"

রমেশ একটু গোলে পড়িলেন। সত্য কথা বলিলে বিজুর উপর শাশুড়ী বিরক্ত হইতে পারেন। সুতরাং তাহা না বলিয়া কেবলমাত্র কহিলেন, "যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে এখনি তাহাকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিই।"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা, আমার ঘরের লক্ষ্মী আমায় ছাড়িয়া গিয়া অবধি আর আমার সুখ-শান্তি নাই। সে কথা ভাবিয়া এখন আমার আর কাঁদিবারও অবসর নাই। সকলের আগে আমার বংশের সুনাম, ছেলের মান রক্ষা কর।"

রমেশ। মা, নিশ্চিন্ত থাকুন, মোকর্দ্দমা যদি মিথ্যা হয়?—

অন্ন। যদি মিথ্যা হয়? তবে তুমি নির্ম্মলকে চেন না। শিশুর মনে পাপ থাকিতে পারে, কিন্তু নির্ম্মলের হৃদয় আজও পাপ স্পৃষ্ট হয় নাই।

রমেশ। তবে ভাবনা কি মা? যেখানে পাপ নাই, সেখানে তুঃখও নাই।

অন্ন। তবে বল দেখি বাবা, কি পাপে আমার সোনার সংসার এমন হ'ল? মহাদেবের মত পুত্র, ভগবতীতুল্য পুত্রবধূ লইয়া সুখে সংসার করিতেছিলাম, কি পাপে বাবা, আমার এমন হ'ল? আমি ত ভ্রমেও কখন কাহারও প্রাণে ব্যথা দিই নাই, জ্ঞানতঃ কখনও অধর্ম্মাচরণ করি নাই। তবে একে একে বিষয়-সম্পত্তি, বংশের সুনাম, যশঃ, পুত্র, পুত্রবধূ হারাইতে বসিয়াছি কেন? যে সর্ব্বস্ব খোয়াইতে বসিয়াছে, তাহাকে কি স্তোভ দিয়া বুঝাইবে বাবা?

রমেশ সকল কথা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জ্যোৎস্নার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, নির্ম্মল ও বিজলীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। তাই নাকি নির্ম্মল কাহাকেও কিছু না বলিয়া মধ্যরাত্রে বিশালপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন তা' স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে অমন ঝগড়া অনেক হইয়া থাকে; সে জন্য এত ভাবনাই বা কেন? আর অন্নপূর্ণারই বা এত আক্ষেপ কেন? তবে কি ভিতরে আরও কিছু আছে? রমেশ স্পষ্ট কিছু বুঝিতে না পারিয়া নিম্মলের অন্বেষণে চলিলেন।

নিম্মল তখন উদ্যানমধ্যে। উদ্যানের এখন আর সে শ্রী নাই,—যেখানে যা' কিছু সুন্দর ছিল, সকলই বিলুপ্ত হইয়াছে। যে বেদীর উপর ফুলরাশির মধ্যে শুইয়া নির্ম্মল ও বিজি কত মধুযামিনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন, আজ সে বেদী ভগ্ন—আবর্জ্জনা-পরিপূর্ণ। বেদীর সন্নিকটে নির্ম্মল ও বিজি স্বহস্তে যে সকল বসোরা, ব্ল্যাকপ্রিন্স, মন্টিকুষ্টো, ওয়াল্টারস্কট, সুইটব্রায়ার, পলনিরোঁ প্রভৃতি সুন্দর গোলাবনিচয় রোপিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা যত্নাভাবে তৃণাচ্ছাদিত হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। শ্যামালতা, লবঙ্গলতার আর সে শোভা নাই—মালতী-মাধবীর আর সে মাধুর্য্য নাই। নাগ-দোনা, বোপাগুলা শুকাইয়া গিয়াছে। বেল, যুঁই, রোজিয়া—হিংস্রক সর্পের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। সে কুসুমিত লতিকা,

সে কোকিলঝঙ্কার, সে পত্রে পত্রে চাঁদের খেলা—কিছুই এখন নাই। এক জনের অভাবে সকলই গিয়াছে, কেবল স্মৃতিটুকু আছে।

নির্ম্মল ইদানীং ইচ্ছাপূর্ব্বক উদ্যানে আসিতেন না; অন্যমনস্কভাবে, যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে কখনও কখনও আসিতেন। বেদীর সন্নিকটস্থ হইলে একে একে সকল কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিত তখন তিনি দ্রুতপদে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে নির্ম্মল উদ্যানমধ্যে আসিয়াছিলেন। আসিয়া গাছপালা, আকাশ, পৃথিবী সকলই দেখিলেন; কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা কোথাও পাইবেন না। অবশেষে অবসন্নহৃদয়ে এক চম্পকবৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃক্ষকাণ্ডে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া সুদূর আকাশপ্রান্তে চাহিয়া রহিলেন বিকৃতমস্তিষ্ক নির্ম্মলকুমার আকাশপটে দুইখানি চিত্র অঙ্কিত দেখিলেন। একখানি নানাভরণভূষিতা, ব্রীড়াবনতা, মাধুর্য্যময়ী দেবীমূর্ত্তি; অপরখানি বসনভূষণশূন্যা, লজ্জাহীনা, বিভীষিকাময়ী পিশাচীর মূর্ত্তি। আকাশের যেখানটায় দেবীমূর্ত্তি উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত ছিল, দেখিতে দেখিতে সেখানটা নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইল। দেবীমূর্ত্তি আঁধারে লুকাইল। তখন সে স্থানে পিশাচী-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল। নির্ম্মল চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বিলি, বিলি, তুই পিশাচী হ'লি? তুই কেন মরিলি না, আমি কেন মরিলাম না?" দেখিতে দেখিতে কুয়াসা কাটিয়া গেল—দেবীমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে নির্ম্মল আবেগভরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বিলি, আমার হৃদয়ের আলো, আমার আনন্দ, আমার উৎসাহ, আমার শক্তি, আমার শান্তি, অত দূরে কেন—আমার হৃদয়ে এস।" অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে দেবীমূর্ত্তি আকাশের গায় মিলাইয়া গেল;—নির্ম্মল হতাশহৃদয়ে বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, "নির্ম্মল।" নির্ম্মল নিরুত্তর, তখনও তাঁহার সংজ্ঞা নাই। যে ডাকিয়াছিল, সে সম্মুখে আসিয়া আবার ডাকিল, "নির্ম্মল।" ধীরে ধীরে নির্ম্মলের সংজ্ঞা আসিল; তিনি ধীরে ধীরে আগন্তুকের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, রমেশ—অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি লইয়া, সুখ-দুঃখের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রমেশ। নির্ম্মল সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মলের ভাব দেখিয়া রমেশ একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কি নির্ম্মল, সাপ দেখেছ নাকি?"

নির্ম্মল তথাপি নিরুত্তর। রমেশ আবার বলিলেন, "আমায় চিনিতে পার, নির্ম্মল?"

নির্ম্মল এবার উত্তর করিলেন, কিন্তু উত্তরটা কিছু কর্কশ। বলিলেন, "তুমি? তুমি এখানে রমেশ বাবু?"

রমেশ বলিলেন, "আসিতে কি নাই? তাড়াইয়া দিতে চাও নাকি?"

নির্ম্মল আত্মসংযম করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "কখন্ এলে? মার সঙ্গে দেখা করেছ?"

র। এসেছি একটু আগে—মার সঙ্গে দেখাও করেছি। কিন্তু তোমার এ ভাব কেন?

নি। কি ভাব দেখিতেছ? আমি রোগা হইয়াছি, তাই বলিতেছ? মাও সে কথা বলিয়া থাকেন।

র। নির্ম্মল, আমি বালক নই, আমার কাছে চাতুরী কেন?

নি। চাতুরী? চাতুরী কখনও করি নাই। যাহা বলিতে ইচ্ছা করি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিও না।

র। কোন্ কথাটা বলতে ইচ্ছা কর না, তাহা ত এ গরীব অবগত নয়। যদি না জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, তা গুণে ক্ষমা করিও। গললগ্নীকৃতবাসে ক্ষমা চাহিতে হইবে কি?

নি। রমেশ বাবু! এটা ঠাট্টার কথা নয়। যে ভাবে কথাটা বলিলাম, সেই ভাবেই উহা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

র। দেখিতেছি, জমীদারের কাছে আসিয়াছি; হুজুরের হুকুম হয় ত এখন স্বগ্রামে ফিরিয়া যাই।

নি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার—আমি তোমায় ডাকিতে যাই নাই।

র। তুমি ডাকিতে না যাও, তোমার মা আমায় ডাকিয়াছেন।

নি। তিনি ভুল করিয়াছেন।

র। তিনি ভুল করুন বা না করুন, আমি এমন বন্য বর্ব্বরের বাড়ীতে আসিয়া ভুল করিয়াছি।

রোষে, ক্ষোভে রমেশ উদ্যান পরিত্যাগ করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহার রাগটা পড়িয়া গেল। ভাবিলেন, 'আমি এ বিপদের সময় নির্ম্মলকে ত্যাগ করিয়া গেলে কে তাহাকে দেখিবে? আগে তাহাকে বিপন্মুক্ত করি, তার পর,—তার পর আবার কি? সে যে বিজুর স্বামী।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোহাগের বিবাহ হওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিল। নিম্মলের চেষ্টায় পাত্র অনেক জুটিল; কিন্তু সকল সম্বন্ধ একে একে ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। গ্রামে যে একবার আসে, সে আর দ্বিতীয়বার আসে না। সোহাগের চরিত্র লইয়া গ্রামে ও আদালতে যে ঢাক বাজিয়াছে, তাহা শুনিয়া কে আপন পুত্রের বা ভ্রাতার সোহাগের সহিত বিবাহ দিবে? সুতরাং নিম্মল সহস্র চেষ্টাতেও সোহাগের বিবাহ ঘটাইতে পারিলেন না। সোহাগ অবিবাহিতা থাকিল। শুধু অবিবাহিত থাকিলে তার মায়ের যন্ত্রণা তবু কতকটা সীমাবদ্ধ হইত। সোহাগের চরিত্র লইয়া গ্রামে এত তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল যে, সোহাগের যাতনা কূল ছাপাইয়া উঠিল। যে সকল ভামিনী পুষ্করিণীর ঘাটে হালদারণীর সঙ্গে সোহাগকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকে এক একখানি সংবাদপত্রের পদ গ্রহণ করিলেন। কে কবে অন্ধকার নিশীথে সোহাগকে নিম্মলের সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে নৌক-বোহণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন—কে কবে ধাত্রীর আশ্রয় হইতে সোহাগকে দেখিয়াছিলেন, তাহা একে একে জনসমাজে প্রচার করিয়া যশঃ ও খ্যাতি অর্জন করিতে লাগিলেন। সময় মন্দ পড়িলে সকলেই চাপিয়া ধরে। যে হালদারণী সকল অনিষ্টের মূল, সে-ই আবার অপূর্ব্ব ভাবনীশক্তিবলে সোহাগ ত দূরের কথা, সোহাগের মাতার চরিত্র সম্বন্ধেও নানা কথা বাষ্ট করিতে লাগিল।

মোটের উপর গ্রাম তিষ্ঠান সোহাগের পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। গ্রামের কেহ সোহাগের বাড়ী মাড়ায় না। অধিকন্তু যদি কেহ পথে ঘাটে সোহাগকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মর্ম্মঘাতী বাক্যবাণে সোহাগকে জর্জ্জরিত করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। ক্রমে ক্রমে সোহাগ গঙ্গাঘাটে যাতায়াত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। খিড়কীতে একটা এজমালী পুষ্করিণী ছিল, তাহাতেই স্নানাদি করিত।

পুষ্করিণীটি অতি ক্ষুদ্র, জল জঘন্য। বাসন মাজা ভিন্ন অন্য কোনও কাজ চলিত না। সোহাগদের খিড়কীদ্বার হইতে প্রায় দুই শত হস্ত দূরে এই পুষ্করিণী অবস্থিত, চতুর্দ্দিকে পাড়, আগাছায় সমাচ্ছন্ন; মাঝে মাঝে দু' চারিটা আম ও কাঁঠাল গাছ। পুকুরের পশ্চিমদিকে দুইটা ঘাট ছিল; একটা সোহাগেরা ব্যবহার করিত, অপরটিতে কেদার জ্যেঠার বাড়ীর দাসীরা বাসন মাজিত। পুরুষমানুষ আসা দূরে থাক, অপর কোন স্ত্রীলোকও এ পুকুরে আসিত না। পুকুরের পূর্ব্ব পাড়ের ধার দিয়া একটা গ্রাম্য রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে লোক-চলাচল বড় একটা নাই। উত্তরে গঙ্গার ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের ভিতর রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণী ও রাস্তা লইয়া আমাদের কিছু প্রয়োজন আছে, তাই একটা বিস্তৃত বিবরণ দিলাম।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার দুই দিবস পরে এক দিন অপরাহ্ণে সোহাগ কথিত পুষ্করিণীর ঘাটে গা ধুইতে চলিল। দুই ধারে নিবিড় জঙ্গল, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। ঘাট বাঁধান নয়, মাটী কাটা। ধাপ করা হইয়াছে। ঘাটে একখানা মোটা কাঠ পড়িয়া আছে; তাহারই উপর বসিয়া সোহাগ কখন কখন বাসন মাজিত। এক্ষণে তাহারই উপর আসিয়া বসিল। চারি-দিক নিস্তব্ধ, কোথাও মনুষ্য সমাগমের চিহ্নমাত্র নাই। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বসিয়া সোহাগ আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল।

অনূঢ়া কন্যারা মাথায় কাপড় দেয় না—সোহাগের মাথায়ও কাপড় ছিল না। সোহাগ আর চুল বাঁধে না—কখনও জড়াইয়া রাখে, কখনও বা আলুলায়িত থাকে। এক্ষণে সেই নিবিড় কেশরাশি গণ্ড পৃষ্ঠ সমাচ্ছাদিত করিয়া আলুলায়িত ছিল। অঙ্গে অলঙ্কার নাই, কেবল প্রকোষ্ঠে চারিগাছা কাচের চুড়ি। সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে সেই নিরাভরণা স্বভাবসুন্দরী সংসারের বিষে কলুষিত জর্জ্জরিত হইয়া আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছিল। সোহাগ ভাবিতেছিল যে, সংসারে সে সে কেবল মায়ের যন্ত্রণার কারণ হইল—পিতৃবংশের মানসম্ভ্রম লোপ করিতে বসিল। ভাবিতে ভাবিতে সোহাগের চোখে জল আসিল। ক্রমে দরদর ধারা বহিল, মাথার ভিতর কেমন করিতে লাগিল,—অবশেষে সোহাগের দেহ এলাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

এমন সময় পূর্ব্বদিকস্থ জঙ্গল ভাঙ্গিয়া এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল। যে আসিল, সে রমেশ।

আজ দুই দিন হইল, রমেশ বধগ্রামে আসিয়াছেন। আসিয়া অবধি তিনি নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। নায়েবকে লইয়া মাঝরুম সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র দেখা, সাক্ষীর তদ্বির করা, কেদার জ্যেঠা ও অমরেশ বাবুর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটান প্রভৃতি কার্য্যে রমেশ এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এই দুই দিনের মধ্যে মুহূর্ত্তকাল তাঁহার অবসর ছিল না। হালদার-ণীকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার উদ্দেশে

আজ বৈকালে আনন্দপুরে আসিয়াছেন। ঘাটে নৌকা রাখিয়া পদব্রজে হালদারণীর বাড়ী যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে দেখিলেন, যৌবনোন্মুখী এক অপূর্ব্বসুন্দরী ঘাটের উপর বসিয়া রহিয়াছে। রমেশ মুগ্ধ হইলেন;—একটু দাঁড়াইয়া সে অলোকসামান্য রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, বালিকা ঝটিকাচ্ছিন্ন পদ্মের ন্যায় মাটীর উপর পড়িয়া গেল। রমেশ বুঝিলেন, বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়াছে; তখন তিনি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিলেন।

চোখে মুখে জলসেচন করিতে করিতে বালিকার চৈতন্যোদয় হইল। নয়নোন্মীলন করিয়া সোহাগ সম্মুখে দেখিল, এক অপরিচিত যুবক তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। সোহাগ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না, মাথা টলিয়া আবার পড়িয়া গেল।

রমেশ বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না; আগে সুস্থ হউন—তার পর উঠিবেন।"

সোহাগ লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিল। রমেশ পুনরায় বলিলেন, "আমার বোধ হয়, আপনার মূর্চ্ছা রোগ আছে; এরূপ অবস্থায় ঘাটে একাকী আসা উচিত হয় নাই।"

উত্তর দেওয়া দূরে থাক, সোহাগ লজ্জায় আরও জড়সড় হইল। তখন রমেশ উত্তরীয় জলসিক্ত করিয়া সোহাগকে বীজন করিতে লাগিলেন। সোহাগ মরমে মরিয়া গেল।

সোহাগের মনোভাব রমেশ কতকটা উপলব্ধি করিলেন। তখন তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং সে স্থান ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। সোহাগ ভাবিল, বুঝি বা সে তাঁহাকে কোনও প্রকারে অপমানিত বা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাই তিনি চলিয়া যাইতেছেন। সোহাগ মুহূর্ত্তের জন্য একবার রমেশের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। তাহার সে দৃষ্টিতে কি কমনীয়তা, কি কৃতজ্ঞতা! রমেশ মুগ্ধ হইলেন।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার গৃহ সম্ভবতঃ সন্নিকটে, আপনি একা যাইতে পারিবেন কি?"

সোহাগ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল—অতি মৃদুস্বরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "পারিব।"

রমেশ সেই ছোট "পারিব" কথাটি বুকে ধরিয়া আর সেই চাহনিটুকু নয়নে মাখিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সোহাগকে পরিত্যাগ করিয়া রমেশ হালদারণীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সে কথা বলিবার আগে রমেশ কিরূপ অবস্থায় নির্ম্মলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন, সে কথা একটু বলি।

উদ্যানমধ্যে রমেশের সহিত কলহ করিয়া নির্ম্মল বাটীর মধ্যে মায়ের কাছে আসিলেন। ডাকিলেন, "মা!"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন, "কি বাবা?"

নি। বিশালপুর হইতে কেহ আসিয়াছেন?

অন্ন। রমেশ আসিয়াছেন।

নি। আর কেহ নয়?

অন্ন। বউমার কথা বলিতেছ? রমেশ তাঁহাকে আনেন নাই।

নি। আনেন নাই, ভালই করিয়াছেন; রমেশ বাবু না আসিলে আরও সুখী হইতাম।

অন্ন। স্থির হও—অকারণ ঔদ্ধত্য দেখাইও না।

নি। রমেশ বাবু এখানে আসিলেন কেন?

অন্ন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়াছি।

নি। কেন ডাকিয়াছ?

অন্ন। সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিব না।

নি। মা, আমার অপরাধ লইও না—ক্ষমা কর। আমার মনের ঠিক্ নাই, তাই কি বলিতে তোমাকে কি বলিতেছি।

অন্ন। বাবা, মায়ের কাছে পুত্রের আবার অপরাধ কি?

নি। মা, দোষ লইও না—একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব কি?

অন্ন। স্বচ্ছন্দে কর।

নি। রমেশ বাবুর এখানে অবস্থান কি আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা?

অন্ন। কেন নয়?

নি। তিনি বিশ্বাসঘাতিনীর সহোদর ভাই।

অন্ন। চুপ কর;—বউমা আমার গৃহলক্ষ্মী; রমেশ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

নির্ম্মল মায়ের পদপ্রান্তে লুটাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি যে তা' ভাবিতে পারি না মা!"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "আজও তুমি বালক; তোমার বুদ্ধি ও চিত্ত চঞ্চল। যখন আমার বয়স পাইবে, তখন আমারই মত সিদ্ধান্ত করিতে শিখিবে। যত দিন না পার, তত দিন মায়ের পরামর্শমত চলাই পুত্রের কর্ত্তব্য।"

নি। আমি ত কখনও তোমার অবাধ্য হই নি, মা! অবাধ্য হবার পূর্ব্বে যেন আমার বাক্‌রোধ হয়। কিন্তু মা, তুমি যেমন আমায় ভাব্‌তে বল্‌ছ, তেমন যে আমি কোনও মতেই ভাব্‌তে পারছি না। আমি যে সে ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি, মা।

অন্ন। বিশালপুরে যাবার আগে যখন তুমি কিছু দেখ নি, শুন নি, তখনও তুমি বউমাকে গ্রহণ করিবে কি না, ইতস্ততঃ করেছিলে। কেন করেছিলে, বলিতে পার কি? যে অভিমানে অন্ধ, তা'র বিবেচনার মূল্য নাই। আমি তোমার মত অন্ধ নই; সুতরাং যা' অসম্ভব, তা' বিশ্বাস করতে পারি না।

নি। আমিও যে মা, তোমার মত ভাবিতে চেষ্টা করি। চিন্তা করিতে করিতে কখনও আকাশ-পটে উজ্জ্বল দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাই, কিন্তু তখনই আবার দেবী-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়, এবং সেই স্থানে বিকটাকার পিশাচীর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে।

অন্ন। যে নিজে পিশাচ, সে-ই দেবী-মূর্ত্তিতে পিশাচীর কল্পনা করে।

নি। পিশাচ হইতে আর বাকী কি আছে, মা? গৃহে অতিথি আসিলে যখন তাহাকে তাড়াইতে শিখিয়াছি, তখন ত পিশাচ সেজেছি, মা।

অন্ন। কাহাকে তাড়াইয়াছ, নির্ম্মলকুমার?

নি। রমেশকে।

অন্ন। রমেশকে? তোমার বিপদে সাহায্য করিতে যাহাকে আমি আহ্বান করিয়া আনিয়াছি, তাহাকে? যার দেব-চরিত্র তোমার অনুকরণীয়, তা'কে তাড়াইয়াছ? নির্ম্মল, আমার প্রাণে ব্যথা দিতে তুমি এত ভালবাস?

নি। মা, ক্ষমা কর; আমি এখনই তাঁকে ডাকিয়া আনিতেছি।

নির্ম্মল রমেশের অনুসন্ধানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন বটে, কিন্তু বাক্যালাপ করিবার তেমন সুযোগ ঘটিল না। রমেশ ইচ্ছা-পূর্ব্বক এ সুযোগ দিলেন না। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে রমেশ আনন্দপুরে যাইবেন বলিয়া নৌকায় উঠিতে-ছিলেন, এমন সময় নির্ম্মল আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। একটু নিভৃতে লইয়া গিয়া বলিলেন, "রমেশ বাবু, তোমাকে অপমান করায় মা আমার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমার উপর রাগ করিও না।"

রমেশ। মাকে বলিও যে, তোমার উপর আমার কোনও রাগ নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে তোমার জেলে যাইবার পথ আরও পরিষ্কার করিয়া দিতাম।

নি। রমেশ বাবু, তোমার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।

র। কি বল।

নি। এ মোকর্দ্দমায় তুমি নির্লিপ্ত থাকিবে।

র। কেন বলিতে পার?

নি। তোমার সাহায্যে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা নাই।

র। তোমার উপযুক্ত কথা বলিয়াছ। যে আমার গৃহ হইতে গভীর রাত্রিতে তস্করের ন্যায় পলায়ন করিয়াছে—যাহার গৃহে আহূত হইয়া কুক্কুরের ন্যায় বিতাড়িত হইয়াছি,—তাহার গৃহে, তাহার কাছে ভদ্রতা, বিনয়, সৌজন্য প্রত্যাশা করা বাতুলতা।

নি। প্রত্যাশা করিতে তোমায় অনুরোধ করিতেছি না; তোমার ইচ্ছামত আমার নিন্দা করিতে পার, তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু এটা তুমি স্মরণ রাখিও যে, তোমার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করা আমার অভিপ্রেত নয়।

র। যখন উপকার করিয়া তোমার নিকট পুরস্কার যাচ্ঞা করিতে আসিব, তখন তোমার ইচ্ছামত তর্জ্জন-গর্জ্জন করিও।

বলিয়া রমেশ নৌকায় উঠিলেন। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আনন্দপুরের ঘাট হইতে বরাবর সড়ক গিয়াছে। রমেশ সদর রাস্তা ছাড়িয়া বামের সঙ্কীর্ণ পথ অব-লম্বন করিয়াছিলেন। কেদার জ্যেঠা রমেশকে চিনিত; বোধ হয়, রমেশ সেই জন্য জ্যেঠার গৃহ-সম্মুখস্থ সড়ক না ধরিয়া অন্যপথে গিয়াছিলেন। পথে যাইতে যাইতে রমেশের সহিত সোহাগের কিরূপ অবস্থায় সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলি-য়াছি। যাহা হউক, এক্ষণে আখ্যায়িকার পরিত্যক্ত সূত্র গ্রহণ করিতে আর কোনও আপত্তি নাই।

সোহাগকে ছাড়িয়া রমেশ ধীরে ধীরে হালদার-ণীর গৃহাভিমুখে চলিলেন।

আমরা তাহার গৃহ একবার দেখিয়াছি। দ্বিতীয়-বার দেখিবার বাসনা না থাকিলেও রমেশের সঙ্গে আমাদের তথায় যাইতে হইবে। হালদারণী শয়ন-কক্ষের ভিত্তিগাত্রে দুইখানি নূতন পট ঝুলাইতেছিল।

একখানি জগন্নাথ দেবের, অপরখানি চতুর্ভুজা কালীমূর্ত্তির। পট দুইখানি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া হালদারণী পটাঙ্কিত ঠাকুরদের প্রণাম করিতে যাইতেছিল, এমন সময় সড়ক হইতে রমেশ ডাকিলেন, "এ বাড়ীতে কে আছ গা ?"

হালদারণীর আর প্রণাম করা হইল না। প্রণামটা স্থগিত রাখিয়া সে বাহিরে আসিল; দেখিল, এক জন অপরিচিত যুবক। হালদারণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা ?"

রমেশ। হ্যা গা, হালদারণীর বাড়ী কোন্ দিকে, আমায় দেখাইয়া দিতে পার ?

হাল। এইটিই তা'র বাড়ী; আমারই নাম হালদার ঠাক্‌রুণ।

র। আঃ বাঁচলুম, খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়েছি।

হাল। কেন আমাকে খুঁজ্‌ছ গা ?

র। এখানে দাঁড়িয়ে ত কথা হ'তে পারে না।

হাল। তবে আমার ঘরে উঠে এস।

রমেশ গৃহমধ্যে উঠিয়া আসিলেন। চারিদিকে চাহিয়া রমেশ বলিলেন, "তোমার ঘরটি বেশ।"

উত্তরে হালদারণী একটু গরবের হাসি হাসিল। রমেশ বলিলেন, "তোমার নাম অনেক দূর থেকে শুনেছি। তোমার এই ঘরে কে একটা ছোঁড়া কি একটা কাণ্ড বাধাইয়াছিল না ?"

হালদারণী আবার একটু হাসিল; সম্ভবতঃ কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের থাকা হয় কোথায় ?"

রমেশ বলিলেন, "আমি থাকি কলিকাতায়; এক্ষণে আসিয়াছি রামপুরে।"

হা। রামপুরে কেন আসিয়াছেন ?

র। সেখানে আমার কুটুম্ব বাড়ী।

হা। কুটুম কে ?

র। তুমি কাহাকে চিনিবে ?

হা। সেখানে অনেকেই আমার পরিচিত।

র। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ আমার কুটুম্ব।

হা। শুনিয়াছি, কার্ত্তিক বাবুর ভগ্নীপতির বাড়ী কলিকাতায়, আপনি কি সেই ?

রমেশ শুধু একটু হাসিলেন। হালদারণী জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়ের মত ব্যক্তির আমার বাটীতে পদার্পণ হইয়াছে কেন ?"

র। ফুলের প্রয়োজন হইলেই লোকে মালীর আশ্রয়গ্রহণ করে।

হা। সকল মালী দেবসেবার উপযোগী ফুল যোগাইতে পারে না।

র। যাহার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি, তাহার মত মালী কোথায় পাইব ?

হা। আপনার মত বড়লোকের পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হইয়াছে। কি আদেশ, আজ্ঞা করুন।

তা'র পর কি কথা হইল, গ্রন্থকার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও শুনিতে পাইল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ের কথোপকথন চলিল। কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া রমেশ পাঁচটি টাকা হালদারণীর হাতে দিলেন। "নেব না, নেব না" বলিতে বলিতে হালদারণী তাহা কোমরে বাঁধিল। রমেশ উঠিলেন। বিদায়কালে বলিলেন, "তা' হ'লে কাল্ ঠাকুর-ঘাটে আসিব ?"

হাল। আসিবেন বই কি।

র। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় ?

হাল। না, আর একটু আগে আসিবেন।

র। কেন ?

হাল। আমায় কাটোয়া যাইতে হইবে।

র। কখন্ যাইবে ?

হাল। সম্ভবতঃ রাত দুপুরে নৌকায় উঠ্‌ব।

র। কেন যাইবে ?

হাল। মোকদ্দমা আছে।

র। রাত্রি এক প্রহরের সময় আসিলে তোমার অসুবিধা হইবে না ?

হাল। তাই আসিবেন।

র। আসিলে নিরাশ হইতে হইবে না ?

হালদারণী আবার একটু হাসিল। রমেশ সে হাসির অর্থ বুঝিলেন; বুঝিয়া প্রসন্নমনে চলিয়া গেলেন।

পরদিন রমেশ যথাসময়ে যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ বজরায় আসিয়াছেন। কেন না, আনন্দপুর হইতে বরাবর কাটোয়া যাইতে হইবে। পরদিন নির্ম্মলকুমারের বিচার। বজরা তত দ্রুত চলে না। তা'তে আবার রমেশের বজরাখানি খুব বড়। মধ্যরাত্রিতে যাত্রা না করিলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কাটোয়া পৌঁছান সম্ভব নয়।

ঘাটে আসিয়া রমেশকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হালদারণী সত্বর আসিয়া দেখা দিল। তবে হালদারণী একা নয়, তার সঙ্গে একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী ছিল। রমেশের আদেশে মাঝিরা স্ত্রীলোক দুইটিকে বজরায় উঠাইয়া আনিল। তাহারা সমীপস্থ হইলে, অবগুণ্ঠনবতীকে লক্ষ্য করিয়া রমেশ বলিলেন, "তোমাকে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। যাহারা তোমার মত ঘৃণিত জীবন অবলম্বন করিয়াছে,

তাহারা আমার দয়ার পাত্রী। তুমি অনর্থক কষ্ট পাইলে, এই বিবেচনায় তোমাকে কিছু দিতেছি।"

এই বলিয়া রমেশ তাহাকে কয়েকটি টাকা দিয়া বিদায় করিলেন। সে চলিয়া গেল। হালদারণী বিস্মিত ও ভীত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমিও যাই?"

রমেশ রুদ্রস্বরে বলিলেন, "তুমি যাবে কোথা? তুমি আমার বন্দী।"

হালদারণী স্তম্ভিত হইল। সে এত দিন কত ভদ্রলোকের মনোরঞ্জন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এমনটা ত কখনও ঘটে নাই। সে বিস্মিতনয়নে রমেশের পানে চাহিয়া রহিল। রমেশ বলিলেন, "আমি কে, তা' জান? আমি বিশালপুরের রমেশ রায়। তোমার সঙ্গে কিছু বুঝা-পড়া আছে। তাই তোমায় এখানে আনিয়াছি।"

হালদারণী এবার বসিয়া পড়িল। রমেশ রায়ের নাম এ অঞ্চলে কে না শুনিয়াছে? সে যে গরীবের মা-বাপ—দুষ্টের যম।

হালদারণী সভয়ে দেখিল, মাঝিরা পাল তুলিয়া বজরা ছাড়িয়া দিল হালদারণী তখন মনে মনে দুর্গা, কালী, রাধাবল্লভকে ডাকিতে লাগিল; চীৎকার করিতে সাহস হইল না; কেন না, পিছনে চারি জন দ্বারবান্; সম্মুখে কালান্তক যমসদৃশ রমেশ।

স্ফীত উদরে, হুঙ্কার শব্দে বজরা দক্ষিণাভিমুখে ছুটিল—স্বামি-বর্জ্জিতা রমণীর ন্যায় দুঃখশ্বাসে ফুলিয়া উঠিয়া, চোখের জল দুই দিকে ছড়াইতে ছড়াইতে বজরা ছুটিল। গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া চলিল। আষাঢ় মাস; আকাশে মেঘ, নদীতে তুফান। তবে মেঘ তত গাঢ় নয়, তুফান তত ভয়াবহ নয়। কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ ক্রমে আকাশে উঠিল। এখন চাঁদের সে রূপ নাই; অনুতাপক্লিষ্টা বৃদ্ধা স্বৈরিণীর ন্যায় মনের দুঃখে শুকাইয়া শীর্ণ, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই শীর্ণ মুখে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া চাঁদ পৃথিবীর পানে চাহিয়া দেখিল। পৃথিবীও একটু হাসিয়া উঠিল। কিন্তু সে হাসি ম্লান—সঙ্কোচপূর্ণ। পৃথিবীর সে হাসি দেখিয়া চাঁদের প্রাণে ব্যথা লাগিল। অকলঙ্কিত কৌমারে যখন সে পৃথিবী হাসাইত, নাচাইত, তখনকার কথা মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। স্মৃতির জ্বালায় অধীর হইয়া মেঘান্তরালে মুখ লুকাইল; অবশেষে কাঁদিয়া ফেলিল। রমেশ ছাদে বসিয়াছিলেন; বৃষ্টি আসিল দেখিয়া তিনি কামরার ভিতর উঠিয়া গেলেন। সেখানে হালদারণীকে ডাকিয়া আনিয়া জেরা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, এখন বুঝিতে পারিতেছ, নির্ম্মল বাবু আমার কে? তাঁহাকে তোমাদের জাল হইতে উদ্ধার করিতে আমি এখানে আসিয়াছি। তাঁহাকে উদ্ধার করিতে যদি তোমার মত দু'দশটাকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিতে হয়, তাহাতেও আমি পিছাইব না এখন ঘটনার কথা যথাযথ খুলিয়া বল।"

হালদারণী নিরুত্তর। রমেশ বলিলেন, "অনর্থক কথা ব্যয় করা আমার অভ্যাস নাই। সকল কথা খুলিয়া বলিতে যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে, তাহাও বল, দরওয়ান ডাকিয়া তোমাকে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করি"

প্রাণের ভয়ে হালদারণী কাঁদিয়া ফেলিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে একে একে আদ্যন্ত সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া রমেশ বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, "তবে কি নির্ম্মলকুমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, সোহাগ নিষ্কলঙ্কা?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া রমেশ বলিলেন, "সত্য বলিতেছ? কিছু গোপন কর নাই?"

হাল। মা কালীর দিব্য—আমি মিথ্যা বলি নাই বা কিছু গোপন করি নাই।

র। নির্ম্মল ও সোহাগের মধ্যে কোনও গুপ্ত প্রণয় আছে কি?

হাল। ভাই-বোনের মধ্যে যেমন থাকে, তেমনি আছে।

র। আর কিছু নাই?

হাল। আমি মানুষের চরিত্র কিছু বুঝি; চরিত্র বুঝাই আমাদের পেশা। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, সোহাগের মত মেয়ে সংসারে খুব কম।

র। আর নির্ম্মল বাবু?

হাল। তিনি দেবতা।

র। দেবতাকে ত জেলে দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।

হাল। সেটা আমার অদৃষ্ট।

র। তুমি নিজে যা' করছ, তা'র জন্য অদৃষ্টের দোহাই দিতেছ কেন?

হাল। আমি নিজে কিছু করি নাই; আমাকে লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া অপরে করাইতেছে।

র। কে করাইতেছে?

হাল। কেদারবাবু—আর—আর এক জন ভদ্র লোক।

র। সে কে?

হাল। অমরীশ বাবু।

র। কিসের লোভ তোমায় দেখাইয়াছেন ?

হাল। এক শত টাকা দিবেন বলিয়াছেন।

র। টাকা দিয়াছেন ?

হাল। পঁচিশ টাকা মাত্র দিয়াছেন। বাকী টাকা পরে দিবেন বলিয়াছেন।

র। ভাল, আমি তোমায় পাচ শত টাকা দিব। আমি যাহা বলি, মন দিয়া শুন।

হালদারণীর বুকের ভিতর প্রাণটা যেন লাফাইয়া উঠিল। কোথায় গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন, আর কোথায় পাঁচ শত টাকা। মনোভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।"

রমেশ তখন হালদারণীকে কতকগুলা উপদেশ দিলেন। উপদেশমত কার্য্য করিতে হালদারণী সম্মতা হইল। রমেশ বলিলেন, "আমি এখন তোমায় দুই শত টাকা দিতেছি; কার্য্যশেষে বাকী টাকা দিব। কিন্তু সাবধান, আমার সহিত প্রতারণা করিও না, শঠতা করিলে কেহ তোমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।"

হালদারণী বলিল, "আপনার নাম অনেক দিন হইতে আমার শুনা আছে; আপনার মত লোকের সহিত শঠতা করিবার আমার সাহস নাই, ইচ্ছাও নাই। আপনি বিরূপ হইলে অমরেশ বাবু বা কেদার বাবু কাহারও সাধ্য নাই যে, আমায় রক্ষা করেন। আপনার নিকট অগ্রিম টাকা লইব না,—কার্য্যোদ্ধার হইলে অনুগ্রহ করিয়া যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গ্রহণ করিব।"

এমন সময় রমেশ কামরার গবাক্ষ হইতে দেখিতে পাইলেন, একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বজরা তাহার বজরাকে অতিক্রম করিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে—আকাশও অনেকটা মেঘমুক্ত। চাঁদের আলো গঙ্গাবক্ষ ঈষৎ আলোকিত করিয়াছে। সেই আলোকে বজরা দেখিতে পাইয়া, রমেশ জনৈক দ্বারবানকে আদেশ করিলেন, "হাঁক, কার বজরা।"

দ্বারবান হাকিল। প্রত্যুত্তরে অগ্রগামী বজরার লোক জানাইল,—"বধূগ্রামের জমীদার বাবুর বজরা।"

রমেশ মাঝিদের আদেশ করিলেন, "ঐ বজরা ধর।" মাঝিরা একে একে নিঃশব্দে আসিয়া আপন আপন স্থানে বসিল। তাহাদের উত্তেজিত করিবার মানসে রমেশ বাহিরে আসিয়া নিজে হাল ধরিলেন। নৌকা তীরবেগে ছুটিল। অগ্রগামী বজরার নিকটবর্ত্তী হইয়াও রমেশ তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। এইরূপ ক্ষণকাল দৌড়াদৌড়ির পর, রমেশ সহসা একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। জলের উপর গুরুভারের পতন-শব্দ বলিয়া তাঁহার অনুমান হইল। রমেশ সতর্কনয়নে চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন। সহসা একটা ভাসমান পদার্থ তাঁহার চক্ষু-গোচর হইল। মনুষ্যাবয়ব বলিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না;—গঙ্গাবক্ষে লম্ফপ্রদান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

রমেশ যখন গঙ্গাবক্ষে পড়িলেন, তখন রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। সেই দুই প্রহর রাত্রিকালে বিলি বিশালপুরের ভবনে শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

কক্ষে আর কেহ নাই, বিলি একা। দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছে। দ্বার বন্ধ, কিন্তু অর্গল-বদ্ধ নয়। রেবতী বাহির হইতে দ্বার ভেজাইয়া চলিয়া গিয়াছে; বিলি উঠিয়া আর দ্বার অর্গলবদ্ধ করে নাই; সম্ভবতঃ বিস্মৃত হইয়াছিল, অথবা নিষ্প্রয়োজন বোধে করে নাই। এরূপ প্রায়ই ঘটে, আজও তাহা ঘটিয়াছিল।

একটা কথা বলিয়া রাখি,—হারাণ আবার বিশালপুরে আসিয়াছে—জ্যোৎস্না তাহাকে আনাইয়াছেন। জ্যোৎস্না চান—উইল; হারাণ চায়—বিলি। উভয়ের ভাগ্যে কিছুই মিলিল না। বিলির দর্শনাভিলাষে হারাণ শিকারলুব্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু কোথাও বিলির সাক্ষাৎ পাইত না। বিলি আর শয়নকক্ষ ত্যাগ করে না, সুতরাং হারাণ দেখাও পায় না। দেখা না পাইয়া হারাণ আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গভীর রাত্রি—সকলেই সুপ্ত; কেবল বিলির নিদ্রা নাই। মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা আসিতেছিল। আবার তখনই তাহা ভয়াবহ স্বপ্ন-দর্শনে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। বিলি একবার স্বপ্ন দেখিল, যেন সে নির্ম্মলের সঙ্গে পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, আকাশের উপর ফুলহার গলায় পরিয়া ফুলময় আকাশের মধ্যে প্রফুল্লমনে ভ্রমণ করিতেছিল। এমন সময় নির্ম্মল বলিলেন, "বিলি, তোমায় নীচে ফেলিয়া দিই।" বিলি নিম্নে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, উত্তালতরঙ্গময় সীমাহীন বারিধি। বলিল, "ফেলিয়া দাও ক্ষতি নাই, কিন্তু

আমায় তোমার কাছ-ছাড়া করিও না।" নির্ম্মল বলিলেন, "এস, তবে দুই জনেই ঝাঁপাইয়া পড়ি।

দুই জনেই পড়িলেন।

বিলির নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, পদতলে কে এক জন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিলির ভ্রম হইল,—তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই।

বিলি বলিল, "তুমি কি আমার স্বামী? কেন এত দূর হইতে পড়িলে? আমার যে অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে।"

যে দাঁড়াইয়াছিল, সে হারাণ। বলিল, "আমি তোমার স্বামী নই। যে নির্ম্মল তোমার মত রমণীরত্নকে পদতলে দলিত করে—তোমাকে উপেক্ষা করিয়া অন্য রমণীতে আসক্ত হইতে পারে, সে নির্ম্মল হইবার আমার সাধ নাই।"

বিলি পালঙ্কোপরি উঠিয়া বসিল, চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল; কক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল, তদালোকে হারাণকে স্পষ্ট চিনিল। চিনিবামাত্র ঘৃণায়, রাগে তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তুমি—এখানে কেন?"

হারাণ বলিল, "দেবী-দর্শনে আসিয়াছি।"

বিলি। এখান হ'তে দূর হও।

হা। দূর হ'তে আসি নি, তোমাকে দেখতে এসেছি।

বিলি। অপমানের ভয় নাই কি?

হা। অপমানের ভয়? কাকে অপমানের ভয় দেখাইতেছ? যদি মরিতে হয়, তবু এ স্থান হইতে নড়িব না। তোমাকে একটিবার দেখিবার আশায় এই কয় দিন উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইয়াছি; মানাপমান, হিতাহিতজ্ঞান আমার লোপ পাইয়াছে। তুমি আমায় বৃথা ভয় দেখাইতেছ।

বিলি পালঙ্ক ছাড়িয়া হর্ম্ম্যতলে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, কক্ষদ্বার ভিতর হইতে অর্গল-বদ্ধ। চীৎকার করিলে সাহায্য পাইবার আশা খুব কম। যদি কোনও মতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে নয়। বিলি সরিয়া আলমারীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আলমারীতে গোলাপজল, সোডাওয়াটার প্রভৃতির কয়েকটা বোতল ছিল। তাহারই একটা হাতে লইয়া বলিল, "এক পা অগ্রসর হইলে তোমার মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে।"

হারাণ বলিল, "পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমি এক্ষণে জ্ঞানহীন উন্মাদ। মৃত্যু ত তুচ্ছ, যদি অনন্তকাল নরকে বাস করিতে হয়, সেও ভাল—তবু পিছাইব না।"

হারাণ এক পা অগ্রসর হইল। বিলি চীৎকার করিয়া বলিল, "সাবধান, আত্মরক্ষার্থ আমি সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত।"

হারাণ বলিল, "মার—না হয় তোমারই হাতে মরিব—কিন্তু পিছাইব না। আজ আমার সাধ মিটাইব।"

হারাণ আবার একটু অগ্রসর হইল। বিলি বসন সংযত করিয়া পরিয়া বোতলের মুখ দৃঢ়হস্তে ধরিল। বলিল, "আমার উপায়ান্তর নাই; ভগবান্, আমায় ক্ষমা কর।"

হারাণ আবার অগ্রসর হইল। যখন অতি সন্নিকটে আসিয়া বিলির হস্ত ধরিবার উপক্রম করিল, তখন বিলি সেই কর-ধৃত বোতল সজোরে হারাণের ললাটে মারিল। বোতল চূর্ণ হইয়া গেল, —হারাণ কাঁপিতে কাঁপিতে ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

বিলি দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। মাকে উঠাইয়া সকল কথা বলিল। মা ভীত হইয়া দেওয়ানকে ডাকাইলেন। দেওয়ান আসিল—জ্যোৎস্না আসিল—রেবতী আসিল—একে একে বাড়ীর সকলেই আসিল।

হারাণ যেখানে পড়িয়াছিল, সেইখানেই রহিল; তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল না। দেওয়ানের যত্নে সে সত্বর সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু ললাটের স্থানে স্থানে তখনও রক্ত ছুটিতেছিল। তাহার সেই রুধিরাপ্লুত দেহ দেখিয়া জ্যোৎস্নার ক্রোধোদয় হইল। তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় তারস্বরে বলিলেন, "এমন কলঙ্কিনীও এ বাড়ীতে ঢুকেছিল।"

কথাটা সকলেই শুনিল। কিন্তু বিলি শুনে নাই। সে তখন মায়ের ঘরে বসিয়াছিল। কথাটা সে শুনে নাই বটে, কিন্তু জনৈকা শুভানুধ্যায়িনী দাসী কথাটা তাহাকে শুনাইয়া গেল। জ্যোৎস্নার তীব্রোক্তি বিলির মর্ম্ম স্পর্শ করিল। ঘৃণায় লজ্জায় অভিভূত হইয়া সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে মনঃস্থ করিল; এবং দেওয়ানকে ডাকাইয়া নৌকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিল।

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথায় যাবে?"

বিলি। বধূগ্রামে যাব।

দেও। তুমি চলিয়া গেলে মনিবের কাছে কি জবাব দিব?

বিলি। দাদা আসিলে বলিবেন, এত দিনে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল; আমি এক্ষণে বধূ-গ্রামে চলিলাম।

দেও। মা, এ ক্ষেত্রে অপরাধী আমি। আমারই অসাবধানতায় এমনটা হইল। এখানে আসিয়া তোমায় দেখিতে না পাইলে যখন আমার প্রভু ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিবেন, তখন মা, কি বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইব—কেমন করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব?

বিলি। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা মাকে বলিয়া চলিলাম। মা তাঁহাকে বুঝাইবেন।

দেওয়ান অনেক বুঝাইল, কিন্তু বিলি কিছুতেই থাকিতে সম্মতা হইল না। তখন দেওয়ান একখানা পানসী আনিয়া যোগাইল। মাঝি-মাল্লা রমেশের বেতনভোগী ভৃত্য—ডাকিবামাত্র তাহারা আসিল। বিলি তখন নৌকায় উঠিল। সঙ্গে রেবতী ও এক জন দ্বারবান্ চলিল। যখন নৌকা ছাড়িল, তখন সূর্য্যোদয়ের বড় বিলম্ব নাই।

এক ঘণ্টা পরে পান্‌সীর অনুসরণ করিয়া একখানি নৌকা বিশালপুর হইতে ছাড়িল। এই নৌকার আরোহী হারাণ।

দশম পরিচ্ছেদ

মোকর্দ্দমার ফলাফল সম্বন্ধে নির্ম্মল সম্পূর্ণ উদাসী। তিনি ভগবান্ বা মানুষের কাছে কোনও অপরাধ করেন নাই, তবে কেন তিনি চিন্তিত হইবেন?

আগামী কল্য কাটোয়াতে তাঁহার বিচার। আজ রাত্রিতে নির্ম্মল সবান্ধবে নৌকারোহণে যাত্রা করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। চারি পাঁচখানা নৌকা ভাড়া করা হইয়াছে। নির্ম্মল একখানি ছোট বজরায় সোহাগকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। অপর লোকেরা নৌকায় যাইবে। নৌকা প্রস্তুত; আত্মীয়-স্বজনেরা গমনোদ্যোগী; কিন্তু কেহই যাইতে পারিতেছেন না; কারণ, নির্ম্মল তখনও বহির্ব্বাটীতে আইসেন নাই।

অবশেষে বিলম্ব দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ নায়েব অন্দরে আসিয়া কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইল। সে আসিয়া দেখিল, নির্ম্মল মায়ের কক্ষসন্নিকটে নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। নায়েব বলিল, "আসুন,—রাত্রি অনেক হইল। বাহিরে সকলে অপেক্ষা করিতেছেন।"

নির্ম্মল। তোমরা অগ্রসর হও—আমি পিছনে যাইব।

নায়েব। কেন?

নির্ম্মল। মার অনুমতি না লইয়া যাইতে পারিব না।

নায়েব। তিনি কোথায়?

নির্ম্মল। তা জানি না। আমাকে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া কোথায় গিয়াছেন।

নায়েব। আমি তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।

নায়েব চলিয়া গেল। অন্তঃপুরস্থ সকল ঘর, সকল স্থান পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল; অবশেষে দেবী-মন্দিরে অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ মিলিল। নায়েব কিছু না বলিয়া সদরে চলিয়া গেল; এবং লোকজন লইয়া কাটোয়াভিমুখে যাত্রা করিল।

কিছুকাল পরে অন্নপূর্ণা ভগবতীর অর্ঘ্য লইয়া নির্ম্মলের সমীপস্থ হইলেন। নির্ম্মল অর্ঘ্য গ্রহণ না করিয়া মায়ের চরণধূলি মাথায় লইলেন। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "বাবা, দেবী অনুকূল, তাঁহার প্রসাদী ফুল গ্রহণ কর,—ত্রিভুবন প্রতিকূল হইলেও তোমার ভয় নাই।"

নির্ম্মল ফুল লইলেন বটে, কিন্তু তখনই তাহা মায়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা, আমি হিন্দু হইয়াও দেবদেবী চিনি না; চিনি কেবল তোমাকে। তুমি আমার ভগবতী; তোমার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়াছি, আবার কি চাই, মা?"

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "ছি,বাবা, অমন কথা বলিতে নাই; আগে দেবীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।"

নির্ম্মল তখন মাথা পাতিয়া ফুল-বিল্বপত্র গ্রহণ করিলেন। সোহাগ অন্য কক্ষে ছিল, সে আসিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন, "সোহাগ, তোমার দাদার সঙ্গে গিয়া বজরায় উঠ।"

সোহাগ বলিল,"কোথায় যেতে হবে জ্যেঠাই-মা?"

অন্ন। কাটোয়াতে।

সো। সেখানে কি কর্‌তে যাব?

অন্ন। তুমি যে সাক্ষী। আর দেরী করিও না—নৌকায় উঠ।

সঙ্গে এক জন দাসী চলিল। নির্ম্মল সোহাগ ও দাসীকে লইয়া বজরায় উঠিলেন।

সোহাগ বজরায় আসিয়া দেখিল, একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কক্ষে তাহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বজরাখানি ক্ষুদ্র, একটি বই তাহাতে শয়নোপযোগী দ্বিতীয় কামরা নাই। যে বজরায় উঠিয়া নির্ম্মল বিলির সঙ্গে

গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতেন,সে বজরাখানি অপেক্ষাকৃত বড়ঃ কিন্তু নির্ম্মল এক্ষণে তাহা ব্যবহার করেন না।

মাঝিরা বজরা ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আনন্দপুরের ঘাট ছাড়াইয়া দক্ষিণাভিমুখে বজরা ছুটিল।

কামরার ভিতর সোহাগকে রাখিয়া নির্ম্মল ছাদে আসিয়া বসিলেন। তথায় একটা শয্যা ছিল। নির্ম্মল শয্যায় শুইয়া আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একটি একটি করিয়া নক্ষত্র আকাশমধ্যে লুকাইল—বুঝি বা আঁধারে পথ দেখিতে পাইবে না আশঙ্কা করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। নিবিড় হইতে নিবিড়তর মেঘে আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল—তবু নির্ম্মল উঠিলেন না। ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। নির্ম্মল সেই বৃষ্টির মধ্যে ছাদের উপর একাকী রহিলেন।

সোহাগ তখনও ঘুমায় নাই। দাসীর সহিত তাহার অনেক কথা হইতেছিল। সোহাগ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "হ্যাগা, দাদা আমায় কেন কাটোয়া নিয়ে যাচ্ছেন?"

দাসী। জান না? তুমি যে সাক্ষী?

সো। আমি কিসের সাক্ষী?

দা। ও মা, আমি কোথায় যাব। সাক্ষী আবার কিসের হয়? তুমি মকরধামার সাক্ষী।

সো। আমাকে কাহারও কাছে যেতে হবে নাকি?

দা। যেতে হবে না? সাহেবের কাছে যেতে হবে। কত হাকিম থাকবে—তাদের কাছে দাঁড়িয়ে তোমায় সব কথা বলতে হবে।

সো। কি বলতে হবে?

দা। তা'ও আবার ব'লে দিতে হ'বে?

সো। আমি যে কিছু জানি না।

দা। তবে শোন ;—কেমন ক'রে তোমায় হালদারণী ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল—কেমন ক'রে হালদারণী তোমায় বেঁধেছিল—কেমন ক'রে কিঙ্কর হতভাগা তোমায় বেইজ্জত করেছিল—কেমন ক'রে দাদাবাবু গিয়ে তোমায় রক্ষা করলেন, সব কথা সেখানে গিয়ে খুলে বলতে হবে।

সো। আমি যে তা' বলতে পারব না, গা।

দা। না পারলে চলবে না—পেটে আঁকুশি দিয়ে কথা বার ক'রে নেবে। শুধু কি তাই? কিঙ্করের সঙ্গে তোমার আশনাই আছে কি না—দাদাবাবুর সঙ্গে তোমার ভাব আছে কি না, এই রকম কত কথা তোমায় জিজ্ঞেস করবে।

সোহাগের মুখ শুকাইয়া গেল। বিচারালয়ে সর্ব্বজনসমক্ষে এমন জঘন্য কথার উত্তর দিতে হইবে শুনিয়া সে মরমে মরিয়া গেল। সে ভাবিয়া স্থির করিল, "আমায় কাটিয়া ফেলিলেও আমি সাক্ষী হইয়া আদালতে দাঁড়াইতে পারিব না।" ক্ষণপরে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি কোনও কথার উত্তর না দিই?"

দাসী বলিল, "উত্তর না দিলে আর রক্ষা আছে? তোমায় উলঙ্গ ক'রে জল্লাদে বেত লাগাবে।"

সোহাগ অন্ধকার দেখিল। ভাবিয়া কিছুই কিনারা পাইল না। এমন সময় বসুন্ধরা প্লাবিত করিয়া বৃষ্টি আসিল। সোহাগ জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা কোথায়?"

দাসী বলিল, "তিনি বুঝি ছাদের উপর।"

শুনিবামাত্র সোহাগ ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিল; ডাকিল, "দাদা!" প্রভঞ্জন-হুঙ্কারে সে ক্ষীণ কণ্ঠের ডাক কোথায় ডুবিয়া গেল। বার বার ডাকিয়াও যখন উত্তর পাইল না, তখন ছাদে আসিয়া নির্ম্মলকে ডাকিল। নির্ম্মল কামরার ভিতর আসিয়া বলিলেন, "কেন সোহাগ, আমার জন্য খামকা বৃষ্টিতে ভিজিলে?"

সোহাগ বলিল, "খামকা ভিজিলাম! তুমি কি রকম ভিজেছ, তা' বুঝি জানিতে পারিতেছ না?"

সোহাগ শুষ্কবস্ত্র দিয়া নির্ম্মলের গা মাথা মুছাইয়া দিল, শুষ্কবস্ত্র পরিতে দিল। পরে নির্ম্মলকে পালঙ্কের উপর বসাইয়া নিজে কক্ষতলে বসিল—পদ্মদলতুল্য ক্ষুদ্র হস্তমধ্যে নির্ম্মলের পদযুগল লইয়া মর্দ্দনে উত্তাপ সৃষ্টি করিতে লাগিল।

নির্ম্মল বলিলেন, "কেন, সোহাগ, তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করিতেছ? তুমি নিদ্রা যাও—আমি উপরে যাই।"

সো। তোমাকে আমি আর উপরে যেতে দিব না।

নি। বৃষ্টি থামিয়াছে—ওই দেখ, চাঁদ আবার দেখা দিয়াছে, ত্রিপল খাটাইয়া উপরে আমি বেশ থাকিতে পারিব।

সো। যদি কাহারও বাহিরে যাইতে হয়, তা হ'লে আমি যাব। কেন, দাদা, তুমি আমার জন্য এতটা কষ্ট পাইতেছ?

নি। আমার আবার কষ্ট! সে কথা যাক্। এখন তুমি একটু ঘুমাও, নইলে কাল দাঁড়াতে পারবে না।

সো। হ্যাঁ দাদা, হাকিমের কাছে দাঁড়িয়ে কাল নাকি আমাকে সাক্ষী দিতে হবে ?

নি। সাক্ষী দিতেই ত কাটোয়া যাওয়া।

সো। সত্য মিথ্যা যা' জিজ্ঞাসা করিবে, তারই কি উত্তর দিতে হবে ?

নি। নিশ্চয়।

সো। যদি না বলি ?

নি। তা হ'লে জেলে দেবে—জরিমানা করবে—বাড়ী ঘরদ্বার নীলাম ক'রে টাকা আদায় করবে; কি করবে না করবে, তা হাকিমই জানেন।

সো। যদি না যাই ?

নি। ধ'রে নিয়ে যাবে।

সো। যদি ম'রে যাই ?

নি। তবে ত সব চুকেই গেল।

সোহাগ চুপ করিল। ভাবিল, "জেলে যেতে পারি; কিন্তু পৈতৃক ভদ্রাসন নীলামে উঠাইতে দিতে পারি না; প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু সে সব নোংরা কথা আদালতে দাঁড়িয়ে বলিতে পারি না। দাদার সাম্‌নে যখন সে সব জঘন্য কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তখন—ছিঃ ছিঃ—আমি তা পারব না—কোনও মতেই না।"

ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তুমি সেখানে থাক্‌বে ?"

নির্ম্মল বলিলেন, "কোথায় ? বিচারালয়ে ? থাক্‌ব বৈ কি, আমি যে আসামী।"

এমন সময় দূর হইতে কে হাঁকিল,"কা'র বজরা ?"

নির্ম্মলের দ্বারবান্ উত্তর দিল,"বধূগ্রামের জমীদার বাবুর বজরা।"

নির্ম্মল গবাক্ষপথে জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, একখানা বড় বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। রমেশের বজরা বলিয়া নির্ম্মলের একটু সন্দেহ হইল—দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তিনি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন। বস্তুতই সেখানা রমেশের বজরা।

রমেশকে আসিতে দেখিয়া নির্ম্মল বড়ই বিরক্ত হইলেন। কাটোয়াতে কি অভিপ্রায়ে রমেশ আসিতেছেন, তাহা নির্ম্মলের জানিতে বাকি নাই। রমেশের নিকট সাহায্য লওয়া নির্ম্মলের অভিপ্রেত নহে; এমন কি, তাঁহার সাহায্যে মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা নির্ম্মল জেলে যাওয়া শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন। নির্ম্মল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, পথে কিংবা কাটোয়াতে রমেশের সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করিবেন না। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া নির্ম্মল বাহিরে আসিলেন। একবার চারিদিক্ দেখিয়া লইয়া নির্ম্মল মাঝিদের আদেশ করিলেন, "পিছনে একখানা বজরা আমাদের ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। যদি ধরিতে পারে, তোমাদের বরখাস্ত করিব—না পারে, বখ্‌শিস্ দিব।"

মাঝিরা সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিল।

এ দিকে কামরার ভিতর থাকিয়া সোহাগ বুঝিল, বাহিরে কি একটা গোল বাধিয়াছে। কি যে, তাহা সে বুঝিল না। বুঝিবার ইচ্ছাও নাই। সে তখন অকূল চিন্তাসাগরে নিমগ্না। সে ভাবিতেছিল, "যদি আদালতে হাজির না হই, তা হ'লে পুলিসে টেনে নিয়ে যাবে। যদি হাজির হয়ে কোনও কথা না বলি তা হ'লে আমায় জেলে দিয়ে ইজ্জত মারবে—পৈত্রিক ভদ্রাসন বেচে জরিমানা আদায় কর্‌বে। আদালতে সকলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সত্য-মিথ্যা কতগুলা কুৎসিত কথার উত্তর যদি দিতে পারি, তবেই ত আমার নিস্তার; কিন্তু তা' ত আমি পার্‌বনা—জীবন থাকতে নয়। তবে উপায় ?"

সোহাগ আবার চিন্তামগ্ন হইল। ক্ষণপরে দৃঢ়সংকল্পে বুক বাঁধিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছাদে উঠিল। সেখানে দেখিল, নির্ম্মল নাই। ফিরিয়া নীচে আসিল। আবার কি ভাবিয়া তখনই উপরে উঠিল। তার পর আকাশের পানে চাহিয়া নীরবে গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পতনশব্দে নির্ম্মল চমকিত হইয়া বলিলেন, "কি পড়িল ?" কি পড়িল, তাহা প্রথমে কেহ বুঝিতে পারিল না। এক জন মাঝি বলিল, "যেন একটা মানুষ ব'লে ঠাওর হ'ল।" মানুষ কে পড়িল ? মাঝি, দ্বারবান গণনা করা হইল—তাহারা কেহ পড়ে নাই। নির্ম্মল কামরার ভিতর ছুটিয়া আসিলেন। তথায় দেখিলেন, দাসী কক্ষতলে ঘুমাইতেছে, সোহাগ সেখানে নাই। সোহাগ কোথায় গেল ? নির্ম্মল ছুটিয়া আবার উপরে আসিলেন। সেখানেও সোহাগ নাই। পাতি পাতি করিয়া সোহাগের অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইলেন না। তখন নির্ম্মল বজরা ফিরাইতে আদেশ করিলেন।

যখন বজরা ফিরিল, তখন যেখানে সোহাগ পড়িয়াছিল, সেখান হইতে বজরা অনেক দূরে আসিয়াছে।

স্রোতের প্রতিকূলে উত্তরদিকে বজরা ফিরিল। বাতাসও অনুকূল নয়। সুতরাং বজরা বড় একটা অগ্রসর হইতে পারিল না। তদ্দৃষ্টে নির্ম্মল ছোট পান্‌সী খুলিয়া তাহাতে উঠিলেন। উপযুক্ত আলো ও দুই জন বলিষ্ঠ মাঝি লইয়া নির্ম্মল পান্‌সী ছাড়িয়া দিলেন। পান্‌সী ছুটিল। আলোর সাহায্যে চারিদিকে অনুসন্ধান চলিল; কিন্তু কোথাও সোহাগের দেহ পাওয়া গেল না। অবশেষে হতাশ ও ক্লান্ত হইয়া রাত্রিশেষে নির্ম্মলকুমার বিষণ্নমনে কাটোয়া অভিমুখে ফিরিলেন।

নির্ম্মল ফিরিলেন বটে, কিন্তু সোহাগ কোথায় গেল? সোহাগ জলে পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। পিছনে রমেশের বজরা আসিতেছিল। স্রোত ও বায়ু খুব প্রবল; বজরা পক্ষিণীর ন্যায় ছুটিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছিল। সোহাগের দেহও স্রোতে দক্ষিণদিকে ভাসিয়া যাইতেছিল। তবে বজরার গতি এত দ্রুত যে, প্রবাহতাড়িত দেহ সত্বর অতিক্রম করিয়া বজরা চলিয়া গেল। অতিক্রমকালে রমেশ সেই ভাসমান দেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমেশ হালে ছিলেন, এবং সেখান হইতে লাফাইয়া গঙ্গায় পড়িয়াছিলেন। রমেশকে অকস্মাৎ গঙ্গাগর্ভে পড়িতে দেখিয়া মাঝিরা পাল নামাইয়া বজরা থামাইল, এবং ক্ষুদ্র পান্‌সীতে উঠিয়া কয়েক জন তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

অনুসন্ধান বড় একটা করিতে হইল না,—সত্বরই রমেশের সাক্ষাৎ মিলিল। রমেশ তখন সোহাগের দেহ বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছিলেন। অতঃপর মাঝিদের সাহায্যে রমেশ সোহাগকে লইয়া বজরায় উঠিলেন।

সোহাগ চৈতন্যশূন্যা; কিন্তু মৃতা নয়। সে সাঁতার জানিত—ডুবিবার ইচ্ছা করিয়াও সহজে সে ডুবিতে পারে নাই। তবে পেটে অনেকটা জল গিয়াছিল—তজ্জন্য নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। উদর হইতে জল কেমন করিয়া বাহির করিতে হয়, রমেশ তাহা বেশ জানিতেন। তৎপরে কিরূপে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সৃষ্টি করিতে হয়, তাহাও রমেশ অবগত ছিলেন। সোহাগের মৃণালতুল্য ভুজবল্লী নিজ হস্তমধ্যে গ্রহণ করিতে রমেশ একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না; সেই ভ্রমর-গুঞ্জিত, পদ্মরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধরমধ্যে ফুৎকার দিতে ইন্দ্রিয়জয়ী রমেশ একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচবোধ করিলেন না। ওষ্ঠে ওষ্ঠ—করে কর—বক্ষ বক্ষের সন্নিকটস্থ, তবু রমেশের চিত্তবিকার নাই। বিস্রস্তবসনা, আলুলায়িত-কুন্তলা, পরমলাবণ্যময়ী বালিকা রমেশের অঙ্কোপরি—তবু রমেশের হৃদয়ে বিকার নাই। যেন একটি পাষাণ-গঠিত মূর্ত্তি কোনও প্রাণহীনা পাষাণ-প্রতিমার শুশ্রূষা করিতেছে।

অল্প আয়াসে সোহাগের চৈতন্যসঞ্চার হইল,—সোহাগ নয়ন-উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারিদিকে অপরিচিত পুরুষ। কিন্তু রমেশের পানে নয়ন পড়িবামাত্র সোহাগ তাঁহাকে চিনিল। তিনি একবার পুষ্করিণীঘাটে সোহাগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সোহাগ ভাবিল, সম্ভবতঃ এবারও তিনি রক্ষা করিয়া থাকিবেন। তা' রক্ষা করিলে কি হইবে? এবার সোহাগ নিশ্চয় মরিবে—কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

রমেশের অনুরোধে সোহাগ বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিল—একটু উষ্ণ দুগ্ধও পান করিল। কিন্তু কিছুতেই মনে শান্তি পাইল না। যে আত্মনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তার আবার শান্তি?

হান্দারণী, সোহাগকে দেখে নাই। সে নীচের একটা ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে ছিল। বজরাখানি বড়; উপরে বড় বড় দু' তিনটি কামরা। একটি রমেশের শয়নকক্ষ; দ্বিতীয়টি স্ত্রী, অথবা প্রয়োজন হইলে বন্ধুবান্ধবের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইত। নীচে কয়েকটি ক্ষুদ্র কামরা। কোনটায় রন্ধন হইত, কোনটায় ভাণ্ডার থাকিত, কোনটায় বা আসবাবাদি রক্ষিত হইত।

যে কক্ষটি রমেশের স্ত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই কক্ষমধ্যেই সোহাগকে রক্ষা করা হইয়াছিল। ঘরের মহামূল্য আসবাব দেখিয়া সোহাগ বিস্মিত হইল। মেহগ্নি-কাষ্ঠের মনোহর পালঙ্ক, তাহাতে নেটের মশারি বিলম্বিত। উপরে সাটিনের চন্দ্রাতপ, হর্ম্ম্যতলে কার্পেট বিস্তৃত, ভিত্তিগাত্রে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র, গৃহকোণে পিয়ানো। আলমারীতে চা খাইবার রৌপ্যময় সরঞ্জাম, গবাক্ষপার্শ্বে মখমল-মণ্ডিত সোফা। সোহাগ সেই সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে কুসুম-দলবৎ কোমল শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছে।

সোহাগকে বস্ত্রাদি দিয়া রমেশ স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। কক্ষমধ্যে কোনও ভৃত্য বা মাঝির আসিবার অনুমতি নাই। সুতরাং সোহাগ একা—আপন জ্বালাময়ী চিন্তারাশি লইয়া একা।

রমেশ তখন ছাদের উপর পাদচালনা করিতেছিলেন। বজরা আবার স্রোতে দক্ষিণাভিমুখে

ছুটিয়াছে। রমেশ চারিদিকে নয়ন ফিরাইয়া নির্ম্মলের বজরার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেই অস্পষ্টালোকে দূরের পদার্থ নয়নগোচর হইল না। দেখিতে দেখিতে বাতাস পাড়িয়া গেল—বজরা তখন মৃদুমন্দগতিতে চলিতে লাগিল। অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রমেশ ছাদে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

এ বালিকা যে সোহাগ, তাহা দুইটি কারণে রমেশ স্থির করিয়াছেন। প্রথম কারণ, এ বালিকাকে রমেশ আনন্দপুরে দেখিয়াছেন; এবং যেখানে সোহাগদের বাড়ী হওয়া উচিত, তাহারই নিকটবর্ত্তী কোনও পুষ্করিণীতে তাহাকে দেখিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ—বালিকা নির্ম্মলের নৌকায় ছিল। যদি এ বালিকা সোহাগ না হইবে, তবে নির্ম্মলের সঙ্গে কেন কাটোয়া যাইতেছিল? অতএব এ বালিকা নিঃসন্দেহ সোহাগ।

রমেশ ভাবিতেছিলেন, "স্বীকার করিলাম, এ বালিকা সোহাগ। কিন্তু গঙ্গাজলে পড়িল কেন? কেহ কি ফেলিয়া দিয়াছে? না আত্মহত্যা-প্রয়াস? অথবা দৈব দুর্ঘটনা? কেহ যে ফেলিয়া দিয়াছে, তাহা সম্ভব নয়। নিরপরাধা দরিদ্রকন্যাকে হত্যা করিয়া কাহার লাভ? বিশেষতঃ, যে তাহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করে, সেই তাহার বক্ষকস্বরূপ তখন বজরায় ছিল। দৈব দুর্ঘটনাও সম্ভব নয়—কেন না, বালিকা শান্ত, ধীর। গভীর নিশীথে কেনই বা সে কক্ষ ছাড়িয়া বাহিরে আসিবে? তবে কি আত্মহত্যা? আত্মনাশের প্রয়াস কেন?"

রমেশ আবার চিন্তামগ্ন হইলেন। যে রমেশের চিন্তার কেন্দ্রস্থল, সে ক্ষণপরে ঘর ছাড়িয়া ডেকের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য—আত্মনাশ। ডেকের উপর মাঝিরা কেহ কেহ বসিয়াছিল; তাহাদের দেখিয়া সোহাগ সেখানে আর দাঁড়াইল না;—ধীরে ধীরে সিঁড়ি বহিয়া ছাদে উঠিল।

ছাদে আসিয়া দেখিল, তথায় রমেশ। তখন সোহাগ অপ্রতিভ হইয়া পলাইবার উপক্রম করিল।

রমেশ বলিলেন, "ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? আমি না হয় নীচে যাইতেছি।"

সোহাগ নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া রমেশ বলিলেন, "কিন্তু আপনাকে আমি চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিব না।"

সোহাগ একবার রমেশের মুখপানে নয়ন তুলিয়া চাহিল। পরমুহূর্ত্তেই চক্ষু নামাইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

র। যে আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প, তাহাকে নয়নান্তরাল করিতে পারি না।

সোহাগ উত্তর করিতে পারিল না। মিথ্যা বলা তাহার স্বভাব নয়। অতএব নিরুত্তর রহিল।

রমেশ বুঝিলেন, তাঁহার অনুমান যথার্থ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু আত্মনাশের চেষ্টা কেন?"

উত্তর দিতে সোহাগের বাধ-বাধ ঠেকিল। নির্লজ্জ হইয়া অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা কহা সোহাগের অভ্যাস নাই; সুতরাং লজ্জা আসিয়া কণ্ঠরোধ করিল। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ভাবিল, "যে সহস্র লোকের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কুৎসিত প্রশ্নের উত্তর দিতে চলিয়াছে, তা'র আবার লজ্জা? বিশেষতঃ যিনি দেব-ভাবাপন্ন, আমার জীবনদাতা, তাঁর সাম্‌নে লজ্জা আসিলেও আসিতে দিব না।"

এইরূপ মনের উপর জোর করিয়া সোহাগ বলিল, "আমি যে আত্মনাশে কৃতসঙ্কল্প, তাহা আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?"

র। ঘটনা দেখিয়া বুঝিয়াছি।

সো। আপনি আমার জীবনদাতা—আপনার নিকট আমার আর লজ্জা নাই। আর যে মরিতে বসিয়াছে, তার আবার লজ্জা কি? আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, আমাকে আপনি বাঁচাইলেন কেন?

র। যে কারণে আপনি আত্মনাশে উদ্যত, সে কারণ তিরোহিত হইলে এ অনুযোগ থাকিবে কি?

সো। সে কারণ দূর করা মানুষের সাধ্য নয়।

র। যদি আমি পারি?

সো। তবে আপনি দেবতা।

র। আমি দেবতা হ'তে চাই না।

সো। তবে?

র। আপনি সুখী হউন, ইহাই আমার কামনা।

সোহাগ নিরুত্তর রহিল। একটা বিদ্যুৎ তাহার দেহমধ্যে খেলিয়া গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে স্থির?"

সো। কি স্থির?

র। আত্মহত্যার বাসনা পরিত্যাগ করা স্থির?

সো। আপনি জানেন কি, কেন আমি আত্মহত্যা-প্রয়াসী? কারণ অবগত না হইলে আপনি কিরূপে তাহা দূর করিবেন?

র। আদালতে দাঁড়াইয়া কুৎসিত অভিযোগে সাক্ষ্য দিতে আপনার অনিচ্ছা। মুক্তির উপায় নাই দেখিয়া জীবন-বিসর্জ্জনের প্রয়াস। কেমন, নয় কি?

সো। আপনি কি দেবতা?

রমেশ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি সামান্য মানুষ মাত্র।"

সো। যে কথা আমি ছাড়া জগতের কেহ জানে না, তাহা আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?

র। ঘটনার অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছি। তা' ছাড়া আপনার মুখ দেখিলেই সকল কথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সোহাগের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল। সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে দাদার কাছে পৌছাইয়া দিন।"

র। আপনার দাদা কে, তাহা ত আমি জানি না।

সো। বধূগ্রামের জমীদার—নির্ম্মলকুমার।

র। ওঃ! তিনি!

সো। তাঁকে চিনেন না?

র। অত বড় জমীদারকে আবার চিনি না!

সো। তবে তাঁর কাছে আমায় রেখে আসুন।

র। তা' পারিব না।

সো। কেন?

র। তিনি কোথায়, তা' আমি জানি না।

সো। তবে আমার গতি কি হইবে?

র। আপনি এ বজরায় থাকিবেন—জনপ্রাণী আপনার কক্ষে প্রবেশ করিবে না।

সো। তার পর?

র। ফিরিয়া যাইবার সময় আপনাকে আনন্দপুরে রাখিয়া যাইব।

সো। আপনি এক্ষণে কোথায় যাইতেছেন?

র। কাটোয়া।

সো। কেন?

র। পরে জানিবেন।

সো। আমায় সাক্ষ্য দিতে হইবে না?

র। না।

সো। বজরা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইবে না?

র। না।

সো। বেশ, আমি দেবতার উপর সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাটোয়ার ঘাটে পৌছিতে রমেশের রাত্রি প্রভাত হইল। পৌছিয়া তাঁহার পরিচিত জনৈক উকীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উকীলের নাম শরচ্চন্দ্র। তিনি আসিলে রমেশ তাহাকে সবিশেষ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। তার পর যখন আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইল, তখন চান্দারাণীকে শিবিকারোহণে বিচারালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে দুই জন বিশ্বাসী দ্বারবান্ চলিল। রমেশ নিজে বজরা ত্যাগ করিলেন না।

অনেকেই অবগত আছেন যে, গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে কাটোয়া অবস্থিত। কাটোয়ার উত্তরে অজয়, পূর্ব্বে গঙ্গা। আদালত-গৃহ হইতে অজয় সন্নিকটবর্ত্তী—গঙ্গা একটু দূরে। নির্ম্মল প্রভৃতি সকলের বজরা অজয়মধ্যে নীত হইল; কিন্তু রমেশের বজরা গঙ্গার উপর রহিল। নির্ম্মল চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া রমেশের বজরা অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

বেলা এগারটা বাজিল। উকীল, মোক্তার, পুলিস আসিয়া আদালত গুল্জার করিল। দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সেই জনতার মধ্যে কেদার জ্যেঠা, হরিকিঙ্কর প্রভৃতি অনেক সাক্ষী ছিল। আসামীও হাজির। কিন্তু বাদিনীকে কেহ দেখিতে পাইল না। জ্যেঠা তজ্জন্য সবিশেষ চিন্তিত। কিঙ্কর পিতাকে বুঝাইয়া বলিতেছিল, "সে জন্য ভাবনা কি, বাবা! আজ হাজির না হ'লেও আর এক দিন তা'কে হাজির হ'তে হবে। ইংরাজের মুলুকে সে পালাবে কোথায়?"

কেদার জ্যেঠা বলিলেন, তুমি ছেলেমানুষ, সকল কথা ঠিক বুঝিতেছ না। আজ যদি সে হাজির না হয়, তা হ'লে মোকর্দ্দমা খারিজ হয়ে যাবে।"

কিঙ্কর। আচ্ছা, সে কোথায় গেল বাবা?

জ্যেঠা। আমার ভয় হচ্ছে, নির্ম্মল তা'কে সরিয়েছে।

কি। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছিল, এর মধ্যে তা'কে কখন্ সরালে?

জ্যে। বুঝ্‌তে হবে, সন্ধ্যার পর সরিয়েছে।

কি। ম'রে যায়নি ত?

জ্যে। মরবে কেন? মরবার আর সময় পেলে না, মোকদ্দমার ঠিক আগের দিন ম'রে গেল?

কি। তা বই কি! যদি মরতেই হয়, না হয় এজাহার দিয়েই মরুক।

এমন সময় হাকিম আসিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন। সকলে সেই দিকে ছুটিল।

হাকিম এক জন প্রবীণ বাঙ্গালী। সুবিচার করিতে তিনি কাহারও খাতির করিতেন না বা ডরাইতেন না। সকল সময়ে আইনের মর্য্যাদা রক্ষা

না করিয়া তিনি মোড়লী ধরণে বিচার করিতেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় তেমন পারদর্শী ছিলেন না; তবু পুলিস তাঁহাকে ভয় করিত, কর্ত্তৃপক্ষ একটু খাতির করিত। সে প্রকার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ স্বাধীনচেতা বিচারক ক্রমেই এ দেশ হইতে লোপ পাইতেছে। এখন উপরিওয়ালার মন না যোগাইলে চাকরী থাকে না।

যাহা হউক, হাকিম আসিয়া বসিলে প্রথমেই নির্ম্মলের মোকর্দ্দমার ডাক হইল। আসামী আসিয়া দাঁড়াইল।

কাটোয়াতে যে কয়েক জন খ্যাতনামা উকীল ও মোক্তার ছিলেন, প্রায় সকলেই নির্ম্মলের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছেন। এক জন নব্য উকীল ও এক জন পাতি মোক্তার বাদিনীর মোকর্দ্দমা চালাইতেছিলেন। কেদার জ্যেঠা পয়সা খরচ করিতে বড় কাতর। নির্ম্মলের খুড়া অর্থসাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন নাই। জ্যেঠা একা কত করিবে? মোকর্দ্দমা উঠিতে না উঠিতেই জ্যেঠার দুই শত টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। জ্যেঠা ভাল উকীল দিয়া উঠিতে পারে নাই; দিবার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু দর করিয়া ঠিক করিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মলের নায়েব, টাকা দিয়া ওকালতনামায় দস্তখত করাইয়া লইয়া গেল।

কাটোয়াতে শরৎ বাবুর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা খুব। তিনি পূর্ব্ব হইতেই নির্ম্মলের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রমেশের উপদেশ পাইয়া তিনি বলদৃপ্ত সিংহের ন্যায় আদালতে আসিয়া বসিলেন। নির্ম্মলের মোকর্দ্দমা উঠিলে তিনি নির্ম্মলের জন্য একখানি বসিবার আসন হাকিমের নিকট প্রার্থনা করিলেন। আসন মিলিল; কিন্তু নির্ম্মল তাহা গ্রহণ করিলেন না,—সগর্ব্বে কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তখন কেদার জ্যেঠার নিযুক্ত বাদিনীর উকীল রতন বাবু মোকর্দ্দমা আরম্ভ করিলেন। সে সব অলীক কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

আরম্ভের ভণিতা দেখিয়া শরৎ বাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, একটু হাসিয়া বলিলেন, "জানি না, সুবিজ্ঞ উকীল মহাশয়ের কল্পনা-স্রোত কোথায় গিয়া থামিবে। আদালতের সময় অনর্থক নষ্ট না করিয়া কাজের কথা তুলিলে ভাল হয় না?"

রতন বাবুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "শরৎ বাবুর মক্কেলে ক্ষতিজনক কার্য্য হইলে শরৎ বাবুর রাগ হইতে পারে বটে—কিন্তু আমি নাচার। আসামী অপরাধ স্বীকার করিলে সকল গোল মিটিয়া যায়।"

শরৎ। সে যুক্তি পরে আপনার নিকট লওয়া যাইবে। এক্ষণে আপনি বাদিনী ও সাক্ষীদের এজাহার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হউন।

রতন। বাদিনী কই? তাঁকে ডাকুন। আমি জেরা করিব।

শরৎ। এ কথা বড় মন্দ নয়। আপনি যে বাদিনীর উকীল, তা' কি ভুলে গেছেন?

তখন রতন বাবুর চমক ভাঙ্গিল। বাদিনীর ডাক পড়িল। ক্ষণপরে হালদার ঠাকুরাণী অবগুণ্ঠনে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া হাকিমের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কেদার জ্যেঠা তাহাকে দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। চুপি চুপি পুত্রকে বলিলেন, "কিঙ্কর, আর রক্ষা নাই—হালদারাণীকে নির্ম্মল ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে।"

কিঙ্কর। কিসে তা' বুঝিলেন? সে আসে নাই ব'লে যে কিছু পূর্ব্বে কত ভাবিতেছিলেন।

কেদার। আমি বেশ বুঝিতেছি, হালদারাণীকে কে লুকাইয়া আনিয়াছে—আমাদের চোখে ধুলা দিয়ে এতক্ষণ কে তাঁকে এখানে লুকাইয়া রেখেছিল। যদি তাহা না হইত, তা' হ'লে হালদারণীকে আমরা দেখিতে পাইতাম, সেও আমাদের দেখা দিতে চেষ্টা করিত।

শুনিয়া কিঙ্কর বড়ই চিন্তিত হইল,—হালদারণীকে দু'টা কথা বলিবার অভিপ্রায়ে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু শরৎ বাবুর সাবধানতায় কিঙ্কর হালদারণীর কাছে যাইতে পারিল না।

হাকিম, হালদারণীর এজাহার লিখিয়া লইতে লাগিলেন। হালদারণী প্রকৃত ঘটনা একে একে বলিতে লাগিল। শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল। আবার যখন শরৎ বাবু উঠিয়া ওজস্বিনা ভাষায় সোহাগের সম্পত্তির উপর কেদার জ্যেঠার লোভ—সোহাগের সম্বন্ধে কিঙ্করের কুৎসিত অভিসন্ধি—হালদারণী ও কিঙ্করের ষড়্‌যন্ত্র বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন সকলের বিস্ময় আরও বাড়িয়া উঠিল। নির্ম্মলের সুবিমল চরিত্র—স্বগ্রামে খ্যাতি—সোহাগের সহিত নির্ম্মলের পবিত্র সম্বন্ধ,—সব একে একে জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিতে শরৎ বাবু বিরত হইলেন না।

শুনিয়া সেই জনতা বিস্মিত, স্তম্ভিত, ক্রুদ্ধ হইল। কিঙ্কর নিজে পাপ করিয়া পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার জন্য কিরূপ ঘোরতর ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল, শুনিয়া চারিদিকে লোকে ধিক্কার দিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া পিতা-পুত্র সরিয়া পড়িলেন।

নির্ম্মল নিরপরাধ নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন হইলেন।

মুক্ত হইবার জন্য উকীলের কূট তর্কের কোনই প্রয়োজন হইল না—সাক্ষ্য প্রমাণাদি কিছুই আবশ্যক হইল না। কিন্তু কেমন করিয়া এমনটা হইল? নির্ম্মল ভাবিলেন, যে কথা তিনি ও সোহাগ ভিন্ন অপর কেহ জানিত না, সে কথা কিরূপে প্রকাশ পাইল? সোহাগ মরিয়া গিয়াছে, সে কিছু বলে নাই; হালদারণীও সকল কথা জানে না। তবে কোন্ অসাধারণ শক্তিবলে সকল গুপ্ত কথা একত্র গ্রথিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশ পাইল? নির্ম্মল ভাবিলেন, "তবে কি এর ভিতর রমেশ আছেন?"

নির্ম্মল কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া অন্যমনে আদালত-গৃহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন। শরৎ বাবু হালদারণীকে লইয়া নিজের বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রি যখন এক প্রহর, তখন রমেশ সোহাগকে লইয়া আনন্দপুরের ঘাটে পৌছিলেন।

রমেশ ডাকিলেন, "সোহাগ!"

সোহাগ উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ। এইবার আমাদের নামিতে হইবে।

সোহাগ। আপনি কোথায় যাইবেন?

রমেশ। তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসিব।

সোহাগ বজরা হইতে রমেশের সঙ্গে নামিল। আগে আগে দুই জন দ্বারবান আলো দেখাইয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে রমেশ বলিলেন, "সোহাগ, আজ তোমাকে আমার পরিচয় দিব।"

সোহাগ। আমি আপনার পরিচয় জানি।

রমেশ। জান? আমি কে বল দেখি?

সোহাগ। আপনি দেবতা; অন্য পরিচয় জানিবার প্রয়োজন নাই।

রমেশ। না সোহাগ, আমি দেবতা নই—আমি—

উভয়ে গৃহদ্বারে পৌছিলেন। দ্বারবানেরা সরিয়া দাঁড়াইল। রমেশ ডাকিলেন, "সোহাগ।"

সোহাগ, রমেশের পানে শুধু একবার চাহিয়া দেখিল।

রমেশ। সোহাগ, চলিলাম,—জানি না, আবার কখন সাক্ষাৎ ঘটিবে কি না। কিন্তু—কিন্তু—

বালিকা নীরবে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। রমেশ বলিলেন, "সাক্ষাৎ হউক, বা না হউক, তুমি চিরসুখী হও, ইহাই আমার প্রার্থনা।"

তিনি সেখানে আর দাঁড়াইলেন না—ক্ষিপ্রচরণে প্রস্থান করিলেন। বালিকা অশ্রুকণা নয়নে ধরিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

বধুগ্রামে আসিতে রমেশের দেড় প্রহর রাত্রি হইল। অন্নপূর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রমেশ সেই রাত্রিতেই বিদায় চাহিলেন।

অন্নপূর্ণা বলিলেন, "না বাবা, আর দু'দিন থাক।"

রমেশ। অনেক দিন আসিয়াছি, কাজ-কর্ম্ম না দেখিলে ক্ষতি হইবে যে, মা।

অন্ন। তুমি আমার নির্ম্মলকে বাঁচাইলে, তোমার ধার কখনও শোধ দিতে পারিব না, বাবা।

র। আমি কি করেছি, মা? আমি বজরা ছাড়িয়া ডাঙ্গাতেও উঠি নাই।

ক্ষণপরে অন্নপূর্ণা সজলনয়নে বলিলেন, "রমেশ, তুমি আমার বড় ছেলে,—নির্ম্মলের অপরাধ লইও না, বাবা!"

রমেশ বলিলেন, "নির্ম্মলের আবার অপরাধ কি মা? তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। কেন এমনটা হইল?"

অন্ন। কেন হইল, তা কতকটা জানি; কিন্তু প্রতীকার আমার সাধ্যাতীত।

র। কথাটা কি শুনিতে পাই না, মা? যদি আমার দ্বারা কিছু হয়।

অন্ন। তুমি বউমাকে সত্বর পাঠাইয়া দিতে পার?

র। কবে আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি?

অন্ন। তুমি চিরজীবী হও, বাবা। বিশালপুরে পঁহুছিবামাত্র বউমাকে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিও।

র। প্রতিশ্রুত হইতেছি, মা। চারি দিনের মধ্যে বিজু বধুগ্রামে আসিবে।

অন্ন। বেশ, যদি বউমা আসিতে অনিচ্ছুক হ'ন?

র। স্বামীর কাছে আসিতে স্ত্রী অনিচ্ছুক হইবে?

অন্ন। যদি তাই হয়?

র। তাহা হইলেও তাকে পাঠাইব।

অন্ন। বাবা, তুমি রাজরাজেশ্বর হও। তোমার কল্যাণে ছেলেকে যদি আবার ফিরে পাই।

র। কেন মা, কি হয়েছে?

অন্ন। সে কথা আজ বলিব না। ভগবান্ যদি কখনও দিন দেন, তবে তখন সকল কথা বলিব।

রমেশ বিদায় হইলেন। তার কিছুকাল পরে নির্ম্মলের বজরা ঘাটে আসিয়া লাগিল। তাঁহার ফিরিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল। নির্ম্মল কাটোয়ার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে সোহাগের শব অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। জীবিত বা মৃতদেহ কিছুই মিলে নাই। অবশেষে তিনি হতাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

ফিরিয়া আগে মাকে প্রণাম করিলেন। মা বলিলেন, "দেখিলে বাবা, ভগবান্ আছেন কি না। শত্রুর মুখে কালি দিয়া কলঙ্কধৌত স্বর্ণের ন্যায় তুমি আবার গৃহে ফিরিয়াছ।"

নির্ম্মল। ভগবান্ আমার কি করিয়াছেন, মা?

অন্ন। কেন, তোমার কলঙ্কমুক্ত করিয়াছেন।

নি। ভগবান্ কিছু করেন নাই।

অন্ন। তবে কে করিল?

নি। রমেশ।

অন্ন। রমেশ? সে ত বজরা ছাড়িয়া উপরে উঠে নাই।

নি। না উঠুক, সে বজরায় বসিয়া যাহা করিয়াছে, হাজার উকীল চীৎকার করিয়া তাহা পারে না।

অন্ন। তুমি এ সকল কথা কেমন করিয়া জানিলে?

নি। শরৎ বাবু উকীলের নিকট শুনিয়াছি।

অন্ন। তবু ত তুমি রমেশকে চিনিলে না।

নি। আমি রমেশকে বেশ চিনি। চিনিয়াও বলিতেছি যে, রমেশের দ্বারা উপকৃত না হইয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে আমি অধিকতর গৌরব মনে করিতাম।

অন্নপূর্ণা কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মল সে স্থান ত্যাগ করিলেন। ঘাটে আসিয়া পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন, এবং আনন্দপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কি বলিয়া সোহাগের মাকে প্রবোধ দিবেন—ভাবিতে ভাবিতে নির্ম্মল কালী খুড়ার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন নিশীথরাত্রি, কিন্তু সকলেই জাগরিত। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নির্ম্মল সর্ব্বাগ্রে সোহাগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া, নিষ্কম্প, নির্ব্বাক্ পাষাণ-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোহাগ একটু হাসিয়া বলিল, "কি দাদা, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

নির্ম্মল দেখিলেন, এ ভূত নয়—ভ্রম নয়—এ সত্যই সোহাগ। আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিলেন, "তুমি? সোহাগ? তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সো। নৌকায় আসিয়াছি।

নি। তুমি ত ডুবিয়াছিলে।

সো। ডুবিয়াছিলাম, কিন্তু মরি নাই।

নি। কেমন করিয়া রক্ষা পাইলে?

সো। দেবতা রক্ষা করিয়াছেন।

সোহাগ একে একে সকল কথা বলিল। শ্রবণান্তে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে কেন?"

সো। সাক্ষ্য দিতে হ'বে বলিয়া।

নি। আমায় বলিলে না কেন?

সো। বলিলে উপায় করিতে পারিতে?

নি। চেষ্টা দেখিতাম।

সো। তুমিই ত ব'লেছিলে, মরে না গেলে আমার নিষ্কৃতি নেই।

নির্ম্মল সে কথার কোনও উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার দেবতা কোথায় গেলেন?"

সো। তা' জানি না।

নি। যে বজরায় তোমায় উঠাইয়াছিলেন, সে বজরা দেখিতে কেমন?

সো। তোমার বজরার চেয়ে অনেক বড়; তা'তে ঘরও যথেষ্ট—সাজানও ভাল।

নি। তাঁহার নাম জান?

সো। নাম? নাম জানি না।

নি। বয়স কত?

সো। তোমায় চেয়ে কিছু বড়।

নির্ম্মল স্থির করিলেন, এ ব্যক্তি রমেশ।

সোহাগের মা আসিয়া কত কথা নির্ম্মলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নির্ম্মল তাহার একটারও উত্তর দিলেন না। সোহাগ দেখিল, নির্ম্মলের বদন চিন্তা-সমাকুল। চিন্তার সঙ্গে একটু ক্রোধও ছিল। সত্বরই নির্ম্মলকুমার আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "কিছু-দিনের জন্য তোমাদের স্থানান্তরে যাওয়া কর্ত্তব্য। চারিদিকে শত্রু—কখন কি বিপদ্ ঘটে, বলা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, এক্ষণে আমার গৃহে চল—পরে যাহা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে। তোমাদের অভিপ্রায় কি?"

গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের আবার মতামত কি? তুমি যেমন ব্যবস্থা করিবে, তেমনই হইবে।"

নির্ম্মল। উত্তম। কাল সন্ধ্যাবেলায় তোমাদের লইতে আসিব—প্রস্তুত থাকিবে।

নির্ম্মলকুমার বিদায় হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কিঙ্করের মনে শান্তি নাই। বেত্রাহত ভুজঙ্গমের ন্যায় গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে কিঙ্কর গৃহে ফিরিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, "সোহাগকে নষ্ট করিব—নির্ম্মলের বুকে আগুন জ্বালাইব, তবে ছাড়িব। দেখিব, কে সোহাগকে রক্ষা করে!"

কিন্তু সে রাত্রিতে কিঙ্কর কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। কাটোয়া হইতে ফিরিতে অনেকটা রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। মনের আগুন মনের ভিতর চাপিয়া অনিদ্রায় রাত্রি কাটাইল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া কিঙ্কর কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমন সময় নীহার শয্যা হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাইতেছ?"

কিঙ্কর। ও-পাড়ায় যাচ্ছি—একটু কাজ আছে।

নীহার। আজ আর কোথাও যেও না।

কি। কেন?

নী। বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

কি। তুমি দুঃস্বপ্ন দেখেছ ব'লে কাজে যাব না?

নী। তোমায় ত অন্য দিন বারণ করি না।

কি। স্বপ্ন দেখা খেয়ালটা যদি আজই চাগিয়া উঠে থাকে।

নী। তামাসা রাখ, স্বপ্নটা বড় গুরুতর।

কি। তোমার পেট গরম হয়েছে—সরবত খাওগে।

নী। তবু ঠাট্টা! আমি কিছুতেই যেতে দিব না।

কি। দেখ, নীহার, কাজের সময় বাধা দিও না। স্ত্রীলোকের আঁচল ধরিয়া থাকিলে বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা হয় না। নির্ব্বোধের মত কেন বার বার বিরক্ত কর?

বলিয়া কিঙ্কর প্রস্থানোদ্যত হইল। নীহার শয্যা-ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া কিঙ্করকে ধরিবার চেষ্টা করিল। আসিতে আসিতে আঁচল পায়ে লাগিয়া হতভাগিনী ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। কিঙ্কর হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "দেখিলে, ভগবান্ কার পক্ষে?" মাটীতে শুইয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে নীহার বলিল, "ওগো, এ ভগবান্ নয়, এ নিয়তি। এখনও ফিরিয়া এস।"

কিঙ্কর শুনিল না—চলিয়া গেল। গ্রামের প্রান্তভাগে এক জন ডোম বাস করিত; কিঙ্কর তাহার কুটীর-দ্বারে আসিয়া দেখা দিল। ডোমের নাম রামু। একটা উপপত্নী ও দুইটা কুকুর ছাড়া তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। রামুর মদের খরচটা কিছু বেশী—কোন মতে কুলাইয়া উঠিতে পারে না; ঝুড়ি বুনিয়া কয়টা পয়সাই বা হয়। কাজেই রামু জাত-ব্যবসা ছাড়িয়া পয়সার চেষ্টায় বড়লোকদের বাড়ীর ভিতর উঁকি মারিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের গৃহিণী ঝুড়ি বুনা ছাড়িল না। কেন না, পুলিসের লোকে পেশা তদন্ত লইয়া মাঝে মাঝে বড়ই জ্বালাতন করিত।

রামু শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেছিল, এমন সময় কিঙ্কর আসিয়া দেখা দিল কিঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে রামু, এত বেলায় ঘুম ভাঙ্গিল না কি?"

রামু উত্তর করিল, "আজ্ঞে কাল রেতে মদটা কিছু বেশী খেয়েছিনু, তাই উঠতে একটু দেরী হয়ে গেছে।"

কিঙ্কর বলিল, "তুই আমার সঙ্গে আয়—আমাদের জানালার দুইটা জাফ্‌রি তৈয়ার করতে হবে—মাপ নিবি আয়।"

রামু গামছা কাঁধে ফেলিয়া কিঙ্করের পাছু পাছু চলিল। কিঙ্কর বাড়ী গেল না।—গঙ্গাতীরে একটা ছোট জঙ্গল ছিল,—সেইখানে রামুকে লইয়া গেল। লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়া কিঙ্কর চুপি চুপি অনেক কথা রামুকে বলিল। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে কিঙ্কর তাহাকে দুইটা টাকা দিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ঠিক সন্ধ্যার সময় আমাদের খিড়কীর বাগানে—"

রামু বলিল, "একটা কথা দু'বার বল্‌তে হ'বে না, কর্ত্তা।"

গৃহে ফিরিয়াও কিঙ্করের শান্তি নাই। বুকের ভিতর দাবানল জ্বলিতেছিল; নীহারের সহিত দেখা করিল না,—সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় ছটফট্ করিয়া সমস্ত দিন কাটাইল। যখন সূর্য্যদেব গাছের পাশে হেলিয়া পড়িল, তখন কিঙ্কর খিড়কীর উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। এ উদ্যানের কথা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি।

এক্ষণে উদ্যানে ফুলগাছ নাই; থাকিবার মধ্যে শুধু আগাছার জঙ্গল। মাঝখানে যে পুকুর আছে, তাহা একটা ডোবা-বিশেষ। এই ডোবার দু'টা ঘাট ছিল। একটা ঘাটে সোহাগ দুই বেলা গা ধুইত। ডোবার পশ্চিম দিকে সোহাগের বাড়ী; পূর্ব্ব-পাড়ে একটা সঙ্কীর্ণ পথ।

ডোবার ধারে একটা ঝোপের ভিতর কিঙ্কর

লুকাইয়া রহিল। তখন সূর্য্য অস্ত যায় নাই। কিঙ্কর জানিত, সন্ধ্যার সময় সোহাগ প্রত্যহ গা ধুইতে ঘাটে আসে। আজও আসিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

স্বল্পক্ষণ ঝোপের ভিতর লুকাইয়া থাকিবার পর কিঙ্করের মনে একটা ভয় জন্মিল। স্থানটা বড় নির্জ্জন—লোকসমাগমের চিহ্নমাত্র নাই। সন্ধ্যার সময় নিস্তব্ধতা আরও যেন বাড়িয়া উঠে। কিঙ্কর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না—সে উঠিয়া যেখানে রামু লুকাইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দক্ষিণ-পাড়ে রামু একটা কাঁটাল গাছে উঠিয়া পাকা কাঁটাল ভক্ষণে বিশেষ মনোযোগী ছিল। কিঙ্করকে আসিতে দেখিয়া বলিল, "কর্ত্তা, দেখ্‌ছি তুমি গোল বাধালে; এখন কি এ-জায়গা, ও-জায়গা ক'রে বেড়ায়? কে কোথ্‌থেকে দেখে ফেল্‌বে—শীকার পালাবে, আমিও মারা যাব।"

কিঙ্কর আবার পশ্চিম-পাড়ে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। যখন সে ফিরিয়া আসে, তখন এক জন তাহাকে দেখিতে পাইল। যে দেখিল, সে যমুনা। যমুনা বিস্মিতনয়নে দেখিল, কিঙ্কর একটা ঝোপের আশ্রয়ে লুকাইল। কৌতূহলবশে যমুনাও একটু গা-ঢাকা দিল; এবং কিঙ্করের ভাব-ভঙ্গী পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

যমুনার পরিধানে একখানা ছোট কাপড়, গায়ে একখানা গামছা। সে এমন সময় এই বেশে এখানে কেন আসিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

অনতিবিলম্বে সোহাগ আসিয়া এই জঙ্গলাবৃত স্থানে দেখা দিল। যে ঝোপটার ভিতর কিঙ্কর লুক্কায়িত ছিল, সেই দিকেই সোহাগকে অগ্রসর হইতে যমুনা দেখিল। দেখিয়া সে স্থির করিল—কিঙ্কর সোহাগের অপেক্ষায় লুকাইয়া আছে। হিংসায় যমুনা ফুলিয়া উঠিল। ভাবিল, লোকে আমায় কেন চায় না—সোহাগীকে কেন সকলেই চায়?

নীহারকে সকল কথা জানাইয়া এই দম্পতীর প্রেমাভিনয়ে বাধা দিবার অভিলাষ যমুনার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল। সে তখনই সেই বেশে ছুটিল। যেখানে ঘরের মেজেতে ধূলার উপর শুইয়া নীহার স্বপ্নের কথা ভাবিতেছিল, সেইখানে যমুনা ঝড়বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং প্রফুল্ল মুখে হর্ষভরে বলিল, "তোমার স্বামীর কীর্ত্তি একবার দেখিবে এস।"

নীহার ঝটিতি উঠিয়া বসিল। দুই হাতে বুক চাপিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হ'য়েছে?"

হাতমুখ নাড়িয়া যমুনা উত্তর করিল, "কি হয়েছে, নিজের চোখে দেখ্‌বে এস; সে কথা আমি মুখে আন্‌তে পারি না।"

নীহার উঠিয়া যমুনার অনুবর্ত্তিনী হইল। যমুনা দ্রুতপাদবিক্ষেপে বাগানে প্রবেশ করিল। যে ঝোপের মধ্যে কিঙ্করকে ক্ষণপূর্ব্বে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল, সেই ঝোপের নিকট চুপি চুপি আসিয়া দাঁড়াইল। সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। চারি দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল। দক্ষিণ পাড়ে অস্পষ্ট মনুষ্যাবয়ব বৃক্ষপত্রমধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্ট হইল। কালবিলম্ব না করিয়া যমুনা সেই দিকে ধাবিত হইল। পিছু পিছু নীহারও চলিল; নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া নীহার দেখিল, কে যেন ছুটিয়া পলাইতেছে। যে পলাইতেছিল, সে রামু ডোম। যমুনা তাহাকে চিনিল। উভয়ে আরও একটু অগ্রসর হইল। তখন এক কদর্য্য দৃশ্য তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উভয়ে দেখিল, কিঙ্কর ভূপৃষ্ঠে বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার অঙ্কোপরি সোহাগ শয়ান রহিয়াছে সোহাগের মুখে কাপড়-বাঁধা,—কিঙ্কর তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া কোলের উপর বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখিয়াছে। দেখিবামাত্র নীহার জ্ঞান হারাইল, এবং উন্মত্ত-পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া সোহাগের কুসুম-কোমল অঙ্গে পদাঘাত করিল। সে আঘাতে সোহাগের দেহ কাঁপিয়া উঠিল;—তাহার অঙ্ক হইতে একখানা ছোরা ও কতকগুলা লতাপাতা পড়িয়া গেল। ছোরাখানা রামুর,—পলায়নকালে তাড়াতাড়িতে ফেলিয়া গিয়াছিল।—লতাগুল্মাদি সোহাগের হস্ত-পদ বন্ধনের জন্য আনীত হইয়াছিল। কিন্তু বাঁধিবার সময় হয় নাই—তৎপূর্ব্বেই নীহার আসিয়া পড়িয়াছিল।

নীহারকে দেখিয়া কিঙ্কর বুদ্ধি হারাইল,—কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না; উদাসনয়নে নীহারের পানে চাহিয়া রহিল। নীহার একবার বিদ্যুদ্বিক্ষেপী দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিল, একবার অঙ্কশায়িনী রমণীর পানে কটাক্ষপাত করিল। নীহারের সেই জ্বালাময়ী, বিদ্যুদ্বিক্ষেপী দৃষ্টি সন্দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় কিঙ্কর বুদ্ধি হারাইয়া সোহাগকে কোলের ভিতর আরও জোরে চাপিয়া ধরিল, এবং জালনিবদ্ধা হরিণী যেমন কালস্বরূপ ব্যাধকে সমাগত দেখিয়া আপন শাবককে দেহ

আবরণের মধ্যে লুকাইয়া রাখে এবং সন্দিগ্ধ-নয়নে ব্যাধের পানে চাহিয়া থাকে, কিঙ্করও তেমনই নিজ দেহ হেলাইয়া অঙ্কশায়িতা সোহাগকে বুকের ভিতর আরও চাপিয়া ধরিল এবং সন্দিগ্ধ-নয়নে নীহারের পানে চাহিয়া রহিল। তদ্দৃষ্টে নীহার আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে ভূপৃষ্ঠ হইতে ছোরা উঠাইয়া লইয়া ভৈরবী-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইল। তাহার বসন বিস্রস্ত—কবরীমুক্ত বেণীনিচয় পৃষ্ঠোপরি দোদুল্যমান—নেত্রে বাড়বাগ্নি—হস্তে ভীষণদর্শন ছোরা। সেই অস্তপ্রায় ভানুর কনকরাগরঞ্জিত নৈশ গগনতলে দাঁড়াইয়া, প্রেমময়ী কোমলপ্রাণা বঙ্গকুলবধূ, প্রেমপ্রতিদ্বন্দ্বিনী সোহাগকে মারিতে দৃঢ়হস্তে ছুরিকা উঠাইল। তদ্দৃষ্টে কিঙ্কর সোহাগকে রক্ষা করিবার মানসে, তাঁহাকে বুকের মধ্যে আরও চাপিয়া ধরিল। তাহাতে ফল অন্যরূপ দাঁড়াইল; পতনোন্মুখ ছোরা সোহাগের বক্ষে না পড়িয়া কিঙ্করের পৃষ্ঠে পড়িল। ছোরা আমূল প্রবিষ্ট হইয়া পৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিল;—কিঙ্কর হতচেতন হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

নীহার স্তম্ভিত হইল। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে স্বামীর প্রাণশূন্য দেহপানে চাহিলা রহিল। চক্ষে পলক নাই, দেহে স্পন্দন নাই। ক্ষণপরে তাহার দেহ একটু কাঁপিয়া উঠিল;—শূন্যনয়নে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর হতভাগিনী মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"কেমন ভালবেসেছি গো, ওগো কেমন বেসেছি।" ক্রমে সে চীৎকারের প্রতিধ্বনিও ডুবিয়া গেল। তখন উন্মাদিনী সেই ছুরিকা স্বামীর পৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজের বক্ষে আমূল প্রবিষ্ট করাইয়া দিল,—তাহার প্রাণহীন দেহ কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল।

মুহূর্তের মধ্যে এত বড় কাণ্ডটা হইয়া গেল। যমুনা কিছু বুঝিবার পূর্ব্বে—নীহারের কার্য্যে বাধা দিবার উপযুক্ত কর্ত্তব্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইবার পূর্ব্বে—এত বড় ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গেল। যখন সব শেষ হইল, তখন যমুনার চমক ভাঙ্গিল, সে আর বিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে ছুটিয়া পলাইল।

সোহাগ এতক্ষণ ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যখন যমুনাকে পলাইতে দেখিল, তখন সেও পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পলাইতে পারিল না,—বেশী দূর অগ্রসর হইতে না হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

হারাণ ও জ্যোৎস্নার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বিলি কাঁদিতে কাঁদিতে বিশালপুর পরিত্যাগ করিয়া বধূগ্রামে চলিল। শ্বশুরালয়ে থাকিবার উদ্দেশ্যে নয়, নির্ম্মলের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনার অভিপ্রায়ে নয়; স্বামীর নিকট নিজের নিরপরাধের কথা জানাইয়া চিরবিদায় লইবার জন্য বিলি আবার বধূগ্রামে চলিল। বিলির জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছে—এই কোমল বয়সে তাহার সকল আশা ফুরাইয়া গিয়াছে—সকল সাধ, সকল বাসনা নিবিয়া গিয়াছে। উদ্দেশ্যহীন যন্ত্রণাময় জীবন বহিয়া ফল কি? তাই বিলি স্বামীর নিকটে চিরবিদায় লইতে চলিল।

যাইতে অনেকটা সময় লাগিল। প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া সেদিন বধূগ্রামে পৌছিতে পারিল না। পরদিন অপরাহ্নে গ্রামপ্রান্তে নৌকা ধীরে ধীরে আসিয়া পৌছিল যেন বিলির যাতনা বুঝিয়া, বিলির যাতনাভারে নিপীড়িত হইয়া পান্‌সী ধীরে ধীরে চলিল। অদূরে নির্ম্মলের অট্টালিকাচূড়া বিলির নয়নগোচর হইল। ক্রমে পান্‌সী আরও নিকটবর্ত্তী হইল। যে ছাদের উপর বসিয়া বিলি স্বামীর নিকট চারি মাস পূর্ব্বে বিদায় লইয়াছিল, সে ছাদ বিলির নয়নে পড়িল। আলিসার নীচে অসংখ্য পারাবতের বাসা ছিল। বিলি সেই কপোত-কপোতীদের অসংখ্য নামে অভিহিত করিয়া কত আদর করিত। তাহাদের খাওয়াইত, তাহাদের সঙ্গে কত গল্প করিত, তাহারা নির্ভয়ে বিলির কাঁধে, মাথায় কত বসিত, নাচিত। তাহারা এক্ষণে আলিসার উপর, ছাদের উপর কত ঘুরিতেছিল, উড়িতেছিল—বিলি তাহা দেখিল। শয়নকক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল; মুক্ত

বাতায়নপথ দিয়া বিলি শয্যাপালঙ্ক দেখিতে পাইল। দেয়ালের গায়ে একখানা মোটা ফ্রেমে আঁটা নলদময়ন্তীর বড় ছবি ছিল, তাহার কিয়দংশ বিলির নয়নগোচর হইল। ছবির ফ্রেমের উপর বধুগ্রাম ত্যাগ করিবার দিন প্রাতঃকালে বিলি এক ছড়া গোলাপের মালা দোলাইয়াছিল; সে মালা ছড়া আজও সেখানে তেমনই দুলিতেছিল। তবে শুকাইয়া সুখ-স্বপ্নের বিকৃত কঙ্কালের ন্যায় ছবিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বিলি ছবি দেখিল, শুষ্ক মাল্য দেখিল—যে দিন তাহা পরাইয়া দিয়াছিল, তাহাও বিলির মনে পড়িল। মালা পরাইবার সময় বিলি নির্ম্মলকে বলিয়াছিল যে, মালা শুকাইবার পূর্ব্বে সে আবার বধুগ্রামে ফিরিয়া আসিবে। মালা শুকাইয়া গিয়াছে—বিলি আসে নাই। কই, তবু ত মালা কেহ ফেলিয়া দেয় নাই। বিলির চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

ধীরে ধীরে পান্সী আসিয়া খিড়কীর ঘাটে লাগিল। কিন্তু বিলি উঠিল না। অনেকক্ষণ আকাশ পানে চাহিয়া থাকিয়া বিলি রেবতীকে বলিল, "তুমি তীরে উঠিয়া বাড়ীতে যাও। অন্দরে যেও না—সদরে যাও। মার সঙ্গে দেখা করো না, আমি এসেছি শুনলে মা এখনই ছুটিয়া আসিবেন। তিনি ডাকিলে আমি ত থাকিতে পারিব না।"

আর কথা সরিল না—গণ্ড, বক্ষ বহিয়া আবার অশ্রুধারা ছুটিল। কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাও ভুলিয়া গেল। চোখে কাপড় দিয়া অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিল—ক্ষিপ্রা নদীর সম্মুখে বালির বাঁধ ভাসিয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া রেবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি অত কাঁদছ কেন, বউদিদি? এতদিন পরে ঘরে ফিরে এলে, এখন কি কাঁদতে আছে? তুমি আমায় কি বল্‌ছিলে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারলাম না। অন্দরে যাব না—মার সঙ্গে দেখা করব না—তবে আমি করব কি?"

প্রকৃতিস্থ হইয়া ক্ষণপরে বিলি বলিল, "তুমি একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করে গোপনে বলগে যে—যে, আমি এসেছি। একবার তাঁহাকে যেমন ক'রে পার ডেকে নিয়ে এস। যদি তিনি না আসতে চান, তা হলে তাঁহাকে বলিও—বলিও যে, এ জীবনে আর—আর সাক্ষাৎ হবে না। আরও বলিও যে, আমি তাঁহাকে বেশীক্ষণ ধ'রে রাখব না—একবার দু'টা কথা ব'লে জন্মের মত চ'লে যাব।"

রেবতী বলিল, "ষাট, ষাট, অমন কথা বলতে আছে। বালাই, জন্মের মত যাবে কেন! তোমার ঘর, দোর—তুমি চিরকাল আলো ক'রে থাক।"

বিলি বলিল, "রেবতি, তোমাকে যাহা বলিতে বলিলাম, তাহা বলিয়া এস।"

রেবতী আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল এবং অল্পকালমধ্যে ফিরিয়া আসিল। বিলি দেখিল, রেবতী একা। হতাশহৃদয়ে বিলি বসিয়া পড়িল।

রেবতী নিকটে আসিয়া বলিল, "বাবু বাড়ী নেই।"

তবু রক্ষা! বিলি ভাবিয়াছিল, বুঝি বা তিনি ঘৃণাভরে আইসেন নাই।

বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

রেবতী বলিল, "আনন্দপুরে।"

বিলি নীরব। তাহার হৃদয়ে সহস্রশীর্ষ জ্বালা-ময়ী হিংসা আবার মাথা জাগাইয়া উঠিল। বিলি আদেশ করিল, "নৌকা ছাড়।"

মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব?" বিলি ভাবিল, "সত্যই ত, কোথায় যাব? এ পৃথিবীতে আমার স্থান কোথায়? মরিয়া গেলেও পিত্রালয়ে আর যাব না—স্বামীর গৃহেও নয়। তবে হতভাগিনার স্থান কোথায়? সেখানে অবিচার নাই, অবজ্ঞা নাই—অত্যাচার নাই, কুৎসা নাই, সেইখানে গিয়া এইবার জ্বালা জুড়াইব। কিন্তু—কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া, আমি যে নিরপরাধ, তাহা তাঁহাকে না জানাইয়া, কেমন করিয়া মরিব।"

বিলি ভাবিয়া চিন্তিয়া রেবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু আজ বাড়ী ফিরিবেন কি? না আনন্দপুরেই থাকিবেন?"

রেবতী বলিল, "সন্ধ্যার পর ফিরিবেন।"

বিলি। তবে ক্ষণকাল ও-পারে নৌকা লাগাইয়া রাখ; তিনি ফিরিলে আবার আসিব।

রেবতী। চলো না, আমরাও আনন্দপুরে যাই?

বি। সেখানে গিয়া কি হবে?

রে। বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হ'তে পারে।

বি। বাবু কি নৌকায় গিয়াছেন?

রে। তা ঠিক জানি না।

বিলি চুপ করিয়া রহিল। রেবতী আনন্দপুরে নৌকা লইয়া যাইতে মাঝিদের আদেশ করিল।

যখন অস্তগত রবির ছটা পৃথিবী ছাড়িয়া মেঘের গায় লাগিল, তখন বিলির নৌকা আনন্দপুরে

পঁহুছিল। মাঝিরা লগি পুঁতিয়া ঘাটে নৌকা বাঁধিল। কিন্তু আরোহীরা কেহই নৌকা ত্যাগ করিলেন না। ঘাটে অন্য কোনও নৌকা নাই, লোক নাই,—চারিদিক্ নীরব।

ক্ষণপরে রেবতী বলিল, "চলো না কেন, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি? ক'দিন বসে বসে পা ধ'রে গেছে।"

বি। কোথায় আর বেড়াতে যাব?

রে। এখানে চুপ ক'রে বসে থেকেই বা কি হবে?

বি। তুমিই ত এখানে আনিলে।

রে। তাই বলছি, যদি এখানে আসাই হ'ল, তবে চলো একটু ঘুরে আসি—বাবুর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।

বি। তাঁর নৌকা ত এখানে দেখ্‌ছি না।

রে। তিনি ঘোড়ায় এসে থাক্‌বেন।

বিলি আর কিছু বলিল না; কিন্তু নড়িলও না। রেবতী আবার বলিল, "শুনেছি সোহাগের বাড়ী ঘাটের নিকটে—বাবুও সেখানে এসে থাক্‌বেন।"

রেবতীর পানে বিলি তীব্র কটাক্ষপাত করিল; বলিল, "তুমি কি জন্য আমাকে এখানে আনিযাছ?"

রেবতী দুইটা ঢোক গিলিযা বলিল, "যদি বাবুর সঙ্গে পথে দেখা হয়, এই আশায় এ পথে এসেছি।"

বিলি চুপ করিল। কিন্তু রেবতী চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নয়। সে একটু মিষ্ট হাসি হাসিযা জিজ্ঞাসা করিল, "মোকর্দ্দমার কি হযেছে, বউদিদি?"

বিলি। কিসের মোকর্দ্দমা?

রে। সেই যে দাদাবাবু ও সোহাগকে নিযে কি একটা মোকর্দ্দমা বেধেছিল।

বিলি কোনও উত্তর করিল না; মোকর্দ্দমার কোনও সংবাদও বিলি রাখিত না। কিন্তু রেবতী অনেক সংবাদ রাখিত। হারাণ ও জ্যোৎস্নার নিকট সে অনেক সংবাদ পাইত। যাহা জানান তাহাদের প্রয়োজন, তাহাই তাহারা রেবতীকে জানাইত। তা'ছাড়া রেবতী আর কিছু জানিতে পারিত না। রেবতী বড় নির্ব্বোধ ছিল। নির্ব্বোধ না হইলে যৌবনের স্মৃতিমাত্র লইয়া যুবতী সাজিবার প্রয়াস পায়?

নির্ব্বোধই হউক, অথবা বুদ্ধিমতীই হউক, রেবতী মনে মনে একটা মতলব ঠিক করিয়াছিল। হারাণের মত বাবুর সঙ্গে বিলাসে মাতিয়া অরসিকা বিজলীর কার্য্যে তাহার আর মন ছিল না। বিলির বিষাদমাখা কান্নাভরা মুখখানা দেখিতে দেখিতে রেবতীর হাড় জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। সোহাগ সুন্দরী, রসিকা;—দাদাবাবু নাকি তাহাকে লইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন। সোহাগের না জানি কত ধন-দৌলত হ'বে—কত সুখ হ'বে। এমন মেয়ের কাছে চাক্‌রী করিতে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। রেবতী স্থির করিয়াছিল যে, যেমন করিয়াই হউক, সোহাগের নিকট চাক্‌রী করিতেই হইবে।

হারাণ যদি আশ্রয় দিত, তাহা হইলে রেবতীর কোথাও চাক্‌রী করিবার প্রয়োজন হইত না। হারাণের গৃহ শূন্য—সুবিধাও বেশ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হারাণ তেমন নয়—সে ধরা দিয়াও ধরা দিল না। পরন্তু রাত্রিতে হারাণ বিলির ঘরে যে কাণ্ডটা করিল, তাহাতে রেবতী হারাণকে বেশ চিনিয়াছে। এতকাল হারাণ যখন আশা দিয়া অবশেষে নিরাশ করিল, তখন তাহাকে চাক্‌রী করিতেই হইবে। তবে বিলির কাছে নয়—সোহাগের কাছে।

কিন্তু সোহাগের ভাব-গতিক না বুঝিয়া রেবতী হাতের চাক্‌রী ছাড়িতে পারে না। তাই একবার সোহাগকে দেখিয়া, গোপনে দুইটা কথা কহিয়া, চাক্‌রী ঠিক করিবার জন্য রেবতী ব্যাকুল। বিলি যখন উঠিয়া একটু বেড়াইতে কিছুতেই স্বীকার পাইল না, তখন রেবতী বলিল, "তবে আমায় একটু ছাড়িয়া দাও—আমি একবার ঘুরিয়া আসি।"

বিলি তাহাতেও স্বীকৃতা হইল না; কেন না, বিলিকে এখনই আনন্দপুর ত্যাগ করিয়া বধূগ্রামে যাইতে হইবে। রেবতী উপায়ান্তর না দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণপরে বলিল, "বউদিদি, তুমি ত আমার মনের কথা বুঝ না—অনর্থক রাগ কর। আমি শুনেছি, এ গাঁয়ে সকলেই বাবুর শত্রু; তাঁহাকে মারবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। এখানে একা এসে বাবু ভাল করেন নি—সন্ধ্যার পর থাকাও ভাল নয়। তাই একটু আগু হ'যে আমি দেখতে যাচ্ছিলাম। তা তুমি ত যেতে দিবে না।"

রেবতীর কথাটা কি তোমার প্রাণে বিঁধিল, বিলি? স্বামীর বিপদ আশঙ্কায় প্রাণ কি একটু চঞ্চল হইল? হায় বিলি, স্বামীর অমঙ্গলে আজও তোমার প্রাণ কাতর হয়? যাঁহার নিষ্করুণ ব্যবহারে তোমার সকলই ঘুচিয়াছে, তাঁহার হিতচিন্তা আজও তোমার মনোমধ্যে স্থান পায়?

ক্ষণকাল বিলি নীরবে চিন্তা করিল। তার পর মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিল, "চল, গঙ্গার ধারে একটু বেড়াই—দরওয়ান পিছনে পিছনে আসুক।"

উভয়ে তীরে উঠিল। গঙ্গার ধারে কোনও পথ

নাই। একটিমাত্র পথ গ্রামের দিকে গিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া উভয়ে চলিল, এবং স্বল্পদূর গিয়া দেখিল, পথটা তত নির্জ্জন নয়। বিলি ঘাটের পথ ছাড়িয়া বামের সরু রাস্তা ধরিল। তিন চারি দিন পূর্ব্বে এই রাস্তায় রমেশ একবার আসিয়াছিলেন। রাস্তাটি নির্জ্জন—ঘনবৃক্ষশ্রেণীমধ্যে অবস্থিত। একটু অগ্রসর হইয়া উভয়ে দেখিল, পথের দুই ধারে জঙ্গল। অন্ধকারটাও অপেক্ষাকৃত বেশী। উভয়ে ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় সহসা দক্ষিণে দেখিল;—এ কি? পুকুরের পাড়ের উপর মুক্ত স্থানে কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? এ নির্ম্মল, না? নির্ম্মলের পাশে এ কার মূর্ত্তি? এই সেই সোহাগ বুঝি। পাপিষ্ঠা পথ-ঘাট মানে না—প্রকাশ্য স্থানে নির্ম্মলের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া, নির্ম্মলের বাহুমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বিলি চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়া আবার দেখিল।

বিলি মিথ্যা দেখে নাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সোহাগ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। যমুনা পলাইল—সোহাগ পলাইতে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। এই সন্ধ্যার সময়ই নির্ম্মল সোহাগকে বধূগ্রামে লইয়া যাইবার বাসনা করিয়া ছিলেন। তদভিপ্রায়ে নির্ম্মল সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আনন্দপুরে আসিয়াছিলেন। গৃহে সোহাগের সাক্ষাৎ পাইলেন না। খিড়কীতে তাহার অন্বেষণে আসিয়া দেখিলেন, কনকলতিকা সোহাগ ধূলার উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। তখন নির্ম্মল সযতনে সোহাগের চৈতন্যবিধান করিয়া তাহাকে বাহুপাশে ধরিয়া লইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। যখন যাইতেছিলেন, তখন বিলি তাঁহাদের দেখিল।

দেখিয়া বিলির মাথা ঘুরিয়া গেল। সন্নিকটস্থ বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া বিলি একটু হেলিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই কদর্য্য দৃশ্য নয়নান্তরাল করিবার চেষ্টা করিল। বৃথা প্রয়াস। দুঃখের কথা, ভয়াবহ দৃশ্য, অনপনেয়-রেখায় হৃদয়ে অঙ্কিত হয়; দেহের উপর অস্ত্রলেখার মত সহজে মিলায় না। বিলি চক্ষু মুছিল। মুছিয়া গাছ, পালা. আকাশ, পৃথিবীর পানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু যাহা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছে, তাহা হৃদয় হইতে কিছুতেই ফিরাইল না। বিলি ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া বসিয়া পড়িল।

রেবতী বলিল, "বউদিদি, দাদাবাবুকে দেখেছ? ঐ যে সোহাগকে নিয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। সোহাগের বেশ ছিরি হয়েছে। তা হবে না কেন? ও ত আমার মত গরীব দুঃখী নয়। ভাল খেতে পরতে পেলেই লোকের ছিরি হয়। তুমি এখানে একটু বসো, বউদিদি; আমি দাদাবাবুকে ডেকে নিয়ে আসি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রেবতী চলিয়া গেল!

বিলি সেখানে আর বসিল না। উদাসনয়নে আকাশের পানে চাহিয়া বিলি বলিল, "আর কেন? এইবার তাঁহাকে না বলিয়াও মরিতে পারি।"

বিলি ফিরিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিল। রেবতীর কথা বিলি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। মাঝিরা ক্ষণকাল তাহার জন্য অপেক্ষা করিল; কিন্তু যখন সে আসিল না, তখন তাহারা নৌকা ছাড়িয়া দিল। কোথায় যাইতে হইবে, জিজ্ঞাসা করায় বিলি কিছুই বলিতে পারিল না। তাহারা অগত্যা বধূগ্রাম-অভিমুখে নৌকা বাহিয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বধূগ্রাম হইতে বিশালপুরে আসিতে রমেশকে উজান বাহিয়া আসিতে হইল। বর্ষাকালে একটানা গাঙ্গে উজান বহা বড় সহজ কথা নয়। তবে বাতাস অনুকূল হওয়ায় রমেশের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় বধূগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া রমেশ তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে বিশাল-পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সদরঘাটে বজরা লাগিল। বাবু ফিরিয়াছেন। সত্বর এ সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। দ্বারবানেরা আসিয়া বজরার সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া ধীর পাদ-বিক্ষেপে নিজ মহল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রমেশ যেন একটু চিন্তাকুল, একটু গম্ভীর; কিন্তু সেই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে একটু আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

রমেশ স্নানান্তে জলযোগ করিয়া স্বীয় পাঠাগারে মখমলমণ্ডিত কাষ্ঠাসনের উপর উপবেশন করিলেন। ভৃত্য বড় কলিকায় গয়ার তামাকু সাজিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। সোনার মুখনলে তামাকু টানিতে টানিতে রমেশ স্তূপীকৃত ডাকের চিঠি একে একে খুলিতে লাগিলেন। কোনটা বা পড়িতে লাগিলেন, কোনটা বা না পড়িয়া ফেলিয়া রাখিলেন। একখানা পত্র তাঁহার মনোযোগ সবিশেষ আকর্ষণ করিল। উন্মোচন করিয়া পত্র পাঠ করিলেন।

পাঠান্তে তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। একবার, দুই-বার, তিন-বার বারবার সেই পত্রখানা পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখ ক্রোধে ক্ষোভে আরক্তিম হইল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; গুড়-গুড়ির নল হাত হইতে পড়িয়া গেল।

পত্রখানার একটু পরিচয় আবশ্যক। রমেশের পীড়িতাবস্থায় একটা শিশির ঔষধ বিকৃত বলিয়া গোল উঠিয়াছিল; রমেশ সেই শিশিটা ডাক্তার সাহেবের নিকট হইতে চাহিয়া নিজের কাছে রাখিয়া-ছিলেন। পরে আরোগ্য লাভ করিয়া সেই ঔষধের শিশি রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় জনৈক বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাঁসপাতালের রাসায়নিক পরীক্ষকের দ্বারা ঔষধের পরীক্ষা করাইয়া বন্ধু পত্রের উত্তর দিয়াছেন। পত্রখানি অদ্য রমেশের হস্তগত হইয়াছে। পত্রে লিখিত ছিল,—

ভাই রমেশ, দুই মাস পূর্ব্বে তোমার প্রেরিত শিশি ও পত্র পাইয়াছি। স্থানান্তরে গিয়াছিলাম বলিয়া পত্রোত্তর যথাসময়ে দিতে পারি নাই।

* * * * *

পরীক্ষার ফলাফল পরীক্ষক মহাশয় স্বতন্ত্র কাগজে লিখিয়া দিয়াছেন। তাহা এই পত্রমধ্যে পাঠাইলাম। 'এন্টিপাইরিণ' নামক কোন তীব্র ঔষধ এই শিশির মধ্যে ছিল। প্রবল জ্বরের প্রথমাবস্থায় ইহা উপকারী হইতে পারে, কিন্তু বিকারগ্রস্ত জীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা বিষতুল্য। সবিশেষ পরীক্ষকের পত্রে জানিবে।

পত্র লেখা তোমার বা আমার অভ্যাস নাই। কিন্তু পত্রোত্তরে একটা কথা জানাইবে কি?—এই ঔষধ পরীক্ষার কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল? ইতি—

রমেশ বন্ধুর পত্র রাখিয়া পরীক্ষকের মন্তব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর "এন্টি-পাইরিণের" গুণাগুণ তাহাতে বর্ণিত ছিল। গুণাগুণ রমেশ পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু অবগত ছিলেন—পড়িবার প্রয়োজন ছিল না। যাহা হউক, পাঠ শেষ করিয়া রমেশ নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তার মধ্যে বিনির কথা সহসা মনে পড়িল,—তাহার শাশুড়ীর নিকট কোন্ কার্য্যের জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছেন, তাহাও মনে পড়িল। তখন তিনি ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য আসিলে 'দিদিবাবুকে' ডাকিয়া আনিতে রমেশ আদেশ করিলেন। দাসদাসীরা বিজলীকে 'দিদি-বাবু' বলিয়া ডাকিত। দিদিবাবু বাড়ী নাই। সুতরাং কে ডাকিয়া আনিবে? ভৃত্য মনে মনে প্রমাদ গণিল। সে কিছু না বলিয়া, ছুটিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিল। দেওয়ান দুর্গানাম জপ করিতে করিতে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রমেশ বলিলেন, "বিজুকে এখনি বধুগ্রামে পাঠাইতে হইবে—নূতন মাঝির দলকে প্রস্তুত হইতে বল।"

দেওয়ান কিছু বলিল না, নড়িলও না। রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বলিবার আছে কি?"

আনতমুখে দেওয়ান ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আজ্ঞে, বিজলী মা এখানে নাই।"

র। এখানে নাই! কোথায় তবে?

দে। তিনি বধুগ্রামে গিয়াছেন।

র। অসম্ভব। আমি সেখান হইতে এখনি আসিতেছি।

দে। তিনি গত পরশ্ব প্রত্যূষে এখান হইতে যাত্রা করিয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যাকালে বধুগ্রামে পৌঁছিয়া থাকিবেন।

র। কিছুদিন পূর্ব্বে বধুগ্রামে যাইতে বিজলী অসম্মতা ছিলেন; তার পর হঠাৎ মতপরিবর্ত্তন ঘটিল কেন? অবশ্য ভিতরে কিছু আছে।

দেওয়ান কোন উত্তর না করিয়া নীরব রহিল। রমেশ উত্তেজিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করিয়া রহিলে যে? কোনও কথা গোপন করিতেছ না কি?"

দে। আপনি মনিব—আপনার নিকট কথা লুকাইতে আজও শিখি নাই।

র। তবে সব কথা খুলিয়া বল।

দে। মার উপর অত্যাচার হইয়াছিল; তাই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

র। আমার ভগ্নীর উপর অত্যাচার? কে করেছে?

দে। হারাণ বাবু।

ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া রমেশ বলিলেন, "হারাণ বাবু! হারাণ বাবু অত্যাচার করেছে?"

দেওয়ান নিরুত্তর রহিল। রুদ্রস্বরে রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি করেছে?"

দে। গভীর নিশীথে বিজু মার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

অকস্মাৎ সর্প-দষ্ট হইলে লোকে যেমন চমকিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, রমেশ তেমনই চমকিত হইয়া দুই পা পিছাইয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না—ক্রোধে, ঘৃণায় মুখ আরক্তিম হইল—সমস্ত দেহ বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কাঁপিতে

লাগিল। দম্ভোলিনিক্ষেপোন্মত্ত ঘনীভূত জলদজাল দৃষ্টে দেওয়ান কাঁপিতে লাগিল; দুর্গানামও তাহার আর মনে পড়িল না।

ক্ষণপরে বজ্রনির্ঘোষতুল্য হুঙ্কাররবে রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হারাণ এখনও জীবিত আছে?"

দে। আজ্ঞে হাঁ।

র। তোমরা তবে কি জন্য নিমক্ খাইতেছ?

দে। বিজু মা নিজেই তাঁ'কে শাস্তি দিযাছেন।

অতঃপর দেওয়ান সকল কথা বলিল। শুনিয়া রমেশ বলিলেন, "বিজু আত্মরক্ষা করিযাছে মাত্র—শাস্তি দেয নাই, শাস্তি দিবার ভার আমার উপর;—হারাণকে ধরিয়া আন।"

দে। তিনি ত এখানে নাই;—কোথায়, তা'ও জানি না।

র। তুমি বৃদ্ধ হইযাছ, অবসর গ্রহণ কর।

দে। প্রভু, দাসের অপরাধ কি?

র। তোমার অসাবধানতায আমার বংশকে আজ এই অপমান সহিতে হইল। এক্ষণে অপরাধীকে ধরিযা আনিবারও তোমার সামর্থ্য নাই।

দে। হুজুর, প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

র। চেষ্টায কি না হয়? সে যখন মরে নাই, তখন তাহাকে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতেও ধরিয়া আনা সহজ কাজ।

এমন সময় তথায গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান সসম্ভ্রমে সরিযা দাঁড়াইল। গৃহিণী বলিলেন,"বাবা রমেশ, তুমি আসিযাছ শুনিয়া তোমাকে একটা কথা বলিতে আসিলাম। আমি বৃন্দাবনে চলিলাম—আর এখানে থাকিব না।"

র। তুমিও যাবে, মা? বিজু রাগ ক'রে আমায় ছেড়ে চ'লে গেছে—তুমিও যাবে, মা?

গিন্নী। কি করব বাবা! যে কালনাগিনী বউ ঘরে এনেছি, কে তোমার সংসারে থাকবে, বাবা? আজ বিজুকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়ে তাড়ালে, কাল আমাকে হয় ত ডাইনী ব'লে তাড়াবে। মানে মানে সরে যাওয়াই ভাল।

র। কলঙ্কিনী! বিজু কলঙ্কিনী? কে আমার বিজুকে কলঙ্কিনী বলে?

পাশের ঘর হইতে এক জন উত্তর করিল, "আমি বলি।"

সকলে ফিরিয়া দেখিল,—উভর কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দ্বারের উপর জ্যোৎস্না। তাহাকে দেখিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন। দেওয়ানও তাঁহার অনুসরণ করিল। রমেশ মুহূর্ত্তের জন্য আত্মহারা হইয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে জ্যোৎস্নার দিকে দুই পা অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তখনই আত্মসংবরণ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

জ্যোৎস্না কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি তোমার বিজুকে কলঙ্কিনী বলি—একবার কেন, সহস্রবার বলি। যে কুলটা, তাহাকে কলঙ্কিনী বলিতে ডরাইব কেন? তোমার ভয়ে নয়—তোমার বিজুর ভয়েও নয।"

রমেশ অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "আমি জানি, তোমার রসনা পাপ-কলুষিত। কিন্তু এত বড় অসত্য তুমিও জীবনে কখন বল নাই—বলিতে পারিবে, তাহাও মনে স্থান দিই নাই।"

জ্যো। কেমন করিয়া জানিলে, কথাটা অসত্য?

র। পৃথিবীর সকলে কলঙ্কিনী হ'তে পারে—স্বর্গের দেবীরাও কলঙ্কিনী হ'তে পারে, কিন্তু আমার ভগ্নী কখন কলঙ্কিনী হ'তে পারে না।

জ্যো। কবিত্ব ছাড়িয়া একটা কথার উত্তর দাও দেখি।

র। যাহা বলিবার আছে, শীঘ্র বল।

জ্যো। নির্ম্মল কাহাকেও কিছু না বলিয়া গভীর রাত্রিতে হঠাৎ চলিযা গেল কেন, বলিতে পার?

র। সম্ভবতঃ তোমারই অত্যাচারে বা কৌশলে।

জ্যো। আমার অত্যাচারে! সে কি রকম?

র। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইও না—কি বলিতে চাও, শীঘ্র বল।

জ্যো। যাহা দেখিযা নির্ম্মল তোমার পাপ-গৃহ ত্যাগ করিযাছেন—

র। যে গৃহে তুমি অধিষ্ঠাত্রী, সে গৃহ নিঃসন্দেহ পাপ-গৃহ।

জ্যো। নির্ম্মলকুমার স্বচক্ষে তোমার আদরের বিজুকে পাপকার্য্যে নিরত দেখিয়া এ পাপগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন।

র। যদি তিনি তাহা দেখিয়া থাকেন, তবে তিনি তোমারই ষড়যন্ত্রে প্রতারিত হইয়াছেন।

জ্যো। ভাল, স্বীকার করিলাম, আমি ষড়যন্ত্র করিয়া নির্ম্মলকে প্রতারিত করিয়াছি। কিন্তু নির্ম্মল যখন বিজুকে পাপকার্য্যে নিরত দেখিয়া ধিক্কার দিলেন, তখন বিজু নীরব রহিল কেন?—আত্মদোষক্ষালনের জন্য তখন বা পরে স্বামীর নির্বুদ্ধিতা জগতে প্রচার করিল না কেন?

র। কুলটারাই স্বামিনিন্দা করে।

জ্যো। কাহার উদ্দেশে এ কথা বলিতেছ ?

র। তোমার উদ্দেশে।

জ্যো। কুলটা কে ?

র। তুমি।

জ্যো। আমি কুলটা ?

র। শুধু কুলটা কেন—তুমি পতিঘাতিনী।

বাণাহতা হরিণীর ন্যায় জ্যোৎস্না অকস্মাৎ আঘাতে চমকিত হইয়া একটু সঙ্কুচিত হইল, একটু পিছাইয়া গেল। কোনও উত্তর করিল না। রমেশ মধ্যাহ্নভাস্করতুল্য জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নাকে দগ্ধ করিতে করিতে তীব্র মর্ম্মন্তুদ ভাষায় ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আর অপরাধ গোপন করিবার চেষ্টা করিও না জ্যোৎস্নাবতী—আমি সকলই জানিয়াছি। আমার উপর তুমি সহস্র অত্যাচার করিয়াছ—তোমার সহস্র অপরাধ আমি ক্ষমা করিয়াছি। এবারও তোমাকে ক্ষমা করিতাম ; কিন্তু—যে আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া ঘৃণিত বিষবিক্রেতার সাহায্যে স্বামীকে হত্যা করিবার প্রয়াস পায়—নারীর মর্য্যাদা উপেক্ষা করিয়া নারীর ধর্ম্মসংহার করিতে সহায়তা করে—বংশমর্য্যাদা পদদলিত করিয়া স্বামীর ভগ্নীকে কলঙ্কিনী অপবাদ দিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, সে ক্ষমার অযোগ্য—দয়ার অতীত। আর নয়, জ্যোৎস্নাবতী, আর তোমার ক্ষমা নাই। কি বলিব, তুমি আমার পিতৃবংশের কুলবধূ, নতুবা—"

জ্যো। নতুবা কি করিতে ?

র। নতুবা তোমাকে এমন শাস্তি দিতাম, যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেহ কখনও দেখে নাই, কল্পনাও করে নাই।

জ্যোৎস্নার মুখ শুকাইয়া বিবর্ণ হইল—ভয়ে নয়, লজ্জায় নয়, অনুতাপে নয়,—নিরাশায়। জ্যোৎস্নার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল—সকল আশা চূর্ণ হইল। জ্যোৎস্না ভাবিয়া দেখিল, দোষক্ষালনের আর কোনও উপায় নাই। তবু ছাড়িল না ;—একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে ম্লান অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা বিকসিত করিয়া বলিল, "দেখিতেছি, এখনও তুমি রোগমুক্ত হও নাই—তোমার মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত।"

সে কথার উত্তর না দিয়া রমেশ বলিলেন, "এক বৎসর পূর্ব্বে তোমায় ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবার বাসনা কখনও মনে জাগে নাই—সম্প্রতি সেটা জাগিয়াছে। বিবাহ করিলেও তোমায় আশ্রয়চ্যুত করিতাম না। কিন্তু আজ যাহা দেখিলাম, শুনিলাম, তাহা হিন্দুমহিলাতে দেখিব বলিয়া জ্ঞান ছিল না। যে পতিদ্বেষিণী, বংশমানাপহারিণী, তাহার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তোমার সহিত আমার আজ হইতে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল—তুমি এখনই এ গৃহ ত্যাগ কর।"

রমেশ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন আনন্দপুর ছাড়িয়া বধূগ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল, তখন বিলির চমক ভাঙ্গিল। সম্মুখে ধূসরবর্ণ আকাশের গায় সমুন্নত প্রাসাদচূড়া দেখিয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "এ কোথায় এসেছি ?"

দ্বারবান্ বলিল, "বধূগ্রামে।"

"এখানে কেন আবার ? নৌকা ফিরাও।"

মাঝিরা এ কথায় বিশালপুরে ফিরিয়া যাইবার আদেশ বুঝিল। ভালমন্দ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহারা উত্তরাভিমুখে চলিল।

তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। ঘনীভূত অন্ধকার গঙ্গার গর্ভ হইতে চুপি চুপি উঠিয়া জাহ্নবীর উপকূল ছাইয়া ফেলিয়াছে—যেন দিগ্‌দিগন্তকে চাপিয়া ধরিয়া গঙ্গাগর্ভে ডুবাইয়া দিতেছে। সব অন্ধকার। ক্রমে জাহ্নবী নিজেও অন্ধকারমধ্যে লুকাইলেন।

বিলির নৌকায় দীপ জ্বলিতেছিল। আকাশ স্থানে স্থানে মেঘাচ্ছন্ন—পৃথিবী নিষ্প্রভ। ক্রমে রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, মেঘও তত ঘনীভূত হইতে লাগিল। মেঘের সঙ্গে বাতাসও উঠিল। মাঝিরা দুইখানা ক্ষুদ্র পাল তুলিয়া একটু সাবধানতার সহিত চলিল। নৌকা জল কাটিয়া—শূন্য-মস্তিষ্ক অহঙ্কৃত ধনীর ন্যায় —বাতাস মাথায় বাঁধিয়া গর্ব্বচাঞ্চল্যে তীরবেগে ছুটিল।

বিলি ঘুমায় নাই ; ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে শুইয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল। মনে মনে স্থির করিল, "এবার নিশ্চয় মরিব। কিন্তু কেমন করিয়া মরিব ? যদি জলে ডুবিয়া মরি, জীবনান্তে লোকে আমার দেহ দেখিবে,—শব সনাক্ত করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া আমার বিকৃত দেহ নাড়িবে চাড়িবে। যদি বিষ খাইয়া বা গলায় দড়ি দিয়া মরি, তা'তেও নিস্তার নাই ;—দেহ লইয়া পুলিসে টানাটানি, ডাক্তারে কাটাকাটি করিবে। তা' মনে হ'লে লজ্জায় প্রাণ এখনই কাঁপিয়া উঠে। তবে কি করিয়া মরিব ? যদি আগুনে পুড়িয়া মরি ?

পুড়িয়া মরিলে দেহের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না—সব ছাই হইয়া যাইবে। সেই ভাল; পোড়াইয়া এই দেহ ছাই করিব। কিন্তু—কিন্তু আত্মহত্যায় ত অধর্ম্ম নাই? পাপ নাই? আমি কি করিতেছি, তা' ত বুঝিতে পারিতেছি না। ভগবান্, আমি জ্ঞানহীনা, অন্ধ, প্রাণের যাতনায় অধীর হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই ভুলিয়াছি, প্রভু! আমায় পথ দেখাইয়া দাও, দয়াময়!"

গলদশ্রুলোচনে বিলি ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল। ডাকিতে ডাকিতে মন কতকটা শান্ত হইল। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। নৌকা সমানই চলিতেছে। তবে মেঘ ও অন্ধকার যেন আরও একটু গাঢ়—বাতাস যেন আরও একটু প্রবল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে মাঝিরাও অদৃশ্য হইল।

এমন সময় মাঝিরা পিছনে একটা শব্দ শুনিতে পাইল। একটু উদ্বিগ্নচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। শব্দ যখন নিকটতর হইল, তখন মাঝিরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, একখানা অপেক্ষাকৃত বড় নৌকা বড় পাল তুলিয়া সোঁ সোঁ শব্দে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি হালে ছিল, সে দাঁড়ীকে দীপ তুলিয়া ধরিতে আদেশ করিল। দেখিতে দেখিতে পিছনের শব্দ আরও নিকটবর্ত্তী হইল। তখন মাঝিরা চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার থামিতে না থামিতে পিছনের নৌকা প্রবলবেগে তাহাদের উপর আসিয়া পড়িল একটা কোলাহল, একটা সজ্ঘর্ষণ-শব্দ।—তার পর সব স্থির,—উভয় নৌকা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ডুবিয়া গেল।

পিছনের নৌকার আরোহী হারাণ।

হারাণ বিশালপুর হইতে বরাবর বিলির অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। সে যখন দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যাকালে বধূগ্রামের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন বিলি চলিয়া গিয়াছে—তা'র কিছু পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। ঘাটে আসিয়া হারাণ বিলির নৌকা খুঁজিল, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। তখন সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তীরে উঠিল।

তীরে কাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। জমীদার বাবুর অট্টালিকা পানে লক্ষ্য রাখিয়া হারাণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু জনপ্রাণী কোথাও দেখিতে পাইল না। ঘাটে নৌকা নাই, তীরে মানুষ নাই। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া হারাণ নৌকায় আসিয়া বসিল।

ক্ষণপরে দেখিল, কে যেন ঘাটে নামিয়া নৌকার দিকে আসিতেছে। যখন সে নিকটবর্ত্তী হইল, তখন হারাণ তাহাকে চিনিল। চিনিবামাত্র নৌকা হইতে নামিল।

আগন্তুক রেবতী। আনন্দপুরে সে বিলির সঙ্গ ছাড়িয়াছে। রেবতী সোহাগদের বাড়ীতে গিয়াছিল। কিন্তু সেখানে যেমনটা দেখিবে মনে করিয়াছিল, তেমনটা দেখিতে পায় নাই। সুতরাং হাতের চাকরীর মায়া কাটাইতে না পারিয়া বিলির নৌকার পাছু পাছু ডাঙ্গা-পথে ছুটিয়া আসিতেছিল।

হারাণের নৌকাখানা বিলির পান্সী বলিয়া রেবতীর ভ্রম হইল; কিন্তু সত্বরই সে ভ্রম ভাঙ্গিল। নিকটে আসিয়া দেখিল—সম্মুখে হারাণ।

হারাণকে দেখিয়া রেবতী বলিল,"তুমি এখানে কেন, হারাণ বাবু?"

হারাণ। তুমিই বা এখানে কেন, রেবতী বাবু?

রে। আমি বউদিদির খোঁজে এসেছি।

হা। তবে তিনি বাড়ীতে আসেন নাই?

রে। না।

হা। আমিও তাই ভাবিয়াছিলাম।

রে। কি ভেবেছিলে?

হা। তিনি এ বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবেন না।

রে। কেন?

হা। সে অনেক কথা। এখন বল দেখি, তোমার বউদিদি কোথায়?

রে। তুমি কি তাঁর খোঁজে এখানে এসেছ?

হা। তা' নইলে কি তোমার খোঁজে এসেছি?

রে। তবে আমি কোনও কথা বলব না।

হা। না বল, গঙ্গায় ডুবিয়ে মারব।

রে। আমি চীৎকার ক'রে লোক ডাকব।

হা। লোক আসিবার পূর্ব্বে তোমায় ডুবাইয়া অন্ধকারে লুকাইতে পারিব।

রেবতী ভাবিয়া দেখিল, সেটা ঠিক কথা। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; সাহায্য করিতে পারে, এমন মানুষ কোথাও নাই। তখন সে ভীত হইয়া যাহা জানিত, তাহা বলিল। হারাণ স্থির করিল, বিজলী বিশালপুরের দিকে গিয়াছে। তখন সে কালবিলম্ব না করিয়া লম্ফত্যাগে নৌকায় উঠিল। যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, তখন রেবতী বলিল, "আমি এখনই বাবুকে সকল কথা ব'লে দেব—তোমাকে পয়জার-পেটা করিয়ে ছাড়ব।"

হারাণ উত্তর করিল,"তুমি আমাকে অপমানের ভয় দেখাইতেছ? লোকনিন্দা, সমাজ-শাসন, মৃত্যু-ভয়,—সকলই এখন ভুলিয়াছি। আমায় ভয় দেখান মিছা।"

অন্ধকার ভেদ করিয়া হারাণ উত্তরাভিমুখে নৌকা ছুটাইল। মাঝিকে সরাইয়া নিজে হালে বসিল। নৌকাচালনায়, সন্তরণে হারাণ সবিশেষ দক্ষ। এমন দক্ষতা গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী অধিবাসীদের অনেকেরই ছিল। হারাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে—মেঘ, অন্ধকার, বিপদ্-সম্ভাবনা গ্রাহ্য না করিয়া নক্ষত্রগতিতে ছুটিল। কিন্তু উত্তর-মুখী পান্‌সী কোথাও দৃষ্ট হইল না। এই সূচীভেদ্য অন্ধকারমধ্যে দেখাই বা কেমন করিয়া মিলিবে? কেমন করিয়া মিলিবে, হারাণ তাহা জানিত।

হারাণ জানিত যে, উজান বহিয়া যাইতে হইলে কিনারা ধরিয়া যাইতে হয়। কিনারায় স্রোত তত প্রবল নয়। বধূগ্রাম গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে; তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাইতে হইলে পশ্চিমকূল ধরিয়াই সচরাচর লোকে গিয়া থাকে। হারাণ তাই পশ্চিমদিকের কিনারা ধরিয়া চলিতেছিল।

হারাণ জানিত, প্রত্যেক গমনশীল নৌকাতে আলো থাকে। হারাণের নৌকাতে একটা আলো ছিল। বিলির পান্‌সীতেও থাকিবার সম্ভাবনা। এই সকল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হারাণ সম্মুখে আলো খুঁজিতে খুঁজিতে কিনারা ধরিয়া চলিল।

মাঝিরা অনেকেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু হারাণের নিদ্রা নাই, আলস্য নাই;—হাল ধরিয়া সে সমান চলিয়াছে। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন হারাণ সম্মুখে একটা আলো দেখিতে পাইল। নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল, একটা নৌকার উপর আলো জ্বলিতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে হারাণ দুইখানা পাল তুলিয়া দৃঢ় হস্তে হাল ধরিল। নৌকা আরও ছুটিল; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্রগামী নৌকাকে অতিক্রম করিয়া দূরে দাঁড়াইল। অতিক্রমকালে হারাণ কি দেখিল, জানি না, কিন্তু সে দূরে দাঁড়াইয়া নিজের নৌকার আলো নিবাইয়া দিল। পরে পাল গুটাইয়া নৌকা দক্ষিণমুখে ফিরাইল। ফিরিয়া আবার পান্‌সীর পিছনে আসিল। একবার একটু গুছাইয়া কাপড় পরিল—মোটা দড়ি দিয়া হাল কষিয়া বাঁধিল; তার পর চারিখানা পাল তুলিয়া হারাণ ঝড়বেগে সম্মুখের নৌকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সঙ্ঘর্ষণের ফলাফল পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যখন শব্দ থামিয়া গেল—কোলাহল ডুবিয়া গেল, তখন সেই নিবিড় অন্ধকারমধ্যে বিভীষিকাময় নীরবতা মন্থন করিয়া কে চীৎকার করিয়া বলিল, "বিজলী, আমার সর্ব্বস্ব, কোথায় তুমি?"

উত্তর হইল, "আবার এসেছ? সুনাম, শান্তি ঘুচাইয়াও তৃপ্ত হও নাই; আর কি চাও, পিশাচ?"

"তোমায় চাই।"

"জন্মজন্মান্তরেও পাবে না।"

"এখনি তা' দেখা যাবে।"

"তবে ডুবিলাম।"

বিলি একখানা ভাঙ্গা কাষ্ঠ ধরিয়া ভাসিতেছিল, সেটা ছাড়িয়া দিয়া ডুবিল। সঙ্গে সঙ্গে হারাণও ডুবিল। ক্ষণপরে হারাণ উঠিল। কিন্তু বিলি কোথায়? চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া হারাণ বিলিকে খুঁজিল, কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। বিলি মনে করিয়া ভ্রমবশতঃ কখনও একখানা ভাঙ্গা কাষ্ঠ ধরিল—কখন বা প্রবাহতাড়িত মাঝির দেহ জড়াইয়া ধরিল। নিরাশ হইয়া হারাণ ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিজলী, বিজলী!" কেহ সাড়া দিল না। হারাণ আবার ডুবিল,—গঙ্গার তলদেশ পাতি পাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। এবার অনেকক্ষণ ডুবিয়া রহিল। যখন উঠিল, তখন তাহার বাহুমধ্যে বিজলী। বিজলী জ্ঞানশূন্যা। হারাণ তাহার অচৈতন্য দেহ টানিয়া আনিয়া তীরে উঠাইল।

যখন হারাণ তীরে উঠিল, তখন পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ভগ্ন নৌকার চিহ্নমাত্র নাই; মাঝিরাও নয়নগোচর হইল না। পিছনে ফিরিয়া দেখিল; দেখিল, উচ্চ পাহাড়। বিলির দেহ স্কন্ধের উপর লইয়া, হারাণ দৌড়িয়া পাহাড়ের উপর উঠিল।

বিলির চৈতন্যোৎপাদনের কোনও চেষ্টা হারাণকে করিতে হইল না; আপনা হইতেই তাহার সংজ্ঞা হইল।

জ্ঞানসঞ্চার হইলে বিলি চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সম্মুখে হারাণ। তখন সকল কথা তাহার মনে পড়িল—সে তৎক্ষণাৎ "বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। হারাণ বলিল, "এখানে রোহিত নাই, দাদা নাই, কে তোমায় রক্ষা করিবে, বিজলী?"

বি। ধর্ম্ম।

হা। ধর্ম্মকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার।

বি। তুমি কি মনে কর যে, ধর্ম্ম তোমার মত পশুর ক্রীড়া-সামগ্রী?

হা। ক্রীড়া-সামগ্রী কি না, তার পরিচয় এখনই পাবে।

বি। যে ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করে—ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারে,তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা তোমার মত পশুর সাধ্য নয়।

হা। প্রাণটা কি সহজে কেহ দিতে পারে? তোমার জন্য প্রাণ দিতে আমি শতবার পারি; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য পারি না।

বি। যে পশু, সে পারিবে কেন?

হারাণের সহিত তর্ক করিয়া কিছু সময় লওয়া বিলির উদ্দেশ্য। হারাণ যখন উত্তর-প্রত্যুত্তরে ব্যস্ত, তখন বিলি ধীরে ধীরে পিছাইয়া পাড়ের ধারে আসিতে লাগিল।

হারাণ বলিল, "ধর্ম্মটা কিছুই নয়—একটা অলীক কল্পনামাত্র।"

বি। কল্পনাই হউক, সত্যই হউক, ধর্ম্মবল তুল্য সংসারে কিছুই শক্তিশালী নাই।

বিলি আবার একটু পিছাইল।

হা। ধর্ম্ম যদি এ যাত্রা আমার হাত হ'তে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে, তা হ'লে বুঝিব, ধর্ম্ম আছে—ধর্ম্মের শক্তি আছে।

বি। তোমার জন্মের বহুপূর্ব্বে অনেকেই ধর্ম্মের বল পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

বলিতে বলিতে বিলি আর একটু পিছাইল; এবার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল—আর এক পদ পিছাইলেই নীচে গঙ্গা।

বিলীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হারাণ বলিল, "ধর্ম্ম আজ তোমায় রক্ষা করিতে পারে?"

বি। সহস্র উপায়ে পারে।

হা। একটা উপায়ই আগে দেখা যাক্।

বি। তবে দেখ।

কথা শেষ হইতে না হইতে বিলি গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হারাণ ছুটিয়া পাড়ের ধারে আসিল; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। কেবল বিলি যেখানটায় পড়িয়াছিল, সেইখানটার জল চক্রে চক্রে ঘুরিয়া স্থান নির্দ্দেশ করিতেছিল। হারাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গঙ্গাবক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিল; কিন্তু কোথাও বিলিকে দেখিতে পাইল না। ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে লম্ফত্যাগে গঙ্গাবক্ষে পড়িবার উদ্‌যোগ করিল; এমন সময় পিছন হইতে কে এক জন ছুটিয়া আসিয়া হারাণের গলায় গামছা বাঁধিয়া আঁটিয়া ধরিল। হারাণ চমকিত হইয়া—জানি না, কোন্ আশায় প্রলুব্ধ হইয়া—বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, বিজলী নয়—নৌকার এক জন মাঝি। হতাশ হইয়া হারাণ আবার গঙ্গাপানে চাহিল।

মাঝির বাড়ী বিশালপুরে; সে রমেশের প্রজা। বাবুর সম্বন্ধীর আদেশে নৌকা লইয়া আসিয়াছিল। সেই নৌকার এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই। তাহার বিশ্বাস, হারাণ ইচ্ছাপূর্ব্বক নৌকা ডুবাইয়াছিল। কেন ডুবাইয়াছিল, তাহাও কতকটা এক্ষণে বুঝিল। মাঝি বলিল, "না ডুবিয়েও ক্ষান্ত নস্, পাজি! আবার বাবুর বুনের উপর অত্যাচার। আজ তোর নিস্তার নেই; সকলে মিলে লাথিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ব—তার পর জমীদারকে ব'লে তোকে ফাটক দেব।"

দুই নৌকার মাঝিরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা এ-দিক ও দিক ছড়াইয়া জমীদার-ভগিনীর অনুসন্ধান করিতেছিল। হারাণের আক্রমণকারী চীৎকার করিয়া তাহাদের ডাকিল। ডাক শুনিয়া অনেকে আসিল। তখন সকলে মিলিয়া হারাণকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিল। কিন্তু হারাণ নড়িল না, কথা কহিল না;—কেহ প্রহার করিতেছে, তাহাও অনুভব করিল না; কেবল গঙ্গাপানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জাহ্নবীবক্ষঃ স্থির—বীচিমালা অরুণকিরণপ্রতিভাত। অনেক দূরে দুই একখানা নৌকা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু ভাসমান মনুষ্যদেহ কোথাও দৃষ্ট হইতেছিল না। হারাণ উন্মত্তদৃষ্টিতে গঙ্গাপানে চাহিতে চাহিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় একবার ছাড়িয়া দাও—গঙ্গার ভিতর একবার খুঁজিয়া আসি।"

মাঝিরা সে কথায় কর্ণপাত করিল না,—হারাণকে বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল। যাইবার পূর্ব্বে আর একবার সকলে মিলিয়া বিজলীকে খুঁজিল। কিন্তু কোথাও তাহাকে পাওয়া গেল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মাঝিরা সে দিন বিশালপুরে পৌঁছিতে পারিল না—পরদিন প্রাতে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া জমীদারের সম্মুখে হারাণকে হাজির করিল। রমেশ তখন কাছারী-গৃহে জমীদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। অনেক দিন তিনি কাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন নাই—কতকটা বিশৃঙ্খলা হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি এক্ষণে অবিরাম পরিশ্রম করিতেছেন; অথবা চিন্তারাশি ডুবাইবার অভিপ্রায়ে কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

হারাণকে দেখিবামাত্র রমেশের ক্রোধ গর্জ্জিয়া উঠিল। আত্মসংযম করিয়া মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "একে তোমরা কোথায় পাইলে?"

মাঝিরা তাহাকে যেখানে যেরূপ অবস্থায় পাইয়াছিল, তাহা বলিল। সকল কথা বলিয়া অবশেষে বিজলীর আত্মহত্যার কথাও বলিল।

রমেশের মাথায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিজু নাই! বিশ্বাস করিতে রমেশের প্রবৃত্তি হইল না। সে কোমলপ্রাণা, পাপশূন্যা বালিকা মরিতে পারে, রমেশ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সকল কথা শুনিয়াও আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিজু বধূগ্রামে ফিরিয়া গিয়াছে?"

মাঝিরা বলিল, "আজ্ঞে, না—"

রমেশ নীরব, স্তম্ভিত। হায়! তবে কি সত্যই বিজু নাই? এক গভীর শ্বাসে রমেশের সমস্ত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। মনকে বুঝাইতে না পারিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার—আমার বিজু—আমার ভগিনী কই? সে আসিল না?"

এক জন মাঝি উত্তর করিল, "আজ্ঞে, আজ্ঞে, তানাকে কুন্ন ঠাঁই খুঁজে পেলুমনি।"

ভূকম্পনে যেমন বসুধা কাঁপিয়া উঠে—রমেশের সমস্ত দেহ একবার তেমনই কাঁপিয়া উঠিল। অন্তর্প্লবে নদীবক্ষঃ যেমন স্ফীত হইয়া উঠে, রমেশের হৃদয় তেমনই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। রমেশ শোকে অভিভূত হইলেন। মস্তক বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িল; যেন বৃক্ষচূড়া বাত্যাহত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কক্ষে দেওয়ান, কর্ম্মচারী প্রভৃতি অনেকেই ছিল। প্রভুর নীরব যাতনা দেখিয়া একে একে সকলেই নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। কেবল দেওয়ান নড়িল না—হারাণও সরিল না। দেওয়ানের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিতেছিল—হারাণের শুষ্ক চক্ষুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। কিন্তু উভয়েই নীরব; বিভিন্ন ভাব হৃদয়ে লইয়া উভয়েই নীরব।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিল। অনেকক্ষণের পর রমেশ ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। সম্মুখে দেখিলেন,—হারাণ। রমেশের ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল—পাঁজর, বুক একবার ফুলিয়া উঠিল; তার পর সব স্থির। রমেশ ধীরে ধীরে বলিলেন, "হারাণ, সাত আট বৎসর তোমাদের সহিত কুটুম্বিতা হইয়াছে। এই সাত আট বৎসরের মধ্যে কখনও তোমার প্রতি কোনও দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি?"

হা। স্মরণ হয় না।

র। কখনও আমার নিকটে কোনও উপকার পাইয়াছ?

হা। শতবার পাইয়াছি।

র। তবে হারাণ, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিলে কেন?

হা। সর্ব্বনাশ করিয়াছি! কিসে করিলাম?

র। কিসে করিলে, তাও আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? সংসারে যেটুকু আমার সুখ ছিল, যেটুকু আমার আনন্দ ছিল, যেটুকু আমার স্নেহের বন্ধন ছিল, তাহা তুমি নষ্ট করিয়াছ; আমার হৃদয়ের উৎসাহ, আশা নিবাইয়া দিয়াছ; আমার তেজ, গর্ব্ব, বংশাভিমান ঘুচাইয়াছ,—আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি আমার কি করিয়াছ?

হা। রমেশ বাবু, এইটুকু অপরাধের জন্য এতটা অনুযোগ! তবে তুমি আমার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তাহা আমি কি বলিয়া বুঝাইব?

র। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি!

হা। হাঁ, তুমি রমেশ বাবু, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ।

র। আমি কবে তোমার কি করিয়াছি?

হা। কবে কি করিয়াছ, শুনিতে চাও? যখন আমি পাপ কাহাকে বলে, ভালবাসা কাহাকে বলে, জানিতাম না—যখন সৌন্দর্য্যের মাদকতা, পাপের কল্পনা, আমার মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত হয় নাই, তখন এক দিন সহসা তোমার শয্যাপার্শ্বে ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্যরাশি একত্রিত দেখিলাম। দেখিয়া মজিলাম—ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য-বিবেচনাশূন্য হইলাম—সেই সৌন্দর্য্যরাশি হৃদয়ে ধরিবার আশায় উন্মত্ত হইলাম। তুমি আমার প্রবৃত্তির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলে। বাধা পাইয়া প্রবৃত্তি শতগুণ তেজে ফুলিয়া উঠিয়াছিল;—ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের ন্যায় তোমাকে সরাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম।

হারাণ একটু থামিল; একবার একটু বিশ্রাম লইয়া আবার বলিতে লাগিল, "তোমার চেয়ে নির্ম্মল আমার পক্ষে তীক্ষ্ণতর কণ্টক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নির্ম্মলের প্রতি বিজলীর গাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি সীমাহীন বারিধিমধ্যে প্রভাত-নক্ষত্রের ন্যায় বিজলীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। সে অনুরাগ, সে ভক্তি নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। জাল চিঠি লিখিয়া, মিথ্যা গল্প সৃষ্টি করিয়া নির্ম্মলের প্রতি বিজলীর অনুরাগ ধ্বংস করিলাম। কিন্তু ভক্তি অধ্বংসনীয় দেখিয়া বিজলীকে ছাড়িয়া নির্ম্মলের দিকে ফিরিলাম; অতুলনীয়া বিজলীর চরিত্র কলঙ্কমণ্ডিত করিয়া নির্ম্মলের সম্মুখে ধরিলাম। নির্ব্বোধ নির্ম্মল,

ভ্রাতা ভগিনীর কৌশলে ভুলিয়া, দেবীলাঞ্ছিতা লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীকে কুলটা ভাবিয়া ভারগ্রস্ত হৃদয় লইয়া পলাইল।"

হারাণ আবার থামিল; অতীতের একটা দৃশ্য তাহার মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল। সেই ঝড়বৃষ্টিময়ী কৃষ্ণবসনা নিশাতে, তাড়িত-কিরণোদ্ভাসিত উদ্যান-মধ্যে, বারিসিক্ত দামিনীলতাতুল্য অচৈতন্য বিজলীর রূপরাশি স্মৃতি-বক্ষে ভাসিয়া উঠিল। হারাণ মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া অতীতের সেই স্মৃতিটুকু বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিল। পর ক্ষণেই সহস্র বৃশ্চিক-দংশনতুল্য যাতনায় জ্বলিয়া উঠিয়া আগ্নেয় ভূধরের ন্যায় অনলরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে বলিল, "কার দোষে আমার প্রবৃত্তি দিন দিন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তা' জান, রমেশ বাবু? তোমার দোষে। তুমি আমার পায় শৃঙ্খল বাঁধিয়া মহা প্রলোভন আমার সম্মুখে ধরিয়াছিলে কেন? তুমি আমার মনের অবস্থা জানিয়াও আমাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দাও নাই কেন? বিজলীকে আমার সান্নিধ্য হইতে অপসৃত কর নাই কেন? এ মহা প্রলোভনের সম্মুখে আমি স্থির থাকিতে পারি নাই বলিয়া কি আমার অপবাদ? যদি তাই হয়, তবে যিনি প্রলোভন সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অবিবেচক; আর যে আমার সম্মুখে প্রলোভন ধরিয়াছিল, সেও মূর্খ ও অপরিণামদর্শী। তোমার এই অপরিণাম-দর্শিতার ফলে আমার কি হইয়াছে, জান? আমার সকল সুখের আধার স্মৃতিটুকুও বিষময় হইয়াছে। যখনই আমি তাহাকে ভাবি, তখনই আপনা হ'তে মনে পড়ে যে, আমিই তাহাকে মারিয়াছি—আমার বজ্রস্পর্শে সে অপাপবিদ্ধা কুসুমলতিকা শুকাইয়া গিয়াছে। সে আত্মগ্লানির সঙ্গে আমার কি যাতনা হয়, তা'—যে জগতে কাহাকেও ভালবাসে নাই, জ্ঞানতঃ কাহারও সর্ব্বনাশ করে নাই—সে কি বুঝিবে? সে তুলনায় তোমার যাতনা অতি সামান্য! তুমি তাহাকে ভাবিতে পার—আমি তা' পারি না; তুমি তার জন্য কাঁদিতে পার—আমি কাঁদিতেও পারি না। তুমি তাহার এক একটি স্মৃতি লইয়া আদর করিতে পার—আমি তা' পারি না। তাহাকে ভাবিতে গেলে অবক্তব্য যন্ত্রণায় হৃদয় ফাটিয়া যায়; কিন্তু না ভাবিয়াও থাকিতে পারি না। তোমারই কার্য্যফলে আমার জীবন যেরূপ নরকযন্ত্রণাতুল্য জ্বালাময় হইয়াছে—সেরূপ শাস্তি বুঝি মানুষের কল্পনায়, ভগবানের কল্পনায় কখনও আসে নাই। তবু আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছ?"

রমেশ বলিলেন, "তুমি মহা পাপিষ্ঠ—তোমার মুখ-দর্শনেও পাপ, তুমি দূর হও—এ দেশে আর আসিও না।"

হারাণ বলিল, "সে কি রমেশ বাবু? তুমি আমাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিবে? তোমার না লেঠেল আছে?—গুপ্ত জেলখানা আছে? তুমি না সেখানে বদ্‌মায়েস প্রজাদের ঠেঙ্গাইয়া মার? তবে আমায় ছাড়িয়া দিতেছ কেন? তোমার লেঠেল ডাক—আমায় খোঁচাইয়া মার।"

রমেশ বিস্মিত হইয়া হারাণের মুখপানে চাহিলেন; পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমি তোমাকে শাস্তি দিতে চাহি না—ভগবান্ তোমাকে শাস্তি দিবেন।"

হা। ভগবানের সাধ্য কি? সে ত ক্ষমতা-হীন জড়পিণ্ডমাত্র। যদি তার সামর্থ্য থাকিত, তা হ'লে যে ত্রিভুবনে সকলের চেয়ে পবিত্র, সকলের চেয়ে সুন্দর, তা'কে আজ সে জলে ডুবাইয়া মারিত না—আমার মত পাপিষ্ঠের নির্য্যাতন হইতে তাহাকে রক্ষা করিত।"

র। এখন বুঝিয়াছ তুমি পাপিষ্ঠ? তবে আর আমায় বিরক্ত করিও না—এখান হইতে দূর হও।

হা। তবু আমাকে শাস্তি না দিয়া ছাড়িয়া দিতেছ? এ বিশ্ব-সংসারে যে তোমার একমাত্র স্নেহবন্ধন ছিল, পবিত্রতায় যে তোমার বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিল, আমি তাহাকে মারিয়াছি—তাহার চরিত্র কলঙ্কিত করিতে সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাইয়াছি।—তোমার সংসারে থাকিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতায় তোমার শত উপকারের প্রতিদান দিয়াছি—নিরপরাধ নির্ম্মলের জীবন বিষময় করিয়াছি; তবু তুমি আমাকে শাস্তি দিবে না? তুমি কি মানুষ নও? তোমার কি তেজ নাই? শোকে অভিভূত হইয়া কি মনুষ্যত্ব ভুলিয়াছ? যদি তুমি পশু না হয়ে মানুষ হও—তোমার স্বর্গগত ভগিনীর নির্য্যাতনের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার লেঠেল ডাক—আমায় মার—আমার হৃদয়টা টানিয়া, ছিঁড়িয়া পদতলে মথিত কর। ঐ দেখ—ঐ শুন, আকাশ থেকে তোমার ভগিনী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 'হারাণকে মার—মহাপাপিষ্ঠ হারাণকে পুড়াইয়া মার;—যে আমার মহা সর্ব্বনাশ করিয়াছে, জাল 'চিঠি লিখিয়া আমার

প্রতি স্বামীর অনুরাগ নষ্ট করিয়াছে, প্রতারণা করিয়া স্বামীর চক্ষে আমাকে কলঙ্কিনী সাজাইয়াছে, ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছে, অবশেষে আমায় জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে, সে হারাণকে মারিয়া এ অপমানের প্রতিশোধ লও, আমাকে যেমন জ্বালাইয়াছে, তেমনি তাহাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মার।' ভগিনীর সকাতর চীৎকারেও কি তোমার তেজ জাগিয়া উঠে না? নির্জ্জীব, নিস্তেজ হৃদয়েও কি প্রাণের সঞ্চার হয় না? চোখে জলধারা! এখন কি কাঁদিবার সময়? আগে শত্রু মার, অপমানের প্রতিশোধ লও—তা'র পরে সমুদ্রের জল চোখে নিয়ে চিরকাল ধ'রে কাঁদো।"

রমেশ উত্তর করিলেন না। দেওয়ান হারাণকে ধরিয়া কক্ষের বাহিরে লইয়া আসিল; এবং দ্বারবান সঙ্গে দিয়া গ্রামের বাহির করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন অপরাহ্লে নির্ম্মলকুমার ব্যাকুলান্তঃকরণে বিশালপুরে ছুটিয়া আসিলেন। রমেশ তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। অনেক কথা হইল; কিন্তু বিজলীর মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দেওয়া হইল না। রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত কথা কেমন করিয়া জানলে, নির্ম্মল?"

নির্ম্মল। দুই দিন আগে রেবতীর কাছে শুনিয়াছি।

রমেশ। রেবতীও সকল কথা জানে না। যদিও ষড়্‌যন্ত্র লিপ্ত ছিল—পত্র ডাকে না দিয়া হারাণকে দিয়া আসিত, তথাপি সে সকল কথা অবগত ছিল না।

নির্ম্মল। রেবতী যাহা অবগত আছে, তাহাই যথেষ্ট। তাহার নিকট দুশ্চরিত্রা কথা শুনিয়াই আমার সন্দেহ উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া তোমার নিকট ছুটিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তুমি যে কথা বলিতেছ—

রমেশ। আমি কোন্ কথা বলিতেছি?

নির্ম্মল। পত্রগুলা জাল—

রমেশ। হাঁ—বলিয়া যাও।

নির্ম্মল। যদি সত্যই জাল হয়—

রমেশ। এখনও সন্দেহ? তবে পরীক্ষা করিবে, এস।

উভয়ে উঠিলেন। যে কক্ষে বিজলি শুইত, উভয়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহদ্বার তালাবদ্ধ ছিল; চাবি বাহির করিয়া রমেশ ধীরে ধীরে চুপি চুপি কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিলেন। যেন ঘরের ভিতর কে নিদ্রিত আছে—শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে, রমেশ তাই চুপি চুপি দ্বার খুলিলেন। খুলিয়া, পীঠস্থানে দেবীমন্দিরে লোকে যেরূপ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রবেশ করে, রমেশ সেইরূপ রুদ্ধশ্বাসে ধীরে ধীরে ভক্তিপ্লুতহৃদয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নির্ম্মলও তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

কক্ষের যে জিনিসটি বিজলি যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল, সে জিনিসটি সেই অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। দেওয়ানের হুকুমে কেহ কোনও দ্রব্য স্থানান্তরিত করে নাই। মেঝের উপর বোতল-চূর্ণও তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে। যেখানটায় কাচ-চূর্ণ পড়িয়াছিল, সেখানটায় রক্তের দাগও অল্লাধিক-পরিমাণে আজও লাগিয়া রহিয়াছে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উভয়ে একবার চারিদিক নিরীক্ষণ করিলেন। নির্ম্মল এই কক্ষে পূর্ব্বে কয়েকবার আসিয়াছিলেন; কিন্তু আজ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র প্রাণের ভিতর যেমন আকুলি বিকুলি করিয়া উঠিল, তেমনটা পূর্ব্বে আর কখন করে নাই। নির্ম্মলের বোধ হইল, যেন কক্ষমধ্যে বিজলীর নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শ্রুত হইতেছে—যেন বিজলীর সুগন্ধময় নিশ্বাসে কক্ষ এখনও আমোদিত। শয্যার অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মলের মনে হইল, যেন এইমাত্র বিজলি শয্যা ত্যাগ করিয়া কোথায় লুকাইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া একটা অপ্রাপ্য সুখের আশায় নির্ম্মলের প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল।

রমেশ বাম হস্তে নির্ম্মলের কর স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে বোতলচূর্ণ দেখাইয়া বলিলেন, "এই কাচচূর্ণ এখানে কেন, জান? ক্ষণপূর্ব্বে তুমি আমায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই কাচ তাহার উত্তর প্রদান করিতেছে। যাহার পবিত্রতায় তুমি সন্দিহান হইয়া তোমার ও তাহার জীবনের সুখ নষ্ট করিয়াছ, তাহারই তেজ, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম্মবলের সাক্ষ্যস্বরূপ এই চূর্ণরাশি এখানে পড়িয়া রহিয়াছে।"

নির্ম্মল এইরূপ কিছু কিছু রেবতীর নিকট শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে রমেশ যখন ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলেন, তখন নির্ম্মলের মনে আনন্দ ও গর্ব্বের সঞ্চার হইল। রমেশ বলিলেন, "এস, যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে এস।"

নির্ম্মলকে সঙ্গে লইয়া রমেশ পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেটা বিলির বসিবার ঘর। বিলি সেখানে দিবসে বসিত, শুইত; পত্রাদি লিখিত, পড়িত। এ ঘরে বিলির একটা ছোট বাক্স ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। রমেশ সেই বাক্সটি নির্ম্মলের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই আধারমধ্যে কতকগুলি পত্র ও তোমার একখানি ছবি আছে। পত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি, সকলগুলি তোমার লিখিত কি না।

সুদীর্ঘকাল পরীক্ষার পর নির্ম্মল বারো তেরখানা পত্র কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। বলিলেন, "এরূপ পত্র আমার দ্বারা লিখিত হওয়া কোনও প্রকারে সম্ভব নয়।"

রমেশ। যে সকল পত্র পাইয়া তুমি জ্বলিয়া উঠিয়াছিলে, সে সকল পত্র বিজলীর দ্বারা লিখিত হওয়া সম্ভব কি না, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছিলে কি?

নির্ম্মল। প্রথমে তাহা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু এমনই ধাপে ধাপে পরদায় পরদায় পত্রের সুর চড়িয়াছিল যে, চিঠির কৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিবার হেতু বা অবসর পাই নাই।

রমেশ। যে কৌশলে তুমি ভুলিয়াছ, সে কৌশলে একটি বালিকা ভুলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? সে কথা যাক্। পত্রগুলা কৃত্রিম কি না, তাহার আরও প্রমাণ দেখিতে চাও? ভাল, এ দিকে এস।

সে মহল ত্যাগ করিয়া হারাণ যে ঘরে থাকিত, উভয়ে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কক্ষও তালাবদ্ধ ছিল। চাবি খুলিয়া উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

একটা আলমারী হইতে এক তাড়া পত্র লইয়া রমেশ নির্ম্মলের হাতে দিলেন, এবং বলিলেন, "পত্রগুলি পড়িয়া দেখ—তোমার ও বিজুর অপহৃত পত্রনিচয় দেখিতে পাইবে।"

বিজলীর লিখিত পত্রগুলি নির্ম্মল একে একে পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে নির্ম্মলের চক্ষু ফাটিয়া জলধারা গড়াইতে লাগিল। একখানা পত্রে লেখা ছিল,—"আমি যে তোমা বই আর কিছু জানি না—আর কিছু জানিতে শিখি নাই। তোমার আদর আমার জীবন—অনাদর আমার মৃত্যু। তোমার পায়ে পড়ি, এমন কঠিন পত্র লিখিয়া আমায় মারিও না। যে তোমার আশ্রিতা, সেবকানুসেবিকা, তাহাকে বজ্রাঘাতে মার কেন?—"

র্ম্মল আর পড়িতে পারিলেন না—পত্র ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষোভে, ধিক্কারে, অনুতাপে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল; বলিলেন, "আর কিছু দেখিতে চাই না, রমেশ বাবু; আমি চলিলাম।"

র। কোথায় যাইতেছ?

নি। বিজলীর কাছে।

র। দাঁড়াও—একটা কথা তোমাকে এখনও বলা হয় নাই।

নি। কি কথা?

র। তোমাকে মিথ্যা বলা হইয়াছে—বিজলী আমার বাড়ী যায় নাই।

নি। কোথায় গিয়াছে?

র। বিজলী এ সংসারে আর নাই—স্বর্গের ফুল স্বর্গে গিয়াছে।

নির্ম্মল কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া কেবলমাত্র শেষ কথার প্রতিধ্বনি তুলিলেন, "স্বর্গে গিয়াছে?"

র। হাঁ, স্বর্গে গিয়াছে; ধর্ম্মরক্ষার্থ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

নি। ডুবিয়া মরিয়াছে? মিথ্যা কথা। সে আমায় না বলিয়া, আমায় না জানাইয়া মরিতে পারে না।

র। জানাইবার সময় পাইল কই?

নি। তুমি স্থির জানিবে, রমেশ বাবু, বিজলী মরে নাই। সে মরিতে পারে না—মরা অসম্ভব। স্বর্গের পারিজাত কোন্ অপরাধে ফুটিবার পূর্ব্বে শুকাইয়া যাইবে? অপরাধী আমি, তবে সে মরিবে কেন?

র। অপরাধ তোমার—সহস্রবার তোমার; তোমারই নির্ব্বুদ্ধিতায় আজ বিজলীকে হারাইলাম।

নি। ক্ষমা কর, রমেশ বাবু, আগে বিজলীকে খুঁজিয়া আনি—তার পর তোমার কথা শুনিব।

এমন সময়ে দেওয়ান ব্যস্তভাবে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং ব্যাকুলভাবে বলিল, "বাবু, এইমাত্র একটা বড় সুসংবাদ পাইলাম।"

রমেশ বলিলেন, "আর কি সুসংবাদ থাকিতে পারে, দেওয়ান? সুখের সহিত আমার সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে।"

দেওয়ান বলিল, "বিজলী-মার দেহ-অন্বেষণার্থ গঙ্গার দুই কূল ধরিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম। কতক লোক নৌকাপথে গিয়াছিল। যাহারা ডাঙ্গাপথে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন ফিরিয়া আসিয়া এইমাত্র একটা সংবাদ দিল—"

রমেশ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি—কি সংবাদ দিল।"

দেওয়ান বলিল, "যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মনে আশা জন্মিযাছে যে, বিজলী-মা জীবিত আছেন। তবে তিনি কোথায়, কোন্ দেশে ও কিরূপ অবস্থায় আছেন, তাহা জানিতে পারি নাই।"

নির্ম্মল বলিয়া উঠিলেন, "শুনিলে, রমেশ বাবু? —বিজলী বাঁচিয়া আছে। আমি চলিলাম;—এ বিশ্বসংসারে যেখানেই সে লুকাইয়া থাকুক, আমি তাহাকে খুঁজিয়া আনিব। যদি না পাই, তা হ'লে —তা হ'লে রমেশ বাবু, তুমি আমার অনাথা মাকে দেখিও।"

বাক্য শেষ হইতে না হইতে নির্ম্মল অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণপরে রমেশও বিজলীর অন্বেষণে অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাড়ের উপর হইতে যেখানটায় বিলি লাফাইয়া পড়িল, সেখানটায় গঙ্গা কিছু গভীর। সচরাচর উচ্চ পাড়ের নীচে জল কিছু গভীর হয়। এখানটাতেও তাই। উচ্চ হইতে সবেগে গভীর জলে পড়িয়া বিলি মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। তলস্পর্শ করিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিবার পূর্ব্বে স্রোতের তাড়নে বিলির দেহ একটু দূরে নীত হইল। যখন বিলি মাটীতে দাঁড়াইয়া মাথা তুলিল, তখন তাহার মাথায় একটা আঘাত লাগিল। একটু সরিয়া আবার মাথা তুলিল; এবার কোনও বাধা পাইল না।

বিলি ঘাড় তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, মাথার উপর উচ্চ পাড় স্তম্ভহীন বারান্দার মত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাড়ের তলদেশে, অবিরাম স্রোতস্তাড়নে মৃত্তিকারাশি ক্ষয় হইয়া একটা গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই গহ্বরের ভিতর বিলি আকণ্ঠ নিমগ্ন করিয়া বসিল। উপর হইতে কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে, এরূপ সম্ভাবনা রহিল না।

এই অবস্থায় বিলি অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। ক্রমে ক্লান্তি ও শৈত্যে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল; তখন বিলি ভাবিল, "আর পরি না— এইবার মরি" আবার ভাবিল, "না, আত্মহত্যা করিব না—আত্মনাশে মহাপাপ। পাপের কথা আগে ভাবি নাই, বুঝি নাই—এখন শিখিযাছি। যখন জীবমাত্রনাশেই পাপ, তখন আত্মনাশে পাপ হবে না কেন?"

আত্মহত্যা যে মহাপাপ, সেটা বিলি স্থির করিল। অতঃপর ভাবিল, "তবে এখন আমি করি কি?" কোথায় যাই? কোথায় আশ্রয় পাই? দাদার কাছে যাইতে পারি; কিন্তু কি উপায়ে সেখানে যাব? হারাণ কি এখনও উপরে আছে? নিশ্চয় আছে,—সে জল-স্থল পাতি পাতি করিয়া আমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। কপাল দোষে শত্রুও কি এমন প্রবল জুটিযাছিল? হা ভগবান্, শেষে কি আত্মহত্যা না করাইযা ছাড়িবে না?"

বিলি কোনও উপায় স্থির করিতে না পারিয়া ক্রমে হতাশ হইযা পড়িল। বেলা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে অবসন্ন হইযা বিলি ডাকিল, "ভগবান্, সব হারাইযা তোমার দ্বারে আজ দাঁড়াইযাছি। এত দিন তোমায় ডাকি নাই---- ডাকিবারও অবসর পাই নাই। যে বিশ্বাস নিয়ে আজ তোমার কাছে এসেছি, দেখিও প্রভু, যেন সে বিশ্বাস, সে ভক্তি বিনষ্ট না হয়।"

গণ্ড বহিয়া ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে আঁখিধারা ছুটিল। নয়নের ক্ষুদ্র স্রোত, জাহ্নবীর অনন্ত স্রোতে মিশিয়া অনন্তদেবের চরণোদ্দেশে ছুটিল। চক্ষুর জল না মুছিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে করযোড়ে আকাশপানে চাহিয়া বিলি জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ অপরাধে, কোন্ পাপে এই বালিকা-বয়সে এত যাতনা পাইতেছি, দয়াময়?"

মাথার উপর গর্জ্জনশীল মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, নিম্নে কলনাদিনী উচ্ছ্বাসময়ী গঙ্গা, মধ্যে অদৃশ্য অথচ হুঙ্কারনাদী বায়ু। এই শব্দতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত করিয়া বিলি কাতর কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে ডাকিল, "অনাথের নাথ, দীনবন্ধু, কোন্ অপরাধে এই বালিকা-বয়সে এত যাতনা পাইতেছি, প্রভু?" পঞ্চভূতে সেই ক্ষীণ কণ্ঠ মিলাইযা গিযা আচম্বিতে এক ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি উঠিল। বিলি শুনিল, জল-স্থল ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া ভৈরব নিনাদে কে যেন উত্তর করিল, "পাপিষ্ঠা! স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইযাছ—বিশ্বাস হারাইযা স্বামী ছাড়িয়া আসিয়াছ; আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোন্ অপরাধে এত যাতনা পাইতেছ?"

বিলি শিহরিয়া উঠিল। এ কথা ত বিলির মনে আগে জাগে নাই। বিলি করযোড়ে আকাশপানে চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ক্ষুধায়, শীতে আমার দেহ অবসন্ন হইযা আসিযাছে—আর বেশীক্ষণ আমি বাঁচিব না; এ সময় একটা কথার উত্তর দাও, প্রভু—একটা কথা আমায় বুঝাইযা দাও, দয়াময়! বল নারায়ণ, যে বিশ্বাসহন্তা, তাঁকেও কি বিশ্বাস করিতে হইবে?"

পঞ্চভূত বিদীর্ণ করিয়া আবার উত্তর আসিল,—

"বিশ্বাসহন্তার বিচারক ভগবান্, তুমি নও; তুমি তোমার কর্ত্তব্যপথে, ধর্ম্মপথে স্খলিতপদ হও কেন?"

উত্তর শুনিয়া বিলির প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তখন তাহার ব'সিবার বা দাঁড়াইবার শক্তি নাই—মাথা টলিতেছে—সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া আসিয়াছে। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "বুঝিয়াছি, আমি মহাপাপিষ্ঠা; এ পাপ হ'তে মুক্ত হবার উপায় নাই কি নারায়ণ।"

উত্তর নাই। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়াও বিলি আর উত্তর পাইল না। ক্ষণপরে কাঁদিতে কাঁদিতে রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি তাঁকে পাব, দয়াময়?"

কোনও উত্তর নাই। ক্ষীণতর কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্বামীকে আর কি কখন দেখিতে পাইব, প্রভু?"

সে ক্ষীণকণ্ঠ বায়ুহিল্লোলে বাহিত হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, আর প্রতিধ্বনি উঠিল না—কোনও উত্তরও আসিল না। উত্তর অপেক্ষায় বিলি সকাতরে আকাশপানে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে শৈত্য ও দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া বিলির হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়িল;—তাহার অচৈতন্য দেহ গঙ্গাপ্রবাহে ভাসিয়া চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিলি গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া গেল বটে, কিন্তু মরিল না। তাহার ভাসমান দেহ জনৈক বৃদ্ধ ধীবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ধীবর সন্নিকটে ডিঙ্গি লইয়া মাছ ধরিতেছিল সে ঐ ভাসমান দেহ দেখিতে পাইবামাত্র জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বিলিকে ডিঙ্গিতে উঠাইল। বৃষ্টিস্নাত মল্লিকাফুলের ন্যায় বিলির মুখখানি দেখিয়া ধীবর ভক্তিগদগদ হইল। ভাবিল, বুঝি বা গঙ্গাদেবী হইবেন। জাল ছাড়িয়া বুড়া সযত্নে বিলিকে গৃহে আনিল। আগুনের তাপে, দুগ্ধ-পানে ক্রমে বিলির চৈতন্যসঞ্চার হইল।

কয়েক দিন বিলি শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না। ধীবরের জীর্ণ পর্ণকুটীরে জীর্ণ ও মলিন শয্যায় শুইয়া বিলি দিন কাটাইতে লাগিল।

ধীবর ও তাহার পত্নী প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া বিজলীকে প্রণাম করিত। বিজলী একদিন ধীবর-পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে প্রণাম কর কেন?—আমি ত ব্রাহ্মণ-কন্যা নই।"

ধীবর-পত্নী উত্তর করিল, "দেবতা হ'লেই তামাকে পেন্নাম করুব।"

বিজলী বুঝিল, এ প্রণাম তাহাকে নহে—তাহার রূপকে। সংসারে যাহার রূপ আছে, সেই দেবতা—যাহার ধন আছে, সেই সমাজনেতা। রূপ মুখোস পরিয়া জগতের পূজা লুটিয়া বেড়ায়—ধন দরিদ্র দলন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই মুখোসের দিনে গুণ ও বংশমর্য্যাদা ভাসিয়া গিয়াছে।

বিলি যখন উঠিতে পারিল, তখন সে ধীবরের গৃহ ত্যাগ করিতে বাসনা করিল। কিন্তু ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে, বিলি তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছে।

বিলি দুর্ব্বল—পথ হাঁটিবার শক্তি নাই; তবু বিলি পথ হাঁটিয়া বধুগ্রাম-অভিমুখে চলিল। বধুগ্রাম এক্ষণে তাহার তীর্থক্ষেত্র। সেই পুণ্যময় ধামে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বিলি পথ হাঁটিয়া চলিল। যে কুসুমদল-বিনিন্দিত কোমল চরণযুগল অলক্তকে রঞ্জিত হইয়া মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলের শোভাবর্দ্ধন করিত, আজ সেই চরণযুগল তৃণ-কঙ্কর-কণ্টকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও পথ অতিক্রম করিয়া চলিল। পদ্মনিহিত মধুভ্রমে যে ঘর্ম্মবিন্দু মুখ-পঙ্কজ হইতে আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে বসন্তানিল ছুটাছুটি করিত, আজ সে ঘর্ম্মবিন্দু ভানুতাপে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। যে কমলদললাঞ্ছিত অঙ্গে পুষ্পালঙ্কারও ম্লান হইত, আজ সে অঙ্গ মলিন, বিশুষ্ক, ধূলিধূসরিত। বিলি কখনও পথ হাঁটে নাই—পথের কষ্ট কখনও অনুভব করে নাই; একটু হাঁটিয়াই বিলি অবসন্ন হইয়া পড়িল। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল।

কিন্তু পা আর উঠিল না। পিছন ফিরিয়া দেখিল, তখনও ধীবরের গৃহ নয়নান্তরাল হয় নাই। ভাবিল, 'কিরূপে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বধুগ্রামে যাইব? মন, আমার এই অপদার্থ দেহটাকে টানিয়া লইয়া চল।' মন আদিষ্ট হইয়া দেহটাকে জড়াইয়া ধরিল। দেহ মনের সহিত কলহ বাধাইয়া দিয়া তাহার অক্ষমতার পরিচয় দিল। মন শুনিল না, দেহটাকে টানিয়া লইয়া চলিল। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দেহ অবশেষে জবাব দিল এবং এক বৃক্ষতলে ঢলিয়া পড়িল।

বিলি পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল। ধীবরের গৃহচূড়া তখন আর নয়নপথবর্ত্তী নয়—বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়াছে। বিলি সেই দিকে চাহিয়া রহিল;

ভাবিতেছিল, ফিরিবে কি না। অবাধ্য দেহটাকে আর ত টানিয়া লওয়া যায় না। বিলি ভাবিয়া কূল পাইল না। এমন সময় সহসা দেখিল, বৃক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে, বিলির দেহ কাঁপিয়া উঠিল। পথিক যতই নিকটে আসিতে লাগিল, বিলি ততই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। পথিক যখন কিয়দ্দূর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "বিলি, বিলি আমার," বিলি তখন ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। নির্ম্মলকুমার যখন সমীপস্থ হইয়া বিলিকে উঠাইয়া আবেগভরে হৃদয়ে ধরিলেন, তখন বিলি কাঁদিয়াই আকুল—বাক্য আর স্ফূর্ত্তি পাইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নির্ম্মল কয়েক দিনের পর বাটী ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অন্নপূর্ণা আনন্দে অধীর হইলেন; কত আদর করিলেন, কত অশ্রুজল মোচন করিলেন, কত কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অনেক কথার পর নির্ম্মল একটু অবসর পাইয়া বলিলেন, "মা!"

অন্ন। কি বাবা?

নি। এনেছি।

অন্ন। কি এনেছ, বাবা?

নি। কি পেলে সুখী হও, মা?

অন্ন। আমার বউমাকে।

নি। তেমন সুখী কি আর কাউকে পেলে হও না?

অন্ন। না, বাবা। তেমন সুখী বুঝি ভগবানকে পেলেও হই না।

নি। তবে তাঁকেই এনেছি।

অন্ন। কাকে? বউমাকে।

নি। হাঁ, মা।

অন্ন। কই—কোথায় আমার বউমা?

নি। ঘাটে—নৌকায়।

উন্মাদিনীর স্থায় অন্নপূর্ণা ছুটিলেন। খিড়কীর ঘাটে নৌকা ছিল। বিলি নৌকায় বসিয়া তাহার বহুকাল-পরিত্যক্ত গৃহপানে চাহিয়াছিল। অন্নপূর্ণা ছুটিয়া গিয়া বিলিকে বুকে টানিয়া লইলেন। উভয়ে অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া যখন প্রাণ একটু শান্ত হইল, তখন অন্নপূর্ণা বিলির হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "মা আমার, ঘরের লক্ষ্মী আমার, তোমার অভাবে যে আমার ঘর নিবে আছে, মা। এস মা, আমার আঁধার ঘর আলো করিবে, এস।"

শাশুড়ী হাত ধরিয়া বধূকে গৃহে আনিলেন। মুহূর্ত্ত-মধ্যে গ্রামে প্রচারিত হইল যে, বিজলী পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনিবামাত্র পাড়ার মেয়েরা ছুটিয়া দেখিতে আসিল। বিলি সকলকে দেখিল, কেবল সোহাগের সাক্ষাৎ পাইল না। সে আনন্দপুরে ছিল। এক্ষণে সেইখানেই থাকে। কেদার জেঠা উপযাচক হইয়া তাহাকে পৈতৃকভিটায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার পিতার যাহা কিছু কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহা দানপত্রের দ্বারা হেমকে অর্পণ করিয়াছেন। সকল ফিরাইয়া দিয়া তিনি এক্ষণে সত্যসত্যই বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিলি সোহাগকে আনাইল—ছাড়িল না। হাস্য-মুখী সোহাগ আসিয়া আনন্দময়ী বিজলীকে প্রণাম করিল। বিজলী তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে শয়নকক্ষে প্রস্থান করিল।

সোহাগ বলিল, "এত দিন কি বাপের বাড়ী থাকিতে হয়, বউদিদি?

বিলি উত্তর করিল, "এখানে আসিয়াও ত তোমার দেখা পাই না"

সো। এখন ত দেখা পেয়েছ, এখন বল দেখি, কেন এত দিন বাপের বাড়ী ছিলে?

বি। তোর জন্যে বর খুঁজছিলাম।

সো। তবু ভাল, আমার জন্যে ব্যস্ত হবার একটি লোক পেলুম।

বি। দেখ্ সোহাগ—

সো। কি দেখ্‌ব বউদিদি?

বি। আমি শুনেছি, তুই খুব ভাল মেয়ে।

সো। বটে! আমি ত তা জানতুম না।

বি। ঠাট্টা রাখ্। কিছুদিন আগে তোকে আমি মন্দ ব'লেই জেনেছিলাম।

এবার সোহাগ উত্তর করিল না—ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া মৌন রহিল। বিলি বলিল, "কিন্তু এখন জেনেছি—"

সো। এখন কি জেনেছ?

বি। এখন জেনেছি, তুই একটি রমণীরত্ন।

সো। বটে: তবে আমাকে খোঁপায় তোল!

বি। সোহাগ—

সো। কি বউদিদি ?

বি। আমি অপরাধ করেছি—

সো। দাদার কাছে ?—শতবার।

বি। না, তোমার কাছে।

সো। বউদিদি, ও রকম কথাগুলা বলো না, আমার বড় লজ্জা করে।

বিলি কোনও উত্তর করিল না। ক্ষণকাল উভয়ে নীরব রহিল। পরে বিলি ডাকিল, "সোহাগ !—"

সো। আবার কি ?

বি। আমার সাধ হয়—

সো। বাপের বাড়ী যেতে না কি ?

বি। দূর !

সো। তবে কি ?

বি। না, সে কথা বল্‌ব না।

সো। বল্‌তেই হবে, আমার মাথার দিব্য।

বি। আমার দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে।

বালিকার প্রগল্‌ভতা মুহূর্ত্তে দূর হইল ; সে এখন জানিয়াছে, এ দাদাটি কে। আরক্তিম মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোহাগ নীরব রহিল।

বি। কিন্তু—

সোহাগ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল

বি। কিন্তু তাহা ত হবার নয়।

সোহাগের ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে—কেন ?

বিলি অন্যমনস্কভাবে আপন মনে বলিতে লাগিল, "দাদা বোধ হয় আর বিবাহ করিবেন না।"

সোহাগ উঠিবার উপক্রম করিল ; বিলি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই আমার দাদাকে দেখেছিস্ ?"

সোহাগ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—দেখেছি।

বিলি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও মা, কোথায় দেখ্‌লি ? দাদা বড় কুৎসিত, না ?"

সো। কা'কে কুৎসিত বল্‌ছ ?

বিলি তীক্ষ্ণনয়নে সোহাগের পানে চাহিল। বালিকার মুখ রক্তবর্ণ হইল ; তাহার মনোভাব বিলির অবিদিত রহিল না। সোহাগও বুঝিল, বিলি সকলই জানিতে পারিয়াছে।—লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল।—যেন উষার চরণে রক্তজবা ফুটিয়া উঠিল।

বিলি বলিল, "তুই দাদাকে ভালবেসেছিস্ ?"

সোহাগ উত্তর না দিয়া পলাইবার উপক্রম করিল। বিলি তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিল, "যে আমার দাদাকে ভালবাসে, সে আমার বড় আপনার। তাঁকে যে কেহ চিনে না—কেহ যে ভালবাসে না। সোহাগ—সোহাগ, তোকে আর আমি ছাড়্‌ব না।"

তার কয়েক দিন পরে নির্ম্মল শ্বশুরের অনুমতি লইয়া সস্ত্রীক বিশালপুরে যাত্রা করিলেন। এবার বিশালপুরে যাওয়াটা বিলির জিদে নয়—নির্ম্মলের জিদে। নির্ম্মল গৃহে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, রমেশ ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। বিলিও সঙ্গে চলিল ; সেটাও নির্ম্মলের বাসনানুযায়ী। সেই বহুস্মৃতিপূর্ণ বিলাসের বজরাখানি সাজাইয়া উভয়ে বজরায় উঠিলেন। যখন যাত্রা করিলেন, তখন অপরাহ্ণ।

পরদিন প্রভাতে বজরার ছাদে বসিয়া বিলি নির্ম্মলকে বলিল, "আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

নির্ম্মল বলিলেন, "বলিতে এত সঙ্কোচ কেন ? বাসনা কি, বল।"

বি। তীর্থ দর্শন করিবার বাসনা জন্মিয়াছে।

নি। তীর্থ! এখানে তীর্থক্ষেত্র কোথায় ?

বি। আছে—সন্নিকটেই আছে।

নি। তাহা ত আমি জানিতাম না। কোথায় বজরা লাগাইতে বলিব ?

বি। আমি দেখাইয়া দিতেছি।

ক্ষণপরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বজরা লাগিল। উভয়ে তীরে উঠিলেন। সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। নির্ম্মল বিস্মিতনয়নে দেখিলেন, সন্নিকটে কোথাও লোকালয় বা দেবালয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ত একখানা ইটও দেখিতেছি না—তীর্থক্ষেত্র কোথায় ?"

বিলি উত্তর করিল, "সম্মুখে সেই ক্ষেত্র। এইখানে আমি ধর্ম্ম শিখিয়াছি—তোমায় চিনিয়াছি।"

নি। আমি যে তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, বিলি।

বি। পার্শ্বে ভাগীরথী-গর্ভে আমার নৌকা ডুবিয়াছিল—সম্মুখে মুক্তক্ষেত্রে হারাণ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। এখন বুঝেছ ?

নি। না।

বি। তবে আরও এগিয়ে চল। আমার যোগস্থান—আমার তীর্থধাম দেখিবে এস।

উভয়ে আরও অগ্রসর হইলেন। পাড়ের ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। উভয়ে সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় এক জন লোক শয়ান রহিয়াছে। উভয়ে বিস্মিত হইলেন। লোকটাকে বিলি দেখিবামাত্র চিনিল। একটু অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "হারাণ, তুমি আবার এখানে ?"

যে শুইয়াছিল, সে প্রকৃতই হারাণ। তাহার

অবস্থা বড় শোচনীয়। যা' কিছু সুন্দর, সুখকর, সকলই তাহাতে লোপ পাইয়াছে। যা' কিছু বীভৎস-দর্শন, ঘৃণাউদ্দীপক, তাহাই তাহাতে বর্ত্তমান। পরিধানে একখানি শতছিন্ন, ক্ষুদ্র, মলিন বস্ত্র—চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট—দেহ কঙ্কালসার—কেশ রুক্ষ, জটাসম্বদ্ধ। সে মুমূর্ষু, উত্থানশক্তি-রহিত। কখন সজ্ঞান, কখনও বা জ্ঞানশূন্য।

বিলির কণ্ঠস্বর হারাণের মর্ম্মস্পর্শ করিল। সে চাহিয়া দেখিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু-কবলিত দেহে নব শক্তির সঞ্চার হইল। সে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না—পড়িয়া গেল। তখন বিলির পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "এসেছ? আমার শেষ প্রার্থনা, শেষ ভিক্ষা কাণে গিয়াছে? আমার অন্তিম বাসনা শুনে স্বর্গ হ'তে নেমে এসেছ? একটু দাঁড়াও—একটু তোমায় দেখি; তোমার পানে চেয়ে তোমায় দেখতে দেখতে মরি। আমার আর বিলম্ব নাই—বেশীক্ষণ তোমায় ধ'রে রাখব না।"

বিলি বলিল, "এ জনহীন প্রান্তরে কেন প'ড়ে রয়েছ?—চল, তোমাকে গৃহে রাখিয়া আসি।"

হারাণ। গৃহ! গৃহ অনেক দিন ছাড়িয়াছি। যে দিন তোমায় গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারিয়াছি, সেই দিন হইতে গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। দেশময় অশান্তপ্রাণে ছুটিয়া বেড়াইয়া অবশেষে এইখানে মরিতে আসিয়াছি। ভাবিলাম, যেখানে তুমি মরিয়াছ, সেইখানে তোমার প্রেতাত্মাও আছে। যদি আমার দেহাবশেষ তোমার প্রেতাত্মার করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, এই আশায় লুব্ধ হইয়া এখানে মরিতে আসিয়াছি। আজ আমার জীবন ধন্য হইল—মৃত্যু সুখের হইল,—আজ তোমার প্রেতাত্মা দেখিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। আমার বোধ হইতেছে, যেন তোমার জীবন্ত প্রতিমা দেখিতেছি।

বিলি। আমি মরি নাই; আমাকে জীবন্তই দেখিতেছ।

হা। আর আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিও না। যাহা নিজে দেখিয়াছি, তাহা কেমন করিয়া অপ্রত্যয় করিব?

তখন বিলি কেমন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা বলিল। শুনিয়া হারাণ বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে বিলির পানে চাহিয়া রহিল। তাহার শুষ্ক চক্ষু বাহিয়া জলধারা ছুটিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "বিজলী, দেবী, আজ পাহাড়ের ভার আমার বুকের উপর হইতে নামাইয়া লইলে। কি বলিয়া কি বলিব, জানি না। আমার হৃদয় আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ—সকলই আমি ভুলিয়া যাইতেছি এত দিনে আমি নরক হইতে পরিত্রাণ পাইলাম।"

বি। তুমিও আমায় নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ। যে আত্মাভিমান, অবিশ্বাস লইয়া এই স্থানে একদিন আসিয়াছিলাম, তুমি আমায় জলে ডুবাইয়া, সে ঘৃণিত আত্মচিন্তা হইতে পরিত্রাণ করিয়াছ। তোমার দয়ায় আমি স্বামীকে চিনিয়াছি—ভগবানকে চিনিয়াছি।

হা। আর আমি সে দিন কি চিনেছি, জান? আমি তোমায় চিনেছি; ধর্ম্মের জন্য যে মানুষ জীবন দিতে পারে—ধর্ম্মের যে একটা শক্তি আছে, সে দিন তা বুঝেছি। তুমি আমার শিক্ষাদাতা, আমার গুরু।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হারাণ আবার বলিল, "আমি এ সংসার ছাড়িয়া, এ সুন্দর পৃথিবী ছাড়িয়া, সকলের উপর তোমায় ছাড়িয়া অজ্ঞাত রাজ্যে চলিলাম। যদি জন্মান্তর থাকে—"

বলিতে বলিতে হারাণের কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিল। হারাণ ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "যদি জন্মান্তর থাকে, তাহা হইলে পুনর্জ্জন্মে যেন তোমার আশীর্ব্বাদে আমার পশুত্ব ধ্বংস হয়—যেন আমি জন্মজন্মান্তরে—"

হারাণের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বিলি আরও একটু অগ্রসর হইয়া হারাণের নিকটবর্ত্তিনী হইল। নির্ম্মল পিছনে দাঁড়াইয়া নীরবে এ দৃশ্য দেখিতে-ছিলেন। হারাণ নির্ম্মলকে দেখে নাই—বিলির মুখখানি ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নাই। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে হারাণ অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "মরি, মরি, কি সুন্দর! যে পৃথিবীতে তুমি আছ, সে পৃথিবী কি সুন্দর! তোমাকে বুকে ধরিয়া পৃথিবী সুন্দর—তোমার আলো মাখিয়া সূর্য্য সুন্দর—তোমার সংস্পর্শে বাতাস সুন্দর—তোমার ছায়া বুকে ধরিয়া আকাশ সুন্দর—জাহ্নবী সুন্দর। এই সুন্দর—বিশ্বমাঝে—তুমি—অতি—সুন্দর। এই—সৌন্দর্য্য,—এই সৌন্দর্য্যের রাণীকে—ছাড়িয়া—চির-বিদায়—লইতে হইল,—এই যা' দুঃখ; নতুবা—মরণে—কি সুখ। কিন্তু—কিন্তু—আবার—দেখা—হবে।"

আর কথা ফুটিল না, সব শেষ হইয়া গেল।

সন্নিকটস্থ গ্রামের লোক ডাকিয়া নির্ম্মল হারাণের শব দাহ করিলেন।

যখন শবদাহ হইতেছিল, তখন বিলি একটা কাজ করিল। যে ধীবর তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল,

বিলি তাহার কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিস্মিত ধীবর দম্পতীর সম্মিনানে প্রচুর অর্থ রাখিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। দম্পতী-যুগল ভাবিল, গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হইয়া তাহাদের অর্থ দিয়াছেন। গৃহিণী সানন্দে গৃহকোণে অর্থ প্রোথিত করিতে সমুদ্যত। কর্ত্তা বাধা দিয়া বলিলেন, "মোদের টাকাকড়িতে কাজ নেই—বর দেবে।" অনেক তর্ক-বিতর্কের পর অর্থ ফিরাইয়া দিয়া ঠাকুরের কাছে বর লওয়াই স্থির হইল। তখন দম্পতীযুগল টাকা-কড়ি কাপড়ে বাঁধিয়া গঙ্গাদেবীর অনুসন্ধানে চলিল। গঙ্গাদেবী গঙ্গায় থাকেন; অতএব তাঁহার অনুসন্ধান সহজসাধ্য। উভয়ে গঙ্গার ধারে আসিয়া ঘাটে একখানা বজরা দেখিল—কিন্তু গঙ্গাদেবীকে দেখিতে পাইল না। ধীবর-পত্নী ভাবিল, গঙ্গামাই বুঝি বজরা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন,—অতএব সে টাকা-কড়ি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া ভক্তিগদ্গদ-চিত্তে বজরার নিকট স্বাগত একটা বর চাহিয়া গৃহে ফিরিল।

এ দিকে শবদাহ শেষ হইতে অপরাহ্ণ হইল। যখন চিতা নিবিয়া গেল, তখন নির্ম্মল বজরা ছাড়িয়া আবার বিশালপুর অভিমুখে চলিলেন কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না; পথিমধ্যেই রমেশের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

রমেশ অশ্বারোহণে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যে দিবস তিনি ধীবর গৃহসন্নিকটে বিলির অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই দিনই তিনি ঘোড়া হইতে প'ড়য়া গিয়া গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। এত দিন শয্যা হইতে উঠেন নাই—উঠিবার শক্তিও ছিল না। আজও দুর্ব্বল, তবে বিলি ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিবার মানসে আজ অধীরান্তঃকরণে বধূগ্রামের অভিমুখে ছুটিয়াছেন। রমেশ বজরায় আসিতেছিলেন। নির্ম্মল তাঁহাকে দেখিতে পাইবা-মাত্র ক্ষুদ্র নৌকাখানি নামাইয়া রমেশের বজরায় গিয়া উঠিলেন। অধীরপদে রমেশের কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া সকল কথার আগে বলিলেন, "ভাই, আমায় ক্ষমা কর। না বুঝিয়া ভ্রম প'ড়য়া তোমার মত দেবতাকে একদিন আমার গৃহ হইতে প্রকারান্তরে তাড়াইয়া দিয়াছি আমি যথার্থই বর্ব্বর। তুমি দেবতুল্য, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিতে পার; কিন্তু এ ক্ষোভ, এ মনোব্যথা আমার চিরদিন থাকিবে।"

রমেশ বলিলেন, "ভাই, ভ্রম মানুষের প্রকৃতিগত। কিন্তু সে ভ্রম স্বীকার করিতে কয়টা মানুষের সাহস আছে? আত্মকৃত অপরাধের জন্য কাঁদিতেই বা কয়টা লোক পারে? যে পারে, সে মহৎ। সে সব কথা যাক্, এখন আমার বিজু কোথায়?"

দশম পরিচ্ছেদ

দুই বজরা একত্র হইল। বিজুর হাসি-কান্নায় রমেশ শ্রান্ত হইলেন। উভয়ের মধ্যে কত কথা হইল। নির্ম্মল দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। ভ্রাতাভগিনীর মধ্যে এত প্রীতি, এত স্নেহ থাকিতে পারে, তিনি তা' কল্পনাতেও কখন আনিতে পারেন নাই। তাঁহার নয়নের আনন্দাশ্রু, তাঁহার অন্তরের ক্ষোভ ও অনুতাপ-বহ্নি নিবাইতে সমর্থ হইল না।

রমেশ ছাড়িলেন না, নির্ম্মল ও বিজুকে লইয়া বিশালপুরে ফিরিলেন। সেখানে জ্যোৎস্না নাই—অশান্তিকে সঙ্গে লইয়া তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে গিন্নী-মা তথায় কর্ত্রী; তিনি কন্যাকে বুকে ধরিয়া কত কাঁদিলেন।

দুই তিন দিন আনন্দে কাটিয়া গেল। একদা রমেশ নির্ম্মলকে বলিলেন, "কয়েক মাস আমরা অশান্তি পেয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা-লাভ হয়েছে। তা' ছাড়া আর একটা জিনিস তোমরা পেয়েছ।"

নির্ম্মল। সেটা কি?

রমেশ। আমার জীবন। বিজু আমার কাছে না থাকিলে, সে যাত্রা আমি কিছুতেই রক্ষা পাইতাম না।

নির্ম্মল। ভগবান্ মঙ্গলময়।

রমেশ। সেটা আমরা মুখে বলি, কিন্তু স্মরণ রাখি কই? দুঃখে পড়িলেই তাঁকে আমরা অবিবেচক ব'লে গালি দিই।

এমন সময় বিলি আসিয়া গোল বাধাইয়া দিল। নির্ম্মল উঠিয়া বারান্দায় গেলেন। বিলি কহিল, "দাদা, আমি তিনখানা বজরা, পাঁচখানা নৌকা ঠিক করতে হুকুম দিয়েছি।"

"কেন?"

"তা এখন বলব না।"

"কখন বলবি?"

"সন্ধ্যার সময় যাবার একটু আগে।"

রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল; জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা আজ যাবি না কি বিজু?"

বিজু। আমরা তোমরা সকলেই যাব।

রমে। আমরা?

বিজু। হাঁ; তুমি, মা, ঝি, চাকর, নায়েব—

রমে। সে কি! আমরা কোথায় যাব?

বিজু। বধূগ্রামে।

রমে। তা কি হয় পাগলী?

বিজু। দেখ দাদা, তোমায় সত্যাশ্রয়ী ব'লে জানি; আমার সে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।

রমে। আমি কি করলুম রে?

বিজু। তুমিই না এক দিন বলেছিলে, "আমার হুকুমের উপর, সকলের হুকুমের উপর বিজুর হুকুম"—

রমেশ হাসিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "এখন কি হুকুম হয়?

বিজু। তা' ত শুনলে; এখন প্রস্তুত হও।

রমেশ উচ্চহাস্যে কক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নির্ম্মলকে ডাকিতে লাগিলেন। নির্ম্মল দ্বারান্তরালেই ছিলেন; হাস্যোজ্জ্বল মুখে একটু সরিয়া আসিয়া দর্শন দিলেন। রমেশ বলিলেন, "শুনেছ? বিজুর হুকুম শুনেছ? আমাদের এখানকার বাস উঠিয়ে বধূগ্রামে যেতে হবে।"

বিজু নির্ম্মলের দৃষ্টিপথ হইতে দেহটাকে গোপন করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আমি বুঝি তাই বলছি? তোমাদের কিছু দিনের জন্য সেখানে গিয়ে থাকতে হবে।" তার পর একটু তেজের সহিত বলিল, "আর দেখ দাদা, তোমরা কেহ আমায় বাধা দিয়ে ধ'রে রাখতে পারবে না—আমি যা' ইচ্ছে করেছি, তা ক'রে ছাড়ব—"

রমে। কি ইচ্ছে করেছিস, পাগলী?

বিজু। তা' এখন বলব না; আগে ত চল।

রমে। আচ্ছা যাব—তোর হুকুমই শুনব; কিন্তু তোরা আর দু' চার দিন এখানে থাক।

বিজির ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; মৃদু কম্পিতকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি মাকে ছেড়ে আর যে থাকতে পারছি না, দাদা।"

রমেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বেশ, আজই আমরা যাব।"

বিজলী আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল। রমেশ ও নির্ম্মল উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বিজলীর সে আনন্দ দেখিতে লাগিলেন। বিজলী হাসিতে হাসিতে বলিল, "মাকেও রাজি করেছি দাদা।"

রমেশ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি পার না, দিদি?"

দূর হইতে নির্ম্মল বলিলেন, "তাই বটে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

তার পর কিছু কাল অতীত হইয়াছে। বিজির ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সে ভাবিয়াছিল, ঘটকালি করিয়া কিছু বিদায় লইবে। পরে জানিল, বর ও বধূ পূর্ব্ব হইতেই ঘটকালি করিয়া রাখিয়াছে।

রমেশ, নববধূ সোহাগকে লইয়া আজ আনন্দবিহ্বল চিত্তে গৃহে ফিরিয়াছেন।

ফাল্গুন মাস জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। ফুলের গন্ধ গায়ে মাখিয়া মলয়ানিল প্রফুল্ল। তরঙ্গশিরে হীরক জ্বালিয়া, পত্রে পত্রে ফুল ফুটাইয়া চন্দ্রিকা গরবিণী।

পুষ্পোদ্যানমধ্যে রমেশ একটি ক্ষুদ্র অথচ মনোহর গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গৃহের সকলই সুন্দর। অর্থে যদি সৌন্দর্য্য কিনিতে পারে, তবে গৃহটি অতি সুন্দর। গৃহপ্রাচীরে লতা-পাতা-ফুল নানাবর্ণে চিত্রিত—হস্তিদন্ত মণ্ডিত স্বর্ণগঠিত রৌপ্য-দীপাধারে উজ্জ্বল দীপ—অগণিত ফুলমালা দীপাধার হইতে দীপাধারে বিলম্বিত। মধ্যস্থলে বহুমূল্য পালঙ্ক। সেই উজ্জ্বল দীপাবলি-উদ্ভাসিত সুগন্ধময় কক্ষমধ্যে নবদম্পতী পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট।

উভয়ে নীরব; কিন্তু সুখের আবেশে বিভোর। সোহাগ যাহা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই, তাহা পাইয়াছে। দেবতুল্য স্বামী—কুবেরের ঐশ্বর্য্য—স্বামীর ভালবাসা, সকলই পাইয়াছে। সে ভাবিতেছিল, "কোন্ পুণ্যফলে তাহার এ সৌভাগ্য।" সোহাগ আর থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল। তদ্দৃষ্টে রমেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোহাগ, কাঁদিতেছ কেন?"

সোহাগ উত্তর করিল না। কেবল একবার সকরুণ দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর পানে চাহিল। সে সম্ভ্রমপূর্ণ লজ্জাজড়িত দৃষ্টিতে রমেশ সে অশ্রুজলের অর্থ বুঝিলেন। কিন্তু কথাটা সোহাগের মুখে শুনিবার অভিপ্রায়ে রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল, বল সোহাগ, কেন কাঁদিতেছ?"

সোহাগ নিরুত্তর রহিল। কিন্তু রমেশ ছাড়িলেন না। নববধূর মুখে প্রণয়ের কথা শুনিতে প্রণয়ীর বড়ই লোভ। রমেশের বয়স কিছু বেশী হইলেও তিনি প্রণয়ী। তিনি সে লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না;—সোহাগকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "সোহাগ, আমি কুৎসিত-দর্শন—বয়সেও তোমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু যদি আদরে, ভালবাসায় এ অভাব দূর করা সম্ভব হয়,

তাহা হইলে যা' কিছু আমার হৃদয়ে স্নেহময় আছে, তাহাতে তোমায় আজীবন নিমজ্জিত রাখিব।"

সোহাগ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল; চোখের কোণে একটু অনুযোগ—ভ্রূ-মধ্যে একটু তিরস্কার। সে দৃষ্টির অর্থ রমেশ বুঝিলেন। আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল। তবু তিনি ছাড়িলেন না,—আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কেন কাঁদিতেছিলে, বল?"

সোহাগ চক্ষু নামাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ভাবিতেছিলাম, কোন্ পুণ্যফলে আজ আমার এই সৌভাগ্য! আমার মত ভাগ্যবতী—"

বলিতে বলিতে সোহাগের কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল—গণ্ড বহিয়া অশ্রুজল গড়াইল। রমেশ সস্নেহে তাহাকে হৃদয়ে ধরিয়া উদ্যানে লইয়া গেলেন।

জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল পুষ্পোদ্যানমধ্যে অনেকক্ষণ পরিভ্রমণ করিয়া উভয়ে আবার ফিরিলেন। শয়নকক্ষে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, পালঙ্কের উপর—যেখানে তাঁহারা ক্ষণপূর্ব্বে বসিয়াছিলেন, সেখানে দুইছড়া গোলাপের মালা পড়িয়া রহিয়াছে। মালা ক্ষণপূর্ব্বে এখানে ছিল না; এর মধ্যে কে রাখিয়া গেল? রমেশ মালা উঠাইয়া লইয়া মনোযোগসহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুষ্পনিচয় সদ্যঃ-চয়িত; এবং কাপড়ের সূক্ষ্ম ছিন্নাংশ দ্বারা একত্র গ্রথিত। আরও দেখিলেন, এই বসন-ছিন্নাংশে ও ফুলের পাপ্‌ড়ীতে স্থানে স্থানে রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রমেশ ভাবিলেন, "কে এ মালা এখানে রাখিয়া গেল?"

রমেশ ঝটিতি গৃহবাহিরে আসিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গৃহ ছাড়িয়া উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র রমেশ সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক মলিনবসনা রমণী-মূর্ত্তি দ্রুতপাদবিক্ষেপে উদ্যান অতিক্রম করিয়া নদীর দিকে চলিয়াছে রমেশ নীরবে তাহার অনুসরণ করিলেন।

নদীকূলে আসিয়া দেখিলেন, রমণী জলে নামিয়াছে। দ্রুতপদসঞ্চারণে ক্রমেই সে গভীরতর জলের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যখন সে আকণ্ঠ জল পাইল, তখন দাঁড়াইয়া একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল চাঁদের পূর্ণচ্ছটা তাহার মুখের উপর পড়িল। মুখাবয়ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গেল। রমেশ তাহাকে চিনিলেন। চলনভঙ্গিমা দেখিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল; এক্ষণে সে সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। রমেশ ডাকিলেন, "জ্যোৎস্না!"

কেহ কোনও উত্তর দিল না। বুঝি বা উত্তরস্বরূপ সে আরও গভীর জলের দিকে অগ্রসর হইল। রমেশ তখন জলে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে রমণীর চিবুক ডুবিল, নাসিকা ডুবিল, চক্ষু ডুবিল, ক্রমে কেশরাশিও ডুবিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বিস্ময়-বিমুগ্ধ রমেশ আবার ডাকিলেন; "জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না!"

কেহ উত্তর দিল না। রমেশ দেখিলেন, নদীর জল চক্রে চক্রে ঘুরিয়া যেন বলিতেছে,—"এইখানে জ্যোৎস্না ডুবিয়াছে।"

রমেশ আর কালবিলম্ব না করিয়া নদীজলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। যেখানে জ্যোৎস্নাকে ডুবিতে দেখিয়াছিলেন, সেইখানে তিনিও ডুবিলেন। তলদেশ পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া আবার জলের উপর ভাসিয়া উঠিলেন। কোথাও জ্যোৎস্নাকে দেখিতে না পাইয়া আবার ডাকিলেন, "জ্যোৎস্না!" কেহ উত্তর দিল না—সব নীরব। রমেশ আবার ডুবিলেন; ক্ষণপরে আবার ভাসিয়া উঠিলেন। উঠিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না!" প্রতিধ্বনি হাঁকিল, "জ্যোৎস্না!"—বায়ুহিল্লোল কাণের কাছে বলিয়া গেল, "জ্যোৎস্না!" প্রতিধ্বনির ছলনায় ভুলিয়া রমেশ আবার ডাকিলেন, "জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না!"

সমাপ্ত

পূজার মালা

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

অর্পণ

নারায়ণচন্দ্র ভটাচার্য্য (বিদ্যাভূষণ)

ভাই নারায়ণ,

আমার এ মালা কা'র কাছে গচ্ছিত রাখিব? কা'র কাছে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব? সংসারময় নেত্রপাত করিয়া দেখিলাম, কিন্তু তোমার মত নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র অল্পই দেখিলাম, তাই, তুমি যাহাদের আহৃত লতাটি পাতাটি পর্য্যন্ত স্নেহ-চক্ষে দেখিয়া থাক, তাহাদের রচিত ফুলের মালা তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।

কিন্তু ভাই, গচ্ছিত রাখিলাম মাত্র। দুই দিন বাদে যখন এ পৃথিবী ছাড়িয়া গৃহে ফিরিব, তখন তোমার নিকট হইতে মালা ফিরাইয়া লইব। যাঁহার পূজার্থে এ মালা গ্রথিত, তাঁহার গলায় সাক্ষাৎকারে পরাইয়া দিব।

ভাই, মালা গ্রহণ কর; কিন্তু দেখিও, হাতে যেন দাগ লাগে না।—আমার এ মালা রুধিরবর্জ্জিত। ইতি—

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পূজার মালা

একবার দেখা

১

শিবপূজা সাঙ্গ করিয়া অলকাসুন্দরী একটি ছোট বাটিতে একটু জল লইয়া শাশুড়ী দেবীর পদপ্রান্তে বসিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন,—

"আ অভাগী, কতই পূজা কর্‌ছিস—কতই পাদোদক খাচ্ছিস্, কই তোর কপাল ত ফিরে না?"

নতবদনা অলকার চক্ষু বহিয়া জল গড়াইল। শাশুড়ী বউয়েব হাত ধরিয়া বলিলেন, "এবার তোমায় লইয়া সেই হতভাগা ছেলের কাছে যাব—দেখিব, তোমার কপাল ফিরে কি না।"

শাশুড়ীর পদতল সযতনে ধৌত করিযা অলকা ভক্তি সহকারে জলটুকু খাইল; এবং মাথায় বুকে একটু দিল। তার পর উদ্দেশে স্বামীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল, "কোথায় আমার দেবতা! কোথায় আমার সর্ব্বস্ব ধন! জীবন থাকিতে দাসী কি তোমার দেখা পাবে না? জীবনও ত আর বেশী দিন থাকে না!"

২

অনিলকুমারের অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে দশমবর্ষীয়া অলকার সহিত বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর যখন বরকনে বাড়ী আসিয়া নামিল, তখন "বউ কালো—ছেলের যোগ্য নয়" ইত্যাদি নানারকমের কথা মেয়েমহলে প্রচারিত হইল। কথাটা অনিলের কাণেও গেল। বিস্তৃত উঠানের মধ্যস্থলে দুধে-আল্‌তায় পা দিয়া কনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, পার্শ্বে বর নিম্নদৃষ্টে ধানের কাঠা ধরিয়া দণ্ডায়মান। ভগবতী দেবী আহ্লাদে পরিপ্লুত হইয়া ছেলে-বউ বরণে ব্যাপৃতা। অনিলকুমার দেখিলেন, বউয়ের পা কালো। ছি, কালো পা কি দুধে-আল্‌তায় মানায়! অনিলকুমার সে কালো মুখ পানে আর চাহিয়া দেখিলেন না।

তা'র পর সাত বৎসর অতীত হইয়াছে; কিন্তু অনিলকুমার সে কালো মুখপানে আর ফিরিয়া দেখিলেন না। তিনি কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় চলিয়া গিযাছেন—কলিকাতা হইতে আর গৃহে ফিরিলেন না। অভাগিনী অলকা কত কাঁদে—মা কত কাঁদিযা চিঠি লিখেন; কিন্তু অনিলকুমার কিছুতেই আর বাড়ী আসিলেন না। স্বামিপরিত্যক্তা অলকা আর কি করিবে? সে শুধু কান্না সম্বল করিয়া, শিবপূজা করিযা, ভগবতীর পাদোদক পান করিয়া দিন কাটায়। কিন্তু দিন যে আর কাটে না!

৩

ভগবতী, বউকে লইযা কলিকাতায অনিলকুমারের বাসায আসিয়াছেন।

একদা সন্ধ্যার পর ভগবতী পুত্রকে কহিলেন, "ছি বাবা, আজ রাতে আর বাহিরে যাইও না বউ যে আমার কাঁদিযা কাঁদিযা সারা হইল। এমন লক্ষ্মীমন্ত বউয়ের পানে তুমি ত একটিবার চাহিয়া দেখিলে না—একবার দেখ—বাবা, একবার চেয়ে দেখ।"

অনিল। ওই কথাটি আমায় বলিও না, মা। তুমি আর যাহা বলিবে, সব পারিব, কিন্তু তার মুখ দেখিতে পারিব না।

ভগবতী। কোন্ অপরাধে তুমি ঘরের লক্ষ্মী বৌয়ের মুখ দেখিবে না?

অনিল। অপরাধ কি, তাহা আমি জানি না। কিন্তু যার মুখ দেখিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, তার মুখ আমি দেখিতে পারিব না।

অনিল চলিয়া গেল। কপাটের পাশ হইতে একখানি অশ্রুসিক্ত ছোট মুখ ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তার পর নিস্তব্ধ নিশীথে নির্জ্জন গৃহে ভূশয্যায় পড়িয়া অলকা কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মনে কহিল, "মা আমাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু আমি কেমন করিয়া এ স্থান ছাড়িয়া যাইব? এ যে আমার স্বর্গ। এখানে থাকিয়া তাঁহাকে দিনান্তে একটিবারও লুকাইয়া দেখিতে পাই—একটিবারও তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে

পাই। হায়, আমার সে সুখ বুঝি ঘুচিয়া যায়। আমি যে লজ্জায় মাকে কিছু বলিতে পারি না। ওগো, তোমরা কেহ বলিয়া কহিয়া আমাকে এ তীর্থে রাখাইয়া দেও না গা!"

কিন্তু কেহ রাখাইয়া দিল না;—শাশুড়ীর সহিত অলকাকে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতে হইল।

তার পর কয়েকমাস কাটিয়া গেল।

৪

শয্যাশায়িতা অলকা ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "মা কই?"

"এই যে মা, আমি তোমারই কাছে আছি।"

অলকা। মা, আর আমি বাঁচিব না।

ভগবতী। ছি, অমন কথা বলিতে নাই।

অলকা। মা, আমার মরিবার সময় তোমার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দিও। আর—আর—

ভগবতী। আর কি মা?

কিন্তু অলকার আর কথা সরিল না; ক্ষীণ শুষ্ক গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে আঁখি-জল গড়াইতে লাগিল। অলকা ধীরে ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা, আমি মরিয়া গেলেও তিনি কি বাড়ীতে আসিবেন না?"

ভগবতী বস্ত্রাঞ্চল চোখে দিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। অলকা বলিল, "যদি আসেন তাহা, হইলে যেখানে আমাকে দাহ করা হইবে, সেই স্থানে তাঁহাকে একবার যাইতে বলিও।"

কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবতী বলিলেন, "কেন মা, অমন কথা বলিতেছ?"

সে কথা কাণে না তুলিয়া অলকা বলিল, "যদি সেই শ্মশানক্ষেত্রে আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখের জল এক ফোঁটাও পড়ে, তাহা হইলে—"

"ছি, আবার ওই কথা বলিতেছ!"

অলকা বলিতে লাগিল,—"তাহা হইলে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে—আমার রমণী-জনমের সকল সাধ মিটিবে।"

৫

অলকার পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। ভগবতী মহা চিন্তিতা হইয়া ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার বাবু পরীক্ষান্তে বলিলেন, রোগ কঠিন—জীবন সংশয়। জেলা হইতে বিচক্ষণ চিকিৎসক আসিলেন; তিনি দেখিয়া বলিলেন, কাসরোগ (থাইসিস্) জন্মিয়াছে। ভগবতী তখন ভীত হইয়া কন্যা ও জামাতাকে আনিলেন।

কন্যা কুলদা আসিয়া দাদার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি আসিলেন না। চিঠির উপর চিঠি, লোকের উপর লোক গিয়াছে, তবু তাঁহার দেখা নাই। অলকা হতাশ হইয়া কুলদাকে বলিল, "ঠাকুরঝি, আমার শেষ দিনেও কি তিনি একবার দেখা দিবেন না?"

কুলদা উত্তর করিল, "তুমি নিশ্চয় জেনো বউ, দাদা আসিবেন। দাদাকে না দেখিয়া তোমার মরা হবে না।"

অলকা। বুঝি জীবন থাকিতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। জীবন যে শেষ হয়ে এল, দিদি।

কুলদা। তোমার মত সতী সাবিত্রীর কামনা বিফল হয় না। তুমি নিশ্চয় জেনো, দাদাকে না দেখিয়া তুমি মরিবে না।

৬

কলিকাতাস্থ একতম অট্টালিকামধ্যে কোন সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া সুরাপানোন্মত্ত বন্ধুবান্ধব-পরিবেষ্টিত অনিলকুমার আনন্দ-উপভোগে (!) নিবিষ্টচিত্ত। তিনি এক্ষণে কালো ছাড়িয়া জনৈক দুগ্ধালক্তকনিন্দিবরণা যুবতী পাইয়াছেন। যুবতী গাহিতে জানে, নাচিতে জানে, তার উপর—আবার রূপ।

ভোরপুর মজলিস—পাখোয়াজের বোল—তবলার চাটি—নূপুরের ধ্বনি—সঙ্গীতের ঝঙ্কার কক্ষ প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। অনিলকুমার পূর্ণসুখে উন্মত্ত। এই পূর্ণসুখে বাধা দিয়া তাঁহার ভগিনীপতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সজলনয়নে কহিলেন, "একবার চল অনিল,—একবার চল;—তোমার সেই মৃতকল্প স্ত্রীকে একবার দেখিবে চল।"

গীতবাদ্য থামিয়া গেল। অনিলকুমার উত্তর করিলেন, "আমি যাব না—সে কালো স্ত্রীর মুখও দেখব না।"

জনৈক বন্ধু বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল,—"বাহবা! বাহবা! একেই ত বলি পুরুষ-বাচ্ছা।"

ভগিনীপতি বলিলেন, "একবার দেখবে না?"

অনিল। না, দেখব না।

ভ-প। আচ্ছা, আজ আমি রহিলাম—কাল তোমায় নিয়ে যাব।

৭

আজ বড় ভয়ানক দিন। ডাক্তার বলিয়াছে, আজ রোগিণীর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।

তাপদগ্ধা নীলবরণা অপরাজিতার ন্যায় অলকা শয্যোপরি পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্বে, কুলদা বারি-ভারাকুল নয়নে উপবিষ্টা। মাথাব শিয়রে, বধূ বৎসলা ভগবতী দেবী, বধূ-মুখ পানে চাহিয়া নীরবে অজস্রধারায় আঁখিজল ফেলিতেছেন। বারান্দায় ডাক্তার ও প্রতিবেশীরা উদ্বিগ্নচিত্তে দণ্ডায়মান।

"কই মা—আমার দেবতা কই? একবার দেখা, মা।"

শাশুড়ী কি উত্তর দিবেন? তিনি নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অলকা একবার ঘাড় ঘুরাইয়া চারিদিক্ দেখিল। চক্ষু যেন কি খুঁজিতেছে, কিন্তু তাহা দেখিতে না পাইয়া নয়ন আবার মুদ্রিত হইল।

এমন সময় সেই ঘরে ধীরে ধীরে গম্ভীর জলদ-খণ্ডের ন্যায় অনিলকুমার আসিয়া মুমূর্ষু পত্নীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। অনিল স্থিরদৃষ্টিতে পত্নীর কালো মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখ দেখি, অনিল, একবার দেখ, এই কালো মুখ কত সুন্দর! এমনটা আর কোথাও দেখিয়াছ কি? তোমার সেই প্রেতপুরে—তোমার কল্পনার নন্দনে এমন সুন্দর, এমন পবিত্র কিছু দেখিয়াছ কি?

মুদ্রিতনয়না অলকা বলিল, "একবার দেখা।"

"চেয়ে দেখ না, মা।"

অলকা নয়ন উন্মীলিত করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, এই আট বৎসর ধরিয়া নিয়ত যাহার ধ্যান করিয়া আসিয়াছে—দেবতা-জ্ঞানে যাহাকে পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই দেবতা সম্মুখে। ধীরে-ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে অলকা বলিল, "এসেছ, প্রভু! এত দিনে দয়া হ'ল? তবে তোমার পদধূলি আমার মাথায় দেও। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে এমনি শাশুড়ী, এমনি স্বামী পাই।"

আর কথা সরিল না। অনিলের চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিয়া অলকা অনন্তধামে চলিয়া গেল।

৮

ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিয়া উঠিল,—ধূমে আকাশ সমাচ্ছন্ন হইল। আজন্ম স্বামিপ্রেমবঞ্চিতা পতিব্রতার দেহ অগ্নির তেজে পুড়িয়া সকল যন্ত্রণার শেষ করিল।

এমন সময় "একবার দেখা" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে অনিলকুমার উন্মত্তভাবে শ্মশানে ছুটিয়া আসিল।

"একবার দেখা—ওগো একবার দেখা।"

অনল গর্জ্জিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখাব?"

"আমার সেই কালো মুখ।"

বলিতে বলিতে অনিলকুমার আছাড় খাইযা সেই প্রজ্বলিত চিতাব উপর পড়িল,—কেহ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিল না। তখন লোকে শুনিল, স্থলজল-ব্যোম চমকিত করিয়া চিতার মধ্য হইতে কাতরকণ্ঠে চীৎকার উঠিল, "একবার দেখা—ওগো, একবার দেখা।" কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। যতক্ষণ না চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, ততক্ষণ লোকে শুনিয়াছিল, অনল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—"একবার দেখা—ওগো, একবার দেখা।"

চিতা নিবিয়া গেল। দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। ক্রমে অলকার স্মৃতিও সকলের হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু আজও লোকে শুনিতে পায়, গভীর নিশীথে শ্মশান হইতে চীৎকার উঠিতেছে,—"একবার দেখা—ওগো একবার দেখা।"

দুই বন্ধু

১

ইচ্ছামতী-উপকূলে বসিয়া সন্তোষকুমার প্রবাস-গমনেচ্ছু বন্ধু গিরিজানাথকে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আসিবে?"

গিরিজা উত্তর করিল, "তা ঠিক বলিতে পারি না।"

সন্তোষ। ঠিক না বলিতে পারিলেও একটা আন্দাজ করিয়া ত বলা যায়।

গিরিজা। আমি জীবিকা-প্রার্থী; যত দিন না জীবিকা মিলিবে, তত দিন গৃহে ফিরিব না।

সন্তোষ। যত দিন না মিলে, তত দিন গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে কি প্রকারে?

গিরিজা। গৃহেই কি অন্ন আছে?

সন্তোষ। না থাকুক, তবু অনাহারে মরিতে হয় না।

গিরিজা। এত দিন যে মরি নাই, সে তোমারই কৃপায়।

সন্তোষ। অনুগ্রহ ভগবানের, আমি আর কি করিয়াছি?

গিরিজা। তুমি যা' করেছ, তা' কখন ভুলিব না,—বুঝি মায়ের পেটের ভাইও এতটা করে না।

সন্তোষ। তুমি কি আমায় কাঁদাবার মতলব করেছ? ও-সব কথা আমার ভাল লাগে না।

গিরিজা। ভাল যে লাগে না, তা' আমি জানি। যে স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী, সে নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিতে ইচ্ছা করে না।

তখন সন্ধ্যা হইযাছে। রুধিরাক্ত রবি ইচ্ছামতী-বক্ষোপরি হেলিয়া পড়িয়াছে,—যেন রক্তরাগ ধুইবার আশায় স্নানে নামিয়াছে। তা'র রক্তরাগ-ধৌত জলে ইচ্ছামতীরও খানিকটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা, স্নানজল মাথায় ধরিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটা মূর্খ মাঝি সে পবিত্রতা, সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না—একখানা ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া সেই সুন্দর জল মথিত করিতে করিতে চলিয়া গেল। সন্তোষকুমার নৌকা পানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রাখিয়া গেলে ভাল হইত।"

গিরিজা। সেখানে কা'র কাছে রাখিয়া যাইব?

সন্তোষ। কেন, তাঁর ভাইযের কাছে।

গিরিজা। ভাই ধনী, আমরা দরিদ্র; সেখানে পাঠাইতে প্রবৃত্তি হয় না।

সন্তোষ। এখানে নিঃসহায় রাখিয়া যাইতে প্রবৃত্তি হয়?

গিরিজা। হয়।

সন্তোষ। কেন?

গিরিজা। এখানে যে তুমি আছ।

উভয়ে নীরব—স্থির নদীপানে চাহিয়া উভয়ে নীরব। উভয়ের হৃদয় মেঘভরা—চক্ষু জলপোরা। তখন সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে। আর সে লাল জল নাই—রং উঠিয়া গিযাছে। সম্মুখে শুধু কাল জল। গিরিজা বলিল, "ভাই, লাবণ্যকে দেখিও; লাবণ্য আমার সর্ব্বস্ব। 'সে আমার সর্ব্বস্ব বলিয়াই তোমাব কাছ ছাড়া আর কোথাও তাহাকে রাখিয়া যাইতে পারিলাম না।"

সন্তোষ কোন উত্তর দিতে পারিল না; তা'র গলাটা তখন রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, আঁখিতে জল উথলিয়া উঠিতেছে। উচ্ছ্বসিত মনোভাব লুকাইবার আশায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল। গিরিজাও উঠিল। তখন আকাশে নক্ষত্র উঠিয়াছে। গিরিজা বলিল, "ভাই, প্রাণ বড় কাঁদিতেছে।"

সন্তোষ। কেন এত অধীর হচ্ছ?

গিরিজা। তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি ব'লে তত নয়।

সন্তোষ। তবে?

গিরিজা। একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

সন্তোষ। কি দেখেছ?

গিরিজা। যেন তোমাতে আমাতে আর দেখা হবে না।

সন্তোষ স্তম্ভিত হইল। সন্তোষের বিশ্বাস, স্বপ্ন বড় একটা মিথ্যা হয় না। তবু সে গিরিজাকে সান্ত্বনা দিয়া নিজের হৃদয়কে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "স্বপ্ন কখন সত্য হয় না।"

গিরিজা। তুমি তবে কখন আমার মত স্বপ্ন দেখ নি; আমি যা' দেখি, তা' কখন মিথ্যা হয় না।

সন্তোষ। ও সব বাজে কথা রাখ; এখন ঠিক করিয়া বল দেখি, কবে ফিরিবে?

গিরিজা। তা' কেমন করিয়া বলিব? ফেরা ত আমার হাত নয়।

সন্তোষ। মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে সব করিতে পারে।

গিরিজা সহসা কোন উত্তর করিল না;—আকাশ-প্রান্তে একটা তারকাপানে চাহিয়া ক্ষণকাল কি ভাবিল, তা'র পর দৃঢ়স্বরে বলিল, "শুন সন্তোষ, আজ শ্যামাপূজা। আগামী বৎসর এই দিনে ফিরিব স্থির করিলাম। যদি পূজার দিন, রাত্রি তৃতীয় প্রহর মধ্যে তোমাতে আমাতে সাক্ষাৎ না ঘটিল, তবে জানিবে, এ জীবনে আর দেখা হইল না।"

সন্তোষ। আমি বলিতেছি, তোমাতে আমাতে আবার সাক্ষাৎ হইবে। স্বপ্নের কথা ভুলিয়া যাও—আমার কথা স্মরণ রাখ।

গিরিজা। মিথ্যা সান্ত্বনা দিতেছ, সন্তোষকুমার! তোমাতে আমাতে এ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইবে না।

সন্তোষ। আমি বলিতেছি, আবার সাক্ষাৎ হইবে। যদি শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কোন মাহাত্ম্য থাকে —যদি পূজা-অর্চ্চনায় কোন শক্তি থাকে, তবে তোমাতে আমাতে আবার সাক্ষাৎ হইবে।

গিরিজা। অসম্ভব! স্থির জানিও ভাই, নিয়তি পরিবর্ত্তিত হইবার নয়।

সন্তোষ। পুরুষকার কি নিয়তির গতিরোধ করিতে পারে না?

গিরিজা। না;—ভগবানও পারে না।

সন্তোষ। ভাল, দেখা যাবে, নিয়তির গতিরোধ করা যায় কি না।

গিরিজা। উত্তম।

তখন দুই জনে আপন আপন চিন্তারাশি হৃদয়ে ধরিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

২

নদীর উপরেই গ্রাম। গ্রামের নাম ইলাপুর। তথায় অনেকগুলি ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস। গ্রামখানি বেশ বড়। এক জন ধনী দুরন্ত জমীদার তথায় বাস করেন, সুতরাং গ্রামখানিকে একটি ছোট নগর বলিলেও চলে।

সন্তোষ ও গিরিজার এই গ্রামেই বাস। সন্তোষের সাংসারিক অবস্থা ভাল। মেডিকেল কলেজে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সন্তোষ এক্ষণে স্বগ্রামে ডাক্তারি করিতেছেন। গৃহে মা আছে, স্ত্রী আছে, দুটি ছোট ছেলে আছে, সন্তোষের কিছুরই অভাব ছিল না,—গৃহে সুখ, মনে শান্তি, গ্রামে খ্যাতি, নির্ম্মল চরিত্র, ঈশ্বরে ভক্তি সকলই ছিল। সব থাকিলেও গিরিজার কারণ সময়ে সময়ে মনে অশান্তি আসিত।

গিরিজা সন্তোষের বাল্য-সুহৃদ্, উভয়ে শৈশবাবধি একত্র বেড়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে। তবে কিছুদিন উভয়ে ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। সন্তোষ ডাক্তারি পড়িতে কলিকাতায় গেল—গিরিজা অর্থাভাব প্রযুক্ত যাইতে পারিল না। এই সময়, অর্থাৎ পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদ-বর্ণিত ঘটনার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গিরিজার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা স্থানীয় জমীদারের সেরেস্তায় বার্ষিক আট টাকা বেতনে মুহুরিগিরি করিতেন। আয় সামান্য, বড় একটা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গিরিজা কুড়ি বৎসর বয়সে স্ত্রী ও বৃদ্ধা পিসীকে লইয়া সংসারে ভাসিল। পিতৃমাতৃকুলে তাহার আর কেহ নাই।

যাহাকে লইয়া আমাদের এ আখ্যায়িকা, তা'র কিছু পরিচয়ে প্রয়োজন। আমরা গিরিজার স্ত্রীর কথা বলিতেছি। তা'র নাম লাবণ্যবতী। সে বেশ সুন্দর;—সন্ধ্যাকালের আধফোটা মল্লিকা-ফুলের ন্যায় তাহার মুখখানি অতি সুন্দর। লাবণ্য অলঙ্কার না পরিয়াও সুন্দর।

লাবণ্যর সন্তানাদি হয় নাই। নায়িকার সন্তান থাকিলে লেখকদের একটু গোলে পড়িতে হয়। উপনায়িকার থাকিলে আপত্তি নাই, কিন্তু নায়িকার থাকিলে চলে না। তাই কমলমণিকে সন্তান লইয়া খেলিতে দেখিলাম। কিন্তু সূর্য্যমুখীর শ্রাদ্ধাধিকারী কাহাকেও দেখিলাম না। আমরা সূর্য্যমুখীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া লাবণ্যকে অনায়িকোচিত কার্য্যে কিছুতেই সংলিপ্ত হইতে দিলাম না।

লাবণ্যর মা আছে, ভাই আছে। তা' লাবণ্য তাদের কাছে বড় একটা যায় না। যখন সময় ভাল ছিল, তখন মাঝে মাঝে মাকে দেখিতে যাইত। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া পিত্রালয়ে যাইতে লাবণ্য সঙ্কুচিতা; গিরিজাও পাঠাইতে নারাজ।

সংসার আর চলে না। পিতার মৃত্যুর দিন হইতে সংসারে অনাটন। দু'চার বিঘা যা জমী ছিল, তা' বেচিয়া দু' বছর কোন রকমে চলিল। তৃতীয় বৎসর লাবণ্যর অলঙ্কারে হাত পড়িল। গহনাপত্র সামান্য, সত্বরই নিঃশেষিত হইল। তখন গিরিজার চমক ভাঙ্গিল, চাকুরি চাকুরি করিয়া দেশময় ছুটাছুটি করিল। জমীদারী সেরেস্তায় চাকুরিও মিলিল—কিন্তু টিকিল না। কেন টিকিল না, তা' বলিতেছি।

গ্রামের জমীদারের নাম নলিনীপ্রসন্ন। তাঁর আয় সালিয়ানা আঠার হাজার টাকা। আয় সামান্য হইলেও প্রতাপ অপ্রতিহত। বয়স বড় বেশী নয়,—ত্রিশের মধ্যে হইবে। দেখিতে রূপবান্; তবে মুখে লাবণ্য নাই, শ্রী নাই। এক জন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন, যার মনোভাব কুৎসিত, তা'র মুখও কুৎসিত। যাই হোক, নলিনী বাবুর চম্পক-গৌর বর্ণ দেখিলে তাঁহাকে কুৎসিত বলিতে পারা যায় না।

নলিনী বাবুর একটা গুরুতর দোষ ছিল;—তিনি রূপপ্রিয় যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখিতেন, তাহা আনিয়া নিজের বিলাস-কক্ষ সাজাইতেন। উদ্যানে 'বসোরা' বা 'সুইট ব্রায়ার' ফুটিলে—গ্রামে সুন্দরী যুবতী বা যৌবনোন্মেষোন্মুখী বালিকা নজরে পড়িলে নিজের বিলাসকক্ষে সযতনে আনিতেন। ইহাতে লোকে বড় নিন্দা করিত। তা' লোকের কি? তারা কা'র কুৎসা না করে? সংসারে যে বড় হয়, তারই গ্লানি সকলের জিহ্বাগ্রে। শঙ্করাচার্য্য বা নেপোলিয়ঁ কেহই অব্যাহতি পান নাই। তা' তাঁদের তুলনায় নলিনী বাবু—নিজে না মানিলেও—অতি তুচ্ছ।

লাবণ্যবতীর রূপের কথা অনুচরের মুখে শুনিয়া নলিনী বাবু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, দেখিবার সুযোগ খুঁজিলেন। দেখাও মিলিল; তবে দূর হইতে। সুতরাং আশা ও প্রবৃত্তি কমিল না—বাড়িল। পুনরায় দেখিবার প্রত্যাশী হইলেন। বারম্বার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না। তখন তিনি গিরিজাকে ডাকিয়া গোমস্তাগিরি দিলেন; এবং অদূরভবিষ্যতে নায়েব করিয়া দিবেন, এরূপ আশাও দিলেন। কিন্তু নলিনী বাবু যাহা আশা করিয়াছিলেন, তাহা মিলিল না,—তখন গিরিজা অপমান-সহকারে বিদূরিত হইল।

নিঃসহায় নিঃসম্বল গিরিজানাথ অকূল সমুদ্রে

ভাসিল। গৃহে অন্ন নাই—তহবিলে কপর্দ্দক নাই। অনাহারে মৃত্যু ভিন্ন উপায়ান্তর কি? কিন্তু নিয়তি মরিতে দিল না,—বাল্যসুহৃদ সন্তোষকুমারকে আনিয়া দাঁড় করাইল। মহাপ্রাণ সন্তোষকুমার প্রফুল্লচিত্তে আহার্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু প্রযোজনীয়, সমস্তই সরবরাহ করিতে লাগিল। দান গৃহীত হইল বটে, কিন্তু গিরিজার প্রাণ ফাটিয়া গেল! তা'র জীবনে ধিক্কার জন্মিল;—অর্থচেষ্টায় সে প্রবাস-যাত্রা করিল।

৩

তা'র পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে; কিন্তু গিরিজার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; গৃহ নিরানন্দ। ভার্য্যা লাবণ্যবতী বেশভূষা, আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বৃদ্ধা পিসী এক বেলা দু'মুঠা র'াধে, আর ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা কুটিয়া দিন কাটায়। সংসারে গিরিজার আর কেহ নাই; সুতরাং কাঁদিবে কে? এ পৃথিবী ত অনাথ কাঙ্গালের জন্য কাঁদে না,—আর কেহ না কাঁদুক—সন্তোষ কাদে; চারিদিকে পত্র লিখিয়াও সন্তোষ-কুমার, বন্ধুর কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। আর কতদিন স্তোক দিয়া লাবণ্যবতীকে রাখা যায়? নিজের কাতর প্রাণের চীৎকার—রুদ্ধ আঁখিজল চাপিয়া কত দিন আর লাবণ্যকে সান্ত্বনা দিয়া রাখিতে পারা যায়? সন্তোষ ভাবিয়া চিন্তিয়া আজ একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লাবণ্যের নিকট সমুপস্থিত হইল! বলিল, "বউদিদি, আমি কলিকাতায় যাইব; তোমরা সাবধানে থাকিও।"

লাবণ্য। কেন যাইতেছ?

সন্তোষ। গিরিজা দাদার সন্ধানে।

লাবণ্য। কোথায় তাঁর সাক্ষাৎ পাইবে?

সন্তোষ। দেখি, কোথায় পাই।

লাবণ্য উত্তর করিল না,—মাটীর পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কত দিন পরে ফিরিবে ঠাকুরপো?"

সন্তোষ। তা ভগবান্ জানেন; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, তাঁর সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।

লাবণ্য আবার নিরুত্তর হইল। একবার আকাশপানে, একবার গাছের পানে, একবার সন্তোষের পানে চাহিল। অবশেষে বলিল, "ঠাকুরপো, তুমি যেও না।"

উত্তর না করিয়া সন্তোষ, লাবণ্যের পানে চাহিল; দেখিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলভারাক্রান্ত। সন্তোষ সকলই বুঝিল; "তা দেখা যাবে" বলিয়া চলিয়া গেল। পরদিন বৈকালে লাবণ্য সত্য সত্যই শুনিল যে, সন্তোষকুমার স্ত্রী, পুত্র, জননী, ভগ্নী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ-গমনোদ্যোগী হইয়াছে। লাবণ্য ব্যস্ত হইয়া সন্তোষকে ডাকিতে পাঠাইল। ডাকিতে আর কে যাইবে?—পিসী গেল। বুড়ীকে পাঠাইয়া লাবণ্য ছাদে আসিয়া বসিল।

লাবণ্যদের বাড়ীখানি ক্ষুদ্র—একতল; সদরে একখানি খড়ের চণ্ডীমণ্ডপ; ভিতরে একখানি খড়ের রান্নাঘর। তা'ছাড়া দু'খানি ইটের ঘর। এই ঘর দুইখানির ছাদ, লাবণ্যের আরামের স্থান। সকালে বিকালে যখন অবকাশ পাইত, তখন সে ছাদে আসিয়া বসিত।

লাবণ্য যখন ছাদে আসিয়া বসিল, তখন অপরাহ্ণ। ছাদটি প্রাচীর-বেষ্টিত নয়। কিন্তু সড়ক হইতে ছাদের মানুষ দেখা যায় না—কেন না, বড় বড় গাছ অন্তরাল করিয়া প্রায় চারিধারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লাবণ্য ছাদে আসিয়া সন্তোষের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বুড়ীও ফিরে না—সন্তোষও আসে না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এমন সময় নাপ্তিনী হরিমতী আসিয়া দেখা দিল। তাহার হাতে একটা বড় রকমের পুঁটলি। সে পুঁটলি নামাইয়া একটু হাসির সহিত বলিল, "কি গো, ভাল আছ ত? তোমার পিস্শাশুড়ী কোথায়?"

"তিনি ঠাকুরপোর বাড়ী গেছেন।"

নাপ্তিনী সাহ্লাদে দেখিল, গৃহে অপর কেহ নাই—পথ পরিষ্কত। তখন পুঁটলি খুলিতে খুলিতে একটু মধুর হাস্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "বল দেখি বউদিদি, তোমার জন্য কি এনেছি?"

লাবণ্য উত্তর করিল না। সে হরিমতীকে চিনিত—তাহার চরিত্রও জানিত। লাবণ্য কিছু-কাল নীরব থাকিয়া ঘৃণাভরে একবার তার পুঁটলির পানে চাহিল। হরিমতী কিন্তু কোন দিকে না চাহিয়া পুঁটলি খুলিল এবং তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি একে একে বাহির করিয়া লাবণ্যের সম্মুখে সাজাইতে লাগিল।—চিরুণি, ফিতা, সাবান প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য বাহির করিয়া লাবণ্যের সম্মুখে রক্ষা করিল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব এখানে রাখিতেছ কেন?"

নাপতিনী। এ সব তোমার—তোমার জন্য এনেছি।

লাবণ্য। আমার জন্য? আমি ত তোমার কাছে কিছু চাহি নাই।

তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত অধরে একটু মধুর হাসি আনিয়া হরিমতী বলিল, "এক জন তোমায় দিয়াছেন।"

লাবণ্য। কে দিয়াছেন?

নাপতিনী। যিনি দেশের রাজা।

লাবণ্য। জমীদার নলিনী বাবু?

নাপতিনী। হাঁ, তিনি এতদিন এখানে ছিলেন না, পীড়িত হয়ে পশ্চিমে হাওয়া খেতে গিছ্‌লেন; তাই এত কাল তোমার কোন খোঁজ নিতে পারেন নি। তাঁর দয়া থাক্‌লে তোমার আর দুঃখ কি?

লাবণ্য। তিনি কেন আমায় এ সব জিনিস দিয়াছেন?

নাপতিনী। বোকা মেয়ে! বুঝ্‌তে পারছ না? তিনি তোমায় ভালবাসেন, তাই দিয়েছেন। আমারও বয়সকালে কত লোকে কত কি দিয়েছে।

লাবণ্যর মনে বড়ই ঘৃণা জন্মিল। সে আজ দরিদ্র হইয়াছে বলিয়া এ উপহারের প্রলোভন! বর্দ্ধমান ক্রোধ দমন করিয়া লাবণ্য ধীরে ধীরে শান্তভাবে উত্তর করিল, "তোমার জিনিস ফিরিয়ে নিয়ে যাও। যিনি তোমায় পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বলিও যে, এরূপ নীচোচিত ব্যবহার দেশের জমীদারের নিকট আমরা প্রত্যাশা করি না। তুমি যাও—এ বাড়ীতে আর আসিও না।"

কথাগুলি শান্তভাবে বলিলেও দূতী রাগিয়া উঠিল। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ জমীদারের অপমান! তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান! কিন্তু দূতের রাগিলে চলে না।—ক্রোধ সম্বরণ করিয়া হরিমতী অনেক বুঝাইল, জমীদারের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের দুই চারিটা গল্প বলিল; এবং তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইলে লাবণ্যের পরিণাম কি ভয়াবহ হইতে পারে, তাহাও ইঙ্গিতে জানাইল। কিন্তু কোন ফল হইল না; লাবণ্য বরং উত্তেজিত হইয়া নাপতিনীকে দুই চারিটা কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল।

নাপতিনী তখন মহাক্রুদ্ধ হইয়া মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল, এবং অকথ্য ভাষায় লাবণ্যকে শাসাইতে লাগিল। এমন সময় তথায় সন্তোষকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া হরিমতী চুপ করিল। কিন্তু চুপ করিবার পূর্ব্বে তাহার দু'একটা কথা সন্তোষের কাণে গিয়াছিল। লাবণ্যর উত্তেজিত ভাবও সন্তোষের নয়নাকর্ষণ করিল। তিনি একটু সন্দিহান হইলেন। লাবণ্যর সম্মুখে দ্রব্যসম্ভার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠে নাপতিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে?"

জমীদারের আশ্রিতা নাপতিনী নির্ভয়ে উত্তর করিল, "জমীদার বাবু।"

সন্তোষ বলিলেন, "তোমার জমীদারকে বলিও, তাঁহার প্রেরিত উপহার আমি পদাঘাতে দূর করিয়াছি।"

বলিয়া তিনি সত্যসত্যই দ্রব্যনিচয় পদাঘাতে দূর করিয়া ফেলিয়া দিলেন। নাপতিনী ক্ষণকাল সন্তোষের পানে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল। সন্তোষ বলিলেন, "আর তুমি যদি কখন এ বাড়ীতে এস—"

পিছন হইতে পিসী বলিল, "তা হ'লে তোকে ঝাঁটা-পেটা করব।"

নাপতিনী আর বিলম্ব করিল না,—দ্রব্যাদি সত্বর গুছাইয়া লইয়া জমীদার-ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। নলিনী বাবু তখন উদ্যানে বসিয়া নাপতিনীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সহজেই তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল। হরিমতী ঘটনাটি বেশ একটু বাড়াইয়া রসান চড়াইয়া বিবৃত করিল। শুনিয়া নলিনী বাবু ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব পণ—তাহাকে আমার করিব—ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া পারি—তাহাকে এ উদ্যানে আনিব।"

ঠিক সেই সময়ে সন্তোষ, লাবণ্যকে বলিল,—"বউদিদি, আমার যাওয়া হ'ল না, তবে তুমি যদি কিছুদিনের জন্য পিত্রালয়ে যাও, তবে আমি যাইতে পারি।"

লাবণ্য উত্তর করিল, "আর কোথাও যাব না—তাঁর প্রতীক্ষায় এইখানেই থাকিব।"

৪

লোকে ভাবে, চাকুরিটা বুঝি কলিকাতার রাস্তায় পড়িয়া আছে, কুড়াইয়া আনিতে পারিলেই হইল। পড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু কয়টা লোক তাহা কুড়াইয়া লইতে সমর্থ? দেশময়, রাজ্যময় টাকা ছড়ান রহিয়াছে, কিন্তু সেই রৌপ্যরাশি উঠাইয়া ঘরে আনিতে কয়টা লোকের সামর্থ্য আছে? কয়টা লোকের সে অধ্যবসায়, সে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে পুরুষকার আছে?

গিরিজানাথের সে অধ্যবসায় আছে কি না, জানি না, কিন্তু সে কোথাও চাকুরি জুটাইতে পারিল না। বাঙ্গালী চাকুরি ভিন্ন আর কি করিবে? গিরিজানাথ চাকুরি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিল না। কিন্তু চাকুরি কলিকাতার রাস্তা হইতে

উঠাইয়া লইতেও পারিল না। তখন রাজধানী ছাড়িয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গেল।

সেখানেও বড় একটা সুবিধা করিতে পারিল না। কলিকাতায় এক ধনীর গৃহে কিছুদিনের জন্য মাষ্টারি করিয়া গিরিজা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল; অবশেষে তাহা নিঃশেষিত হইয়া আসিল। তখন চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে সে গৃহের দিকে ফিরিতে লাগিল। পথের ধারে জামালপুরে একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে নামিল। সেইখানে ঘটনাক্রমে কারখানার জনৈক সাহেবের সুনজরে পড়িল। সেটা বড় তুচ্ছ কথা নয়। বাঙ্গালী যে জন্য লালায়িত, গিরিজা তাহা পাইল,—একটু চাকুরি, আর সাহেবের কৃপা। গিরিজার অবসন্ন হৃদয়ে আবার শক্তির সঞ্চার হইল,—সে মহানন্দে চাকুরিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন গিরিজা গৃহে পত্র লিখিল; সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, চাকুরি সংগ্রহ না করিয়া সংবাদ দিবে না। এক্ষণে স্ত্রীকে ও বন্ধুকে পত্র লিখিল। প্রত্যুত্তরে বন্ধু সন্তোষকুমার লিখিলেন, "বউদিদিকে সত্বর লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিবে; যদি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইতে না পার, তাহা হইলে লিখিবে, আমি গিয়া রাখিয়া আসিব। কিন্তু এখানে কোনমতেই বউদিদিকে আর রাখা হইতে পারে না,—বানরের উপদ্রব হইয়াছে।" পত্রের মর্ম্ম গিরিজা বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

স্ত্রী লিখিল, "এত দিন পরে দাসীকে মনে পড়িল? যদি মনে পড়িল, তবে চরণে স্থান দাও,—আমায় সত্বর লইয়া চল। যদি কাল আসিতে পার, তবে পরশুর অপেক্ষা করিও না। সন্তোষ ঠাকুরপোরও তাই ইচ্ছা। জানই ত তাঁর মত আত্মীয় আমাদের আর নাই। তাঁর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিও না।"

গিরিজানাথ মহাবিপাকে পড়িল। ছুটিয়া সাহেবের কাছে ছুটীর জন্য গেল, সাহেব ছুটী দিলেন না; বলিলেন, "তুমি আজ কয় দিন মাত্র চাকুরিতে ভর্ত্তি হইয়াছ, এরই মধ্যে ছুটী? সম্মুখে দুর্গা-পূজা, তখন যাইও।"

গিরিজানাথ পূজার অবকাশের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু তখনও ছুটী মিলিল না,—বড় বাবু অন্তরায় হইলেন, গিরিজা অনেক কান্নাকাটি করিল, কিন্তু বাবুর দয়া হইল না। তখন গিরিজা সাহেবকে গিয়া ধরিল? সাহেবের দয়া হইল,—তিনি তিন দিনের ছুটী দিলেন। কিন্তু সে হুকুম বড় বাবু চাপিয়া রাখিলেন। ফল এই দাঁড়াইল যে, গিরিজানাথ পূজাবকাশে এক দিনের জন্যও ছুটী পাইল না। বারম্বার সাহেবকে ত্যক্ত করিতেও তাহার সাহস হইল না।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে গিরিজানাথ একদিন সুযোগ বুঝিয়া সাহেবকে ধরিল—তাহার স্ত্রীকে আনিতে চায়, তাহাও সাহেবকে জানাইল। সাহেব বলিলেন, "তোমায় ত আমি কয়দিন পূর্ব্বে ছুটী দিয়াছি, বাবু।"

গিরিজা। সাহেব, আমি হুকুম পাই নাই।

সাহেব। আচ্ছা, আমি তদন্ত করিয়া দেখিব; যদি ছুটী না পাইয়া থাক, তোমায় আমি সাত দিনের ছুটী দিব।

পরদিবস অপরাহ্নে সাহেবের খোদ চাপরাশি ছুটীর হুকুম লইয়া গিরিজার নিকট উপস্থিত হইল। গিরিজা মহা উল্লাসে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। সে দিন চতুর্দ্দশী—পরদিবস শ্যামাপূজা।

আজ শ্যামাপূজা। ইলাপুরে বড় ধূম। জমীদারভবনে প্রতিমা-পূজা হয়। তদুপলক্ষে যাত্রা, নাচ প্রভৃতি নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া জমীদারবাটীর দিকে ছুটিল; পূজা দেখিতে নয়—যাত্রা শুনিতে।

সন্তোষের বাড়ীতেও শ্যামাপূজা। কিন্তু সেখানে আড়ম্বর নাই। একখানি ক্ষুদ্র মৃন্ময় প্রতিমা লইয়া এক জন বৃদ্ধ পুরোহিত উপবিষ্ট। পুরোহিত, পূজোপকরণ লইয়া ডাহিনে বামে সাজাইতে লাগিলেন। জবা, পদ্ম, অপরাজিতা, শেফালিকা, বিল্বপত্র স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া আকুল'—দুই গণ্ড বহিয়া অজস্রধারে জল গড়াইতে লাগিল। বাহ্যজ্ঞান-বিবর্হিত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রতিমা-চরণে ফুল-বিল্বপত্র না দিয়া তৎসমুদয় ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কখন বা উন্মাদের ন্যায় স্বীয় মস্তকে বক্ষে চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। মৃণ্ময় প্রতিমা ভুলিয়া বৃদ্ধ ভক্ত মানসপটে যে দেবীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারই অর্চ্চনা করিতে উন্মত্ত। উপাসক কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী-চরণে নিবেদন করিলেন,—"মা, যে সঙ্কল্প হৃদয়ে ধরিয়া এই দ্বাদশ মাস নিয়ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছি, আমার জ্ঞানমত শুদ্ধাচারে পূজা হোম শান্তি-স্বস্ত্যয়ন চণ্ডীপাঠ করিয়া আসিতেছি, আমার সে সঙ্কল্প, সে বাসনা পূর্ণ করিয়া দেও মা!—সর্ব্ব আপদ্ শান্তিপূর্ব্বক সন্তোষ ও

গিরিজার মিলন সজ্ঘটিত করিয়া দাও, বরাভয়-দায়িনি।"

সন্তোষকুমার প্রতিমা-পদতলে প্রণাম করিতে করিতে বলিল, "ভাগ্য-বিধাত্রি, যদি কায়মনোবাক্যে এই দ্বাদশ মাস তোমার আরাধনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আজ গিরিজার সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটাইয়া দাও। জীবনে জ্ঞানতঃ কখন অধর্ম্মাচরণ, পরপীড়ন করি নাই; আমার ধর্ম্ম, আমার পুণ্য দিয়া গিরিজাকে রক্ষা কর—আমার কামনা পূরণ কর। তোমার চরণে প্রণাম করিয়া গিরিজার সাক্ষাৎ আকাঙ্ক্ষায় চলিলাম, আমার কামনা যেন নিষ্ফল না হয়।"

সন্তোষ উঠিল। তখন রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর।

৬

ছাদে বসিয়া লাবণ্য পূজার বাজনা শুনিতেছিল। এক একবার উঠিয়া এ-দিক্ ওদিক্ দেখিতেছিল। আজ গিরিজার গৃহে ফিরিবার কথা। লাবণ্য ভাবিতেছিল, "তিনি বলিয়া গিয়াছেন, 'শ্যামা-পূজার দিন গৃহে ফিরিব; যদি রাত্রি তৃতীয় প্রহরের মধ্যে না ফিরি, তবে জানিবে আর দেখা হইল না।' দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে; কই, তিনি ত এখনও আসিলেন না?"

পিসী এক পাশে শুইয়াছিল; সহসা বলিয়া উঠিল, "না বাপু, সন্তোষ এখনও এল না—আমি যাই, একবার ঠাকুরটা দেখে আসি—গিরিজার কল্যাণে পূজা মানত আছে, দিয়ে আসি; আমি যাব, আর আসব।"

লাবণ্য। না, পিসীমা, ঠাকুরপো না এলে তোমার য'ওয়া হ'তে পারে না; আমি কি একা থাক্‌ব?

পিসী। সন্তোষের কিন্তু ভারি অন্যায়, সে জানে, আমি পূজা দেখ্‌তে যাব।

লাবণ্য। ঠাকুরপোর অন্যায়? ঠাকুরপো বোধ হয় জীবনে কখন অন্যায় কাজ করেন নাই।

পিসী। তবে সে এখন এল না কেন?

লাবণ্য। হয় ত পূজা ফেলে আসতে পার্‌ছেন না। তুমি ত জানই, কি জন্য আজ এই পূজার আয়োজন। তোমারি মুখে শুনেছি, ঠাকুরপো বারমাস-ব্যাপী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর্‌তে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন। আজ ব্রত-উদ্‌যাপন—একটু দেরি হচ্ছে ব'লে কেন তাঁকে দোষী কর?

পিসী। আহা, সন্তোষ আমার সোণার চাঁদ—এমন ছেলে সংসারে হয় না—বাছা দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে বেঁচে থাক্—

"কা'কে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছ পিসী-মা?"

"কে, সন্তোষ এলি? আয় বাবা আয়!"

সন্তোষ উপরে উঠিয়া আসিয়া পিসীমার কাছে দাঁড়াইলেন। পিসী বলিল, "বাবা, তুমি একটু বসো, আমি একবার ঠাকুরটা দেখে আসি।"

সন্তোষ। যাবে যাও, কিন্তু শীঘ্র এস। এখনি গিরিজা দাদা আস্‌বেন।

পিসী রীতিমত কাঁদিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "এমন দিন কি আমার হবে, গিরিজা আবার এসে পিসী ব'লে ডাক্‌বে।"

সন্তোষ। আজ তাঁকে আস্‌তেই হবে, কেহ রোধ কর্‌তে পার্‌বে না। পৃথিবী বৈরী হইলেও আজ তাঁতে আমাতে সাক্ষাৎ হ'বে। এইমাত্র আমি পূর্ণাহুতি দিয়ে আস্‌ছি—ললাটে আমার যজ্ঞফোঁটা—মাথায় জগদম্বার নির্ম্মাল্য—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ এখনও আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

এমন সময় দ্বারে শিকলের শব্দ হইল। সন্তোষ চমকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গিরিজা। —গিরিজাদাদা?"

পিসী বলিল, "গিরিজা কেন হবে? সে শিকল নাড়বে না,—সে জানে, বা'র হ'তে কেমন ক'রে ভিতরের খিল খুল্‌তে হয়। যাই, আমি একবার চট্‌ ক'রে ঠাকুর দেখে আসি।"

পিসী নামিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই নীচে হইতে ভয়-চকিত কণ্ঠে চীৎকার উঠিল, "বাবা গো।" সন্তোষ ও লাবণ্য উভয়েই চিনিল, পিসীর কণ্ঠস্বর; ব্যস্ত হইয়া উভয়ে ছুটিয়া নীচে চলিল। অর্দ্ধপথে পিসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সন্তোষ ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, পিসীমা?"

পিসীমা ভয়রুদ্ধ কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হয়েছে, বাবা—উপরে চল, বল্‌ছি।"

উপরে আসিয়া পিসী বলিল, "সর্ব্বনাশ হয়েছে—ডাকাতে বাড়ী ঘিরেছে। দোর খুলে যেমন ঠাকুর দেখ্‌তে যাচ্ছি, আর দেখি কি না যমের মত দু'টো লোক লাঠী ঘাড়ে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কি হবে, বাবা? পাড়ায় ত লোক নেই, সব ঠাকুর দেখ্‌তে গেছে—বুড়া বয়সে কি ডাকাতের হাতে প্রাণটা দিতে হ'ল?"

বুড়ী নিজের চিন্তায় বিভোর। সন্তোষ কিন্তু আর একটা কথা ভাবিতেছিলেন। তাঁহার মনে স্বতঃই

উদয় হইল, "যার মত দরিদ্র এ গ্রামে নাই, তার বাড়ীতে ডাকাতি কেন?" সন্তোষ ভাবিতে অবসর পাইলেন না। একটা লোক প্রাচীর উল্লম্ফনে গৃহপ্রাঙ্গণে পড়িল এবং দ্রুতপাদবিক্ষেপে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া ছাদে আসিল। ছাদে একটা দীপ জ্বলিতেছিল; তদালোকে সন্তোষকুমার মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে চিনিলেন।—সে জমীদারের বেতনভোগী জনৈক লাঠিয়াল। সন্তোষকে দেখিয়া লোকটা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য; পরমুহূর্ত্তে লাবণ্যর দিকে অগ্রসর হইল। সন্তোষ তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দস্যু, সন্তোষকে মারিতে উদ্যত হইল। ছাদে একটা পিত্তলের ঘটি পড়িয়াছিল, সন্তোষ একটু পিছাইয়া আসিয়া তাহা উঠাইয়া লইলেন এবং লোকটার মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন। দস্যু সশব্দে পড়িয়া গেল।

সন্তোষ তৎক্ষণাৎ লাবণ্যর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বউদিদি, এখন সঙ্কোচের সময় নয়—পালাতে হবে।"

লাবণ্য। পালাব না—তিনি যে আসিবেন।

সন্তোষ। এখন বাঁচিলে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা।

লাবণ্য। এত ভয়ই বা কিসের? ডাকাতেরা ত প্রাণে মারে না। না হয়, দু'চারখানা বাসন যা' আছে, তাই নিয়ে যাবে।

সন্তোষ। এ ডাকাতি বাসনের জন্য নয়—এ ডাকাতি তোমার জন্য।

লাবণ্য। আমার জন্য?

সন্তোষ। হাঁ; ডাকাতের সর্দ্দার কে জান? স্বয়ং নলিনীপ্রসন্ন।

লাবণ্যর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে বলিল, "মরিতে হয়, এইখানে মরিব, তিনি আমায় এইখানে রাখিয়া গিয়াছেন—এইখানে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, আমি এ স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

সন্তোষ। মৃত্যু ত সুখের! কিন্তু তুমি ভুল বুঝিতেছ, জমীদার তোমায় মারিতে আসে নাই, ধরিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পদশব্দ শ্রুত হইল, তখন সন্তোষ আর সঙ্কোচ না করিয়া লাবণ্যকে কাঁধের উপর ফেলিলেন, এবং লম্ফত্যাগে ছাদ হইতে ভূতলে পড়িলেন। পতনবেগে তাঁহার একটা পা ভগ্নপ্রায় হইল; সন্তোষকুমার তাহা গ্রাহ্য না করিয়া গুরুভার কাঁধের উপর লইয়া ছুটিলেন। কয়েকপদ ভূমি অগ্রসর হইতে না হইতে জনৈক দস্যু লাঠি-হস্তে পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল! সন্তোষ তখন লাবণ্যকে ভূপৃষ্ঠে নামাইয়া পশ্চাতে রক্ষা করিলেন; এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া দস্যুর সম্মুখীন হইলেন। দস্যুর লাঠি উঠিল, সন্তোষ চকিতমধ্যে সরিয়া দাঁড়াইলেন। যষ্টি পড়িল ভূপৃষ্ঠে। সন্তোষ তখন ব্যাঘ্রবৎ আততায়ীর উপর লাফাইয়া পড়িলেন এবং তাহার হস্ত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে প্রহার করিলেন। দস্যু ভগ্নহস্ত লইয়া চীৎকার করিতে করিতে সত্বর অদৃশ্য হইল।

লাবণ্যকে লইয়া সন্তোষ বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাস্তা নিকটেই, কিন্তু রাস্তায় পড়িবার পূর্ব্বেই দুই জন দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি লাঠী দ্বারা তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেও, এত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যষ্টি চালনার শক্তি তাঁহার আর ছিল না। তিনি চীৎকার করিয়া লাবণ্যকে কহিলেন, "তুমি পালাও বউদিদি—সড়কে এসে পড়েছি—সোজা পথে আমার বাড়ীতে যাও।"

"তোমাকে ফেলে পালাব না।"

"তুমি থেকে কোন্ কাজে লাগ্‌বে?"

লাবণ্যর মনে তৎক্ষণাৎ একটা ধিক্কার জন্মিল; ভাবিল, আমি কি সত্যই কোন কাজে লাগিতে পারি না? দেখিল, এক জন দস্যু লাঠি ঘুরাইয়া সন্তোষকে মারিতে যাইতেছে, আর পশ্চাৎ হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি সন্তোষকে মারিতে চুপি চুপি অগ্রসর হইতেছে! তৎক্ষণাৎ লাবণ্যও এক মুষ্টি ধূলা লইয়া দ্বিতীয় দস্যুর দিকে চুপি চুপি অগ্রসর হইল এবং সুযোগমত তাহার চক্ষু লক্ষ্য করিয়া সজোরে ধূলি নিক্ষেপ করিল। দস্যু আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

৭

সেই আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া দুই ব্যক্তি ঘটনা-স্থলে ছুটিয়া আসিল। তাহারা ষ্টেশনের দিক্ হইতে দ্রুতপদে আসিতেছিল। অগ্রগামীর হাতে একটা লণ্ঠন, পশ্চাতের ব্যক্তির মাথায় একটা মোট ছিল। প্রথম ব্যক্তি গিরিজা, দ্বিতীয় ব্যক্তি মোট-বাহক।

গিরিজা আলোক-সাহায্যে অবস্থাটা দেখিয়া লইল; স্ত্রী ও বন্ধুকে চিনিল। তার পর প্রথম দস্যুকে ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিল। কৌশলে অগ্রসর হইয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিল এবং ভূপাতিত করিয়া তাহাকে মুষ্ট্যাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়া তুলিল। দ্বিতীয় দস্যু সঙ্গীকে সাহায্য করা দূরে থাক্, নিজেই অশেষ প্রকারে সন্তোষের হস্তে

লাঞ্ছিত হইয়া ভগ্নহস্ত লইয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে কোন প্রকারে পলায়ন করিল।

গিরিজা তখন ছুটিয়া সন্তোষের কাছে আসিল। সন্তোষ আহত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, উঠিবার শক্তি ছিল না। গিরিজা আসিয়া না পড়িলে দস্যু তাহাকে শেষ করিত। গিরিজা তখন সন্তোষের দেহ বক্ষের উপর ফেলিয়া গৃহের দিকে অগ্রসর হইল।

সন্তোষ বলিলেন, "ভাই গিরিজা, আবার ত দেখা হয়েছে।"

"কিন্তু এ অবস্থায়!"

"এ অবস্থাটা ত খুব ভাল। তোমার বুকে—"

"কোথা লেগেছে বল দেখি?"

"বিশেষ কোথাও না—হেঁটে আসতে পারতাম; কিন্তু তোমার—"

"ওরে দুষ্ট। আমার বুকে উঠবার সাধ এত! আমি যে তোকে বুকের ভিতর রেখেছিলাম।"

"গিরিজাদা, তুমি যদি আর এক মিনিট বিলম্বে আস্‌তে, তা হ'লে আমাকে আর জীবিত দেখতে পেতে না। আমাকে, তোমাকে ও বউদিদিকে আজ রক্ষা করেছেন মা ভগবতী। তাঁর কৃপা হ'লে ললাট-লিখন পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁকে ডেকো—কপালে যা আছে, তা ঘটবেই মনে ক'রে নিশ্চিন্ত থেকো না।"

দীক্ষা

১

"বউমা, মঙ্গল ঘট পেতেছ গা?"

"হাঁ মা, পেতেছি।"

একমাসের ছুটী লইয়া অখিলচন্দ্র বাটী আসিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে ছুটী ফুরাইয়া গেল। ছুটীগুলা চিরদিন এমনই ফুরাইয়া যায়। আজ বেলা তিনটার সময় অখিলচন্দ্র কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিবেন। তাই স্নেহময়ী জননী পুত্রের শুভ-কামনায় মাঙ্গলিক আচরণে ব্যাপৃতা; তিনি বধূ সন্ধ্যামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঘট পেতেছ গা?"

বারিপূর্ণ একটি ঘটের মুখে একটি আম্রশাখা, দুটি বিল্বপত্র, দুটি সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া সন্ধ্যামণি উত্তর করিল,—"হাঁ মা, পেতেছি।"

পুত্র অখিলচন্দ্র পূর্ণকুম্ভের পাদমূলে প্রণাম করিয়া মাতার পদধূলি মাথায় লইলেন; পরে স্নেহশীলা প্রেমময়ী পত্নীর নিকট বিদায় লইতে আসিলেন।

একটি পাঁচ বৎসরের পুত্র, একটি দুই বৎসরের কন্যা, মায়ের হাত ধরিয়া বাপের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই—সব নীরব। অখিলচন্দ্রের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

বালক-বালিকার গণ্ডে নিঃশব্দে চুম্বন দিয়া অখিলচন্দ্র বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে ডাকিলেন,—"সন্ধ্যা—আমার সন্ধ্যা—"

সন্ধ্যামণি উত্তর করিল না,—স্বামীর মুখপানে চাহিয়া নীরব রহিল। অখিলচন্দ্র বলিলেন,—"আবার আমি শীঘ্র আসিব মণি, তোমায় ছেড়ে আমি কত দিন থাকিতে পারিব!"

চক্ষু মুছিয়া অখিলচন্দ্র বিদায় লইলেন।

অমাবস্যার অন্ধকাররাশি হৃদয়ে ধরিয়া সন্ধ্যামণি সেইখানেই বসিয়া রহিল। ভাবিল,—"চিরদিন ত এমনি ভাবে বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে আজ আমার প্রাণ কাঁদে কেন? কি যেন একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে। এ কি হ'লো, ভগবান্!"

২

কিছু দিন পরে সংবাদ আসিল, অখিলচন্দ্র রোগ-শয্যায় শায়িত; বাড়ীতে হাহাকার উঠিল। অখিলের মা বৎসহারা গাভীর ন্যায় ঘরবার করিতে লাগিলেন। অবশেষে বধূমাতার সহিত পরামর্শ করিয়া অখিলের কর্ম্মস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর যাইতে হইল না,—অবিলম্বে সংবাদ আসিল, অখিল প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। জননী কাত্যায়নী ধূলায় পড়িয়া উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিলেন। পতিপ্রাণা সন্ধ্যামণি চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। হায়, এই আশঙ্কাতেই বুঝি সাধ্বীর প্রাণ পূর্ব্ব হইতেই কাঁদিয়াছিল।

৩

তিন দিন পরে সন্ধ্যামণির জ্ঞানসঞ্চার হইল। তখন সে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, পুত্র-কন্যা কাছে বসিয়া কাঁদিতেছে। বাড়ীতে অনেক স্ত্রীলোক জমিয়াছে; সকলেরই মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। বিস্মিত নয়নে সন্ধ্যা সকলের মুখপানে চাহিয়া

দেখিল। তার পর সহসা বিদ্যুদ্বেগে সেই কথা—সেই সর্ব্বনাশের কথা মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল। সন্ধ্যা আবার চৈতন্য হারাইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

প্রতিবেশিনীদের যত্নে সন্ধ্যা অচিরে জ্ঞান লাভ করিল। তখন শাশুড়ী কাত্যায়নী বধূর মুখে জল দিয়া বলিলেন,—"উঠ বউমা, আজ তিন দিন মুখে জল দেও নাই। হায়, হায়, এমন কপালও মানুষের হয়।"

কাত্যায়নী কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার ছেলেটি মায়ের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "মা, উঠ, মা, খাও।"

সন্ধ্যা উঠিল; কিন্তু কেহই তাহাকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না। নিদাঘের জলভরা মেঘখণ্ডের ন্যায় সন্ধ্যা উঠিয়া গিয়া একটি জনশূন্য গৃহে কবাট বন্ধ করিয়া দিল। তার পর ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত করিতে করিতে কহিল, "স্বামিন্, প্রভু, দেবতা, আজ তিন দিন দাসীকে ছাড়িয়া গিয়াছ। গিয়াছ, যাও—দাসীও তোমার পিছনে যাইতেছে। কিন্তু যে লোকে তুমি গিয়াছ, সে লোকে আমি যাইতে পারিব কি?—সে লোকে যাইবার আমি কি উপযুক্ত? না, এখন আমি দেহত্যাগ করিব না। আগে সাধনাবলে তোমার দর্শন পাইবার যোগ্য হই, তার পর এ মাটীর ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমার অনুসরণ করিব।"

সন্ধ্যা উঠিয়া বসিল। চোখের জল না মুছিয়া যুক্তকরে বলিতে লাগিল, "তুমি আমার ইষ্টদেব, তুমি আমার ধর্ম্ম। আজ হ'তে যত দিন এ দেহ থাকিবে, তত দিন এই যোগ—এই ধর্ম্ম সাধন করিব। অন্তরীক্ষে কোথায় আছ প্রভু, আশীর্ব্বাদ কর, দাসীর সাধনা যেন সিদ্ধ হয়।"

সন্ধ্যা এবার চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

৪

দিন যেমন যায়, তেমনই যাইতে লাগিল। তপনদেব আগে যেমন কিরণ ছড়াইয়া পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতেন, এখনও তেমনই করিয়া থাকেন। নিশীথে সুনীল আকাশে শশধর তেমনই হাসিয়া চারিদিকে মাধুর্য্য বিকিরণ করে। বাতাস তেমনই হেলিতে দুলিতে বহিয়া যায়। মানুষ তেমনই হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। এক-জনের সর্ব্বনাশে সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

অখিলচন্দ্র নাই, তবু এক বৎসর কাটিয়া গেল, সময় দাঁড়াইল না—সৃষ্টির কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। সব তেমনই চলিতে লাগিল, শুধু অভাগিনী সন্ধ্যামণি সধবার বেশ ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণীর বেশ পরিগ্রহ করিল। সন্ধ্যামণিতে আর যৌবনের চাঞ্চল্য নাই, চাঞ্চল্য কাটিয়া গিয়া এক্ষণে প্রৌঢ়ার গাম্ভীর্য্য আসিয়াছে,—যেন বৈশাখের জলঝড়ের পর দিগ্-দিগন্তে গম্ভীর প্রসন্নতা আসিয়াছে। সন্ধ্যামণি সেই প্রসন্নতাটুকু বুকে ধরিয়া যোগিনী-বেশে সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে বুঝি তাহার এত রূপ ছিল না। নিরাভরণা, শ্বেতবসনা, স্বামিধ্যাননিরতা সন্ধ্যার রূপ দিন দিন উছলিয়া উঠিতেছিল। কে বলে অলঙ্কারে রূপ বাড়ে?

সন্ধ্যা শাশুড়ীর আদেশে সংসারের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত বটে, কিন্তু নিজের কাজ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইত না। অরুণোদয়ের পূর্ব্বে উদ্যানে উদ্যানে ঘুরিয়া পুষ্পচয়ন করিত। তার পর চন্দন ঘষিয়া লইয়া স্বামীর অর্চ্চনায় বসিত। যে দিন ফুল বেশী পাইত, সে দিন একছড়া মালা গাঁথিয়া উদ্দেশে স্বামীকে পরাইয়া দিত। এক একটি করিয়া ফুল লইয়া সকলগুলিই স্বামীর চরণোদ্দেশে অর্পণ করিত। ভগবানকে একটিও দিত না,—সব কুড়াইয়া লইয়া স্বামীর উদ্দেশে অঞ্জলি দিত।

কখন কখন বা দিবা দ্বিপ্রহরে ছেলেদের আহারাদি করাইয়া সন্ধ্যা দ্বিতীয়বার পূজায় বসিত। কখন কখন বা তাহার পূজা করা হইত না,—কাঁদিয়াই ভাসাইয়া দিত। সে সময় তাহার মুদ্রিত নয়নদ্বয় হইতে জলধারা গড়াইয়া যখন অঞ্জলিবদ্ধ পুষ্পনিচয় সিক্ত করিত, তখন যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইত, তাহা বুঝি আকাশের গায়, প্রকৃতির বুকেই শুধু চিত্রিত দেখা যায়। আবার সন্ধ্যা যখন সেই অশ্রুসিক্ত চন্দন-চর্চ্চিত পুষ্পাঞ্জলি, মানসমন্দিরস্থাপিত পতি-দেবতার চরণোদ্দেশে স্ফীতবক্ষে ভক্তিপ্লুত-হৃদয়ে অর্পণ করিত, তখন মনে হইত, এ চিত্র বুঝি হিন্দুরমণীর হৃদয় ব্যতীত ত্রিভুবনে আর কোথাও চিত্রিত হইতে পারে না।

৫

"আমাকে কেন ডেকেছ মা?"

"গুরুদেব, বড় বিপদে পড়েছি।"

"কি বিপদ?"

"ছেলে হারিয়ে এখন ছেলের বউকে নিয়ে বিপদে পড়েছি।"

"বউকে নিয়ে বিপদ! সে কি মা?"

কাত্যায়নী চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিয়া উত্তর করিলেন, "বউ খায় না দায় না—সংসারে দেখে না,

ছেলেপিলের পানে ফিরে চায় না, কি এক রকম পাগলের মত হয়ে গেছে।"

গুরুদেব প্রকাণ্ড এক টিপ নস্য সশব্দে গ্রহণ করিয়া অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে উত্তর করিলেন, "বধূঠাকুরাণী শোকে অভিভূতা হইয়াছেন; ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।"

কাত্যা। কি ব্যবস্থা করিতেছেন?

গুরু। মন্ত্র দিব।

কাত্যা। বেশ কথা; কবে দিবেন?

গুরু। আগামী কল্য শুভদিন আছে। উদ্যোগ আয়োজন কর গে।

গৃহিণী প্রফুল্লচিত্তে উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃতা হইলেন; কিন্তু সন্ধ্যাকে কিছু বলিলেন না।—সন্ধ্যাও কিছু জানিল না।

৬

পরদিন প্রভাতে সন্ধ্যা স্নান সমাপন করিয়া পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইল। আজ ফুল অনেক; সন্ধ্যা সাজি পূর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিল। পূজার ঘরে নিভৃতে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সন্ধ্যা মালা গাঁথিতে লাগিল। মালা গাঁথিতে গাঁথিতে কণ্টক ও সূচিকায় তাহার হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইল, সে দিকে সন্ধ্যার দৃক্‌পাত নাই। সে একবার ফিরিয়াও দেখিল না, শুভ্রকায় মল্লিকার অঙ্গ রুধিররাগে কেমন রঞ্জিত হইয়াছে—রুধিরবরণ গোলাপ রক্তলিপ্ত হইয়া কেমন লালবসনা উষার ন্যায় দেখাইতেছে। সন্ধ্যা কোন দিকে মন দিল না,—স্বামীর চরণ ধ্যান করিতে করিতে মালা গাঁথা শেষ করিল।

তার পর চন্দন ঘষা। চন্দন ঘষিতে ঘষিতে সন্ধ্যা সহসা যেন দেখিল, চন্দন-পিঁড়িতে তাহার স্বামীর চরণ—চন্দন-কাষ্ঠে স্বামীর চরণ—ঘর্ষিত চন্দনে স্বামীর চরণ। তাহার সমস্ত দেহ পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল: সে চন্দনঘষা ছাড়িয়া আকুলনয়নে চন্দন-পিঁড়ি পানে চাহিয়া রহিল। চন্দন পড়িয়া রহিল—সযত্নগ্রথিত পুষ্পমাল্য, আয়াস-সঞ্চিত ফুলরাশি উপেক্ষিত হইল; সন্ধ্যা নিবিষ্টচিত্তে অনন্যকর্ম্মা হইয়া চন্দনপিঁড়ি পানে চাহিয়া রহিল।

ক্রমে চন্দনপিঁড়ি অন্তর্হিত হইল—শুধু চরণ রহিল। অবশেষে চরণও অদৃশ্য হইল। কিছুই রহিল না,—আকাশ-পৃথিবী, আলো-অন্ধকার, ফুল-চন্দন, স্বামিচরণ কিছুই রহিল না—সব কোথায় অদৃশ্য হইল।

সন্ধ্যা ভূম্যাসনে উপবিষ্টা, স্পন্দনরহিতা, জ্ঞানশূন্যা, তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে—আলুলায়িত সিক্ত কেশরাশি ভূপৃষ্ঠে লুটাইতেছে। তাহার দেহ স্থির, নেত্রদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত, শ্বাস রুদ্ধ, অধরোষ্ঠ বিযুক্ত। সন্ধ্যা যেন তাহার দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে সেই কক্ষে কাত্যায়নী ও তাঁহার গুরুদেব আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সম্মুখেই দেখিলেন, সন্ধ্যার জ্ঞানশূন্য সমাধিস্থ দেহ। ফুল, চন্দন, মালা পড়িয়া রহিয়াছে—পূজার উপকরণ চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; মধ্যে স্থির নিষ্কম্প জ্ঞানবিরহিতা সন্ধ্যা। নয়নে পলক নাই, নাসিকায় নিশ্বাস নাই, দেহে স্পন্দন নাই। গুরুঠাকুর নীরবে নির্নিমেষলোচনে সন্ধ্যার পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু গৃহিণী ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না,—তিনি বধূর অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বধূকে জড়াইয়া ধরিবার উপক্রম করিলেন। গুরুদেব ইঙ্গিতে গৃহিণীকে সংযত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বধূ ধ্যাননিমগ্না—বিরক্ত করিও না।"

কথাটায় গৃহিণীর বিশ্বাস হইল না। কেন না, হরিনামের মালা হাতে করিয়া তিনিও অনেক জপধ্যান করিয়াছেন; কিন্তু এমন ধারা মরা মানুষের মত ভাব কখনও তাঁহার হয় নাই, বরং ধ্যানাবস্থায় তাঁহার বুদ্ধিশক্তি ও কার্য্যতৎপরতা এতই প্রবল হয় যে, তিনি মনে মনে সাংসারিক আয়ব্যয়ের হিসাব, বিড়াল কুক্কুরাদির শাসন পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হন। মরিয়া যাওয়া দূরে থাক্, তখন তিনি আরও সঞ্জীবতা লাভ করেন। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া গৃহিণী গুরুদেবের কথায় সন্দিহান হইলেন; কিন্তু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। কিছু না বলিয়া বধূমাতার পার্শ্বে বধূমাতার মুখপানে উৎসুক নয়নে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

গুরুদেব ধীরে ধীরে উঠিলেন—নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহবাহিরে আসিলেন, এবং ইঙ্গিতে শিষ্যাকে ডাকিলেন। শিষ্যা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন গুরুদেব মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার পুত্রবধূর দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন।"

গৃহিণী সবিস্ময়ে বলিলেন,—"সে কি ঠাকুর!"

গুরু। তিনি পূর্ব্বাহ্ণে দীক্ষিতা হইয়াছেন।

গৃহিণী আঁচলটা উঠাইয়া লইয়া, একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"না ঠাকুর, বউমার মন্ত্র লওয়া হয় নি—আপনি জানেন না।"

গুরু। বিশ্বাস কর, আমি বল্‌ছি, তোমার বউমার মন্ত্র লওয়া হইয়াছে।

কাত্যা। কে মন্ত্র দিল ঠাকুর? তুমি না আমি?

গুরু। কাহাকেও দিতে হয় নাই—তিনি আপনিই কুড়াইয়া পাইয়াছেন।

কথাটায় কাত্যায়নীর বিশ্বাস হইল না, গুরুদেব তাহা বুঝিলেন। তিনি বলিলেন,—"শুন মা, গুরুর কথায় অবিশ্বাস করিও না। আমি এ সত্তর বৎসর বয়সেও যাহা করিতে পারি নাই, এই ক্ষুদ্র বালিকা স্বল্পকালমধ্যে তাহা করিয়াছে; এ তেজোদ্দীপ্তা বালিকার দীক্ষার প্রয়োজন নাই।"

কাত্যা। তবে শুন ঠাকুর, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বউমার পূজা-অর্চ্চনা সকলি দেখে আসছি; আমি কখন তাঁকে ঠাকুর-দেবতাকে ডাক্‌তে শুনি নি—কখন তুলসী-গাছকে বা কালী জগন্নাথের পটকে প্রণাম কর্‌তে দেখি নি। যে এমন মূর্খ, ধর্ম্মহীন, আমি কেমন ক'রে বল্‌ব ঠাকুর, তাঁ'র দীক্ষা হয়েছে?

গুরু। তবে বল দেখি, তোমার বউমা চুপ ক'রে ব'সে থেকে কি করে?

কাত্যা। কি করে, তা' আমি কেমন ক'রে জান্‌ব? তবে বিড়্ বিড়্ ক'রে বকে—মাঝে মাঝে 'স্বামী' 'স্বামী' ক'রে ডেকে উঠে; ভুলেও একবার 'হরি' 'হরি' করে না। এক গাছা তুলসীর মালা গোপীনাথের পায়ে ঠেকিয়ে এনে দিলাম, তা' বউ যদি ভুলেও একবার মালা হাতে ক'রে বসে।

গুরু। তোমার বউ জপতপের অতীত; ন্যাস, প্রণাম, প্রণব, কর্ম্ম তোমার আমার জন্য—সম্মুখে যাঁকে সমাধিস্থ দেখছ, তার জন্য নয়। বুঝেছ?

কাত্যা। কই আর বুঝলুম? যে মেয়ে ঠাকুর-দেবতার নাম ছেড়ে আজীবন 'স্বামী' 'স্বামী' ক'রে কাটালে, তা'র ধর্ম্ম আমার ধর্ম্মের চেয়ে বড় হ'ল? তুমি কি বল্‌ছ ঠাকুর?

গুরু। তুমি বিস্মৃত হইতেছ মা, স্বামিপূজাই নারীজন্মে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কুন্তলা *

১

শান্তিপুরের রাস্তা বহিয়া শত শত নরনারী গঙ্গা-স্নানে চলিয়াছে। আজ মহাবিষুব সংক্রান্তি। মহা-পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানে মহাপুণ্য। ঘাট আলো করিয়া কত হিন্দুরমণী পুণ্যলাভার্থ গঙ্গায় ডুব দিতেছে। কেহ সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতেছে, কেহ বা "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে" বলিয়া গঙ্গার স্তব করিতেছে। যে স্তবস্তোত্র জানে না, সে শুধু "মা গঙ্গা" "মা গঙ্গা" বলিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে। এমন সময় রমণীমহলে একটা মহা গোল পড়িয়া গেল।

ঘাটের একধারে একটি যুবতী স্নান করিতেছিল। সে বেশ্যা—নাম কুন্তলা। অনেকেই তাহাকে চিনিত, চিনিবার একটু কারণও ছিল। যে পাড়ায় কুন্তলা বাস করে, সেই পাড়ার অধিকাংশ স্ত্রীলোক এই ঘাটে স্নান করিতে আসিয়াছে। এক্ষণে এই মহাপুণ্যদিনে গৃহস্থরমণীর সান্নিধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাকে স্নান করিতে দেখিয়া সতীত্বতেজোদৃপ্ত সাবিত্রী-প্রতিম ললনাকুল ক্রোধে ও ঘৃণায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। যিনি স্তব আবৃত্তি করিতেছিলেন, তিনি স্তব বন্ধ রাখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আ মোলো, মাগী আবার এ ঘাটে মর্‌তে এসেছে!" যিনি সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতে-ছিলেন, তিনি প্রণামটা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া সূর্য্যবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, "স'রে যা মাগী, দেখছিস্ না আমরা চান্ করছি।"

কুন্তলা বেশ্যা—অনপনেয় পাপে কলঙ্কিতা। তবে সে গঙ্গাস্নানে আসে কেন? জাহ্নবী-সলিলে কি বেশ্যার পাপ বিধৌত হয়? বুঝি হয়; দুই নয়নের গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-প্রবাহ জাহ্নবী-স্রোতে মিশাইতে পারিলে বুঝি বেশ্যার পাপও ধুইয়া যায়।

যাক্ বা না যাক্, কুন্তলা প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে আসে। আজও আসিয়াছিল; কিন্তু এরূপ তীব্র তিরস্কার তাহাকে ইতিপূর্ব্বে সহ্য করিতে হয় নাই। তবু সে বিচলিত হইল না। ধীরে ধীরে স্নান সমাপন করিল; এবং পিত্তলময় কলসী জলপূর্ণ করিয়া ঘাটের

---

* গল্পের মূলাংশ সত্য। যাঁহাকে সেবাইত বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তিনি লেখিকার পিতা—স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়।

উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একধারে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া গঙ্গাপানে চাহিয়া প্রণাম করিল। তার পর কাল মেঘের মত নিবিড় কেশরাশি পৃষ্ঠের উপর এলাইয়া দিয়া সিক্ত বস্ত্রে অনাবৃত মস্তকে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল।

২

গঙ্গার ঘাট হইতে তাহার গৃহ অনেকটা পথ—এক ক্রোশের উপর। পথে আসিতে আসিতে সে ভাবিল, "সকলে ঠাকুরকে জল দিয়া আসে; আমি কেন দিয়া আসি না? আমার জল কি ঠাকুর গ্রহণ করিবেন না? না করেন, আমি তাঁহার দালান ধুইয়া দিয়া আসিব। তা'তেই বা আমার অধিকার কি? আমার ছোঁয়া জল হাড়ি-ডোমেরও গায়ে লাগিলে তাহারা অপবিত্র হয়, তবে দালান বা রোয়াক ধোবার আমার অধিকার কি? দেখি, গোপীনাথ ধুইতে দেন কি না।" কথাটা ভাবিতে ভাবিতে কুন্তলা পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল।

শান্তিপুরের এক প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র পল্লী আছে,—নাম নূতনপাড়া। এই পল্লীর প্রান্তভাগে কুন্তলার পর্ণকুটীর। কুটীর-সন্নিকটে প্রসিদ্ধ গোপীনাথের মন্দির।

কুন্তলা গৃহে না গিয়া জলপূর্ণ কলসী-কক্ষে গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবালয়ে প্রবেশ করিতে অথবা সিঁড়িতে উঠিতে সাহস পাইল না;—প্রাঙ্গণের একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য—কলসীর জল লইয়া মন্দিরের দালান ও রোয়াক ধুইয়া দেয়; কিন্তু সাহস হইল না। সে যে বেশ্যা—তাহার স্পৃষ্ট জল যে অপবিত্র। কুন্তলা কাহাকেও কিছু না বলিয়া নীরবে একধারে দাঁড়াইয়া রহিল।

একজন ইতরজাতীয় স্ত্রীলোক সম্মার্জ্জনী হস্তে মন্দির-প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছিল। সে কুন্তলাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ্ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? স'রে যা—ঝাঁট দিই।" কুন্তলা সরিয়া আর একধারে দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকটা বলিল, "তুই চাস্ কি?"

কুন্তলা উত্তর করিল, "আমার এই জল-কলসীটা—আর বলিতে পারিল না—বলিতে সাহসও করিল না।

"তোর জল-কলসীটা নিয়ে হবে কি?—ঠাকুরকে চান্ করাতে চাস্?"

"না।"

"তবে?"

"দালান রোয়াক ধুইতে চাই।"

"আ মোলো, মাগীর আস্পর্দ্ধা দেখ। আমাদের ছোঁয়া জলই মন্দিরে উঠ্‌তে পায় না, উনি আবার জল নিয়ে দালান ধুতে এসেছেন। বেরো মাগী, এখান থেকে।"

পুরোহিত মহাশয় তখন দালানে বসিয়া নিমীলিত-নয়নে ধূমপান করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনের কতকাংশ তাঁহার কাণে গেল। তিনি চক্ষু খুলিয়া উঠানের দিকে দেখিলেন; এবং অশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে রে?"

সম্মার্জ্জনী ধারিণী উত্তর করিল, "হবে আবার কি? বেশ্যা মাগী জল এনেছে—বলে কি না ঠাকুরের দালান ধোব।"

ঠাকুরের প্রতিনিধি—পুরোহিত মহাশয়—কুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার স্পৃষ্ট জলে কোন কার্য্য হইতে পারে না; এমন কি, উঠান ধোয়াও চলিতে পারে না—কি জানি শুষ্ক হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ তাহা স্পর্শ করে।"

কুন্তলা নতমুখে পুরোহিতের আদেশ শুনিল। তার পর ধীরে ধীরে বিষণ্ণ অন্তরে প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া মন্দিরের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া একবার একটু ভাবিল; তার পর চারিদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিল।—কেহ কোথাও নাই। তখন সে জানু পাতিয়া ভূপৃষ্ঠে উপবেশন করিল; এবং কলসীর সমুদয় জল ঠাকুরের উদ্দেশে সম্মুখস্থ ভূখণ্ডের উপর ধীরে ধীরে ঢালিল। তার পর সেই বারিসিক্ত ধূলি লইয়া ললাটে ও জিহ্বায় দিল; এবং উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শূন্য কলসীকক্ষে গৃহে ফিরিল।

৩

বৎসর ঘুরিয়া আবার মহাবিষুব সংক্রান্তি আসিয়াছে। কুন্তলা এই বৎসরেক কাল প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইত; এবং জাহ্নবী-সলিলে কলসী পূর্ণ করিয়া গোপীনাথের মন্দির-পশ্চাতে বসিয়া কলসীর জল ঠাকুরের উদ্দেশে মৃত্তিকায় ঢালিত।

আজ আবার বৎসর ঘুরিয়া সেই মহাপুণ্যদিন আসিয়াছে। কুন্তলা প্রভাত হইতে না হইতে গঙ্গাস্নানে চলিল; এবং পবিত্র জলে কলসী পূর্ণ করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। কুন্তলা গৃহে গেল না, মন্দির-পশ্চাতে আসিয়া জলও ঢালিল না,—ব্যাকুল-হৃদয়ে

মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। বাসনা—একবার ঠাকুর-দর্শন। দালান বা রোয়াক ধুইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সে আর রাখে না,—শুধু একবার দূর হইতে দেবতার দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিতে চায়। বৎসরেক পূর্ব্বে এম্‌নি দিনে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সে একবার দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিল; সেই একবার দেখিয়াই নবজলধর-শ্যামের বংশীবাদক মোহনমূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া লইয়াছিল। তদবধি এই বৎসরেক কাল সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, মন্দির-পশ্চাতে আম্রবৃক্ষতলে জানু পাতিয়া জল ঢালিয়া আসিতেছে। আজ আবার ধ্যানে আঁকা সেই শ্যামমূর্ত্তি নূতন করিয়া দেখিবার বাসনা হৃদয়ে ধরিয়া আসিয়াছে। দেখা কি মিলিবে না?

তখনও মন্দির-দ্বার খোলা হয় নাই। পুরোহিত মহাশয় স্নানে গিয়াছেন। কুন্তলা কলসী-কক্ষে একধারে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। কলসী মাটীতে নামাইতে পারে না—শূন্যও করিতে পারে না। সে স্থির করিয়াছিল, "আজ ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে দূরে দাঁড়াইয়া এই কলসীর জল ঠাকুরের চরণোদ্দেশে ঢালিব।" কিন্তু ঠাকুরের যে দর্শন মিলে না। কুন্তলার কক্ষ অবশ হইয়া আসিল। সে সকাতরে ঠাকুরের চরণে নিবেদন করিল, "আর যে পারি না, ঠাকুর! একবার মুহূর্ত্তের জন্য দর্শন দেও।"

এমন সময় গোপীনাথের সেবাইত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভদ্রাসন-বাটী মন্দিরের সন্নিকট—প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে; কিন্তু তিনি সকল সময় শান্তিপুরে থাকিতেন না—মধ্যে মধ্যে আসিয়া ঠাকুরের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। সম্প্রতি তিনি সপরিবারে গৃহে আসিয়াছিলেন।

সেবাইত আসিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণের একধারে একটি স্ত্রীলোক কলসীকক্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি—সেবাইত কুন্তলাকে চিনিতেন না। কিন্তু কুন্তলা তাঁহাকে চিনিত এবং ভক্তিও করিত। তিনি পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ—প্রাচীন ও প্রবীণ—সরল ও উদার। যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই তাঁহাকে ভালবাসিত।

কুন্তলা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সংস্পর্শে আসে নাই, দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়াছিল মাত্র। এক্ষণে তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিপ্লুত-চিত্তে নীরব রহিল। প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া সেবাইত মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও বাছা?"

কুন্তলা তথাপি নীরব। সেবাইত জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরকে জল দিতে এসেছ?"

"না।"

"তবে কি?"

"ঠাকুরকে একবার—"

"দেখিতে চাও?"

"হাঁ।"

"আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।" বলিয়া তিনি দ্রুতপদে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেন এবং দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "উপরে উঠিয়া এস।"

কুন্তলা ঠাকুরকে দেখিতে দেখিতে ব্যগ্রভাবে সিঁড়ি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল। উপরে উঠিল না—নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেবাইত পুনরায় ডাকিলেন,—"উপরে এস।"

কুন্তলার আকুল বাসনা, উপরে উঠিয়া, ঠাকুরের নিকটে দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে দর্শন করে; কিন্তু সে প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া কুন্তলা অবনত-মস্তকে ধীরভাবে উত্তর করিল, "উপরে উঠিবার আমার অধিকার নাই।"

সেবা। কেন অধিকার নাই, বাছা? যাহার ঠাকুরদর্শনেচ্ছা এত বলবতী, তাহার সকল অধিকার আছে।

কুন্তলা। আমি—আমি—

সেবা। তুমি কি?

কুন্তলা। আমি বেশ্যা।

সেবা। তুমি বেশ্যা নও, তুমি ঠাকুরের ভক্ত।—স্বচ্ছন্দে উপরে উঠিয়া এস।

কুন্তলা ঠাকুরের ভক্ত! সে ত এ কথা জানিত না। তাহার দেহমধ্যে তাড়িত ছুটিল। সে আর দ্বিধা করিল না, সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া রোয়াকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

৪

এমন সময় পুরোহিতের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। কুন্তলাকে রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, তাঁহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্তোত্র বন্ধ করিয়া কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, "আ গেল রে, মাগী রোয়াকের উপর উঠেছে। আস্পর্দ্ধা দেখ—নেমে যা বলছি।"

কুন্তলার আনন্দ, সাহস মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইল; সঙ্কোচ, দ্বিধা আসিয়া তাহার হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিল। সে প্রস্থানোদ্যতা হইল। সেবাইত মন্দিরগৃহ হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকটিকে তিরস্কার করিতেছেন কেন ?"

পুরো। দেখুন না, মাগী রোয়াকের উপর উঠেছে।

সেবা। তাহাতে অপরাধ কি হয়েছে ?

পুরো। মাগী যে বেশ্যা।

সেবা। বেশ্যার পক্ষে কি ঠাকুরদর্শন নিষিদ্ধ ?

পুরো। দর্শন নিষিদ্ধ নয়—কিন্তু স্পর্শন নিষিদ্ধ।

সেবা। কে আপনাকে এ কথা বলিল ? পীঠস্থানে লোকে কি করে ?

পুরো। পীঠস্থানের পক্ষে কোন নিয়ম নাই।

সেবা। কোন মন্দিরেও সে নিয়ম নাই। আমার বিশ্বাস—ম্লেচ্ছ-স্পর্শেও দেবতা অপবিত্র হন না।

পুরো। তবে অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কেন ?

সেবা। সেটা আপনার জন্য—ঠাকুরের জন্য নয়। লোকে ঠাকুরকে শুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়া নিজের মন শুদ্ধ করে। যিনি দেবতা—পরমাত্মা, তিনি কিছুতেই অপবিত্র হ'ন না। সে যাই হউক, স্ত্রীলোকটি ঠাকুরকে স্পর্শ করে নাই; রোয়াকের উপর উঠিয়াছে মাত্র, তাহাতেই কি মন্দির অপবিত্র হ'ল ?

পুরো। তা' হ'ল বই কি ?

সেবা। আপনি কি এই জাগ্রৎ দেবতা গোপীনাথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে পারেন, 'আপনি বা আমি এই মন্দিরে দাঁড়াইয়া মন্দির অপবিত্র করিতেছি না ?—আপনি বা আমি কি এই বেশ্যার ন্যায় পাপাক্রান্ত নই ? যৌবনের কথা স্মরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে সত্য বলুন দেখি।

পুরোহিত মহাশয় এবার নিরুত্তর রহিলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কুন্তলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই মাগী কি দালান ধুতে আবার এসেছিস্ ? যেখানে রোজ জল ঢালিস্, সেইখানে জল ঢাল্ গে যা।"

সেবাইত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় রোজ জল ঢালে ?"

পুরো। মন্দিরের পিছনে।

সেবা। চলুন—দেখি গে।

উভয়ে নামিয়া মন্দির-পশ্চাতে আসিলেন। তথায় একটি স্বল্পায়তন গর্ত্ত দৃষ্ট হইল। গর্ত্তের তলদেশে কিছু জল জমিয়া রহিয়াছে। এই গর্ত্ত দেখাইয়া দিয়া পুরোহিত বলিলেন, "বেশ্যা মাগী প্রত্যহ এইখানে জল ঢালে।"

সেবা। জল কোথা হ'তে আনে ?

পুরো। কে জানে কোথা হ'তে আনে। লোকে বলে, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ক'রে এসে, এইখানে মাগী জল ঢালে।

সেবা। গঙ্গাজল ঠাকুর-পূজার জন্য দেয় না কেন ?

পুরো। বেশ্যা-স্পৃষ্ট জলে ঠাকুর-পূজা হবে ? এক বৎসর আগে এমনি দিনে সে দালান ধুতে এসেছিল, তাই ধুতে দিই নি—তা'র জলে আবার পূজা করব ?

সেবা। আপনি না করেন, আমি করব।

বলিয়া তিনি মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় কুন্তলা রোয়াকের উপর অধোমুখে কলসীকক্ষে তেমনি ভাবে দাড়াইয়াছিল। সেবাইত তাহাকে বলিলেন, "তুমি জল লইয়া ঠাকুর-ঘরে এস।"

কথাটায় কুন্তলার বিশ্বাস হইল না। সে পিছন ফিরিয়া দেখিল—অপর কাহারও উদ্দেশে কথাটা বলা হইয়াছে কি না। দেখিল, পিছনে কেহ নাই। তখন সে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে সেবাইতের পানে চাহিল। সেবাইত পুনরায় বলিলেন, "ঠাকুর-ঘরে জল লইয়া এস।"

কুন্তলা তখন দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। এই দালান তাহার তীর্থক্ষেত্র। এখানে সে পূর্ব্বে কখন আসিতে পায় নাই। যাহারা এই দালানে দাঁড়াইয়া ঠাকুরদর্শন করিত, তাহাদের সৌভাগ্য কামনা করিয়া কুন্তলা কত দিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। আজ কুন্তলা সেই দালানে।

কুন্তলা ঠাকুর-ঘরে গেল না। দালানের একাংশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া জলের ঘড়া রাখিল। সেবাইত মহাশয় তাহা উঠাইয়া লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; এবং ক্ষণকাল-মধ্যে শূন্য কলসীহস্তে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কুন্তলা ধূলার উপর লুটাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছে। যখন সে উঠিয়া বসিল, তখন তাহার গণ্ড ও বক্ষ বহিয়া অশ্রুধারা ছুটিতেছিল। সেবাইত তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে ভক্তি লইয়া ঠাকুরদর্শন করিতে আসিয়াছ, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সে ভক্তি অক্ষয় হউক। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ঠাকুরের উদ্দেশে যেখানেই কেন জলধারা ঢাল না, ঠাকুর তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন। ঠাকুরের পিছন নাই—সম্মুখ নাই—তিনি ব্রাহ্মণ-শূদ্র, গঙ্গোদক-পঙ্কিলবারি ভেদাভেদ করেন না। তিনি শুধু হৃদয় চান। তুমি তাঁহাকে হৃদয় দান কর—পাপের জন্য কাঁদ, তোমার সকল পাপ ধু'য়ে যাবে।"

সেবাইতের চরণে প্রণাম করিয়া কুন্তলা গৃহে ফিরিয়া আসিল।

৫

গৃহের প্রাঙ্গণে আম্রবৃক্ষতলায় বসিয়া এক জন যুবা পুরুষ হুঁকাহস্তে তামাকু সেবন করিতেছিল। সে কুন্তলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত দেরী কেন গো?"

কুন্তলা সে কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; এবং দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার শেষ নাই—বিরাম নাই,—মুখে কাপড় গুঁজিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনোমধ্যে কেবল জাগিতেছিল, "পাপের জন্য কাঁদ, তোমার সকল পাপ ধুয়ে যাবে।" কুন্তলা কাদিতে কাঁদিতে ভগবানের উদ্দেশে মনে মনে বলিল, "ঠাকুর, আজীবন নিরন্তর কাঁদিব—কাদিয়া বুকের রক্ত চক্ষু দিয়া বাহির করিব, আমার পাপ ধুয়ে দেও, দয়াময়!"

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। কুন্তলা চমকিত হইয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাড়াইল; এবং আত্মসংযম করিয়া চোখের জল মুছিল। কুন্তলা দ্বার খুলিল না,—স্থির হইয়া শয্যার উপর বসিয়া আপন অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। দ্বারে উপর্য্যুপরি করাঘাত হইতে লাগিল, কুন্তলা সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না। অবশেষে মনোমধ্যে একটা সঙ্কল্প আঁটিয়া কুন্তলা দ্বার খুলিল!

দ্বারদেশে সেই যুবাপুরুষ হুঁকা হস্তে দণ্ডায়মান। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার বুঝি কাদ্‌ছিলে কুন্তলা?

কুন্তলা কোন উত্তর করিল না। যুবক বলিল, "কেন নিরন্তর কেদে কেদে দেহপাত করছ, কুন্তলা?"

কুন্তলা। দেহ রাখিয়া সুখ কি?

যুবক। সুখ? যত দিন পৃথিবীতে থাকা যায়, তত দিনই সুখ।

কুন্তলা। তত দিনই দুঃখ—নিরন্তর স্মৃতির যন্ত্রণা।

যুবক। তুমি আমার সহিত গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছ বলিয়া কি তোমার যত দুঃখ? তাই কি তুমি প্রতিনিয়ত কাদ? আগে ত এমন করিতে না—বৎসরাবধি তোমার পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। সত্য করিয়া বল কুন্তলা, কি করিলে আবার তেমনটি হয়?

কুন্তলা। তেমনটি আর কিছুতেই হয় না, সরোজকুমার। যাহা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহা কেহ আমাকে আর ফিরাইয়া দিতে পারে না

যুবক। পারুক বা না পারুক, বল দেখি, তুমি কাঁদ কেন?

কুন্তলা। কাঁদি কেন? বুক চিরিয়া না দেখাইলে ভাষায় তাহা বুঝাইতে পারি না।

যুবক। কুন্তলা, আমিই তোমার যত দুঃখের মূল। তুমি সুখে পিতা মাতা, রাজৈশ্বর্য্য লইয়া সংসার করিতেছিলে। আমি কুক্ষণে তোমার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভালবাসিলাম। শুধু ভালবাসিয়া যদি নিবৃত্ত থাকিতাম, তাহা হইলেও তোমার হৃদয়ে আজ এ অনল জ্বলিত না—তোমাকে আমার ভালবাসা জানাইলাম—তুমিও আমার মাথা খাইয়া আমাকে ভালবাসিলে। কুন্তলা, বল—কি করিলে তুমি আবার সুখী হও?

কুন্তলা। তুমি তাহা করিবে?

যুবক। করিব—প্রাণ দিলেও যদি তুমি মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হও, তাহাও আমি করিব।

কুন্তলা। তবে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাও।

যুবক। গৃহে আমার কে আছে, কুন্তলা?

কুন্তলা। গৃহে তোমার স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন সকলি আছে।

যুবক। কিন্তু কুন্তলা নাই।

কুন্তলা। কুন্তলা পাপ—স্ত্রী পুণ্য। এত দিন পাপের সেবা করিলে, এক্ষণে পুণ্যের সেবা কর গে।

যুবক। কুন্তলার তুলনায় স্ত্রী!

কুন্তলা। স্ত্রীর চরণতলে শত শত কুন্তলা গড়াগড়ি যাইতেছে; একবার ফিরিয়া গিয়া দেখ দেখি।

যুবক। কুন্তলা, তুমি এত নিষ্ঠুর হইতে পারিবে, আমি জানিতাম না।

কুন্তলা। কুন্তলা আর নাই—কুন্তলা মরিয়া গিয়াছে।

যুবক। তুমি যে পথে যাইতে চাও, আমাকেও সেই পথে সঙ্গী করিয়া লও;—তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না।

কুন্তলা। যে সুখের আশায় আমার সংসর্গ কামনা করিতেছ, সে সুখ আর পাইবে না। তোমার সুখ স্ত্রীসংসর্গে—আমার সুখ স্বর্গগত স্বামীর চরণতলে। পথ বিভিন্ন—আমাকে ত্যাগ করিয়া গৃহে যাও, নতুবা—

যুবক। নতুবা কি করিবে, কুন্তলা?

কুন্তলা। নতুবা আমি গৃহত্যাগ করিব।

যুবক। এত ভালবাসার এই প্রতিদান?

কুন্তলা। আমার কাছে তোমার ভালবাসার আর মূল্য নাই।

যুবক। কুন্তলা, কুন্তলা, এত দিনের পর আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিল।

কুন্তলা আর সেখানে দাঁড়াইল না—স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

৬

তার পর এক বৎসর অতীত হইয়াছে। কুন্তলা এখন একা। আপন মনে গৃহকর্ম্ম করে—আর ভাবে! গৃহকর্ম্মের শেষ আছে—কিন্তু ভাবনার শেষ নাই। অকূল ভাবনারাশি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিয়া বারিভরা গম্ভীর মেঘখণ্ডের স্থায় কুন্তলা ঘুরিয়া বেড়ায়।

কুন্তলা পূজা করে না—জপতপ কিছুই করে না। সে শুধু এক কলসী গঙ্গাজল গোপীনাথের মন্দিরে দিয়া আসে। এইখানেই তা'র সকল কার্য্যের অবসান।

নিশীথে যখন সমস্ত পৃথিবী ঘুমাইত, তখন কুন্তলা নীরবে উঠিয়া গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে যাইত; এবং ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিত। তা' সে প্রত্যহ যাইত,—শীত, বর্ষা কিছুই মানিত না।

কুন্তলা কাহারও গৃহে যাইত না—কেহ তাহার গৃহে আসিত না। কুন্তলা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিত না—কেহ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে উপযাচক হইত না। সে একা কাঁদিত। সপ্তাহে একদিন বাজারে যাইত। চাল ডাল যাহা কিছু কিনিয়া আনিত, তাহাতেই সে কোন প্রকারে দিন কাটাইত। চাল, ডাল, লবণ, তৈল ছাড়া আর কিছু খাইত না—খাইবার প্রবৃত্তিও ছিল না।

কুন্তলার রূপ, যৌবন, দুই-ই ছিল। যেখানেই রূপযৌবন, সেইখানেই বিপদ্। কেহ কেহ তাহার পাছু লাগিয়াছিল। কুন্তলা একদিন স্বহস্তে তাহার নিবিড় কেশরাশি কাটিয়া ফেলিল,—তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা গণ্ড, বক্ষ পুড়াইয়া দিল। তদবধি কোন পুরুষ তাহার পানে ফিরিয়া চাহিত না।

কুন্তলার কিছু অর্থ ও অলঙ্কার ছিল। গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার সময় তাহা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিত। এই অর্থ পাপ-উপার্জ্জিত নয়,—পিতৃভবনত্যাগকালে সঙ্গে আনিয়াছিল। তবু কুন্তলা ঠাকুরের সেবায় তাহা ব্যয় করিতে সাহস পাইত না।

কুন্তলা একদিন দূরে দাঁড়াইয়া গোপীনাথের পূজা দেখিতেছিল। যখন দেখিল, তাহার চয়িত পুষ্প-মধ্যে ঠাকুরের চরণ দুইখানি লুক্কায়িত হইল, তখন সে ভক্তি ও আনন্দে অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ঠাকুরকে প্রণাম করিল না—একবার "গোপীনাথ" বলিয়া ডাকিল না, শুধু কাঁদিতে লাগিল। পূজার এই স্মৃতিটুকু লইয়া আনন্দবিহ্বল-চিত্তে কুন্তলা কত দিন কাটাইল।

কুন্তলা প্রত্যহ ঠাকুরের পূজার্থে গঙ্গাজল দিয়া আসিত—ফুল পাইলে ফুল দিয়া আসিত, কখন কখন বা মালা গাঁথিয়া ঠাকুরকে দিয়া আসিত। পুরোহিত এখন কোন আপত্তি করেন না;—কুন্তলা ঠাকুরের জন্য যাহা দিয়া আসে, তাহা তিনি সাদরে গ্রহণ করেন।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। কুন্তলা একদিন উকীলবাড়ী গিয়া একখানি দানপত্র প্রস্তুত করিল। তাহার যাহা কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ছিল, তাহা এই দানপত্রের দ্বারা গোপীনাথকে অর্পণ করিল। দলিলখানি গোপীনাথের মন্দিরে রাখিয়া দিয়া কুন্তলা গ্রামত্যাগ করিল। কোথায় গেল, কেহ জানিল না।

৭

কুন্তলা গৃহ ছাড়িয়া কপর্দ্দকমাত্র সঙ্গে না লইয়া একবস্ত্রে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিল। পথ জানে না,—পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ চলে। পয়সা নাই,—ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করে। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল,—কুন্তলা অদম্য উৎসাহে পথ হাঁটিয়া চলিতে লাগিল। এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। এখনও বৃন্দাবন অনেক দূর। কুন্তলা আর তেমন পথ হাঁটিতে পারে না, অনশনে, অৰ্দ্ধাশনে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। উৎসাহ ক্রমে নিবিয়া আসিতেছে, শক্তি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। কুন্তলা ভাবিল, "ভগবান্, আমার উপায় কি হবে?"

একদিন সন্ধ্যাকালে কুন্তলা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পথের ধারে বৃক্ষাশ্রয়ে শয়ন করিল। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, কেহ ভিক্ষা দেয় নাই। শ্রান্ত, অনশন-ক্লিষ্ট দেহ আর টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। কুন্তলা কণ্টকাকীর্ণ কঠিন মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল।

শুইয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার কপালে বুঝি বৃন্দাবন-দর্শন নাই। যে সেখানে যাইতে পায়, তার পাপ আর থাকে না। আমি কাঁদিতে পারিলাম না আমার পাপ ধুয়ে গেল না। বৃন্দাবনে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনে চলিয়াছি, তা'ও বুঝি আমার

ভাগ্যে ঘটিল না। ঠাকুর, আমার কি হ'বে? এ পাপ-ভার যে বহিতে পারি না।"

ভাবিতে ভাবিতে কুন্তলা ঘুমাইয়া পড়িল। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নঘোরে মধ্যাকাশে সে এক সুন্দর মূর্ত্তি দেখিল। দেখিল, যেখানে নক্ষত্র ফুটে, চাঁদ জ্বলে, সেইখানে নবজলধরশ্যাম বংশীবাদন পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীকৃষ্ণ বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অধরে হাসি, নয়নে করুণা। শতচন্দ্র চরণনখরে প্রতিভাত হইতেছিল—সহস্র নক্ষত্র পদতলে গড়াগড়ি যাইতেছিল। আকাশ, পৃথিবী সব নিবিয়া গিয়াছে—ব্রহ্মাণ্ডের আলোকরাশি কেন্দ্রীভূত হইয়া মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। কুন্তলা ঘুমঘোরে কণ্টকিতদেহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি কৃষ্ণ?"

উত্তর হইল, "হাঁ।"

"তুমি কি আমায় দর্শন দিতে আসিয়াছ, ঠাকুর?"

"না।"

"আমি যে তোমাকে দেখিতে বৃন্দাবনে চলিয়াছি।"

"আমি বৃন্দাবনে থাকি না।"

"তবে কোথায় থাক?"

"আমি লোকের হৃদয়ে থাকি; যে আমাকে ডাকিতে পারে—দেখিতে জানে, সেই আমার দেখা পায়।"

"আমি যে ডাকিতে জানি না, আমাকে ডাকিতে শিখাইয়া দেও, দয়াময়!"

কোন উত্তর আসিল না। কুন্তলা আবেগভরে পুনরায় বলিল, "তোমাকে ডাকিতে শিখাইয়া দেও, ঠাকুর!"

এবারও কোন উত্তর আসিল না। দেখিতে দেখিতে আকাশের সে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ম্লান হইয়া আকাশ-পটে মিশিয়া যাইতে লাগিল। কুন্তলা আকুল-হৃদয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ব'লে দেও ঠাকুর, কি করিলে তোমাকে পাইব?"

দিগ্‌দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া চীৎকার উঠিল—'ব'লে দেও ঠাকুর, কি করিলে তোমাকে পাইব।' সেই সকাতর চীৎকারে স্থাবর-জঙ্গম, আকাশ-পৃথিবী কণ্টকিত হইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল—"ব'লে দেও ঠাকুর, কি করিলে তোমাকে পাইব।"

চীৎকার শব্দে কুন্তলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পৃথিবী দেখিল—আকাশ দেখিল—নক্ষত্র দেখিল; কিন্তু কোথাও সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। নিরাশা-নিপীড়িত অন্তঃকরণে আকাশপানে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

স্বপ্নে যাহা শুনিয়াছিল, তাহা কুন্তলার বেশ স্মরণ ছিল। কুন্তলা একে একে সেই কথাগুলি মনোমধ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। নিশা যখন প্রভাত-প্রায়, তখন কুন্তলা গাত্রোত্থান করিয়া বৃক্ষাশ্রয় ত্যাগ করিল; এবং যে পথে শান্তিপুর হইতে আসিয়াছিল, সেই পথে শান্তিপুর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

৮

কুন্তলার ভুল ভাঙ্গিয়াছে; সে আর বৃন্দাবন-গমনাভিলাষিণী নয়। কুন্তলা এখন বুঝিয়াছে, হৃদয়ের অবস্থা-বিশেষের নাম বৃন্দাবন—স্থানের নাম নয়। যখন হৃদয়াভ্যন্তরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজ করে, তখন মানুষের শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ঘটে; নতুবা পাপাকুল হৃদয়ে চিরজীবন বৃন্দাবনধামে অতিবাহিত করিলেও মানুষ শ্রীবৃন্দাবন দর্শন পায় না।

পথে যাইতে যাইতে কুন্তলা ভাবিতে লাগিল, "ছি ছি, আমি করিয়াছি কি! অজ্ঞান, অবোধ মনের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কোথায় ছুটিয়া আসিলাম! গোপীনাথ, গোপীনাথ, অজ্ঞান তনয়াকে ক্ষমা কর। তোমার চরণ আমার বৃন্দাবন—তোমার চরণ আমার পুণ্যতীর্থ। তোমার চরণে জল ঢালিয়া আমি পাপের জন্য কাঁদিতে শিখিয়াছি—লোষ্ট্র ছাড়িয়া সোণা চিনিয়াছি। তুমি আমার বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ—তুমি আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীহরি। আমার অপরাধ ক্ষমা কর, ঠাকুর!"

গোপীনাথকে কাতর হৃদয়ে ডাকিতে ডাকিতে কুন্তলা পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন—মাসের পর মাস গড়াইয়া চলিল। কুন্তলা তেমন পথ চলিতে পারে না,—এক দিনের পথ দশ দিনে যায়। অনশন-ক্লিষ্ট, শ্রান্ত, অবসন্ন দেহ টানিয়া কোন প্রকারে অবশেষে শান্তিপুরে পৌঁছিল।

সে দিন মহাবিষুব সংক্রান্তি। কুন্তলা তা' জানে না। পথে ঘাটে চারিদিকে লোক। সকলেই গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। কুন্তলা কৌতূহলপরবশ হইয়া একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগা, তোমরা সকলে কোথায় চলেছ?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, "আ মর্ মাগী, জানিস্ নে, আজ যে চড়ক সংক্রান্তি।"

কুন্তলাও গঙ্গাস্নানে চলিল।

আকণ্ঠ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া কুন্তলা ভাবিল, "আজ আবার সেই মহাপুণ্যদিন। এই দিনে আমি

ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—আজ ব্রত উদ্‌যাপন করিব। মা সুরধুনী গঙ্গে, আমার পাপরাশি ধুয়ে দেও মা—দেহভার হ'তে আমাকে মুক্ত ক'রে দেও মা। মা—মা—"

আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। দুইগণ্ড বহিয়া অজস্র ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। দুই আঁখির দুই প্রবাহ, জাহ্নবী-প্রবাহে দেহ মিশাইয়া অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিল। এই ত্রিবেণী-সংস্পর্শে—এই কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞান তিনের সম্মিলনে জীবের মুক্তি; বেশ্যার মুক্তি নাই কি?

কুন্তলা স্নানান্তে গোপীনাথের মন্দির অভিমুখে চলিল। কুন্তলার দেহে—কি জানি কেন—এখন নবশক্তি, মনে নব উৎসাহ। কুন্তলা এই দীর্ঘপথ স্বল্পকালমধ্যে অতিক্রম করিয়া অচিরে মন্দির-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইল।

তখন পূজা আরম্ভ হইয়াছে। কুন্তলা সঙ্কোচ-শূন্য হৃদয়ে দালানে উঠিয়া পূজা দেখিতে লাগিল। সেবাইত মহাশয় স্বয়ং পূজা করিতেছিলেন। পূজান্তে তিনি ফিরিয়া দেখিলেন—পশ্চাতে কুন্তলা। তাহাকে তিনি দর্শন-মাত্রেই চিনিলেন; বলিলেন, "এত দিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছ? ঠাকুরকে প্রণাম কর মা।"

কুন্তলা, ঠাকুরের চরণ হইতে নয়ন না ফিরাইয়া বলিল, "কাহাকে প্রণাম করিব?—ঠাকুরকে?—আমি যে নিয়ত তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি—নিয়ত তাঁহার চরণে গড়াগড়ি দিতেছি। আমি যে তাঁহারই চরণের উপর মাথা রাখিয়াছি; আবার কোথায় মাথা রাখিয়া কাহাকে প্রণাম করিব?"

সেবাইত বিস্মিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাদোদক খাইবে?"

কুন্তলা। পাদোদক? পাদোদক কোথায় দিবে? আমাতে যে স্থান নাই,—সমস্ত দেহ গোপীনাথ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। মাথায় গোপীনাথ—জিহ্বায় গোপীনাথ—কোথায় পাদোদক দিবে?

সেবাইত আরও বিস্মিত হইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের প্রসাদী ফুল লবে?"

কুন্তলা। ফুল? দেও—তাহার চরণের ফুল তাহার চরণের উপর দেও।

বলিয়া কুন্তলা পা বাড়াইয়া দিল। সেবাইত জ্ঞানী, তথাপ কুন্তলার পায়ের উপর ফুল দিতে সাহস করিলেন না। কুন্তলা কোন দিকে আর ফিরিয়া দেখিল না,—নিমীলিত-নয়নে ধ্যানে বসিল। সে ধ্যান আর ভাঙ্গিল না—কুন্তলা আর চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিল না।

সন্ধ্যাকালে সেবাইত মহাশয় কুন্তলার মৃতদেহ স্বয়ং বহিয়া লইয়া গঙ্গার ঘাটে দাহ করিলেন।

প্রতিশোধ

১

ছোট বউ, বড় বউকে বলিল,—"হা দিদি, তোমার বাপের বাড়ী থেকে নাকি তত্ত্ব এসেছে?"

বড় বউ বলিল,—"আস্‌বে না ত কি? তাই ব'লে কি সকলের বাপের বাড়ী থেকে আসবে?"

এ আক্রমণটা ছোট বউয়ের উপর। তা'র বাপ বড় গরীব, কোন রকমে সংসার চালায়। সে বড় একটা তত্ত্ব করিয়া উঠিতে পারে না। বড় বউয়ের বাপ ধনী, নিয়তই তত্ত্ব পাঠায়। সুতরাং বড় বউ গর্ব্বস্ফীতা—ছোট বউ কুণ্ঠিতা—সঙ্কুচিতা।

প্রত্যুত্তরে ছোটবউ বলিল—"আমার বাপ গরীব, তত্ত্ব দিতে কোথায় পাবেন? তোমার বাপের অবস্থার মত অবস্থা হ'লে তিনিও কত তত্ত্ব কর্‌তেন।"

বড় বউ বলিল,—"কত পুণ্যি কর্‌লে তবে আমার বাপের মত অবস্থা হয়। তাই ব'লে কি যে সে লোকের হবে?"

ছোট বউ মনে একটু কষ্ট পাইল। কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কি জিনিস এসেছে, দিদি?"

বড় বউ গর্ব্বভরে বলিল,—"দেখাব? আয়।"

ছোট বউ, বড় বউয়ের অনুসরণ ক'রল।

২

ছোট সংসার, কেবল দুটি ভাই। বাপ-মা নাই। দুই জনের দু'টি স্ত্রী আছে। তাহা ছাড়া সংসারে আর কেহ নাই। বাপ-মায়ের জীবদ্দশায় উভয়ের উদ্বাহন-কার্য্য

সমাধা হইয়াছিল। বড় বউ রূপে বায়সী, তবে ধনীর কন্যা; তাই একটু ঝাঁজ বেশী। দেখিয়া শুনিয়া বাপ-মা, গরীবের মেয়ে আনিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠের নাম রামলাল, কনিষ্ঠের নাম বিনোদ-লাল। নিবাস কল্যাণপুরে। পিতা বড় একটা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভদ্রাসনটুকু ও কিছু জমীজায়গা ছাড়া আর কিছু ছিল না। তা' তা'তে মোটা ভাত কাপড় বেশ এক রকম চলিয়া যায়।

বিনোদের বয়স যখন যোল বৎসর, তখন তা'র বিবাহ হয়। আঠার বৎসর বয়সে সে মা-বাপ হারাইয়া বড় ভাইকে আশ্রয় করে। এখন তা'র বয়স কুড়ি বৎসর। রামলাল তা'র চেয়ে ছয় বৎসরের বড়। বড় বলিয়াই বিষয়াদি যা' কিছু আছে, তা'র তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করিয়াছে। বিনোদ তাস খেলিয়া, গান গাহিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সে বিষয়কর্ম্ম বুঝে না—সংসারের ধার দিয়া যায় না।

লেখা-পড়া বড় একটা কাহারও হয় নাই। কয়েক বৎসর বিদ্যালয়ে বৃথা ঘুরিয়া অবশেষে উভয়ে বিদ্যালয়-গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়াছিল। শুনিতে পাই, তাদের কোন দোষ ছিল না—দোষটা পণ্ডিতের; তাঁ'র লট-লিটের দৌরাত্ম্যে কোন সুবোধ বালক বিদ্যালয়ে টিকিতে পারিত না।

ছোট বউ সুন্দরী। সুন্দরী হইলেও তাহাকে আমা-দের পছন্দ হয় না। সে কেমন ঘ্যান-ঘেনে প্যান-পেনে, তা'র তেজ আদৌ নাই। লোকে ভর্ৎসনা করিলে, কথার উত্তর দেয় না—বরং হাসে। বড় বউ মিথ্যা করিয়া তা'র ঘাড়ে কোন দোষ চাপাইলে, সে নীরব থাকিত,—ম্লানমুখে লোকের তিরস্কার খাইত। কেহ গালি দিলে গালি না পাণ্টাইয়া নীরবে, নিভৃতে কাঁদিত; কেহ একটু আদর করিলে বড় বড় চোখ দুটি ছল ছল করিত। বড় বউ যদি কখন তার চুল বাঁধিয়া দিত, তা' হ'লে ছোট বউ কৃতার্থ হইত। স্বামীর জন্য দু'টা পাণ লুকাইয়া আনিতে পারিলে সে দিগ্বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করিত। এমন মেয়ে কি ভাল লাগে গা?

দেখ দেখি বড় বউ কেমন! দিনরাত্রি কেমন ফিট্-ফাট হয়ে বেড়াচ্ছে। হ'লই বা সে কাল, কুৎসিত; তার বাপের ত টাকা আছে। সে গায়ে গহনা প'রে, সাবানে গা ধু'য়ে, সিমলার কাপড়ে কালরূপ ঢেকে, কেমন ভাবযুক্ত হয়ে দিন রাত গজ্‌রে গজ্‌রে বেড়াচ্ছে। আর তেজই বা কি! স্বামীর সঙ্গে একটু মতভেদ হইলে সে বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া ছোটলোক স্বামীকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দেয়। স্বামী ত' দূরের কথা, পাড়ার বিড়াল-কুকুরও বড় বউয়ের ভয়ে ত্রস্ত, ভীত। এমন না হ'লে আর বউ!

ভায়ে ভায়ে এখন বড় একটা মিল নাই। বিনোদের একপয়সার দরকার হইলে দাদার কাছে হাত পাতিতে হয়। চাহিলে কখন মিলে—কখন মিলে না! একটা জামা বা এক জোড়া বিনামা ১৩১০ সালের বৈশাখে মাগিলে ১৩১২ সালের চৈত্র নাগাদ মিলিতে পারে। তা' ছাড়া আবার ঝঙ্কার আছে। তবে সেটা অন্দর-বিভাগ হইতেই বেশী আসে। দাদার অন্যায় তিরস্কার, ভর্ৎসনা বিনোদ অম্লানবদনে সহ্য করে; কিন্তু বউদিদির তীব্রো-ক্তিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। বউদিদি নিয়ত বুঝাইতে চেষ্টা পায় যে, তার মত বড়লোকের মেয়ে এই ছোটলোকদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাহাদের ঊর্দ্ধতন বাহান্ন পুরুষ উদ্ধার করিয়াছে। বউদিদির বাক্যবাণ, কঠোরোক্তি, সকলই বিনোদ নীরবে সহ্য করে। কিন্তু যখন সেই অপাপ-বিদ্ধা, সুকুমারমতি ছোট বউয়ের উপর হিমাদ্রি-বিদীর্ণ-কারী বাক্য-শেল নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সে ধৈর্য্য হারাইয়া ক্ষিপ্তবৎ হয়। বিনোদের তখনকার অবস্থা দেখিয়া, স্বামী কাছে না থাকিলে সেই প্রচণ্ডা রাক্ষসীও ভয় পায়। কিন্তু ছোট বউ ইহাতে মরমে মরিয়া যায়। ঘটনার পর স্বামী প্রকৃতিস্থ হইলে, তাহাকে নিভৃতে বলে, "কেন তুমি দিদিকে অমন ক'রে বল? ছি, আমি লজ্জায় ম'রে যাই। তিনি দিদি, গুরুজন—আমরা দোষ করলে তিনি বক্‌বেন না ত রাস্তার লোক বক্‌তে আসবে?" ইত্যাদি।

৩

বড় বউয়ের পিছু পিছু ছোট বউ তত্ত্ব দেখিতে চলিল। দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে সৌখীন দ্রব্যের ঘটাটা কিছু বেশী। ফিতা, চিরুণী, গন্ধদ্রব্য, সাবান, পেটি-কোট, জ্যাকেট প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যে হর্ম্ম্যতল সুশোভিত। সকল জিনিস দেখিয়া ছোট বউ বলিল, "দিদি, আমাকে একটা জিনিস দিবে?"

বড় বউ। কি চাও?

ছোট বউ। এক শিশি আতর।

বড় বউ। ও সব সৌখীন গন্ধদ্রব্য নিয়ে তুমি কি করবে? যার পর্‌তে কাপড় জুটে না, তা'র আবার আতর মাখা কেন?

ছোট বউ আর কিছু বলিল না—চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেখানে এক দাসী দাঁড়াইয়াছিল, তার নাম পাঁচি। সে বড় বউয়ের দাসী হইলেও ছোট বউকে বেশী ভালবাসিত। ছোট বউয়ের বিমর্ষ মুখখানি দেখিয়া তা'র প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল। সেখানে আর সে দাঁড়াইল না, স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কিন্তু ছোট বউয়ের মুখখানি তার প্রাণে গাথা রহিল।

দুই দিন পরে বাড়ীতে এক মস্ত গোল বাধিল; বড় বউয়ের আতরের শিশি চুরি গিয়াছে। চোর ধরা বড় কঠিন হইল না—গন্ধেই ধরা পড়িল, সে গন্ধ চাপিয়া রাখা বড় সহজ নয়। ছোট বউ যে দিকে যায়, সেই দিকেই বোঁটা-ভাঙ্গা ফুলের গন্ধ। বড় বউ গর্জ্জিয়া ছোট বউকে ধরিল। ছোট বউ বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কেন দিদি, তুমিই ত আমায় আতর মাখিতে দিয়াছ।"

অনলে ঘৃতাহুতি পড়িল। বারিধিহৃদয়ে প্রভঞ্জন নাচিয়া উঠিল। বড়বউ চীৎকার করিয়া বলিল, "আমি তোকে দিয়েছি! চোর! ছোটলোক! মিথ্যাবাদী!"

ছোটবউ স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল, কিছু বলিতে সাহস পাইল না। সে চুপ করিলেও বড়বউ চুপ করিতে পারে না। আগ্নেয় গিরির বিদীর্ণবদন-নিঃসৃত জ্বলন্ত অনলরাশির ন্যায় তাহার মুখগহ্বর হইতে জ্বালাময়ী বাক্যাবলী বিনির্গত হইতে লাগিল। সে বাক্যানলে মানুষ পুড়িয়া ছাই হয়, কিন্তু ছোট বউয়ের ধৈর্য্য পুড়িল না। সে নতমুখে ধীরে ধীরে বলিল, "দিদি, শিশিটা এনে দিব? আমি ফোঁটা-কতক নিয়েছি বই ত নয়।"

এবার বৈশাখী মেঘে বিজলী খেলিল—হুঙ্কার-রবে ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। বড়বউ গর্জ্জিয়া বলিল,—"এত বড় আস্পর্দ্ধা। তোর প্রসাদী জিনিস আমায় দিতে আসিস্!"

তখন ছোটবউকে ছাড়িয়া ছোট বউয়ের পিতৃ-মাতৃকুল, এমন কি, শ্বশুরকুলের উপরেও ঝড়ের বেগটা পড়িল। ভাষায় যতদূর গালি দেওয়া সম্ভব, ততদূর গালি চলিল। ছোটবউয়ের যে যেখানে আছে—কেহই অব্যাহতি পাইল না। প্রাণ ভরিয়া সকলকে গালি দিয়া বড়বউ অবশেষে ছোটবউকে বৈধব্য-অভিসম্পাত দিল। তখন ছোটবউয়ের মৈনাকতুল্য অটল ধৈর্য্যও ঝটিকা-তাড়নায় নড়িয়া উঠিল। সে বলিল, "দিদি, আমি দোষ ক'রে থাকি, আমায় গালি দেও, শাস্তি দেও, যারা নিরপ-রাধ তাদের কেন গালি দিচ্ছ?"

এবার উনপঞ্চাশৎ পবন নীল কাদম্বিনীর পিছু তাড়না করিয়া ছুটিল; বড়বউ মুখ ছাড়িয়া হাত ধরিল; উন্মত্ত নর্ত্তনে হর্ম্যতল প্রকম্পিত করিয়া বড়বউ কমলতুল্য কোমল ছোটবউয়ের অঙ্গে পদাঘাত করিল।

এমন সময় তথায় বিনোদ আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনোদ যখন সকল কথা শুনিল, তখন সে দ্বাদশ রবির তেজে জ্বলিয়া উঠিল। সে অনলে কোন গ্রহ ভস্মীভূত হইল কি না, জানি না, কিন্তু গৃহের সুখ, ভ্রাতার কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সকলই পুড়িয়া গেল। ক্রোধানলে দেবত্ব আহুতি দিয়া বিনোদ পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইল।

গোলমাল শুনিয়া রামও ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ভায়ে ভায়ে বচসা আরম্ভ হইল। বচসায় কখন ঝগড়া মিটে না—বরং বাড়ে। এ ক্ষেত্রেও ঝগড়া পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল। রামলাল চীৎকার করিয়া বলিল, "তুই আমার বাড়ী হ'তে দূর হ'।" বিনোদও সমান উত্তর করিয়া জানাইল যে, পৈতৃক ভিটায় তাহারও স্বত্ব আছে। ঝগড়া কতদূর গড়াইত, বলা যায় না; কিন্তু ইচ্ছামত স্রোতোমুখে যাইতে পারিল না। কয়েক-জন নিষ্কর্ম্মা প্রতিবেশী অযাচিতরূপে আসিয়া মধ্যস্থ হইল। তাহারা বিনোদকে সস্ত্রীক কিছু দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ী গিয়া বাস করিতে উপদেশ দিল। তাহারা বুঝাইয়া বলিল, কিছুদিন বাদে পৈতৃক বিষয় ভাগ করিয়া লইলেই চলিবে।

তাহাদের পরামর্শমত বিনোদও তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর-হাত ধরিয়া শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিল। যাই-বার সময় দাদাকে শাসাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "যদি বেঁচে থাকি, এ ব্যবহারের প্রতিশোধ এক দিন দিব।"

ছোটবউ পিত্রালয়ে যাইতেছে দেখিয়া, পাঁচি কোথা হইতে আসিয়া বলিল,—"দাঁড়াও ছোট বউদিদি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি মাইনে চাই না—কেবল দু'টো খেতে চাই। তাও যদি না দাও, তবুও তোমার কাছে থাক্‌ব, যত দিন বেঁচে থাক্‌ব, তত দিন তোমার সেবা করব। একটু দাঁড়াও, বড়বউকে দুটো কথা ব'লে নি। দেখ বড়-বউ, তোমার মত ছোট লোকের কাছে আমি আর চাকৃরি করতে চাইনে। দেখ, আমার কাছে মুখ ধোরো না—তুমি চোদ্দ পুরুষ তুললে, আমি ছাপ্পান্ন পুরুষ তুলব। একটা কথা তোমায় বল্‌বার জন্য দাঁড়ালুম। যে শিশিটার জন্য তুমি ছোটবউদিদিকে লাথি মারলে, তাড়িয়ে দিলে, সে শিশিটা আমি চুরি

ক'রে ছোটবউদিদিকে দিয়েছিলাম। দিয়ে বলেছিলাম, শিশিটা তুমি তাকে দিয়েছ। চুরি করা জিনিস জান্‌তে পার্‌লে ছোট বউদিদি লাথি মেরে শিশিটা ফেলে দিত। তুমি এত অপমান করেছ, তবু সে মুখ ফুটে আমার নাম করে নি। কি বল্‌ব, এত দিন তোমার নুণ খেয়েছি, নইলে যে লাথি মেরেছ, তার প্রতিশোধ দিতাম।"

বাধা দিয়া বিনোদ বলিল,—"একদিন এ অপমানের প্রতিশোধ আমি দিব। যে পায়ে তুমি লাথি মেরেছ, যে মুখে দাদা গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই—"

ছোটবউ মুখ চাপিয়া ধরিল, কিছু বলিতে দিল না।

৪

শ্বশুরালয় দ্বারভাঙ্গায়। যাইতে দুই দিন লাগিল। শ্বশুর বড় গরীব, রাজষ্টেটে সামান্য চাকুরি করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। তিনি জামাইয়ের গ্রাসাচ্ছাদন-ভার লইতে অক্ষম হইলেও দায়ে পড়িয়া লইতে হইল। কিছুদিন বাদে শ্বশুর বিনোদকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাপু, এ বয়সে ব'সে থাক্‌লে ত চলবে না, কিছু কাজকর্ম্ম করা উচিত। আমি বুড়ো হয়েছি, কেমন ক'রে একা এত বড় সংসার চালাই বল।"

বিনোদ কথা কহিল না। আবার কিছুদিন গত হইল। শ্বশুর একদিন বলিলেন, "না হয় ভাইয়ের সঙ্গে বিষয় ভাগ ক'রে নিয়ে পৈতৃক ভিটায় থাক গে। আমি আর ক'দিন পারি বল।" বিনোদ বলিল, "ভাইয়ের সঙ্গে বিষয় ভাগ কর্‌ব না। হাজার হ'ক, তিনি আমার বড় ভাই।" শ্বশুর তখন সরোষে বলিলেন, "না ভাগ ক'রে নেও, অন্য কোন উপায় দেখ—নিষ্কর্ম্মা হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে থাক্‌লে চিরকাল চল্‌বে না।"

লজ্জায় ঘৃণায় বিনোদের মুখ লাল হইল। সে উঠিয়া গৃহমধ্যে গেল। সেখানে শ্যালিকা একটু গঞ্জনা দিল। তখন বিনোদের অভিমানপূর্ণ হৃদয় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া একাকী একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া চলিল।

৫

প্রাণের ধিক্কারে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া বিনোদলাল জয়পুরে এক উকীলের গৃহে আশ্রয় লইল; এবং পিতামাতার সহস্র অনুরোধে যাহা কখন করে নাই, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে লাগিল;—স্থানীয় পুস্তকাগারে যত পুস্তক ছিল, তাহার ভূরিভাগ একে একে পড়িল। জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান একে একে অনন্য-সাহায্যে পড়িল। তাহার অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্রয়দাতা উকীল বাবু বিস্মিত হইলেন। বিনোদের আলস্য নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই—সে দিবারাত্রি অনন্যকর্ম্ম হইয়া পাঠে নিযুক্ত। চারি বৎসর পরে বিনোদ মনের শান্তি ফিরাইয়া পাইয়া পাঠাগার পরিত্যাগ করিল।

উকীল বাবু রাজসরকারে বিনোদের একটু চাকুরি করিয়া দিলেন। বেতন দশ টাকা মাত্র; কিন্তু বিনোদ তাহাতেই সন্তুষ্ট। অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া সে সততা ও অধ্যবসায়-গুণে ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে লাগিল। সিদ্ধি আকৃষ্ট হইয়া সাধনার গলায় বরমাল্য পরাইয়া দিল;—বিনোদ দশ বৎসর পরে রাজসরকারে দেওয়ানের পদ প্রাপ্ত হইল।

তখন বিনোদ পরিবার আনিল। পরিবারের পিছু পিছু অনেকেই আসিল। শ্যালক, শ্যালিকা, শ্যালকপুত্র সকলেই আত্মীয়তা করিতে বিনোদের কাছে ছুটিয়া আসিল। বিনোদ রাজসরকার হইতে বাস করিবার জন্য প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পাইয়াছিল, অল্প দিনের মধ্যে সেই সুবৃহৎ অট্টালিকা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবে পরিপূর্ণ হইল। সংসারে যে তাহার এত আত্মীয়, বান্ধব ছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। এক্ষণে সম্পদের দিনে জগৎ বন্ধুময় হইয়া উঠিল।

সকলে আসিল বটে, কিন্তু কল্যাণপুরের কেহ আসিল না। সে দূরবর্ত্তী গ্রামে বিনোদের সম্পদের কথা পৌছায় নাই; বিনোদও কোন সংবাদ লয় নাই বা পাঠায় নাই। কার কাছেই বা বিনোদ সংবাদ পাঠাইবে? সে গ্রাম হইতে বিনোদের দাদার বাস উঠিয়াছে। কেমন করিয়া উঠিল, তা' বলিতেছি।

রামলাল নিজে লোকটা মন্দ নহে; তবে স্ত্রীর সম্পূর্ণ শাসনাধীন। স্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রামলাল ও বিষয়াদি উভয়ই চলিত। বড়মানুষের মন যোগাইতে যোগাইতে রামলাল ও বিষয় হায়রাণ হইয়া পড়িল,—রামলাল ঋণগ্রস্ত হইল, বিষয় বন্ধক পড়িল। বাঁধা-বাঁধি না থাকিলে ঋণ কমে না, বরং বাড়ে। দেনা যখন দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিল, তখন এক বিপদ আসিয়া বড়বউয়ের হৃদয়ে বজ্রাঘাত-তুল্য আঘাত করিল। বড়বউয়ের পিতার একখানি বড় দোকান ছিল। পিতা হঠাৎ দেউলে হওয়ায় সে দোকানখানি উঠিয়া গেল। সেই সঙ্গে মহাজন পাওনাদার সকলে মিলিয়া তাহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিয়া শৃগালের ন্যায় লুঠিয়া

লইল। সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও সকল ঋণ পরিশোধ হইল না। তাহাকে জেলে দিবে বলিয়া পাওনাদারেরা শাসাইতে লাগিল। পিতার সে বিপদে বড়বউ স্থির থাকিতে পারিল না ;—নিজের অলঙ্কার, স্বামীর ভদ্রাসন প্রভৃতি বেচিয়া পিতার সাহায্যে অগ্রসর হইল। কন্যার সাহায্যে পিতা জেল হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ঘোর দরিদ্রতায় পড়িয়া রিক্তহস্তে কন্যার গৃহে সপরিবারে আশ্রয় লইল। কন্যার তখন কিছুই নাই ; ভদ্রাসন, বিষয়-সম্পত্তি, অলঙ্কার সকলি গিয়াছে। পিতাকে দু'মুঠা খাইতে দিবারও তাহার সামর্থ্য নাই। দেখিয়া শুনিয়া রামলালও নিশ্চেষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় মহাজন আসিয়া বাড়ী দখল করিল। তখন পরামর্শ আঁটিয়া সকলে কল্যাণপুর ত্যাগ করিয়া চলিল।

৬

আজ বিনোদলাল বিচারে বসিয়াছেন। কতকগুলা লোক অভিযুক্ত হইয়া দেওয়ানের সমক্ষে নীত হইয়াছে। অপরাধ গুরুতর। রাজসরকারের চলিত মুদ্রা জাল করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আজ তাহাদের বিচার—দেওয়ান বিচারক।

আসামীরা সংখ্যায় অনেক—প্রায় দশ বারো জন হইবে। প্রধান অপরাধী—বড়বউয়ের পিতা ও স্বামী। বড়বউও অব্যাহতি পায় নাই—সেও একজন আসামী। তাহার ভাই, ভগিনী, মা প্রভৃতি সকলেই অভিযুক্ত হইয়া বিচারাসনের সম্মুখে নীত হইয়াছে। দেওয়ানের অট্টালিকার একতম অংশে বিচারগৃহ। সেই সুপ্রশস্ত বিচারালয় লোকে পরিপূর্ণ। আসামীদের চারিদিকে সিপাহী-দল—বিচারাসনের চারিদিকে কর্ম্মচারিবৃন্দ। আশে পাশে নীরব দর্শকমণ্ডলী। সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সকলি গৃহীত হইয়াছে। তবে এখনও হুকুম হয় নাই। হুকুমের প্রতীক্ষায় সকলেই বিচারকের মুখ পানে চাহিয়া আছে। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বিচারক অবশেষে নিস্তব্ধ গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে বিচারফল পাঠ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "আসামীগণ, তোমাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে। তোমাদের গর্হিত কার্য্যে রাজসরকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেই জন্য আমি রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ তোমাদের দশ সহস্র চলিত মুদ্রায় দণ্ডিত করিতেছি। যত দিন না এই অর্থ দিতে পার, তত দিন কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে।"

তখন একজন জমাদার অগ্রসর হইয়া আসামীদের জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ লোগ্ রুপেয়া দেগা ?"

রামলাল উত্তর করিল, "না, দিবার ক্ষমতা নাই। আজও নাই, বিশ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও জন্মিবে না।"

জমাদার বলিল, "তব্, জেলখানামে চলো।"

আসামীদের মধ্যে যাহারা স্ত্রীলোক, তাহারা আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিল না,—হর্ম্ম্যতলে বসিয়া পড়িল। পুরুষেরা সান্ত্বনা দিবে কি, নিজেরাই অশান্ত হইয়া উঠিল। এমন সময় দেওয়ান বিচারাসন হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "জমাদার, একটু অপেক্ষা কর।"

অর্দ্ধ দণ্ড পরে দেওয়ান একটা ছোট পুঁটুলি হস্তে ফিরিয়া আসিয়া দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যদি কেহ এই গহনাগুলি আবদ্ধ রাখিয়া পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আমায় কর্জ্জ দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই। এই গহনার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা না হইতে পারে, কিন্তু আমার গৃহে আর এক টুক্‌রাও সোণা-রূপা নাই।"

একজন সম্ভ্রান্ত মহাজন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা তখনি আনিয়া দিল ; কিন্তু গহনা লইল না ; বলিল, "আপনার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আপনাকে আমি যথাসর্ব্বস্ব কর্জ্জ দিতে পারি।"

তখন বিনোদলাল রামলালের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "আমি এত দিন যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা আপনার চরণে অর্পণ করিতেছি। অর্থদণ্ড দিয়া কারামুক্ত হউন।"

রামলাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, "টাকা ! অর্থদণ্ড ! আপনি কে ?"

বিনোদ বলিলেন, "দাদা, আমি বিনোদ।"

রামলাল বলিল, "বিনোদ ! যা'কে আমি অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি, সেই বিনোদ ! সেই আমাকে টাকা দিয়া রক্ষা করিতেছে ? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?"

বিনোদ কোন উত্তর না দিয়া নীরবে অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রামলাল বিনোদের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, এই কি তোমার প্রতিশোধ ?"

বড়বউ সুদূর গবাক্ষপানে নেত্রপাত করিয়া দেখিল, ছোটবউ দণ্ডায়মান। তাহার নয়নে জল, অধরে হাসি, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ।

ঋণ-মুক্তি

১

"কেন বালিকা, তুমি রাত্রিদিন কাঁদ ? তোমার স্বামীর খোঁজে চারিদিকে লোক পাঠাইয়াছি—বিলাতেও পত্র লিখেছি।"

"সাহেব, তোমার দয়ার শরীর, তুমি অভাগিনীর জন্য যথেষ্ট কষ্ট করিতেছ, কিন্তু—কিন্তু—"

"আবার কাঁদিতেছ ? ছি !"

"না কাঁদিয়া থাকি কেমন ক'রে, সাহেব ?"

"তোমার সেই স্বামীর স্বামী জগৎস্বামীকে ডাক, তা হ'লে প্রাণে শান্তি পাবে।"

শিশিরসিক্ত কমলের ন্যায় জলভারাকুলনয়ন দুইটি একবার সাহেবের মুখ পানে তুলিয়া বালিকা বলিল, "সাহেব, আমরা হিন্দুর মেয়ে, স্বামীকে ঈশ্বরের উপর স্থান দিয়া থাকি। যদি সেই স্বামীকে না পাইলাম, তবে এ জীবনে আর প্রয়োজন কি ?"

সাহেব। হিন্দু মেয়ের প্রাণ কি ধাতুতে গঠিত, তা' আমরা জানি না; আমরা জানি, স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ দুই দিনের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ চিরদিনের। তাঁর সঙ্গে মানুষের তুলনা !

বালিকা। সাহেব, তুমি স্ত্রীলোক নও, তাই এ কথা বলিতেছ। তুমি যদি স্ত্রীলোক হয়ে হিন্দুর ঘরে জন্মাতে, তা হ'লে আমার মনোভাব বুঝিতে পারিতে। একবার আমাদের বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী-পূজা হয়; আমি দেখিলাম, আমার স্বামী দণ্ডবৎ হইয়া প্রতিমা-পদতলে প্রণাম করিতেছেন। আমি কিন্তু সেই মৃন্ময়ী প্রতিমাকে প্রণাম না করিয়া আমার জীবন্ত দেবতা স্বামীর চরণে প্রণাম করিলাম।

সাহেব। তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা ভাল জান, আমরা কিন্তু কাহারও জন্য চিরদিন কাঁদিয়া নিজের জীবন—আত্মীয়-স্বজনের জীবন অশান্তিময় করি না।

বলিয়া সাহেব ক্ষুণ্ণমনে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

২

বালিকার নাম পুষ্প—বয়স পনর বৎসর; শ্বশুরালয় বেদগ্রামে। স্বামী সনাতন মিত্র, কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন। বালিকা শ্বশুরকে দেখে নাই—শুধু শাশুড়ীকে পাইয়াছিল। কিছু জমীজমা ছিল, তাহাতেই কোন রকমে সংসার চলিত। সংসার সুখের না হইলেও বড় একটা দুঃখের ছিল না। এমন সময় সহসা একদিন বজ্রনির্ঘোষ তুল্য সংবাদ আসিল, সনাতন দেশ ছাড়িয়া বিলাতযাত্রা করিয়াছেন। কথাটা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। যে পরশ্রীকাতর, সে রাষ্ট্র করিল, সনাতন প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। সঠিক সংবাদ কোথাও পাওয়া গেল না। গৃহিণী অবশেষে হতাশ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। সে শয্যা তাঁহাকে আর ত্যাগ করিতে হইল না, স্বল্পকালমধ্যে চিতার উপর শুইয়া তিনি সকল চিন্তা—সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

পুষ্প মরিল না—তাহার পাষাণ হৃদয় কিছুতেই ভাঙ্গিল না। কিন্তু বড়ই বিপাকে পড়িল। শ্বশুরের ভিটায় আর কেহই নাই,—সে একা; একে কুলবধূ, তা'য় বয়সে নবীনা। বিষয়াদি দেখে, এমন লোক নাই। যাহাদের দেখিবার কথা, তাহারা রক্ষা না করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া পুষ্প শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে আসিল। সেখানে একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বই আর কেহ নাই। গুণধর ভ্রাতা সুযোগ ছাড়িলেন না; তিনি স্বল্পকালমধ্যে ভগ্নীর অলঙ্কারগুলি আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অনাথিনী পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে অনেক বিপদ্; বিশেষ যার রূপ-যৌবন আছে, তার বিপদের সীমা নাই। বালিকা দেখিল, সে যেখানে যায়, সেইখানেই উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র যুবকের দল তাহার পিছু লয়। কোন গৃহস্থ অভাগিনীকে আশ্রয় দিল না। আশ্রয়হীনা যুবতীকে আশ্রয় দিয়া কে সমাজে কলঙ্ক কিনিবে ? এ বিষয়ে হিন্দুসমাজ বড় সতর্ক। আশ্রয় না পাইয়া পুষ্প আর জীবনভার বহন করিতে পারিল না,—ব্রহ্মপুত্রগর্ভে সে ভার নামাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

বালিকা ব্রহ্মপুত্র-তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। নীলাকাশপ্রতিবিম্বিত নীলাম্বু-হৃদয়ে আশ্রয় অন্বেষণে বালিকা আকণ্ঠ জলে নামিল; কিন্তু মরিতে পারিল না;—স্বামীকে মনে পড়িল। তাহার মনে আশা জাগিল, একদিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবে। বালিকা নদীতট হইতে ফিরিয়া বনপথ অবলম্বন করিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতে বালিকা সভয়ে দেখিল, কয়েক জন দুর্বৃত্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। পুষ্প চীৎকার করিয়া উঠিল। দুর্বৃত্তেরা

ছাড়িল না,—বালিকাকে ধরিল। পুষ্প সাধ্যমত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু বালিকার বল কতটুকু? শীঘ্রই সে অবসন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল।

তখন নিরুপায় হইয়া পুষ্প কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "কোথায় দুর্গতিনাশিনী দুর্গে, অনাথাকে রক্ষা কর মা! শুনেছি, তোমার নাম স্মরণে বিপদ্ থাকে না। বিপন্না আমি তোমাকে ডাকিতেছি মা, আমাকে রক্ষা কর—আমার ধর্ম্ম রক্ষা কর।"

মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে পুষ্প দেখিল, এক জন সাহেব অশ্বারোহণে তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল; এবং ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বেত্রহস্তে দুর্ব্বৃত্তদের আক্রমণ করিল। পাষণ্ডেরা প্রহৃত হইয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল। সাহেব অচেতনপ্রায় পুষ্পকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সাহেব—এক জন চা-কর—নাম জর্জ্জ বার্ড।

৩

আজ দুই মাস হইল, পুষ্প সাহেবের আশ্রয়ে আসিয়াছে। সাহেব তাহাকে অন্যত্র পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন না—বালিকাও ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যত্র গেল না। সে আর কোথায় যাইবে? এ বিশ্বসংসারে তাহার স্থান কোথায়? পুষ্প সাহেবের গৃহে আশ্রয় পাইয়া কৃতার্থ হইল।

সাহেবের পুত্র-কন্যা নাই; কিন্তু স্ত্রী আছে। ক্ষোভের বিষয়, মেম সাহেব কুরূপা। কুরূপা হইলেও স্বামিপ্রেমে বঞ্চিতা ছিলেন না, প্রেমময় হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা অযাচিতরূপে পাইয়াছিলেন। এত ভালবাসা পাইয়াও মেম সাহেবের মনে শান্তি ছিল না,—তিনি স্বামীর চরিত্রে অযথা সন্দিহান ছিলেন! সাহেব কিন্তু নিষ্কলঙ্ক—দেবচরিত্র।"

পুষ্প সাহেবের গৃহে আশ্রয় লইল বটে, কিন্তু মোটা শাড়ী ছাড়িয়া গাউন পরিল না, শাঁখা খুলিয়া হাতে ব্রেস্‌লেট উঠাইল না। সহস্র অনুরোধ সত্ত্বেও বুট মোজা পরিল না—সাহেবের গৃহে অন্নজল গ্রহণ করিল না। উদ্যানের অপর প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল; পুষ্প তথায় আশ্রয় লইল। একা থাকিত না, একজন হিন্দু দাসী তাহার কাছে শুইয়া থাকিত। দাসী জল আনিয়া দিত, পুষ্প স্বহস্তে পাক করিত। আহারের কোন আড়ম্বর ছিল না। কিছু চাউল আর দুটা আলু বা কাঁচকলা হইলেই বালিকার চলিয়া যাইত। তবে একাদশীর দিন মাছ না খাইয়া ছাড়িত না। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহার স্বামী জীবিত আছেন—একদিন না একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে।

সাক্ষাতের আশা থাকিলেও বালিকা সময়ে সময়ে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না। সাহেব কত বুঝাইতেন, পুষ্প বুঝিত না;—সাহেবের পদতলে কার্পেটমণ্ডিত হর্ম্ম্যতলে বসিয়া কাঁদিত। সাহেবও সেই সঙ্গে কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। আবার অপরের অজ্ঞাতসারে তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বালিকাকে কত সান্ত্বনা দিতেন।

একদিন সাহেব বিলাত হইতে একখানা পত্র পাইয়া সানন্দে পুষ্পকে বলিলেন,—"বেটী, আজ আমার জামাইয়ের খবর পেয়েছি।"

"কার খবর পেয়েছ বাবা?"

"আমার জামাইয়ের—তোর স্বামীর।"

পুষ্প আর দাঁড়াইতে পারিল না,—কাঁপিতে কাঁপিতে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল; এবং ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি খবর—কি খবর পেয়েছ?"

বলিতে বলিতে পুষ্প চৈতন্য হারাইয়া ভূ-পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল।

৪

তা'র পর আরও কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। পুষ্প বার্ড সাহেবের গৃহে তেমনই আছে। তবে এখন বড় একটা কাঁদে না। যদি কখনও কান্না আসে, গোপনে কাঁদে। হাসিমুখ ছাড়া বিষাদাচ্ছন্ন মুখ সাহেবকে দেখায় না। সাহেব মহাসুখী।

একদিন বার্ড সাহেব পুষ্পকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ্, (সাহেব পুষ্প বলিতে পারিতেন না) আমাদের দেশে যাবে?"

"না।"

"কেন?"

"তা হ'লে জাতি যাবে।"

"তবে তোমার স্বামীরও জাতি গিয়াছে।"

পুষ্প অন্যমনস্ক হইল—কথাটার উত্তর দিতে পারিল না। সাহেব বলিলেন, "পুষ, তোমার স্বামী বিলাত হইতে সাহেব সাজিয়া আসিতেছেন; তুমি তাঁহার উপযুক্ত স্ত্রী হইবার চেষ্টা কর—লেখাপড়া শিখ।"

পুষ্প কাতরনয়নে সাহেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল—কোন উত্তর করিল না। সাহেব তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুষ্, তুমি লেখা-পড়া জান?"

"কিছু জানি—স্বামী শিখাইয়াছিলেন।"

"তবে একখানা পত্র লিখিয়া দাও, তোমার স্বামীর নিকট তাহা পাঠাইয়া দিব।"

পুষ্পের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল। সাহেব বলিলেন, "পত্রে আমার কথা লিখিও না।"

পুষ্প। তোমার কথা ছাড়িয়া দিলে লিখিবার আর যে বড়-একটা কিছু থাকে না, বাবা।

সা। থাকে বই কি। লিখিও যে, এক্ষণে তুমি তোমার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছ, আর সেই সম্পত্তি হইতে—

পু। সম্পত্তি হইতে কি?

সা। সম্পত্তি হইতে তুমি তাঁহাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছ।

পু। কথাটা আমি বুঝিলাম না।

সা। আর কি করিয়া বুঝাইব?

পু। তুমি কি আমার স্বামীকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছ?

সা। হাঁ—তোমার নাম দিয়া আমি পাঠাইতেছি। এবার বুঝেছ?

পু। আমার স্বামী কি দুর্দ্দশায় পড়িয়াছেন?

সা। এমন কিছু নয়; তবে কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে। তা' তুমি কিছু ভেবো না।

বালিকা ছল্‌ছল্‌ নয়নে সাহেবের মুখপানে চাহিয়া রহিল, একটিও কথা কহিতে পারিল না। সাহেব সেখানে আর দাড়াইলেন না—স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

৫

সাহেব একদা মেমসাহেব ও পুষ্পকে লইয়া নৌকাবিহারে বহির্গত হইয়াছেন। সুন্দর তরণী—ফুলমালা-বিশোভিত। সুন্দর জল—নীল, স্বচ্ছ, বীচিবিক্ষেপী। সুন্দর আকাশ—নীলিমামণ্ডিত—দিগন্তপ্রসারিত।

বজরার ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া পুষ্প শুইয়া আছে। কামরার ভিতর সাহেব ও মেম। পুষ্প আকাশ দেখিতেছে। আকাশ দেখিয়া বুঝি তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটিতেছে না। তাই নীরবে, পলকশূন্য-নয়নে চাহিয়া আছে। অনন্ত আকাশে ছিদ্র নাই, দাগ নাই,—শুধু আকাশ—শুধু অনন্ত নীল। পদনিম্নে জল,—শুধু জল—মলা নাই, রেখা নাই—শুধু জল। পুষ্প কখন জল দেখিতেছে, কখন বা আকাশ দেখিতেছে। কোন্‌টা সুন্দর? জল না আকাশ? পুষ্প ভাবিল, বুঝি আকাশটাই সুন্দর।—আকাশ সীমাহীন, অনন্তবিস্তৃত—বিকার নাই, চাঞ্চল্য নাই, গর্জ্জন নাই—বুঝি অনন্ত-রূপধারের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধরিয়া আকাশ এত স্থির, এত সুন্দর।

দেখিতে দেখিতে আকাশ রূপান্তর পরিগ্রহ করিল। উত্তর-পশ্চিমকোণে মেঘ সঞ্চিত হইয়া নীলাকাশের কিয়দংশ কৃষ্ণবর্ণে সমাচ্ছাদিত করিল। মেঘান্তরালে মারুত লুকাইয়া ছিল, এক্ষণে আলস্য ছাড়িয়া সোঁ সোঁ শব্দে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে আকাশ পৃথিবী কম্পিত করিতে লাগিল। ব্রহ্মপুত্রের নীল জল সহসা জাগিয়া উঠিয়া, ফেনরাশি মাথায় বাঁধিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ছুটিল। সমস্ত জীব-জন্তু শঙ্কিত-হৃদয়ে আশ্রয়ান্বেষণে ছুটিল। মাঝি-মাল্লারা ভয় পাইয়া সাহেবকে বলিল, "হুজুর, ম্যাঘ উঠেছে।"

সাহেব বাহিরে আসিলেন এবং চারিদিকে নেত্র-পাত করিয়া দেখিলেন, ভীত হইয়া পুষ্পকে বলিলেন, "পুষ্, ভিতরে এস।"

"কেন বাবা, আমি ত বেশ আছি।"

সাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া মাঝিদের আদেশ করিলেন, "নৌকা কিনারায় লাগাও।"

এমন সময় মেম সাহেব বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কি হয়েছে?"

উত্তর কেহ দিল না—দিবার প্রয়োজনও হইল না;—মেঘের আড়ম্বর দেখিয়াই মেম সাহেব বুঝিলেন, ব্রহ্মপুত্রের বিশাল তরঙ্গময় বক্ষ এখন তত নিরাপদ নয়। তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া বলিলেন, "নৌকা কিনারায় লাগাও—পুষ্, ভিতরে এস।"

পুষ্প উঠিল; সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিল। এমন সময় বায়ু সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বজরার উপর আসিয়া পড়িল। নৌকা টলিল—পুষ্প পদস্খলিত হইয়া নদবক্ষে পড়িয়া গেল।

সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া অঙ্গ হইতে বস্ত্রাদি উন্মোচন করিতে লাগিলেন। মেম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতলব কি?"

কার্য্যে বিরত না হইয়া সাহেব উত্তর করিলেন, "পুষ্‌কে রক্ষা করিব।"

মেম। নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে?

সাহেব কোন উত্তর না করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মেম সাহেব চীৎকার করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে তোমার কে যে, তাহার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছ?"

নদগর্ভ হইতে উত্তর আসিল, "সে আমার আশ্রিত।"

৬

পুষ্প মরে নাই—বাঁচিয়াছে। সাহেব আবার তাহাকে কুঠীতে আনিয়াছেন। পূর্ব্বে সাহেব তাহার ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রাণরক্ষা করিলেন। পুষ্প ভক্তি ও প্রীতিভাণ্ড শূন্য করিয়া সাহেবের চরণে ঢালিল এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, কাব্য একে একে বহু পুস্তক পড়িল। ইংরাজী ভাষায় কথা-বার্ত্তা কহিতে বেশ শিখিল। তাহার মেধাশক্তি দৃষ্টে সাহেব চমৎকৃত হইলেন।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। পুষ্প মধ্যে মধ্যে স্বামীর পত্র পাইত; সেও মধ্যে মধ্যে স্বামীকে পত্র লিখিত। পুষ্প একবার স্বামীকে লিখিয়াছিল, "বার্ড সাহেব কেমনতর, জানিতে চাহিয়াছ; কিন্তু কেমন করিয়া সে সৌম্যমূর্ত্তি, সে উদার হৃদয় তোমার চক্ষের সাম্‌নে আঁকিয়া ধরিব? আমি কখন দেবতা দেখি নাই, সুতরাং বলিতে পারি না, তিনি দেবতা কি না। স্বর্গে যদি বার্ড সাহেবের মত তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকেন, তা হ'লে স্বর্গ কত পবিত্র, কত পুণ্যময়!"

স্বামী সনাতন মিত্র ইংলণ্ড হইতে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, "তুমি ঠিক বলিয়াছ, পুষ্প! যে দেশে বার্ড সাহেবের মত দেবতা থাকেন, সে দেশ পবিত্র, পুণ্যময়। তুমি জান কি না, জানি না, এই বার্ড সাহেব —এই দেবতার দেবতা আমাকে মাসে মাসে দুই শত টাকা দুই বৎসর ধরিয়া নিয়মমত পাঠাইতেছেন। যদি এই দেবতা সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত আমাকে এতদিন অনাহারে মরিয়া যাইতে হইত, অথবা অনাবৃত দেহে এই ভীষণ তুষারপাতের মধ্যে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। পুষ্প, আমি দেখি নাই, বার্ড সাহেব কেমন, কিন্তু আমি দূর হইতে বুঝিতে পারিতেছি, বার্ড সাহেব মহাপুরুষ। যদি মানুষের কোটি জন্ম থাকে, তা হ'লে আমার কোটি জীবন তাঁহার কার্য্যে উৎসর্গ করিলেও সে মহাপুরুষের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

৭

কয়েক মাস পরে সনাতন সিবিল সার্‌ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিয়া আগে বার্ড সাহেবের গৃহে আসিলেন। সাহেব অভ্যর্থনা করিতে দ্বারে দণ্ডায়মান। সাহেব অভিবাদন করিলেন; কিন্তু সনাতন প্রত্যভিবাদন করিলেন না,—পলকশূন্য নয়নে সাহেবের পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল—সমস্ত দেহ কাঁপিতে থাকিল। তা'র পর সাহেবের পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত বলিলেন, "সাহেব, হিন্দুরা দেবতাকে এইরূপে অভিবাদন করে।" সাহেব আদরভরে সনাতনকে বুকে টানিয়া লইলেন।

* * *

তা'র পর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। সনাতন মিত্র এক্ষণে এস্, মিত্রা ও জেলার জজ। যে জেলাতে বার্ড সাহেবের বাস, সেই জেলাতে মিট্রা সাহেব এক্ষণে জজ। একদা মিত্রা সাহেব শুনিলেন, বার্ড সাহেব একজন যুবতী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছেন। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না—লোকেও বিশ্বাস করিল না। তাহারা বলাবলি করিল, "মিষ্টার বার্ড নিষ্কলঙ্ক, দেবচরিত্র—মেমসাহেব, যুবতীকে স্বামীর প্রেমাসক্ত বিবেচনা করিয়া অকারণ হত্যা করিয়াছেন।"

সে যাই হউক, মিত্রা সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না—স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তখন পুলিস আসর জমকাইয়া বসিয়াছে। মিষ্টার বার্ড কিন্তু নীরব। পুলিসের সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—"আমাকে ফাটকে লইয়া চল, আমি খুন করিয়াছি।" পুলিস-সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন খুন করিয়াছেন?" বার্ড সাহেব সে প্রশ্নের কোনই উত্তর দিলেন না। না দিলেও পুলিস-সাহেবের মনে ধারণা জন্মিল যে, মেম সাহেবই প্রকৃত হত্যাকারী—মিষ্টার বার্ড স্ত্রীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। তাই তিনি বার্ডকে ছাড়িয়া তাঁহার স্ত্রীকে আসামী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না।

এমন সময় জজ-পত্নী পুষ্প তথায় উপস্থিত হইলেন। পুলিস-সাহেব সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু মিষ্টার বার্ড উঠিলেন না—একটি কথাও কহিলেন না—নীরবে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। পুষ্প ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল, এবং স্নেহ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

সাহেব পুষ্পের পানে চাহিয়া দেখিলেন না—একটা কথাও কহিলেন না; পুলিস-সাহেবকে শুধু বলিলেন, "আমাকে যদি এখনি জেলখানায় না লইয়া যাও, আমি আত্মহত্যা করিব।"

পুলিস-সাহেব মোকদ্দমা রুজু করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীকে প্রেরণ করিলেন। কলিকাতা হইতে এক জন ব্যারিষ্টার আসিয়া আসামীর পক্ষ-সমর্থন করিতে লাগিল। কে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছে, লোকে তা জানিল না; বলাবলি করিল,—"এত বড় কৌঁসিল তাহাদের দেশে পূর্ব্বে আর কখন আসে নাই।" কৌঁসিল যত বড়ই হউন না কেন, তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। করিবার যো কি? আসামী আদালতগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া যখন ব্যারিষ্টারকে বলিল,—"কে তুমি? আমি তোমাকে চাই না—তুমি দূর হও," তখন ব্যারিষ্টার সাহেব আর কি করিতে পারেন? আবার যখন সাক্ষীরা হলপ লইয়া বলিতে লাগিল, "বার্ড সাহেব খুন করেন নাই—মেম সাহেব খুন করিয়াছেন," তখন আসামী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা! আমি খুন করেছি।" মাজিষ্ট্রেট নিরুপায় হইয়া মোকদ্দমা দায়রা-সোপর্দ্দ করিলেন।

দায়রার জজ মিট্রা সাহেবের কাছে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। কলিকাতার বড় কৌঁসিল, জেলার সমস্ত উকীল, আসামীর পক্ষ-সমর্থন করিতে লাগিলেন। কৌঁসিল বলিলেন,—"আসামী নিরপরাধ।" আসামী তদুত্তরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "না, আমি নিরপরাধ নই—আমি হত্যা করেছি।" কৌঁসিল বলিলেন,—"আসামী ক্ষেপিয়াছেন।" ডাক্তার সাহেব সাক্ষ্য দিলেন,—"আসামী ক্ষেপেন নাই—সম্পূর্ণ সজ্ঞান।"

কিন্তু আসামীর উক্তি-সমর্থক কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ঘটনা প্রমাণ করিতে একটা সাক্ষীও কাঠগড়ায় দাঁড়াইল না; এমন কোন ঘটনা পুলিস উল্লেখ করিতে পারিল না, যদ্দ্বারা আসামীকে এই হত্যাব্যাপারে জড়িত করা যাইতে পারে। আসামীর উক্তি ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে আর কিছুই নাই। এ অবস্থায় আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না; তাহাকে ছাড়িয়াও দেওয়া যাইতে পারে না। এক পক্ষের উকীল প্রার্থনা করিলেন, আসামীকে ছাড়িয়া দেও; অপরপক্ষের উকীল হাঁকিলেন, কিছুতেই নয়। বিচারক পরদিন রায় দিবেন জানাইলেন। আসামী জামীনে মুক্ত রহিলেন।

অত্যল্পকালের মধ্যে মোকদ্দমা শেষ হইল। কিন্তু শেষ হইবার পূর্ব্বে আকস্মিক এক অভিনব ব্যাপার ঘটিল;—পুষ্প সহসা আদালতকক্ষে প্রবেশ করিয়া পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়কে কহিল, "আমি হত্যাকারী—সাহেব ন'ন।"

পুলিস, উকীল, দর্শক সকলেই হতভম্ব হইল। কে কি করিবে বা বলিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অনেকে জজের পানে চাহিলেন। তাঁহার মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, যেন বিরক্তির পরিবর্ত্তে আনন্দই তাঁহার নয়নে প্রতিভাত হইতেছিল।

পুষ্প কহিল, "আমি আপনাকে দেখাইয়া দিব, কোন্ স্থানে কোন্ অস্ত্র দ্বারা মেয়েটাকে আমি হত্যা করেছি। আর আমি প্রমাণ ক'রে দেব, সাহেব ঘটনার সময় চা-বাগানে ছিলেন—কুঠীতে নয়। বাগানের কুলীদের, কুঠীর নকরদের জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন, সাহেব আমাকে বাঁচাবার জন্যে নিজের ঘাড়ে অপরাধ নিচ্ছেন। আসুন—দেখবেন আসুন—সাহেবকে ছেড়ে দিন—আমাকে ধরুন—"

বুদ্ধিমান্ ইন্সপেক্টারের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সাহেবকে বাঁচাইবার জন্য জজ-পত্নী স্বীয় স্কন্ধে অপরাধের বোঝা তুলিয়া লইতেছেন। তিনি জানিতেন যে, পুষ্প, সাহেবের গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট মিসেস্ মিট্রা অনেক বিষয়ে ঋণী। জানিলে কি হইবে? তিনি তদন্ত করিতে বাধ্য। কর্ম্মচারী সম্মান সহকারে কহিলেন, "আসুন।"

"আগে সাহেবকে ছেড়ে দিন।"

"তিনি ত ছাড়াই আছেন।"

পুষ্প একবার সাহেবের পানে চাহিয়া দেখিল, ভাবে বুঝিল, তিনি মুক্ত। তখন সে আনন্দচিত্তে পুলিস-কর্ম্মচারীর অনুসরণ করিল।

সাহেবের কুঠী সদর ষ্টেশন হইতে দশ বারো মাইল। অত্যল্পকালমধ্যে মোটরে তাঁহারা সাহেবের কুঠীতে আসিলেন। পুষ্প যে স্থান নির্দ্দেশ করিল, তথায় রক্তের দাগ দেখা গেল। কিন্তু রক্তটা টাট্‌কা বলিয়া কর্ম্মচারী মনে করিলেন। তার পর পুষ্প অস্ত্র আনিয়া দেখাইল। সেখানা নিকটেই এক বৃক্ষনিম্নে লুক্কায়িত ছিল। কর্ম্মচারী দেখিলেন, অস্ত্রখানা নূতন, কিন্তু তাহাতে রক্তচিহ্ন। তিনি কহিলেন, "আপনার জামাতেও রক্তচিহ্ন দেখ্‌ছি।"

"হাঁ, এই জামা পরেই আমি মেয়েটাকে খুন করি।"

"তা হ'লে একমাসের মধ্যে জামাটাকে কাচ্‌তে দেন নি?"

পুষ্প তাহার ভুল বুঝিল। কি উত্তর দিবে, স্থির করিতে না পারিয়া নীরব রহিল। কর্ম্মচারী বলিলেন,

"আপনার জামার হাতাটা দয়া ক'রে একটু উঠান ত।"

হাতা উঠাইতেই দেখা গেল, বাহুতে একটা বড় গোছের ক্ষত-চিহ্ন। তখনও একটু আধটু রক্ত পড়িতেছে।

কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোরাখানা কোন্ দোকান হ'তে কিনেছেন ?"

পুষ্প অকপটে তাহা বলিল। কর্ম্মচারী একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সকালেই অস্ত্রখানা কিনে থাকবেন ?"

পুষ্প এ প্রশ্নের উত্তর করিতে গিয়া বুঝিল, সে কত বড় ভুল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল, আজ হয় ত সাহেবের প্রতি ফাঁসির হুকুম হইবে। তাই সাহেবকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় স্কন্ধে এই অপরাধের বোঝা লইয়াছিল এবং নিজে যে অপরাধী, তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটা ঘটনার সৃষ্টি করিয়াছিল। পুলিসকে ঠকাইতে গিয়া নিজেই ঠকিল।

উভয়ে সদরে ফিরিলেন। ক্ষত পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "ক্ষত নূতন, পুরাতন নহে।" দোকানদার বলিল, সেই দিন প্রাতে ছোরা ক্রীত হইয়াছিল। অতঃপর কর্ম্মচারী ব্যক্তিগত জামীনে পুষ্পকে ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে কুঠীতে রাখিয়া আসিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে পুষ্প ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে হাজির হইল। সাহেব পুষ্পকে এজলাসের উপর নিজের পাশে বসাইয়া কহিলেন, "আমি মোকর্দ্দমার কথা সব শুনেছি—আপনাকে আমি মুক্তি দিলাম।"

পু,—আমি মুক্তি চাই না। অপরাধীকে মুক্তি দিয়া নিরপরাধকে শাস্তি দেওয়া কি আপনার পক্ষে সুবিচার হ'ল ?

ম্যা,—নিরপরাধও মুক্তিলাভ করেছেন।

পু,—কই তিনি ? কই আমার বাবা ?

কথা শেষ হইতে না হইতে বার্ড সাহেব আদালত-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ও পুষ্পকে লইয়া খাসকামরায় উঠিয়া গেলেন। উভয়কে বসাইয়া সাহেব বলিলেন, "আজ আমার পক্ষে বড় আনন্দের দিন—আমি আপনাদের উভয়কে অভিনন্দিত করিতেছি।"

পুষ্প বার্ড সাহেবের চরণতলে বসিয়া সাহেবকে প্রণাম করিল ; পরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বার্ড সাহেব কহিলেন, "আর কেন কান্না মা, আমি ত মুক্ত হয়েছি।"

"আমি ভাবছি বাবা, যে ধর্ম্ম এই আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দেয়, সে ধর্ম্ম না জানি কত বড়।"

"আর আমি ভাবছি মা, যে দেশ তোমার মত কন্যা প্রসব করে, সে দেশ জগতের বরণীয় স্বর্গতুল্য।"

আমি

ছি ছি ছি! আমি করছি কি? আমার এই নবীন বয়স, এত রূপ বৃথা যাইতে বসিল! আমি কেন যৌবন ভোগ করি না—রূপ জগৎকে দেখাই না, তা হ'লে ত আমার সকলি সার্থক হ'ল; মাথার উপর মণিমুক্তাখচিতচন্দ্রাতপতুল্য তারকাবিভূষিত নীলাকাশ—পদনিম্নে বাসনাপ্রবাহতুল্যা পূর্ণযৌবনা জাহ্নবী; মধ্যে আমি,—বিকসিত যৌবনের চাঞ্চল্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া মধ্যে আমি। আকাশ গরবে ফুলিয়া উঠিয়া, জগৎকে আপন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছে—ভাগীরথী যৌবন-চাঞ্চল্যে অধীর হইয়া শস্যশষ্পসমাচ্ছন্ন-ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে আমি কেন নীরব থাকি? আমি কেন রূপের তরঙ্গে জগৎকে প্লাবিত না করি?—বাসনার প্রবাহ ছুটাইয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের জ্বালা পরিতৃপ্ত না করি?

জ্যোৎস্না-পুলকিত রজনী,—আকাশ, পৃথিবী হাসিয়া উঠিতেছে। যেখানে যা' কিছু সৌন্দর্য্য লুকান ছিল, সব অন্ধকার ছাড়িয়া জগতের নয়নসমক্ষে আসিয়া দাড়াইয়াছে। কেহ ঘোমটা টানে নাই, সঙ্কোচ করে নাই,—রূপের ডালা মাথায় করিয়া গরবে ফুলিয়া হাসিয়া উঠিযাছে! আমিও কেন হাসি না?—ঘোম্‌টা টানিয়া ফেলিয়া, জগতের নয়নসমক্ষে রূপের ডালা মাথায় করিয়া দাঁড়াই না কেন?

তোমরা বলিবে, আমি হিন্দুকুলবধূ—বালবিধবা,—আমাকে পরদা ছাড়িয়া জগতের সমক্ষে দাঁড়াইতে নাই—রাজহংসীর ন্যায় বাসনার প্রবাহে দেহ ভাসাইয়া ছুটিতে নাই। কেন নাই? তুমি পার, আমি পারি না? তুমি শাস্ত্রকার, বিপত্নীক হইলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ কর; গ্রহণ করিয়াও অন্য রমণীতে আসক্ত হও। এই কি তোমার সংযম? সংযমী না হইয়া সংযম শিখাইতে চাও? ছি ছি! বৃথা তোমার হবিষ্যান্ন, বৃথা তোমার শিক্ষাদান! আমি তোমার কথা শুনিব না।

কেনই বা শুনিব? ভগবান্ আমাকে রূপযৌবনৈশ্বর্য্য, ভোগ-স্পৃহা, লালসা সকলি দিয়াছেন, তবে কেন আমি হবিষ্যান্ন খাইয়া, কম্বলাসনে একাকিনী শুইয়া দরিদ্র ভিক্ষুকের ন্যায় দিনযাপন করি? যা'র যৌবন গিয়াছে, সে হরিনামের মালা হাতে করুক—যা'র রূপ নাই, সে মুখের উপর ঘোম্‌টা টানুক—যে দরিদ্র, সে কদর্য্য অন্ন খাইয়া দেহ পুষ্ট করুক। আমি কেন করিব? আমার কিসের অভাব? আমি ইচ্ছা করিলে জগতের আহার্য্য একত্র করিয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতে পারি—যৌবন-নদে তরঙ্গ ছুটাইয়া আকুল লালসানল শান্ত করিতে পারি। তবে কেন আমি অসংযমীর মুখে সংযমের শিক্ষা লইয়া আজীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব?

আবার সেই কথা! পরোপকার! বারম্বার সেই উপদেশ দিতেছ? কেন আমি তা' করিব? তোমার উপকারে আমার লাভ কি? তোমার মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত—তুমি অবিবাহিতা কন্যা লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত, আমার তা'তে কি? তোমার মা স্বর্গে গেল বা না গেল, তোমার অরক্ষণীয়া কন্যা পাত্রস্থা হ'ল বা না হ'ল, আমার তা'তে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? হাঁসপাতালের অভাবে ঔষধ না পাইয়া তোমরা দলে দলে মরিয়া যাইতেছ—এই দুর্ভিক্ষের দিনে এক মুঠা অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া পালে পালে মানুষগুলা মরিতেছে; আমি মনে করিলে আমার অগাধ ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে দেশে দেশে হাঁসপাতাল স্থাপন করিতে পারি—গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র খুলিতে পারি। কিন্তু কেন তা' করিব? তোমরা বাঁচ বা মর, তা'তে আমার লাভালাভ কি? যাহারা রুগ্ন, পীড়িত—যাহাদের অর্থ নাই, তাহাদের মরিয়া যাওয়াই উচিত,—আমি তোমাদের জন্য কিছু করিতে পারিব না।

জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নিশি। আমার ফুলের বাগান হাসিয়া উঠিয়াছে। আমি সেই পুষ্পোদ্যানমধ্যে মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত বেদীর উপর শুইয়া ফুলের শোভা দেখিতে লাগিলাম। কত রকমের কত ফুল। কোনটা সুইটব্রায়ার, কোনটা বা পলানিঁরো, কোনটা মালতী, কোনটা বা মাধবী। কোথাও বেলফুল ফুটিয়াছে—কোথাও বা বকুল ফুটিয়াছে। কোন স্থানে রজনীগন্ধা—কোন স্থানে চন্দ্রমল্লিকা, কোথাও যূঁই—কোথাও চাঁপা; এখানে বৌপাগ্‌লা—সেখানে সেফালিকা; কোথাও জেস্‌মিন—কোথাও মল্লিকা ফুটিয়া উঠিয়া গন্ধ-রাশি বিস্তার করিতেছে। আমি সেই সুগন্ধামোদিত,

মলয়ানিল-সেবিত, নক্ষত্রপ্রফুল্ল নীলাকাশতলে শুইয়া আমার বাসনামুখরিত হৃদয়ের কোমল আরাব শুনিতে লাগিলাম।

আমার মনে হইতে লাগিল, যেন কে নিশীথিনীর কোমল অঙ্কে শুইয়া দূর হইতে গাহিতেছে—

স্বদূর আঁখির আড়ে কে গায় বিষাদ-গান।
স্মৃতির তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিয়া আসিছে তান।
না হ'তে যৌবনোদ্গত
জীবনের সাধ যত
বায়ুমুখে ফুল মত অকালে দিতেছে প্রাণ;
জীবন ফুরায়ে গেল শুনিতে শুনিতে বিষাদ-গান।

গান শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইল, আমি যেন ঘুমঘোরে—অথবা স্বপ্নে, ঠিক তা' বলিতে পারি না—আমি যেন আমার দেহ ছাড়িয়া কোন এক অপরিচিত দেশে * আসিয়া পড়িয়াছি। দেহ ছাড়িয়া বেশী দূর আসি নাই—বাগানের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; অথচ আমার ধারণা হইল, আমি যেন কোন এক অজ্ঞাতরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। দেখিলাম, অদূরে বেদীর উপর আমার দেহ—রত্নালঙ্কার-বিভূষিত পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে; দাসীরা চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আমার খোলস বা আবরণটাকে বীজন করিতেছে। আমি মনে মনে একটু হাসিলাম।

আমি বিস্মিত অন্তরে শৃঙ্খলমুক্তা হরিণীর ন্যায় উদ্যানমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পলনিঁরোর কাছে গিয়া দেখি, তার ভিতর একটা বিবস্ত্রা যুবতী বসিয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?"

যুবতী নিরলঙ্কারা; উত্তর করিল, "আমি ক্লিওপেট্রা; রূপ ও ঐশ্বর্য্যে একদিন আমি ভুবন-বিখ্যাত ছিলাম। বাসনার তরঙ্গে গা ভাসাইয়া আজীবন প্রবৃত্তির সেবা করিলাম; কিন্তু কখন তৃপ্তি বা শান্তি পাইলাম না। এখন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "মিথ্যা কথা! ভোগে নিঃসন্দেহ তৃপ্তি।"

আমি সেখানে আর দাঁড়াইলাম না—বকুলের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, পাতার দল কাণে গুঁজিয়া পুরুষ মানুষ ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কে?"

সে বলিল, "আমি পত্রিকা-সম্পাদক। আমার মাসিক প্রকাশের কোন ত্রুটি ছিল না—প্রবন্ধ নিঃসরণেরও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু আমার গ্রাহক জুটিল না। আমি নিজে লেখাপড়ার বড় একটা ধার ধারি না। তা' সংসারে পাঁচজন ত আছে; তবে আমার ব্যবসায়ের ক্ষতি হয় কেন? আমার বাসনা ছিল, পত্রিকাখানা কোন রকমে চালাইয়া অর্থ ও নাম করিব। কিন্তু আমার কপালগুণে দেনার জ্বালায় কাগজখানা বিক্রীত হইয়া গেল। হায়, আমার অর্থ-সঞ্চয় হইল না—যশও হইল না, আমি শুধু আকুল বাসনারাশি হৃদয়ে ধরিয়া ছুটাছুটি করিয়া মরিলাম।"

সম্পাদকের নিরাশ হৃদয়ের ব্যথা শুনিতে শুনিতে আমি রজনীগন্ধার কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, একটা অন্ধ, দন্তহীন পুরুষমানুষ হামা-গুড়ি দিয়া গাছের তলায় বেড়াইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সে একটা বড় চাকুরে ছিল; কখন কলিকাতায়, কখন বা মফঃস্বলে ফুটিত। উন্নতির আশায় প্রলুব্ধ হইয়া দুষ্টের পালন শিষ্টের দমন করিয়া আসিয়াছে। চোখ বুজিয়া ন্যায়কে দমন করিত বলিয়া সে চক্ষু হারাইয়াছে—ফলের আশায় গাছের তলায় তলায় বেড়াইত বলিয়া পা হারাইয়াছে। এখনও—এই বিষহীন অবস্থাতেও আশা ছাড়িতে পারে নাই, তাই আজও ফুল বা ফলের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

এ সব জীবকে দূরে রাখিয়া জেস্‌মিনের কাছে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, সাইলক্‌-জু নিক্তি হস্তে সুদ মাপিতেছেন, আর মৃদুস্বরে এক দুই তিন গণনা করিয়া যাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

উত্তর হইল, "আমি—এক, দুই, তিন—সাইলক্‌—এক, দুই—"

প্রশ্ন। কি গণিতেছ?

উত্তর। সুদ—এক, দুই, তিন।

প্রশ্ন। কত টাকা করিয়াছ?

সাইলক্‌ উত্তর না দিয়া একটু হাসিল মাত্র। আমি তাহার হাসির অর্থ বুঝিলাম। বুঝিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলাম এবং সেফালিকার তলায় গিয়া দাঁড়াইলাম। সেফালিকা-গিন্নী হাসিয়াই আকুল। কিন্তু সে হাসির অর্থ বুঝিতে না বুঝিতে আমাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল। কে আমায়—কোন এক প্রবল শক্তি আমায় টানিয়া লইয়া চলিল। যে স্থানে আমার দেহ পড়িয়া ছিল, সে স্থানে বিদ্যুদ্বেগে আসিলাম। দেখিলাম—যাহাকে আমি সুখের উপকরণ বলিয়া মনে করি, সেই নবীন যুবা পুরুষ আমার পতিত দেহটা ঠেলিয়া আমাকে জাগরিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

* Astral world.

সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখি, মাথার উপর নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ। চারিদিকে গাছ-পালা। সাইলক্ বা ক্লিওপেট্রা কাহাকেও দেখিলাম না। পদতলে এক জন কে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে চিনিলাম,—সে আমার মনোমোহন নবীন যুবা পুরুষ। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে বেদীর উপর উঠিয়া বসিলাম।

পরমুহূর্ত্তে বন্দুকের গুলী আসিয়া আমার ললাট ভেদ করিল। আমি হতচৈতন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলাম।

ক্ষণপরে একটু উর্দ্ধে উঠিয়া দেখি, আমার রক্তাক্ত দেহ ধরাপৃষ্ঠে লুটাইতেছে; আমার জনৈক আত্মীয় বন্দুকহস্তে নিকটে দণ্ডায়মান। দুই জন ভৃত্যের সাহায্যে আমার দেহ লুক্কায়িত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। উদ্যানের একাংশে একটা গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে দেহ নিক্ষেপ করিবার আয়োজন হইতেছিল। আমি ভাবিলাম, এইবার দেহের ভিতর ফিরিয়া যাই। চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। —যেন, কোন এক অনিবার্য্য কারণে, যেন কোন এক অলঙ্ঘনীয় শক্তিপ্রভাবে আমি বিফলমনোরথ হইলাম। যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম—যখন বেদীর উপর দেহ রক্ষা করিয়া উদ্যানময় পরিভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন ত বিনা চেষ্টাতেই দেহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়াছিলাম। এখন পারিতেছি না কেন? এখন কি দেহের মৃত্যু ঘটিয়াছে? মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়াই কি আমি পুনরায় দেহাবলম্বন করিতে পারিতেছি না? নিদ্রা ও মৃত্যুতে কি এই প্রভেদ? সুপ্তাবস্থায় আমার সহিত দেহ যে সামান্য সূত্রে আবদ্ধ ছিল, সে সূত্রটুকু বুঝি এখন কাটিয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া নিদ্রা ও মৃত্যুতে আর ত কোন প্রভেদ দেখি না।

আমি সচকিতে দেখিলাম, আমার দেহ প্রোথিত না করিয়াই আমার আত্মীয় সভয়ে পলায়ন করিল। কারণটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, আমার দেহের অনুরূপ আর একটা দেহ * আমার পরিত্যক্ত দেহের সন্নিকটে শূন্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বুঝিলাম, এই নবদেহটা বায়বীয়; কিন্তু দেখিতে ঠিক আমার পার্থিব দেহের মত। উভয় দেহের ললাট রক্তাক্ত—বন্দুকের গুলীতে আহত। বিস্মিত নয়নে দেখিলাম, এই নবদেহটা বায়ু-হিল্লোলে ক্রমে মিলাইয়া গেল। কিন্তু আমার আত্মীয় আর ফিরিয়া আসিল না,—'ভূত' মনে করিয়া 'রাম' 'রাম' করিতে করিতে সভয়ে পলাইল।

* Etheric double.

কোথায় চলিলাম?

দশদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সীমাহীন বারিধির উপর ক্ষুদ্র নৌকায় ভাসিয়া যাইতেছি। কোথায় যাইতেছি, জানি না,—কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, জানি না। সম্মুখে, পাশে, পিছনে কেবল স্তূপাকার অন্ধকার; পদনিম্নে—অপরিজ্ঞাত অনন্ত জলরাশি।

আমার নৌকায় আমি একা; মাঝি নাই, মাল্লা নাই, আমি একা। আমার পিছনে কামিনী বাবুর নৌকা, তাহাতে তিনিও একা। আমার আগে তারার নৌকা, তা'র আগে হরির নৌকা। আমরা চারিজন চারিখানা নৌকায় অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছি। কাহার ডাকে, কাহার তাড়নায় যাইতেছি, জানি না; কেবল বুঝিতেছি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট পথে আমরা অগ্রসর হইতেছি।

এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠিল। আমরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু হরি চক্ষু খুলিল না, চীৎকার করিল না সে বুঝিল না যে, ঝড় উঠিয়াছে। সে বুঝিল না যে, ঝড়ের আঘাতে ক্ষুদ্র তরী অচিরে ডুবিয়া যাইবে।

অন্ধকারে নৌকা ডুবিল। আমরাও ডুবিলাম। জীবন রক্ষার্থ যে চেষ্টা করিলাম, তাহা বৃথা হইল। অচিরে আমার জীবাত্মা একটা স্থূলদেহ অবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিল। আমার বায়বীয় বা আতিবাহিক শরীর অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তোমরা যাহাকে ভূতপ্রেত বল, আমি তখন তাহাই হইলাম। আমার কথা পরে হইবে; এক্ষণে অন্যান্যের কথা বলি।

দেখিলাম, কামিনী বাবুর জীবাত্মা আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি উর্দ্ধে উঠিতেছ না কেন?"

সে বলিল, "আমার উর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা নাই —আমায কীটি-যোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কামিনী বাবু, তুমি কীট-যোনি প্রাপ্ত হইবে কেন?"

কামিনী উত্তর করিল, "আমি মহাপাপিষ্ঠ ছিলাম —কখন পুণ্য কার্য্য করি নাই। তাই আমার এ অবনতি ঘটিয়াছে। জানি না, কত যুগ-যুগান্তরের পর আবার মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হইব।"

২

ঘৃণার সহিত সে দিক্ হইতে ফিরিলাম। আগু হইয়া দেখিলাম, তারার জীবাত্মা বায়বীয জগতের কোন বস্তু অবলম্বন করিযা তারার শরীর ত্যাগ করিয়াছে। তারার এই আতিবাহিক দেহ ক্রমে অন্তরীক্ষে উঠিতে লাগিল। তাহার এই দেহ ও আমার বাযবীয দেহ ভিন্ন জাতীয়। দেখিতে দেখিতে তারার আতিবাহিক দেহ সূর্য্যকিরণে আকৃষ্ট হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তারা, আমি তোমার মত উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেছি না কেন? তুমি কোথায় যাইতেছ?"

তারা বলিল, "ভাই, সকলই কর্ম্মফল। আমি যাগ-যজ্ঞ করিয়াছিলাম; বাপী, কূপ, তড়াগাদি উৎসর্গ করিয়াছিলাম, পরের উপকার সাধ্যমত করিয়াছিলাম, তাই আমি স্বর্গে যাইতেছি।"

আমি। কত দিনে সেখানে যাওয়া যায়?

তারা। এক বৎসরে।

আমি। তুমি যেখানে যাইতেছ, সেখানে গিযা কি করিবে?

তারা। সেই লোকের শরীর ধারণ করিব।

আমি। অনন্তকাল কি সেখানে থাকিবে?

তারা। না, ভোগান্তে আবার এই পৃথিবীতে ফিরিব।

আমি। কেমন করিয়া আবার ফিরিবে?

তারা। বৃষ্টি-ধারার সাহায্যে।

আমি। ফিরিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিবে?

তারা। হাঁ, জন্মগ্রহণ করিতে আবার লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। সম্ভবতঃ সেবার অপেক্ষাকৃত ভাল জন্ম পরিগ্রহ করিব।

আমি। তুমি ধার্ম্মিক ছিলে, কেন তোমার মুক্তি ঘটিল না?

তারা। মুক্তি কাহাকে বলিতেছ?

আমি। জীবাত্মার মুক্তি।

তারা। সেটা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয।

আমি। সম্ভব নয কেন?

তারা। জীবাত্মা কি, তা' জান?

আমি। সূক্ষ্মদেহ ও চৈতন্যের সংযোগ।

তারা। বেশ; যদি জড় ও চৈতন্য স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে মুক্তি সম্ভব। যেহেতু পুনঃস্বাতন্ত্রী মুক্তি।

আমি। স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হয নাই কি?

তারা। চেতন অচেতন, স্থাবর অস্থাবর সকল পদার্থেই যখন জড় ও চৈতন্য একত্র ও অবিমুক্ত অবস্থায় থাকিতে দেখিতেছ, তখন কেমন করিয়া বলিব, মনুষ্যদেহে জড় ও চৈতন্য স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে?—ভাই, আর থাকিতে পারিতেছি না— চলিলাম।

৩

তারা চলিয়া গেল। হরির পানে ফিরিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, তাহার জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "হরি, তুমি কোথায যাইতেছ?" হরি কোনও উত্তর করিল না। তদ্দৃষ্টে তারা দূর হইতে বলিল, "হরি সাধনা-বলে বাসনা ত্যাগ করিয়া অনন্তকালের জন্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না।"

আমি। এই কি মুক্তি?

তারা। হাঁ, এই মুক্তি। এ মুক্তিতে সুখদুঃখ ও ভয জ্ঞান থাকে না।

আমি। কাহার পক্ষে এ মুক্তি সম্ভব?

তারা। যাহারা জ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞ, সাধক। যাঁহারা সকল বাসনা, সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে তন্ময হইয়াছেন।

আমি। বেদব্যাস, শঙ্করাচার্য্যের এরূপ মুক্তি ঘটিয়াছিল কি?

তারা। সম্ভবত ঘটে নাই; কারণ, তাঁহাদের ত্রিপুটি লয হয নাই। যাঁহাদের ত্রিপুটি লয হয, তাঁহাদের লিখিবার বা উপদেশ দিবার সম্ভাবনা থাকে না।

৪

সকলে চলিযা গেল। আমি অন্তরীক্ষে ভূত-প্রেতরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দেখিলাম,

অন্তরীক্ষে অসংখ্য, অগণ্য আতিবাহিক দেহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার বাড়ী বীরভূমে ছিল। আমার কয়েকটি পুত্র-কন্যা ছিল। বিষয়কর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া পরের অনিষ্ট করিয়াছি, উপকারও করিয়াছি; কাহারও লইয়াছি, কাহাকে দানও করিয়াছি। অন্ধ-আতুরকে কখন কখন পয়সা দিতাম, ঠাকুর-দেবতা দেখিলে প্রণাম করিতাম। আবার এ দিকে একটু অন্যায় করিয়া দু'পয়সা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাতেও বিরত হইতাম না।

আমার শ্রাদ্ধ এবং এক বৎসরের পর সপিণ্ডকরণ হইয়া গেল। পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু গর্ভাশ্রয় না পাইলে জন্মিতে পারি না। আমার ইন্দ্রিয়াদি আছে,—অথচ আমি সংসারে জন্মিতে পারিতেছি না। জন্মিতে না পারিয়া আমার যাতনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে আমার আগেকার জ্যেষ্ঠা কন্যার গর্ভাশ্রয় করিয়া আমি সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলাম।

আমার দুই স্ত্রী

ঘরে চলেছি। পথ অনেকটা; তা'ও আবার সুগম নয়। ঘন-বৃক্ষাচ্ছাদিত কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সুক্ষ্ম রাস্তা। পথে নিয়তই লোক চলা-ফেরা করে, তবু পথের দাগ নাই। কখন পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া দুরারোহ পর্ব্বতের শিখর-দেশে উঠিয়াছে, কখন বা মকর-কুম্ভীর-সমাকুল তরঙ্গ-বিক্ষেপী নদী-হৃদয়ে মিশিয়াছে। পথমধ্যে কোথাও বা পান্থশালা-আবার কোথাও বা অনন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি। কখন ব্যাঘ্র-ভল্লুকের গর্জ্জন, কখন বা প্রাণ-মুগ্ধকর দূরাগত মধুর সঙ্গীত! কখন ভয়, নিরানন্দ; কখন বা উৎসাহ, আশা। এইরূপে পথ অতিক্রম করিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছি।

সঙ্গে দুই স্ত্রী। তা'রা সঙ্গ ছাড়ে না। যেখানে যাই, তা'রা সঙ্গে যায়। বড় বউ বড় গম্ভীর। তা'কে তত ভাল লাগে না। সময়ে অসময়ে গম্ভীর মুখে কেবল উপদেশ দেয়। তা'কে ভালবাসি, ভয়ও করি। ছোট বউএর কথা স্বতন্ত্র। সে হাস্যমুখী, মনোমোহিনী; কিন্তু বড় বউয়ের প্রতি ব্যবহারে একটু যেন কুটিল, একটু যেন গরল-বর্ষিণী। বড় বউ যখন আমাকে কোন উপদেশ দিতে আসে, তখন ছোট বউ জ্বালাময়ী তীব্র ভাষায় বেশ দু'কথা তাহাকে শুনাইয়া দেয়। বড় বউ সংযতভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তর করে। ছোট আরও গর্জ্জিয়া উঠে। তখন আমাকে মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতে হয়। কখন বড় বউএর কথা শুনি, কখন বা ছোট বউএর মতানুবর্ত্তী হইয়া চলি। তবে, ছোট বউএর কথাটা অধিকাংশ সময় প্রবল থাকে।

ঝগড়া মিটাইতে মিটাইতে আমার সময় যায়; পথ যে বড় একটা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছি, তা' নয়। অতিক্রম করা দূরে থাকুক, কখন কখন ঘুরিয়া ফিরিয়া পিছাইয়া যাইতেছি। পথ আমার জানা নাই; যে পথে বড় বউ, ছোট বউ আমায় লইয়া যাইতেছে, সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছি।

একদিন ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক পান্থ-শালায় উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাঁগা, কোন্ পথ ধরিয়া যাইব?"

গৃহস্বামী। কোথায় যা'বে?

আমি। মুক্তিপুর।

গৃহ। পথ ভুল করিয়াছ।

আমি। তবে কোন্ পথ ধরিব?

গৃহ। পথ ঠিক আমি জানি না; তবে একজন জানে।

আমি। সে কোথায়?

গৃহ। নিকটে এক কূপমধ্যে পড়িয়া আছে। তাহাকে উদ্ধার করিয়া পথ জানিয়া লইতে পার।

শুনিয়া বড় স্ত্রী বলিল, "পথ জানিতে পার বা না পার, আগে তাহাকে উদ্ধার কর।" ছোট বউ অমনি গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল, "তোর যেমন কথা! উদ্ধার বলিলেই অমনি উদ্ধার করা হয়? সে একটা গভীর কূপের মধ্যে প'ড়ে আছে—কে আপনার জীবন বিপন্ন ক'রে কূপের ভিতর নামিবে?"

আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাবছ কি?"

আমি সে কথায় কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কূপের ভিতর নামিবার কোন পথ বা উপায় আছে?"

গৃহ। পথ থাকা দূরে থাক্, কূপের তলাও দেখা যায় না।

ছোট বউ আরও যো পাইল। সে গলা মোটা করিয়া বলিল, "শুন্‌লি? এখন ইচ্ছা হয়, স্বামীকে যমের মুখে দি গে। পরের উপকার কর্‌তে গিয়ে নিজের জান্‌টা দিতে হবে?"

ছোট বউএর কথাটা আমার মনে লাগিল। আমি সেখানে আর দাঁড়াইলাম না; পান্থশালা ছাড়িয়া গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। সেখানে কোন পথ নাই। আপন মনে জিজ্ঞাসা করিলাম, "পথ ত দেখি না,—এক্ষণে কোন্ দিকে যাই?"

ছোট বউ কোমর বাঁধিয়া বলিল, "আমি তোমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি—ভয় কি?"

বড় বউ অভিমানভরে মনে মনে গর্জ্জিতেছিল। সে বলিল,—"যে দিকে যাইতেছ, সে দিকে পথ কোথা? ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পান্থশালায় যাইতে চাও ত ছোট বউএর নির্দ্দেশিত পথ ধর।"

বড় বউকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কোন্ পথে যাইতে বল?"

বড় বউ পাশের একটা পথ নির্দ্দেশ করিল। পথটা কণ্টকাকীর্ণ, দুরারোহ পর্ব্বতচূড়ার উপর দিয়া গিয়াছে। আমি ভীত হইয়া ছোট বউএর নির্দ্দেশিত পথ পানে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া পুষ্পবনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আমি মুগ্ধ হইয়া সেই পথ ধরিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার ভ্রম দেখিতে পাইলাম—আমি আবার সেই পান্থশালায় আসিয়া উপনীত হইলাম।

ছোট বউএর উপর রাগ করিয়া এবার বড় বউ-এর নির্দ্দেশিত পথ ধরিলাম। কিন্তু পাহাড়ে উঠিতে সাহস হইল না; পর্ব্বত-পদতলে অবসন্ন-দেহে বসিয়া পড়িলাম। ছোট বউ বলিল, "কেমন, এইবার পাহাড়ে উঠ। বড় সোজা রাস্তা, নয়?"

বড় বউ উত্তর করিল, "রাস্তা সোজা নয়, তা' আমিও জানি। কিন্তু, যখন দু'চারটা পাহাড়, পাঁচ সাতটা জঙ্গল, দশবিশটা নদী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে, তখন সম্মুখে সুন্দর, সুগম রাস্তা দেখ্‌তে পা'বে।"

ছোট বউ বলিল, "এই সব পাহাড়, নদী পার হ'লে তবে ত ভাল রাস্তা পাব? কাজ নেই আমার ভাল রাস্তায়, প্রাণটা থাকলে অনেক ভাল রাস্তা জুটবে।"

বড় বউ বলিল, "অনেক দূরে থাকুক, একটা রাস্তাও জুটিবে না। যতদিন না বাসনা-কামনা বর্জ্জন করিতে শিখিবে—ভয়-দুঃখের অতীত হইতে পারিবে, ততদিন মুক্তিপুরের নিকটেও যাইতে পারিবে না।"

ছোট বউ বলিল, "তোর ও-সব কট্‌মটে কথা রেখে দে। এখন আমার ক্ষিদে পেয়েছে—খাবার উপায় দেখ্।"

এমন সময়ে সাম্‌নে একটা খরগোষ দেখিতে পাইলাম। ছোট বউ বলিল,—"আমাকে ঐ খরগোষটা মেরে দেও; আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

আমি তৎক্ষণাৎ ধনুকে তীর যোজনা করিলাম। বড় বউ আমার হাত চাপিয়া ধরিল; বলিল, "ছিঃ, প্রাণি-হত্যা করিও না।"

ছোট বউ আর কোথায় আছে! ঝড়বেগে চামুণ্ডা-মূর্ত্তিতে বড় বউএর ঘাড়ে পড়িল। সে বেচারি বলিল, "আগে বুঝাইয়া দাও, আমার অপরাধটা কি হইয়াছে।"

ছোট বউ। আমার ক্ষিদে পেয়েছে, তুই কেন খেতে দিবি নি লা?

বড়। তাই ব'লে কি একটা প্রাণী মেরে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর্‌তে হ'বে?

ছোট। তবে কি না খেয়ে আমি মর্‌ব?

বড়। একবেলা না খাইলে মানুষ মরে না।

ছোট। খরগোষের মাংস খেতে কত ভাল, তা' তুই জান্‌বি কি?

বড়। সামান্য রসনা-তৃপ্তির জন্য একটা প্রাণি-বধ কর্‌তে চাও? ছি!

ছোট। তা'তে দোষ কি? ওটা একটা ছোট খরগোষ বই ত নয়!

বড়। ভগবানের চক্ষে ছোট-বড় সব সমান। একটা হাতী যদি তোমায় মারে, তোমার কেমন লাগে বল দেখি?

ছোট। আঃ মর্! তুই আমায় গাল্ দিবি কেন্ লা? তোর মত কুঁদুলে আমি কোথাও দেখি নি।

ঝগড়া মিটিবার পূর্ব্বেই খরগোষ অন্তর্হিত হইল। আমি তখন বিরক্ত হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলাম; এবং জঙ্গল ছাড়িয়া গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে যাইবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার নয়নে পড়িল। এক জন মহাজন বা পাওনাদার দেনার দায়ে এক জন দরিদ্র ব্যক্তিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। বেচারার তৈজস-পত্র সকলি লইয়াছে, অবশেষে তাহার নিঃসম্বল স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয়চ্যুত করিতেছে। দেখিয়া বড় বউএর হৃদয় গলিয়া গেল। পাওনাদারকে নিবৃত্ত করিতে সে আমাকে অনুরোধ করিল। আমি তাহার উপদেশ-মত পাওনাদারকে পাকড়াও করিলাম; বলিলাম,

"গরীবদের ঘর হইতে তাড়াইয়া তোমার লাভ কি হবে? তৈজসপত্র টাকাকড়ি যাহা কিছু ছিল, সকলই লইয়াছ; এখন কেন এই অনাথ, নিরাশ্রয়দের গাছতলায় তাড়াইয়া দাব?"

মহাজন বলিল, "আমার পাওনা টাকা দিলেই আমি ঘর ছাড়িয়া দিয়া যাই।"

আমি। তাড়াইয়া দিলেই কি তোমার পাওনা টাকা মিলিবে?

মহাজন। না মিলে, তোমার কি হে বাপু?

ছোট বউ আমার কাণে কাণে বলিল,—সে কথা ত ঠিক। তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

আমি নিবস্ত হইতেছি দেখিয়া, বড় বউ বলিল, "জিজ্ঞাসা কর, কত টাকা পাইলে মহাজন ঘর ছাড়িয়া দিতে পারে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। মহাজন উত্তর করিল, "তোমার দুই স্ত্রীর সমস্ত গহনাগুলি যদি খুলিয়া দিতে পার, তা হ'লে ঘর-বাড়ী তৈজস-পত্র সব ছাড়িয়া দিতে পারি।"

বড় বউ তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার খুলিয়া দিতে উদ্যত হইল; কিন্তু ছোট বউ কিছুতেই রাজি হইল না। বড় বউ অনেক বুঝাইল; বলিল, "সামান্য গহনার বিনিময়ে একটি দরিদ্র পরিবারকে আশ্রয় দিতে পারিবে, এর চেয়ে আর আনন্দ কি আছে? তুমি কেন অমত করিতেছ?"

ছোট বউ গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল, "ও আশ্রয় পেলে বা না পেলে, তা'তে আমার কি? আমার এত টাকার গহনা, আমি দিব কেন, বল্ দেখি?"

বড় বউ। 'গহনা আর কত দিন পরিবে? দু'দিন বাদে সব ফেলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু আজ এই অনাথ পরিবারকে আশ্রয় দিলে তুমি যে আনন্দ পাইবে, সে আনন্দটুকু অবিনশ্বর—সেটুকু 'তোমার সঙ্গে যাইবে।

ছোট বউ গহনা ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই সম্মত হইল না। বড় বউও ছাড়ে না। তখন দুই বউএর মধ্যে বেশ ঝগড়া লাগিয়া গেল। ঝগড়া আর থামে না; অবিরাম চলিতে লাগিল। দেখিয়া মহাজন আমাকে বলিল, "হাঁগা, এই রকম কি প্রত্যহ ঝগড়া চলে?"

আমি। প্রত্যহ কি বল্‌ছ, অহর্নিশ চল্‌ছে।

মহা। তুমি থামাতে পার না?

আমি। আমার সাধ্য কি?

মহা। চেষ্টা করেছ?

আমি। তা বড় একটা করি নি।

মহা। এ স্ত্রী দুটি পেলে কোথা?

আমি। পাব আর কোথা? বাবা জুটাইয়া দিয়াছেন।

মহা। বেশ, বেশ! পত্নীদ্বয়ের নাম কি?

আমি। কত লোকে কত কি নাম ধ'রে ডাকে।

মহা। তুমি কি ব'লে ডাক?

আমি। বড় বউটিকে আমি বিদ্যা ব'লে ডাকি।

মহা। ছোটটি বুঝি অবিদ্যা?

আমি। হাঁ।

মহা। বেশ, বাবা, বেশ! তোমার বিদ্যা, অবিদ্যা নিয়ে এখন স'রে পড়, আমায় আর জালিও না।

আমি সরিয়া পড়িলাম। কিন্তু আমার ঘর যাওয়া আর হ'ল না। ঝগড়া মিটাইতে মিটাইতেই আমার দিন গেল।

কিন্তু

"কিন্তু"টাকে নিয়ে আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। তোমরা কেহ আমার উপায় করতে পার গা? আমার হাড় জ্বালাতন হয়েছে; যখনি যেখানে যাই, যখনই যে কাজে হাত দিই, তখনই 'কিন্তু' আসিয়া অন্তরায় হয়। আজ থিয়েটার দেখ্‌তে যাব প্রিয়তমাকে বলিলাম। প্রিয়তমা গম্ভীর-বদনে বলিলেন, "কিন্তু শীঘ্র ফিরিও।" সেখানে গিয়ে কেবল "কিন্তু'র কথা ভাবছি—অভিনয়ে মন নাই। প্রহসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই 'কিন্তু' ভাবিয়া গৃহে ফিরিলাম।

স্নেহময়ী জননীকে বলিলাম, "মা, আজ ইডেন-গার্ডেনে বেড়াতে যাব?" মা বলিলেন, "যাও, কিন্তু দেখো, যেন গাড়ীচাপা পড়ো না।" বস্—আমার সব আমোদ ফুরাল। গাছপালার দিকে আর আমার লক্ষ্য নাই—কোথায় গাড়ী আস্‌ছে দেখ্‌তেই আমি ব্যস্ত। গাড়ীর টাল্ সামলাইতে সামলাইতে কোন রকমে সন্ধ্যা কাটাইয়া গৃহে ফিরিলাম।

আজ শরৎ দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ—বাবাকে বলিলাম। বাবা বলিলেন,—"যাও--কিন্তু বেশী খাইও

না।" সেইখানেই আমার উৎসাহ নিবিয়া গেল। খাইতে গিয়া দেখি, পাতের উপর ছাগমুণ্ড, রোহিত-তুণ্ড। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুণ্ডদ্বয়কে পাতের একধারে সরাইয়া রাখিয়া অর্দ্ধভোজনে গৃহে ফিরিলাম।

বাজারে যাইতেছি, পোড়ারমুখী হিমী দুই আনা পয়সা হাতে দিয়া বলিয়া দিল—"দাদা, আমার জন্য একখানা কলের গাড়ী এনো, কিন্তু দুই আনার মধ্যে আন্‌তে হবে।" সমস্ত রাধাবাজার মুর্গিহাটা ঘুরিলাম; কলের গাড়ী অনেক দেখিলাম, কিন্তু কোথাও দুই আনা মূল্যের কলের গাড়ী পাইলাম না। হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া হিমীর পয়সা ফিরাইয়া দিলাম। সে বলিল, "দাদা, তুমি এমন!"

দ্বারে ভিখারী ডাকিল, "এক পয়সা মিলায়ে দে যাও রাম," "এক পয়সা মিলায়ে দে যাও, রাম।" পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া ভিখারীকে দিতে যাইতেছি, বন্ধু হাত চাপিয়া ধরিলেন; বলিলেন, "পয়সা নষ্ট কর্‌তে ইচ্ছা হয়ে থাকে, কর; কিন্তু আগে দেখ, লোকটা যথার্থ দয়ার পাত্র কি না।" বন্ধুর কথা শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলাম। দেখি কি না, ভিখারী বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ যুবক। এক 'কিন্তু'র গুঁতোয় পয়সাটা আর ভিখারীর হাত পর্য্যন্ত পৌঁছিল না—পকেটেই রহিয়া গেল।

ধড়াচূড়া পরিয়া দশটা বাজিতে না বাজিতে কাছারি রওনা হইলাম। সেখানে গিয়া কাহাকেও মেয়াদ দিলাম, কাহাকেও বা অব্যাহতি দিলাম। সাহেব ইন্‌স্‌পেক্‌সানে আসিয়া আমার কার্য্যাকার্য্য দেখিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "টোমার কামে হাম খুসী আছে; কিণ্টু ডেখো বাবু, আওর জল্‌দি ফাইল ক্লিয়ার কর্‌নে হোগা।" তার পর মকর্দ্দমা করিয়া ফাইল ক্লিয়ার করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু এই 'কিণ্টু'র ঘায়ে আমার আর বিচার করা হইল না।

নিশীথে গৃহে চোর ঢুকিয়াছে—গৃহিণী ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিলেন। দ্বার খুলিয়া লগুড়-হস্তে বীরদর্পে তার অনুসরণে উদ্যত। গৃহিণী আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিয়া দিলেন,—"কিন্তু দেখিও, সে যেন খোঁচা মারে না।" বস্—আমার সাহস উৎসাহ নিবিয়া গেল। চোর ধরিব কি, আত্মরক্ষায় বিব্রত। অবশেষে লাঠি ছাড়িয়া গৃহিণীর অঞ্চল ধরিলাম।

তাই বলিতেছি, এই 'কিন্তু' আমায় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। এই 'কিন্তু'র ঘায়ে বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমার কোন সুখ-শান্তি নাই। আমি তাকে ছাড়িতে চাই, কিন্তু সে যে আমায় ছাড়ে না। আমি কি বিপদে পড়িলাম গা! জীবনটা ত কোন রকমে কাটিয়া গেল, কিন্তু—কিন্তু তার পর? তোমরা কোথায় আছ 'ব'লে দাও না গা, এই জীবনের 'পর—এই দেহ ধ্বংসের পর পরিণাম কি হইবে? তখন ত তোমরা কেহ আমার কাছে থাক্‌বে না, তোমরা ত কেহ আমার পানে তখন চাহিয়া দেখিবে না; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, নিঃসহায়, নিঃসম্বল আমার তখন কি হবে গা?

আমার চাকরি

আচ্ছা চাক্‌রির দায়ে ঠেকেছি! আজ এখানে—কাল সেখানে। উপায় নাই—আমরা হুকুমের অধীন। হুকুম আসিল—'তোমাকে মেদিনীপুর হইতে ছাপরায় বদলি করা হইল।' বস্!—অমনি ছুটিলাম। তল্পিতল্পা বাঁধিয়া, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্যপথে ছুটিলাম। ছাপরায় আসিয়া দেখিলাম, সব নূতন। নূতন মাটী—নূতন দৃশ্য—নূতন লোক—নূতন ভাষা। এই নূতন দেশে আসিয়া বড়ই বিপন্ন হইলাম। কিছুই ভাল লাগে না—চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকি। দুই এক জন পবিত্রাত্মা দয়া-পরবশ হইয়া আমাকে নূতন দেশের অভিনব আচরণ শিখাইতে লাগিলেন। ক্রমে পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ হইল। দেশেও মন বসিল। দেখিতে দেখিতে দুই এক বৎসর কাটিয়া গেল। তখন এই নূতন দেশ আর নূতন নয়—পুরাতন। কাহারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, কাহারও সঙ্গে বা আত্মীয়তা হয়েছে। কাহাকে দাদা বলিয়া ডাকি—কাহাকেও বা খুড়া বলিয়া সম্বোধন করি। এইরূপে ঘরদ্বার পাতাইয়া, পাঁচ জন বন্ধুবান্ধব লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। এমন সময়ে সহসা অশনিনির্ঘোষ তুল্য সংবাদ আসিল, আমাকে চট্টগ্রামে বদলি করা হইয়াছে। আমি অবনত-মস্তকে উপরওয়ালার আদেশ গ্রহণ করিলাম। তল্পিতল্পা বাঁধিলাম—বন্ধুবান্ধবের নিকট বিদায় লইলাম। তাহারা কাঁদিল—আমিও কাঁদিলাম। আত্মীয়-বন্ধুরা সভা করিয়া প্রীতিভোজ দিল—আমার মঙ্গল কামনা

করিয়া শোক-পীড়িত-হৃদয়ে ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা করিল। আমি সেই শোক-কোলাহলের মধ্যে সাশ্রুনয়নে বিদায় হইলাম।

নূতন স্থানে যাইবার আগে একবার গৃহে ফিরিলাম। ছুটী—পনর দিনের মাত্র (Preparatory leave)। এই পনর দিন সম্বল করিয়া দেশে চলিলাম। দেশ, অনেকটা পথ—নদীয়া জেলায়। সেখানে গিয়া—বহুকাল পরে জনক-জননীর চরণে প্রণাম করিলাম। কিন্তু বেশী দিন থাকিতে পারিলাম না,—চাকরি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। চাকরির পিপাসা তখনও মিটে নাই; তাই পরের দাসত্ব করিতে চট্টগ্রামে চলিলাম।

চট্টগ্রাম দূর-পথ। জলে স্থলে কত দিন ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কর্ম্মক্ষেত্রে পৌঁছিলাম। সেখানে আসিয়া দেখি—সব নূতন। কেবল আইন-কানুন পুরাতন। সেখানকার ভাব-ভাষা, আচার-ব্যবহার, লোকে শিখাইতে লাগিল—তবে শিখিতে পারিলাম। ক্রমে অধিবাসীদিগের সঙ্গে পরিচয় হইল এবং কাহারও কাহারও সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। কেহ আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, আমি কাহাকেও বা দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম। আবার ঘরদ্বার বাঁধিয়া প্রফুল্লচিত্তে বেড়াইতে লাগিলাম। পৃথিবী কত সুন্দর, সেখানে আসিয়া তাহা উপলব্ধি করিলাম। সমুদ্রতীরে বসিয়া যখন 'তরুরাজিনীলা' তরঙ্গভঙ্গভীম জলধিকে দেখিলাম—যখন তাহার ব্যোমপ্রতিঘাতী গর্জ্জন শুনিলাম, তখন আমার মনে হইল, যেন কোন প্রকাণ্ডকায় পরাক্রান্ত দৈত্যকে জলধিতলে কে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে;—যেন সে দিবা-রজনী হা হুতাশ করিতেছে—সময়ে সময়ে যেন সে ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিয়া হুহুঙ্কার শব্দে ক্ষিতি ব্যোমকে রণে আহ্বান করিতেছে—কখন যেন বা বন্ধন ছিঁড়িয়া আকাশে পলায়ন করিবার উদ্যম করিতেছে। সমুদ্র ছাড়িয়া অনন্তবিস্তৃত শৈলমালা পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সাগরতরঙ্গনীলা আকাশের গায় কে যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আঁকিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্রের চিত্র গগনপটে প্রতিবিম্বিত, আকাশের চিত্র বারিবিক্ষদয়ে প্রতিবিম্বিত। সমুদ্রে আকাশে মিশামিশি। অনন্ত নীলা, অনন্তনীল আলিঙ্গনেচ্ছু—আকাশ, বারিধি হৃদয়স্পর্শী। উভয়ই প্রেমাভিভূত, কিন্তু উভয়ের কেহই আপন গৃহ ছাড়ে নাই। আমিই শুধু আমার সুখময় গৃহ ছাড়িয়া পরের দাসত্ব করিতে বিদেশে আসিয়াছি। যার যেমন কর্ম্মফল। প্রবল কর্ম্মফলকে কে কোথায় অতিক্রম করিতে পারিয়াছে?

আমিই যে শুধু আমার কর্ম্মফলের বশবর্ত্তী হইয়া এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছি, তা' নয়—অনেকেই আমার মত—স্থানভ্রষ্ট উল্কার ন্যায়—স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কত পুরাতন লোক চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল দেখিলাম—কত নূতন লোক কত দূরদেশ হইতে চট্টগ্রামে আসিল দেখিলাম। যাহারা গেল, তাহাদের জন্য শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিলাম—যাহারা আসিল, তাহাদের সাদরে সম্ভাষণ করিলাম। এইরূপে কত লোক আসিল—কত লোক গেল, তাহার সংখ্যা নাই। দেখিয়া শুনিয়াও আমার শিক্ষা হইল না,—আমি মোহে পড়িয়া বিস্মৃত হইলাম যে, আমাকেও একদিন চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

কেনই বা আমি চট্টগ্রাম ছাড়িব? এখানে আমার কিসের অভাব? চারিদিকে আমার যশঃ ও খ্যাতি। আমি পদে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট—জ্ঞানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—গৌরবে হাকিম। উকীল-মোক্তার আমার খোসামোদ করে—চোর, ডাকাত, জমীদার আমার প্রীত্যর্থে রাশি রাশি ডালি পাঠায়—মাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার সুখ্যাতি করিয়া দীর্ঘ রিপোর্ট লিখেন। এততেও যদি মানুষ না ভুলে, তবে কিসে আর ভুলিবে? আমি ভুলিলাম—এক-কালে বিস্মৃত হইলাম যে, আমাকে এক দিন চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

যাইতে হইল। লোকমুখে শুনিলাম, আমার বদ্‌লির হুকুম আসিয়াছে। এবার বড় কষ্ট হইল—উপরওয়ালার উপর একটু অভিমানও হইল। ভাবিলাম, সাহেব-সুবো ধরিয়া একটু চেষ্টা দেখি, যদি আরও কিছুদিন থাকিতে পারি। কিন্তু সাহেব আমায় রাখিতে পারিলেন না। তখন বাধ্য হইয়া তল্পিতল্পা বাঁধিতে হইল। বাঁধিতে বাঁধিতে আমাকে কত নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইল; শেষবার, একবার শৈলমালা-চিত্রিত নীলাকাশ পানে চাহিয়া দেখিলাম—শেষবার, একবার গিরিরাজিনীলা বারিধিপানে চাহিয়া দেখিলাম। তা'র পর আমার প্রাধান্যের কথা—আমার নামযশখ্যাতির কথা একবার ভাবিলাম। ভাবিতে ভাবিতে, বন্ধুবান্ধবদের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইতে মিশাইতে আমার সাধের চট্টগ্রাম ছাড়িয়া যাত্রা করিলাম।

এ যাত্রায় কর্ম্মস্থানে গেলাম না। দীর্ঘকাল অবকাশ লইয়া গৃহে বসিয়া রহিলাম। বিদেশে যাইতে

আর প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু না গিয়াই বা করি কি? আদেশ মান্য করিতে হইবে। হুকুম তামিল করিতে আবার গৃহ ত্যাগ করিয়া বিদেশে ছুটিতে হইল। এক দেশ হইতে আর এক দেশে, সে দেশ হইতে আবার এক নূতন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কোথাও দুমাসের জন্য ডেপুটেশনে (Deputation), কোথাও বা দু' বছরের জন্য স্থায়িভাবে (?) থাকি। এইরূপে কত দেশ-দেশান্তর পরিভ্রমণ করিলাম। অবশেষে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইলাম। অতি কাতরভাবে উপরওয়ালার নিকট পেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত করিলাম। আমার ঠিক সময় হয় নাই বলিয়া রাজ্যেশ্বর আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন।

তুমিও কি বিশ্বনাথ, আমার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবে? আমি যে ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া বিশ্রামের জন্য লালায়িত হইয়াছি। কতকাল আর নিজগৃহ ছাড়িয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব? আর যে পারি না প্রভু! কতবার পার্থিব দেহ ধরিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলাম—কতবার জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করিলাম—কতবার মিছা সুখের জন্য লালায়িত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলাম। শুধু কর্ম্মফলের বোঝা-মাত্র লইয়া দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিলাম! কোন জন্মে দুই দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিলাম—কোন জন্মে পুত্রকলত্র লইয়া সংসার পাতিলাম—কোন জন্মে নাম-যশ কিনিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম। কিন্তু মনে শান্তি পাইলাম কই? শান্তিময় পিতা! কতবার আর পৃথিবীতে অশান্তিভোগ করিতে পাঠাইবে? আর যে পারি না প্রভু! এখনও কি আমার পেন্‌সনের সময় হয় নাই?

আমার ছোকরা চাকর

আমি বেশ একটি চাকর পাইয়াছি। ছেলেটার বয়স কম—দেখিতে ভাল—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আমার বেশ মনে ধরিয়াছে। কাজেও খুব তৎপর—চরকির মত দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আলস্য নাই, ওজর নাই—হাস্যমুখে হুকুম তামিল করিতে সকল সময়ে প্রস্তুত। কিন্তু তার একটা বড় দোষ আছে, সে কথা পরে বলিতেছি।

শীতকাল—নিশি প্রভাত-প্রায়। লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। ঘুম আর হয় না—লেপ ছাড়িতেও ইচ্ছা করিতেছে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম,—"হরিদাস!"

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, আমার ছোক্‌রা চাকরের নাম হরিদাস। হরিদাসকে ডাকিলাম; হরিদাস রান্নাঘর হইতে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে?"

আমি। চা হয়েছে?

হরি। আজ্ঞে হয়েছে।

আমি। নিয়ে আয়।

হরি। আজ্ঞে যাই।

মুহূর্ত্তমধ্যে হরিদাস গরম চা লইয়া আসিল। আমি লেপ মুড়ি দিয়া চা পান করিতে বসিলাম। খাইতে গিয়া দেখি, চা অতিরিক্ত লাল হইয়া গিয়াছে। এক চাম্‌চে মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেখিলাম, চা তিক্ত—খাইবার অনুপযুক্ত। কোন মতে দুইচার চামচ গলাধঃ করিয়া বলিলাম,—"তুই বেটা বড় আহাম্মক—এতক্ষণ ধ'রে চা টি-পটে রাখে? কড়া হয়ে গেছে—যা, আর খাব না।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে হরিদাস উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, এই রকম ক'রে চা কর্‌তে বামনঠাকুর আমাকে শিখাইয়া দিল।"

আমি। তোমার মাথা শিখাইয়া দিল। যা, এখন তামাক আন্‌ গে যা।

হরিদাস ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া গেল এবং কলিকা-হস্তে চকিতমধ্যে ফিরিয়া আসিল। এত শীঘ্র তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া আমি সাতিশয় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এর মধ্যে কি ক'রে তামাক সাজ্‌লি হরিদাস?"

হরিদাস উত্তর করিল,—"আজ্ঞে, আগে হ'তে আমি তামাক সেজে রেখেছিলাম।"

আমি পরম আপ্যায়িত হইয়া গড়গড়ার নল দশনে চাপিয়া ধরিলাম। টানিয়া দেখি—টান সরিতেছে না। আমি ঈষৎ কুপিত হইয়া বলিলাম, "ওরে বাঁদর, করেছিস্‌ কি? যা, ছিঁচকে নিয়ে আয়।"

হরিদাস ক্ষিপ্রহস্তে কলিকা নামাইয়া জাঠে ছিঁচকা দিল। কিন্তু হতভাগা এত জোরে ছিঁচকা চালাইল যে, গড়গড়ার ক্ষণভঙ্গুর তলা মুহূর্ত্তে ছেঁদা হইয়া গেল। আমি মহা কুপিত হইয়া বলিলাম,—"হতভাগা বাঁদর, আর তোকে ছিঁচকে কর্‌তে হবে না—দূর হ। গাড়ুতে জল দি গে যা—গরম জল যেন দিস্‌।"

ছোঁড়া লাফাইয়া ছুটিয়া গেল। আমিও তামাকের আশা ছাড়িয়া চুরুট-মুখে শয্যাত্যাগ করিলাম।

পায়খানায় গিয়া শৌচকালে দেখি, বেটা গাড়ুর ভিতর Boiling hot জল পুরিয়াছে। এ স্বদেশীর দিনে 'স্বদেশী' কাগজে ইংরাজী কথা! ছি, ছি! তা' আমি কি করিব? Boiling hotএর বাঙ্গালা যে আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। ফুটন্ত গরম বলিব? সে যাই হউক, জল এত গরম যে, কা'র বাবার সাধ্য গাড়ুতে হাত দেয়—শৌচ করা ত দূরের কথা। তখন আমি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে মুক্তকচ্ছ অবস্থায়, হাতে কাপড় ধরিয়া পায়খানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

স্নান করিতে বসিয়া হরিদাসকে তেল মাখাইতে বলিলাম। হরিদাস চৌদ্দপুরুষের ভিতর তৈলমর্দ্দন করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।—সে অতি ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আমি সানুনয়ে বলিলাম,—"বাপু, একটু জোরে দেও।"

বেটা তখন এত জোরে তেল মাখাইতে আরম্ভ করিল যে, পায়ের লোম পট্‌পট্‌ শব্দে ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। আমি তখন সকাতরে বলিলাম,—"আর তোমায় তেল মাখাতে হবে না, বাবা—এখন দয়া ক'রে জল আন।"

হরিদাস লাফাইয়া গেল; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দুই কলসী জল আনিয়া হাজির করিল। আমি গাড়ুর ঘটনা স্মরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জল গরম নয় ত রে?"

"আজ্ঞে না—ঠাণ্ডা।"

তখন মাথায় জল ঢালিতে অনুমতি দিলাম। হরিদাস হড়্‌ হড়্‌ করিয়া জল ঢালিল। বাপ রে—কি ঠাণ্ডা! যেন হিমালয়শিখর-নিঃসৃত দ্রবীভূত হিমানী-ধারা! আমি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ইঙ্গিতে হরিদাসকে জল ঢালিতে নিষেধ করিলাম। বেটা তাহা বুঝিতে পারিল না—সমানে জল ঢালিতে লাগিল। আমি তখন শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে লাফাইয়া উঠিলাম। মাথার উপর কলসী ছিল,—আঘাত লাগিয়া কলসী ভাঙ্গিল—আমার মাথাও ফাটিল।

আমার শরীর বড়ই খারাপ—ডাক্তারদের পরামর্শমত আমি সন্ধ্যার পর একটু Vinum galicii সেবন করিয়া থাকি। তোমরা হয় ত তাহাকে ব্রাণ্ডি বলিবে; কিন্তু ব্রাণ্ডি বলিলে বস্তুতই আমি প্রাণে ব্যথা পাইব। এক বোতল সোডা-ওয়াটারে ছয় আউন্স মাত্র গ্যালিসাই মিশাইয়া পান করিয়া থাকি। অতএব আমি ব্রাণ্ডি বা মদ খাই না। সে কথা যাক্‌। সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রি আসিল,—আমারও মন বোতল পানে ধাবিত হইল। হরিদাসকে বলিলাম,—"বোতলটা নিয়ে আয় ত।"

হরিদাস ছুটিয়া গিয়া বোতলের ঘাড় ধরিল। আনিতে আনিতে মধ্যপথে—আমার মাথা আর মুণ্ড—বোতল পড়িয়া গিয়া চুরমার্‌ হইল।

একটু বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত পড়াশুনা করা আমার অভ্যাস। আমি শয্যায় শুইয়া ওয়েন সাহেবের একখানা বই পড়িতেছি—মাথার কাছে টুলের উপর একটা সেজ জ্বলিতেছে। রাত্রি যখন আড়াই প্রহর, তখন আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমি চক্ষু বুজিয়া নিদ্রাঘোরে হরিদাসকে ডাকিলাম। তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল,—"আজ্ঞে!"

"আলোটা নিবাইয়া রাখ।"

হরিদাস ক্ষিপ্রহস্তে আলোটা উঠাইতে গিয়া সমস্ত তেলটুকু আমার মাথা ও বালিসের উপর ফেলিয়া দিল। আমার ঘুম ছুটিয়া গেল। আমি তখন লাফাইয়া উঠিয়া সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই হরিদাসের গণ্ডদেশে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক চপেটাঘাত করিলাম। লাভে হ'তে সেজটিও ভাঙ্গিল।

ভাবিলাম, হরিদাসকে আর রাখিব না। হতভাগা যে কাজটা করিতে যায়, সেই কাজেই একটা না একটা গোল বাধাইয়া বসে। কিন্তু তারই বা অপরাধ কি? সে ত নিয়ত আমাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। তবে সে অজ্ঞ—ঠিক উপায় জানে না। যে যেমন শিখাইয়া দিয়াছে, তাহার বুদ্ধি ও সামর্থ্যে যাহা কুলাইতেছে, সে তেমনই করিতেছে। আমার সন্তোষ-বিনোদন তাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কখন সফলকাম হয় না।

আমিও যে সফলকাম হই নাই, প্রভু! আমিও হরিদাসের ন্যায় তোমার সন্তোষ-বিনোদনার্থ অহরহঃ চেষ্টা করিতেছি, বিশ্বপিতা! কিন্তু অজ্ঞ, জ্ঞানহীন আমি যে কোন উপায় জানি না। আমাকে পথ দেখাইয়া দেও, বিভো! আমাকে যে যা' পথ বলিয়া দিয়াছে—যে যা' শিক্ষা দিয়াছে, আমি সেই সেই পথ ধরিয়া—সেই সেই শিক্ষা মাথায় করিয়া তোমার প্রসন্নতা-লাভের আশায় ছুটিয়া চলিয়াছি; কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ পদে পদে তোমার বিরাগভাজন হইয়াছি।

কোথায় অকূলের কাণ্ডারী, দয়াময় বিশ্বনাথ, আমার এ অজ্ঞানতা—এ মোহাচ্ছন্ন তামসান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের দীপ জ্বালাইয়া দেও। আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চাই না,—আমি শুধু তোমাকে চাই—তোমার প্রসন্নতা চাই। কি করিলে আমি তোমাকে পাইব, আমাকে তাই বলিয়া দেও, বিভো!

ফেউ

আচ্ছা ফেউ পিছু লেগেছে,—মুহূর্ত্তের জন্যও আমার নিস্তার নাই। যেখানেই কেন যাই না, ফেউ আমার পাছু ছাড়ে না। ফেউযের দৌরাত্ম্যে আমার আর শান্তি নাই—আমি হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হ'যে উঠেছি।

বাজারে গেলুম, ইচ্ছা দু'টা মুরগির আণ্ডা লইব। ও মা, চেয়ে দেখি, ফেউ বেটা আমার সঙ্গে। যেমনি আণ্ডায় হাত দিয়েছি, অমনি বেটা মহা চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগ্‌ল, "মুরগির ডিম কিন্‌ছে গো,—জাত-ধর্ম্ম আর রাখ্‌লে না গো।" বস্—ডিম প'ড়ে রইল—আমি স'রে দাঁড়ালুম।

কন্‌কনে শীত, রাস্তা হাঁটতে আর পারি না; ভাবিলাম, এক গ্লাস হুইস্কি টানি। শরীর-রক্ষার্থে এই মধুসঙ্কল্প মনে মনে এঁটে শুঁড়ির দোকানে ঢুকেছি মাত্র, আর ফিরে দেখি কি না, ফেউ বেটা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকেছে। তা'কে দেখে আমার হাড় জ্ব'লে গেল; আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না—হুইস্কি না টেনেই চম্পট দিলাম।

রাস্তার বাহির হইয়া দেখিলাম, পথের ধারে সারি দিয়া বারাঙ্গনাদল। তা'দের মধ্যে একটা মেয়ের বেশ নধর শরীর—প্রফুল্ল মুখ—টানা চোখ। ভাবিলাম, একটু আমোদ করা যা'ক। আমোদ কি আর আমার কপালে আছে!—পিছন ফিরে দেখি, সেই ফেউ বেটা। বেটা আবার ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ইঙ্গিতে আমাকে সতর্ক করছে। ভাবিলাম, বেটাকে আচ্ছা ক'রে পয়জার পেটা করি; কিন্তু সাহস হ'ল না।

গৃহিণীর আদেশে বাজারে বেরিয়েছি। চুড়ি, এসেন্স, সাবান—নানাবিধ ফরমাজ। দেখিলাম, বিলাতী জিনিসগুলা দেখিতে ভাল, দরেও সস্তা। স্বদেশীর আমি একজন মস্ত পাণ্ডা হইলেও গোপনে বিলাতী জিনিসগুলা কিনিতে ইচ্ছা করিলাম। চারিদিক চাহিয়া ভয়ে ভয়ে, খাঁটি বিলাত জাত দ্রব্যসম্ভার পকেট-জাত করিতেছি, এমন সময়—ও বাবা গো, আবার সেই বেটা! আমি জিনিস ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চাঁদনি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

এই স্বদেশীর দিনে নাম কিনিবার আশায় একটা স্বদেশী হাট বসাইলাম। জেলার সাহেব চোখ রাঙ্গাইয়া 'টাইটেল' কাড়িয়া লইতে চাহিল। আমি ছাঁকা বিদেশী ভূষায় সজ্জিত হইয়া—সাহেবের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া সাহেবকে শান্ত করিতে জুড়ি হাঁকাইয়া চলিলাম। গাড়ীতে উঠে দেখি, ফেউ বেটা আমার আগে গাড়ীতে উঠে ব'সে আছে। আমাকে দেখিয়াই সে চোখ রাঙ্গাইয়া গর্জ্জিয়া বলিল, "আমি সকলকে বলিয়া দিব, তুমি গোপনে দেশের স্বার্থ বেচিতেছ।" সে যাত্রা আমার আর যাওয়া হ'ল না—আমি বাড়ী ফিরিয়া অগত্যা স্বদেশী সাজিলাম।

স্ত্রী চিররুগ্ন দেখিয়া ভাবিলাম, একটা বিবাহ করি। স্ত্রী কাঁদিয়া কাটিয়া বলিল, "ওগো, দু'দিন অপেক্ষা কর—আগে আমি মরিয়া যাই।" আমি শুনিলাম না,—একটা ষোল বছরের দুগ্ধালক্তকনিন্দিবরণা পীনোন্নত-পয়োধরা আমার লক্ষ্য। আমি কি তখন পরিবারের কান্না দেখে ভুলি। আমি মহা উৎসবে বর সাজিলাম। টোপর মাথায় দিয়া ছান্‌লাতলায় উপস্থিত। কাপড় ঢাকা দিয়া যখন ক'নের মুখ দেখিলাম, তখন ক'নের পাশে আর একজনকে দেখিলাম। সে কে বুঝেছ? সে আমার চিরভীতি ফেউ বেটা। বেটা গম্ভীর-বদনে অঙ্গুলি হেলাইয়া আমাকে বলিল, "ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির বাসনায় এক স্ত্রী ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাও?" আমি দাঁড়াইলাম না,—কাপড় ফেলিয়া দিয়া একছুটে গৃহে আসিলাম। আমার কপালে দুগ্ধালক্তকনিন্দিবরণা আর জুটিল না।

আপিসের ক্যাশ আমার জিম্মা। ভাবিলাম, কিছু টাকা ভাঙ্গিয়া ভবিষ্যতের সুরাহা করি—সাহেবের বাবাও কিছু জানিতে পারিবে না। একদিন নিরিবিলিতে লোহার সিন্দুকের ডালা খুলিলাম। নোটের তাড়ায় হাত দিতেছি, এমন সময়—বাবা গো—দেখি কি না, সেই বেটা সিন্দুকের মধ্যে বসিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। আমি ভবিষ্যতের সুব্যবস্থার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া রিক্তহস্তে চম্পট দিলাম।

তাই বলিতেছি, এই ফেউ বেটার জ্বালায় আমার কোন সুখ নাই। অহরহঃ আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আমার বাড়া ভাতে ছাই ঢালিতেছে। যখনই পাঁচ ইয়ার সঙ্গে লইয়া কোন বিলাস-মন্দিরে একটু আমোদ করিতে যাইব মনে করিতেছি, অথবা কাহাকেও ফাঁকি দিয়া দু' পয়সা উপায় করিবার

চেষ্টা করিতেছি, তখনই এই ফেউ বেটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার বাসনার অন্তরায় হয়। হাঁ গা, ফেউ বেটাকে তাড়াইবার কোন ঔষধ তোমরা জান গা? আমি যে অস্থির হয়ে পড়েছি—শয়নে-ভোজনে, স্বদেশী-আন্দোলনে কোথাও শান্তি পাই না। বেটা আজীবন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরূছে—জীবন ভোর আমাকে জ্বালাইয়া মারূছে। হাঁ গা, জীবন অবসান না হ'লে কি এর হাত হ'তে আমার পরিত্রাণ নাই? ভগবান্, শৈশব হইতে এ কা'কে আমার সঙ্গে জুটাইয়া দিয়াছ? আমি ছাড়িতে চাহিলে, এ যে আমায় ছাড়ে না! যখন বিপথে পা বাড়াই, তখন আমাকে সতর্ক করিয়া সুপথে আনে। এ কে প্রভু? এ কে প্রভু, উপদেষ্টা হয়ে সকল সময়ে আমাকে উপদেশ দেয়? দয়াময় বিশ্বনাথ, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যেন শয়নে, বিচরণে, সম্পদে-বিপদে সকল সময় এই উপদেষ্টা আমার সঙ্গে ফিরে—আমি ছাড়িতে চাহিলেও যেন আমাকে না ছাড়ে।

ডাকঘর

তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই, ডাকঘর। আমি ডুম্কার জঙ্গলে বসিয়া সম্পাদক মহাশয়কে একখানা পত্র লিখিলাম, তুমি ঝমর ঝমর করিয়া বাহিয়া চলিলে। পাহাড়-জঙ্গল কিছুই মানিলে না—ঝড়-বৃষ্টি কিছুই গ্রাহ্য করিলে না,—নিয়মিত সময়ে পত্রখণ্ড কাঁকালে করিয়া তাঁহার সমীপে হাজির হইলে। তিনি হয় ত সে সময় কাগজের প্রুফ দেখিতেছিলেন; এমন সময় তুমি বায়স-নিন্দী কণ্ঠে হাঁকিলে, "বাবু, চিঠি।" বাবু লেফাফা খুলিয়া দেখিলেন,—প্রণয়-পত্র নয়—একটা প্রবন্ধ। তিনি তৎক্ষণাৎ মহা বিরক্তি সহকারে "rubbish, nonsense" বলিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মলয়ানিল-সেবিত, বিহঙ্গমকূজিত, সরিৎপ্রফুল্ল পুষ্পোদ্যানমধ্যে বসিয়া ভাবিলাম, স্ত্রীকে একখানা পত্র লিখি। তিনি তখন অনেক দূরে—তাঁহার পিতার সঙ্গে বৈদ্যনাথে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন। আমি বিরহাপ্লুত-হৃদয়ে তাঁহাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। মাথার উপর অনন্ত বিস্তৃত কোমল নীল আকাশ—পদনিম্নে দর্পণ তুল্য স্বচ্ছ জলরাশি, আমার আশে-পাশে গগনমধ্যস্থিত নক্ষত্রবৎ গোলাপ, মল্লিকা, বিগোনিয়া। অঙ্গের উপর—প্রণয়িনী-হস্তাধিক কোমল স্পর্শে মলয়-মারুত বহিয়া যাইতেছে; চারিদিকে ভ্রমর-গুঞ্জন। আমি কণ্টকিত দেহে এই বসন্ত অধিষ্ঠিত পূর্ণবিকশিত রাজ্যমধ্যে বসিয়া পূর্ণ-যৌবনা প্রণয়িনীকে পত্র লিখিতে বসিলাম।

ডাকঘর, তুমি আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস মাথায় করিয়া বহিয়া লইয়া দুইটি পয়সামাত্র রাস্তা-খরচ সম্বল করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলে। নন্দন পাহাড়ের উপর যেখানে বসিয়া আমার হৃদয়রাণী সুন্দর আকাশ-প্রান্তে চাহিয়া বিরহের তপ্ত নিশ্বাস ছাড়িতেছিলেন, তুমি সেইখানে পত্রের সহিত আমার বিরহ-নিশ্বাস বহিয়া লইয়া হাজির করিলে। কমলদল-বিনিন্দিত কোমল হস্তে গৃহিণী (ছিঃ, গৃহিণী নয়—প্রণয়িনী) পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন; আবার চম্পককলি-নিন্দী ক্ষুদ্র অঙ্গুলীনিচয়ে লেখনী ধরিয়া আমাকে পত্র লিখিতে বসিলেন। তুমি তাহাও আবার আমার কাছে বহিয়া আনিলে।

এ অসার খলু সংসারে চাকুরির মত কিছুই নাই। ভাবিলাম, একটা চাকুরি করি। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিতে থাকিলাম। যেখানে কর্ম্ম খালি দেখি, সেই খানেই আমার মন, কুসুমমধু-লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। দেখিয়া শুনিয়া একটা দরখাস্ত লিখিলাম। লেফাফায় আঁটিয়া তোমার হাতে দিলাম, তুমি বিনা ওজরে তাহা গ্রহণ করিয়া কিছু জলপানির আশায় আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলে; আমি দুইটি পয়সা দিলাম; তুমি কাতর-মুখে বলিলে, "বাবু লেফাফাটা বড় ভারি, আর দুইটা পয়সা পাইলে ভাল হয়।" আমি তাহাই দিলাম। তুমি তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল-বদনে আমার পত্র লইয়া ছুটিলে।

তাই বলিতেছিলাম ডাকঘর, তোমার গুণ অনেক; তোমার তুলনা সংসারে বিরল। আমার প্রেয়সীর যত গুণ, বুঝি তোমারও তত। অতএব সরিয়া এস, তোমার স্তুতিগান করি। অয়ি রেল-ষ্টীমার-গামিনী,

প্রেমপত্র-প্রবন্ধ-আবেদনবাহিনী, তোমাকে নমস্কার। তোমার ঊর্দ্ধে নমস্কার, তোমার অধোদেশে নমস্কার, তোমার সম্মুখে নমস্কার, তোমার পশ্চাদ্‌ভাগে নমস্কার, তোমার চারিদিকে নমস্কার। তুমি স্থল-জল-ব্যোম ব্যাপিয়া আছ। কখন স্তম্ভরূপে নিশ্চল অবস্থায় পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাক, কখন বা গৃহপ্রাচীরে দেহ সংগোপন পূর্ব্বক উষ্ট্রবৎ ওষ্ঠদ্বয় ব্যাদান করিয়া স্ফীতোদরে বসিয়া থাক। তুমি কখন যন্ত্রমুখে বসিয়া তাড়িত ছুটাও, কখন বা জাহাজে উঠিয়া পৃথিবী বেড়াও। তুমি কখন ঝমর ঝমর শব্দে মল বাজাইয়া পথ হাঁটিয়া চল, কখন বা রেলপথ অবলম্বন করিয়া মেঘ-গর্জ্জনবৎ হুঙ্কারশব্দে জলস্থল প্রকম্পিত করিতে করিতে উল্কাগতিতে ছুটিয়া চল। তোমার মহিমা অপার, এ সংসারে তুমি সকলই পার।

সকলই পার কি ডাকঘর? আমার প্রাণের উচ্ছ্বাস, অন্তিমের আবেদন বহিয়া লইয়া সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের চরণে পৌছিয়া দিতে পার কি, ডাকঘর? আমার সম্পদ, ঐশ্বর্য্য যা কিছু আছে, সকলই তোমাকে দিব, তুমি আমার নিরুদ্ধ হৃদয়-ব্যথা একবার সেই সর্ব্বদুঃখ-বিনাশনের চরণে পৌছাইয়া দিয়া এস। বহুকাল হইল, সেই অনন্তধাম ছাড়িয়া আসিয়াছি, যুগযুগান্তর বহিয়া গেল, তবু সে পিতৃগৃহের কোন সংবাদ পাইলাম না; তুমি একবার বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটিয়া গিয়া সেখানকার সংবাদ আনিয়া দেও, আমার প্রাণের ব্যথা পরম পিতার চরণে নিবেদন করিয়া এস; পার যদি, একবার শুধাইয়া এস, কত দিনে আবার পিতৃগৃহে ফিরিতে পাইব। কোড়ে, গাইডে দেখিয়াছি, তুমি সর্ব্বস্থানে যাইতে পার; সমুদ্রের ভিতর, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বস্থানে তোমার যাতায়াত। তবে হে ডাকঘর, তোমার পায়ে ধরি, আমার একখানি প্রেমপত্র, একখানি সকরুণ আবেদন বহিয়া লইয়া আমার পিতার চরণে পৌছাইয়া দিয়া এস। পার না কি ডাকঘর?

সমাপ্ত

শ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

উৎসর্গ

চির-আরাধ্য নিত্যপূজ্য

স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পিতৃদেব উদ্দেশ্যে—

বাবা,

আপনাকে দিবার উপযুক্ত এত দিন কিছুই পাই নাই; দিতে ভরসাও হয় নাই। আর দিবই বা কি, সবই ত আপনার। যে বীজ আপনি রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল আপনি গ্রহণ করুন।

স্নেহাশিস্ প্রার্থী

শচীশ—

ভূমিকা

গ্রন্থখানি জীবনী বা উপন্যাস নয়; ইতিহাস বলিয়াও কেহ না মনে করেন।

এখানি আমার অর্ঘ্য; যাঁর উদ্দেশে প্রদত্ত, তিনি গ্রহণ করিলে, আমি ধন্য ও কৃতার্থ—আমার জীবন ও জন্ম সফল।

ভক্তমাত্রেই—বৈষ্ণব বা শাক্ত, শৈব বা গাণপত্য—আমার নমস্য; তাঁহাদের পদরজঃ শিরে ধরিয়া আজ এ পূজায় প্রবৃত্ত।

কিন্তু আমার পূজার উপকরণ সামান্য। সামান্য হইলেও ভক্তেরা আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া আমায় ক্ষমা করিবেন। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

মূর্খ বলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনামাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥

সেই সন্তোষের আশায় আমি ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিয়াছি, ভাষা বা ভাবের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই।

ঐতিহাসিকত্ব কোথাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নষ্ট করি নাই। শ্রীশ্রীগোস্বামী ঠাকুর সম্বন্ধে যতটুকু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি; প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করি নাই, তবে স্থানে স্থানে কল্পনার কিছু কিছু সাহায্য লইয়াছি। উন্মাদের চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দুই একটি ক্ষুদ্র ঘটনাও কাল্পনিক।

দুইটি গান আমার রচিত নয়; সে দুইটি বন্ধনীর "(   )" মধ্যে আবদ্ধ। একটির কর্ত্তা নরহরি ঠাকুর, অপরটির রচক অজ্ঞাত। ইতি।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীসনাতন গোস্বামী

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

আহ্বান

"তুমিই ত বলিয়াছিলে প্রভু, ধর্ম্মের গ্লানি সমুপস্থিত হইলে, আবির্ভূত হইবে। কই ভগবান্, আজও ত আসিলে না; আমি যে তোমার প্রতীক্ষায় নিরন্তর আকাশ পানে চাহিয়া বসিয়া আছি। আর কত দূরে, প্রভু?"

শান্তিপুর গ্রাম, গঙ্গার উপকূলে। এখন জাহ্নবী গ্রাম হইতে একটু সরিয়া গিয়াছেন, আগে নিকটেই ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহ গঙ্গার ধারে। গৃহ-প্রাঙ্গণে কয়েকজন ভক্তসহ আচার্য্য উপবিষ্ট। শুক্লাম্বর, গঙ্গাদাস, শ্রীবাস, ত্রিকূট স্বামী প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন।

শুক্লাম্বর কহিলেন, "সত্যই কি ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়েছে?"

গঙ্গাদাস একটু অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর করিলেন, "গ্লানির আর বাকি কি ব্রহ্মচারী? সমাজ গিয়াছে, আশ্রম গিয়াছে, আমরা ধর্ম্মের একটা কঙ্কাল ধরিয়া আছি মাত্র।"

শ্রীবাস। ঠিক বলেছ গঙ্গাদাস। যে দিকেই দেখি না কেন, সেই দিকেই দেখি, জনসমাজ দেহ ও ইন্দ্রিয়-সেবায় ব্যস্ত—পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিরা, কপিল-জৈমিনির পতাকা-হস্তে কেবল তর্ক করিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় ছুটাছুটি করিতেছেন। দৃপ্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ ভগবানের বিগ্রহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া অনুরাগহীন চিত্তে বিশ্বময় প্রেমময়ের গ্লানি করিয়া বেড়াইতেছেন। জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিক প্রভৃতি বহুভর মত আসিয়া জনসমাজের চিত্ত লইয়া নানা-পথে টানাটানি করিতেছে; কত ভণ্ড প্রতারক, সাধুর বেশ ধরিয়া কামিনী-কাঞ্চন সংগ্রহার্থে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আবার কত লোক তপস্বীর সাজ-সজ্জা গ্রহণ করত সরল মনুষ্যদিগকে বঞ্চনা করিয়া ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপর ঘৃণা আহ্বান করিয়া আনিতেছে। গৃহস্থদের মধ্যেই বা ধর্ম্ম কোথায়? তাহারা জানে শুধু উদরপূর্ত্তি আর স্ত্রী-পুত্র পরিপালন; আর জানে হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা—

শুক্লাম্বর। নারায়ণ, নারায়ণ, চুপ কর।

আচার্য্য। এস গোবিন্দ, তোমার সন্তানদের রক্ষা করিবে এস।

ত্রিকূট। তুমি কি সত্যই মনে কর আচার্য্য, ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন?

আচার্য্য। আমি সত্যই তা মনে করি, তিনি পুনঃপুনঃ আসিয়াছেন, এবারও আসিবেন। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে তিনি উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন না।

শ্রীবাস। তিনি দেহ ধারণ ক'রে আমাদের মধ্যে আসবেন, এমন দিন কি হবে?

শুক্লাম্বর। ভগবান্, তত দিন আমায় বাঁচায়ে রাখ, আমি যেন তোমায় না দেখে মরি না।

শ্রীবাস। আর ভগবান্, আমার মত পাপিষ্ঠ তোমায় পাছে দর্শন করে, এই ভয়ে তুমি যদি জন্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হও, তা হ'লে বল, আমি ম'রে যাই; কিন্তু তুমি এস।

ত্রিকূট। আমার মনে হয়, এ সব আচার্য্যের কল্পনা মাত্র।

আচার্য্য। কল্পনা বলিতেছ ত্রিকূটস্বামী? তোমার তারকেশ্বর তীর্থ প্রতিষ্ঠা কল্পনা হইতে পারে; শাস্ত্র পুরাণ বেদ কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্ স্বয়ং যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না

শুক্লাম্বর। স্বীকার করিলাম, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতীকার কি? ভগবান্ আসিয়া কি করিবেন?

আচার্য্য। যুগে যুগে এক ভাবের গ্লানি উপস্থিত হয় না, বা একরূপেই তাহার প্রতীকার হয় না। দয়াময় এবার শাসন করিতে আসিতেছেন না, এবার ভালবাসা বিলাইতে আসিতেছেন। এস, আমরা

সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ডাকি; তিনি দয়াময়, ভক্তের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিবেন না। ডাকে সাড়া তিনি চিরদিন দিয়াছেন, এবারও দিবেন। ডাক শ্রীনিবাস, তোমার কৃষ্ণকে ডাক।—

"চেয়ে আছে জগৎ সতৃষ্ণ,
এস জগতের প্রাণ, এস প্রাণেরি প্রাণ,
এস নয়নাভিরাম কৃষ্ণ।
এস চিৎ, এস রসকান্তি,
এস জগতের আলো, এস রাধিকার কালো,
এস দয়া, এস ক্ষমা শান্তি॥
এস হরি এস প্রাণবঁধু হে,
এস শক্তি, এস কর্ম্ম, এস জ্ঞান, এস ধর্ম্ম,
এস প্রীতি, এস গীতিগন্ধ।
সম্বরি বিরাট রূপ রুদ্র,
অসীম সসীম হয়ে, এস হে গোপাল হয়ে,
ছোটে বুকে এস হয়ে ক্ষুদ্র॥
মায়া-কারাগারে ধরা-বন্ধ,
এস জ্ঞান জড় দেহে, এস মুক্তি কারাগৃহে,
এস প্রীতি, এস গীতিগন্ধ।
এসেছিলে শাসিতে ও নাশিতে
এবার বাঁশরী তব গাবে গান অবিরত,
এবার আসিছ (শুধু) ভালবাসিতে॥"

সঙ্গীত-ঝঙ্কার আকাশ পৃথিবী প্লাবিত করিয়া সকাতর প্রার্থনা লইয়া কোথায় ছুটিল। যাহারা আহ্বান করিতেছিলেন, তাঁহারা যুক্তকর, গলদশ্রু, ভক্তিবিহ্বল। আচার্য্য অনুভব করিলেন, পৃথিবী-ব্যোম স্তব্ধ হইয়াছে—একটা অব্যক্ত শক্তি তাঁহাকে যেন বেষ্টন করিয়াছে—একটা মহাজ্যোতিঃ যেন আকাশতলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অঙ্গ কণ্টকিত হইল; তিনি আবেগে কাঁপিয়া উঠিলেন।

সঙ্গীত ঝঙ্কার শূন্যে মিলাইতে না মিলাইতে শ্রীবাসের সহোদর শ্রীনিধি, শ্রীকান্ত প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণব ব্যস্ততাসহ ছুটিয়া আসিয়া আচার্য্যের চরণে পতিত হইলেন; কহিলেন, "আচার্য্য, রক্ষা কর, আমাদের ধর্ম্ম আর থাকে না; আপনার উপদেশমত আমরা গৃহে বসিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলাম, প্রতিবেশীরা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের প্রহার করিয়াছে।"

মহাতপস্বী আচার্য্য ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বসন বিস্রস্ত; দেহ তেজোদীপ্ত, নয়ন অনলবর্ষী। সহসা বাক্য-স্ফুরণ হইল না।

শুক্লাম্বর কহিলেন, "হা ভগবান্, তবে আর তুমি এ পাপ ধরায় এলে না? আমি যে অনেক আশা করেছিলাম দীননাথ!"

আচার্য্য হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন; চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—

"শুন শ্রীনিবাস! * গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনি আসিয়া,
বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
যদি নাহি পারি তবে এই দেহ হৈতে
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ,
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥ †

দ্বিতীয় অধ্যায়

রূপ সনাতন—বাল্যে

তা'র পর অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে যশোহর জেলায় যে স্থান দিয়া ভৈরব-নদ বহিয়া যাইত, এখন আর সে স্থান দিয়া বহিয়া যায় না। যে গ্রাম নদের দক্ষিণে ছিল, এক্ষণে তাহা বামে। নদী চিরদিনই কমলার ন্যায় চঞ্চলা; কিন্তু এ চাঞ্চল্য নদের পক্ষে অশোভনীয়।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ভৈরব, প্রেমভাগ গ্রামের পদ ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত, এখন কিছু দূরে সরিয়া গিয়াছে। দু'খানি গ্রাম—জগন্নাথপুর ও তপনভাগ—প্রেমভাগের পাশে ছিল, এখন নদ তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে সরাইয়া দিয়াছে। তিনখানি গ্রামই অতি সুন্দর; বড় বড় গাছগুলির পত্রপূর্ণ মাথা, পাশে হরিদ্রাবর্ণ ক্ষেত্র, সমুন্নত ও উজ্জ্বল ঘরগুলি বড়ই চিত্তাকর্ষক।

আমাদের প্রেমভাগ ‡ লইয়া প্রয়োজন। অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। গ্রামের মালিক কুমারনাথ গ্রামেই বাস করেন। তিনি বিতাড়িত কর্ণাট-রাজ

---

* এই শ্রীনিবাস সম্ভবত প্রভুর পার্ষদ শ্রীবাস। প্রভুর ভক্ত এক শ্রীনিবাস ছিলেন; প্রভুর যখন উনত্রিশ বৎসর বয়স, তখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন; আর তাহার বাড়ীও এতদঞ্চলে ছিল না—তাহার জন্মভূমি শ্রীখণ্ডের নিকট জাজিগ্রামে। ইনি ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য।

† শ্রীচৈতন্যভাগবত। দুই এক স্থানে ভাষা একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

‡ বর্ত্তমান কালে পদ্মভাগ নামে অভিহিত হয়। যশোহর রেল লাইনের চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে।

রূপেশ্বরের বংশধর। কুমার ভরদ্বাজ-গোত্রোদ্ভব যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ; বিষয়-সম্পত্তি যথেষ্ট। তাঁহার পিতামহ পদ্মনাভকে রাজা দনুজমর্দ্দন যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। কাটোয়ার সন্নিকটে নৈহাটী গ্রামে তাঁহাদের অনেক সম্পত্তি ছিল; কুমারের পিতা মুকুন্দ, নৈহাটী ত্যাগ করিয়া প্রেমভাগে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সহোদরেরা নৈহাটীতেই রহিলেন।

কুমারনাথের তিন পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ অমর সম্প্রতি নবদ্বীপের বিখ্যাত আচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন,—তিনি পিতাকে লুকাইয়া আর একটা জিনিস শিখিয়া আসিয়াছেন,—সেটি পারস্য ভাষা। শিক্ষক—সপ্তগ্রামের বিখ্যাত মৌলবী সৈয়দ ফখ্রুদ্দীন। অমরনাথ প্রতিভাবলে বিংশতি বর্ষ বয়সে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুত্র—সন্তোষকুমার, অমরনাথ অপেক্ষা নয় বৎসরের ছোট। তাঁহার শিক্ষা-গুরু অমর। তিনি স্বগৃহ ছাড়িয়া গুরুগৃহে কখন যান নাই। অমর যাহা গুরুগৃহে শিক্ষা করিতেন, তাহা যখন তিনি স্বগৃহে আসিতেন, তখন তাহার প্রাণপুত্তলি সন্তোষকে শিখাইয়া যাইতেন। সন্তোষ একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না।

কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপ, তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক মাত্র। তাঁহার শিক্ষাগুরু সন্তোষকুমার।

কন্যা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। তাঁহার বিবাহ মাধাইপুরের * ভূস্বামী বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ শ্রীকান্তের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। মাধাইপুর, গৌড় হইতে বেশী দূর নয়। শ্রীকান্ত গৌড়ের রাজ-সরকারে চাকুরি করিতেন; মুরুব্বি এবং প্রতিভা ছিল না, সুতরাং উন্নতিও করিতে পারেন নাই।

একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভৈরব-উপকূলে দুই ভাই অমর ও সন্তোষ—যাহারা পরে সনাতন ও রূপ নামে ভারতে খ্যাত হইয়াছিলেন,—রূপে নদীকূল আলো করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সন্নিকটে একখানি বৃহৎ প্রস্তর পতিত ছিল, অমর অবলীলাক্রমে তাহা ঈপ্সিত স্থানে টানিয়া আনিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। সন্তোষ তাঁহার দাদার অসামান্য শক্তি দৃষ্টে বিস্মিত হইলেন। তিনি জানিতেন, তাঁহার দাদার মত পণ্ডিত, বলশালী ও রূপবান্ জগতে নাই।

দাদাকে দেখিতে দেখিতে সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা দাদা, পড়ুয়াদের মধ্যে তোমার মত পণ্ডিত আর কেউ আছে?"

অমর হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমার চেয়ে বড় পণ্ডিত নবদ্বীপে অনেক আছেন।"

সন্তোষ। ইস্, তা' আর হ'তে হয় না। বাবা বলেছেন, তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

অমর। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারি, কিন্তু যারা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন, এমন পড়ুয়া অনেক সেখানে আছেন।

সন্তোষ। আচ্ছা, তুমি একে একে তাঁদের নাম বল দেখি, আমি এর পরে দেখ্‌ব, কে তোমার চেয়ে বড় হয়।

অমর। কত নাম বল্‌ব সনু? আগে ধর মুরারি গুপ্ত; তিনি আমাদের চেয়ে যদিও বয়সে অনেক বড়। তা'র পর মুকুন্দ; আহা, তাঁর কি মধুর কণ্ঠ! গদাধর এখন ছোট, কিন্তু কি রূপ তার! তা'র পর রঘুনাথ, এর মধ্যেই তিনি ন্যায়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত; একখানি দীধিতি ব'লে বই লিখেছেন; সে রকম বই লেখা আমার পাণ্ডিত্যে কুলায় না। কিন্তু সকলের উপর একজন আছেন; তাঁর বয়স বেশী নয়, মাত্র ষোল বৎসর; কিন্তু এরূপ প্রতিভাবান্ বালক পৃথিবীতে সম্ভবত কোন কালে জন্মায় নাই।

সন্তোষ। তাঁর নাম কি?

অমর। বিশ্বম্ভর—লোকে নিমাই পণ্ডিত ব'লে ডাকে। এমন অদ্ভুত বালক নবদ্বীপে কেহ কখন দেখে নাই। এই বয়সেই তিনি সার্ব্বভৌমের টোলে ন্যায় পাঠ শেষ করিয়া নিজে একটি টোল করিয়াছেন।

সন্তোষ। তাঁর টোলে পড়ুয়া হয়েছে?

অমর। অনেক; তাঁর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে পড়ুয়াগণ মহাভাগ্য বলিয়া মনে করে। আমারই ইচ্ছা হয়—

সন্তোষ। কি ইচ্ছা হয় দাদা?

অমর। তাহার পড়ুয়া হইতে। তাহার নিকট পাঠ লই বা না লই, তাঁহার অতুলনীয় সুন্দর মুখখানি দিনরাত দেখিতে বড় সাধ হয়।

সন্তোষ। তিনি কি এত সুন্দর?

অমর। তিনি যে কত সুন্দর, তাহা তুমি কল্পনায় আনিতে পারিবে না। তিনি সকল বিষয়ে বড়—চাঞ্চল্যে, প্রতিভায়, পাণ্ডিত্যে, সৌন্দর্য্যে তাঁহার সমকক্ষ নবদ্বীপে নাই—বোধ হয় জগতেও নাই। আমার মনে হয়, তাঁহার সঙ্গে আমার জীবন জড়িত।

* বর্ত্তমান মালদহ রেল ষ্টেশনের সন্নিকট।

সন্তোষ। দাদা, আমি একবার নবদ্বীপে যাব?

অমর। তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়ে থাকে, যাও; আমি গৌড়ে চলিলাম।

সন্তোষ। সেখানে কেন দাদা?

অমর। শ্রীকান্ত দাদা লিখেছেন যেতে। এখন আমি শীঘ্র ফিরব না সনু! যদি কখন মানুষ হয়ে দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারি, তবে ফিরব; নতুবা এই শেষ ভাই।

সন্তোষ। আমি যে তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারব না দাদা?

অমর। আমিই কি পারব সনু? কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

সন্তোষ। আচ্ছা দাদা, গৌড়ে না গেলেই কি নয়?

অমর। না গেলেই নয় ভাই। আমি মানুষ হ'তে চাই—এমন কীর্ত্তি রেখে যেতে চাই, যা' অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ কখন ভুলবে না।

সন্তোষ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দাদার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

হরিদাস

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত বুঢন নামে একটি পরগণা আছে। সেই পরগণার মধ্যে নদীর তীরে একখানি গ্রাম আছে। সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে গ্রামের নাম ছিল, ভাট কলাগাছি; এখন নাম হয়েছে, ভাট্‌লা-কেরাগাছি। গ্রামের অধিবাসী সকলেই হিন্দু; কিন্তু শাসনকর্ত্তা মুসলমান। শাসনকেন্দ্র, খলিফাবাদ (আধুনিক বাগেরহাট)।

মনোহর বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ; কলাগাছিতে বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। পত্নীর নাম উজ্জ্বলা, শিশু পুত্রের নাম হরিদাস। গ্রামবাসীরা সুখে দুঃখে এক রকমে দিন কাটাইতেছিল; সহসা তাহারা একদিন সভয়ে দেখিল, মুসলমান পাইক দলে দলে পার্শ্ববর্ত্তী গণ্ডগ্রাম ভাট্‌লায় প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ভয় পাইয়া নদীর পথে পলাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তথায় পথরোধ করিয়া কালান্তক যমের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, স্বয়ং মহম্মদ পীর আলি। তিনি শাসনকর্ত্তা খাঁ জাহান আলির প্রধান কর্ম্মচারী। শাসনকর্ত্তার চেয়ে হিন্দুরা পীর আলিকে বেশী ভয় করিত; কেন না, পীর আলি বেহেস্ত গমনের আশায় সুবিধা পাইলেই কাফের ধরিয়া তাহাকে পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। মূর্খ হিন্দুরা পীর আলির ধর্ম্মের মহিমা না বুঝিয়া সুবিধা ও সুযোগ পাইলে পলায়ন পূর্ব্বক তাহাদের অপবিত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিত; যখন পারিত না, তখন কাঁদিতে কাঁদিতে পীর আলির বেহেস্তের পথ পরিষ্কার করিত। এইরূপে কত গ্রাম, কত সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। আবার যাঁহারা নবধর্ম্মে দীক্ষিত মাননীয় ব্যক্তিদিগের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিলেন, তাঁহারাও সমাজচ্যুত ও পিরালী নামে আখ্যাত হইলেন।

ভাট্‌লা ও কলাগাছির কেহই অব্যাহতি পাইল না; সকলকেই ধরিয়া মুসলমান করা হইল। তাহাদের এই দারুণ দুঃখের মধ্যে এইটুকু সুখ রহিল যে, তাহাদের প্রতিবাসীরা সকলেই সমধর্ম্মাবলম্বী—কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিবার নাই। মুসলমান হইয়াও তাহারা সহসা শিবপূজা বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করিল না। প্রাণের প্রাণ, আত্মীয়ের আত্মীয়কে তাহারা সহসা কিরূপে ত্যাগ করিবে?—পারিল না—দুই তিন পুরুষ পারিল না।

মনোহর ও উজ্জ্বলা মুসলমান হইয়া বেশী দিন পৃথিবীতে রহিলেন না। হরিদাস সাত বৎসর বয়সে পথে দাঁড়াইলেন। কোনও দয়ার্দ্রচিত্ত প্রতিবাসী তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন।

আশ্রয়দাতা মুসলমান। হরিদাসকে আল্লা নাম শিখান হইল, হরিদাস বলিলেন, হরি কৃষ্ণ নারায়ণ। হরিদাসকে কোরাণ পড়িতে দেওয়া হইল; হরিদাস পড়িলেন, ভাগবত। হরিদাসকে মসজিদে নেমাজ করিতে লইয়া যাওয়া হইল, হরিদাস সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কোথায় আমার দয়াল হরি!" প্রচুর ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা হরিদাস উপভোগ করিলেন, কিন্তু হরি নাম কেহ তাঁহাকে ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে পীড়ন আরম্ভ হইল। ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে; হরিদাস যখন আর নির্য্যাতন সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন বিংশতি বর্ষ বয়সে জন্মভূমি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেন।

নিরাশ্রয় নির্য্যাতিত হরিদাস বেনাপোলের জঙ্গলে আসিয়া একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। কুটীর-পার্শ্বে ভক্তিরোপিত অশ্রু-সিঞ্চিত তুলসী-মঞ্চ।*

* তুলসী-মঞ্চ, যশোহর সন্নিকটে বেনাপোল রেল-ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর তথায় উৎসব হয়।

তাঁহার সঙ্গী তুলসী; পাঠ হরিগুণ গান; কার্য্য হরিনাম জপ। তিনি মানুষকে চান না, কিন্তু মানুষ তাঁহাকে ছাড়ে না। অনেক ভক্ত আসিয়া জুটিল।

হরিদাসের কুটীর হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একখানি বড় গ্রাম। গ্রামের নাম কাগজ পুকুরিয়া। চতুঃপার্শ্বের—মালিক, শান্তিধর—রাজদত্ত-উপাধি, রামচন্দ্র খাঁ। তিনি হিন্দু, কিন্তু মুসলমানের পক্ষপাতী; তিনি ব্রাহ্মণ, কিন্তু অসদাচারী। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প প্রচলিত আছে—কোন কোন ইতিহাসেও স্থান পাইয়াছে; কিন্তু অনেকের সে সকল গল্পে শ্রদ্ধা হয় না। কিম্বদন্তী আছে, গৌড়ের রাজা হোসেন সা, পিতৃ-পরিত্যক্ত হইয়া বাল্যকালে শান্তিধরের গো-পালকের কার্য্য করিতেন। একদিন শান্তিধর দেখিলেন, গোচারণ-ভূমিতে বৃক্ষতলে নিদ্রিত হোসেন খাঁর মস্তক, দুইটি বিষধর সর্প, চক্র ধরিয়া সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। শান্তিধর বুঝিলেন, এ বালক একদিন সিংহাসনে বসিবে। তিনি হোসেন সাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দান করিয়া সসম্মানে বলিলেন, "তুমি যদি কোন দিন রাজা হও, তাহা হইলে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিও।" হোসেন সা প্রতিশ্রুতি দিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। তার পর যখন তিনি রাজ-সিংহাসনে বসিলেন, তখন শান্তিধরকে বিনা খাজনায় কাগজ পুকুরিয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম দান করিলেন। *

আর একটি গল্প আছে, একদা নিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে শক্তি-উপাসক শান্তিধরের গৃহে উপনীত হন। শান্তিধর তাঁহাকে অপমানিত করায় নিত্যানন্দ অভিসম্পাত করেন। অভিসম্পাতের ফলে শান্তিধর সপরিবারে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া দেহত্যাগ করেন।

এই রকম কয়েকটি অশ্রদ্ধেয় গল্প প্রচলিত আছে। যিনি বৈষ্ণব অথবা সুবিবেচক, তিনি কখনও বিশ্বাস করিবেন না যে, নিত্যানন্দ-প্রভু কখন কাহাকেও অভিসম্পাত প্রদান করিতে পারেন। যিনি প্রেমের নিকেতন, তিনি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেন না। ইতিহাসে এই সব মিথ্যা উঠিয়াছে বলিয়া এত কথা লিখিতে হইল।

তবে এটা সত্য কথা যে, রামচন্দ্র খাঁ অতি দুরাচারী ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, বৈষ্ণব হরিদাস জনসাধারণের ভক্তিপ্রীতি আহরণ করিয়া দিবারাত্র হরিনাম ধ্বনিতে স্থাবর-জঙ্গম মধুময় করিয়া তুলিতেছেন, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মধু, বিষ বলিয়া মনে হইল এবং সেই বিষধরকে নানা উপায়ে পীড়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা নিশীথে হরিদাস যখন নামগানে উন্মত্ত, তখন তাঁহার কুটীরে অগ্নি সংযোগ করিলেন। শত শত প্রজা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল এবং পরদিন বড় করিয়া একখানি ঘর তুলিয়া দিল। রামচন্দ্র খাঁর অনেক হাতী ছিল। তিনি হস্তি-রক্ষকদের উপযুক্ত উপদেশ দিয়া হরিদাসকে হত্যা করিতে প্রেরণ করিলেন। হরিদাস একবার মধ্যাহ্নে ভিক্ষার্থে বহির্গত হইতেন; একদা বাহির হইয়াছেন, সেই সময় হস্তি-যূথ আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিল। হরিদাস পিছাইলেন না—যুক্তকরে মুদ্রিত-নয়নে কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। জানি না কেন, হস্তিযূথ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। এই প্রকারে অনেক চেষ্টা চলিতে লাগিল, কিন্তু রামচন্দ্র খাঁ কিছুতেই সফল-মনোরথ হইলেন না। অবশেষে হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

চরিত্রহীন রামচন্দ্র খাঁর হীরানাম্নী এক বেশ্যা ছিল। সম্ভবত তাহার রূপ ও বয়স যথেষ্ট ছিল; গর্ব্বেরও কিছু অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। দেশের অধিপতি যাহার চরণে লুণ্ঠিত, তাহার গর্ব্ব না থাকিলে কিঞ্চিৎ অশোভন হইত। রামচন্দ্র সন্নিকটস্থ রাজাপুর গ্রামে তাহার জন্য এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং পঙ্খী-তরণীতে চড়িয়া খাল বহিয়া হীরার গৃহে যাতায়াত করিতেন। সে খাল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গ্রাম ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু হীরার অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আজও আছে; আর আছে তাহার স্মৃতি।

গর্ব্বভরে হীরা, রামচন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, তিন দিবসের মধ্যে সে হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিবে। নানালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া হীরা একদা সন্ধ্যাকালে হরিদাসের কুটীরে আসিয়া দর্শন দিল। হরিদাস তখন জপে নিবিষ্টচিত্ত। তিনি মৃদুস্বরে বা মনে মনে জপ করিতে জানিতেন না—গগনবিদারী উচ্চকণ্ঠে জপ করিতেন। পাবনানাং পাবন হরিনাম নিজে শুনিয়া দেহ পবিত্র করিতেন, আর পশুপক্ষী, স্থাবর-জঙ্গম, মানুষ বা প্রেত, যে কেহ নিকটে থাকিত, তাহাকে শুনাইয়া পবিত্র করিতেন। তিনি জপ করিতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে—

হীরা শুনিল, অদূরে বসিয়া শুনিতে লাগিল।

* এক-আনি চাঁদপাড়ার জনৈক ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে।

হরিদাসের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ, তিনি হীরাকে দেখিতে পাইলেন না। হীরা অলঙ্কার-শিঞ্জিতে তাহার উপস্থিতি জানাইল; হরিদাসের কর্ণ তখন নাম শুনিতে উন্মত্ত, অলঙ্কারের শব্দ শুনিতে পাইল না। হীরার কণ্ঠে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য ছিল, সে তাহা নাড়িয়া দোলাইয়া গন্ধ ছড়াইতে লাগিল, হরিদাসের নাসিকা সে গন্ধ লইল না—সে তখন লক্ষ পুষ্পের গন্ধে পূর্ণ। হরিদাসের মন আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে হীরা হস্ত প্রসারণ করিল; কিন্তু হীরার হাত শূন্য হইতে ফিরিয়া আসিল—একটা প্রবল শক্তি যেন ফিরাইয়া দিল। সাহস ভঙ্গ হইয়া হীরা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; কিন্তু তাহার চঞ্চল মন, গর্ব্বিত হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না—সে তাহার কবরী হইতে দুইটা ফুল লইয়া হরিদাসের অঙ্গোপরি সজোরে নিক্ষেপ করিল। হরিদাসের সমাধিভঙ্গ হইল; তিনি অশ্রু মুছিয়া হীরার পানে চাহিলেন। হীরা তাহার অস্ত্রাদি দেখাইল। হরিদাস তাহার মনোভাব উপলব্ধি করিয়া কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি জপ সারিয়া লই।"

হীরা অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল; জপের বিরাম নাই, তখন সে নিদ্রালু হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে হীরা আবার আসিল। হরিদাস তখন জপ আরম্ভ করিয়াছেন। হীরা সন্নিকটে ভূম্যাসনে বসিল এবং গান ধরিবার উপক্রম করিল। হরিদাস বলিলেন, "আপনাকে কাল বড় কষ্ট দিয়েছি, আজ সত্বর জপ সেরে নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করব।" হীরা আর গাইতে পারিল না, কে যেন তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিল; হীরা নীরবে বসিয়া রহিল।

হরিদাস তখন তাঁহার গান ধরিলেন। সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত, এমন গান পৃথিবীতে আর কেহ গায় নাই। হরিদাস মধুময় কণ্ঠে গাইতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে,
হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে।

রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ততই সঙ্গীত-উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল। স্থাবর জঙ্গম উৎকর্ণ হইয়া গান শুনিতে লাগিল, নদী তাহার কলরব বন্ধ করিয়া সে মধুময় সঙ্গীত শুনিতে উথলিয়া উঠিল, আকাশের দেবতারা পবিত্র হইতে সে সঙ্গীত শুনিতে আসিলেন। গভীর নিশি, জগৎ স্তব্ধ। হীরা দেখিল, হরিদাসের বক্ষ বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইতেছে, দেহ উচ্ছ্বাসভরে আন্দোলিত, কণ্ঠ আবেগে কম্পিত; অস্পষ্ট দীপালোকে দেখিল, হরিদাসের মস্তকের কেশরাশি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা জ্যোতিঃ যেন তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁহার কণ্ঠকে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠাইতেছে। শুনিতে শুনিতে দেখিতে দেখিতে হীরা ভাবিল, এ ত জপ নয়, এ যে সঙ্গীত; ক্রমে ভাবিল, এ ত সঙ্গীত নয়, এ যে আহ্বান; এ ত আহ্বান নয়, এ যে স্তব। এমন মিষ্ট নাম ত কখন শুনি নাই, এমন গান, এমন ঝঙ্কার আমার কাণে কখন আসে নাই। আমিও ডাকি না কেন? আমি কি দুঃখে ডাক্‌তে যাব? যে কাঙ্গাল ভিখারী, সেই ভগবান্‌কে অর্থের জন্য ডাক্‌বে। আমার কিসের অভাব? কিন্তু—কিন্তু বেশ মিষ্ট নাম। রাত অনেক হয়েছে বটে, কিন্তু আরও খানিক শুনি।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল; হীরা স্তব্ধ হইয়া নাম শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে হীরার প্রাণের ভিতর হইতে সহসা কেমন একটা কান্নার রোল উঠিল —চীৎকার করিতে কেমন একটা অদম্য বাসনা জাগিল—হীরা কাঁপিয়া উঠিল—মহার্ঘ্য বসন-পরিহিতা হীরা ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িল। চক্ষুতে জল, কেন, তা' সে জানে না; হৃদয়ের ভিতর হাহাকার ধ্বনি, কোন্ অভাবে, তা' সে বুঝে না। হীরা নাম করিতে আরম্ভ করিল—হরিদাসের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া হীরা নাম করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হরিদাসের সমাধিভঙ্গ হইল—তিনি হীরার পানে চাহিয়া দেখিলেন। হীরা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া নাম বন্ধ করিল এবং চিত্ত সংযম করিয়া গম্ভীরভাবে কুটীর ত্যাগ করিল।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে হীরা যখন হরিদাসের কুটীর উদ্দেশে চলিল, তখন তাহার পরিধানে সামান্য বস্ত্র, অঙ্গ অলঙ্কারশূন্য। হীরা পথে আসিতে আসিতে দূর হইতে শুনিল, সঙ্গীত-ঝঙ্কার উঠিয়াছে। হীরার বুকের ভিতর সপ্ত স্বর জাগিয়া উঠিল; হীরা হাঁটিতে হাঁটিতে গাইতে লাগিল—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে।

সহসা তাহার পথরোধ করিয়া রামচন্দ্র খাঁ দাঁড়াইলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, "হীরা, এই মলিন বেশে কি তুমি হরিদাসকে ভুলাইতে যাইতেছ?"

হীরা। কাঙ্গালের কাছে কাঙ্গালের বেশই ভাল।

রাম। আর হরিনাম গান?

হীরা। এটাও ঠিক; হরি-ভক্তকে হরিনামে ভুলাতে হয়?

রাম। আর বিমর্ষ বদন ?

হীরা। হাসি শুধু তোমার জন্যে।

রাম। কিন্তু আজ শেষ দিন, স্মরণ রাখিও।

হীরা। স্মরণ আছে।

রামচন্দ্র প্রস্থান করিলেন। হীরা কুটীরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নদীতে নামিয়া হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিল। হীরা আজ উপবাসী ; আহারে রুচি ছিল না, তাই আজ উপবাস করিয়াছে। হীরা তুলসীতলে প্রণাম করিল ; পরে কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, হরিদাসের পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত ভাব ; শ্রোতাকে উন্মত্ত করিয়া নিজেও উন্মত্ত হইতেছেন। হীরা আসিয়া দ্বার-প্রান্তে বসিল।

নাম ঝড়বেগে বহিয়া চলিযাছে। কণ্ঠ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উঠিল—সঙ্গীত-ঝঙ্কার পৃথিবী মুগ্ধ করিয়া আকাশের দিকে ছুটিল। হীরা মুগ্ধচিত্তে আত্মহারা হইয়া নাম শুনিতে লাগিল। যতই শুনিতে লাগিল, ততই তাহার দেহ অবশ হইযা আসিতে লাগিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দিয়া বারিধারা গড়াইতে লাগিল—তাহার বসন ভিজিল, পৃথিবী ভিজিল ; তাহার হৃদয়মধ্যে নাম ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—তাহাকে আর নাম জপ করিতে হইল না—নাম আপনিই চলিতে লাগিল। সে জপের বেগ রোধ করা হীরার সাধ্যাতীত—এক অভিনব শক্তি কোথা হইতে আসিয়া হীরাকে অভিভূত করিল। হীরা ধূলিধূসরিতা, কম্পিতকলেবরা। রাত্রি তৃতীয় প্রহর যখন অতীত-প্রায়, তখন হরিদাসের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, হীরা দ্বারপার্শ্বে রোরুদ্যমানা। ডাকিলেন, "বাহিরে কেন মা, ভিতরে এস।"

এই প্রথম মাতৃ-সম্বোধন। লক্ষপুত্র এককালে মা বলিয়া ডাকিলে হীরার কাণে এমন মিষ্ট শুনাইত না। হীরা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আসিল। সে তখন স্নান করিয়া শুচি হইয়াছে—চোখের জলে ; ভিতরের আবর্জ্জনা পুড়াইয়া পবিত্র হইযাছে—হরিনামানলে ; দুষ্প্রাপ্য চন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াছে—অশ্রুসিক্ত মৃত্তিকায়। হরিদাস স্নেহভরে বলিলেন, "তোমাকে দুই দিন কষ্ট দিযেছি, আজ তোমার সহিত আলাপ করব—বসো।" হীরা আছাড় খাইয়া হরিদাসের দেব-বাঞ্ছিত চরণের উপর পড়িল। হীরা সেই পবিত্র চরণস্পর্শে শিহরিয়া উঠিল—একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আসিয়া তাহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে অভিভূত করিল। হীরা একবার সচকিতে বলিয়া উঠিয়াছিল, "একি!" তার পর তার কণ্ঠরোধ হইল। হীরার মস্তকে হস্ত বিমর্ষণ করিতে করিতে হরিদাস বলিলেন, "উঠ মা!"

হীরা উঠিল ; যুক্তকরে গলদশ্রুলোচনে কহিল, "বাবা, আমাকে ক্ষমা কর।"

হরি। তোমার অপরাধ কি মা? তোমার পাপ ক্ষয় হযেছে, তুমি এক্ষণে অতি পবিত্র।

হীরা। বুঝেছি, তুমি এ পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করতে এ দেশে এসেছ। বাবা, আমার উপায় কর।

হরি। লও মা, কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র গ্রহণ কর।

হীরা। এ নাম এতদিন কোথায় ছিল বাবা? কতদিন কত লোকের মুখে হরিনাম শুনেছি, কিন্তু কখন ত প্রাণের ভিতর এ নাম প্রবেশ করে নি। এ নাম যে আমাকে পাগল ক'রে তুলছে বাবা!

হরি। এখন আমি চলিলাম মা!

হীরা। না বাবা ; যেও না—তুমি গেলে আবার আমি ডুবে মরব—আমি বড় দুর্ব্বল।

হরি। আর ভয় নেই মা, এই নাম তোমায় রক্ষা করবেন।

হীরা। আমি কি নিযে থাকব বাবা?

হরি। এই নাম নিযে এখানে থাক্‌বে। যখন কর্ম্ম শেষ হ'বে, তখন শ্রীক্ষেত্রে চলে যেও। সময় হলে, শ্রীকৃষ্ণই তোমাকে ডেকে নেবেন।

হরিদাস প্রস্থান করিলেন। হীরা সেই কুটীরেই রহিল। তাহার অনেক বিভব ঐশ্বর্য্য ছিল, তদ্দ্বারা সে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। শ্রীক্ষেত্র-যাত্রীদের সুবিধার্থে তাহার জন্মভূমি হইতে জগন্নাথ-ক্ষেত্র পর্য্যন্ত এক পথ প্রস্তুত করিযা দিল। সে পথ আজও হীরার জাঙ্গাল নামে পরিচিত। হীরা মস্তক মুণ্ডন করিল, এবং যখন সে শ্রীক্ষেত্রে গেল, তখন সে তাহার কেশগুচ্ছ জগন্নাথ দেবের মন্দির-প্রাচীরে টাঙ্গাইযা দিল। কেশগুচ্ছ অনেক দিন তথায় ছিল। দেহ বহু পূর্ব্বে লয হইয়াছিল, কিন্তু যা' ভগবানে অর্পিত, তা' সহজে লয় পায নাই। *

চতুর্থ অধ্যায়

অমর—গৌড়ে

তখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হোসেন সা। তিনি বিচক্ষণ, প্রজাবৎসল। তিনি স্বভাবত হিন্দুদ্বেষী

* তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল,
গৃহবিত্ত যেথা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি একবস্ত্রে রহিলা সে ঘরে,
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে। চৈতন্য-চরিতামৃত।

ছিলেন না, তবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি মুসলমানের পক্ষই অবলম্বন করিতেন।

গৌড়ের পরিচয় বাঙ্গালী শত গ্রন্থে পাইয়াছেন; সুতরাং নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। দুইটা কথা বলা প্রয়োজন; গৌড় নগর এত বিস্তৃত যে, তাহার বহু পল্লী ও বহু বাজার ছিল। রামকেলীর নিকট গঙ্গার উপকূলে এক পল্লী ছিল, ব্রাহ্মণেরা তথায় বাস করিতেন। গোঁড়া মুসলমানেরা গৌড়ের অপরাপর পল্লীতে হিন্দুদিগকে তাহাদের পর্ব্বাদির অনুষ্ঠান করিতে দিত না। দ্বারবাসিনী হইতে রামকেলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত পল্লীর নাম ছিল, ভট্টপল্লী; আনুষ্ঠানিক হিন্দুরা সচরাচর তথায় আসিয়া বাস করিতেন।

একদা সুলতান হোসেন সা নগর-ভ্রমণার্থে অশ্বারোহণে বহির্গত হইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন। প্রাসাদ-সম্মুখে প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত অশ্ব দণ্ডায়মান—শরীর-রক্ষী সৈন্যরাও প্রস্তুত। সুলতান তাঁহার উজীর গোপীনাথ বসুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। গোপীনাথ সুলতানের বড় প্রিয়পাত্র। তিনি উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন, পুরন্দর খাঁ। তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্রকেও সুলতান, শ্রীমন্ত রায় উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহাদের পৈতৃক বাস, হুগলী জেলার অন্তর্গত সেয়াখালা গ্রামে। গৌড়েও তাঁহাদের এক বিশাল অট্টালিকা আছে। গোপীনাথের পশ্চাতে মন্ত্রী কেশব ছত্রী খাঁ; তাঁর পিছনে আরও কতিপয় পদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তাঁদের পিছনে শ্রীমন্ত ও অমর।

হোসেন সা অশ্বপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; অশ্বটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা পুরন্দর বলিতে পার, ভাল ভাল ঘোড়াগুলা এদেশে এসে কেন বিগ্‌ড়ে যায়? মোটা হয়, কিন্তু সে তেজ আর থাকে না।

গোপীনাথ কি উত্তর কবিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ছত্রীর পানে চাহিলেন; ছত্রী গোঁপে মোচড় দিয়া পশ্চাতে চাহিলেন, সকলেই নীরব। এমন সময় অমর অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা, এদেশের ঘাস ঘোড়াকে দুর্ব্বল করে।"

সুলতান। কেন?

অমর। ঘাসে জলের ভাগ বেশী থাকে, তাতে মেদ বৃদ্ধি করে, কিন্তু শক্তির অন্তরায় হয়।

সুলতান। তুমি কি শুক্‌নো ঘাস দিতে বল?

অমর। হাঁ জাঁহাপনা। পাহাড়ে বা কঙ্করময় প্রদেশে যে সব ঘাস জন্মায়, সে সব ঘাসে জলের ভাগ কম। তারা মেদ বাড়ায় না, কিন্তু তেজ বাড়ায়।

সুলতান। তুমি কে যুবক?

অমর। জাঁহাপনার সামান্য ভৃত্য।

সুলতান। উত্তম, তোমাকে অশ্বশালার অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিলাম।

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছু কাল পরে হোসেন সা একদা তাঁহার কর্ম্মচারীদের বলিলেন, "আগামী কল্য প্রভাতে আমি শিকারে যাব; যারা বাঘ দেখে ভয় পাবে না, তারা আমার সঙ্গে চলো।"

বৃদ্ধ গোপীনাথ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "জাঁহাপনা ছাড়া আর কাউকে কখন ভয় করি নি; এখন বয়স হয়েছে—সকলকেই এখন ভয় হয়।"

সুলতান একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি যেতে বলি নি পুরন্দর; যাহারা যুবক ও সাহসী, তাহারা যাবে"

অনেকেই সাজিল। যথাকালে সুলতান প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, প্রাঙ্গণ অশ্বে পূর্ণ। তাহার মধ্যে একটি অতি উচ্চ মহাতেজস্বী অশ্ব সুলতানের নয়নাকর্ষণ করিল; তাহার পৃষ্ঠ যেন ধনুকের ন্যায়, গ্রীবা কতকটা রাজহংসের গ্রীবার ন্যায়, কটিতট ক্ষীণ, ক্ষুরের উপরিভাগও ক্ষীণ; সহস্র ঘোড়ার মধ্যে সেই ঘোড়াটিকে সুলতানের মনে ধরিল। দেখিলেন, সেই অশ্বের বল্গা ধরিয়া দণ্ডায়মান্ রহিয়াছেন, স্বয়ং অশ্বশালাধ্যক্ষ। সুলতান প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ অশ্ব কোথায় পাইলে?"

অমর। জাঁহাপনার শালে ছিল।

সুল। সে কি! এমন ঘোড়া থাক্‌তে আমাকে এতদিন একটা গিধ্বড় দেওয়া হ'ত!

ভূতপূর্ব্ব অশ্বশালা-রক্ষক দেখিল, মহাবিপদ; কি বলিতে যুক্তকরে সে অগ্রসর হইল। অমর তাহাকে সে সুবিধা না দিয়া পুনঃ পুন কুর্ণিশ করিতে করিতে নিবেদন করিলেন, "এর পিঠে চাপ্‌লেই জাঁহাপনা বুঝতে পারবেন, এমন তেজী ঘোড়া সম্রাট লোদিরও নেই।"

সুলতান প্রীতমনে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অমর অশ্ববল্গা ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং সুলতানের অগ্রবর্ত্তী হইয়া, বিলম্বিত বৃক্ষশাখা তরবারির আঘাতে ছেদন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গোপীনাথ প্রভৃতি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া অমরকে দেখিতে লাগিলেন। বিতাড়িত অশ্বশালা-রক্ষক যুক্তকরে উজীরকে কহিলেন, "হুজুর, এ ঘোড়া এখানে ছিল না, হালে দিল্লী হ'তে আনিয়েছে।

একটা মিথ্যাকথা বলে স্বচ্ছন্দে আমাকে অপদস্থ করলে; কথাটা আমাকে ভেঙ্গেও বল্‌তে দিলে না।"

গোপীনাথ বলিলেন, "দেখ কেশব, এই ব্যক্তি ভবিষ্যতে উজীর হ'বে। তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করো না; যা'র প্রতিভা আছে, তা'কে উঠ্‌তে দাও; না দেও, তুমিই মরবে। অমরকে দেখ্‌লে সত্যই আমার আনন্দ হয়।"

কেশব। আপনি থাক্‌তে এই যুবক উজীর হবে?

গোপীনাথ। না, তা' হবে না; কিন্তু আমি আর ক'দিন? বৃদ্ধ হয়েছি, বড় জোর আর দু'চার বছর আছি।

পরদিন প্রভাতে হোসেন সা যখন সভাতে সপার্ষদ উপবিষ্ট, তখন গোপীনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল নাকি জ'াহাপনার বিপদ্ গেছে?"

সুলতান। শিকারের কথা বল্‌ছ? সে আর বিপদ্ কি? তাদের মারতে গেছি, তারা ত আর আমাদের আদর করবে না।

একটা আহাম্মক ভুইয়া বলিয়া উঠিল, "সর্দ্দার অমরনাথ পাশে না থাক্‌লে সের জ'াহাপনাকে আস্ত রাখ্‌ত না।"

অমরনাথ সতেজে বলিয়া উঠিলেন, "যা' আপনি স্বচক্ষে দেখেন নি গাফর আলি, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলবেন না। আপনারা দূরে পলায়িত, আমি ও সুলতান ছাড়া সেখানে আর কেহ ছিল না।"

ভুইয়া। আমি পালাই নি—কাছেই ছিলাম, নিজের চোখে দেখেই বলছি।

অমর। আপনি ভুল দেখেছেন।

একটু হাসিয়া গোপীনাথ, অমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপারটা কি হ'য়েছিল অমর?"

অমরনাথের মুখ লাল হইয়া উঠিল; তিনি অবনতবদনে বলিলেন, "ব্যাপার অতি সামান্য; সুলতান বাঘটাকে সড়্‌কি দ্বারা আঘাত করে মাটীর সঙ্গে গেঁথে ফেললেন; আঘাতটা এত জোরে হয়েছিল যে, সড়্‌কি ভেঙ্গে গেল, বাঘ আবার ঠেলে উঠ্‌ল। আমি—আমি ভয়ে সুলতানের পশ্চাতে লুকিয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লুম, 'সুলতান রক্ষা করুন।' সুলতান তখন খড়্গের আঘাতে ব্যাঘ্রের শিরশ্ছেদ করিলেন। আমি আর করিছি কি? খাঁ সাহেবের মত প্রাণভয়ে না পালিয়ে সুলতানের পশ্চাতে ছিলাম, এই যা।"

সভাতল নিস্তব্ধ; অনেকেই বুঝিলেন, অমরনাথ আগাগোড়া মিথ্যা বলিতেছেন।

সুলতান বলিলেন, "আমার তরবারিও আঘাতের প্রচণ্ডতায় ভেঙ্গে গেছে। আচ্ছা পুরন্দর, এ দেশে ভাল ইস্পাত জন্মায় না কেন?

পুরন্দর ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন উত্তর না দিয়া অমরনাথের পানে চাহিলেন। অমর কি বলিতে উঠিতে'ছলেন, কিন্তু গোপীনাথের সকৌতুক দৃষ্টি, তাঁহার নয়নে পড়িবামাত্র তিনি আর উঠিলেন না। কেশব ছত্রী বলিলেন, "জন্মায় বই কি, জ'াহাপনা।"

সুলতান। তোমার কি অভিপ্রায় অমরনাথ!

অমর। জ'াহাপনার অসুর-বীর্য্য ধারণ করিতে পারে, এমন ইস্পাত দুনিয়ায় জন্মায় নি।

তখন অনেকেই তারিফ করিয়া বলিলেন, "ও তো ঠিক বাৎ।"

সুলতান তখন ডাকিলেন, "সর্দ্দার অমরনাথ!"

অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুলতান। তুমি কি চাও?

অমর। জ'াহাপনার যদি গরীবের প্রতি কৃপা হয়ে থাকে, তবে একটি প্রার্থনা জানাই। জ'াহাপনার এই দরবার অতি পবিত্র। এখানে যদি কেহ মিথ্যা কথা বলে, তবে তার দণ্ড হওয়া উচিত। আমি প্রার্থনা করি, এই ভুইয়া গাফর আলি অতঃপর দরবার হ'তে বিতাড়িত হউক।

গোপীনাথ হাসিয়া ফেলিলেন। ভুইয়া প্রমাদ গণিল। ওমরাহেরা বুঝিল, এই সর্দ্দার যুবক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। সুলতান সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; ভুইয়া গাফর আলি দরবারে আর প্রবেশ করিতে পাইবেন না।"

আরক্তনয়নে অমরনাথের পানে চাইতে চাইতে ভুইয়া দরবার ত্যাগ করিলেন।

সুলতান বলিলেন, "সর্দ্দার অমরনাথ, তোমার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি, দরবার ও রাজ্যের গৌরব। আমি তোমাকে সহর কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত করিলাম।"

অমরনাথ অভিবাদন করিলেন। গোপীনাথ উঠিয়া বলিলেন, "জ'াহাপনা বোধ হয় অবগত নহেন, অমরনাথের একটি ছোট ভাই আছেন; আমার প্রার্থনা, তাঁহাকে অশ্বশালার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন।

সুলতান। আমি সানন্দে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম।

গোপীনাথ। জাহাপনা, এই দুই ভাই একদিন আপনার রাজ্যের স্তম্ভ হইবে। এই বুড়ার

কথা স্মরণ রাখিবেন, এই অমরনাথ হইতে আপনার রাজ্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে; এমন অসাধারণ প্রতিভা আমি কোথাও দেখি নাই।

তা'র দুই বৎসর পরে একদা সুলতান দরবারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বলতে পার, ক্ষুদ্র রাজা ত্রিপুরেশ্বর ধন মাণিক্যের হাতে কেন আমরা পরাস্ত হ'লুম।"

কেহ বলিলেন, সেনাপতি ছুটী খাঁর দোষে।

কেহ বলিল, আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ গৌর মল্লিকের অকস্মাৎ মৃত্যু জন্য।

কেহ বলিলেন, আমাদের সৈন্য কম ছিল, তাই।

এই ভাবে নানারকম উত্তর হইল।

সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অভিমত কোতোয়াল সাহেব?"

অমর। আমাদের নৌকা ছিল না বলে জাঁহাপনা।

সুল। সে কি রকম?

অমর। ও সব পাহাড়ে দেশ—অনেক নদী। বর্ষায় দেশ ভেসে গেল, আমরা দাঁড়াবার স্থান পেলাম না; শত্রু সেনাপতি চয়চাগ সেই সুযোগে আমাদের বিব্রত করে তুল্‌ল—রসদ বন্ধ করে দিল—ঘোড়া কতক মারল, কতক জলে ভেসে গেল। কাজেই শেষে আমাদের পালিয়ে আসতে হ'লো।

বিপুল শ্মশ্রুভারাক্রান্ত সেনাপতি ইসমাইল গাজি উঠিয়া বলিলেন,—"কোতোয়াল সাহেব ঠিক বাৎ বলেছেন।"

সুলতান। অমরনাথ, তোমার তীক্ষ্ণবুদ্ধিদৃষ্টে আমি চমৎকৃত হইলাম। আমি তোমাকে যুদ্ধ-বিভাগের মন্ত্রী করিলাম, আর তোমার উপাধি হইল—সাকের মল্লিক *।

তা'র কিছুকাল পরে—তখন গোপীনাথ সরিয়া পড়িয়াছেন—একদা সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা ত কিছুতেই উড়িষ্যা জয় করতে পারছি না—কোন পরামর্শ দিতে পার, সেনাপতি সাহেব?"

সেনাপতি তাঁহার শ্মশ্রুরাশিকে তোয়াজ করিয়া উত্তর করিলেন, "প্রতাপরুদ্র বড় শক্ত রাজা আছে জাঁহাপনা।"

সুলতান। তা' ত আছে; আমরাই কি নরম?

কেশব। কথা হচ্ছে, আমাদের এখান হতে সেজেগুজে রসদ নিয়ে যেতে হয়, আর—

* জ্ঞানী—শ্রেষ্ঠ।

সুলতান। সে সব কথা আমিও জানি। আমি শুন্‌তে চাই, কোনও উপায়ে আমরা উড়িষ্যা জয় করতে পারি কি না।

কেহ কোনও উত্তর করিলেন না। ক্ষণপরে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি কোন উপায়ের কথা বল্‌তে পার না, সাকর মল্লিক?"

সাকর। জাঁহাপনা, কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হ'তে পারে।

সুলতান। কৌশলটা কি?

সাকর। যখন প্রতাপরুদ্র রাজধানীতে থাক্‌বেন না, তখন আমরা উড়িষ্যা আক্রমণ করব।

সেনাপতি একটু অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমরা কি প্রতাপরুদ্রকে বল্‌ব, 'ওগো তুমি সরে যাও, আমরা উড়িষ্যা আক্রমণ করব'?"

সাকর মল্লিক একটু ভর্ৎসনার সহিত বলিলেন, "ব্যস্ত হবেন না সেনাপতি সাহেব, আমি সুলতানের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন করছি।" পরে সুলতানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমরা দক্ষিণে যুদ্ধ বাধাব, প্রতাপ সসৈন্যে সেই দিকে ছুটে যাবেন; আমরা তখন তাঁহার অনুপস্থিতে সহসা রাজধানী অধিকার করে বসব।"

সুল। দক্ষিণে যুদ্ধ বাধাব কিরূপে?

সাক। তা'র উপায় কঠিন নয়, সে ভার আমি নিলাম।

সুল। তবু উপায়টা কি শুনি?

সাক। দক্ষিণে বিজয়নগর-রাজের সহিত প্রতাপরুদ্রের চিরদিনের বিরোধ। তিনি পুনঃ পুনঃ প্রতাপের হস্তে পরাস্ত হয়ে, প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ অন্বেষণ করছেন। আমরা যদি তাঁহাকে অস্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করবার একটা প্রতিশ্রুতি দি, তা' হ'লে তিনি দক্ষিণে এখনি একটা গোলমাল বাধাতে পারেন।

সুল। উত্তম পরামর্শ, বাঃ বা-! তোমার মত জ্ঞানী ও রাজনীতিজ্ঞ এ সভায় কেহ নাই; সাকের মল্লিক! আমি তোমাকে উজীর পদ দিলাম; আর এই যুদ্ধ-আয়োজনের সমস্ত ভার তোমার উপর রহিল; দক্ষিণে যুদ্ধ বাধাইতে তুমি আগে যাইবে, পরে ফিরিয়া গড় মান্দারণে আমার সহিত মিলিত হইবে; তখন আমরা একত্রে উড়িষ্যা প্রবেশ করিব। বৃদ্ধ গোপীনাথ আমায় বলিয়া গিয়াছিলেন, তোমা হইতেই আমার রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে; তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নয়।

সভাভঙ্গ হইলে উজীর সাকর মল্লিক তাঁহার

প্রাসাদে ফিরিলেন। তাঁহার বদন প্রফুল্ল নয়, কেমন একটু চিন্তান্বিত। অশ্বারোহণে একাকী ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। প্রাসাদ একটু দূরে। রামকেলির উত্তরে সনাতন-খনিত সনাতন-সরোবর; এই সাগরের পশ্চিমে তাঁহার অট্টালিকা। রামকেলিগ্রামে রূপ-সাগরের পূর্ব্বদিকে দবির খাস সন্তোষের প্রাসাদ। অনুপ টাঁকশালের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন; তাঁহার প্রাসাদ ছিল, রূপ-সাগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে খব্‌খবি নামক স্থানে। এ সব 'সাগর' তখনও খনিত হয় নাই, কিছুকাল পরে হইযাছিল।

উজীর গৃহে আসিযা দেখিলেন, নবদ্বীপবাসী কতিপয় ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে দ্বারে দণ্ডায়মান্। সাকর মল্লিক তাঁহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহারা একে একে তাঁহাদের অভাব নিবেদন করিলেন। কাহারও গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে, কেহ টোল করিবেন, কেহ কন্যাদায়গ্রস্ত, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ। সাকর মল্লিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি মুসলমানের ভৃত্য, যবন-প্রভুর ইঙ্গিতে হিন্দুর সর্ব্বনাশ করি; আপনারা কোন্ ভরসায় আমার নিকট ভিক্ষা চাইতে আসিয়াছেন ?"

জনৈক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "আমরা হিন্দুর নিকট আসিয়াছি, হিন্দুকে হিন্দু না দিলে কে দিবে ?"

উজীর কহিলেন, "আপনার উত্তরে আমি প্রীত হইলাম। আমার ভাণ্ডার খুলিয়া দিতেছি, আপনারা ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করুন।"

ব্রাহ্মণেরা সহর্ষে আশীর্ব্বাদ করিলেন। উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিমাই পণ্ডিতের সংবাদ কি ?"

ব্রাহ্মণ। তিনি কিছুকাল আগে দীক্ষা নিয়ে গয়া হ'তে ফিরেছেন। তাঁর ভাব এক্ষণে স্বতন্ত্র; সে চাঞ্চল্য আর নাই—এখন তিনি সকল সময়ে হরি-প্রেমে মাতোয়ারা। অনেকের বিশ্বাস, তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

উজীর সাহেব আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত বক্ষ আলোড়িত করিয়া একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল।

পঞ্চম অধ্যায়

হরিদাস সপ্তগ্রামে

সাতখানি গ্রাম লইযা সপ্তগ্রাম। হরিদ্রাপুর, গোবিন্দপুর, সেকেন্দরপুর, চন্দনপুর, সাহাপুর কৃষ্ণপুর, ও সাতগাঁ।—এই সাতখানি গ্রাম লইয়া বিশাল বাণিজ্য-কেন্দ্র সপ্তগ্রাম সরস্বতী নদীর তীরে গঠিত হইয়াছিল। বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসিয়া লাগিত, আর বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া মিশর, সুমাত্রা, পেগু প্রভৃতি দেশে যাইত। বাঙ্গালায় যাহা কিছু উপজাত হইত, তাহা সপ্তগ্রামে আসিত। সোণার গাঁর বিখ্যাত মলমল্, হিজলীর তৃণ হইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম বস্ত্র, টাঁড়া ও শ্রীপুরের তুলাজাত বস্ত্র, কুচবিহারের মৃগনাভি, রেশম ও কার্পাস বস্ত্র, বাঙ্গালার হীরক-খচিত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, কাঁসা-পিতলের বাসন, উৎকৃষ্ট চিত্র, ঢাকার শাঁখা, গালার বার্ণিস, মাটীর বাসন প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইত ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইত।

সপ্তগ্রাম-সরকার বহুদূর বিস্তৃত ছিল। হাতিয়াগড় (ডায়মণ্ড-হারবার) মহল কলকত্তা, কপোতাক্ষের তীর, নদীয়া ও বহরমপুরের কিয়দংশ লইয়া সরকার-সপ্তগ্রাম। এই সরকার যিনি গৌড়রাজের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন, তিনি আদায় করিতেন প্রায় বারো লক্ষ টাকা, আর রাজস্ব রাজ-সরকারে দিতে হইত চারি লক্ষ আঠার হাজার রূপেইয়া বা রূপেয়া। এই লাভবান্ প্রদেশ সম্প্রতি ইজারা লইয়াছিলেন হিরণ্যদাস ও গোবর্দ্ধনদাস, ইঁহারা কায়স্থ; কিন্তু সপ্তগ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী তখনকার দিনে সুবর্ণবণিক ছিলেন।

হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, দুই ভাই দেশের রাজা। রাজা হইলেও তাঁহারা গর্ব্বিত বা অত্যাচারী ছিলেন না। তাঁহারা সদ্ব্যয়ী ও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন; দেবালয় ও জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা ও চতুষ্পাঠী-স্থাপন প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্য ইঁহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ভজন-সাধনমার্গ যে কি, তাহা তাঁহারা বুঝিতেন না। মন্দির-দ্বারে একবার মাথা খুঁড়িলেই ভক্তি যথেষ্ট করা হইত, মনে করিতেন। দরিদ্রকে একমুঠা অন্নদান করিলে জীবে দয়া প্রচুর পরিমাণে করা হইল, এইরূপ বুঝিতেন; তার পর বাকি খাজনার জন্যে এক প্রজাকে সপরিবারে রাস্তায় বসাও না কেন, তাতে কোন অপরাধ আছে, মনে করিতেন না। আগে বিষয়কর্ম্ম, তা'র পর ধর্ম্ম।

জ্যেষ্ঠ হিরণ্যর সন্তানাদি ছিল না। কনিষ্ঠ গোবর্দ্ধনের একটি মাত্র পুত্র; তাঁর নাম রঘুনাথ। তিনি দাস-পরিবারের নয়নমণি, অনেক মানৎ করিয়া ছেলেটি হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিতের উপনয়ন উপলক্ষ্যে গোবর্দ্ধন সস্ত্রীক নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। নিমাইয়ের অতুলনীয় রূপদৃষ্টে অপুত্রক গোবর্দ্ধন-রমণীর ইচ্ছা জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার ঐ রকম একটি সর্ব্বশোভাময় সন্তান হয়। তাহার দুই এক বৎসর মধ্যেই রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করিলেন।

রঘুনাথ উপযুক্ত বয়স লাভ করিলে, বিদ্যাশিক্ষার্থে কুল-পুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে প্রেরিত হইলেন। বলরামের গৃহ নগরের প্রান্তে চাঁদপাড়া নামক পল্লীতে। পল্লীটি জনবহুল নয়, অধিবাসীরা সকলেই ব্রাহ্মণ। তখনকার দিনে হিন্দুরা এক এক বর্ণ এক এক পল্লীতে সকলেই সচরাচর বাস করিত। আচার্য্য মহাশয় এই ব্রাহ্মণ-পল্লীর সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। অবস্থাও তাঁর ভাল। তিনি কৃষ্ণভক্ত, তেজস্বী ও উদারচিত্ত।

সম্প্রতি বলরামের গৃহে একজন অতিথি আসিয়াছেন; তিনি আমাদের উৎপীড়িত হরিদাস। নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে তিনি সপ্তগ্রামে আসিয়াছেন। কোথাও শান্তি পান নাই; তাঁহার হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার নির্য্যাতন ফিরিয়াছে। যবন বলিয়া ঘৃণা করিয়া, অথবা ভয় করিয়া কোন হিন্দু তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। হরিভক্তকে মুসলমান ত আশ্রয় দেবেই না। তা'ছাড়া আবার এক বিপদ আছে; রামচন্দ্র খাঁর তুল্য ব্যক্তি সকল দেশেই আছেন। কোনও প্রবল ব্যক্তির আশ্রয় না পাইলে কোথাও স্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই। অবশেষে বলরামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার বিস্তৃত উদ্যানের একাংশে আশ্রয় লইয়াছেন; বলরাম আগ্রহ সহকারে একখানি কুটীর তুলিয়া দিয়াছেন। হরিদাস মনের আনন্দে তথায় দিবানিশি হরিনাম জপ করেন। তাঁহার কামনা আর কিছু ছিল না—শুধু একটু আশ্রয়।

হরিদাস এইবার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; ভয় নাই, উদ্বেগ নাই,—বৈষ্ণবের গৃহে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। নাম করিতে করিতে হরিদাস কখন কাঁদিতেন, কখন হাসিতেন, কখন নাচিতেন, কখনও বা হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন। আচার্য্যের গৃহে অনেক ছেলে পড়িতে আসিত; তাহারা হরিদাসকে পাগল মনে করিয়া বিদ্রূপ করিত; কেহ হরিদাসের গায়ে ধূলা দিত, কেহ বা গোবর দিত। কিন্তু একটি বালক হরিদাসকে পাগল মনে করিত না। সে আমাদের রঘুনাথ। তাঁহার বয়স তখন দশ এগার বৎসর; তাঁহার হৃদয় যেন এতকাল সুপ্ত ছিল, হরিদাসের হরিনামধ্বনিতে সে যেন সহসা জাগিয়া উঠিল। রঘুনাথ সুযোগ পাইলে পলাইয়া হরিদাসের নিকট আসিতেন এবং তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া গান করিতেন। যতই তিনি গাইতেন, ততই তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, প্রাণের ভিতর এক অনির্ব্বচনীয় সুধা বর্ষিত হইত। পাঠে বা গৃহে তাঁহার মন থাকিত না—মন থাকিত হরিদাসের কাছে, সেই মধুময় হরিনাম। প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জাগিল শুধু হরিনাম গান।

একদা অপরাহ্নে হরিদাস গাইতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে—

বালক রঘুনাথ গাইতেছেন—

হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হে।

হরিদাস গাইলেন—

কৃষ্ণ কেশব হরি মাধব রাম রাঘব ত্রাহি মাং—

বালক অমনি গাইলেন—

কৃষ্ণ কেশব হরি মাধব রাম রাঘব ত্রাহি মাং।

হরিদাস—

হরি আমার দয়াল হে—

বালক—

হরি আমার দয়াল হে।

হরিদাস—

হরি আমার প্রেমময় হে—

বালক—

হরি আমার প্রেমময় হে।

হরিদাস—

আমার সকল কাড়িয়া লও—

বালক—

আমার সকল কাড়িয়া লও।

হরিদাস—

যা' কিছু আমার আছে সব লয়ে আমায় তোমার করিয়া লও—

বালক—

যা' কিছু আমার আছে সব ল'য়ে আমায় তোমার করিয়া লও।

হরিদাস—

ভিখারী কাঙ্গাল করিয়া আমায় তোমারি করিয়া লও—

বালক—

ভিখারী কাঙ্গাল করিয়া আমায় তোমারি করিয়া লও।

হরিদাস—

আমি যে তোমার, তুমি যে আমার, ও আমার দয়াল হরি! আমায় তোমারি করিয়া লও—

বালক—

আমি যে তোমার, তুমি যে আমার, ও আমার দয়াল হরি! আমায় তোমারি করিয়া লও।

উভয়েই গলদশ্রুলোচন। রঘুনাথ কেন কাঁদিতেছেন, তা' তিনি জানেন না। প্রাণের ভিতর

কি একটা প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয় ও নয়নে উচ্ছ্বাস তুলিতেছিল ; এ উচ্ছ্বাসকে শান্ত করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। রঘুনাথ ভাবিতেছিলেন, এ আনন্দ, এ পুলক, মাতা-পিতার ক্রোড়ে বসিয়া বা কোন অবস্থাতেই তিনি ত কখন অনুভব করেন নাই। হরিকে ডাক্‌লে কেন এমন হয়? হরি কে, হরিদাস?

হরিদাস। তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, তিনি আমাদের সকলের চেয়ে আত্মীয়।

রঘুনাথ। তবে তাঁর দেখা পাই না কেন?

হরি। অন্তরের সঙ্গে ডাক্‌লেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়। তিনি যে দেখা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আমাদের আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

রঘু। এস না তবে হরিদাস, আমরা তাঁকে ডাকি—তাঁকে দেখ্‌তে আমার যে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

হরি। ডাক বালক; তোমার ডাকে তিনি নিশ্চয় আসবেন।

উভয়ে ডাকিতে লাগিলেন—

হরি আমার এস হে—
হৃদি-সিংহাসন রেখেছি পাতিয়ে
তুমি আসিবে ব'লে হে—
আমার কৃষ্ণ আসিবে ব'লে হে—
আমার রাজার রাজা আসিবে ব'লে হে—
আমার জীবন-ধন আসিবে ব'লে হে—
আমি হৃদয় ধুয়েছি নয়নেরি জলে
তুমি আসিবে ব'লে হে—
ওগো বেদী সাজায়েছি ফুলদল দিয়ে
তুমি বসিবে ব'লে হে—
আমার মদনমোহন বসিবে ব'লে হে—
আমার শ্যামসুন্দর বসিবে ব'লে হে—
আমার হৃদয়নাথ বসিবে ব'লে হে।

উভয়ে কাঁদিয়া আকুল—পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ। প্রৌঢ় হরিদাস বালক রঘুনাথের বাহুপাশে বদ্ধ। উভয়ের হৃদয়াবেগ যখন একটু শান্ত হইল, তখন আবার উভয়ে ডাকিতে লাগিলেন—

বাঁশী করে ল'য়ে কৃষ্ণ আমার এস হে—
ভুবন-মাতান রূপ ল'য়ে কৃষ্ণ আমার এস হে—
বনমালা গলায় পরে কৃষ্ণ আমার এস হে—
শ্যাম শ্যাম শ্যামরূপ ল'য়ে একবার এস হে—
আমার প্রভু,আমার পিতা,আমার রাজা এস হে—
চরণে চরণ দিয়ে কৃষ্ণহৃদয়ে এস হে—
প্রাণনাথ আমার হৃদয় মাঝে এস এস হে—
আমার প্রিয়, আমার সুন্দর—

উভয়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর ডাকিতে পারিলেন না—কাঁদিয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। ক্ষণপরে হরিদাস বলিলেন, "ওই দেখ রঘুনাথ, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে এসেছেন, তাঁর চরণভরে তোমার হৃদয় কাঁপছে, তুমি কাঁপছ ; চোখ বুজে দেখ, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে বসেছেন।"

রঘুনাথের কান্নার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল—তিনি আর সামলাইতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হরিদাস, রঘুনাথের অচৈতন্য দেহ বেষ্টন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, মুখে হরিনাম, নয়নে জল, হৃদয় কৃষ্ণময়।

স্বল্পকাল মধ্যে রঘুনাথ উঠিয়া বসিলেন ; কিন্তু তাঁহার হৃদয় তখনও কাঁপিতেছে। হরিদাসের নৃত্যের বিরাম নাই ; তদ্দৃষ্টে রঘুনাথ আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি উঠিয়া নৃত্যে যোগদান করিলেন। উভয়ে আবার গান ধরিলেন,—

নীলকান্তমণি কৃষ্ণ একবার এস হে—
রাজরাজেশ্বর কৃষ্ণ আমার এস হে—
আমার সুখময় শোভাময় প্রেমময় এস হে—
হৃদয়শোভন নয়নরঞ্জন আমার এস হে।

প্রাঙ্গণে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা কাহারও লক্ষ্য হইল না—নৃত্য ও গান সমভাবে চলিতে লাগিল। প্রাঙ্গণ হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "রঘুনাথ, বেশ লেখাপড়া শিখ্‌ছ ত?"

২য় ব্যক্তি। রঘুনাথ বালক, তা'র অপরাধ কি? যত নষ্টের গোড়া এই মুসলমানটা।

৩য়। আহা, অত বড় বংশের একটি ছেলে, তা'র মাথা খাচ্ছে দেখ।

২য়। তুই নিজে ক্ষেপেছিস, বেশ করেছিস ; কা'রও কিছু বল্‌বার নেই ; কিন্তু এই ভদ্রলোকের ছেলেটাকে বেগড়াও কেন?

১ম। সত্যি কথাই ত ; তখনই বলেছিলাম, আচার্য্য ঠাকুর, যবনকে বাড়ীতে ঠাঁই দিও না। তা' গরীবের কথা কেউ কি শোনে।

২য়। আমিই কি কম বলেছিলাম? কত বললুম, ওগো মুসলমান যখন হরিনাম জপ করছে, তখন ভিতরে একটা কিছু মতলব আছে ; ও নিশ্চয় বাদসার গোয়েন্দা, আমাদের সব মুসলমান করতে এসেছে।

৩য়। য়্যাঁ, আমাদের সব মুসলমান করবে! আজ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কাল সকালেই আমি ভুঁইয়াকে খবর দেব। দেখি বেটা মুসলমানের কি দুর্দ্দশা হয়।

সংবাদ দিতে আর যেতে হ'ল না—ক্রুদ্ধ হিরণ্য ও শান্ত আচার্য্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে তিনটি জ্ঞানী ব্যক্তি হরিদাসের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিলেন, তাঁহারা সচকিতে ও সসম্ভ্রমে দেশের রাজাকে পথ দিলেন এবং সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম; একবার কাণ্ডটা দেখুন।"

তখনও হরিদাস ও রঘুনাথ নৃত্য করিতেছিলেন আর ডাকিতেছিলেন, "হৃদয়শোভন নয়নরঞ্জন, আমার এস হে।" ক্রুদ্ধ হিরণ্যর তর্জ্জন গর্জ্জনে তাঁহাদের ভাব নষ্ট হইল এবং অচিরে তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। হিরণ্য ক্রোধভরে কহিলেন, "এই কি তোমার বিদ্যাশিক্ষা রঘুনাথ?"

রঘু। এই ত জ্যেঠা, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, পুঁথি পড়ে কি হবে?

হিরণ্য। তোমার বাপ-পিতামহ যা' করে এসেছেন, তাই কর; আমরা কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি না।

রঘু। আমি ত ধর্ম্ম কর্ম্ম চাই না।

হিব। কি চাও তবে?

রঘু। চাই আমার কৃষ্ণকে।

হির। দেখ্‌ছি পাগলে তোমায় পাগল করেছে।

তারপর আচার্য্যের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এ মুসলমানটাকে এখানে আর রাখ্‌তে পাবেন না; ইচ্ছা হয়, অন্যত্র স্থান দেন।"

বলরাম। বেশ; আমার শয়ন-গৃহে অতঃপর ইহার স্থান হইবে।

হিরণ্য। আপনার শয়ন-গৃহে! সে কি!

বলরাম। হরিদাস আমার আশ্রিত।

হিরণ্য। আপনি কি ধর্ম্ম-সমাজ মানেন না?

বলরাম। প্রয়োজন হয়, সে জবাবদিহি অন্যত্র করব।

হিরণ্য। তবে কি আমাদের পুত্রকে অন্যত্র নিয়ে যেতে বলেন?

বলরাম। তোমাদের অভিরুচি।

হরিদাস এতক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান ছিলেন; এক্ষণে অগ্রসর হইয়া আচার্য্যের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন; এবং কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। তখন অন্ধকার বসুধাকে ঘিরিতে অগ্রসর হইতেছে, হরিদাস সেই অন্ধকার ক্রোড়ে সত্বর অদৃশ্য হইলেন; কিন্তু তাঁহার উচ্চকণ্ঠের আহ্বান—হৃদয়শোভন নয়নরঞ্জন আমার এস হে—ক্ষণকাল ধরিয়া সকলেই শুনিতে পাইলেন। বৃদ্ধ আচার্য্য যখন বুঝিলেন, হরিদাস তাহার আশ্রয় ছাড়িয়া চলিতেছেন, তখন তিনি হরিদাসের পশ্চাদনুসরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে ছুটিলেন, "হরিদাস"—"হরিদাস"। *

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাজির বিচার

সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া হরিদাস শান্তিপুরে আসিলেন; তথায় অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইয়া গঙ্গাতীরে তখন বাস করিতে লাগিলেন। নিমাই পণ্ডিতের নাম তখন চারিদিকে। তিনি হরিনামে চতুর্দ্দিক মাতাইয়া তুলিয়াছেন; হরিনামের একটা প্রবল স্রোত নবদ্বীপ ও শান্তিপুর প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে। হরিদাস মনের আনন্দে সেই স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিলেন। কিন্তু এ আনন্দ তাঁহার স্থায়ী হইল না।

শান্তিপুর ও নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা তখন গোরাই কাজি। তিনি দেখিলেন, হরিনামে দেশে একটা বিপ্লব তুলিয়াছে। ইসলাম ধর্ম্মীরা বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। কাজি ইহাও দেখিলেন, যাহারা সম্প্রতি মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কাজির নিকট এমনও সংবাদ আসিতে লাগিল যে, তাহারা গোপনে হরিনাম করে। কাজি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এ ক্ষেত্রে কোনও হিন্দুকে বিশেষরূপে শাস্তি না দিলে, হিন্দুদের এ ধর্ম্মান্দোলন বন্ধ হইবে না। ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুদের এ আন্দোলন অচিরে বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তিকে ধরিয়া জল্লাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়? নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে—নিমাই পণ্ডিত বা অদ্বৈতাচার্য্যের কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। তাঁহাদের কোনও স্বগণের অঙ্গে হস্তার্পণ করিলে সমস্ত হিন্দুরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া দেশে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারে। তাহাতে তিনি নানাপ্রকারে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারেন, সুলতানের নিকটেও তিরস্কৃত হইবার সম্ভাবনা। তবে কাহাকে ধরা যায়? এক আছে নিরাশ্রয় হরিদাস। কাজি সাহেব তাঁহাকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া ধরিলেন। হরিদাস অনাথ কাঙ্গাল; হরিদাসের বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই, অর্থ নাই হরিদাসই উপযুক্ত পাত্রবোধে ধৃত হইলেন। কাজি প্রকাশ করিলেন, হরিদাস কেন মুসলমান হইয়া হরিনাম করে?

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-লিখিত আখ্যায়িকা এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে অনুসৃত হয় নাই।

হরিদাসের এবম্বিধ গুরুতর অপরাধের বিচার তিনি নিজেই করিতে পারিতেন; কিন্তু সুলতানের নিকট কিঞ্চিৎ যশঃপ্রাপ্তির আশায় হরিদাসকে গোড়ে বিচারার্থে পাঠাইলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ ও মহাপণ্ডিত গৌড়ের কাজি তোগ্‌লক্‌ খাঁ হরিদাসের বিচার করিতে বসিয়াছেন। সুলতান সিংহাসনে উপবিষ্ট; উজীর ও অমাত্যবর্গ নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তোগ্‌লক্‌ খাঁ সুলতানকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—"আপনার ভৃত্য কাজি গোরাই খাঁ এই গৌড়-রাজ্যের পরম হিতৈষী ও ইসলাম ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। আপনার ভৃত্যদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মপরায়ণ অতি অল্পই আছেন। তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, কতকগুলা কাফের এই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ও এই অজেয় গৌড়রাজ্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছে। শান্তিপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এখনও বেশী দূর বিস্তৃত হয় নাই। বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি বিদ্রোহীদের নেতা হরিদাসকে অনেক কৌশলে ধরিয়া বিচারার্থে জনাবের দরবারে প্রেরণ করিয়াছেন।"

সুলতান। বিদ্রোহ? আমার রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ? উজীর সাহেব, সে কথা ত তুমি আমাকে বল নি?

উজীর। বিদ্রোহ কোথাও থাকলে আপনাকে বল্‌তাম, জাঁহাপনা। কাজি সাহেব আগাগোড়া আপনাকে ভুল বুঝিয়েছেন। বিদ্রোহ কোথাও নেই। এক ব্যক্তি হরিনাম ক'রে বেড়ায়, তা'কেই ধ'রে গোরাই কাজি পাঠিয়েছে। সে জাঁহাপনার কাছে কিছু ইমাম চায়, আর আমাদের কাজ তোগ্‌লক্‌ খাঁ কিছু যশঃপ্রার্থী। কাহারও কোন কাজ নেই, কি করেন।

সুলতান একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তাই নাকি কাজি সাহেব?"

কাজি। কি আর বল্‌ব জনাব! উজীরের কথার উপর কথা বল্‌তে আমার সাহস হয় না। এখনই দেখ্‌তে পাবেন, আমার কথা সত্য কি না,—আমি অপরাধীকে আন্‌তে আদেশ দিয়েছি।

শৃঙ্খলিত হরিদাস অচিরে আনীত হইলেন। দরবারের একাংশে একটি মঞ্চ ছিল, হরিদাস তা'র উপর দাঁড়াইলেন। প্রহরী, জল্লাদ তাঁহার আশে-পাশে দাঁড়াইল। হরিদাসের বদনমণ্ডলে চিন্তা বা ভয়ের কোন চিহ্ন দেখা গেল না; বরং তাঁহাকে যেন প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হইল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া হরিদাস পূর্ব্ব-রাত্রি নামকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়াছেন। ডাকের সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লতা আসিয়াছে। হরিদাস কিঞ্চিৎ স্থূলকায় ছিলেন, তাঁহার অঙ্গের বর্ণও শ্যাম। কিন্তু তাঁহার মুখের এমন একটা কমনীয় ভাব ছিল, সমস্ত দেহকে বেষ্টন করিয়া এমন একটা জ্যোতিঃ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, ইনি সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র।

কাজি বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

হরি। হরিদাস।

কাজি। তুমি কোন্‌ ধর্ম্মাবলম্বী?

হরি। আমি হরিনামাশ্রয়ী।

কাজি। সে কি? তুমি হিন্দু না মুসলমান?

হরি। তাহা ত আমি ঠিক জানি না—আমি জানি শুধু হরিনাম।

কাজি। দেখ্‌ছি, তুমি লোক বড় সোজা নও, তোমার ঘর কোথা?

হরি। শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ছিল; এখন আর নাই, কাজি ভেঙ্গে দিয়েছেন।

কাজি। বেশ করেছেন। তোমার বাপ্‌ কাফের না মুসলমান ছিলেন?

হরি। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পীর আলি জোর ক'রে তাঁকে মুসলমান করেছিল।

কাজি। উত্তম করেছিলেন, এ'তে তাঁর দয়ারই পরিচয় পাওয়া যায়। তা হ'লে বুঝা গেল, তুমিও তোমার বাপের সঙ্গে মুসলমান হয়েছিলে।

হরি। আমি তখন শিশু মাত্র।

কাজি। তর্ক করো না—প্রমাণ হলো, তুমি মুসলমান হয়েছিলে।

হরি। এত জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন কি? আমাকে যে শাস্তি দিতে ইচ্ছা হয়, তাই দিন্‌।

এবার সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণের পর কেন আবার হরিনাম কর?"

হরি। আমি যে হরিনাম না ক'রে থাকৃতে পারি না সুলতান।

সুলতান। আল্লার নাম ছেড়ে হরিনাম ধর্‌লে কেন?

হরি। আমি ত ধরি নি, কে আমায় ধরিয়েছে।

সুলতান। তুমি হরিনাম ত্যাগ কর।

হরি। "খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় যদি প্রাণ,
তবুও বদনে আমি না ছাড়ি হরিনাম।"

সুলতান। আমি তোমাকে পদ দেব, জায়গীর দেব, ঐশ্বর্য্য দেব—

হরি। আমি যে ঐশ্বর্য্যের কাঙ্গাল, তা' যে তোমার ভাণ্ডারে নেই সুলতান।

কাজি অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "একে কুত্তা দিয়ে—?"

সুলতান গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না।"

কাজি। একে জ্যান্ত কবর—?

সুল। না।

কাজি। তবে কি মুক্তি দিতে চান?

সুল। আমার ইচ্ছা তাই, কিন্তু—

কাজি। তা হ'লে জাঁহাপনা, দেশে আর ধর্ম্ম থাক্‌বে না—আমাদের ধ'রে ধ'রে হিন্দু করবে।

সুল। তোমার অভিপ্রায় কি?

কাজি। সহর ঘুরাইয়া কোড়া লাগাই।

সুলতান একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মতি দিলেন। হরিদাস একটুও বিচলিত হইলেন না—প্রসন্নবদন ও হাস্যমুখ। বিদায়কালে সুলতানের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সুলতান, ভগবান্‌ তোমাকে আরও বড় করুন—আমি আনন্দে তোমার দণ্ড মাথায় পাতিয়া লইলাম। কিন্তু সুলতান, আমি বুঝিতে পারিলাম না, আমার অপরাধ কি? তোমার রাজ্যে কি কেহ হরিনাম করিবে না? আমি তোমার অতি ক্ষুদ্র নগণ্য প্রজা, রাজ্যের একপ্রান্তে একখানি কুঁড়ে তুলিয়া বাস করিতেছিলাম, আমি কি অপরাধ করিলাম সুলতান, তাই আমাকে আজ—না, ন, আমার অপরাধ আছে, নইলে এ দণ্ড কেন? দণ্ড দিবার তুমি কে? যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত গাছের পাতাটি পড়ে না, তাঁরই ইচ্ছায় আজ আমার এই দণ্ড! সুলতান, তুমি নিরপরাধ, সহস্রবার নিরপরাধ, ভগবান্‌ তোমাকে সুখে রাখুন। আমি তাঁরই দণ্ড গ্রহণ করিতে চলিলাম; কই, তোমার জল্লাদ কই?"

গৌড়-নগরের বাইশ বাজার ঘুরাইয়া হরিদাসকে বেত্রাঘাত করা হইল। বেত্রাঘাত বলিলে ঠিক হয় না; কোড়ার আঘাত অতি ভীষণ, প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে রক্তমাংস উঠিয়া আসে। কোড়ার আঘাত হরিদাসের অঙ্গের উপর যতই পড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার করুণা বিগলিত হইয়া আঘাত-কারীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল; বলিতে লাগিলেন, "হরি, এরা অজ্ঞ, এদের কোন অপরাধ লইও না।" যখন মূর্চ্ছিত-প্রায়, তখনও যুক্তকরে বলিতেছেন,—

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে এ সবার নহে অপরাধ।"

তাঁহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, দেহ রক্তপ্লুত, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য নাই; তিনি জল্লাদের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছেন,—"প্রভু, এ অজ্ঞদের ক্ষমা কর।"

অবশেষে হরিদাস চৈতন্যশূন্য হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। পড়িবার পূর্ব্বে শেষ নিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "এদের ক্ষমা কর হরি।"

জল্লাদ কাজির নিকট সংবাদ দিল, হরিদাস প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছেন। কাজি সাহেব মহাপুলকিত হইয়া বলিলেন, "কেমন কৌশলে কার্য্য উদ্ধার করেছি, সুলতান কিছুতেই মারতে দেবে না। এ সব আগুনের ফুল্‌কী রাখতে আছে! যাও, এখন তা'র দেহটাকে দরিয়ায় ছেড়ে দেও—যথা ইচ্ছা যাক্‌।"

হরিদাসের মৃতবৎ দেহ যখন গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন অনেক হিন্দু তীরে দাঁড়াইয়া হাহাকার করিতে-ছিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ ছাইয়া আসিয়াছে; ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবন্দনা ত্যাগ করিয়া হরিদাসের বিসর্জ্জন দেখিতে লাগিলেন। সেই দর্শক-বৃন্দের মধ্যে অমর, সন্তোষ ও অনুপ তাঁহাদের কয়েক জন অনুচর লইয়া ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিলেন। অমর চুপি চুপি বলিলেন, "সনু, তুমি একখানা নৌকা নিয়ে হরিদাসের অনুসরণ কর। তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, জীবিত আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। সঙ্গে কয়েকজন লোক লও—তাঁহাকে এখানে আর এনো না—তাঁহার ইচ্ছামত সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসবে—শীঘ্র যাও।" সন্তোষ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। যখন হরিদাসের দেহ ও সন্তোষের নৌকা অমরের নয়নান্তরাল হইল, তখন তিনি অনুপের পানে ফিরিয়া বলিলেন, "আজকের ব্যাপরে দেখে কি বুঝলে অনু?"

অনুপ। মুসলমান অবিচারী ও অত্যাচারী।

অমর। ভুল বুঝেছ। মুসলমান ঠিক বিচার করেছে

অনুপ। তবে?

অমর। আমরাই মূর্খ, তাই স্বার্থান্বেষণে আমরা ওদের সাহায্য করি। আজকের ব্যাপার দেখে আমি এই শিক্ষা পেলাম যে, হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্মকে হিন্দু রক্ষা করবে—হিন্দু ভিন্ন তাদের অন্য আশ্রয় নেই।

অনুপ। সেটা ঠিক কথা।

অমর। সুলতান বিচার করেছেন তাঁর স্বধর্ম্মীর মুখ তাকিয়ে, আমিও বিচার করব আমার স্বধর্ম্মীর মুখ তাকিয়ে। আমি কাজির প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ড দিলাম; তুমি সাত দিনের মধ্যে তাহাকে সরাইয়া ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যমধ্যে দিয়া আসিবে। পারিবে?

অনুপ। নিশ্চয়—আপনার আদেশ পেলে সব পারি।

অমর। আর এক কথা, গোরাই কাজি হিন্দুর উপর বড় অত্যাচার আরম্ভ করেছে; তা'র কাছে হুকুম পাঠাও, সে যেন হিন্দুকে পীড়ন না করে; হুকুম অমান্য করলে তা'কে গৌড়-রাজ্য ছেড়ে চ'লে যেতে হবে।"

এমন সময়ে সন্তোষ ফিরিয়া আসিলেন; অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মধ্যে ফিরলে যে?"

সন্তোষ। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি তীরে উঠিতেছেন। অর্থ, আহার্য্য, আশ্রয় দিতে চাহিলাম; তিনি হাসিতে হাসিতে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অমর। কি বলিলেন?

সন্তোষ। বলিলেন, "আমার ব্যবস্থা শ্রীহরি করিয়া রাখিয়াছেন।"

অমর। তাঁহাকে কেমন দেখিলে?

সন্তোষ। বড় দুর্ব্বল মনে হ'ল না; অন্ধকারে আঘাতের চিহ্ন কিছু দেখিতে পাইলাম না।

অমর। জানি না, এ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ জীবনে আর কখন পাব কি না।

সন্তোষ। একটা কথা তিনি বলিলেন, ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

অমর। কি বলিলেন?

সন্তোষ। বলিলেন, "তোমরা দুঃখ করিও না—সত্বরই তোমাদের কর্ম্মক্ষয় হইবে।"

অমর স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অমরের দগ্ধচিত্ত

"আমার এ সব আমোদ-প্রমোদ কিছু ভাল লাগ্‌ছে না সনু, সব বন্ধ ক'রে দেও।"

"সে কি দাদা, আজ যে তুমি উড়িষ্যা জয় ক'রে ফিরেছ।"

"আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ফিরেছি।"

সন্তোষ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন, "সে কি দাদা, রাজ্যময় তোমার যশঃ, সুলতান তোমার গোলাম, আর তুমি কি না বলছ তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

অমর। উড়িষ্যায় আমি সব হারিয়ে এসেছি।

সন্তোষ। কি হারিয়েছ দাদা?

অমর। হিন্দুত্ব, মনুষ্যত্ব, ধর্ম্ম—

সন্তোষ। তা কি আজ হারালে?

অমর। যা' কিছু ছিল, তা' উড়িষ্যায় হারিয়ে এসেছি।

সন্তোষ। তা' হ'লে এতদিন কিছু ছিল। আচ্ছা দাদা, যখন উড়িষ্যা-বিজয়ে যাও, তখন কি জান্‌তে না, সব হারাতে হবে?

অমর। না সনু, এতটা হবে, তা' আমি আগে ভাবি নি। আমি মন্দির ভেঙ্গেছি, দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করেছি, হিন্দুর জাতি মেরেছি—

সন্তোষ। বেশ করেছ—আরও কর।

অমর। কি বলছ সনু?

সন্তোষ। ঘোর দুর্ব্বৃত্ত না হ'লে ত তাঁর দয়া পাওয়া যাবে না। যখন পাপকার্য্যে তুমি প্রতিদ্বন্দ্বি-হীন হবে, তখন তাঁহার করুণা তোমাকে উদ্ধার করতে আসবে।

অমর। এ সব অশাস্ত্রীয় কথা বলো না সন্তোষ।

সন্তোষ। দাদা, তোমারই কাছে শাস্ত্র শিখিয়াছি; তোমারই কথায় বুঝিয়াছি, পূতনা রাক্ষসী, কৃষ্ণকে বিষদানে মারিতে আসিয়া কৃষ্ণের কৃপায় স্বর্গে গেল; কেন না, সে স্তন্যদান করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছিল। আবার হরিদ্বেষী হিরণ্য-কশিপু, হরিকে সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাস করিয়া হরিকে মারিতে স্তম্ভ বিদীর্ণ করিল; পরে হরির অঙ্কে শুইয়া হরিকে দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিল। আর কি চাই দাদা? জীবনের যা' কিছু কাম্য, সে তা' পাইল; অবশেষে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইল। তাই বলি দাদা, হরির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাইয়া লও, তা' শত্রু বা মিত্ররূপে—যে ভাবেই হউক।

অমর। তুমি কি আমাকে হিরণ্যকশিপুর মত হ'তে বল?

সন্তোষ। সে যে আমাদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল দাদা! সে ত আমাদের ন্যায় মনুষ্যত্ববর্জ্জিত ধর্ম্মভ্রষ্ট ছিল না,—তা'র একটা বিশ্বাস ছিল, একটা ধর্ম্ম ছিল—তা' সে ধর্ম্ম পৈশাচিক হো'ক বা যাই হো'ক। সে নিজের বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে স্বাধীন চিত্ত লয়ে কাজ করত। আমরা নামে হিন্দু, কার্য্যে মুসলমান; আমরা পূজি কৃষ্ণকে, ভাঙ্গি তাঁর মূর্ত্তিকে। আমাদের কি আছে দাদা?

অমর। আমাদের পরিত্রাণের উপায় কি সনু? আর যে পাপের বোঝা বইতে পারি না।

সন্তোষ। যখন গ্রীষ্ম অসহ্য হবে, তখনই বর্ষা নামবে। ভয় কি?

অমর। ভয় যে অনেক সনু।

সন্তোষ। পাপে অজামিল হ'তে পারলে না, তাই বুঝি আশঙ্কা করছ? তবু বলছি, ভয় নেই, বোঝা চাপিয়ে যাও।

অমর। তার পর?

সন্তোষ। তার পর আর কি? লোকে বলে, অমুক ব্যক্তি ঈশ্বর-চিহ্নিত মহাপুরুষ, তা' আমরা পাপে প্রতিদ্বন্দিহীন হয়ে উঠ্‌লে আমাদের প্রতিও তাঁর নজর পড়্‌বে।

অমর। তুমি গভীর দুঃখে এ কথা বলছ সনু।

সন্তোষ। পাপীর মনে সুখ কোথায় দাদা? তুমি উড়িষ্যা জয় ক'রে এসে কাঁদতে বসেছ কেন?

অমর। সনু, একটা উপায় ঠিক কর।

সন্তোষ। উপায়? তাঁর কৃপা ভিন্ন আমাদের উপায় নেই।

অমর। আমি তাঁরই কৃপার আশায় ব'সে আছি। নদীয়ায় প্রভুকে পুনঃ পুনঃ ব্যথা জানাইয়া পত্র লিখিলাম; কই, কোন উত্তর ত পাইলাম না।

সন্তোষ। সময়ে পাবে। আমার বিশ্বাস, তাঁর কাছে প্রাণের সঙ্গে কোন ব্যথা জানালে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন না।

অমর। ঠিক বলেছ সনু; আমি উড়িষ্যা লুঠ করে এসে, দেবতা-ব্রাহ্মণের অভিশাপে বুদ্ধি-ধৈর্য্য স'ব হারিয়েছি।

সন্তোষ। আমার আরও বিশ্বাস, তাঁর উপর সকল ভার ছেড়ে দিলে, তিনি আমাদের ভার নিবেন। আমরা ভেবে মরি কেন, দাদা?

অমর। সনু, সনু, বুকে আয় ভাই, তুই আমায় বড় শান্তি দিলি।

সন্তোষ। তোমারই কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতেছি দাদা।

এমন সময় অনুপ ব্যস্ততাসহ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; ব'ললেন, "উড়িষ্যার সংবাদ এসেছে।"

অমর। কি সংবাদ?

অনুপ। প্রতাপরুদ্র দক্ষিণ হ'তে ফিরে উত্তরে পাঠানদের তাড়া ক'রে নিয়ে চলেছেন; কটক জাজপুর হ'তে তাহারা বিতাড়িত।

অমর। ঠিক হয়েছে; জানি, বাঘ ঘরে ফিরলে ফেরুদল পালাবে। সুলতান তা হ'লে শীঘ্রই ফিরছেন।

অনুপ। এত দিনে বোধ হয়, ইসমাইল গাজি গড় মান্দারণে আশ্রয় নিয়েছেন; আর সুলতান অর্দ্ধেক সৈন্য হারিয়ে গৌড়ের দিকে প্রাণভয়ে ছুটেছেন।

সন্তোষ। সংবাদ শুভ।

অমর। ঠিক শুভ নয়, আমাদের মনিব হারলে সেটা আমাদেরও হার।

সন্তোষ। দাদা, আমাদের কয় জন মনিব?

অমর। তাঁহাকে ত আজও তুমি মনিব ক'রে নিতে পার নি সনু! যে দিন পারবে, সে দিন এ মনিবের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করবে।

অনুপ। আমি অত বুঝি না। আমার প্রাণ আজ আনন্দে মেতে উঠেছে—চারিদিকে আমার দাদার জয়ধ্বনি। সকলে বলছে, যশঃ আপনার, কলঙ্ক সুলতানের। ইচ্ছা করছে, আজ টেঁকশাল খুলে বিলিয়ে দি।

অমর। ভুল বুঝেছ অনু, যেটাকে যশঃ বলছ, সেটা আমার কলঙ্ক। সে সব কথা যাক্; আমাদের এখানকার খেলা শীঘ্র ভাঙ্গবে ব'লে মনে হয়। একটু আগে হ'তে প্রস্তুত থাকায় ক্ষতি নেই।

অনুপ প্রস্থান করিলেন। অমর বলিলেন, "দেখ সনু, আমি বাইশ-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করেছি। বিশ লক্ষ পিতার নিকট পাঠাও, আর ব'লে দিও, দেবকার্য্যে এবং হিন্দুর উপকারার্থে যেন এই অর্থ ব্যয় হয়। দুই লক্ষ নবদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানের নিঃস্ব ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠিয়ে দেও। সত্বর ব্যবস্থা করবে—এখন তুমি যেতে পার।"

সন্তোষ প্রস্থান করিলেন। তখন গৌড়রাজ্যের ভাগ্য-বিধাতা সাকর মল্লিক ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হরিদাসের কান্না

পবিত্র কুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া হরিদাস মহাশান্তিতে বাস করিতেছেন। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গাপারে নবদ্বীপ পানে চাহিয়া প্রণাম করেন, আর যে দিন অন্য কাহারও মুখ দর্শন করিবার পূর্ব্বে দূর হইতে গৌরহরির মুখচন্দ্র দেখিতে পান, সে দিন আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি গৌরহরিকে দর্শন করিতে স্ব-ইচ্ছায় বড় একটা নবদ্বীপে যাইতেন না ; ভয় হইত, পাছে তাঁহার স্পর্শে ভক্তেরা কলুষিত হয়েন। হরিদাস দূর হইতে তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইতেন।

কিন্তু প্রভু ও নিত্যানন্দ হরিদাসকে ছাড়িতেন না ; তাঁহাদের ইচ্ছায় হরিদাসকে নিত্য নবদ্বীপে যাইতে হইত এবং সময় সময় তথায় বাস করিতে হইত। তখন শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রত্যহ রাত্রিতেই কীর্ত্তন হইত এবং মাঝে মাঝে নগর-সঙ্কীর্ত্তন হইত। প্রভুর ইচ্ছায় হরিদাসকে কীর্ত্তনে যোগদান করিতে হইত। প্রভু বলিতেন, "হরিদাস, তুমি বড় দুঃখ পেয়েছ, এখন প্রাণ ভ'রে হরিনাম কর ; আর তোমার ভয় নাই—বাধা-বিঘ্ন কেটে গেছে "

একদিন প্রভুর বাসনানুসারে হরিদাস ও নিত্যানন্দ জগাই-মাধাইকে হরিনাম শুনাইতে গিয়াছিলেন। উন্মত্ত জগাই-মাধাই যখন তাঁহাদের আক্রমণ করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইল, তখন উভয়ে ক্ষিপ্রচরণে পলায়ন পূর্ব্বক কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। নিতাই প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন, "সাধুকে সকলেই উদ্ধার করতে পারে, জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে পারলে বুঝি তোমার পতিতপাবন নামের মহিমা।" হরিদাস নিবেদন করিয়াছিলেন, "আমার মত পাতকীকে যখন কৃপা করেছ, তখন জগাই-মাধাইকে কেন কৃপা করবে না প্রভু ?" ভক্তের প্রার্থনায় প্রভু বিচলিত হইয়া জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

একদা দারুণ শীতের দিনে প্রত্যুষে উঠিয়া হরিদাস নবদ্বীপ পানে চাহিলেন। তখনও অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে সরিয়া যায় নাই। হরিদাস গান ধরিলেন—

"সোণার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া,
প্রেমজলে ভাসাইল নগর নদীয়া।"

ক্রমে অরুণালোকে নবদ্বীপ রঞ্জিত হইল। হরিদাস দেখিলেন, নবদ্বীপ যেন আজ হাসিয়া উঠিল না—একটা বিষাদভারে নবদ্বীপ যেন আজ অবসন্ন হরিদাসের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি নবদ্বীপে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কিরূপে যাইবেন ? খেয়াঘাট অনেকটা পথ ; তা ছাড়া খেয়া তখনও খুলে নাই। হরিদাস অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন,—তিনি সাঁতারিয়া নদী পার হইবার বাসনা করিলেন ; এবং তদভিলাষে গঙ্গায় নামিলেন। সহসা তথায় শ্রীখণ্ডের নরহরি ঠাকুর উপস্থিত হইলেন। নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত প্রত্যুষে স্নান ?"

হরি। স্নান নয়।

নর। তবে কি আত্মহত্যা ?

হরি। প্রভুকে যে দেখেছে, সে কি আর মরতে পারে ?

নর। তবে যাচ্ছ কোথা ?

হরি। নবদ্বীপে।

নর। নদীগর্ভ ত সরল পথ নয়।

হরি। আমার মন প্রভুর কারণ বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে—নৌকা-পথে অনেক বিলম্ব হ'তে পারে।

নর। আকাশপথে ত আরও দ্রুত যাওয়া যেতে পারত !

হরি। আমার যে সে ক্ষমতা নেই ঠাকুর।

নর। সে কি ! তোমার ন্যায় ভক্তের আবার কিসের অভাব ? অষ্টসিদ্ধি যে দাসীর ন্যায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরছে।

হরি। অমন ক'রে ব'লে আমায় অপরাধী করবেন না ঠাকুর।

নর। আচ্ছা, পরীক্ষা কর, তুমি বল দেখি, 'মা গঙ্গা স'রে গিয়ে আমায় একটু পথ দেও'। দেখ্‌বে, সুরধুনী এখনি তোমায় পথ দেবেন।

হরি। ছি ছি, অমন কথা আমি বলতে পারব না ; আমার আবার ইচ্ছা কি ? প্রভুর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।

নর। এই জন্যই ত হরিদাস তোমার তুলনা নেই। যা' হোক তোমাকে আর নবদ্বীপে যেতে হবে না, আমি তোমাকে প্রভুর সংবাদ দিচ্ছি।

হরি। তাঁর সংবাদ কি ?

নর। শুভ ; মধ্য-রাত্রিতে অর্থাৎ দুই প্রহর পূর্ব্বে তাঁর চরণ ছেড়ে এসেছি।

হরি। তবে আজ নবদ্বীপ নিরানন্দ কেন ?

নর। নিরানন্দ আবার কোথায় দেখলে ?

হরি। ওই দেখ, চোখ বুজে দেখ, নবদ্বীপ কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে ; ওই শোন, কান বুজে প্রাণ দিয়ে শোন, কান্নার রোলে নবদ্বীপ কেঁপে উঠছে—একটা

হাহাকারধ্বনি গঙ্গার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। ওই শোন, একটা চীৎকার উঠছে, 'আমাদের হৃদয়চাঁদ, নবদ্বীপের চাঁদ কোথায় গেল।' আমি যে আর স্থির থাক্‌তে পারছি না ঠাকুর! কোন্‌ পথে যাই, কোথায় যাই?

নর। হরিদাস ঠাকুর, তোমায় চিরদিন ধীর ব'লে জানি; আজ সহসা ধৈর্য্য হারায়ে এ সব কি বক্‌ছ? নিশ্চিন্ত থাক, প্রভু নদীয়ায় আছেন।

হরি। না, নেই—তিনি নদীয়ায় নেই; নদীয়া শূন্য, অন্ধকার। ঐ যে তিনি গঙ্গার ধারে ধারে দ্রুতপদে একাকা ছুটছেন! প্রভু, আস্তে যাও, চরণে কাঁটা বিঁধবে—আমি বুক পেতে দিচ্ছি, আমার বুকের উপর দিয়ে যাও—না না, আমার বুক কঠিন, তোমার কোমল চরণে বাজবে; আমার মাথার উপর 'দিয়ে দাও—না, সে আরও কঠিন প্রভু, প্রভু—

বলিতে বলিতে হরিদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নরহরি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে জল হইতে উঠাইলেন এবং তীরের উপর অপেক্ষাকৃত শুষ্ক স্থানে শোয়াইলেন।

সহসা দূরে কে ডাকিল, "হরিদাস" "হরিদাস।"

হরিদাস অচৈতন্য অবস্থায় উত্তর করিলেন, "কে, রঘুনাথ এসেছ?"

"হরিদাস" "হরিদাস"! চীৎকার ক্রমেই নিকটে শুনা গেল; তখন নরহরি শুনিলেন, সত্যই কে হরিদাসকে ডাকিতেছে। হরিদাস তদবস্থায় বলিলেন, "নবদ্বীপে আর কেন রঘুনাথ?"

রঘুনাথ দ্রুতপদে কুটীরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে মর্ম্মভেদী কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হরিদাস, হরিদাস, নবদ্বীপ নিবে গেছে—চাঁদ অদৃশ্য।"

কুটীরে হরিদাসকে দেখিতে না পাইয়া রঘুনাথ গঙ্গার দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, হরিদাসের দেহ বালুকার উপর লুণ্ঠিত হইতেছে। মুহূর্ত্তকাল রঘুনাথ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; পরে ছুটিয়া গিয়া হরিদাসের পদযুগল বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভুর বিরহে তাঁহার হৃদয়-কপাট পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়াছিল, এক্ষণে রুদ্ধপ্রবাহ আঁখি-পথে ছুটিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হরিদাস, গুরু আমার, তুমিও আমাকে ছেড়ে চল্‌লে?"

ধীরে ধীরে হরিদাসের চৈতন্যোদয় হইল; পদতলে রঘুনাথকে দেখিয়া হরিদাস বলিয়া উঠিলেন, "কি করলে রঘুনাথ! ছি ছি!" পা টানিয়া লইয়া হরিদাস উঠিয়া বসিলেন।

রঘুনাথ। হরিদাস, আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে—প্রভু আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন।

হরিদাস। তা' আমি জানি, তিনি গঙ্গার ধার দিয়ে কাটোয়ার দিকে চলেছেন।

রঘু। সত্য? চল' আমরাও যাই।

হরি। নৌকা আছে?

রঘু। দু'খানা আছে; একখানায় লোক-লস্কর, আর একখানায় আমি। জানই ত পাহারা সঙ্গে না দিয়ে বাবা আমায় ছাড়েন না।

হরি। তবে চল।

রঘুনাথ দাঁড়াইলেন এবং সতৃষ্ণনয়নে হরিদাসের মুখ প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "হরিদাস, আমি সন্ন্যাসী ব।"

হরি। সে কি!

রঘু। কেন হরিদাস, সন্ন্যাস-আশ্রম কি মন্দ?

হরি। যাহা প্রভুর পক্ষে ভাল, তাহা তোমার পক্ষে দূষণীয়। তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবামাত্র অহঙ্কার-পাশে আবদ্ধ হইবে; যাঁহারা এখন তোমার নমস্য, তখন তুমি তাঁহাদের প্রণাম গ্রহণ করিতে থাকিবে; বৈষ্ণবের বিনয়ের পরিবর্ত্তে তুমি নিজেকে নারায়ণ বলিয়া পরিচয় দিবে। দণ্ডগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দম্ভ আসিবে। তুমি সন্ন্যাসী হইতে চাও?

রঘু। না না, হরিদাস, আর আমার সে বাসনা নাই—আমায় ক্ষমা কর—আমি বৈষ্ণব হ'তে চাই।

হরি। তা ছাড়া তুমি কি ভুলে গেছ, প্রভু তোমায় একদিন কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, বৈরাগ্য অতি পবিত্র বস্তু—আড়ম্বর ক'রে দেখাবার জিনিস নয়। যে ব্যক্তি ভগবানের শরণাগত হয়, তাহাকে আর নিজের উদ্ধারের উপায় নিজে ক'রে নিতে হয় না; সময় সমুপস্থিত হ'লে ভগবান্‌, স্বয়ং তাহাকে টেনে নেবেন।' তাই বলি, ব্যস্ত হ'য়ো না—প্রভুর লীলা দেখ।

উভয়ে নৌকায় উঠিলেন। নরহরি বলিলেন, "আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রভুর লীলা দেখতে যাব।" কন্দর্পবৎ সুন্দর গদাধর কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া দলে যোগ দিলেন। তখন চারিজনে মিলিয়া নৌকায় তুমুল কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পদকর্ত্তা নরহরি গান ধরিলেন—

"মরম কহিব, সজনী কায়, মরম কহিব কায়।
উঠিতে বসিতে, দিক্‌ নেহারিতে,
হেরি যে গৌরাঙ্গ রায়।
হৃদি-সরোবরে, গৌরাঙ্গ পশিল,
সকলি গৌরাঙ্গ-ময়।

এ দু'টি নয়নে, কত বা হেরিব,
লাখ আঁখি যদি হয় ॥
জপিতে গৌরাঙ্গ, ঘুমাতে গৌরাঙ্গ,
সকলি গৌরাঙ্গ দেখি।
ভোজনে গৌরাঙ্গ, গমনে গৌরাঙ্গ,
কি হইলো মোর এ সখি ?
গগনে চাহিতে, সেখানে গৌরাঙ্গ,
গৌর হেরি যে সদা।
নরহরি কহে, গৌরাঙ্গ-চরণ,
হিয়ায় রহিল বাঁধা ॥

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভুর সন্ন্যাস

এ দিকে কণ্টক-নগর বা কাটোয়াতে বড় গোল লাগিয়াছে। সুরধুনীর তীরে কেশব-ভারতীর আশ্রম। আশ্রম-প্রাঙ্গণে বহু প্রাচীন বিশাল বটবৃক্ষ। তন্মূলে চতুর্দ্দিক্ আলোকিত করিয়া 'সান্দ্রানন্দোজ্জ্বল-রসময়-প্রেমপীযূষসিন্ধু'-নেত্র কনককদলীগর্ভ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উপবিষ্ট। তাঁহার চরণ-নখর জ্যোতির্ম্ময়, কমলাধিক কোমল চরণতল ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত; অঙ্গ বিজলি-বিজড়িত, পদ্মগন্ধামোদিত।

প্রভুর অদূরে মহাভাগ্যবান্ কেশবভারতী চিন্তাক্লিষ্ট-বদনে উপবিষ্ট। প্রভুপাদ নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ ও দামোদর, প্রভুকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট। চারিদিকে লোক জমিয়া গিয়াছে। প্রভুর আজানুলম্বিত সুবর্ণদণ্ডস্বরূপ বাহুমধ্যে চন্দ্রবদন লুক্কায়িত ছিল, সহসা তিনি চন্দ্রকে সুবর্ণদণ্ডের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া বলিলেন, "গোঁসাই, আমাকে সন্ন্যাস দেও, আমার উপায় কর।"

ভারতী। আমার দ্বারা তা হবে না।

প্রভু। সন্ন্যাস দিতে তুমি যে প্রতিশ্রুত আছ গোঁসাই।

ভারতী। দেব বলেছি, তা' এক সময়ে দেব। সন্ন্যাসের ত একটা সময় আছে, না কচি কচি বাচ্ছা ধ'রে সন্ন্যাসী করতে হবে ?

সমবেত জনমণ্ডলী ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। কাহারও ইচ্ছা নয়, প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই কিশোর বয়স, এই রূপ! যে পুত্তলি আতপতাপে শুকাইয়া যায়, পবনসঞ্চালনে যাহার দেহ বিবর্ণ হয়, সন্ন্যাস তাহার জন্য নয়। যখন জনতা শুনিল যে, প্রভুর গৃহে বৃদ্ধা মাতা, তরুণী ভার্য্যা, তখন তাহারা করুণার্দ্র হৃদয়ে বলিল, "ঘরে ফিরে যাও বাছা।" রমণীগণ একদিকে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহারা নয়নে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বলিতে লাগিলেন, "কার ঘর অন্ধকার ক'রে এসেছ দুলাল ?" কিন্তু যখন সকলে শুনিল যে, ইনিই নবদ্বীপের অবতার, তখন অনেকে যুক্তকরে বলিয়া উঠিল, "এ আবার তোমার কি লীলা, লীলাময় ?"

প্রভু সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার বাবা, তোমরা আমার মা। যা'তে আমার ধর্ম্ম হয়, তোমরা তাই কর। এই দেহ, রূপ এবং যৌবন শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ না ক'রে কা'র জন্যে রাখব ? তাঁর চেয়ে কে আর আত্মীয় আছে ?"

বলিতে বলিতে প্রভুর নয়ন জলে ভরিয়া গেল। ভারতী বলিলেন, "দেখ বাপু, সন্ন্যাসের একটা সময় আছে; যৌবনে প্রবৃত্তি বড় বল করে। আগে পঞ্চাশ পার হও, তা'র পর সন্ন্যাসের কথা তুলো।"

প্রভু। যদি তত দিন না বাঁচি ? তা হ'লে কি আমি কৃষ্ণচরণ হ'তে বঞ্চিত হব ? এ জীবন, এ দেহ নিয়ে তবে আমার কি হবে ?

ভারতী। তোমার সন্তান নাই, সহোদর ভাইও নাই; বংশের পিণ্ডলোপ কি তোমার বাঞ্ছনীয় ?

প্রভু। বংশের কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে আর ত পিণ্ডের প্রয়োজন হয় না।

ভারতী। আমি তোমায় মন্ত্র দিতে পারব না; ইচ্ছা হয়, অন্যত্র মন্ত্র লও গে।

প্রভু। গোঁসাই, আর আমাকে পরীক্ষা করো না; শ্রীকৃষ্ণভজনের জন্য মনুষ্যজন্ম—আমার একটা জন্ম বৃথা করো না।

অনেক বাদানুবাদের পর অবশেষে ভারতী সম্মত হইলেন। তখন ভক্তদের বুকের উপর পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল; আর জনসমূহ চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এক জন কৃষ্ণকায় বলবান ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, "সাবধান সন্ন্যাসী ঠাকুর, এ দুধের বাচ্ছাকে কিছুতেই আমরা সন্ন্যাস নিতে দেব না। ভাল চাও ত স'রে পড়, নইলে আমরাই তোমাকে—বুঝেছ ত ?"

এক জন পণ্ডিত অগ্রসর হইয়া ভারতীকে বলিলেন, "এরূপ অশাস্ত্রীয় ব্যাপার কিছুতেই আমরা ঘটতে দেব না। আগে তর্কে আমাকে পরাস্ত করুন, তা'র পর যা হয় করবেন।"

একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া ভারতীর চরণসমীপে পড়িল এবং যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিল, "ঠাকুর, এমন নিষ্ঠুর কাজ করো না।"

কাহাকেও ভারতী লক্ষ্য না করিয়া প্রভুকে

বলিলেন, "দেখ নিমাই, আমি জানি তুমি কে। তোমার বাসনা রোধ করতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। আমি তোমার কিঙ্কর মাত্র, যা' করাবে, তাই করব। কিন্তু তুমি আমাকে প্রণাম ক'রে অপরাধী করো না। আর দেখো ইচ্ছাময়, তোমার আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে আমার যেন পরকাল নষ্ট না হয়।

প্রভু। এ রকম কথা ব'লে আমায় অপরাধী করবেন না। আমি যাহাতে আমার প্রাণেশ্বর কৃষ্ণকে পাই, আপনি তা'র উপায় করুন—আমি বড় দুঃখী। কৃষ্ণ আপনার মঙ্গল করবেন।

সুকণ্ঠ মুকুন্দ উঠিয়া তখন কীর্ত্তন ধরিলেন—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ,
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।

তখনকার দিনে অন্য কীর্ত্তন বড় একটা প্রচলিত ছিল না। মুকুন্দ যখন কীর্ত্তন ধরিলেন, তখন নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি মাতিয়া উঠিলেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্যও চলিতে লাগিল। প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার নৃত্যের ভঙ্গী দেখিয়া জনসমূহ মুগ্ধ হইল। তার পর তাঁহার চক্ষুর অবিরামধারায় যখন সন্নিকটস্থ ভূমি কর্দ্দমাক্ত হইল, তখন তাহারাও কাঁদিয়া উঠিল এবং নৃত্য আরম্ভ করিল। প্রথমে দুই চারি জন, তা'র পর দশ বিশ জন, ক্রমে শত শত ব্যক্তি নৃত্য আরম্ভ করিল। যাহারা পুরুষানুক্রমে কখনও নাচে নাই, তাহারাও নাচিল; যাহারা বিপুল দেহভার লইয়া অচল মৈনাকের ন্যায় গৃহমধ্যে পড়িয়া থাকিতেন, তাঁহারাও নাচিলেন। আর যে সকল বৃদ্ধ চরণযুগলকে অবিশ্বাস করিয়া সাতিশয় সাবধনতার সহিত পদক্ষেপ করিতেন, তাঁহারাও পুত্র পৌত্র লইয়া নৃত্যে যোগদান করিলেন। ভারতী অস্পষ্টালোকে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিতেছিলেন, "প্রভু, এ সবই তোমার যন্ত্র; বাজাও, নাচাও, তোমার ইচ্ছামত বাজিয়ে যাও।"

মুহুর্মুহুঃ হরিধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ হইতে বরষার ধারার ন্যায় নরনারী আসিয়া জনসমুদ্রে সম্মিলিত হইতে লাগিল যিনি আসিতেছেন, তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বিবশীরত হইয়া পড়িতেছেন। ক্রমে খোল করতাল আসিল, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইল; শত শত দলে হরিনাম চলিতে লাগিল। এক প্রবল শক্তি আসিয়া সেই সহস্র সহস্র নরনারীর হৃদয় অধিকার করিল—ভক্তির এক মহাতরঙ্গ আসিয়া তাহাদের ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

চতুর্থ অধ্যায়

সন্ন্যাসে নাপিত

অরুণোদয় হইল; কীর্ত্তন ও নৃত্য ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিল। জনসঙ্ঘ বিশ্রামার্থে একটু বসিল প্রভু তখন দূরে গদাধর, নরহরি প্রভৃতি ভক্তের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে সেই সহস্র সহস্র নরনারীর আবার মনে পড়িয়া গেল, প্রভু তাহাদের ত্যাগ করিয়া অদ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। তখন তাহারা চমকিত হইয়া প্রভুর দিকে ধাবিত হইল এবং নানা উপায়ে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইল। যখন পুরুষেরা অকৃতকার্য্য হইল, তখন রমণীর দল অগ্রসর হইলেন। পুরুষেরা ক্রমে ক্রমে পশ্চাতে হঠিলেন। একটি শীর্ণকায়া প্রখরা রমণী বলিলেন, "বাপু, তুমি বললেই ত আর সন্ন্যাসী হওয়া হ'ল না; সেদিনকার এক ফোঁটা ছেলে যা বায়না ধরবেন, তাই হবে! ওরে বাপ রে! যেন ওঁর ইচ্ছেতেই সব হবে! আমরা কিছুতেই তোমাকে সন্ন্যাসী হ'তে দিব না।"

কোনও শিরোমণির বিদুষী বর্ষীয়সী ঘরণী তাঁহার স্বামীকে ঠেলিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, "কি শিক্ষা দিতে তুমি জগতে এসেছ বাবা? জীবে দয়া? বিধবা মা, বালিকা স্ত্রীকে মেরে কি তার পরিচয় দিচ্ছ? ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে চীৎকার করতে কি তোমার লজ্জাবোধ হচ্ছে না?"

প্রভু। ধর্ম্ম-টর্ম্ম কিছুই চা'ই না মা—চাই আমার কৃষ্ণকে, আমার হৃদয়বল্লভকে।

রমণী অর্থাৎ তুমি নিজের সুখ খোঁজ; আত্মীয়-স্বজনের, তোমার ভক্তদের সুখ দেখ না। এই যে হাজার হাজার লোক চীৎকার করছে, 'প্রভু নিবৃত্ত হও—আমাদের ত্যাগ করো না', সে চীৎকার কি তোমার প্রাণে লাগছে না? লক্ষ লক্ষ লোক কাঁদিয়ে, জননী ও ঘরের লক্ষ্মীকে কাঁদিয়ে, তুমি তোমার নিজের সুখের চেষ্টায় বনে জঙ্গলে ছুটতে চাও, এই কি তোমার মানুষের কাজ, না দেবতার কাজ? শুনেছি, তুমি নাকি অবতার হয়ে এসেছ। কথাটা আমার প্রত্যয় হয় না, ভগবান্ এত নিষ্ঠুর নির্ম্মম হ'তে পারেন না।

প্রভু। আমি মা, অতি সামান্য মানুষ; ভাল-মন্দ কিছুই বুঝি না। আমার প্রাণ কাঁদছে আমার বৃন্দাবনেশ্বরের জন্যে—তিনি আমার মা, আমার পিতা আমার স্বামী; তিনি ছাড়া আমার যে আর কিছুই নেই মা! আমার অপরাধ নেবেন না—আমায় আপনারা অনুমতি দিন্।

বলিতে বলিতে প্রভু কাঁদিয়া ভাসাইলেন। রমণীরা সে বন্যার সম্মুখে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তখন প্রভুর ইচ্ছাক্রমে সন্ন্যাসের আয়োজন চলিতে লাগিল। যাঁহারা সন্ন্যাসে বাধা দিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিপুল দ্রব্যসম্ভার আনিয়া সেই পুণ্যময় ক্ষেত্রে ফেলিতে লাগিলেন। কেহ দধি আনিলেন, কেহ বস্ত্র আনিলেন, কেহ ফুলচন্দন সংগ্রহ করিলেন, কেহ মিষ্টান্নের ভার লইলেন। তা'র পর নাপিত ডাকিতে কেহ কেহ ছুটিলেন। সহরের ভিতর পদস্থ নরসুন্দর হরিদাস * আহূত হইয়া আসিলেন; সকলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিলেন। হরিদাস তাঁহার আহ্বানকারীর নিকট পরিচয় দিতেছিলেন যে, তাঁহার পিতা পূর্ব্বে এক ব্যক্তির মস্তক মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন এবং তিনিও এবম্প্রকার সৌভাগ্যের অধিকারী কোনও একদিন হইবেন, এরূপ আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। আজ সে সৌভাগ্যের দিন সমুপস্থিত। হরিদাস গর্ব্বে আনন্দে স্ফীত হইয়া দ্রুতপদে আসিতেছিলেন; কিন্তু দূর হইতে যখন প্রভুর সে জ্যোতির্ম্ময় দেহ হরিদাসের নয়নে পড়িল, তখন তাঁহার আনন্দ-উৎসাহ নিবিয়া গেল, আবার যখন প্রভুর সন্নিকটে আসিয়া তাঁহার করুণাপূর্ণ বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিলেন, তখন তাঁহার হস্ত-পদ কি একটা শক্তিপ্রভাবে এলাইয়া পড়িল। তিনি ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িয়া প্রভুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রণাম করিলেন; এবং যুক্তকরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুরের কি আজ্ঞা?"

প্রভু। "খালাস কর হে নাপিত বৃন্দাবনে যাই,
তোরে কৃপা করিবেন কৃষ্ণ দয়াময়।"

হরিদাস। ক্ষমা করবেন ঠাকুর, আমা হ'তে মুণ্ডন হবে না।

হরিদাস উঠিলেন; প্রভু কহিলেন, "যেও না হরিদাস, আমায় উদ্ধার কর।"

হরি। বলেছি ত ঠাকুর, আমা হ'তে হবে না।

প্রভু। কেন হরিদাস, আমার অপরাধ কি?

হরি। আমিই তোমার চরণে কি অপরাধ করেছি ঠাকুর, যে, জগতে এত নাপিত থাক্‌তে আমাকেই বধ করতে তোমার বাসনা হ'ল?

প্রভু। নাপিত, এরূপ বলিয়া আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমাকে খালাস কর, তোমার বংশ-বৃদ্ধি হবে, তোমার সুখ-সৌভাগ্য হবে—

* আমরা শুনিয়াছি, ইঁহার নাম মধুসূদন; কিন্তু প্রভু তাঁহাকে হরিদাস বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

হরি। "মোর ভাগ্যনাশ প্রভু যাউক সর্ব্বথায়।
কেমনে বা হাত দিব তোমার মাথায়॥
যদি মোর কুষ্ঠ হয় গলি যায় অঙ্গ।
বংশ মোর নরকে যাক্ শুনহ গৌরাঙ্গ॥"

প্রভু। হরিদাস, আমি তোমায় মিনতি করছি, আমায় এ যাত্রা উদ্ধার কর।

হরি। বলছ কি? ওই মাথায় আমি হাত দেব?—ওই সুন্দর কেশ আমি কাট্‌ব? আমা হ'তে হবে না ঠাকুর, তুমি অন্য নাপিত দেখ।

প্রভু। হরিদাস, আমায় খালাস কর, তোমার ধর্ম্ম হবে, পুণ্য হবে।

হরি। যারা ধর্ম্ম পুণ্য চায়, তাদের তুমি সে লোভ দেখাও গে—আমি ও সব চাই না।

প্রভু। আমি কাঙ্গাল, আমি তোমায় কি দিতে পারি হরিদাস?

হরি। তোমার সোনা-রূপা কে চায় ঠাকুর? এক ঘড়া মোহর দিলেও আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।

প্রভু। হরিদাস, তুমি অক্ষয় স্বর্গলাভ করবে—বৈকুণ্ঠে যাবে—

হরি। সেই লোভ দেখিয়ে বুঝি এই শুক্‌নো সন্ন্যাসীকে বশ করেছ? আমার কাছে ও-সব চল্‌বে না। আমি তোমার স্বর্গ-টর্গ, ধর্ম্ম-পুণ্য, সুখ-সৌভাগ্য কিছুই চাই না—তুমি আর কাউকে ধ'রে এনে দাও গে।

প্রভু। তবে কি হরিদাস আমার সন্ন্যাস লওয়া হবে না?

হরি। তুমি এক কাজ কর,—সন্ন্যাস নিতে চাও লও, কিন্তু ক্ষৌরি করো না।

প্রভু। সে কি হয়, হরিদাস? আগে মুণ্ডন, তা'র পর সন্ন্যাস।

হরি। তবে আর তোমার সন্ন্যাস লওয়া হ'ল না। আমি যখন পারব না, তখন আর যে কোনও নাপিত তোমার মাথায় হাত দিতে সাহস করবে, তা' মনে হয় না। তুমি ক্ষৌরির আশা ত্যাগ কর।

প্রভু প্রেমের নিকট পরাস্ত হইলেন। জ্ঞান, স্বর্গ কামনা করিয়াছিল; প্রভু তাহাকে স্বর্গের আশা দিয়া বশীভূত করিলেন। কিন্তু যে স্বর্গ, মোক্ষ, ধর্ম্ম, পুণ্য কিছুই চায় না, তাহাকে প্রভু মুগ্ধ করিতে পারিলেন না—নিজেই মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িলেন। প্রভু তখন প্রেমপূর্ণ নয়নে হরিদাসের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড দ্রবীভূত হয়। হরিদাস কাঁপিয়া উঠিলেন, তাঁহার দেহ কণ্টকিত হইল, একটা অব্যক্ত শক্তি

আসিয়া তাঁহার হৃদয়-কপাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। হৃদয়ের প্রত্যেক রক্তবিন্দু উন্মুখ হইয়া প্রভুকে দেখিতে লাগিল। হরিদাস ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন; এবং যুক্তকরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "আমি বুঝেছি, তুমি কে ঠাকুর। তুমি সেই ত্রিলোকের নাথ; সেবার কৃষ্ণ হয়ে দুর্যোধনকে মারতে এসেছিলে, আর এবার গৌর হয়ে আমাকে বধ করতে এসেছ। প্রভু, আমাকে দয়া কর ও মাথায় হাত দিতে আজ্ঞা করো না।"

প্রভু। আমি মিনতি করছি—আমার প্রতি তোমার যদি বিন্দুমাত্রও স্নেহ-দয়া থাকে, তবে আমায় উদ্ধার কর হরিদাস!

হরিদাস। প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, এমন সাধ্য আমার নাই। কিন্তু ত্রিলোকনাথ, আমার এক নিবেদন আছে। আমার জাতি-ব্যবসা, পরের পায়ের নখ ফেলা। যে হাত তোমার মাথায় দেব, সে হাত কেমন ক'রে মানুষের পায়ে দেব প্রভু? আমি তোমার নাপিত হয়ে আবার কা'র ক্ষৌরা করব?

প্রভু। "না করিও নিজ বৃত্তি শুন হরিদাস।
কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোঁয়াইবে সুখে,
অন্তকালেতে গমন হবে বিষ্ণুলোকে॥"

নাপিত যখন প্রভুকে মুণ্ডন করিতে সম্মত হইল, তখন আবার বিষাদ আসিয়া জনতাকে সমাচ্ছন্ন করিল। কিন্তু আর উপায় নাই। তখন কয়েকজন বলিষ্ঠকায় যুবক ভারতীকে বেষ্টন করিল। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, "এখানে মারিও না, গঙ্গার অপর পারে লইয়া চল।"

ভারতী তখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমাকে সত্বর বধ কর, বধ ক'রে আমাকে এ যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর। আমি প্রতিক্ষণে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি—আর পারি না। আমাকে বধ কর, কে কোথায় আমার হিতকাম সুহৃদ্ আছ, আমাকে বধ কর।"

তখন যুবকের দল পিছাইয়া গেল। প্রভু নাপিতের অগ্রে বসিলেন। হরিদাস প্রভুর মাথায় হাত দিবার পূর্ব্বে তাঁহার চরণে হাত দিলেন। স্পর্শমাত্রেই বিহ্বল। হরিদাসের দেহ কাঁপিতে লাগিল, নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হইল, তিনি আর চোখে দেখিতে পাইলেন না, স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না—উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুই আবার তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। কিন্তু প্রভু নিজে অশান্ত হইয়া উঠিলেন—উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার দেহ কম্পিত; সংসার আত্মীয়স্বজনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন, তরুলতাশ্রয়ী ভিক্ষাজীবী হইবেন, তাই বুঝি আজ তাঁহার এত আনন্দ।

হরিদাস কম্পিত হস্তে ক্ষৌরকার্য্য আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ গান ধরিলেন—

"জাহ্নবী উঠিছে দেখ ফুলিয়া ফুলিয়া,
কত ব্যথা হৃদে চেপে উঠিছে মা কাঁদিয়া।
(যে) চরণ হ'তে এসেছে মা, (সে) চরণে পড়িয়া,
জননী জানাতে ব্যথা আসিছে উথলিয়া।
তরুশাখা দুখভারে পড়েছে গো হেলিয়া,
নীরবেতে কত কাঁদে ঝরিয়া ঝরিয়া।
বিহঙ্গম নীড় ত্যজি উড়ে গেল ছুটিয়া,
হা হা রবে স্থল জল গগন বিদারিয়া।
দেবগণ আকাশেতে আসিছে গো ছুটিয়া,
ধরণী ভিজাল দেখ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
ত্রিজগৎ স্তব্ধ হ'ল মরমেতে মরিয়া,
ত্রিভুবন-নাথে আজি ভিখারী দেখিয়া॥"

অজস্র নয়নবারিতে গায়ক ও শ্রোতা স্নাত হইলেন। তার পর?—তার পর আর কি—ত্রিজগন্নাথ ভিখারী সাজিয়া নাম গ্রহণ করিলেন,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য;

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

অমরের বৈরাগ্য ও আশা

অমর তাঁহার অট্টালিকার একতম কক্ষে শয্যায় শায়িত। পার্শ্বে পূর্ণ যৌবনা পত্নী অম্বিকা নিদ্রিতা। তখনও সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে দেখা দেন নাই। অমরের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু ঘোর ছাড়ে নাই। সহসা তিনি শুনিলেন, দূরে,—প্রাসাদের বাহিরে কে গাইতেছে—

আর কত ঘুমাবে, তাঁরে ভুলে রহিবে,
নয়ন মুদিয়া ভেবে দেখ না।
ধনজন পরিবার, জ্ঞান পদ অহঙ্কার,
সঙ্গে কেউ ত যাবে না।
কে আছ করুণাভিখারী, স্মরণ লও তাঁহারি,
সময় ব'য়ে গেলে আর ত পাবে না।
অনিত্যে হইয়া মগন, ভুলে আছ নিত্যধন,
যে দিন চ'লে যায় সে দিন ত আর ফেরে না।

অমর চমকিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। দরবেশ গাইতে গাইতে সম্ভবত দূরে সরিয়া গিয়াছিল; সঙ্গীত-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে আর পঁহুছিল না। অমর ব্যস্ত হইয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং সদর-বাটীতে আসিয়া দরবেশের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন; কিন্তু দরবেশের অনুসন্ধান কোথাও পাওয়া গেল না—একে একে সকলে ফিরিয়া আসিল। তখন সহসা অমরের মনে আঘাত করিল, এ দরবেশ ত মানুষ নয়! এ দরবেশ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অমরকে জাগাইতে আসিয়াছিলেন। যদি তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে গঠিত হইত, তবে তাঁকে কেন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না? ইনি নিশ্চয় প্রভুর প্রেরিত কোন মহাত্মা। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অতি প্রফুল্ল-মনে সন্তোষকে ডাকিতে পাঠাইলেন। তিনি আসিলে অমর হর্ষ-গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "সনু, এতদিনে প্রভুর বুঝি এ হতভাগ্যদের স্মরণ হয়েছে।"

সন্তোষ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে দাদা? কিসে বুঝলে?"

অমর। প্রভু আজ দূত পাঠিয়েছিলেন।

সন্তোষ। দূত? কই?

অমর। তাঁহাকে পাওয়া গেল না। তিনি আমাকে জাগাতে এসেছিলেন; কাজ শেষ ক'রে কোথায় অন্তর্দ্ধান করলেন, তা' আর জানা গেল না।

সন্তোষ। আমি ত কিছুই বুঝছি না দাদা।

অমর। আমি শয্যায় শুয়েছিলাম, তখনও প্রভাত হয় নি; এমন সময় একটি মধুর সঙ্গীত শুন্‌লাম। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার ভিতর কি একটা জেগে উঠ্‌ল। আমি তখনই সে দরবেশের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠালাম, কিন্তু কেউ তাঁকে পেলে না। তখনই বুঝলাম, এ প্রভুর দূত, অন্তরীক্ষ হ'তে গেয়ে আমার বুকের ভিতরের নিদ্রিত দেবতাকে জাগাতে এসেছিলেন। সনু, আজ বড় আনন্দের দিন, প্রভু আমাদের স্মরণ করেছেন।

সনুর মুখও আনন্দে সমুজ্জল হইয়া উঠিল। তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "চল দাদা, আমরা নীলাচলে ছুটে যাই—দাসত্ব আর না।"

অমর। অপেক্ষা কর সনু, প্রভুর যখন কৃপা হয়েছে, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? ঠিক সময়ে তিনি উদ্ধার করবেন।

সন্তোষ। তুমি আমার চেয়ে ঢের ভাল বুঝ দাদা, কিন্তু আমার মন কেমন অশান্ত হয়ে উঠেছে। ইচ্ছা করে, নীলাচলে ছুটে যাই।

অমর। জানই ত, প্রভু এখন নীলাচলে নাই। তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়াছেন, কি কোথায় গিয়াছেন, তাহাও কেহ জানে না। তাঁহাকে খুঁজিয়া কেহ পাইবে না, কিন্তু তিনি ঠিক সময়ে তোমাকে খুঁজিয়া লইবেন।

সন্তোষ। এমন কপাল আমাদের আবার হবে যে, তিনি এসে আমাদের খুঁজে নেবেন।

অমর। হবে—নিশ্চয় হবে; তা'র পরিচয় আজ পেয়েছি। ভগবান্ এইরূপেই ইঙ্গিত করেন।

সন্তোষ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "কিন্তু উড়িষ্যা হ'তে প্রভু এ দেশে আসিবেনই বা কি প্রকারে, তথায় বুঝি আবার গোল বাধে।"

অমর। সে কি! উড়িষ্যায় গোল?

সন্তোষ। প্রভু সন্ন্যাস নিয়ে উড়িষ্যায় বাস করবার পর, তুমি হুকুম দিয়েছিলে, একটি মুসলমানও যেন উড়িষ্যায় প্রবেশ না করে।

অমর। সে হুকুম কেহ অমান্য করেছে?

সন্তোষ। আজও করে নাই, কিন্তু করবার উপক্রম করেছে।

অমর। কার এত বড় স্পর্দ্ধা! প্রভু আমার নীলাচলে, কেহ যদি তাঁহাকে ত্যক্ত করতে সেখানে যায়, তা হ'লে তা'র আর নিস্তার নেই—সে যত বড়ই হো'ক না কেন, তা'কে আমি ধ্বংস করব।

সন্তোষ। আর যদি সুলতান স্বয়ং যান?

অমর। তা হ'লে তাঁরও নিস্তার নেই; দিল্লীকে আহ্বান ক'রে, গৌড় তাকে দেব।

সন্তোষ। চুপ কর দাদা, অত উত্তেজিত হইও না; ব্যাপারটা আগে শুন। দুই রাজ্যের প্রান্ত সীমায় গড় মান্দারণ। সেনাপতি ইসমাইল গাজি সেই দুর্গ খুব দৃঢ় করেছে, আর লোক সংগ্রহ করছে। এ দিকে সুলতানকে জানিয়েছে যে, উড়িষ্যা যখন অতর্কিত থাক্‌বে, তখন বহু সৈন্য নিয়ে সহসা উড়িষ্যা আক্রমণ করবে, আর পূর্ব্ব-অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

অমর। বটে! তা'র এত বড় আস্পর্দ্ধা! তাই বুঝি কথাটা আমায় না জানিয়ে সুলতানকে চুপি চুপি বলেছে। বেশ, এক মাসের মধ্যেই তার ছিন্ন মুণ্ড বধ্যভূমিতে লুণ্ঠিত হবে।

সন্তোষ। সে কি দাদা! ইসমাইল গাজি যে একজন বড় ওমরাহ, রাজ্যের প্রধান সেনাপতি, সুলতানের প্রিয়পাত্র, দেশময় তাহার বন্ধু।

অমর। কেউ তা'কে রক্ষা করতে পারবে না সন্তোষকুমার; যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তবে জানিও, প্রভুর চরণে আমার কপট-ভক্তি।

সন্তোষ। তুমি কি গুপ্ত ঘাতকের দ্বারায় তাকে সংহার করবে?

অমর। ছি ছি! এ কাজ প্রভুর সেবকের পক্ষে শোভা পায় না।

সন্তোষ। তবে কি করবে?

অমর। তা'কে আহ্বান করব—প্রকাশ্য দরবারে দাঁড় করাব; সুলতানকে আর সব প্রজাদের বুঝাব যে, সেনাপতি একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার মতলবে রাজ্যপ্রান্তে দুর্গ বাঁধছেন, আর সৈন্য সংগ্রহ করছেন। এই ষড়যন্ত্রে রাজ্যের বড় বড় ওমরাহদের যোগ আছে, এ কথাও দরবারে বল্‌ব। তখন আর কোনও ওমরাহ সাহস ক'রে সেনাপতির রক্ষার্থে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করবে না। মুহূর্ত্ত-কাল আর বিলম্ব না করে জল্লাদ দিয়ে রাজবিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ করব।

মুগ্ধনয়নে ক্ষণকাল অমরের পানে চাহিয়া থাকিয়া সন্তোষ বলিলেন, "দাদা, তুমি সব পার। মাথায় তোমার কি শক্তি! এই শক্তি যদি ভগবানের চরণ চিন্তায় নিযোজিত হ'ত, তা হ'লে তিনি ত তোমায় দর্শন না দিয়ে থাকতে পারতেন না।"

অমর। ভুল করো না ভাই। এ শক্তির মালিক তিনি, আমি নই। যখন তিনি যে কাজে এই শক্তিকে নিযোজিত করবেন, তখন শক্তি সেই দিকে চালিত হবে। আমি কে সনু?

এমন সময় ভৃত্য অধর আসিয়া সংবাদ দিল, নীলাচল হ'তে এক ব্রাহ্মণ এসেছেন; তিনি দর্শন-প্রার্থী—দ্বারে দণ্ডায়মান।

উভয়ে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "নীলাচল হ'তে? কই সে ব্রাহ্মণ?" বলিতে বলিতে নিজেরাই আত্মহারা হইয়া ছুটিলেন এবং স্বল্পকাল-মধ্যে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন।

ব্রাহ্মণের বয়স অনেক; কিন্তু তিনি বেশ সুস্থ ও সবল। শান্তি ও আনন্দ তাঁহার বদনমণ্ডলে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু অভ্যর্থনার গতিকে তাঁহার শান্তিটুকু অন্তর্হিত হইল। দুই ভাই দুই হাত ধরিয়া সর্ব্বশোভাময় কক্ষমধ্যে মহার্ঘ আসনের উপর আনিয়া ব্রাহ্মণকে যখন বসাইলেন, তখন তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। গৃহের সে রকম সাজ-সজ্জা কখন তিনি দেখেন নাই; প্রাচীরগাত্র চিত্রিত, কক্ষ যুড়িয়া মহামূল্যবান্ সুকোমল গালিচা, ব্রাহ্মণের চরণযুগল কর্দ্দম-লিপ্ত, তিনি কিরূপে চরণ দু'খানি সেই গালিচার উপর স্থাপন করিবেন, এই চিন্তায় তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অমর ও সন্তোষ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া যাইতেছেন, "প্রভুর সংবাদ কি? তিনি কোথায়? নীলাচলে ফিরেছেন?" কিন্তু ব্রাহ্মণ চরণ দু'খানি লইয়া এতই বিব্রত যে, প্রশ্ন-রাশির অর্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। যখন অমর তাঁহার কর্দ্দমলিপ্ত চরণ গালিচার উপর টানিয়া আনিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দয়া ক'রে বলুন, প্রভু কোথায়," তখন ব্রাহ্মণ সহাস্য-বদনে উত্তর করিলেন, "নীলাচলে।" একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস দুই ভাইয়ের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইল। তা'র পরই আবার প্রশ্নের রাশি বুকের ভিতর সঞ্জাত হইতে লাগিল। অমর জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কি আমাদের স্মরণ করেছেন?"

সন্তোষ। প্রভু কি আমাদের তাঁর নিকট যেতে বলেছেন?

অমর। প্রভু কি আপনাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন?

সন্তোষ। আপনি কি প্রভুর কাছ হ'তে আসছেন?

অমর। প্রভু কি আমাদের পত্র পেয়েছেন?

সরল ব্রাহ্মণ প্রশ্নরাশি কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া বলিলেন, "বাবা, আমি বুড়া মানুষ; প্রভু কি করেন, কি বলেন, কি স্মরণ করেন, অত আমি বুঝতে পারি না। আমি শুধু দূরে ব'সে প্রভুর মুখচন্দ্র পানে চেয়ে থাকি। সে সুখও আমার গেল; দামোদর বল্‌লেন, দু'খানা পত্র নিয়ে যাও,—একখানা কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে দিও, আর একখানা গৌড়ের মন্ত্রী সাকর মল্লিককে দিও। আর—"

"প্রভু আমাদের চিঠি দিয়েছেন? কই কই?"

উত্তরীয়-প্রান্তে পত্রদ্বয় দৃঢ়রূপে বাঁধা ছিল; ব্রাহ্মণকে কঠিন বন্ধন খুলিবার উপযুক্ত অবসর না দিয়া অমর বস্ত্র ছিন্ন করত পত্রদ্বয় উন্মুক্ত করিলেন; এবং নিজের শিরোনামাঙ্কিত পত্রখানি লইয়া মাথায় ধারণ করিলেন। তার পর সাশ্রুনয়নে পত্রখানি সন্তোষের শিরোপরি রক্ষা করত কহিলেন, "ভাই, পবিত্র হও।" যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন পত্র পাঠ করিলেন; পত্রে লেখা ছিল—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।"
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥" *

"আর ভয় নাই—ভয় নাই, প্রভু কৃপা করেছেন।" বলিতে বলিতে অমর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রঘুনাথ—সংসার-অরণ্যে

"ওই যে বাবা, কে গান গেয়ে যায়।"

গোবর্দ্ধন উত্তর করিলেন, "কোথায় আবার কে গান গাচ্ছে?"

রঘু। ওই শোন না বাবা; ওই যে বলছে, 'কে আছ প্রেমের কাঙ্গাল প্রেম নিবি আয়'; বাবা, বাবা, আমায় ছেড়ে দেও, আমি একবার গায়ককে দেখে আসি।

গোব। কেউ গান করছে না, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

রঘু। ওই শোন বাবা, আকাশে সুর ভেসে বেড়াচ্ছে—স্পষ্ট শুন্‌ছি; কেন তুমি শুনতে পাচ্ছ না? শোন—

অদৃশ্য থাকিয়া কে দূরে গাইতেছিল—

"কে আছ প্রেমের কাঙ্গাল প্রেম নিবি আয়,
গোলোক হইতে গোরা এসেছে ধরায়॥
হরি ব'লে বাহু তুলে নেচে নেচে যায়,
প্রেমেতে পাগল হয়ে হরি ব'লে ধায়।
কে কোথায় পাপী তাপী আয় ছুটে আয়,
না চাইতে প্রেম সে যে দু'হাতে বিলায়॥"

রঘু। শুন্‌লে বাবা? চল না, আমরা ছুটে সেই দয়ালের কাছে যাই। আমি যে বড় কাঙ্গাল।

গোব। তুমি কিসের কাঙ্গাল? এই ধনদৌলত, রাজত্ব সব যে তোমার। তুমি আমাদের বংশের দুলাল, তুমি ইচ্ছা করলে হাজার হাজার গোলাম রেখে ইন্দ্রের বৈভব ভোগ করতে পার! দুঃখ কিসের বাবা?

রঘু। দুঃখ অনেক বাবা; তুমি পিতা হয়ে তা' বুঝলে না, এও একটা মস্ত দুঃখ

গোব। আমি ত বুঝলুম না, দেখি বউ-মা যদি বুঝতে পারেন। আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রঘু। ক্ষমা কর বাবা, এ কয়েদখানায় তুমি বরং পাহারা দেও, সে ভাল, কিন্তু তাকে পাঠিও না।

গোব। কেন, বউ-মাকে পছন্দ হয় না না কি? বল যদি তোমার হাজারটা বিয়ে এখনি দি—বউয়ের অভাব কি? রাজার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে সকলেই পায়ে ধ'রে সাধবে। কিন্তু এ কথাও বলি, আমার বউ-মার মত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে ভু-ভারতে নেই।

গোবর্দ্ধন প্রস্থান করিলেন; এবং অচিরে বধূমাতা আসিয়া দর্শন দিলেন। তাঁহার নাম ইল্ললা; বয়স পঞ্চদশ বৎসর; বর্ণ সূর্য্যকিরণতুল্য সমুজ্জ্বল. তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার রাজরাণীরও অভিলষণীয়, পরিহিত বসন স্বর্ণখচিত। সমস্ত ঘর আলো করিয়া তিনি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সপ্তদশবর্ষীয় যুবক, অসামান্যা রূপবতী যুবতী ভার্য্যার পানে চাহিয়াও দেখিলেন না। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহ-মন লইয়া তিনি বাতায়ন-মুক্ত আকাশ-পানে চাহিয়া রহিলেন। ইল্ললা বলিলেন, "আমাকে নাকি তোমার পছন্দ হয় না—আবার বিয়ে করবে নাকি?"

রঘু। ইল্ললা, ক্ষান্ত দেও; ও সব কথা আমার ভাল লাগে না।

ইল্ললা। আমার কথা ত তোমার কোন কালেই ভাল লাগে না। ধর্ম্মকর্ম্ম ত ক'রে বেড়াও, এ দিকে ঠাকুরের কাছে আবার বিয়ের আব্দারটি করা হয়েছে; আমি লুকিয়ে সব শুনেছি।

* ভাবার্থ—পরাধীনা রমণী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিয়াও যেমন নবসঙ্গের রস অন্তরে আস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও ঈশ্বরের চরণ চিন্তা করিবে।

রঘু। বেশ করেছ ; গুণ অনেক।

ইন্দু। তুমিই কেবল আমার সব কাজে দোষ দেখ ; নিজের গুণ কত! মা-বাপকে দিবারাত্র কাঁদাচ্ছেন।

রঘু। হা গৌরাঙ্গ! কবে যে এ কয়েদখানা হ'তে মুক্ত হব!

ইন্দু। সে আর এ জীবনে নয়।

রঘু। নিশ্চয় একদিন হব, তোমরা কেউ ধ'রে রাখতে পারবে না।

ইন্দু। ওরে বাপ্‌ রে, মানুষ ত ওই! আমি একাই যথেষ্ট, ঠাকুর আবার হাজার লোক পাহারা দিতে রেখেছেন। আমার পোড়া কপাল!

রঘু। দেখ ইন্দুলা, যে দিন প্রভু আমায় ডাক্‌বেন, সে দিন তোমরা লক্ষ লোক নিয়ে আমায় ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না।

ইন্দু। আচ্ছা, তখন বুঝা যাবে, তোমার ও তোমার প্রভুর গায়ে কত শক্তি।

রঘু। তুমি পাপিষ্ঠা, তোমার মুখদর্শন করলেও পাপ হয়।

ইন্দু। আমি না হয় পাপের বোঝা নিয়ে স'রে পড়লুম—তুমি পুণ্যি কর। কি বলব, তুমি স্বামী!

ইন্দুলা সদর্পে প্রস্থান করিলেন। তখন রঘুনাথ করযোড়ে প্রভুর উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আর কত দিনে আমায় এ সংসারারণ্য হ'তে মুক্ত করবে প্রভু? আর যে পারি না, অরণ্যবাসীরা আমায় ক্ষতবিক্ষত ক'রে তুললে।" মনের ভিতর হইতে একজন উত্তর করিল, "অপেক্ষা কর, তোমার কর্ম্ম-ক্ষয় এখনও হয়নি।"

রঘুনাথ। কর্ম্মক্ষয়! কিসে হবে?

মন। এইরূপ নির্য্যাতনে।

রঘু। কর্ম্মক্ষয় এ জন্মে হবে ত?

মন। নিশ্চয় হবে, প্রভু যখন বলেছেন।

রঘুনাথ তখন কিঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলেন। সহসা জননীর কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে গেল ; তিনি বলিতেছেন, "তুমি আমার স্বামী, তোমাকে আমি কি বুঝাব? তুমি যে বউমার কথা শুনে নেচে উঠেছ, এ ত ভাল কথা নয়। ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে কি ফল হবে?

'ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্‌সরা সম ;
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন।
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে ;
চৈতন্য প্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে?' *

জননীর কথা শুনিয়া রঘুনাথের মন আনন্দে পুলকিত হইল। তিনি মুদ্রিত-নয়নে প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু ধ্যানে মন বসিল না। মন ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়া যায়, আবার তাহাকে ধরিয়া আনেন ; মন আবার পালায়। এইরূপে যখন চঞ্চল মনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন, তখন রঘুনাথ আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "কোথায় যে শুনেছিলাম, পবনকে বরং বাঁধা যায়, তবু মনকে বাঁধা যায় না, সে কথা ঠিক। ধ্যানে আর কাজ নেই, সে সব আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, আমি যে চোখ বন্ধ ক'রে দেখ্‌ছিলাম, প্রভু কুলিয়া পরিত্যাগ ক'রে বৃন্দাবনের দিকে চলেছেন, সেটা কি? সেটা কি ধ্যান? কি জানি ; কিন্তু সে রকম ধ্যান করতে আমার বেশ লাগে। আচ্ছা, চোখ বন্ধ ক'রে দেখি না কেন, প্রভু কোথায়? ঐ ত, ঐ ত প্রভু চলেছেন, সঙ্গে অগণ্য লোক ; সকলেই প্রেমে মত্ত হয়ে প্রভুর সঙ্গে চলেছেন ; আমিই কেবল সঙ্গে যেতে পেলাম না! সে সব কথা যাক্‌। এ কি হ'ল, প্রভুকে যে আর দেখ্‌তে পাচ্ছি না! ঐ যে—ঐ যে, আমার প্রভু বসুন্ধরা আলো ক'রে অগণ্য ভক্তের আগে আগে চলেছেন। পথ বড় কঠিন, তাঁর চরণতলে বড়ই ব্যথা লাগছে ; আমার এ দৃশ্য সহ্য হয় না। আমি তাঁর জন্য মনে মনে পথ প্রস্তুত করি। আগে পথের উপর খুব পুরু ক'রে পদ্মফুল ছড়িয়ে দি, প্রভু তা'র উপর পা রেখে যাবেন—তা হ'লে আর প্রভুর চরণতলে ব্যথা লাগবে না। না, লাগবে ; তাঁর চরণ যে ফুলের চেয়েও কোমল। তবে কি করব? আমার বুক পেতে দেব? এক পা আমার বুকে, আর এক পা আমার মাথার উপর রেখে যাবেন? না, তা'তে প্রভু আরাম পাবেন না ; আমার দেহ বড় কঠিন। আচ্ছা, রাস্তার দু'ধার কি দিয়ে সাজাব? গাছ দিয়ে—কদম্ব আর তমালগাছ দিয়ে ; তমালের সঙ্গে জড়িয়ে দেব মালতী। গাছময় ফুল, আর পথময় গাছ। প্রভু যে আমার কদম্ব ও তমাল বড় ভালবাসেন। আর পথের পাশে দুই ধারে ছোট ছোট ফুলের গাছ থাক্‌বে, গাছের পাতায় পাতায় ফুল ; প্রভু যেমন অগ্রসর হবেন, আর গাছ হেলে প'ড়ে প্রভুর চরণের উপর পড়বে ; আহা, তাদেরও জন্ম

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা।

সার্থক হবে! আচ্ছা, সে যেন হ'ল; কিন্তু তাঁর মুখচন্দ্র যে ভানুতাপে ক্লিষ্ট হবে, তা'র উপায় কি? তিনি ত ছত্র ধরতে দেবেন না; সন্ন্যাসীকে ছত্র ব্যবহার করতে নাই। হায় হায়, আমি যদি গাছ হতুম, বংশীবট হতুম, তা হ'লে তাঁর শ্রী-অঙ্গ ঢেকে নিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে যেতুম। কিন্তু আমি কি পুণ্য করেছি যে, আমার দেহ প্রভুর কাজে লাগবে!"

"রঘুনাথ, গান শুন্‌বে এস—রাজ্যের গায়ক এনেছি।"

রঘুনাথের ধ্যানভঙ্গ হইল—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, পিতা দ্বারদেশে। ইচ্ছা নাও থাকিলে আদেশ পালন করিতে উঠিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভু রামকেলিতে

সত্যই প্রভু অগণ্য লোক সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনের পথ ধরিয়া চলিয়াছেন। পথ গঙ্গার ধারে ধারে। পৌষ মাস, দারুণ শীত; কিন্তু কাহারও শীতানুভব নাই। কীর্ত্তন যে অঞ্চলে হয়, সে স্থলে শীত থাকিতে পারে না। কীর্ত্তন চলিলে, নৃত্যও তাহার অনুগামী হইবে। বিপুল আনন্দে মুহুর্মুহুঃ হরি হরি ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া অসংখ্য ভক্ত প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন। যে গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছেন, সে গ্রামের লোক মহা উৎসাহে ভিক্ষা দিতেছেন। যে কাঙ্গাল, সে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষা দিতেছে, আর জীবন ধন্য করিতেছে। ভিক্ষা দিয়া হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গ্রামবাসীরা প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। এইরূপে জনস্রোতঃ বিপুল আকার ধারণ করিয়া গৌড়ের দ্বারে গিয়া পৌছিল। প্রভু রামকেলিতে উপনীত হইয়া তমালবৃক্ষতলে আসন করিলেন।*

লক্ষ লোকের কলরব সুলতানের কাণে প্রবিষ্ট হইল। সুলতান সভয়ে মন্ত্রী কেশব ছত্রীকে বলিলেন, "ব্যাপার কি, দেখে এস।"

কেশব। আমি দেখে এসেছি; একজন হিন্দু ফকীর তাঁর হাজার হাজার ভক্ত নিয়ে বৃন্দাবনে চলেছেন।

সুল। সে কি। ফকীর তাদের খেতে দেয় কি?

কেশব। ফকীর নিজে ভিক্ষুক, তিনি অপরের আহার যোগাবেন কোথা হ'তে?

কথাটা সুলতানের বিশ্বাস হইল না; তিনি সহর-কোতোয়ালকে ডাকিলেন, কোতোয়াল বলিলেন, এ হিন্দু ফকীর সাধারণ মনুষ্য নহেন; ইনি যখন গান করেন, তখন বৃক্ষ সকল মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করে। সুলতান আরও বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফকীর দেখিতে কেমন?"

কোতোয়াল তখন প্রভুর রূপ বর্ণনা করিলেন—

"জিনিঞা কনককান্তি প্রকাণ্ড শরীর
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি সুগভীর।
সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, কমল নয়ান
কোটি চন্দ্রো সে মুখের না করি সমান।
* * *
অরুণ কমল যেন চরণ-যুগল
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল।
* * *
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ।
একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গে নহে ক্ষত।
* * *
না খায়, না লয় কারো, না করে সম্ভাষ,
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস॥" *

সুলতান চমৎকৃত হইলেন। কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সাকর মল্লিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমরনাথ আসিলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ হিন্দু ফকীরটি কে?"

অমর। আমার বিশ্বাস, ইনি স্বয়ং ভগবান্।

সুল। (সহাস্যে) ভগবান্? আল্লা হিন্দুর বেশে আসবেন কেন?

অমর। আল্লার কাছে জাতি নাই, বেশভূষা নাই। তিনি কখন্ কোন্ বেশে আসেন, তা জগতে অল্প লোকেই জান্‌তে পারে।

সুল। শুন্‌ছি, ফকীরের এক কপর্দ্দকেরও সংস্থান নেই, এত লোককে তিনি খাওয়ান কোথা হ'তে?

অমরনাথ একটু হাসিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না; জিহ্বাগ্রে উত্তর আসিয়াছিল—যে ভাণ্ডার হ'তে তিনি আপনাকে আমাকে খাওয়াচ্ছেন।

সুলতান। আমার এত ভৃত্য, এত সৈন্য আছে, কিন্তু ছয় মাস তাদের দরমা না দিলে, তা'রা আমার নকরি ছেড়ে চ'লে যাবে, এমন কি, আমার বিরুদ্ধে

* বর্ত্তমান মালদহ সহর হইতে রামকেলি চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

* শ্রীচৈতন্যভাগবত। (বৃন্দাবনদাসের)

ষড়যন্ত্র ক'রে আমাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এই ফকীর, যা'র কাউকে এক কড়ি দেবার সামর্থ্য নেই, তার সঙ্গে কিনা লক্ষ লোক ঘরদ্বার ছেড়ে আজ্ঞাবহ হয়ে চলেছে! তাজ্জব!

অমর। কড়ির চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে জাঁহাপনা।

সুল। সেটা কি?

অমর। ভগবানের নাম।

সুল। আমরাও ত আল্লার নাম মসজিদে গিয়ে নিয়ে থাকি, আর দিয়েও থাকি। প্রজাদের ধর্ম্মের জন্যে মোল্লা রেখেছি, মসজিদ বানিয়েছি।

অমর। দুই-ই ধ'রে থাকলে হবে না জাঁহাপনা! নয় আল্লা, নয় কড়ি।

সুল। তুমি কি তবে বল্‌তে চাও, আমরা যে খোদাকে এত ডাক্‌ছি, সব বৃথা হচ্ছে?

অমর। বৃথা হচ্ছে না—তাঁর নাম কখন বৃথা হয় না; তাঁর নাম নিলে একদিন তার ফল পাবেন। কিন্তু কড়ি ধ'রে থাকলে আল্লাকে পাওয়া যায় না। আমি এখন ভগবানকে ভুলে আপনার নক্‌রি করছি, কিন্তু যে দিন তিনি মেহেরবাণী ক'রে আমাকে ডাকবেন, সে দিন আপনার নক্‌রিতে ইস্তফা দিয়ে নেংটী প'রে চ'লে যাব।

সুল। তুমি এই উজীরি পদ, এই ধন-দৌলত ছেড়ে কখন চ'লে যেতে পারবে?

অমর। যদি পারি সুলতান, আমায় ছুটী দেবেন?

সুল। তা' বল্‌তে পারি না; আমার মনে হয়, তোমায় ছাড়্‌লে আমার রাজ্য চলবে না—তোমার বুদ্ধিকৌশলে আমার রাজ্যের এই শ্রীবৃদ্ধি।

অমর। আমি আর কি করেছি সুলতান, আমার মত আপনার শত শত গোলাম আছে।

সুল। তা' নেহ সাকর। তুমি যদি ইসমাইল গাজির চক্রান্ত ধ'রে না দিতে, তা হ'লে সে আজ আমায় মেরে সিংহাসনে বসত। সে যে রকম অসংখ্য বন্ধু ও সৈন্য নিয়ে প্রবল হয়েছিল, তার গায়ে হাত দিতেও আমার সাহস হ'ত না। তুমি অদ্ভুত কৌশলে মুহূর্ত্তে তা'কে ধ্বংস করলে।

অমর। সে যাই হো'ক জাঁহাপনা, আমার আবেদন রইল, ছুটী চাইলে ছুটী পাব।

সুলতান। তুমি যা চাইবে উজীর সাহেব, তোমাকে তাই দেব, কিন্তু ছুটী দিতে পারব না।

উজীর সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অগ্র-পশ্চাৎ সহস্র অশ্বারোহী শরীর-রক্ষিরূপে চলিল। তাঁহার অঙ্গে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, কিন্তু তিনি অন্তরে দীন। দর্শকেরা ভাবিতেছিল, উজীর সাহেব কত বড়! আর অমরনাথ ভাবিতেছিলেন, আমি কত ছোট— কত কাঙ্গাল!

উজীর প্রস্থান করিলে সুলতান কেশব খাঁকে বলিলেন, "আমি একবার এই হিন্দু ফকীরকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।"

কেশবের ভয় হইল, পাছে সুলতান, প্রভুর কোনও অনিষ্ট করেন। কৌশল করিয়া বলিলেন, "আজ থাক্‌, কাল তাঁকে এক সময় নিয়ে আসব?

সুলতান। বেশ, তাই হবে। আমার রাজ্যে তিনি অতিথিরূপে এসেছেন, আমি তাঁকে বিরক্ত করব না, অপর কাউকে করতেও দেব না।

তথাপি সুলতানের হিন্দু কর্ম্মচারীরা নিরুদ্বেগ হইলেন না। প্রভুকে সত্বর রাজধানী ছাড়িয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন, স্থির করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রূপ-সনাতন

গভীর রাত্রি। প্রভু ভাবে বিভোর। নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাজনেরা প্রভুকে বেষ্টন করিয়া তমালতলায় উপবিষ্ট। অসংখ্য ভক্তেরা চতুর্দ্দিকে প্রায় ক্রোশব্যাপী স্থান যুড়িয়া হরিনাম করিতেছেন। দারুণ শীত। শীত-নিবারণার্থে মধ্যে মধ্যে ধুনি জ্বলিতেছে। আবার স্থানে স্থানে কীর্ত্তন চলিতেছে, নৃত্যও হইতেছে। কয়েকটা খোল-করতাল আসিয়া যুটিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ প্রবল হুঙ্কারও আকাশ ফাটাইয়া তুলিতেছে। বিধর্ম্মী রাজার দুয়ারে আসিয়া হরিধ্বনি করিতে কাহারও সঙ্কোচ বা ভয় নাই। তাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রভুর সেবক, সুতরাং অন্য কাহাকেও ভয় করিতে তাঁহারা জানেন না।

আহার্য্য প্রচুর আসিয়াছে। কে দিয়াছে, কোথা হইতে আসিয়াছে, সে সংবাদ কেহ রাখেন নাই। সুমিষ্ট কদলী ও বহুবিধ মিষ্টান্ন সহযোগে দধি ও ক্ষীরের সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহারা পরিতৃপ্ত। দাতা কে, সে সংবাদ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা দেখেন নাই। তবে দাতার উদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার কৃষ্ণপ্রেম হউক।"

লক্ষ হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ বিফল হয় নাই—সেই আশীর্ব্বাদ হইতে সনাতনের জন্ম হইয়াছিল।

এ দিকে প্রভুপাদ নিত্যানন্দ ভাবিতেছেন, "প্রভু এখানে, এই মুসলমান-রাজধানীতে আসিয়া নিশি যাপন করিতে বাসনা করিলেন কেন? নিশ্চয় তাঁহার কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে; সমস্ত দিন গেল, রাত্রিও শেষ হ'তে যায়, প্রভু নিশ্চেষ্ট—অন্যত্র যাবার নামও নেই। ব্যাপার কি? দেখাচ্ছেন যেন কিছুই জানেন না—ভাবেতেই বিভোর, কিন্তু চতুর-চূড়ামণি এ দিকে মতলব ঠিক করেছেন। কিছু রহস্য আছে—দেখা যাক্।"

সহসা নিত্যানন্দ দেখিলেন, অদূরে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি চোরের ন্যায় নীরবে ধীরে ধীরে তমাল-বৃক্ষের দিকে আসিতেছেন। ধুনির আলো তেমন উজ্জ্বল ছিল না। অস্পষ্টালোকে দেখিলেন, আগন্তুকদ্বয় নগ্নপদ, নগ্ন অঙ্গ—পরিধানে একখানি সামান্য বস্ত্র মাত্র, কিন্তু বক্ষে যজ্ঞোপবীত। নিত্যানন্দ উঠিলেন, অনুমান করিলেন, এই দুই ব্যক্তির জন্যই প্রভু এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই বলিলেন, "প্রভু তোমাদের অপেক্ষা করছেন, এস।" দুই ভাই—অমর ও সন্তোষ—বিস্মিত হইয়া নিত্যানন্দের পানে চাহিলেন। নিত্যানন্দ একটু হাসিলেন, তখন দুই জনের মনে এক সময়ে এই সিদ্ধান্ত সমুদিত হইল যে, ইনিই প্রভুপাদ নিত্যানন্দ। তখন উভয়ে তাঁহার চরণে পড়িয়া যুক্তকরে বলিলেন, "আমাদের প্রতি কৃপা কর।"

নিত্যানন্দ সহাস্যে উত্তর করিলেন, "কৃপাময় তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন বলেই নীলাচল হ'তে এতদূরে এসেছেন। আর তোমাদের ভয় কি?"

দুই ভাই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। নিত্যানন্দ তখনও তাঁহাদের পরিচয় অবগত নহেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, এই দুই ব্যক্তির জন্যই প্রভু এ দেশে আসিয়াছেন। প্রভুপাদ সহাস্য-বদনে প্রভুর নিকট তাঁহাদের লইয়া চলিলেন। প্রভু বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত প্রেম-বিহ্বল। নিত্যানন্দের চেষ্টায় প্রভুর ধ্যানভঙ্গ হইল। দুই ভাই তখন প্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। যে চরণধূলির কামনায় লক্ষ লক্ষ ভক্ত ছুটাছুটি করিতেছেন, সেই দেব-দুর্ল্লভ চরণধূলি তাঁহারা মাথায় ও জিহ্বায় দিলেন। হৃদয়ের বেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইল—প্রাণের ভিতর যেখানটায় হাহাকার উঠিতেছিল, সেখানটা শান্ত ও শীতল হইল। প্রভু কারুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের পানে চাহিলেন; বলিলেন, "উঠ, দৈন্য সম্বরণ কর। তোমরা আমাকে যে সকল পত্র লিখেছিলে, তা আমি পেয়েছি—আমার একটা উত্তরও পেয়ে থাক্‌বে।"

অমর যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আমার সে স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিও। এবার তুমি জগতে আসিয়াছ শুধু ভালবাসিতে, প্রেম বিলাইতে—দণ্ড দিতে নয়; সেই ভরসাতেই আমি তোমায় পত্র লিখিতে সাহস করিয়াছিলাম।"

প্রভু একটু হাসিলেন; আর প্রেমময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সনাতনকে বুঝাইলেন, তাঁহার কাছে যে অপরাধ, তাহা তিনি গ্রহণ করেন না।

অমর। পাপীকে উদ্ধার করতে এবার এসেছ প্রভু; কিন্তু আমাদের মত পাপী আর কোথাও পাবে না।

প্রভু। কৃষ্ণনাম যার বদনে, তা'র আবার পাপ কোথা? সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণনামে।

অমর। প্রভু, কৃষ্ণনাম বদনে নাই, হৃদয়ে নাই। সেথা আছে শুধু হাহাকার, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা। রক্ষা কর প্রভু, কাঙ্গালদের উদ্ধার কর।

প্রভু। যখন পাপ চিনেছ, নামের মহিমা বুঝেছ, তখনই ত তোমার উদ্ধারের উপায় কৃষ্ণ করেছেন।

অমর। প্রভু, আমরা ঘোর পাপী—এত বড় পাপী তোমার জগাই-মাধাইও ছিল না। তাহারা মূর্খ নির্ব্বোধ—অজ্ঞানে পাপ করেছে; আর আমরা পাপ জেনে শুনে করেছি। তোমার কৃপা ভিন্ন এ জ্ঞানকৃত অপরাধ হ'তে উদ্ধার নেই।

প্রভু। কৃষ্ণের কৃপায় তোমরা অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিবে।

অমর। প্রভুর বাক্য কখন নিষ্ফল হবার নয়; কিন্তু যে জিহ্বা কখন মিথ্যা ভিন্ন সত্য বল্‌তে পারে নি, সে জিহ্বা কিরূপে কৃষ্ণনাম বল্‌বে? যে হৃদয় পরের হিংসা ব্যতীত পরের উপকার-চিন্তা কখন করে নি, সে হৃদয় কিরূপে কৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হবে?

প্রভু। আজ তোমাদের পুনর্জ্জন্ম হ'ল; আমি তোমাদের নাম দিলাম—সনাতন ও রূপ; এই নামে তোমরা দুই ভাই অতঃপর পরিচিত হইবে। তোমরা কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র জপ কর, অচিরাৎ কৃষ্ণের কৃপায় মুক্তিলাভ করিবে।

উভয়ের দেহমধ্যে এক তাড়িত-প্রবাহ প্রবেশ করিল; সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া সেই শক্তি সঞ্চালিত হইল এবং কাহাকে যেন ঠেলিয়া উঠাইয়া জাগাইল; সেই বেগভরে তাঁহাদের দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

রূপ (সন্তোষ) এতক্ষণ নীরব ছিলেন; গলায় বস্ত্র দিয়া যুক্তকরে অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রভুর পানে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। এখন সহসা বলিয়া উঠিলেন,

"এ কি! আমার প্রাণের ভিতর এমন হচ্ছে কেন? কোথা হ'তে যেন একটা অসীম শক্তি এসে আমায় কাঁপিয়ে তুলছে। যে জিহ্বা কখন কৃষ্ণনাম বলে নি, সে জিহ্বা কেন কৃষ্ণনাম নিয়ে ছুটে চলেছে? কে যেন আমার প্রাণের ভিতর একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সব আলো ক'রে দেখা দিয়েছে। এ যে বাঁশী হাতে ক'রে চরণের উপর চরণ দিয়ে দাঁড়াল। এ কে? মরি মরি, কি সুন্দর! সমস্ত আকাশের নীলবর্ণ যেন গ'লে এর অঙ্গে পড়েছে। নীলবর্ণ এত উজ্জ্বল? এ নীলের জ্যোতিতে যে সব ভ'রে গেল! এই নীল জ্যোতির মধ্যে আবার এ কি ফুটে উঠল? হাসি? হাসি কি এমন বিদ্যুৎভরা হয়? দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে এ হাসিতে সব ভ'রে গেল—আকাশ, পৃথিবী, আমি, আমার চতুর্দ্দিক্, সব হাসিময়। ও কি, আবার একটা কিসের তরঙ্গ এসে হাসির বিদ্যুৎকে সহসা নিবিয়ে দিলে; দৃষ্টি? আকর্ণ-বিস্তৃত নীল নয়নের দৃষ্টি। আহা, দৃষ্টিতে কত প্রেম, কত করুণা! এ ত দৃষ্টি নয়, এ যে করুণার প্রবাহ—অমৃতধারায় জগৎ প্লাবিত ক'রে ছুটে চলেছে। স্রোত, বয়ে যেও না—দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি এক বিন্দু তুলে নেব—আমায় এক বিন্দু দিয়ে যাও—ওগো দাঁড়াও—

বলিতে বলিতে রূপ, প্রভুর চরণের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহার পদ্মহস্ত রূপের মাথায় দিলেন; রূপ, প্রভুর চরণধূলি লইয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রভু কহিলেন, "রূপ, তোমায় কৃষ্ণ কৃপা করেছেন, অতি সত্বরই তুমি সকল বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ করবে।"

সনাতন (অমর) এতক্ষণ অবিশ্রাম কাঁদিতে-ছিলেন। কেন কাঁদিতেছেন, তা' তিনি জানেন না, কিন্তু কান্নার বিরাম নাই—প্রবাহ গড়াইয়া মেদিনী সিক্ত করিল। প্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "তোমরা আমার অতি প্রিয়।"

সনাতন যুক্তকরে বলিলেন, "প্রভু, পাপিমাত্রেই তোমার প্রিয়, নইলে মি পতিতপাবন নাম নেবে কেন?"

প্রভু। সনাতন, তোমার দৈন্যপূর্ণ পত্র পেয়ে আর স্থির থাকতে পারলাম না—নীলাচল হ'তে ছুটে এসেছি।

সনা। তোমায় ডাক্‌লে কি তুমি থাকতে পার প্রভু? আমি তোমায় এত দুঃখ দিয়ে অতদূর থেকে আনতাম না; কিন্তু আর আমাদের কে আছে নাথ? আর কা'কে ডাকব? তুমি যে আমাদের—আমাদের জন্যেই ধরায় এসেছ। আমি কৃষ্ণ জানি না, ভগবান্ জানি না—জানি শুধু তোমাকে—আমার প্রেমময় করুণাময় গৌরাঙ্গদেবকে। প্রভু, তোমার এ দাসকে চরণে স্থান দেও—আর আমার কেউ নেই।

প্রভু। সময়ে কৃষ্ণ কৃপা করবেন—নির্ভয় থাক। অন্তরেও একবার যে তাঁকে ডেকেছে, তা'র ত আর ডুববার ভয় নেই,—সেই নাম তাহাকে রক্ষা করবে, আর সে যদি কর্ম্মদোষে বিপথে যায়, কৃষ্ণ তাহাকে চুলে ধ'রে সৎপথে নিয়ে আসবেন।

রূপ ও সনাতন। প্রভু, এই কথা যেন স্মরণ থাকে।

প্রভু একটু হাসিলেন। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু কি এই লক্ষ লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে চলেছেন?"

প্রভু। তাই ত দেখছি, অনেক লোক সঙ্গ নিয়েছে।

সনা। জনতা ক্রমে বাড়তেই থাকবে।

প্রভু। সে কথা সত্য; আমি তবে নীলাচলে ফিরে যাই।

রূপ কহিলেন, "প্রভুর অনুমতি হয় ত আমিও সঙ্গে যাই।"

প্রভু। না রূপ, এখন নয়—সময়ে যেও।

রূপ। আবার কবে প্রভুর দর্শন পাব?

প্রভু। সত্বরই কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করবেন।

অরুণোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুই ভাই প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। প্রভু তখন নিত্যানন্দকে বলিলেন, "এত লোক সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়া ঠিক নয়; সনাতনের মুখ হ'তে কৃষ্ণের আদেশ পেলাম। চল, আমরা নীলাচলে ফিরে যাই।"

নিত্যানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা' জানি, তুমি এখান হ'তেই ফিরবে। বৃন্দাবন-যাত্রা ত ছল মাত্র।"

পঞ্চম অধ্যায়

নিত্যানন্দের হরিনাম বিতরণ

প্রভু গৌড়নগর ত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে অগ্রদ্বীপ-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। নরোত্তম ঠাকুরের জন্মভূমি খেতরির কিছু দূরে পদ্মা পার হইয়া প্রভু সত্বর অগ্র-দ্বীপে আসিলেন; এবং তথায় গোবিন্দকে কৃপা করিয়া শান্তিপুরে আসিলেন। জননীর পাদবন্দনা করিয়া তথায় মাধবেন্দ্র-তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। পরে দ্রুতপদে নীলাচল-অভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রভুপাদ নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইলেন ন'—বাঙ্গালায়

রাখিয়া গেলেন, হরিনাম প্রচারের জন্ত। প্রভুপাদ বর্ত্তমান কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী পাণিহাটী গ্রামে ভক্ত ও ধনী রাঘবের বাটীতে অবস্থান করিয়া হরিনামে দেশ মাতাইতে লাগিলেন।

সপ্তগ্রামে রঘুনাথ তাহা শুনিলেন। প্রভুপাদের চরণবন্দনা করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। পিতার নিকট অনেক মিনতি করিয়া পাণিহাটীতে আসিতে রঘুনাথ অনুমতি পাইলেন। অবশ্য প্রহরী তাঁহার সঙ্গে চলিল। বিদায়কালে গোবর্দ্ধন বলিয়াছিলেন, "তুমি যাহা কর, যত ইচ্ছা ব্যয় কর, আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু কতকগুলো সন্ন্যাসীর পাল্লায় প'ড়ে সংসার ত্যাগ করো না।"

সুরম্য ও সুসজ্জিত তরণীতে উঠিয়া রঘুনাথ চলিয়াছেন। সঙ্গে কয়েকজন বয়স্য আছেন; ইহা পিতার দান। রঘুনাথের মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য সঙ্গীতামোদী সংসারমুখী কয়েক জন নবীন যুবককে গোবর্দ্ধন সঙ্গে দিয়াছেন। রঘুনাথ আপত্তি করেন নাই, কিন্তু তাহাদের সহিত এই সর্ত্ত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ছাড়া গ্রাম্য কথার আলোচনা করিতে পারিবে না।

তরণী যখন পাণিহাটী গ্রাম হইতে কিয়দ্দূরে, তখন আরোহীরা দেখিলেন, এক বিপুল জনপ্রবাহ গঙ্গার তীর বহিয়া ধীরে ধীরে মন্থর-গতিতে চলিয়াছে। তরণী ক্রমে নিকটে আসিল; রঘুনাথ দেখিলেন, এক জন সন্ন্যাসী রূপে আলো করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে পথ বহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। তিনি কি একটা গান করিতে করিতে যাইতেছিলেন। গান বুঝা গেল না, কিন্তু কণ্ঠ শুনা গেল। তরণীর উপর হইতে যুবকেরাও গান ধরিলেন।

তরণী ক্ষণকালমধ্যে ঘাটে লাগিল। রঘুনাথ সদলে ঘাটে নামিলেন ও সেই জনস্রোতে মিশিয়া গেলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ-প্রভু সপার্ষদ গাইতে গাইতে চলিয়াছেন। তাঁহার চরণে নূপুর, নয়নে বারিধারা, বদনে হরিনাম। তিনি নাচিতেছিলেন, আর গাইতেছিলেন।

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গ নাম রে;
যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদে সেই আমার প্রাণ রে।"

কেহ নাম লইতেছে, কেহ লইতেছে না। যে লইতেছে, সে নৃত্য ও সঙ্গীতে যোগ দিতেছে। যে পাষাণ, সে শুধু মজা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ বা বিদ্রূপ করিতেছে। এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "নাম নিয়ে হবে কি?"

"গোলোকে যাবে।"

"স্ত্রীপুত্র নিয়ে?"

"যে নাম নেবে, সেই যাবে।"

"সেখানে কি সব খড়ের ঘর?"

প্রভুপাদ উত্তর না করিয়া সকাতরে বলিলেন, "একবার গৌর বল।"

লোকটা উত্তর করিল, "তা বই কি, আমি ওই নামটা ক'রে গোল্লায় যাই, আর এখানে আমার মেয়ে ছেলে না খেতে পেয়ে ম'রে যা'ক্। ও-সব হবে না ঠাকুর!"

প্রভুপাদ। তুমি ত কঠিন নও; একবার গৌর বল—সময়ে গৌর তোমায় উদ্ধার করবেন।

নাম গ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তি উত্তর করিল, "এমন সোণার সংসার, স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে আমি গোলোকে যেতে চাই না।"

প্রভুপাদ। একদিন ত ছাড়তে হবে ভাই।

ব্যক্তি। মর্‌তে হবে বল্‌ছ? তার এখন ঢের দেরী; এর পরে দেখা যাবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া কহিল, "আচ্ছা ঠাকুর, তুমি গোলোক দেখেছ?"

প্রভুপাদ। গোলোক দেখি নি, গোলোকপতিকে দেখেছি। ভাই, একবার গৌর বল।

২য় ব্যক্তি। গোলোকে যেতে আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই।

প্রভুপাদ। ভাই, গৌর ব'লে আমায় কিনে লও।

২য় ব্যক্তি। তুমি আমার কোন্ কাজে লাগবে যে, তোমায় আমি কিনে নেব? শুধু গৌর গৌর ব'লে জ্বালাবে বই ত নয়।

১ম ব্যক্তি। ধাঃ, সেই নামটা ক'রে ফেল্‌লি?

২য় ব্যক্তি। বেশ করেছি, এক শ'বার করব; তোর কি? গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর। আমার কাছে নাম-টাম যে কিছু চালাকি ক'রে যাবেন, সে যো নেই। কিন্তু নামটি বেশ, আমার আরও বল্‌তে ইচ্ছা করছে। বলি না কেন,—গৌর গৌর গৌর গৌর গৌর। বাঃ, কি মিষ্ট নাম!

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ-নাম রে।

অবশেষে তিনি গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে প্রভুপাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তির অবস্থা দৃষ্টে অপর এক ব্যক্তি স্পর্দ্ধা সহকারে অগ্রসর হইয়া কহিল, "ঠাকুর, আমি তোমায় কিনে নিতে সম্মত আছি।"

"তবে হরি বল, কৃষ্ণ বল, গৌর বল।"

৩য় ব্যক্তি। হরি হরি হরি হরি
হরি হরি হবি হরি
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।

কই ঠাকুর, আমার ত কিছু হ'ল না? কিন্তু আরও নাম করতে মন হচ্ছে—করিই না—দুটা নাম মুখে করব, তা'তে আর ক্ষতি কি? কিন্তু শীঘ্রই আমায় বাড়ী ফিরতে হবে, ছোট মেয়েটা বাল্সেছে দেখে এইছি। নাম ক'টা করে নি!—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।

এ কি, নাম যে আমার রসনা ছাড়তে চাচ্ছে না। আগে মুখে নাম বল্‌ছিলাম, এখন যে বুকের ভিতর হ'তে নাম ঠেলে উঠ্‌ছে। এ আবার কি ফ্যাসাদ হ'ল! ছেলে মেয়ে ঘরদোর সবই যে ভুলে যাচ্ছি, শুধু সেই নামই মনে পড়ছে—কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ—ঠাকুর তুমি আমার এ কি করলে? আহা, কি মধুর নাম! এ নাম কোথায় এতদিন লুকান ছিল!

নাম গাইতে গাইতে তিনিও নিত্যানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। অপর এক ব্যক্তিকে ধরিয়া প্রভুপাদ বলিলেন, "ভাই, একবার কৃষ্ণ বল।"

৪র্থ ব্যক্তি। আমি গোড়ায় সাফ্ ব'লে দিচ্ছি, আমা হ'তে ও-সব পাগলামী হবে না—ধেড়ে মিন্‌ষে সদর-রাস্তার উপর দিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছেন—লজ্জাও করে না!

প্রভুপাদ। আমার কোলে ব'সে একবার হরি বল ভাই, একবার কৃষ্ণ বল।

৪র্থ ব্যক্তি। গোড়াতেই সাফ্ ব'লে দিইছি ত।

প্রভুপাদ। আমি তোমার দাসানুদাস—আমার প্রতি কৃপা ক'রে একবার কৃষ্ণ বল, একবার গৌর বল।

৪র্থ ব্যক্তি। ঠাকুর-মহলের একটা নামও আমা হ'তে হবে না। নাচ্‌ছ, কাঁদ্‌ছ, ব্যাস্—আবার আমায় নিয়ে পড়্‌লে কেন?

প্রভুপাদ তখন ধূলার উপর তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ওগো, একবার হরি বল, একবার কৃষ্ণ বল; কৃষ্ণ ব'লে আমায় জন্মের মত কিনে লও।"

লোকটা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। একজন মহাশক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী, তাহাকে হরিনাম বলাইবার জন্য তাহার পায়ের কাছে পড়িয়াছেন। এ দৃশ্য সে হিন্দু হয়ে সহ্য করিতে পারিল না; বলিল, "ওঠ ঠাকুর, যা বলতে বল্‌বে, তাই বল্‌ছি। তামাসা দেখ্‌তে এসে ভ্যালা আপদে পড়লুম! কি বল্‌তে হবে? কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম? আচ্ছা বলছি, ওঠ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে,
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে।

বাঃ, বেশ নাম ত। আচ্ছা, নাম করতে করতে বুকের ভিতর কেঁপে উঠে কেন? কি যেন বন্ধ ছিল, খুলে গেল। চোখে জল আসছে কেন? ছেলে-মেয়েদের ডাকতে এমন হয় না ত। প্রাণভ'রে অবিরাম ডাকতে বাসনা হচ্ছে কেন?

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে,
রাম রাম রাম রাম রাম রাম রাম হে।

ওগো, আমায় রসনা ক'রে দাও, আমি রসনা হয়ে মধুর কৃষ্ণনাম অবিরাম করতে থাকি; আমায় শ্রবণেন্দ্রিয় ক'রে দেও, আমি দিবারাতি ঐ নাম শুন্‌তে থাকি; আমায় চক্ষু ক'রে দেও, আমি দিবানিশি ঐ নাম আকাশপটে চিত্রিত দেখি—"

নিত্যানন্দ-প্রভু, তাহার কম্পিতদেহ বাহুমধ্যে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর সে নাম করিতে করিতে কাদিতে কাদিতে নির্লজ্জের ন্যায় নাচিতে নাচিতে চলিল।

এইরূপে নিত্যানন্দ দ্বারে দ্বারে নাম বিতরণ করিয়া বেড়াইলেন। অপরাহ্নে রাঘবের বাটীতে যখন ফিরিলেন, তখন রঘুনাথ তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। প্রভুপাদ পূর্ব্বে দুই তিনবার রঘুনাথকে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচয়ও অবগত ছিলেন। এক্ষণে রঘুনাথকে পাইয়া সাদরে বক্ষে ধরিলেন; এবং ভক্তদের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। রঘুনাথ, বৈষ্ণবমাত্রেরই পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

ক্ষণপরে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরিদাসকে দেখছি না; কোথায় গেলে তাঁর দর্শন পাব?"

প্রভুপাদ। তিনি নীলাচলে আছেন।

রঘুনাথ। শুনেছিলাম, নীলাচলে যবনের প্রবেশাধিকার নাই।

প্রভুপাদ। প্রভুর ইচ্ছায় সবই হয়। হরিদাসের অন্তরের ইচ্ছা জেনে প্রভু তাঁহাকে নীলাচলে যেতে বলেছিলেন। তা' ছাড়া হরিদাস যবন নহেন—তিনি ব্রাহ্মণ-সন্তান, যবনের অন্নে পালিত। যদি যবনও হতেন, তা হ'লেও তিনি অতি পবিত্র—তাঁহার চরণরজে তীর্থ পবিত্র হয়।

রঘুনাথ অন্তরে হরিদাসকে ধ্যান করিয়া ভক্তিবিনম্র-চিত্তে প্রণাম করিলেন। অতঃপর প্রভুপাদ কহিলেন, "রঘুনাথ, আমরা ভিখারী সন্ন্যাসী, যে

যা' দেয়, তাই খাই; বহুকাল উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পাই নাই। তুমি ধনীর সন্তান—"

ব্যস্ত হইয়া রঘুনাথ বলিলেন, "সে সৌভাগ্য কি আমার ঘটিবে? প্রভুপাদের আদেশমত আমি সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করিতেছি।"

তখনই চারিদিকে লোক ছুটিল; দ্রুতগামী নৌকা লইয়া দুই জন ভৃত্য সপ্তগ্রামে গেল; মহল কলকাত্তা প্রভৃতি স্থানেও লোক প্রেরিত হইল। পরদিবস মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পূর্ব্বেই বিশ হাজার লোকের আহার্য্য সংগৃহীত হইয়া রাঘবের গৃহ-সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত হইল। দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, আম্র, কদলী, মিষ্টান্ন, চিপিটক প্রভৃতি আহার্য্য ভারে ভারে আসিযা প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিল। গঙ্গাতীরে রাঘবের বাটী; প্রাচীন বট ও অশ্বত্থবৃক্ষে প্রাঙ্গণ সকল সময়ে ছায়াশীতল। আষাঢ় মাস, নিদাঘের প্রকোপ মন্দীভূত। গঙ্গা-প্রবাহিত সমীরণে সকলেরই মন প্রফুল্ল। শত শত ভক্ত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। সহস্র সহস্র অনাহূত ভক্তও প্রসাদ-গ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছেন। ভাগীরথী বাহিয়া যাহারা নৌকারোহণে যাইতেছিলেন, তাঁহারাও নৌকা লাগাইয়া প্রসাদলোভে একখানা পাতা লইয়া বসিয়া পড়িলেন।

মধ্যস্থলে এক বিপুলকায় বটবৃক্ষতলে দুইখানি পাতা হইল। নিত্যানন্দ একখানি আসনে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে ধ্যানস্থ হইলেন; সম্ভবতঃ মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গদেব তখন নীলাচলে, কিন্তু নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আসিতে হইল; এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির নয়নপথগামী হইয়া তাঁহাকে ভোজনে বসিতে হইল। তদ্দৃষ্টে ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন এবং ভোজ্য উপেক্ষা করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন; নৃত্যের সঙ্গে গান আরম্ভ হইল—

ওগো এসেছে, এসেছে, আমার প্রাণনাথ এসেছে,
বহুদূর হ'তে আমারে দেখিতে ছুটে সে এসেছে।
আমায় ফেলে সে কি থাক্‌তে পারে,
সে বই আমি যে আর জানি না রে,
সে বই আমার যে কেহ নাই রে,
তাই সে এসেছে, আমার রাজা, আমার বঁধু এসেছে,
আমারে দেখিতে আমায় দেখা দিতে ছুটে এসেছে।

ভোজ্য পড়িয়া রহিল; নৃত্য ও গীত চলিতে লাগিল। আহার্য্য চরণে দলিত হইয়া নষ্ট হইল। নিত্যানন্দ সকলকে শান্ত করিয়া আহারে বসাইলেন। আবার নূতন পাতা আসিল, আম, দধি, ক্ষীর আবার আসিল। দধি-ক্ষীরের আর প্রয়োজন ছিল না—চোখের জলেই চিপিটক ভিজিয়াছিল।

রঘুনাথ ভোজনে বসেন নাই, তিনি এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে গলদশ্রুলোচনে প্রভুকে দেখিতেছিলেন। নিত্যানন্দ বলিলেন, "আর কান্না কেন রঘুনাথ? প্রভু যখন তোমার ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তখন তোমার মনস্কামনা অচিরাৎ পূর্ণ হবে।"

রঘুনাথ আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরীক্ষা

কার্ত্তিক মাস; শীত তখনও পড়ে নাই। একদা প্রভাতে রূপ ও সনাতন পদব্রজে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছেন। তখনও সূর্য্যদেব আকাশে দেখা দেন নাই—তাঁহার রক্তবসনা গৃহদেবী সবে উঠিতেছেন। পৃথিবীর মানুষ তখনও জাগে নাই, দেবী-দর্শনার্থে দুই চারি জন জাগিয়াছে মাত্র। পথে জনকোলাহল নাই—কিন্তু গাছের মাথায় পাখীর কোলাহল আরম্ভ হইয়াছে।

মন্ত্রিযুগলের সঙ্গে পাইক নাই, কেবল দুই জন ভৃত্য বস্ত্রাদি লইয়া পশ্চাতে দূরে দূরে আসিতেছিল। রূপ বলিতেছেন, "দাদা, এ রকম ক'রে ত আর দিন যায় না—আর যে পারি না।"

সনাতন। ধৈর্য্য ধর ভাই, প্রভু যখন বলেছেন, আমরা সত্বর মুক্তি লাভ করব, তখন তুমি নিজের জন্য কেন আর চিন্তা কর?

রূপ। চিন্তা যে অনেক দাদা; জীবন যে অবিরাম বয়ে চলেছে—আমার শত অপরাধেও অপেক্ষা করছে না। যে চিন্তা লয়ে প্রভাতে উঠি, সেই চিন্তা লয়ে দিবসান্তে শয্যা গ্রহণ করি। হিসাব মিলায়ে দেখি, আয় কিছু নাই—ব্যয়ই বেশী।

সনা। যে আয় ক'রে নিয়েছ, তাহা ত আর ব্যয় হবার নয়। প্রভুর চরণধূলি যে মাথায় আছে ভাই।

রূপ। দাদা, আমি প্রভুকে ছেড়ে আর থাকতে পারছি না; প্রতিমুহূর্ত্তে ইচ্ছা করছে, নীলাচলে ছুটে যাই।

সনা। তাঁর আদেশ না পেলে যেতে পার না।

রূপ। তবে তুমি তাঁকে এখানে ডাক না কেন দাদা! তুমি ডাক্‌লে তিনি স্থির থাক্‌তে পারবেন না।

সনা। ভক্তে ডাকলেই তিনি অস্থির হন ; তাই ব'লে কি ভক্তের উচিত তাঁকে কষ্ট দেওয়া ? তাঁর যা' মন চায়, তিনি তাই করুন ; যদি আমাদের জীবন্ত দগ্ধ করতে ইচ্ছাময়ের বাসনা হয়, আমরা সানন্দে তাঁর আদেশ মাথা পেতে নেব।

রূপ। আচ্ছা দাদা, প্রভু আজও নীলাচল ত্যাগ ক'রে বৃন্দাবন গেলেন না কেন ? গত বৎসর ত এই সময় নীলাচল হ'তে যাত্রা করেছিলেন।

সনা। আমার কি বিশ্বাস শুনবে রূপ ? প্রভু নীলাচল ত্যাগ করেছেন।

রূপ। তিনি নীলাচল ত্যাগ করলে আমাদের চরেরা এসে সংবাদ দিত। চার জন লোক শ্রীক্ষেত্রে ব'সে রয়েছে—প্রভুর সংবাদ আনবার জন্তে ; এক জনও অন্ততঃ ছুটে এসে খবর দিত।

সনা। শীঘ্রই সে সংবাদ পাবে।

রূপ। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে দাদা ?

সনা। আমি ধ্যানে দেখেছি, প্রভু নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছেন।

রূপ বিস্মিত হইলেন ; ভাবিলেন, আমি কেন ধ্যানে প্রভুকে দেখিতে পাই না ? উভয়ে তখন গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

সনাতন বলিলেন, "দেখ রূপ, প্রভুর চরণরজঃ আর এই গঙ্গাবারি যা'র মাথায়, তার আর কোন চিন্তা নাই।"

উভয়ে জলে নামিলেন এবং স্নানাদি সমাপনান্তে আবক্ষ জলে দাঁড়াইয়া গঙ্গার স্তব করিতে লাগিলেন—

"দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবন-তারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।" ইত্যাদি

তীরে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের প্রেরিত চর-চতুষ্টয়ের মধ্যে এক জন ভৃত্যদ্বয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ব্যস্ত হইয়া রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি ?"

"প্রভু নীলাচল ত্যাগ করিয়াছেন।"

উভয়ের বদন উৎফুল্ল হইল। রূপ ব্যস্ততাসহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে ? কোন্ পথে ? সঙ্গে কে ?"

চর উত্তর করিল, "বিজয়া দশমীর দিন শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল-পথে বৃন্দাবনের দিকে চলেছেন। সঙ্গে বলভদ্র ব'লে একটি ভক্ত ব্রাহ্মণ আছেন, কাউকে পূর্ব্বাহ্ণে জানান নি, সঙ্গেও আর কাউকে নেন নি।"

রূপ তাহাকে পুরস্কারের আশা দিয়া বিদায় করিলেন, পরে উভয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহাভি-মুখে অগ্রসর হইলেন। ভৃত্যদ্বয় স্নানার্থে পশ্চাতে রহিল।

রূপ বলিলেন, "দাদা, এইবার আমি চলিলাম।"

সনা। হৃদয়ে যদি পূর্ণ বৈরাগ্য জেগে থাকে, তবে আমি বাধা দেব না—স্বচ্ছন্দে যাও।

রূপ। তুমি যাবে না দাদা ?

সনা। সুলতানকে না ব'লে আমি যেতে পারব না। তিনি আমার উপর রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁকে সব বুঝিয়ে না দিয়ে আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রূপ। তুমি কি আশা কর, সুলতান তোমায় ছুটী দেবেন ?

সনা। সে আশা করি না, তবে ব'লে যাব—চোরের ন্যায় পালাব না।

রূপ। তবে আর তোমার যাওয়া ঘটবে না।

সনা। তুমি অগ্রসর হও, আমি পিছনে যাচ্ছি। প্রভু যখন আমাকে ডাক্‌বেন, তখন আমায় কেহ বেঁধে রাখতে পারবে না।

রূপ। তবে আমি একা বৃন্দাবনে যাব ?

সনা না, অনুপকে সঙ্গে লও। আর তোমার ও আমার অর্থাদি যা' কিছু আছে, সব সঙ্গে লও।

রূপ। সে কি ? অর্থ নিয়ে কি করব ? সন্ন্যাসী হ'তে যাচ্ছি, এখনও অর্থ ?

সনা। অর্থ নিয়ে তোমাকে বৃন্দাবনে যেতে বল্‌ছি না, দেশে যেতে বল্‌ছি। সেখানে অর্থ রেখে অনুপকে নিয়ে বৃন্দাবনে যেও।

রূপ। এত অর্থ নিয়ে কি হবে ?

সনা। অনেক কাজ হবে। তোমার ও আমার সন্তানাদি নাই। অনুপের পুত্র জীবই আমাদের একমাত্র বংশধর। তা'র এত অর্থে প্রয়োজন নেই। তা'কে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে আমাদের গৃহে বসাবে, আর বাকি অর্থ দেবকার্য্যে ব্যয় করবে ; নিজের জন্তে এক কড়িও রেখো না। সত্বর কাজ শেষ ক'রে বৃন্দাবনে যাও ; আমি এ দিকে সুলতানকে বুঝিয়ে রাখব, তুমি দেশে গিয়েছ, আবার ফিরবে।

রূপ। আমি দু'দিনের মধ্যেই—

সহসা পথপার্শ্বে কাতরকণ্ঠে কে ডাকিয়া উঠিল, "বাবা গো !"

উভয়ে চমকিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় চীৎকার হইল, "বাবা গো, মেরে ফেল্লে গো !" উভয়ে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। পথপার্শ্বে আমগাছের বাগিচা, সামন্য জঙ্গলে আবৃত কিয়দ্দূর গিয়া

উভয়ে দেখিলেন, এক শীর্ণ বৃদ্ধা অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় রোদন করিতেছে। বৃদ্ধা অতিকুৎসিতদর্শনা, অর্দ্ধনগ্না যে বস্ত্রটুকু পরিধানে আছে, তাহা ছিন্ন, মলিন, দুর্গন্ধবিশিষ্ট। সনাতন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা?"

বৃদ্ধা। সাপে কেটেছে বাবা।

সনা। কই দেখি।

বৃদ্ধা। আমাকে ছুঁয়ো না বাবা।

সনা। কেন মা?

বৃদ্ধা। আমি ছোট জাত—মেথর।

সনা। তুমি যে আমার মা।

বৃদ্ধা। আমি অশুচি।

সনা। মা কি কখন অশুচি হয়?

বৃদ্ধা নীরবে সনাতনের দিকে চাহিয়া রহিল। সনাতন নিজের উত্তরীয় দ্বারা বৃদ্ধার অর্দ্ধনগ্ন দেহ আবৃত করিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, দষ্ট স্থান হইতে রক্ত ছুটিতেছে। তখন আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ক্ষতস্থানে মুখ দিতে উদ্যত হইলেন। রূপ তাঁহাকে সে সুযোগ না দিয়া তৎপরতার সহিত নিজে মুখ দিলেন এবং চুষিয়া রক্ত টানিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে তাঁহারা কি বুঝিয়া রক্ত-মোক্ষণ হইতে বিরত হইলেন। সনাতন বলিলেন, "আর কোনও ভয় নাই মা, এখন আমাদের ঘরে চল—পরে সুস্থ হ'লে তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।"

দুই ভাই বৃদ্ধাকে যত্নপূর্ব্বক বহন করিয়া লইয়া চলিলেন। সনাতনের গৃহ নিকটে; তথায় বৃদ্ধাকে তাঁহারা আনিলেন এবং এক পালঙ্কের উপর বিস্তৃত শয্যায় তাহাকে শয়ন করাইলেন। চারিদিক্ হইতে দাসদাসী ছুটিয়া আসিল; রূপ তাহাদের ভিড় করিতে নিষেধ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সনাতনের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি একদৃষ্টে শয্যোপরি বিস্তৃত উত্তরীয় পানে চাহিয়া ছিলেন। অবশেষে কাঁদিয়া উঠিলেন। রূপ তাঁহার দাদার পানে বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেহ কাঁপিতেছে, বক্ষ অশ্রুপ্লাবিত। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে দাদা?"

সনাতন অঙ্গুলীসঙ্কেতে শয্যা দেখাইয়া দিলেন। রূপ চকিতে উঠিয়া উত্তরীয় টানিলেন। দেখিলেন, বস্ত্রনিম্নে বৃদ্ধার দেহ নাই। রূপ নির্ব্বাক্!

সনাতন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যাপানে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, কত দয়া তোমার। কত দয়া ক'রে আজ তোমার ভৃত্য দুটিকে স্মরণ করেছ! পরীক্ষা কত করবে কর; তোমার পরীক্ষায় তুমিই উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি কে? তুমি পরীক্ষা, তুমি শক্তি। সনাতন তোমার। সনাতন যদি কখন বিপথগামী হয়, সে কলঙ্ক তোমার—সনাতনের নয়, দয়াময়!"

সপ্তম অধ্যায়

সনাতন বিদ্রোহী

মাসাবধি হইল, রূপ গৌড় ত্যাগ করিয়া প্রেমভাগ অভিমুখে গিয়াছেন। তাঁহার কোন সংবাদ নাই। সুলতান মহারুষ্ট; দবীর খাস নাই, টেঁকশালের অধ্যক্ষ বল্লভ নাই, আবার সাকর মল্লিক কার্য্যে অমনোযোগী। সুলতান কেশব খাঁকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দবীর খাসের কোন সংবাদ পেয়েছ?"

কেশব। পেয়েছি জনাব; তিনি দেশে আছেন।

সুলতান। মন্দ নয়; আর বল্লভ?

কেশব। তিনিও দবীর খাসের সঙ্গে গেছেন।

সুলতান। বেশ! আর এ দিকে সাকর মল্লিক দরবেশ হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তিন ভাই বিগড়ালে আমার কাজ চলে কেমন ক'রে? সহজে আমি মল্লিককে ছাড়ছি না। আচ্ছা খাঁ সাহেব, বল্‌তে পার, কোন্ দুঃখে এই সব মানুষ দরবেশ হ'তে চায়? এই ধন-দৌলত, মান, ইজ্জত, এ সব ছেড়ে পথে পথে আল্লা আল্লা ক'রে কি সুখ পায়? কেন, ঘরে ব'সে কি খোদাকে ডাকা যায় না? আমরা কি ডাক্‌ছি না?"

কেশব। জাঁহাপনা, মানুষের মাথা না বিগ্‌ড়ালে দরবেশ হয় না।

সুলতান। আমারও তাই মনে হয়। তুমি একবার সাকর মল্লিককে ডেকে নিয়ে এসো; তা'কে একবার বুঝিয়ে দেখি। আর দবীর খাসকে ধ'রে আন্‌তে লোক পাঠাও।

কেশব খাঁ, সনাতনের অট্টালিকায় গিয়া দেখিলেন, তিনি ভাগবত-শ্রবণে নিমগ্ন। ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীনাথ আচার্য্য (১)। শ্রোতাও অনেক; তন্মধ্যে উদ্ধারণ দত্ত (২) ও রামদাস বিশ্বাসও (৩) ছিলেন। পঠিত হইতেছিল, দশম

---

(১) কুলীনগ্রামের শিবানন্দ সেনের গুরু।

(২) সপ্তগ্রামে জন্ম; ধনী ও ভক্ত। শাবারির মিথ্যাপবাদ মোচনের জন্য সরস্বতী-নদীর গর্ভ হইতে ভগবতী শঙ্খপরিহিত দুইখানি হস্ত তুলিয়া উদ্ধারণকে দেখাইয়াছিলেন।

(৩) হোসেন সার কর্মচারী; পরম পণ্ডিত, কিন্তু গর্ব্বিত।

স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়। অঘাসুর, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার মনে কেমন একটা সংশয় জন্মিল; ভাবিলেন, এই অদ্ভুতকর্ম্মা বালকটি কে? ইনি কি সত্যই ভগবান্? আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাক্। ব্রহ্মার মোহ তখনও বর্ত্তমান, তাই তিনি ত্রিভুবননাথকে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। বৎস ও বৎসপালদিগকে হরণ পূর্ব্বক মায়ায় অভিভূত করিয়া ব্রহ্মা এক পর্ব্বতগুহামধ্যে তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বৎস প্রভৃতিকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইলেন; ক্ষণমধ্যে অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানিতে পারিলেন, এ চৌর্য্যকার্য্য ব্রহ্মার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। তখন বিশ্ব-আত্মা শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা একদল নূতন গোপাল ও বৎস সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহাদের লইয়া গৃহে ফিরিলেন। গোপালদিগের জননীরাও বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহাদের প্রকৃত সন্তানের পরিবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণ-মায়া-সৃষ্ট সন্তান তাঁহাদের অঙ্কে বসিয়াছে। এইরূপে মায়া-রচিত বৎস ও গোপালদিগকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ এক বৎসর লীলা করিলেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ অনুচরবর্গ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে পদ্মযোনি ভাবিলেন,—গোকুলে যত বালক ও গোবৎস ছিল, সকলই আমার মায়া-শয্যায় শায়িত রহিয়াছে—এখনও উত্থান করে নাই; তবে এখানে এই সকল গোপাল ও গোবৎস কোথা হইতে আসিল?

পাঠক এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় কেশব ছত্রি তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব কহিলেন, "উজীর সাহেব, সুলতান আপনাকে সেলাম দিয়াছেন।"

সনাতন। তাঁহাকে বলিবেন, এক্ষণে আমার অবসর নাই।

কেশব। এই কথাই কি তাঁহাকে বলিব?

সনাতন। আপনার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন।

কেশব। আমি বলিব, আপনি অসুস্থ, তাই আসিতে পারিলেন না।

সনাতন আর তাঁহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য মহাশয়, পাঠ বন্ধ করিবেন না।"

শ্রীনাথ আচার্য্য পরিত্যক্ত সূত্র গ্রহণানান্তর বলিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মা মনে মনে নানাবিধ তর্ক-বিতর্ক করিয়া কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, কোন্‌গুলি প্রকৃত আর কোন্‌গুলি মিথ্যা। আজ এইরূপে মোহশূন্য বিশ্বমোহনকে মোহিত করিতে গিয়া নিজেই মোহিত হইলেন। মোহগ্রস্ত ব্রহ্মা তখন দর্শন করিতেছিলেন, বৎস ও বৎসপাল সকলেই মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সকলেরই পরিধানে পীত পট্টবস্ত্র, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই হস্তে শঙ্খচক্র-গদাপদ্ম। সেই সব মূর্ত্তির তেজে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইল।

এবার রাজবৈদ্য মুকুন্দ দাস আসিয়া বাধা দিলেন। তিনি ভক্ত ও পদকর্ত্তা নরহরি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠাগ্রজ ভ্রাতা। শুধু তাই নয়, তিনি প্রভুর মহাভক্ত রঘুনন্দনের পিতা এবং সুলতানের প্রিয় চিকিৎসক। তিনি এক্ষণে সুলতান কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উজীর সাহেবের কল্পিত রোগের চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার ব্যাধি কি সনাতন ঠাকুর?"

সনাতন। তুমি বৈদ্য, রোগ-নির্ণয় তুমিই করিবে।

বৈদ্য। মানসিক ব্যাধি আমরা নির্ণয় করিতে পারি না।

সনা। আমার কোন্ জাতীয় ব্যাধি?

বৈদ্য। মানসিক।

সনা। তা'র প্রতীকার করতে পার কি?

বৈদ্য। না—আমি পারি না।

সনা। উত্তম; তবে এসেছ কেন?

বৈদ্য। সুলতান পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি।

সনা। আচ্ছা, এখন তবে যাও।

মুকুন্দের ইচ্ছা হইল, সনাতনকে একটু পরীক্ষা করেন। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া বলিলেন, "তবে আমি সুলতানকে বলি গে যে, আপনি রোগ-শূন্য, কিন্তু রোগের ভাণ ক'রে গৃহে ব'সে রয়েছেন।"

সনাতন গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ভাণ! ভাণ দেখ্‌ছ মুকুন্দদাস? প্রহরি! না, তুমি যাও মুকুন্দ; আমার সাম্‌নে আর এসো না। (স্বগত) আজও প্রবৃত্তির এত তেজ! এ আত্মাভিমান না গেলে ত প্রভুর কৃপালাভ হবে না। আমিই তাই প'ড়ে রইলাম, রূপ ও অনুপ চ'লে গেল।"

মুকুন্দদাস হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আপনি এখনও ব্যাধিমুক্ত হ'তে পারেন নি, উজীর সাহেব!" গুপ্ত ক্ষতে যেন কে আঘাত করিল। সনাতন আচার্য্যকে কহিলেন, "আজ পাঠে বড় ব্যাঘাত ঘটিতেছে—পাঠ বন্ধ করিলে ভাল হয়।"

"ব্রহ্মার মোহনাশটা সংক্ষেপে সারিয়া লই" বলিয়া আচার্য্য আরম্ভ করিলেন,—সেই তেজের সম্মুখে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় যখন স্তব্ধ হইল, তখন সেই বাণীর অধীশ্বর, স্বপ্রকাশ, জন্মরহিত পদ্মযোনি "এ

কি!" বলিয়া স্তম্ভিত হইলেন। জ্ঞানময় ব্রহ্মা জ্ঞানরহিত হইলেন—দর্শন করিবার শক্তিও তাঁহার বিলুপ্ত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া মায়া-যবনিকা উঠাইয়া লইলেন। ব্রহ্মা বাহ্যদৃষ্টি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মৃত ব্যক্তি সহসা জীবন লাভ করিয়া যেমন ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে থাকে, তিনিও সেইরূপ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতিকষ্টে চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক আপনার ও জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিলেন; তখন বৃন্দাবন, পরে কৃষ্ণ তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। মায়ামুক্ত ব্রহ্মা তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মস্তক-চতুষ্টয় শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুণ্ঠিত করিলেন।

আচার্য্য নীরব হইলে উদ্ধারণ ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ব্রহ্মাই যখন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারেন নাই, তখন দুর্ব্বল মায়ান্ধ জীব কিরূপে তাঁহাকে চিনিবে? তিনি আমাদের আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারি না—বিশ্বাস করিতে পারি না যে, তিনি আমাদেরই মত হাত-পা লইয়া আমাদের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।"

এমন সময় একজন বলিয়া উঠিলেন, "অনেকগুলি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যাচ্ছে।"

সনাতন। এবার সুলতান স্বয়ং আসছেন।

আচার্য্য। তবে আমরা বিদায় হই।

সনাতন। আসুন তবে; এ জীবনে আমাদের বোধ হয় এই শেষ সাক্ষাৎ।

আচার্য্য। জীবন আর কতটুকু!

সকলে প্রস্থান করিলেন। স্বল্পকাল পরে সুলতান আসিয়া দর্শন দিলেন। সনাতন অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন সুলতান একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "ব্যাপার কি মল্লিক? তুমি আর দরবারে যাও না, ডেকে পাঠালেও এসো না, তুমি কি পীড়িত?"

সনা। না সুলতান, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

সুল। তবে কাজকর্ম্ম দেখ না কেন?

সনা। কাজে আর মন নাই।

সুল। কেন?

সনা। এতদিন আপনার কাজ করেছি, আর কোন দিকে চাইনি; এখন আমার নিজের কাজ করব, আর কোন দিকে চাইব না।

সুল। তোমার নিজের কাজ, সে কি রকম?

সনা। পরকালের কাজ।

সুল। তোমার এক ভাই দস্যুর ন্যায় ব্যবহার ক'রে আমার চাবুলা ছারখার দিলে, এক ভাই আমার নখরি ছেড়ে দরবেশ হ'ল, আর তুমিও আমার কাজ-কর্ম্ম দেখ না; রাজ্য চল্‌বে কেমন ক'রে?

সনা। আমাদের ন্যায় কত প্রজা আপনার সেবা করতে লালায়িত। এক কুক্কুর যাবে, অন্য কুক্কুর আসবে—সুলতানের পদলেহন করতে কুক্কুরের অভাব হবে না।

সুল। ছি মল্লিক, ও কথা বলো না। তোমার সঙ্গে এতকাল আমি বন্ধুর ন্যায়ই ব্যবহার ক'রে এসেছি; রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান, অতুল পদগৌরব, বিপুল ভূ-সম্পত্তি সকলই তোমায় দিয়েছি। আর কি চাই সাকর মল্লিক? বল কি চাই? তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই।

সনা। এ অধমের প্রতি সুলতানের যদি এতই কৃপা হয়ে থাকে, তবে আমাকে মুক্তি দিন—এ সম্মান, এ পদ-গৌরব হ'তে আমাকে অব্যাহতি দিন। সম্মান, গৌরব, অর্থ, এ সব আমি কিছুই চাই না,—আমি ফকীর হ'তে চাই; দয়া ক'রে আমার সব কেড়ে নিয়ে আমায় কাঙ্গাল করুন বঙ্গেশ্বর!

সুল। তুমি দরবেশ হ'তে চাও?

সনা। আমি কাঙ্গাল হ'তে চাই; যে সব হ'তে গর্ব্ব অভিমান আসে, সে সব হ'তে আমি মুক্ত হ'তে চাই।

সুল। তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। আমি উড়িষ্যা অভিযানে চলেছি, তুমি আমার সঙ্গে চল।

সনা। আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান।

সুল। কি, যাবে না? আমার আদেশ পালন করবে না? তুমি মৃত্যুর ভয় কর না?

সনাতন একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমায় মারিবার কাহারও শক্তি নেই সুলতান! প্রভু বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে; সেই সাক্ষাতের পূর্ব্বে তোমার সাধ্য নেই সুলতান, তুমি আমাকে সংহার কর।"

সুল। তোমার প্রভু বুঝি সেই ফকীর?

সনা। আমার প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

সুলতান অধোবদনে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন; পরে একবার শেষ চেষ্টা করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে ফিরে পাবার কি কোন উপায় নেই সাকর মল্লিক?"

সনা। পৃথিবীর রাজ্যও যে আমার কাছে এক্ষণে তুচ্ছ সুলতান!

সুল। আমি তোমার জন্যে কি না করেছি

উজীর সাহেব। আমার স্বজাতিদের ঠেলে তোমায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছি; আমি বেগমের কথা শুনি নি, কিন্তু তোমার কথা শুনেছি। তুমি যাকে যে পদ দিয়েছ, সে সেই পদ পেয়েছে; যা'কে রেখেছ, সেই থেকেছে; যা'কে মেরেছ, সেই মরেছে। আমি তোমার জন্যে কি না করেছি উজীর সাহেব!

সনা। আমিও তোমার জন্যে কি না করেছি সুলতান। আমি হিন্দু হয়ে হিন্দুর মন্দির ভেঙ্গেছি, দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করেছি, গো-হত্যা ব্রহ্ম হত্যা করেছি, ব্রাহ্মণের ইজ্জত মেরেছি, হিন্দুকে জোর ক'রে মুসলমান করেছি; আমার ইহকাল পরকাল সব তোমার জন্যে নষ্ট করেছি।

বলিতে বলিতে সনাতনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সুলতান বলিলেন, "তুমি আমার জন্যে কর নি—"

সনাতন বাধা দিয়া একটু তেজের সহিত বলিলেন, "তোমার জন্যে করি নি অকৃতজ্ঞ সুলতান? আমি যা' করেছি, তা' তোমার কোন্ হিন্দু নফর করেছে? বাঙ্গালায় এমন একটা হিন্দু পাবে না, যে আমার ন্যায় আত্মবিক্রয় ক'রে তোমার সেবা করে। শুধু বাঙ্গালায় কেন, সমস্ত ভারতে এমন একটা নির্ব্বোধ পাবে না, যে সব ঘুচিয়ে, সব দিয়ে মনিবের সেবা করে। বল্‌তে বাধ্‌ল না সুলতান, আমি তোমার জন্যে মহাপাপ করি নি? নিজের ঘরে নিজে আগুন জ্বালাইনি?

সুল। দেখ্‌ছি তুমি বড় বাড়িয়ে তুলেছ; আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি আমার সঙ্গে উড়িষ্যায় যেতে সম্মত আছ কি না।

সনা। কিছুতেই না।

সুল। তোমার এ অবাধ্যতার দণ্ড কি জান?

সনা। মৃত্যু? দণ্ড দাও সুলতান—এ স্বদেশ-দ্রোহী, এ ধর্ম্মদ্রোহীকে মৃত্যু দাও সুলতান! আর পারি না—অনুতাপের ভারে জীবন অবসন্ন হয়ে পড়েছে—আমায় শাস্তি দাও, মৃত্যু দাও, কিন্তু—

সুল। কিন্তু কি?

সনা। কিন্তু মৃত্যু দেবার তোমার শক্তি নেই, অধিকার নেই; তোমার হাজার হাজার জল্লাদ, এমন কি, যমরাজ স্বয়ং এসেও আমায় এখন মারতে পারবেন না।

সুল। দেখাব শক্তি আছে কি না, আগে উড়িষ্যা হ'তে ফিরি। আপাততঃ তুমি বন্দী হ'লে।

কারাধ্যক্ষ হবু সেখ আহূত হইয়া আজ্ঞাপেক্ষায় দাঁড়াইল। সুলতান বলিলেন, "এই নিমখ্‌হারামকে কড়া পাহারায় রেখো।"

রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

রূপ প্রেমভাগে

এ দিকে রূপ ও অনুপ প্রেমভাগে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের জমীদারীতে বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে। মাতা-পিতা পূর্ব্বেই দেহ রাখিয়াছিলেন; আত্মীয়-স্বজনও তথায় কেহ নাই। তাঁহাদের খুল্লপিতামহদ্বয় নারায়ণ ও মুরারির বংশধরেরা কাটোয়ার নিকট নৈহাটী গ্রামে বাস করিতেছিলেন। মুরারির কয়েকটি পৌত্র ছিলেন; তন্মধ্যে বিষ্ণু সাতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন। পিতার মৃত্যুর পর রূপ, বিষ্ণুকে নৈহাটী হইতে আনাইয়া বিস্তৃত জমীদারী পাবদর্শনার্থে প্রেমভাগে বসাইয়াছিলেন। এক্ষণে মানস করিলেন, বিষ্ণুকে জীবের অভিভাবক করিবেন।

কিন্তু বিষ্ণু বড় অত্যাচারী ও চরিত্রহীন। তাঁহার অত্যাচারে সমুদয় চাকলা কম্পিত। কাহারও কিছু বলিবার যো নাই। সুলতানের দরবারে কেহ কোন অভিযোগ আনয়ন করিলে তিনিই সুলতান-কর্ত্তৃক অপদস্থ হইতেন। উজীর সাহেবের আশ্রিত ভ্রাতা বিষ্ণুকে কেহ দমন করিতে পারে নাই। অপ্রতিহততেজে অত্যাচার চলিতে লাগিল। যেখানে অত্যাচার, সেখানে বিশৃঙ্খলা। ন্যুতিত বা হৃতসর্ব্বস্ব প্রজারা খাজনা দিতে অসমর্থ; যাহারা সমর্থ, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক খাজনা দেয় নাই। প্রজারা একপ্রাণ হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক দিয়া দাঁড়াইল। অত্যাচার-নিক্ষিপ্ত ক্ষীণ শর পাষাণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইল। যে ফল রাজদরবারে নালিশ করিয়া প্রজারা পায় নাই, সে ফল সহজলব্ধ হইল।

এমন সময় রূপ আসিয়া পঁহুছিলেন। যে পাষাণ অস্ত্রে ভাঙ্গে নাই, সে পাষাণ রূপের সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। অশ্রুতে অশ্রু মিশিল। বিষ্ণু তিরস্কৃত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া রূপ ভুলিলেন; তাঁহাকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

রূপকে বৃন্দাবনে বিদায় দিয়া বিষ্ণু আবার পূর্ব্ব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, বিষ্ণু এক ব্রাহ্মণের জমীজমা প্রভৃতি আত্মসাৎ করেন; সেই ব্রাহ্মণ পদব্রজে বৃন্দাবনে রূপের নিকট গিয়া নালিশ করেন। রূপ একটি শ্লোক রচনা করিয়া

প্রস্তরের উপর অঙ্কিত করেন এবং সেই প্রস্তরফলক উক্ত ব্রাহ্মণের দ্বারায় বিষ্ণুর নিকট প্রেরণ করেন।

শ্লোকটি এই :—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

বিষ্ণু শ্লোক পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার জমীজমা ছাড়িয়া দেন এবং প্রেমভাগ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তঃপাতী চন্দ্রদ্বীপে গমন করেন।

কিন্তু সে সব পরের কথা। রূপ গৃহে আসিয়া লুণ্ঠিত প্রজাদের প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন; কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিলেন; পুষ্করিণী খননের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রজাদের হস্তে অর্থ প্রদান করিলেন; দুঃস্থ ব্রাহ্মণদের জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিলেন; নবদ্বীপে ব্রাহ্মণসমাজের হিতার্থে বহু স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। এইরূপে সঞ্চিত অর্থের ভূরিভাগ ব্যয় করিয়া রূপ ও অনুপ বৃন্দাবন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বিষ্ণু একদা অপরাহ্ণে নির্জ্জনে রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা সন্তোষ—"

রূপ। আমার নাম রূপ।

বিষ্ণু। ভাল, তাই হ'ল; আচ্ছা রূপ, বল্‌তে পার, সহসা তোমার এ বৈরাগ্য হ'ল কেন?

রূপ। বৈরাগ্য সহসা হয় নি, তবে দাসত্বে ধিক্কারটা সহসা জন্মেছিল বটে।

বিষ্ণু। সে কি রকম?

রূপ। একদিন রাত্রিতে খুব জলঝড়; সুলতান এমন সময় আমাকে ডেকে পাঠালেন, কি করি, ঘোড়ায় উঠ্‌লুম; ঘোড়া সেই দুর্য্যোগে যেতে চায় না, মেরে ধ'রে নিয়ে চললুম। ঝড়ের বেগে সহসা এক গাছ ভেঙ্গে পড়্‌ল। ঘোড়া চম্‌কে উঠে আমাকে ফেলে দিয়ে পালাল; আমি হেঁটে চললুম। পথে জল দাঁড়িয়েছিল, জল ভেঙ্গে যাওয়ায় ছপ্‌ ছপ শব্দ হচ্ছিল। এক দরিদ্রের কুটীরের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় সেই গৃহের লক্ষ্মী তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ দুর্য্যোগে অন্ধকারে কে বার হয়েছে? চোর-টোর নয় ত?' স্বামী উত্তর করলেন, 'চোর দুর্য্যোগে বেরুবে না, তবে কুকুর হ'তে পারে।' লক্ষ্মী তদুত্তরে বললেন, 'কুকুরও এমন সময় বেরুবে না; আমার মনে হয়, কোন বড় লোকের চাকর হবে।' এই বাক্যালাপ শুন্‌বার পর হ'তেই দাসত্বে আমার ধিক্কার জন্মাল।

বিষ্ণু। ধিক্কার জন্মাবারই কথা; ওই দুঃখেই ত আমি গোলামী করতে যাই নি; নইলে আমিও তোমাদের মত একটা কিছু হ'তে পারতুম।

এমন সময় অনুপ আসিয়া দাদার সম্মুখে দাঁড়াইলেন; তাঁহার চক্ষু অশ্রুময়। রূপ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ভাই?"

অনুপ। দাদা, আমি পারলুম না।

রূপ। কি পারলে না ভাই?

অনু। রঘুনাথকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের উপাসনা করিতে; আমি যতই কৃষ্ণকে ডাকিতে যাই, ততই রঘুনাথ আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরেন। আমি মুখে কৃষ্ণকে ডাকি, কিন্তু হৃদয় জুড়িয়া দাঁড়ান রঘুনাথ। দাদা, আমি কিছুতেই রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না—তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলে, তিনি আমাকে ছাড়েন না।*

রূপ। যিনি রঘুনাথ, তিনিই কৃষ্ণ; রঘুনাথেরই উপাসনা কর ভাই, কোনও দুঃখ নেই।

অনুপ তখন চক্ষু মুছিয়া সুস্থ হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন, "দূরে একটা লোক দেখছি, আমাদের লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছে।"

রূপ। এ ব্যক্তিকে আমি চিনি ব'লে মনে হচ্ছে। এবার চিনেছি, এ আমার দাদার প্রিয় ভৃত্য অধর।

ক্ষণমধ্যে অধর আসিয়া চরণ-বন্দনা করিল। রূপ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ অধর!"

অধর। বড় রাজা কয়েদখানায় আবদ্ধ।

রূপ। সে কি! কোন্‌ অপরাধে?

অধর। সুলতান উড়িষ্যায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, প্রভু সম্মত হ'ন নি; আরও কত কি।

রূপ। এতটা হবে, তা' ভাবি নি; ভেবেছিলাম, তাঁরই প্রাসাদে হয় ত নজরবন্দী থাক্‌বেন। যাই হো'ক, এখন তাঁকে মুক্ত কর্‌তে হবে। সে ভার তোমারই উপর দিচ্ছি অধর।

অধর। আজ্ঞা করুন।

রূপ। গৌড়ের বাজারে তুমি এক মুদিখানা দোকান খোল গে—আমি রূপেয়া† দিচ্ছি। দশ হাজার মুদ্রা গচ্ছিত রাখ; এই অর্থ কারাধ্যক্ষ হবু সেখকে দিয়ে দাদাকে মুক্ত করবে। আর আমি

* রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায়,
ছাড়িবার মন হইলে প্রাণ ফাটি যায়।

† হিন্দু আমলে ছিল, রূপক; মুসলমান আমলে হ'ল রূপেয়া। আর তঙ্কা হ'ল টাকা।

একখানা চিঠি লিখে দেব, সেটা দাদাকে গোপনে দিও ; পারবে ত ?

অধর। এ ত অতি সামান্য ভার দিলেন ; কয়েদখানা ভেঙ্গে বড় রাজাকে আনতে বললে তা'ও পারতুম।

রূপ। আমি জানি, তুমি চতুর ও প্রভুভক্ত—তোমা হ'তে কার্য্যোদ্ধার হবে ; কিন্তু সুলতান উড়িষ্যায় চ'লে না গেলে কারাগারের নিকটেও যেও না। তিনি কবে যাবেন বুঝলে ?

অধর। কতক সৈন্য আগে গেছে, কতক প্রস্তুত হচ্ছে ; বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যেই যাবেন।

রূপ। বেশ ; আমি তোমাকে অর্থ ও পত্র দিই গে চল, রজনী-প্রভাতে আমরা বৃন্দাবন যাত্রা করব।

অধর। যাত্রাটা আজ হ'লেই ভাল হ'ত।

রূপ। কেন ?

অধর। আপনাকে ধ'রে নিয়ে যেতে সুলতান হুকুম করেছেন ; এতদিনে হয় ত লোক ছুটেছে, কবে এসে পড়ে, তা'র ঠিকানা নেই।

বিষ্ণু এতক্ষণ নীরব ছিলেন ; এক্ষণে সৈন্যাদির আগমন-সংবাদ শ্রবণে তাঁহার বাক্‌শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "ওরে বাপ রে! আমাদের রাজ্যে এসে আমাদের রাজাকে ধ'রে নিয়ে যাবেন। বিষ্ণু শর্ম্মা থাকতে সে কাজ হচ্ছে না। আমরাও একদিন কর্ণাটে রাজত্ব করেছিলাম। আসুক দেখি, কে আসবে ?"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে দূরে অশ্বপদ-শব্দ শ্রুত হইল। বিষ্ণু তখন রূপ ও অনুপকে টেনে নিয়ে গিয়ে অন্দরমহলের একটা ঘরে বন্ধ করলেন। অন্দরমহলের দ্বারে পাহারা বসিল। বিষ্ণু তখন বাহিরে আসিয়া রাজসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহারা সত্বর আসিয়া পড়িল ; অল্প লোকই আসিয়াছিল, সুলতানের আদেশই যথেষ্ট। বিষ্ণু মনে মনে বলিলেন, "আরে ছ্যা, মোটে এগার জন! এদের সঙ্গে আর লড়াই করব কি, গলা টিপে ধরলেই হ'ল। না, একটা মজা করা যাক্—বিনা রক্তপাতেই কার্য্যোদ্ধার। কিন্তু রক্ত না দেখলে বিষ্ণু শর্ম্মার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না, আমি বৈষ্ণব, থুড়ি, শাক্ত কি না। যাই হো'ক—(প্রকাশ্যে)—আসুন আসুন, খাঁ সাহেব, আমাদের বহু সৌভাগ্য যে, আপনার পায়ের ধুলা এই গরীব-খানায় পড়েছে।"

দলপতি খাঁ সাহেব অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অতি গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইটে কি মন্ত্রী দবীর খাসের বাড়ী ?"

বিষ্ণু। এই বাড়ী তাঁর ছিল বটে, এখন আমার। তিনি বাড়ীঘর সব আমায় বিক্রী ক'রে, নদীর ও-পারে ঐ যে খোড়োঘর দেখ্‌ছেন, ঐখানে চ'লে গেছেন ; আর হরদম্ নেমাজ পড়ছেন। অনুপও সঙ্গে গেছে। আচ্ছা খাঁ সাহেব, মানুষের মাথা খারাপ না হ'লে এমন কাজ করে ?

দলপতি। তোবা তোবা। এত্‌না বড়া আমীর থা, আভি বাউরা বন্ গিয়া।

বিষ্ণু। আপনি সমঝদার আছেন ; আপনি একটা আমীর-টামির হবেন—আসুন, গরীবখানায় বসুন।

দলপতি আপনার কথা শুনে আমি বড় খুসী হ'লুম। আমার বাপ আমীর ছিলেন, আমিও আমীর জলদি বন্ যাব। আপনি লোক চিনেন দেখছি—বাঃ বাঃ!

বিষ্ণু। বসুন বসুন, গরীবখানায় বসুন।

দলপতি। আগে ও-পার হ'তে ঘুরে এলে ভাল হ'ত না ?

বিষ্ণু। ও-পারে বস্‌বেন কোথায় ? আর খানা দানা পাকাবে কে ? এ দিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। একটু বিশ্রাম করুন, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

খাঁ সাহেব বসিলেন। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া আরাম করিয়া বসিলেন। বিষ্ণু পেয় ও ভোজ্য সরবরাহ করিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন—এ দিক ও-দিক অবিরাম ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। খাঁ সাহেব বড়ই আপ্যায়িত হইয়া পড়িলেন। যখন সকলে একটু সুস্থ হইয়াছেন, আর সন্ধ্যা, নদীবক্ষে ছায়াপাত করিয়াছে, তখন বিষ্ণু, খাঁ সাহেবকে বাহিরে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "ঐ যে দুটো লোক ও-পারে সেই খড়ের ঘরের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই—ওই হচ্ছে আপনাদের খাস আর ঘাস—ওর নাম কি, দবীর খাস আর টেঁকশালের ঘাস। দু'টো লোকই বদ্‌মায়েস, এখান হ'তে গেলে বাঁচি।"

খাঁ সাহেব একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ও-পার হ'তে আমি একটু ঘুরে আসি ; কি জানি যদি রাতা-রাতি স'রে পড়ে। আপনি একখানা নৌকা দিতে পারেন ?"

বিষ্ণু। নৌকা ? আমার বাড়ী-ঘর সব আপনার, নৌকা ত কোন্ ছার। আমাকে আপনার তাঁবেদার ব'লে জানবেন।

তখন বিষ্ণুর আদেশে একখানি ভাল নৌকা

আসিয়া ঘাটে লাগিল। খাঁ সাহেব সদলে নৌকায় উঠিলেন; অশ্বগুলি অবশ্য পড়িয়া রহিল। নৌকা যখন মধ্যপথে, তখন সহসা নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। জল-ঝড় নাই, নৌকা একটু কাৎ হ'ল না, একেবারে নোঙ্গরের মত সোজা নাবিয়া পড়িল। খাঁ সাহেব ও তাঁহার অনুচরেরা জুগপটি পোষাক, পাগড়ী নিয়ে বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ একটু আধটু সাঁতার জানিতেন; যাঁহারা জানিতেন না, তাঁহারা নৌকার সঙ্গে একেবারে নোঙ্গর। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণুর বড়ই আনন্দ; তিনি তীরে দাঁড়াইয়া উচ্চহাস্য করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে লম্ফদান করিতেছেন। তিন ব্যক্তি প্রাণপণ শক্তিতে তীরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; দুই জন অসমর্থ হইলেন—তীরের নিকটেই ডুবিয়া গেলেন। তৃতীয় ব্যক্তি—দলপতি খাঁ সাহেব—কোমর-জলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণু তখন অতি মোলায়েম কণ্ঠে বলিলেন, "আসুন খাঁ সাহেব, আপনার অভ্যর্থনার্থে আমি বাঁশী হাতে দাঁড়িয়ে আছি।" বাঁশী হ'ল মাছ মারবার সড়কী। বিষ্ণু অব্যর্থ সন্ধানে খাঁ সাহেবের বিশাল বক্ষ সড়্‌কি দ্বারা ভেদ করিলেন। দেহ ভাসিয়া চলিল; কিন্তু বিষ্ণু কাহাকেও ভাসিতে দিলেন না। দেহগুলি জল হইতে তুলিয়া আগুন ধরাইয়া দিলেন।

আগুন দেখিয়া রূপ বাহিরে আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি করছ বিষ্ণু-দা?"

বিষ্ণু। ভাই, ধুনো দিচ্ছি।

রূপ। এতগুলা লোক মারতে তোমার প্রাণে একটু ব্যথা লাগল না? ছি।

বিষ্ণু। আমি কি মেরেছি? খোদা মেরেছে, দেখলে না, নৌকার তলা হঠাৎ ফুটো হয়ে গেল, আর একেবারেই নোঙ্গর—

রূপ। তুমিই ফুটো ক'রে রেখেছিলে।

বিষ্ণু। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি আমি কে ভাই? মালিক তিনি, আমি তাঁর হুকুমে চলি। একটু আধটু গীতা পড়ো, তবে ত ধর্ম্ম হবে; কৌপীন আঁটলেই ধর্ম্ম হয় না।

রূপ। তোমার এই কাজের পরিণাম কি হবে জান?

বিষ্ণু। বেশ জানি; এই সব দাড়ি বাবাজিরা জাহান্নমে যাবেন, আর আমি বেহেস্ত পাব।

রূপ। পরিহাস রাখ।

বিষ্ণু। রাখলুম তোমার উড়িষ্যার সমুদ্রে, যেখানে তোমার সুলতান ডুবতে যাচ্ছেন। সেখানে প্রতাপরুদ্রের হাত থেকে যদি প্রাণে প্রাণে ফিরে আসেন, তা হ'লেও এমন পিটুনি খেয়ে আসবেন যে, প্রেমভাগের নাম আর তাঁর স্মরণে আসবে না। তুমি ত এখন স'রে পড় বৃন্দাবনে। সুলতান আসে, আমি বুঝে নেব। তুমি এখন নিশ্চিন্ত-মনে নেংটি পর গে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সনাতন কারাগারে

গৌড়-রাজ্যের ভূষণ কারাগারে। শ্রেষ্ঠস্থান স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া সনাতন নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। গৌড় স্তব্ধ, জগৎ স্তম্ভিত। এ ত্যাগ, এ বৈরাগ্য সংসার পূর্ব্বে আর দেখে নাই। দেখিয়াছিল একবার বহুপূর্ব্বে—যখন নবীন রাজপুত্র, রাজ্য স্ত্রী পুত্র পিতা সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা—ইতিহাস তখন প্রস্তর-ফলকে সবে জন্ম লইতেছে। এখন দেখিয়া বুঝিল, সে রাজপুত্রের উপাখ্যান সত্য।

নির্জ্জন কারাগারে সনাতন বেশ আছেন। কোন চিন্তা নাই হৃদয়ের মধ্যে—শুধু এক স্বর্ণোজ্জ্বল তেজোময় মূর্ত্তি সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া অবস্থান করিতেছেন। সনাতন সেই মূর্ত্তি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তন্ময়; কখন পূজা করিতেছেন, কখন বা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। উদ্বেগ নাই, চিন্তা নাই—শুধু আনন্দ। সনাতনের পূর্ণ বিশ্বাস, প্রভুর ইচ্ছায় আজ তিনি কারাগারে, আবার প্রভুর ইচ্ছা হইলে তিনি মুক্ত হইবেন।

সনাতন একদা নিশীথে আপন মনে প্রশ্ন করিতেছিলেন, "প্রভু এখন কোথায়? বৃন্দাবনে? না, বৃন্দাবন হ'তে আবার নীলাচলে ফিরেছেন? আমি

কতদিন এখানে এসেছি?" পার্শ্বে, কিছু দূরে ভৃত্য ঈশান শয়ান ছিল; সে উত্তর করিল, "আজ তিন মাস হ'বে।"

"কে, ঈশান?"

"আজ্ঞে, আপনার দাস।"

সনাতন কি ভাবিলেন; পরে বলিলেন, "ঈশান, তুমি এখানে কেন? তুমিও কি বন্দী?"

ঈশান। প্রভুর সেবা করতে এখানে রয়েছি।

সনা। আমার সেবা? আমি যে এখন ভিখারীরও অধম ঈশান।

ঈশা। প্রভু চিরদিনই প্রভু

সনা। তুমি আমায় শিক্ষা দিলে। মঙ্গলময় সকল অবস্থাতেই মঙ্গলময়।

ঈশা। আপনাকে শিক্ষা দেব? সে সব কথা যাক্; আমরা আজ তিন মাস এখানে ব'সে আছি, প্রভু হয় ত এত দিনে আবার নীলাচলে ফিরে গেলেন; তাঁকে কি আপনার দেখতে ইচ্ছা হয় না?

সনা। আমার প্রভুকে? আমার হৃদয়ের রাজাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় কি না, তাই জিজ্ঞেসা করছ? কি ক'রে তোমায় বোঝাব ঈশান, আমার হৃদয় কত ব্যাকুল হয়েছে! আমার প্রত্যেক রক্ত-বিন্দু যে তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটাছুটি করছে!

ঈশা। তবে আগে এই কারাগার হ'তে মুক্ত হবার উপায় করুন।

সনা। আমি কি উপায় করব? আমার শক্তি কতটুকু? প্রভু যথাসময়ে বুদ্ধি ও শক্তি দিবেন।

ঈশা। মেজরাজা বৃন্দাবনে প্রভুর কাছে চ'লে গেছেন; আর আপনার জন্য দশ হাজার মুদ্রা অধরের কাছে রেখে গেছেন, তা'ও আপনি জানেন।

সনা। জানি—কিন্তু—প্রভু, সময় হয়েছে কি? যদি সময় হয়ে থাকে, তবে বুদ্ধি দেও, শক্তি দেও।

এমন সময় কারাধ্যক্ষ হবু সেখ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জনাবের কোন হুকুম আছে কি?"

সনা। কি আর তোমায় হুকুম করব হবু? আমিই এখন তোমার হুকুমের দাস।

হবু। ও-কথা বলবেন না হুজুর, আমি আপনার খেয়ে মানুষ। আপনি দু'বার আমার জান বাঁচিয়েছেন, আমাকে এই নকরি দিয়েছেন; আমি নিমখ-হারাম নই জনাব! আমি জানি, আপনি যদি কাল সুলতানকে দু'টা মিঠা কথা বলেন, তা হ'লে তিনি মহাখুসী হ'য়ে আপনাকে আবার গদিতে বসান; আপনি ত ইচ্ছা ক'রে এখানে প'ড়ে আছেন।

সনা। সুলতান এখন কোথায়?

হবু। উড়িষ্যায় আজও লড়াই করছেন। আমাদের ফৌজ খুব হারছে, তবু সুলতান ছাড়ছেন না।

সনা। তিনি যখন এখানে নেই, তখন কা'কে আমি দু'টা মিষ্টি কথা বলব?

হবু। সে বাৎ ঠিক বলেছেন।

সনা। আচ্ছা হবু, তুমি কয়েদখানা হ'তে লুকিয়ে কাউকে কখন ছেড়ে দিয়েছ কি?

হবু। ঝুটা বলব না—দিয়েছি।

সনা। আমাকে ছেড়ে দিতে পার কি?

হবু। হুজুর হুকুম করলে পারি, হুজুরের দেওয়া নক্‌রি হুজুরের জন্যে না হয়ে ছেড়ে দেব।

সনা। ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবে?

হবু। দেশে। এখানে থাকলে জান্ যাবে।

সনা। সেখানে খাবে কি? তোমার ছোট ছোট ছেলেদের খাওয়াবে কি?

হবু। খোদা খাওয়াবেন।

সনা। খোদার উপর তোমার এতটা বিশ্বাস?

হবু। তাঁর দয়ার উপর আমার বিশ্বাস আছে। তাঁর রাজ্যে তাঁর উপর নির্ভর কর্‌লে কেউ উপবাসে মরে না।

সনা। যার এত বড় বিশ্বাস, তা'কে খোদা কখন কষ্ট দেবেন না। আমি তোমাকে দশ হাজার রূপেয়া দিচ্ছি, নিয়ে তুমি দেশে চ'লে যাও।

হবু। হুজুর, এত রূপেয়া আমি বরাবর নক্‌রি করলেও রোজগার হ'তে পারতুম না। হুজুরের নিকট হ'তে আমি অর্থ নেব না।

সনা। খোদা তোমায়, তোমার ছেলেদের জন্যে এই অর্থ আমার হাত দিয়ে দিচ্ছেন। খোদার দান ফিরিও না।

হবু আর উত্তর করিল না। ঈশান তৎপর হইয়া দশ হাজার মুদ্রা আনিয়া দিল। হবু গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু বড় অনিচ্ছাসত্ত্বে। যুক্তকরে কহিল, "জনাব আমার বাপ্-মা, চিরদিন খাওয়াচ্ছেন, ভবিষ্যতে খাওয়াবার ব্যবস্থা করলেন। আমি আমার বাপের কাছ হতে অর্থ নিলাম—খোদা আমায় মাফ্ করো। এখন জনাবের হুকুম কি?"

সনাতন কহিলেন, "আমাকে গঙ্গাপারে রেখে এসো।"

হবু তৎক্ষণাৎ সনাতনকে সঙ্গে লইয়া কারাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সঙ্গে ঈশানও চলিল।*

* যে কারাগৃহে সনাতন আবদ্ধ ছিলেন, সেই গৃহের ধ্বংসাবশেষ যাজপুরে (গৌড়ের শ্রীনিবাস) আজও দৃষ্ট হয়। ধ্বংসস্তূপের উপর এক অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়া জগৎকে শিক্ষা দিতেছে, আমি সেই মহান্ বৈরাগ্য দেখিয়াছি।

প্রভু ঠিক সেই সময়ে, সেই গভীর নিশিতে প্রয়াগ তীর্থে রূপকে বলিতেছিলেন, "সনাতন এক্ষণে কারামুক্ত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

সনাতন ও দস্যু

সনাতন গঙ্গার ধার দিয়া চলিতে লাগিলেন; তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই। ঈশান পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল; সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় যাবেন?"

সনা। কোথায় আবার। যাবার কি দু'টা জায়গা আছে ঈশান?

ঈশান। প্রভু কি এই দিকে আছেন?

সনা। আমার মন ও চরণ যে দিকে নিয়ে যাবে, সেই দিকেই জানব প্রভু আছেন।

ঈশা। আর যদি বিভিন্ন দিকে নিয়ে যায়?

সনা। তা' হ'তে পারে না, ঈশান।

উভয়ে অন্ধকারে চলিতে লাগিলেন ক্রমে রজনী প্রভাত হইল। সনাতনের অঙ্গে একখানি শীতবস্ত্র ছিল; পথের মাঝে একটি শীর্ণকায় বৃদ্ধ মুসলমান অর্দ্ধ-নগ্নাবস্থায় শীতে কাঁপিতেছিল। সনাতন নিজের গাত্র-বস্ত্রখানি অঙ্গ হইতে খুলিয়া বৃদ্ধের অঙ্গে জড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "আপনি দয়া ক'রে গ্রহণ করুন" বৃদ্ধ স্তব্ধ হইয়া সনাতনের পানে চাহিয়া রহিল; সনাতন আর তাহার দিকে না ফিরিয়া পথ অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন হইল; গ্রামপ্রান্তে বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে উভয়ে উপবেশন করিলেন—ঈশান ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আনিলেন—উভয়ের সেবা হইল। আবার পথ চলিতে লাগিলেন। পথ পার্ব্বত্য, কখন উঠিতে হইতেছে, কখন বা নামিতে হইতেছে। দিল্লী বা পাটনা হইতে বাঙ্গালা প্রবেশের তিনটা পথ ছিল। পথের পাশে দুর্গম-ক্রম্য পর্ব্বত। সনাতন পাহাড়পর্ব্বতের পথ ধরিলেন। ঈশান আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, "এ পথে দস্যু-ভয়, অন্যপথে চলুন।"

সনাতন। আমাদের কি আছে ঈশান যে আমরা দস্যুভয় করিব?

ঈশান। প্রাণটা ত আছে।

এখন ঈশান পনরখানি স্বর্ণমুদ্রা গোপনে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভয়, পাছে চোরে তাহা কাড়িয়া লয়। সনাতন একটু সন্দেহ করিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "প্রাণ কেহই লইতে পারে না ঈশান; কর্ত্তা এক জন, তিনিই কেবল লইতে পারেন।"

ঈশান কোনও উত্তর না করিয়া সনাতনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিতে লাগিল। যখন দিবাবসান হইয়া আসিল, তখন উভয়ে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি সহসা পর্ব্বতান্তরাল হইতে বাহির হইয়া তাহার পার্ব্বত্য কুটীরে আশ্রয় গ্রহণার্থে তাহাদের আহ্বান করিল লোকটা বীভৎস বা কুৎসিতদর্শন নয়; তথাপি তাহাকে দেখিলে মনে হয়, এ ব্যক্তি দস্যু।

যথার্থই তাহার উপজীবিকা দস্যুতা। পুরুষানুক্রমে এই পর্ব্বতে সে দস্যুতা করিয়া আসিতেছে। তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে ঈশান একটু ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু সনাতন ভ শঙ্কচিত্তে তাহার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; ঈশানের মন বড়ই উৎকণ্ঠিত রহিল। তিনি গোপনে সনাতনকে বলিলেন, "এই লোকটিকে দস্যু ব'লে আমার মনে হয়।"

সনা। তা' হ'তে পারে; কিন্তু এ ভয়, এ উৎকণ্ঠা নিয়ে কেন চলেছ ঈশান? সঙ্গে যা' আছে, তা' এই লোকটাকে দিয়ে দাও।

ঈশান। কিছু আছে বটে, কিন্তু সম্বলহীন হ'য়ে পথ চলা কি ভাল?

সনা। অর্থ সম্বল নয়, অর্থ বিপদ আর যদি প্রকৃত সম্বল চাও, তবে তাঁর উপর নির্ভর কর।

ঈশা। আমি চুপ্ ক'রে এক জায়গায় ব'সে থাক্‌লে কি আমার আহার জুট্‌বে?

সনা। জুটবে; তাঁর উপর ঠিক নির্ভর ক'রে থাকতে পার যদি, তিনি তোমার আহার নিজে ব'য়ে এনে দেবেন

ঈশা। তবে কি পুরুষকার ব'লে কোন জিনিস নেই?

সনা। আছে; তোমার এই যে নির্ভরতা, সেটা যে একটা মস্ত পুরুষকার, ঈশান।

ঈশান আর কিছু না বলিয়া দস্যুকে ডাকিলেন এবং তাহার হস্তে মোহর কয়খান গণিয়া দিলেন। দস্যু অতি গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "দিলে ভালই কর্‌লে, নইলে এর জন্যে তোমাদের খুন কর্‌তে হ'ত যাই হো'ক, যখন স্বেচ্ছায় দিচ্ছ, তখন আমি সব নেব না, তুমি একটা লও।"

ঈশা। না, আমি নেব না; আজ আমি আমার প্রভুর কাছে শিক্ষা পেয়েছি, অর্থই সর্ব্বনাশের মূল। আর আমি জীবনে অর্থ স্পর্শ করব না।

দস্যু। অর্থ সর্ব্বনাশের মূল, এ কথা বলে কে ?

ঈশা। এই আমার প্রভু, আমার গুরুদেব। এঁর কিছু ধন-সম্পত্তি ছিল, সব বিলিয়ে দিয়ে এখন দরবেশ হয়েছেন।

দস্যু। এ ত বড় নূতন কথা! অর্থ সর্ব্বনাশের মূল! বাঃ বাঃ, আরে বাবা, অর্থ নইলে যে একদিনও চলে না।

সনাতন মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন। তাঁহার নয়নে করুণা ও প্রেম। দস্যুর দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সনাতন প্রভুকে স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিলেন, "প্রভু, এ ব্যক্তি আমারই ন্যায় মহাপাপী; আমাকে বিষয় কূপ হ'তে উদ্ধার ক'রেছ, একেও উদ্ধার কর দয়াময়।" তা'র পর প্রকাশ্যে দস্যুকে কহিলেন, "অর্থ নইলে কেন দিন চল্বে না ভাই? আমার ত কিছু নেই, তবু ত দিন চলছে। আর এখন যে ভাবে সুখে চল্‌ছে, আগে ত সে ভাবে চলে নি।"

দস্যু। খিদে পেলে কর কি?

সনা। তাঁকে ডাকি; যিনি তোমাকে, আমাকে, রাজাকে, পাৎসাকে খাওয়াচ্ছেন, তাঁকে ডাকি; তিনি আহার যোগান।

দস্যু। কা'কে ডাক? সে কে?

সনা। যিনি তোমাকে, আমাকে, আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টি করেছেন; তাঁর নাম ভগবান্‌।

দস্যু। ভগবান্‌? এ নাম ত কখন শুনি নি। তিনি দেখ্‌তে কেমন? থাকেন কোথা?

সনা। তিনি বড় সুন্দর, এত সুন্দর জগতে আর কিছু নেই। তিনি থাকেন সকল স্থানে।

দস্যু। আমার আশে পাশে আছেন?

সনা। নিশ্চয় আছেন; ডাকলেই তিনি দেখা দেন।

দস্যু। আমি তাঁকে ডাকব? কি ব'লে ডাক্‌তে হয়?

সনা। ডাক, ডাক, তাঁকে কৃষ্ণ ব'লে ডাক। ঐ নীল মেঘের মত তাঁর গায়ের রং, ঐ নীল আকাশের মত তাঁর চোখের বর্ণ। মাথায় চূড়া, পায়ে নূপুর, হাতে বাঁশী, পায়ের উপর পা দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরিধানে পীতবস্ত্র, গলায় মালতীর মালা, অধরে মধুর হাসি, নয়নে করুণা। ডাক, ডাক, ভাই, এই রূপ হৃদয়ে ধ'রে তাঁকে কৃষ্ণ ব'লে ডাক—তিনি আসবেন; তোমার বুকের ভিতর আসবেন, তোমার চোখের উপর আসবেন, তিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবেন।

দস্যু। না, আমি ডাকব না।

সনা। কেন ডাকবে না ভাই?

দস্যু। আমি এত দিন তাঁকে ডাকি নি, আজ হঠাৎ ডাকলে তিনি যদি এসে আমায় বকেন, শাস্তি দেন।

সনা। তিনি ত কোন অপরাধই গ্রহণ করেন না; তিনি শাস্তি দিতে জানেন না, শুধু ভালবাসিতেই জানেন; তিনি আদর করেন, কান্না দেখলে চোখের জল মুছিয়ে দেন। তিনি যে দুনিয়াময় এই কাজই ক'রে বেড়াচ্ছেন।

দস্যু। ঠাকুর, তুমি থামো, আমার কিছু ভাল লাগছে না, বুকের ভিতর কেমন করছে। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি কি বলে তাঁর নাম?

সনা। কৃষ্ণ।

দস্যু। তুমি একবার ডাক দেখি, আমি শুনি।

সনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!

দস্যু। আচ্ছা, আমি একবার ডেকে দেখব? ভয় নেই ত?

সনা। সে নামে ভয়? ওরে সে নামে যে ভয় যায়।

দস্যু। না, ডাক্‌ব না, আমার বাপ্‌ পিতাম' 'যা' কখন করে নি' তা' কেন তোমার কথায় কর'তে যাব?

সনাতন আর কিছু না বলিয়া কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন; ক্ষণকাল পরে ঈশান শুনিল, দস্যুও সনাতনের সঙ্গে নাম করিতেছে; প্রথমে ধীরে, মৃদু স্বরে; ক্রমে স্বর চড়িতে লাগিল, অবশেষে সনাতনের কণ্ঠ ছাপাইয়া তাহার কণ্ঠ উঠিল। রাত্রি প্রহরের পর প্রহর বাহিত হইয়া চলিল। তিনটি হৃদয়যন্ত্র এক সুরে বাজিয়া চলিল। ব্যোম সুরময়, হৃদয় কৃষ্ণময়। সনাতন নামের সঙ্গে কি শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন, জানি না, কিন্তু কৃষ্ণনাম দস্যুর জিহ্বা সহসা ত্যাগ করিতে পারিল না। নামপ্রভাবে তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু অশ্রুময় হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। যখন সে আর সামলাইতে পারিল না, তখন সনাতনের চরণের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর, আমায় দয়া কর।"

সনাতন। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন; এখন আমি যাই, রাত্রি প্রভাত হয়ে এসেছে।

দস্যু। আমাকে দয়া ক'রে তোমার সঙ্গে লও প্রভু!

সনা। তোমার কাজ এইখানে, আমার সঙ্গে নয়।

দস্যু। আমার কি কাজ প্রভু?

সনা। যাদের নিয়েছ, এখন তাঁদের দাও। পথিক পেলে, সাদরে নিয়ে এসে সেবা কর; আর দিবারাত্র কৃষ্ণনাম কর।

সনাতন পথ ধরিলেন; দস্যু বিবশচিত্তে পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় অধ্যায়

সনাতন পথে

"কিন্তু ঈশান, তোমার আর আমার সঙ্গে যাওয়া হ'তে পারে না। তুমি এইখান হ'তে ফের।"

"কেন প্রভু, দাসের অপরাধ?"

"তুমি এখনও বিষয়-বাসনা ছাড়তে পার নি।"

"প্রভু আমায় ক্ষমা করুন।"

"দুঃখিত হইও না ঈশান, আজও তোমার বিষয়-বুদ্ধি যায় নাই। এক দিন যাবে, তখন শত শত শিষ্য তোমার পিছনে ফিরিবে। এখন যাও।"

সনাতন একাকী চলিতে লাগিলেন; রোরুদ্যমান ঈশান পড়িয়া রহিলেন। শীত দারুণ, দেহ অর্দ্ধ নগ্ন, পথও অজ্ঞাত। সনাতন নির্ভয়ে নিরুদ্বেগে পথ চলিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন সমাগত হইলে গ্রাম-প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, আহার্য্য অযাচিত ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসিয়া উপস্থিত হইত; পশু-পক্ষী যাহারা নিকটে থাকিত, তাহাদের খাওয়াইয়া নিজে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিতেন। এইরূপে দুই তিন দিন অতিবাহিত হইল।

একদা নিশা-সমাগমে গ্রামপ্রান্তে এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গ্রামের নাম হাজিপুর, পার্শ্বে শোণপুর। ভারত-বিশ্রুত হরিহরছত্রের মেলা এইখানে প্রতি বৎসর শীতের সময় বসিয়া থাকে।

হীরা মাণ্ক্য সোণা, হাতী ঘোড়া উট, গরু মহিষ বাঘ, লোহা পিতল কাঁসা, যা' কিছু মানুষের প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন, তা' এইখানে বেচাকেনা হয়। চোর, ডাকাত, বেশ্যা, নর্ত্তকী, সকলেই এখানে রোজগারের আশায় পদার্পণ করে। রাজারাজড়াদেরও কিছু কিনিবার প্রয়োজন হইলে এখানে আসিতে হয়। গৌড়ের সুলতান এই মেলা হইতেই প্রতিবৎসরে ঘোড়া কিনিয়া থাকেন; তিনি অবশ্য নিজে আসেন না, তাঁহার অশ্বশালার অধ্যক্ষ শ্রীকান্ত প্রতিবৎসর আসেন। এবারও আসিয়াছিলেন; আসিয়া গ্রামপ্রান্তে বাসা লইয়াছিলেন।

সহসা তিনি শুনিলেন, কে গাইতেছে:—

আমি তোমারি পথ ধ'রে চলেছি তোমায় খুঁজিতে,
তোমার জগত্তারণ চরণ দু'খানি পূজিতে।
(ওগো দয়াল আমার, কৃষ্ণ আমার, গৌর আমার)
আমার দেহ মন প্রাণ তোমারি চরণে সঁপিতে,
ওগো যা কিছু আমার আছে তোমারি চরণে অর্পিতে।
(ওগো প্রভু আমার, পিতা আমার, সম্বল আমার)

কণ্ঠ পরিচিত বলিয়া শ্রীকান্তের মনে হইল; কিন্তু কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। তার পর যখন শুনিলেন, গায়ক স্তব পাঠ করিতেছেন—

"হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো! দীননাথং, নিহিতমচলং, নিশ্চিতপদং,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥"

তখন আর তাঁহার সংশয় রহিল না। তিনি একটা আলো লইয়া কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে চলিলেন। দেখিলেন, এক বট-বৃক্ষমূলে গৌড়ের উজীর ধূলিশয্যায় অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় শয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার নয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা প্রবাহিত হইতেছিল, তৃষ্ণার্ত্ত বসুন্ধরা ভক্তের অশ্রুধারায় তৃপ্ত ও সিক্ত হইতেছিলেন। সনাতন মুদ্রিত-নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছিলেন, "প্রভু, তুমি আমার জগন্নাথ, আমার কৃষ্ণ, আমার স্বামী; দেখা দেও, দয়াসিন্ধো!"

শ্রীকান্ত ডাকিলেন, "উজীর সাহেব!"

সনাতনের যোগভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন; শ্রীকান্তকে চিনিলেন। ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "আমি আর উজীর নই, আমি সনাতন।"

শ্রীকান্ত। আচ্ছা সনাতন, তোমার এ বুদ্ধি হ'ল কেন?

সনা। এতদিন হয়নি কেন, তাই বলছ? কি করব ভাই, তিনি যখন যেমন বুদ্ধি দেন, তখন তেমনি করি।

শ্রী। গৌড়ের উজীর আজ ধূলিশয্যায়! উঠ, উঠ ভাই, চল আমার ঘরে চল।

স। তাঁর হুকুম না পেলে ত আমি যেতে পারি না।

শ্রী। তাঁর এখন দেখা পাবে কোথা?

স। দেখা পেতে হবে না, তিনি সকল সময় আমার বুকের ভিতর থেকে আমায় আদেশ করছেন।

শ্রী। প্রভু দয়াল হয়ে এমন আদেশ করতে পারেন না যে, তুমি গাছের তলায় মাটীতে প'ড়ে থেকে শীতে কষ্ট পাও।

স। তিনিও যে এমনি ক'রে, এর চেয়েও বেশী কষ্ট পেয়েছেন, শ্রীকান্ত দাদা!

শ্রী। তাঁর আবার কষ্ট কি? তিনি হ'লেন ঠাকুর-দেবতা।

স। ভগবান্‌কে পেতে হ'লে কি রকম দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা' তিনি নিজে আচরণ ক'রে জগৎকে দেখিয়েছেন।

শ্রী। তোমার সঙ্গে কথায় কোন কালে পারি নি, এখনও পারব না। ভাল, তোমার জন্যে না হয় এইখানেই শয্যা আনিয়ে দি?

স। ছি, শয্যাতেই যদি শোব, তবে এখানে কেন?

শ্রী। গায়ের একটা কাপড় এনে দি?

স। ক্ষমা কর।

শ্রী। আমার গায়ের শালখানা লও।

স। ছি ছি!

শ্রী। একটা কম্বল এনে দি?

সনাতন আপত্তি করিলেন না।

শ্রী। কিছু খাবার?

স। একখানা রুটী।

শ্রীকান্ত মনে মনে ভারি চটিয়াছেন; ভাবিতেছিলেন, তোমাকে এইখান হ'তে ফেরাব, তবে আমার নাম শ্রীকান্ত। গাছতলায় প'ড়ে না থাকলে সাধু হওয়া যায় না! এ আবার কি ঢং? তোমার ওষুধ দিচ্ছি।

শ্রীকান্ত বকিতে বকিতে প্রস্থান করিলেন; এবং মনে মনে এক পরামর্শ আঁটিয়া ব্যাঘ্র-বিক্রেতা প্রভৃতি কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আহার্য্য ও কম্বল পাঠাইয়া দিয়া অনুচরবর্গকে যথাযথ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এ দিকে সনাতন একখানি ভোটকম্বল পাইয়া তাহা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন; পরে অঙ্গে দিলেন। রুটীখানি প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিয়া পরে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। তার পর নিশ্চিন্তমনে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্।

সহসা সন্নিকটে অন্ধকারে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শ্রুত হইল; সনাতন প্রথমটা একটু চমকিয়া উঠিলেন, তার পর পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন। গর্জ্জনের উপর গর্জ্জন; সনাতন নির্ব্বিকার। গ্রামের ভিতর হইতে একটা গোল উঠিল, "ওরে বাঘ এসেছে—পালা পালা।"

সনাতন উঠিলেন না, নাম-গানও বন্ধ করিলেন না। বাঘ তখন দূরে সরিয়া গেল, ক্রমে তাহার গর্জ্জন আর শুনা গেল না। ক্ষণপরে একটু দূরে বামাকণ্ঠে চীৎকার উঠিল—"ওগো আমায় রক্ষা কর, আমায় খেয়ে ফেল্লে।"

সনাতন তখন কম্বল ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং চকিতে এক বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া শব্দানুসরণ করিয়া ছুটিলেন। একটু গিয়া দেখিলেন, মাঠের উপর ধূলায় পড়িয়া একটি স্ত্রীলোক ছট্‌ফট্ করিতেছে। সনাতন দেখিলেন, একটা কি যেন তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গেল; ভাবিলেন, হয় ত বা বাঘ। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

স্ত্রীলোকটি কাতরকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমায় বাঘে ধরেছিল, অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে।"

সনাতন হাটু গাড়িয়া তাহার পাশে বসিলেন; দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি সুন্দরী ও যুবতী। তদ্দর্শনে তিনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "আমি গাঁ হ'তে লোক ডেকে আনি।"

রমণী। আমায় বাঘের মুখে ফেলে পালিও না।

সনা। তাই ত। তা' হ'লে উপায় কি?

রম। তুমি আমায় নিয়ে চল।

সনা। হাঁটতে পারবে?

রম। না; তুমি আমায় কোন রকমে নিয়ে চল।

সনা। ক্ষমা কর মা, আমি সন্ন্যাসী; স্ত্রীলোক স্পর্শ আমায় করতে নেই।

এমন সময় এক জন চীৎকার করিয়া বলিল, "কোন্ বদমায়েস স্ত্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট করছে?"

বলিতে বলিতে তিনটি লোক স্থূল যষ্টিহস্তে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া সনাতনের সমীপবর্ত্তী হইল। সনাতন ধীরভাবে বলিলেন, "কেউ কা'রও ইজ্জত নষ্ট করে নি। স্ত্রীলোকটিকে বাঘে ধরেছিল, চীৎকার শুনে সাহায্যে এসেছি; এখন তোমরা একে ঘরে নিয়ে যাও—আমি চল্লুম।"

১ম আগন্তুক। যাবে কোথা দাঁড়াও। (রমণীর প্রতি) তোমার ইজ্জত নষ্ট করতে চেষ্টা করেছিল?

রমণী। (মৃদুকণ্ঠে) হাঁ।

সনা। সত্য কথা কি বলছ মা?

রমণী নিরুত্তর। দ্বিতীয় আগন্তুক রুষ্ট

আস্ফালন পূর্ব্বক কহিল, এই আওরৎ হামার বহিন—তুমি তাকে একা পেয়ে বেইজ্জত করেছ, হামি তোমাকে মারবে।"

সনাতন। (সহাস্যে) মারো।

স্ত্রীলোকটি উঠিয়া বসিল; এবং বিস্রস্ত বসন সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটিকে যে বাঘে ধরিয়াছিল, লক্ষণাদিতে এরূপ প্রকাশ পাইল না। ব্যাপারটা বুঝিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সনাতনের বাকি রহিল না। তিনি ধীরপদে তাঁহার আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন; প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তের জন্যে সনাতনের ইচ্ছা হইল, বৃক্ষশাখা উঠাইয়া লইয়া তিন জনকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা প্রদান করেন; দেহেও অসাধারণ শক্তি, তাহা শ্রীকান্ত প্রভৃতি অনেকেই অবগত ছিলেন। ইচ্ছাটা মনে উঠিবামাত্র তিনি তাহা দমন করিয়া স্বগত কহিলেন, "ছি ছি! এখনও ক্রোধ! আমাকে যে তৃণের চেয়েও হীন হ'তে হবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমার কাছে তোমরা কি চাও? মারতে চাও? মার। যা'তে তোমরা সুখ পাও, তাই কর।"

তখন তৃতীয় আগন্তুক অগ্রসর হইল; সে এতক্ষণ পশ্চাতে নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে সহসা অগ্রসর হইয়া সনাতনের চরণ সমীপে পড়িল; বলিল, "ভাই সনাতন, আমায় ক্ষমা কর, আমি মহাপাপী, তোমায় পরীক্ষা করবার জন্যে আমি এই চক্রান্ত করেছিলাম। দেখলাম, তুমি ভয়শূন্য, চিত্তজয়ী, ক্রোধহীন। রিপু যা'র বশীভূত, সেই দেবতা; অন্য দেবতা আমি মানি না। সনাতন, ভাই, দেবতা, আমায় ক্ষমা কর।"

সনাতন। ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করুন, শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্ত। আমি অন্ধ, মূর্খ, তাই তোমায় পরীক্ষা করতে গিছলাম। আমি ভুলে গিছ্‌লাম, তুমি চিরদিনই সকল বিষয়ে সকলের চেয়ে বড়। রাজকার্য্যে, বৈরাগ্যে, সন্ন্যাসে সকল বিষয়ে তুমি অদ্বিতীয়। তোমার জয় হউক—তোমার নাম জগতে চিরস্মরণীয় হউক।

চতুর্থ অধ্যায়

সনাতন—প্রভুর চরণে

প্রভু কয়েকদিবসমাত্র বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন চন্দ্রশেখরের আলয়ে বাস করিতেন, এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন, প্রভু দ্বিতীয়বার বারাণসীতে আসিয়া সেইরূপই করিতে লাগিলেন।

বারাণসীতে ফিরিয়া আসিবার দুই দিন পরে একদা প্রভু, চন্দ্রশেখরকে কহিলেন, "চন্দ্রশেখর, বাহিরে এক জন বৈষ্ণব বসিয়া রহিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া এস।" প্রভু ভিতর-প্রকোষ্ঠে নির্জ্জনে উপবিষ্ট; সদর-দ্বারে সনাতন বসিয়া প্রভুর চরণধ্যান করিতেছেন। চন্দ্রশেখর আসিয়া দেখিলেন, বৈষ্ণব কেহ নাই, তবে এক ব্যক্তি একখানা কম্বল গায় দিয়া একপার্শ্বে নীরবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ফিরিয়া গিয়া প্রভুকে কহিলেন, "দ্বারে ত কোন বৈষ্ণব নাই।"

প্রভু। তুমি কি দ্বারে কাকেও দেখিলে না?

চন্দ্র। এক জন দরবেশকে দেখিলাম।

প্রভু। তাঁহাকেই লইয়া এস।

চন্দ্রশেখর পুনরায় বাহিরে আসিলেন; এবং সনাতনকে বলিলেন, "প্রভু আপনাকে ডাকিতেছেন।"

সনাতন ভাবিলেন, চন্দ্রশেখর বুঝি আর কাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন; তাঁহাকে যে প্রভু ডাকিবেন, ইহা তিনি প্রত্যয় করিতে পারিলেন না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও নাই; বলিলেন, "প্রভু কা'কে ডাকছেন?"

"আপনাকে।"

"আপনি ভুল শুনেন নি?"

"না, আপনি চলুন।"

তথাপি সনাতনের বিশ্বাস হইল না। বলিলেন, "আপনি দয়া ক'রে পুনরায় জিজ্ঞাসা ক'রে আসুন। আপনার শুন্‌তে ভুল হয়ে থাকবে। আমার ন্যায় অস্পৃশ্য পামরকে প্রভু কেন ডাকবেন?"

"যে জগতের নিকট হেয় ঘৃণ্য, তাকেই ত প্রভু বুকে ধরেন।"

সনাতন তখন কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার চক্ষু বহিয়া বারিধারা ছুটিল; দ্বার পথ সিক্ত হইল। সনাতন কম্পিত দেহে যুক্তকরে চন্দ্রশেখরের অনুসরণ করিলেন, এবং ভিতর-প্রকোষ্ঠে আসিয়া দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভূম্যবলুণ্ঠিত হইলেন। প্রভু মৃদু হাস্য সহকারে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে উঠিলেন। সনাতন তদ্দৃষ্টে ঝটিতি উঠিয়া পশ্চাৎ হঠিতে লাগিলেন; সকাতরে যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিবেন না, প্রভু—"

তোমা স্পর্শ যোগ্য প্রভু, মুক্তি ছার নহি কভু,
ঘৃণাস্পদময় এই দেহ,
পাপময় স্ত্রুকদর্য্য, সাধুর সভায় বর্জ্জ্য,
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ।" *

প্রভু তখন উত্তর করিলেন—

"কৃষ্ণ-কৃপা তোমা পরি, যতেক কহিতে নারি,
উদ্ধারিলা বিষয়-কূপ হ'তে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ কৃষ্ণভক্তিমতি অহ
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। *

প্রভু দ্রুতপদে গিয়া সনাতনকে বক্ষোমধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। সনাতন কাঁপিযা উঠিলেন, তা'র পরই অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। প্রভু এই সুযোগে তাঁহার দেহে শক্তিসঞ্চার করিলেন। ক্ষণ-পরে সনাতন চৈতন্যলাভ করিয়া কম্বলখানি টানিয়া গায়ে দিলেন। তাঁহার অঙ্গের কম্বল প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; প্রভু হয় ত ভাবিলেন, সনাতনের বিষয়বাসনা আজও সম্পূর্ণ যায় নাই। সনাতন সব ত্যাগ করিয়াছেন—স্ত্রী, গৃহ, রাজতুল্য সম্মান, অতুল সম্পদ, সব ত্যাগ করিয়া একখানি ভোট-কম্বল শীতনিবারণার্থে গায় দিয়াছেন, তাহাও প্রভুর সহ্য হইল না; তিনি ঘন ঘন কম্বলখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। বুঝিয়া তিনি উঠিলেন; এবং বাহিরে গিয়া এক বৈষ্ণবকে কম্বলখানি দিয়া তাহার কন্থা-খানি মাগিয়া লইলেন। এইবার প্রভু সদয় হইলেন। রাজাকে রাজবেশ ছাড়াইয়া, ছিন্ন কন্থা, ছিন্ন বসন পরাইয়া, পথের ভিখারীর অধম করিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলেন। তখন পুনরায় সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "সনাতন, তোমার দৈন্য দেখে বুক ফেটে যায়।"

এমন সময় যমুনাতীর্থ নামক এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তিনি দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। পরে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রভুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরা বিগ্রহাদি যেভাবে দর্শন করি, তিনিও সেইভাবে প্রভুকে দেখিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন, কিন্তু তিনি আসন না লইয়া তপন ও চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়া ভূম্যাসনে বসিলেন। প্রভু তখন সনাতনকে চারি যুগের ধর্ম্মকথা শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ধনী, সরল ও ভক্ত। আজীবন তিনি সাধু খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন; যাঁহাকে যখন বড় মনে করেন, তাঁহাকে তখন সিদ্ধি, গাঁজা প্রভৃতি উপহার দিয়া তাঁহার অনুগ্রহ-লাভাশায় ঘুরিয়া বেড়ান। এতদিন তিনি সন্ন্যাসি-শিরোমণি প্রকাশানন্দকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি-পূজা করিতেন; কিন্তু যেদিন তিনি প্রভুকে দেখিলেন, সে দিন তিনি মনঃপ্রাণ প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিয়া তাঁহার দাসানুদাস হইয়া রহিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় দুঃখ যে, মহাজ্ঞানী ও গর্ব্বী প্রকাশানন্দ সরস্বতী, প্রভুকে চিনিলেন না। প্রকাশানন্দের দশ সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্য; তিনি বেদে অদ্বিতীয়, যশে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন, সম্মান অক্ষুণ্ণ, প্রতিপত্তি ভারতব্যাপ্ত। বিদ্যা ও জ্ঞানের নিকেতন বারাণসী ধামের কেহ যদি একচ্ছত্রি সম্রাট থাকে, তবে তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতী। ইনি প্রভুর প্রবল শত্রু; কাহাকেও প্রভুর নিকট আসিতে দেন না; প্রভুর অপযশ গাইযা তিনি সকলকে নিরস্ত করেন। যমুনাতীর্থের বিশ্বাস, যদি সরস্বতী কখন প্রভুকে দর্শন করেন, তা হ'লে প্রভুর প্রতি আর তাঁহার বিরাগ থাকে না—থাকিতে পারে না। এমন দয়াল ঠাকুরকে দেখিলে পাষাণও যে গলিযা যায়! তাই তিনি তপন মিশ্রকে বলিতেছিলেন, "প্রভুর নিন্দা আর সহ্য হয না।"

তপন। সহ্য না ক'বে উপায কি?

যমুনা। একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

তপন। আচ্ছা, তারা কি বলে?

যমুনা। 'কৃষ্ণচৈতন্য একটা মূর্খ সন্ন্যাসী, বেদ-পাঠ ছেড়ে নৃত্য-গীত করে। তা'র একটা মানুষ-ভুলান শক্তি আছে—অত বড় পণ্ডিত সার্ব্ব-ভৌমকে ভুলিয়েছে—যে তা'র কাছে যায়, তাকে ভুলোয়—সাবধান, কেউ তার কাছে যেও না।' এই রকম কত কথা বলে।

চন্দ্রশেখর। প্রভু এ সব নিন্দা শুনে কেবল হাসেন, কিন্তু আমাদের প্রাণে যে বড় লাগে।

তপন। আমাদের প্রাণে লাগলে প্রভুরও প্রাণে লাগে, তিনি কি ভক্তের ব্যথা দেখে স্থির থাক্‌তে পারেন?

চন্দ্র। তাই ব'লে আমরা আর স্থির থাক্‌তে পারি না, এর একটা ব্যবস্থা করা উচিত।

তপন। ব্যবস্থা যদি চাও, তবে এই গৌড়ের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর, কূট মন্ত্রণা অমন আর কেউ দিতে পারবে না।

---

* ভক্তমাল।

সনাতন তখন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন,—

"শুক্ল, রক্ত তথা পীত ইত্যাদিক করি
যুগে যুগে অবতার করেন যে শ্রীহরি।
তিন যুগে যে যে অবতার তা কহিলে,
পীতবর্ণ কলিতে কে তাহা না বলিলে।" *

প্রভু কহিলেন, "সনাতন, চাতুরালী ছাড়।" বলিয়া তিনি মৃদুহাস্যসহকারে ভিতর-প্রকোষ্ঠে উঠিয়া গেলেন। তখন ভক্তদের মধ্যে একটা পরামর্শ চুপি চুপি চলিতে লাগিল। চুপি চুপি কেননা, পাছে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শুনিতে পান। গোপীদেরও ভ্রম হইয়াছিল, তাই তাহারা সর্ব্বব্যাপী ভগবানের নয়ন হইতে তাঁহাদের নগ্ন দেহ লুকাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

চন্দ্রশেখর সমস্ত অবস্থা সনাতনের নিকট বিবৃত করিয়া কহিলেন, "দেখ, এই যে মহাগর্ব্বী প্রকাশানন্দ, এর দর্প চূর্ণ না হ'লে আমরা আর শান্তি পাচ্ছি না। যথা তথা প্রভুর নিন্দা ক'রে বেড়ায়, সে সব কথা শেলের ন্যায় আমাদের বুকে বাজে। স্বীকার করি, প্রকাশানন্দ মস্ত পণ্ডিত, তাঁ'র দশ হাজার শিষ্য সেবক আছে, তাই ব'লে প্রভুর নিন্দা করবার তাঁ'র কি অধিকার? আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সনাতন। প্রভুকে আপনারা কিছু বলেছেন?

চন্দ্র। বলেছি, কিন্তু কোন ফল হয় নি।

সনা। প্রভু কি বলেছেন?

চন্দ্র। কিছু বলেন নি, শুধু একটু হেসেছেন।

সনা। তা হ'লে ত প্রকাশানন্দের মুক্তি বেশী দূর নয়।

চন্দ্র। আপনি কি তাই মনে করেন?

সনা। আমি মনে করি, সেই অজ্ঞান জ্ঞানগর্ব্বী সত্বরই প্রভুর কৃপালাভ করবেন।

যমুনা। (ব্যাকুলভাবে) কি করা যায়, তা'র একটা উপদেশ দিন; আমরা আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারছি না।

সনা। প্রভু কি প্রকাশানন্দকে কখন দেখেছেন?

যমুনা। পরস্পর কেহ কাহাকে দেখেন নি।

সনা। আমার মনে হয়, উভয়ের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ ঘটলেই প্রকাশানন্দ মুক্ত।

যমুনা। সেটা বুঝি; কিন্তু সাক্ষাৎ কিরূপে ঘটবে? প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট আসবেন না, প্রভুকেও বলা যায় না, আপনি প্রকাশানন্দের আশ্রমে চলুন। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা নেই।

সনা। আপনি কিছু অর্থ-ব্যয় ও পুণ্যসঞ্চয় করতে প্রস্তুত আছেন কি?

যমুনা। আমার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করতে প্রস্তুত আছি।

সনা। আপনি কাশীর সমুদয় সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা গ্রহণার্থে নিমন্ত্রণ করুন; আর প্রভুরও চরণে ধরিয়া তাঁহাকে আহ্বান করুন।

যমুনা। প্রভু যাবেন কি?

সনা। যাবেন—নিশ্চয় যাবেন—প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করতে যাবেন। প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করতেই প্রভু কাশীতে এসেছেন।

যমুনা। তা' আপনি কি ক'রে বুঝলেন?

সনা। আমার দৃষ্টান্ত দেখে; আমাকে কৃপা করতে প্রভু নীলাচল হ'তে এসেছিলেন।

বলিতে বলিতে সনাতনের নয়ন অশ্রময় হইল। চন্দ্রশেখর বলিলেন, "পরামর্শ অতি উত্তম, আমার বেশ মনে ধরেছে। তবে এখন সহসা কিছু করা হবে না। আমার মনে হয়, প্রভু এখন কিছুকাল বারাণসীতে অবস্থান করবেন; তাড়াতাড়ি করলে সব পণ্ড হ'তে পারে।"

তপন। প্রভুর অনুমতি নেবে কে?

চন্দ্র। সে ভার বিচক্ষণ সনাতনের উপর রইল।

সনা। আমার বল, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা সবই প্রভু। আমি অতি ক্ষুদ্র, কীটাণুকীট—

এমন সময় ঘরের ভিতর একটি অপরিচিত ব্যক্তি প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিলেই মনে হয়, এ ব্যক্তি উন্মাদ। শ্মশ্রু, গুম্ফ ও মস্তকের কেশভারে তাহার বদনমণ্ডলের ভূরিভাগ আবৃত। পরিধানে অতি মলিন বস্ত্র; দেহ নগ্ন, কর্দ্দমলিপ্ত; কেশ রুক্ষ; কিন্তু চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়। ঘরের ভিতর আসিয়াই ডাকিল, "কই, আমার শ্যাম কই?"

চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

উন্মাদ উত্তর করিল, "আমার শ্যামকে চাই, এনে দেও না গা।"

চন্দ্র। ভিক্ষা চাও? অপেক্ষা কর, সময়ে পাবে। এখানে গোল করো না—প্রভু বিরক্ত হবেন।

উন্মাদ। কে তোদের প্রভু? তোরা নক্রি করিস নাকি? আরে ছ্যা।

চন্দ্র। দেখছি লোকটা উন্মাদ।

সনা। ঠিক উন্মাদ নয়—দিব্যোন্মাদ।

* ভক্তমাল

উন্মাদ তখন নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—

(ও সে) বাহু পশারিয়া হৃদে যব্ ধরবে
ছাড় ছাড় বলি হাম দূরে চলি যাওবে।
চরণ ধরিতে (যব্) ছুটি ছুটি আওবে,
কি কর কি কর বলি (হাম) হাসি চলি যাওবে॥

উন্মাদ ভাবে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছে আর গাইতেছে। কেশাবৃত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল—ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ জ্যোতির্ম্ময়। চন্দ্রশেখর প্রভৃতি সকলে নির্ব্বাক্। সহসা উন্মাদের ভাবান্তর হইল; নাচ-গান বন্ধ করিয়া বলিল, "কই, এখন ত এল না? আমি কার উপর তবে অভিমান করব? কই আমার শ্যাম —ওগো আমার শ্যাম কই গো?"—বলিয়া আবার গান ধরিল—

সখি আমার প্রাণনাথ কই এল,
মোহন মূরতি লয়ে বারেক দেখা দিয়ে
ওগো সে আমার কোথা চলি গেল।
আমি বাসক সাজায়ে আছি গো বসিয়া,
আমার মদনমোহন আসিবে বলিয়া।
(কত আবেগভরে গো)
(কত ব্যাকুল হয়ে গো)
লয়ে মালতীমালা, চন্দন বরণডালা,
সাজাব আমার শ্যামে হৃদিমাঝে বসাইয়া।
(মোরা দুয়ে এক হয়ে যাব,
আমি শ্যামে শ্যাম হয়ে মিশে যাব)।
(হায়) রজনী প্রভাত হ'ল, শ্যাম নাহি আয়ল,
জীবন জনম আমার সকলি বিফল হ'ল।
(ওগো শ্যাম বিহনে আমার সকলি বিফল হ'ল॥)

এবার উন্মাদ কাঁদিয়া আকুল; তাহার নয়ন কাঁদিতেছে, বদনমণ্ডল কাঁদিতেছে, সমস্ত দেহ কাঁদিতেছে—পদনখর হইতে মাথার কেশ পর্য্যন্ত কাঁদিতেছে। তেমন কান্না যমুনাতীর্থ প্রভৃতি কেহ কখন দেখেন নাই। তাঁহারাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছেন; কেন কাঁদিতেছেন, তা' জানেন না, শুধু প্রবাহে প্রবাহ মিশাইয়া যাইতেছেন। ঘরদ্বার কাঁদিতেছে, নিম্নে ভাগীরথী কাঁদিতেছেন—চারিদিকে একটা কান্নার রোল। উন্মাদ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে গাইতেছে—ওগো শ্যাম বিহনে আমার সকলি বিফল হ'ল।

এই কান্নার রোলের মধ্যে আচম্বিতে প্রভু আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন—আহূত হইয়া উপাস্যকে আসিতে হইল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র উন্মাদ হুঙ্কারপূর্ব্বক লাফাইয়া উঠিল। তাহার কান্না মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল —মেঘ সরিয়া রবির উদয় হইল—উন্মাদের প্রত্যেক লোমকূপ আনন্দে হাসিয়া উঠিল। সে প্রভুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বরণ করিল ও সঙ্গে সঙ্গে গাইল—

এই এসেছে মোর রসিয়া, আমায় কত ভালবাসিয়া,
হৃদি আলোকরা ধন কোথা ছিল লুকাইয়া।
কত দেশ ঢুঁড়নু, কত জনা পুছনু,
কত যুগ ধ'রে আছি গো বসিয়া॥

প্রভুর চিবুক ধরিয়া—

যদি এসেছ, যদি এসেছ, ও আমার প্রাণ-বঁধুয়া,
দাঁড়াও দেখি তেমনি ক'রে চরণে চরণ দিয়া।
পীত ছেড়ে কৃষ্ণ হয়ে ও আমার মোহনিয়া,
দণ্ড ছেড়ে মোহন বাঁশী করেতে লইয়া।
(ও সেই ভুবন-ভুলান বাঁশী করেতে ধরিয়া)॥

প্রভুর চরণ ধরিয়া—

ফিরে চল গো কুঞ্জে আমার ও প্রাণ-বঁধুয়া,
তুমি আসিবে ব'লে রেখেছি কত কুসুম তুলিয়া।
শেজ বিছায়ে রেখেছি নাথ কুসুমে গাঁথিয়া,
মোর হৃদয়-নিকুঞ্জে ওগো তুমি আসিবে বলিয়া॥

প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া—

তুমি আছ ব'সে আমার হৃদয় জুড়িয়া,
আমি আছি প্রাণধন তোমাতে মিশিয়া।
আমি জনম জনম আসি তোমারি হইয়া,
তুমি যুগ যুগ এস আমারি লাগিয়া॥

প্রভু তখন কম্পিত-কলেবর, গলদশ্রুলোচন। উন্মাদ, প্রভুকে ছাড়িয়া দুই পা পিছাইয়া গেল এবং সমস্ত প্রাণ দিয়া প্রভুকে দেখিতে লাগিল; সে দেখার আর শেষ নাই, প্রতি লোমকূপ চক্ষু হইয়া যেন প্রভুকে দেখিতে লাগিল। যখন প্রাণ ভরিয়া উঠিল, তখন ধীরে ধীরে মৃদু ও মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তুমি ত শ্যাম আমার শ্যামই আছ; লোকে বলে তুমি নাকি মথুরায় এসে গোরা হয়েছ, বাঁশী ছেড়ে নাকি দণ্ড ধরেছ, পীতধড়া ছেড়ে নাকি রক্তবসন পরেছ। কই, তুমি ত কিছুই ছাড় নি, তুমি ত গোরা হও নি; তুমি যে আমার সেই শ্যামই আছ। এস প্রাণনাথ—"

বলিতে বলিতে উন্মাদ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। প্রভু তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কোন সন্তর্পণের প্রয়োজন হইল না, প্রভু কাহাকেও সে দেহ স্পর্শ করিতে দিলেন না। উন্মাদ চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলেন, তিনি প্রভুর ক্রোড়ে শয়ান রহিয়াছেন। তখন তিনি একটু হাসিয়া সলজ্জে উঠিয়া বসিলেন এবং সহসা দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিতে প্রভু কাহাকেও দিলেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভু ও প্রকাশানন্দ

যমুনাতীর্থের বাসনা পূর্ণ হইল,—প্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছেন; প্রকাশানন্দও সশিষ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রভুর ভক্তেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের মনের কোণে একটু উৎকণ্ঠা জাগিয়া রহিয়াছে। সনাতনের কোনও চিন্তা বা উদ্বেগ নাই; তিনি স্থির জানেন, আজ প্রকাশানন্দের মুক্তি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তখনকার দিনে পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সমাজের একচ্ছত্রি সম্রাট প্রকাশানন্দ সরস্বতী। তিনি অদ্বৈতবাদী, নিজেকেই ভগবান বলিয়া জানেন; সুতরাং ভক্তি-তত্ত্ব তাঁহার নিকট অপরিচিত।

"যতেক দণ্ডীর গুরু কাশীতে প্রামাণ্য।
আপনারে মানে ইষ্টব্রহ্মেতে অভিন্ন॥
ভক্তি যে পদার্থ তা'র মর্ম্ম নাহি জানে।
প্রেমভাব দেখি কহে কান্দে কি কারণে॥"

এ দিকে প্রভু ভক্তির উৎস। প্রকাশানন্দ পাণ্ডিত্যাভিমানী, প্রভু তৃণাদপি সুনীচ; প্রকাশানন্দ দাম্ভিক, প্রভু বিনয়ী। একজন নিজেকে ভগবান্ মনে করেন, অপর ব্যক্তি নিজেকে দাস মনে করেন। পরস্পর বিরোধী ভাব লইয়া আজ দুই মহাপুরুষ একই সভায় সমুপস্থিত। একজন দ্বেষ ও হিংসা লইয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করিতে সমুৎসুক, অপর ব্যক্তি ক্ষমা ও করুণা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্ধার করিতে প্রয়াসী।

যমুনাতীর্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে প্রকাশানন্দ সহস্রাধিক শিষ্য সহ উপবিষ্ট। সকলেই শুনিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই বৃহৎ সভাতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেছেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রভুর প্রতীক্ষা করিতেছেন। সহসা দূরে দৃষ্টি হইল, এক জ্যোতির্ম্ময় দীর্ঘাকার মহাপুরুষ স্বর্ণসমোজ্জ্বল তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। কেহ কেহ ভাবিলেন, এত জ্যোতিঃ কেন? ইনি কি আমাদেরই মত মানুষ? মানুষে কি এত জ্যোতিঃ সম্ভব? প্রভু গজেন্দ্রগমনে অবনত বদনে মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, পশ্চাতে সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত। প্রভুর হাস্যময় বদন, কমল-নয়ন, সলজ্জ মধুময় ভাব, সার্দ্ধ চতুর্হস্ত-পরিমাণ সুদীর্ঘ দেহ সকলকে বিমোহিত করিল। প্রভু অগ্রসর হইয়া চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইলেন এবং সমবেত সন্ন্যাসিগণকে যুক্তকরে নমস্কার করিলেন; পরে চন্দ্রাতপের বাহিরে যেখানে পদপ্রক্ষালনের স্থান ছিল, সেইখানে চরণ-প্রক্ষালন করণানন্তর উপবেশন করিলেন।

প্রকাশানন্দ বিচলিত হইলেন; প্রভু অপবিত্র স্থানে উপবিষ্ট থাকিবেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি সশিষ্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রভুর সন্নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, সভার মধ্যে আগমন করুন; এ অপবিত্র স্থানে কেন?"

প্রভু। আমি আপনাদের মধ্যে বসিবার উপযুক্ত নই—আমার সম্প্রদায় হীন।

প্রকা। আমি জানি, আপনি কেশব ভারতীর শিষ্য; সম্প্রদায় হীন হইলেও আপনি হীন নহেন—সভার মধ্যে উঠিয়া আসুন।

বলিয়া প্রকাশানন্দ, প্রভুর হস্তধারণ পূর্ব্বক স্নেহ ও আদরের সহিত তাঁহাকে সভার মধ্যস্থলে আনিয়া বসাইলেন। নক্ষত্র-নিচয়ের মধ্যে প্রভু চন্দ্রের ন্যায় বসিলেন। তাঁহার অঙ্গের পদ্মগন্ধ চতুর্দ্দিক গন্ধময় করিল।

প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী, তবে আমাদের সহিত মেলামেশা করেন না কেন?"

প্রভু অতি ক্লিষ্ট-বদনে একবার প্রকাশানন্দের প্রতি চাহিলেন, তা'র পর মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিলেন। মুখের ভাবে যেন জানাইলেন, আমি অতি হীন, তাই আপনাদের সহিত মিশিতে সাহস করি না।"

সন্ন্যাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। সরস্বতীর আর সে বৈরিভাব নাই, সে স্থান এক্ষণে বাৎসল্য স্নেহ দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। প্রকাশানন্দ বলিলেন, "যদি অনুমতি হয় ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

প্রভু করযোড়ে উত্তর করিলেন, "স্বচ্ছন্দে করুন। আপনি আমার গুরুস্থানীয়, আমি আপনার সন্তান-তুল্য।"

এবার সরস্বতী বিগলিত হইলেন। একটু ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী হইয়া বেদপাঠ করেন না কেন? আর—আর শুনিতে পাই, সন্ন্যাসীর পক্ষে যা' অত্যন্ত নিন্দনীয়, আপনি সেই নৃত্যগীত প্রভৃতি ভাবকালিতে নিমগ্ন থাকেন। আপনি জগদ্বরেণ্য সন্ন্যাসসম্প্রদায় ভুক্ত, আপনার নিন্দা শুনিলে মনে বড় ব্যথা পাই; তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি এ সমস্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত কেন?"

প্রভুর উত্তর শুনিবার জন্য সভাস্থ সকলে উদ্‌গ্রীব।

সভাতল স্তব্ধ, ব্যগ্র। প্রভু করুণকণ্ঠে অবনতবদনে উত্তর করিলেন, "শ্রীপাদ, আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্খ। আমার দ্বারা বেদ, নিরুক্ত প্রভৃতি অধীত হওয়া সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কহিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্খ, তুমি বেদ পড়িতে পারিবে না; তজ্জন্য দুঃখিত হইও না, তৎপরিবর্ত্তে আমি তোমাকে বেদের সার একটি শ্লোক দিতেছি; তুমি ইহা কণ্ঠস্থ করিলে পূর্ণাভিলাষ হইবে।' বলিয়া তিনি একটি শ্লোক দিলেন; যথা—

'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

বলিয়া প্রভু শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন, "এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই। হরিনাম ব্যতীত জীবের গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্যা, পূজা, অর্চ্চনা এ সবে কিছুই হবে না, কেবলমাত্র হরিনামে সিদ্ধকাম হবে। অন্য কোন সাধন, দেবদেবী-পূজা, ধ্যান-ধারণা কিছুতেই জীবের উদ্ধার সম্ভবপর নয়—এক হরিনামই মহামন্ত্র, হরিনামই জীবের একমাত্র সহায় ও সম্বল।"

করুণস্বরে অশ্রুসিক্ত-নয়নে প্রভু যখন শ্লোক পাঠ করিলেন ও তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রোতামাত্রেরই মন দ্রব হইল। প্রভু বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব হরিনাম দিয়া আমাকে কহিলেন, 'দেখ বাপু, কলিকালে আয়ু কম, হরিনাম ব্যতীত স্বল্পায়ুর দিনে জীবের আর গতি নাই; অতএব তুমি কৃষ্ণনাম জপ কর, তোমার আর কিছু করিতে হইবে না।' আমি গুরুদেবের আজ্ঞামত তদবধি কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। দয়াময় কৃষ্ণ আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন; আমি চারিদিক্ কৃষ্ণময় দেখিলাম; আমার কর্ণে কৃষ্ণনাম, আমার নয়নে কৃষ্ণ,—আমার ভিতরে বাহিরে কৃষ্ণ, আমার চারিদিকে কৃষ্ণ—"

বলিতে বলিতে প্রভুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সভাস্থ সন্ন্যাসিগণের হৃদয়মধ্যে একটা ক্রন্দনের সুর বাজিয়া উঠিল। প্রভু বলিতে লাগিলেন, "আমি অবশেষে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য, কখন গান করিতে লাগিলাম; আমার তনু-মন এলাইয়া গেল; ক্রমে পাগল হইলাম। তখন আমি ভীত হইয়া পুনরায় গুরুর শরণাপন্ন হইলাম। তাঁহার চরণে নিবেদন করিলাম,'প্রভু' আমাকে এই কৃষ্ণনাম হ'তে পরিত্রাণ কর; দিবারাত্র আমার কাণে কৃষ্ণনাম ঝঙ্কৃত হচ্ছে, আমি আর কিছু শুনতে পাই না; কণ্ঠ আমার অবিরাম কৃষ্ণনাম বলছে, আমি তা'কে রোধ ক'রে রাখতে পারি না। কৃষ্ণনাম শুনলে চরণ আমার নেচে উঠে, বন্যার জল আমার নয়ন হ'তে উথলে পড়ে, মন পাগল হয়, দেহ এলিয়ে পড়ে। গুরুদেব, আমায় রক্ষা কর, এ কৃষ্ণনাম হ'তে পরিত্রাণ কর।' গুরুদেব আমার সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'তোমার এ বিপদ্ নয়, সম্পদ্; তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম তুমি লাভ করিয়াছ; সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যে পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করা সম্ভব হয় না, তাহা তুমি কৃষ্ণনাম জপ করিয়া পাইয়াছ।' গুরুর আজ্ঞা পাইয়া কৃষ্ণনামকে আমি আরও দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিলাম। তদবধি আমি যে হাসি গাই, নাচি কাঁদি, এ ঐ কৃষ্ণনামের শক্তিতে পরিচালিত হইয়া করি; তাহাতে আমার হাত নাই—আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু করি না।"

সভাতল স্তব্ধ; প্রভুর করুণ-কণ্ঠোচ্চারিত মধুর কৃষ্ণনাম শুনিয়া সকলেরই হৃদয় কেমন এক অভিনব ভাবে আবিষ্ট হইল। প্রকাশানন্দ মুগ্ধ, বিগলিতচিত্ত। কোমল ঝঙ্কারের কোমলতর প্রতিধ্বনি সভাস্থ সকলের হৃদয়মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল—একটা সুর, একটা উচ্ছ্বাস সভাময় যেন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে সুর, সে উচ্ছ্বাস ভঙ্গ করিতে সহসা কাহারও সাহস হইল না। ক্ষণপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি কৃষ্ণনাম করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; কৃষ্ণপ্রেম অতি দুর্লভ বস্তু স্বীকার করিলাম। কিন্তু আপনি বেদান্ত পড়েন না কেন?"

প্রভু। শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তর না দিলে আমার অপরাধ হইবে। আবার যথাযথ উত্তর দিলে আপনাদের বিরক্তি জন্মিতে পারে। যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি, কেন আমি বেদান্ত পাঠ করি না।

প্রকাশা। আপনার আবার অপরাধ! আপনার কথা শুনিতে বিরক্তি! এমন আদেশ করিবেন না শ্রীপাদ! আপনার বক্তব্য স্বচ্ছন্দে বলুন।

প্রভু। বেদান্ত ঈশ্বরের বাক্য, কিন্তু শঙ্কর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শঙ্করেরই রচিত। সূত্র মাথা পাতিয়া লইব, কিন্তু ভাষ্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই।

প্রকা। কেন?

প্রভু। বেদান্তের সূত্র সরল ও অর্থময়, কিন্তু ভাষ্য কূট ও কদর্থপূর্ণ।

প্রকা। আপনি বিস্মৃত হইতেছেন শ্রীপাদ, শঙ্কর জগদ্‌গুরু ও সন্ন্যাসীমাত্রেরই নমস্য।

প্রভু। আমি কিছুই বিস্মৃত হই নাই; যখন বিচার করিব, তখন তাঁহার কার্য্যের বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিতে হইবে, তাঁহার পরিচয় লইয়া বিচার করিব না। আরও এক কথা, আমার বিশ্বাস, শঙ্কর ইচ্ছাপূর্ব্বকই সূত্রের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন।

প্রকা। তাঁহার উদ্দেশ্য?

প্রভু। শঙ্কর মায়াবাদী; তিনি সোঽহংতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষে বেদান্তের প্রত্যেক সূত্রের একটা মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। বেদান্তকে আনিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করাইতে না পারিলে হিন্দু তাহা গ্রাহ্য করিবে না, তাই বিকৃত অর্থ তিনি একটা উদ্দেশ্য লইয়া করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীরা একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন। শঙ্করের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা কখন শুনেন নাই, বা নিজেরাও ভাবেন নাই। প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? তাঁহার ভাষ্যে যে আপনি দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড়ই সাহসের কথা।"

প্রভু। আপনার যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি দেখাইব, সূত্রের অর্থ কত সরল ও সহজবোধ্য, আর ভাষ্য কত দুর্ব্বোধ্য ও কদর্থপূর্ণ।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাষ্যের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক একটি সূত্রের অর্থ শঙ্কর যেরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ খণ্ডন করিয়া যাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসিগণ স্তব্ধ হইয়া প্রভুর বাক্য শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্য দৃষ্টে চমৎকৃত হইলেন। প্রকাশানন্দের গর্ব্ব ছিল, পাণ্ডিত্যে তিনি অদ্বিতীয়; প্রভু আজ তাঁহার সে গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দেখাইলেন, তিনি কোন্ ছার, শঙ্করাচার্য্যও ভ্রান্ত ও বিপথগামী। সন্ন্যাসীদের চক্ষু ফুটিল; তাঁহারাও এক্ষণে ভাষ্যের দোষ ও কদর্থ দেখিতে পাইলেন। প্রকাশানন্দ—সদাশয় ও মহাপণ্ডিত—প্রভুর ব্যাখ্যার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া অবনতমস্তকে সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলেন। বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, আমাদের প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। আপনি পরম পণ্ডিত, তাহাও জানিলাম; গুরু শঙ্করের মত খণ্ডন করিয়া আপনি অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এক্ষণে কৃপা করিয়া আরও কিছু শক্তির পরিচয় দিন। সূত্রের মুখ্য অর্থ করুন; দেখি আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন।"

তখন গৌরাঙ্গদেব সূত্রের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি একটি সূত্র বলিতে লাগিলেন আর তাহার অর্থ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ অর্থ করিয়া দেখাইলেন যে, ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবৎপ্রেম জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ।

অগ্রে প্রভু, শঙ্করের ভাষ্য দূষিয়াছিলেন, এক্ষণে সূত্রের সরল ব্যাখ্যা করিলেন। সকলের মনে এই ব্যাখ্যা সত্য ও প্রকৃত বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। তা' ছাড়া ভক্তির একটা আকর্ষণী শক্তি আছে; মানুষ স্বভাবতঃই ভালবাসিতে চায় ও ভালবাসার পাত্র খুঁজিয়া বেড়ায়। সন্ন্যাসীদের জীবন মরুভূমি-তুল্য শুষ্ক হইলেও ভিতরে কোমল স্নেহধারা আছে। সেই উৎসের অস্তিত্বও তাঁহারা হয় ত অবগত ছিলেন না—এত দিন অভিমান, গর্ব্ব, ভ্রান্তবিশ্বাস প্রভৃতি আবর্জ্জনা দ্বারা আবদ্ধ ছিল; আজ সহসা সেই উৎসের মুখ হইতে আবর্জ্জনা সরিয়া গেল—স্নেহধারায় তাঁহাদের হৃদয় প্লাবিত হইল। তাঁহারা সহসা দেখিলেন, তাঁহাদের ভালবাসিবার পাত্র আছে, আর সেই পাত্র স্বয়ং প্রেমময় ভগবান্—যাঁহার তত্ত্ব লইবার জন্য এই শুষ্ক কঠোর জীবন বহন করিয়া বেড়াইতেছেন। তখন তাঁহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সেই সহস্রকণ্ঠোত্থিত ধ্বনি, শঙ্খনিনাদরূপে ভক্তি-দেবীকে বরণ করিয়া আনিল। অভিমান, নাস্তিকতা তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিল না—শিহরিয়া পলাইল।

তখন প্রকাশানন্দ অতি কাতরে করযোড়ে সেই সহস্র সহস্র দর্শকের সম্মুখে প্রভুকে বলিতেছেন, "শ্রীপাদ, এতদিন আমি আপনাকে নিন্দা, দ্বেষ ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আমি এতকাল দম্ভে ও অভিমানে পূর্ণ ছিলাম; আপনাকে চিনিতাম না, আপনার মহিমা বুঝিতাম না। আজ আপনার কৃপায় আপনাকে জানিলাম; বুঝিলাম, আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। ভক্তি যে কি পদার্থ, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতাম না, পরন্তু ঘৃণা করিতাম। আজ আপনি অশেষ কৃপা করিয়া তাহা বুঝাইলেন। আপনি আমার প্রকৃত গুরু। আজ বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ সত্য, তাঁহার সেবা ও ভজনাই জীবের পরম ধর্ম্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।"

সন্ন্যাসিগণ ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে পুনরায় হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অতঃপর সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।*

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাশীধাম—চঞ্চল

তার দুই তিন দিন পরে একদা প্রভাতে কাশীর কোনও পথে এক সন্ন্যাসী দ্রুতপদে চলিয়াছেন; অপর এক সন্ন্যাসী অন্যপথ দিয়া আসিয়া প্রথম সন্ন্যাসীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে নমস্কারাদি করিলেন। দ্বিতীয় সন্ন্যাসী, প্রথমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দ্রুত কোথায় চলেছ?"

প্রথম। গৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখতে। আর তুমি?

দ্বিতীয়। আমিও তাই; সকলেই তাই।

প্র। আবার তর্ক করতে নাকি?

দ্বি। তর্ক! নারায়ণের সঙ্গে তর্ক! হায় হায়, এতদিন কায়া ফেলে ছায়া নিয়ে ছিলাম। জীবনের এতটা দিন বৃথায় গিয়েছে।

প্র। ঠিক বলেছ, এতটা শ্রম-সাধনা সব বৃথা হ'ল!

দ্বি। এখন কি করতে চাও?

প্র। তাঁর চরণে শরণ লব, তা'র পর তিনি যা' হয় করবেন।

দ্বি। গুরুদেবের সংবাদ কি?

প্র। তাঁর নয়নে এখন অশ্রুধারা।

দ্বি। আমি দেখলাম, তিনি এখন পুঁথি বাঁধছেন; বোধ হয়, গঙ্গার জলে ফেলে দেবেন।

প্র। আমারও তাই সঙ্কল্প; তা'র পর কাশী ছেড়ে নীলাচলে যাব।

দ্বি। দেখছ কি জনস্রোতটাই প্রভুর বাসার দিকে চলেছে।

প্র। আর সকলের মুখেই কৃষ্ণনাম; সত্যযুগের এই কাশীধামে এতদিন হর হর বম্ বম্ ধ্বনি উঠত, আর আজ হরিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত। এমনটা আর কখন শুনি নি।

দ্বি। অবতারও বোধ হয় আর কখন দেখি নি। যাক্,—আরে, এ ভিড়ের ভিতর দিয়ে আর ত অগ্রসর হওয়া যায় না।

প্র। এ কি! প্রভুর বাসা হ'তে লোক সব ফিরছে কেন?

দ্বি। তাই ত, এক জনকে-জিজ্ঞাসা করা যাক্ না। (জনৈক পথিকের প্রতি)—তোমরা ফিরছ কেন?

পথিক। প্রভু এখানে নেই, বিন্দুমাধবের মন্দিরে গেছেন।

সন্ন্যাসিদ্বয়। চল, আমরাও সেখানে যাই।

প্রভু প্রত্যহ প্রভাতে সনাতন প্রভৃতি ভক্তদের লইয়া পঞ্চনদে স্নান করিতে আসেন; এবং ঐ পথে বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। বিগ্রহ-দর্শনকালে প্রভুর ভাবোদয় হইত, কিন্তু তিনি এতদিন সে ভাব সম্বরণ করিয়া লইতেন; আজ আর তা' পারিলেন না। বিন্দুমাধবকে আজ দর্শন করিবামাত্র তাঁহার প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল,—তিনি আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তবৃন্দ হাতে তালি দিয়া গাইতে লাগিলেন—

> হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
> যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

সহস্র সহস্র লোক জমিয়া গেল; জনস্রোত চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য দেখিতে লাগিল। যাহারা পিছনে পড়িল, তাহারা নৃত্য দেখিতে পাইল না; দেখিল শুধু প্রভুর প্রেম-বিহ্বল বদনকমল, আর তাঁহার নয়ন-উৎসের জলধারা। যাহারা প্রভুর নিকটে, তাহারা নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ; যাহারা দূরে, তাহারা নানারূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত। এক জন বলিল, "ইনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ; আহা, আমি একবার ভাল ক'রে দেখতে পেলুম না।"

দ্বিতীয়। তুই কেমন ক'রে জান্‌লি ইনি ছিরিকেষ্ট?

প্র। সন্ন্যাসীরা বলছেন।

দ্বি। তুই বড় বোকা, তাই ও-কথা বিশ্বেস করিস।

প্র। আমি যেন ভগবানে বিশ্বাস ক'রে চিরদিন বোকাই থাকি।

দ্বি। আচ্ছা বল্ দেখি কেষ্টর গায়ের রং কি রকম ছেল?

প্র। কালো।

দ্বি। আর সামনের এই মনিষ্যিকে কি রকম দেখ্‌ছ?

প্র। সোণার বরণ।

* পরমভক্ত শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিকট এই অধ্যায়ের জন্ম ঋণী। তাঁহার প্রবোধানন্দের জীবনচরিত হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

দ্বি। তবেই ত হ'ল, ইনি কেষ্ট ন'ন।

প্র। ভগবান্ কি কাউকে লেখা-পড়া ক'রে দিয়েছেন যে, তিনি এক রকম রং নিয়ে চিরদিন পৃথিবীতে আসবেন?

যাঁহারা নিকটে,তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতেছিলেন, "প্রভুর এই আঁখিনিঃসৃত বারিধারায় যদি একবার স্নান করতে পেতাম,তা' হ'লে আমার মানবজন্ম সফল হ'ত।" এক জন বলিলেন, "আমি যদি ঐ কমলনয়নের এক ফোঁটা জল পেতাম, তা' হ'লে জন্মজন্মান্তরের পাপ ধুয়ে নিতে পারতাম।"

দ্বিতীয়। আরে, এক ফোঁটার দরকার নেই, এক বিন্দু পেলেই সমস্ত তীর্থের জল পাওয়া হ'ল।

তৃতীয়। আমি যদি একবার প্রভুর চরণস্পর্শ করতে পাই, তা' হ'লে দুনিয়ায় আর কিছু চাই না।

চতুর্থ। আরে বাবা, তোর স্পর্দ্ধা ত কম নয়! স্পর্শ! কত পুণ্যি করেছিলি, তাই দর্শন পেয়েছিস্; আবার বলে কি না স্পর্শ! আমরাই বড় সাহস করছি না।

তৃতীয়। কেন, তুমি কি বড় পুণ্যিবান্ না কি?

চতুর্থ। নয় ত কি? আমি ঠাকুর-দেবতা দেখতে পেলেই প্রণাম করি, সকালবেলা দুর্গা নাম ক'রে বিছানা ছাড়ি, পালপার্ব্বণে গঙ্গাস্নান করি, কাণা-খোঁড়া দেখ্‌লে দানও করি; পুণ্যিবান্ নয় ত কি?

তৃতীয়। আর সুযোগ পেলে মানুষ ঠেঙ্গাও ও ঠকাও।

চতুর্থ ব্যক্তি তাঁহার পুণ্যের দপ্তর লইয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আরে ছ্যা, এ সব যাযগায ভদ্রলোক থাকে।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "আমি একটা মতলব ঠিক করেছি।"

প্রথম। কি, কি ভাই?

দ্বি। প্রভু যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ঐখানকার মাটী খানিকটা আমি তুলে এনে রাখ্‌ব; ছুঁচের আগায় ক'রে রোজ একটু একটু ক'রে সপরিবারে খাব; আর বাকিটা ছেলেপিলেদের জন্যে রেখে যাব। তারা এখন হাজার বছর ধ'রে পুরুষানুক্রমে খেতে থাকুক।

প্র। তা'তে কি হবে?

দ্বি। কি হবে! কি না হবে তাই বল; প্রভুর-চরণ-রজঃ আমার ঘরে আছে জান্‌লে পরে কত লোক আমার দ্বারে এসে মাথা কুটবে।

তৃতীয়। চুপ্ কর, প্রকাশানন্দ এসেছেন।

প্রকাশানন্দ সত্যই আসিয়াছেন; জনতা সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি প্রভুর অদূরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আর সে বেশভূষা নাই, দণ্ড-কমণ্ডলু নাই, জটার বন্ধন নাই, অঙ্গে ভস্ম নাই। হৃত সন্তানের প্রত্যাগমন-সংবাদ পাইয়া জননী যেমন আলুথালু বেশে তাহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসেন, সরস্বতী, প্রভুর নৃত্য-গীতের সংবাদ পাইয়া, সেই ভাবে ছুটিয়া আসিয়াছেন। অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রভুর অদ্ভুত নৃত্য নিস্পন্দ-নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, হেমদণ্ডতুল্য দুইটি হস্ত উর্দ্ধে সঞ্চালিত করিয়া এক সুবর্ণোজ্জ্বল দীর্ঘাকার জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। মুখে কৃষ্ণনাম, নয়নে বারিধারা, অঙ্গে পদ্মগন্ধ। তাঁহার প্রেমার্দ্র বদনচন্দ্র দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর বিমোহিত হইলেন। হৃদয়াভ্যন্তরে যাঁহার মুখশশী এ কয়দিন নিরন্তর ধ্যান করিতেছিলেন, আজ সেই মনচোরকে সর্ব্বমাধুর্য্যমণ্ডিত দেখিয়া তাঁহার অন্তর গৌরাঙ্গময় হইয়া উঠিল; তিনি ভিতরে ও বাহিরে গৌরাঙ্গ দেখিলেন। তাঁহার যে নয়ন পূর্ব্বে অশ্রুসিক্ত হয় নাই, আজ সে নয়ন অশ্রুর বেগ ধরিয়া রাখিতে পারিল না; যে চরণ কখন পরের কথায় উঠে নাই, আজ সেই চরণ প্রভুর নৃত্য দেখিয়া নাচিয়া উঠিল; যে হৃদয় কঠোর ও শুষ্ক ছিল, সে হৃদয় আজ কোমল ও স্নেহপ্লুত। তাঁহার প্রাণের ভিতব এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তিনি জগৎ আনন্দময় দেখিতেছেন।

বহু লোকের কলরবে অবশেষে প্রভুর সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন; দেখিলেন, প্রকাশানন্দ তাঁহার সম্মুখে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে দণ্ডায়মান। প্রকাশানন্দ ছুটিযা গিযা প্রভুর চরণের উপর পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে সাদরে ধরিয়া উঠাইলেন।

সরস্বতী কাতরে করযোড়ে বলিলেন, "প্রভু, আমায় কৃপা কর—আমি তোমার নিকট অপরাধী।"

প্রভু। আমার নিকট কোনও অপরাধ কর নাই সরস্বতী।

সর। যদি আমার অপরাধ গ্রহণ না ক'রে থাক প্রভু, তবে আমায় সেবক ক'রে তোমার সঙ্গে লও।

প্রভু। তোমার স্থান বৃন্দাবনে, আমার সঙ্গে নয়।

সর। জীবের পদে পদে বিপদ্; এ সময় তুমি আমায় চরণে স্থান না দিলে আমি আবার ডুবে মরব।

প্রভু। তোমার আর বিপদ নাই, কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করেছেন।

সন। প্রভু, তোমার বিরহ যে আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

প্রভু। বৃন্দাবনে তুমি আমার দর্শন পাবে।

সন। তুমি ত আমায় বৃথা প্রবোধ দিচ্ছ না?

প্রভু। না; যখনই তুমি আমাকে স্মরণ করবে, তখনই আমার দর্শন পা'বে—তুমি নিশ্চিন্ত-মনে বৃন্দাবনে যাও।

সন। আপনার প্রবোধে আমি বড় আনন্দ পেলাম।

প্রভু। তোমার এই আনন্দ দিন দিন বর্দ্ধিত হোক, আর আজ হ'তে তোমার নাম হ'ল, প্রবোধানন্দ।

প্রবোধানন্দ প্রভুর চরণধূলি লইয়া বিদায় হইলেন। পরদিবস প্রভুও নীলাচলের পথ ধরিলেন। সনাতন সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু নিবারণ করিলেন; বলিলেন, "তুমি এক্ষণে বৃন্দাবনে যাও; সময়ে নীলাচলে আসিও। রূপ ও অনুপ বৃন্দাবনে গিয়াছে—লোকনাথ, ভূগর্ভ তথায় আছেন—তুমিও যাও।"

সনাতন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। প্রভু যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়া নীলাচলে চলিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

সনাতন—নীলাচলের পথে

সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া দেখিলেন, রূপ বা অনুপ কেহ তথায় নাই। তিনি দেখিলেন, বৃন্দাবনে তীর্থ নাই, মন্দির নাই, বিগ্রহ নাই; সমাজ নাই, দুই চারিজন ছাড়া বড় একটা ভক্ত বা সাধক নাই; আছে শুধু জঙ্গল

বৃন্দাবনে তাঁহার মন বসিল না, প্রভুর দিকে মন ছুটিল। কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া সনাতন নীলাচলে প্রভুর নিকট ছুটিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে পথে আসিয়াছিলেন, সনাতন সেই পথ ধরিয়া নীলাচলে চলিলেন। বারাণসী ত্যাগ করিয়া ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। স্থানে স্থানে জঙ্গল অতি নিবিড়, স্থানে স্থানে বসতি। দৃশ্য অতি সুন্দর; বৃক্ষ, বৃক্ষের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়াছে, লতা, বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। গাছে ফল, লতায় ফুল। বৃক্ষ দেহে অসংখ্য পক্ষী, লতার অঙ্গে অগণিত ভ্রমর ও প্রজাপতি। পাখী ডাকিতেছে, ভ্রমর গুন্‌গুন্ করিতেছে; আবার বন্য জন্তুরাও চীৎকার করিতেছে। সংসারে মানুষও তাই করিতেছে। জঙ্গলে পাহাড় নাই, কিন্তু টিলা আছে; নদী নাই, কিন্তু ঝরণা আছে; পথ নাই, কিন্তু চলিবার বাধাও নাই; মানুষ নাই, কিন্তু হিংস্র জন্তু আছে। সনাতন সেই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর দিয়া নির্ভয়ে চলিয়াছেন। মুখে হরিনাম, হস্তে দণ্ড। সনাতন গাইতেছেন—

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাং।

প্রভু যে গান গাইতে গাইতে পথ চলিতেন, সনাতনও সেই গান ধরিয়াছেন। নাম গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, ভয় ও চিন্তা কিছুই থাকে না। সনাতন নির্ভয়ে চলিয়াছেন। সহসা নিবিড়-তর জঙ্গলে তাঁহার পথ রুদ্ধ হইল। সনাতন দাঁড়াইলেন; ভাবিলেন, এ পথে ত প্রভু আসেন নাই, এখানে গাছে ফল নাই, লতায় ফুল নাই, পাখীর গান নাই—এ পথে ত প্রভু আসেন নাই। চরণ, কেন তুমি আমাকে এ পথে আনিলে? চল, ফিরে চল। সনাতন ফিরিলেন। বৃক্ষচূড় পানে চাহিয়া পথ নির্ণয় করিয়া লইলেন। এই যে, এই পথে প্রভু গিয়াছেন, দুই ধারে তৃণ সকল মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার অঙ্গের পদ্মগন্ধ পাইয়া আজও ভ্রমরকুল আকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে; এ পথে গাছে গাছে ফল, লতায় লতায় ফুল। একটি সুন্দর গন্ধময় ফুল দেখিয়া সনাতন তাহার অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ রূপ, এ গন্ধ কোথায় পেলে ফুল? তুমি যাঁর ইচ্ছায় আমারই মত ধরাধামে এসেছ, তুমি কি তাঁকে দেখেছ? সেই পরম সুন্দরকে দেখে কি তোমার জন্ম সার্থক করেছ? তুমি ত নিজের জন্মে আস নি, তাঁরই জন্মে, তাঁরই কাজে এসেছ। তুমি কেন সেই চরণে ঢ'লে প'ড়ে জন্ম সার্থক করলে না ফুল?

সনাতন চলিতে লাগিলেন। অদূরে হস্তিযূথ

দৃষ্ট হইল। সনাতন নির্ভয়ে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, কাহাকে তোমরা বনময় খুঁজে বেড়াচ্ছ? সেই বনবিহারীকে? যিনি বনের রাজা, তোমাদের রাজা, আমার রাজা, পৃথিবীর রাজা, সেই রাজার রাজাকে বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছ? তাঁকে একবার দেখে আমারই মত বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে বিশ্বময় ছুটে বেড়াচ্ছ? আহা, তিনি বড় দয়াল, তাঁকে যে খোঁজে, সেই তাঁর দর্শন পায়। খোঁজ, খোঁজ, বনময় পাতি পাতি ক'রে খোঁজ; খুঁজলেই তাঁর দর্শন পাবে—এই বনের ভিতরই তিনি তোমাদের দর্শন দিতে আসবেন।

হস্তি-যূথ অদৃশ্য হইল। সনাতন চলিতে লাগিলেন। যখন ক্ষুধা অনুভব করিলেন, তখন গাছের ফল পাড়িয়া ঝরণার ধারে বসিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া সনাতন আবার পথ চলিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বনের ভিতর অন্ধকার। সনাতন এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইল; এত গাঢ়, এত নিবিড় যে, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও সনাতন আর দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তিনি নির্ভয়। হৃদয়মধ্যে প্রভু আলো করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। আলো যাহা দেখায়, তাহা অস্থায়ী, মিথ্যা; অন্ধকার যাহা দেখায়, তাহা স্থায়ী, সত্য। সনাতন বাহিরের অনিত্য ছাড়িয়া ভিতরের নিত্যকে দেখিতে লাগিলেন। যখন আনন্দ উথলিয়া উঠিল, তখন গদ্‌গদচিত্তে গান ধরিলেন,—

একটিও আশা হৃদয়ে নাই যাহাতে তুমি জড়িত নও,
একটিও ক্ষোভ অন্তরে নাই যাহাতে তুমি লুকায়ে নও।
একটিও ছবি মানসে নাই যাহাতে তুমি অঙ্কিত নও,
একটিও সাধ প্রাণেতে নাই যাহাতে তুমি মিশায়ে নও।
বিন্দু রক্তও দেহেতে নাই যাহাতে তুমি বিম্বিত নও,
ক্ষুদ্র চিন্তাও আমাতে নাই যাহাতে তুমি সম্বিত নও॥

প্রভাতে উঠিয়া সনাতন আবার পথ চলিতে লাগিলেন। অচিরে ধূম দেখিতে পাইলেন; বুঝিলেন, নিকটে গ্রাম। সহসা পথপার্শ্ব হইতে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, তক্রপান করবে?"

সনাতন দেখিলেন, এক ব্যক্তি কলসপূর্ণ তক্র লইয়া পথপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সনাতন বুঝিলেন, সে গোপ—দধি-দুগ্ধ বিক্রয় তাহার ব্যবসা। কহিলেন, "আমি ভিখারী সন্ন্যাসী, তক্রের মূল্য কোথায় পাইব?"

গোপ। আমি মূল্য চাই না, তুমি ঘোলটুকু পান ক'রে আমাকে কৃতার্থ কর।

সনা। তুমি কি প্রত্যহ ঘোল নিয়ে এস?

গোপ। প্রত্যহ আসি; যে দিন পথিক পাই, সে দিন পথিককে দি; যে দিন না পাই, সে দিন ঐখানে ঢেলে দি।

সনা। তুমি মূল্য লও না কেন গোপ?

গোপ। মূল্য এক জন আমায় দিয়ে গেছেন—অনেক দিয়ে গেছেন—যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তক্রপান করালেও তাঁর ঋণ শোধ হবে না।

সনা। তিনি কে, গোপ?

গোপ। কে, তা' জানি না। জানি শুধু তিনি আমার পিতা, আমার প্রভু, আমার বুক আলোকরা ধন।

সনা। কোথায় তাঁকে দেখলে?

গোপ। ঐখানে, যেখানে আমি ঘোল ঢালি, ঐখানে; স'রে দাঁড়াও ঠাকুর, ওখানে পা দিও না; ঐখানে দাঁড়ায়ে আমার প্রভু এক দিন মধ্যাহ্নে আমার নিকট তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে তক্র চাইলেন। আমি তাঁহাকে কলস ধরিয়া দিলাম; তিনি দুই হাতে কলস ধরিয়া তক্রটুকু পান করিলেন। আমি মূর্খ, পাষণ্ড, তাঁর নিকট মূল্য চাহিলাম। তিনি কহিলেন, তুমি মূল্য লইয়া কি করিবে? আমি কহিলাম, আমার মা ও স্ত্রী আছে, তাহাদের পালন করিতে হইবে। তাহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন, তাঁহার পিছনে যে দুই ব্যক্তি আসিতেছেন, তাঁহারা মূল্য দিবেন। বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

বলিতে বলিতে গোপের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। সনাতন বুঝিলেন, এ বুক-আলোকরা ধন কে। গোপনন্দন বলিতে লাগিলেন, "দেখিলাম, পশ্চাতে দুই ব্যক্তি আসিতেছেন। তাঁহারা নিকটে আসিলে আমি মূল্য চাহিলাম। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, 'যিনি তোমার ঘোল পান করেছেন গোপ, তিনি ভিখারী সন্ন্যাসী; আর আমরা সেই ভিখারীর দাসানুদাস; আমরা অর্থ কোথা পাব ভাই? প্রভু যখন তোমার ঘোল পান করেছেন, তখন তুমি ধন্য, তোমার বংশ ধন্য।' আমি তাঁহার কথা শুনিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইলাম; কলস উঠাতে গিয়া দেখি, কলস ভারি; ভিতরে চাহিয়া দেখি, কলস স্বর্ণে পূর্ণ।"

যুবক নীরব হইল। উভয়ে ধ্যানে দেখিতেছিলেন, প্রভু যেন তাঁহাদেরই সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতেছেন। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'র পর?"

গোপনন্দন কহিল, "তার পর আমি প্রভুর

পশ্চাৎ ছুটিলাম ; আমাকে দেখিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিলাম, আমাকে অর্থ দিয়া ভুলাইলে হইবে না ; আমি তোমার চরণে আশ্রয় চাই। প্রভু বলিলেন, 'আমার বরে তুমি জ্ঞান ও ভক্তিলাভ করিবে—সময়ে ডাকিয়া লইব—এখন সংসার কর গে'।"

গোপনন্দনের নয়ন হইতে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি তা'র পর হ'তেই প্রত্যহ এখানে ঘোল নিয়ে এস ?"

মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক গোপ সম্মতি জানাইল।

সনা। আমি তোমার সেই প্রভুর দাসানুদাস, আমি তাঁরই চরণ দর্শনে চলেছি।

গোপ। তিনি কোথায় থাকেন ?

সনা। নীলাচলে। তুমি যাবে ?

গোপ। না।

সনা। কেন ?

গোপ। তিনি বলেছেন এখন সংসার করতে ; যখন সময় হবে, তখন তিনি ডাক্‌বেন। আচ্ছা ঠাকুর, বলতে পার, তিনি কে ?

সনা। তিনি স্বয়ং ভগবান্।

গোপ। না, না, অত বড় নাম বলো না, শুন্‌লে ভয় হয়। আমি যে মহাপাপী, ব্যবসা করুতে গিয়ে কত লোককে ঠকিয়েছি, কত মিথ্যা কথা বলেছি। আমি ভগবানের সাম্‌নে যেতে পারব না।

সনা। ভগবান্ দয়াময়, দণ্ডদাতা ন'ন। দণ্ড দেয় আমাদের কর্ম্ম, তাঁকে ডাক্‌লে তিনি আমাদের কর্ম্ম ক্ষয় ক'রে দেন, অশ্রু দেখ্‌লে বুকে ক'রে নিয়ে সান্ত্বনা দেন। তিনি আমাদের পিতা, তাঁকে ভয় কি ?

গোপ। তোমার ভগবান্ তোমার থাকুন, আমি তাঁকে চাই না। আমি চাই আমার সেই সোণার বরণ মদনমোহনকে। আহা, কি দৃষ্টি, কি হাসি, কত দয়া, কত মিষ্ট কথা !

সনাতন তক্র-পানান্তে প্রস্থান করিলেন। পথ চলিতে চলিতে পুনরায় পথভ্রান্ত হইলেন। চারিদিকে নিবিড় জঙ্গল, সন্ধ্যারও বড় বিলম্ব নাই। পৃথিবীময় শাঁক বাজিয়া উঠিয়াছে, আকাশময় দীপ জ্বালিবার ব্যবস্থা হইতেছে, বনময় হিংস্রক জাগিয়া উঠিতেছে। অন্ধকারে পথভ্রান্ত হইয়া সনাতন এক বৃক্ষমূলে বসিলেন এবং ভক্তিপূর্ণচিত্তে গান ধরিলেন—

আমি থাকি যেন সদা তোমারে লইয়া,
তোমারি ধ্যানেতে প্রভু, বিভোর হইয়া।
আমি সকল ছাড়িয়া (ওগো) সকল ভুলিয়া,
দিবানিশি থাকি যেন তোমারে লইয়া॥

সেই সুর লইয়া অদূরে কে গাইয়া উঠিল—

ওগো তোমার ওই অধরে অধর দিয়া,
ওগো প্রাণনাথ, হিয়ায় হিয়া মিশাইয়া ;
আমি সকল ছাড়িয়া ওগো সকল ত্যজিয়া
সতত রাখিব তোমা নয়নে বাঁধিয়া।

সনাতন গায়কের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন ; ডাকিলেন, "কে, উন্মাদ ? এস মহাপুরুষ, কৃপা ক'রে আমায় দর্শন দেও।"

নেপথ্যে পুনরায় সঙ্গীত হইল—

দরশন দেও প্রিয়, কোথা আছ লুকাইয়া,
যুগভোর আছি ব'সে কত আশা লইয়া।

সনাতন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মহাপুরুষ, দেখা দেও, আমায় পাগল করো না।"

কোথায় কে ? কোনও শব্দ নাই—সব নিস্তব্ধ। সনাতন উঠিয়া নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, অন্ধকারে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। অধিকন্তু বৃক্ষকাণ্ডে আহত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সনাতন দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গময় গলিত-কুষ্ঠ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আহ্বান

এ দিকে সপ্তগ্রামে রঘুনাথকে লইয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। রঘুনাথ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে ঘুরিয়া বেড়ান, বিষয়াদি দেখেন না ; তবে পিতার ঠিক যে অবাধ্য, এ কথা বলা যায় না। ভ্রমণে, শয়নে সকল সময়ে রঘুনাথ নজরবন্দী। আহা, বংশের একমাত্র দুলাল পাগল হয়ে গেল ! হিরণ্য ভেবে ভেবে কেমন এক রকম জড়-পিণ্ডের ন্যায় হয়ে গেছেন।

একদা প্রভাতে অন্তঃপুরমধ্যে কোন এক সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে বসিয়া হিরণ্য তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে বলিতেছিলেন, "কি করা যায় বল দেখি, ছেলেটাকে নিয়ে ত কোন সুখ হ'ল না।"

গোব। আমাদের মনুষ্য-জন্ম বৃথা হ'ল।

হির। বিয়ে দিলেম, এমন বউ—রূপে-গুণে লক্ষ্মী-সরস্বতী।

গোব। বউটা রোজ রাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘর হ'তে বেরিয়ে আসে।

হির। আসবেই ত! পাগল নিয়ে ভরসা ক'রে কে রাত কাটাতে পারে?

গোব। আহা, বউ-মা আমার সাবিত্রী; কাঁদেন আর বলেন, কেন পাগলের সঙ্গে আমার বিয়ে হলো গো!

হির। বলবেনই ত।

গোব। আহা, যদি একটা খুদ-কুঁড়োও হ'ত!

হির। হঁ্যা, আমাদের ভাগ্যিতে ওর আবার ছেলে হবে!

গোব। আর দেখ দাদা, ও যদি শোনে যে, রাজ্যের মন্ত্রীরা বিবাগী হয়ে চ'লে গেছেন, তা হ'লে ওকে আর ধ'রে রাখতে পারব না।

হির। কিছুতেই পারব না।

গোব। আজ এক বছর খবরটা লুকিয়ে রেখেছি, যদি দৈবাৎ শুনতে পায়—

হির। আরে বাপ রে! যদি দৈবাৎ শুনতে পায়—

গোব। আচ্ছা দাদা, এক কাজ করলে হয় না—

হির। কর, কর, এখনি কর।

গোব। ওকে শুনিয়ে দি, আমরা দত্তক পুত্র নিচ্ছি—

হির। দত্তক নিচ্ছি? বেশ, শুনিয়ে দেও।

গোব। তা হ'লে ওর ভয় হবে, ভাব্‌বে, এতটা বিষয় হাত-ছাড়া হবে। এখন জানে ওর সব।

হির। বেশ তাই কর; কবে দত্তক নিচ্ছ?

গোব। নেব না, শুধু ভয় দেখাব।

হির। ওঃ তাই! বেশ ভয় দেখাও।

যাঁর কথা হইতেছিল, তিনি সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথ ভাবে ঢুলু ঢুলু; যেন দূরে কি দেখিতেছেন, যেন আকাশে কি শুনিতেছেন। রঘুনাথ সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তোমরা আমার শত্রু না মিত্র?"

গোব। ছি ছি, এ কথা কেন? আমাদের মত তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী আর কে আছে? বাবা?

হির। নেই ত, কোথাও নেই।

রঘু। বাবা, তবে কেন আমায় জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌ছ?

গোব। তোমার ভালর জন্যই রাখ্‌ছি।

রঘু। আমি বুকে পাথর নিয়ে দিন-রাত কেঁদে কেঁদে বেড়াব, এই কি আমার ভাল?

গোব। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তাই এ রাজ-সম্পদকে পাথর মনে করছ।

রঘু। গৌড়ের উজীর ও মন্ত্রীরও কি তা'ই হয়েছিল?

সর্ব্বনাশ! রঘুনাথ তা হলে কথাটা শুনেছে! পিতাকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রঘুনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল বাবা, নিরুত্তর রহিলে কেন? রূপ ও সনাতনের মাথাও কি বিকৃত হয়েছিল? নরহরি, গদাধর, লোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, তাদের মাথাও কি বিকৃত হয়েছে? ঐশ্বর্য্য, গৃহ, মাতা, পিতা সব ত্যাগ ক'রে এঁরা কি জন্যে ভিখারী সেজেছেন, তা, কি একবার তলিয়ে বুঝে দেখেছ? যে সুখের জন্যে তাঁরা সব ছেড়েছেন, সে সুখের তুলনায় রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়-স্বজন কিছুই যে নয় বাবা! কেন এমন ভুল বুঝছ?"

গোব। আমরা ভুল বুঝছি, না তুমি ভুল বুঝছ?

রঘু। আচ্ছা বাবা, একবার প্রাণ খুলে কৃষ্ণ ব'লে ডাক দেখি।

গোব। আমরা কি কৃষ্ণ ব'লে ডাকি নি যে, তুই আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষে দিতে এসেছিস?

রঘু। না, সে রকম ডাক নয়; তোমরা যে ঝুলির ভেতর মালা রেখে জপ করবে আর বিষয়-কাজ দেখবে, তা' হবে না; তুমি আমার সঙ্গে একবার কৃষ্ণ ব'লে ডাক দেখি। ডাকতে না ডাকতেই দেখবে, তোমার সামনে সব নীল হয়ে গেছে, আর সেই নীলের ভিতর হ'তে নীলকান্তমণি ফুটে উঠছেন। একবার যদি দেখ, তিনি কত সুন্দর, তা' হ'লে পৃথিবীর কিছুই তোমার আর ভাল লাগ্‌বে না। একবার ডেকে দেখ, বাবা!

হিরণ্য। ডেকো না গোবর্দ্ধন, ডেকো না; আমি দেখছি, ডাকলে কি হয়—হরিদাস ও রঘুকে মাতালের মত মাটীতে প'ড়ে লুটোপুটি খেতে দেখেছি; ও বাবা! সে কাণ্ড কি ভোলবার!

রঘুনাথ। বুঝে দেখ না বাবা, কোন্ শক্তির বলে সুস্থ মানুষ এমন চঞ্চল হয়? নামের এমনি মহিমা, এমনি শক্তি যে, পাষাণকেও মাতাবে, কাঁদাবে। একবার ডেকে দেখ না, বাবা!

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, তোর সঙ্গে একবার ডেকে দেখি।

হিরণ্য। ডেকো না ভাই, অমন কাজও করো না, শেষকালে কি তোকেও হারাব। আমাদের পিতৃপুরুষ হ'তে যা' চ'লে আসছে, তাই কর। ভাল ভাল পুরুত লাগাও, ভোগের বরাদ্দ বাড়াও, ব্যস্।

গোবর্দ্ধন। দাদা, তুমি কি আমায় এমনি পেয়েছ যে, কৃষ্ণনামে আমি গ'লে পড়্‌ব? আমায় কেউ কিছুতে টলাতে পারবে না। ছোঁড়াটা ধরেছে, যদি দু'বার নাম করলে খুসী হয়, করি না কেন?

হিরণ্য। না ভাই, ও সবে কাজ নেই; কি হ'তে কি হ'যে পড়বে। কি যে ঢং উঠেছে, না লাফালে চেঁচালে ভজন হয় না! এ কি বাবা! ভগবানকে ডাকতে ইচ্ছে হয়েছে, বেশ, মনে মনে ডাক; তা' নয়, লাফালাফি কুঁদোকুঁদি জড়াজড়ি। আবার তা'র সঙ্গে আছেন ভেউ ভেউ। এ সব দেখ্‌লে শুন্‌লে ভগবান্ সে অঞ্চল ছেড়ে পালান।

গোবর্দ্ধন। সে কথা ঠিক্। আমার সময় সময় মনে হয়, এ সব ভূত-প্রেতের কাণ্ড; নইলে এত হুড়োমুড়ি করে কেন?

হিরণ্য। কাজ নেই ভাই, ও সব ঝঞ্ঝাটে—

রঘুনাথ। চুপ কর—ঐ শোন—আকাশে একটা গান উঠেছে; না, এ ত গান নয়—এ যে বংশীধ্বনি—অনেক দূর হ'তে, বুঝি বা পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে কে বাঁশী বাজাচ্ছে। কি মিষ্ট, কি মধুর! এ ধ্বনিতে যে সব ভ'রে গেল, পৃথিবীর চীৎকার ডুবে গেল—বিশ্বময় শুধু বংশীধ্বনি। আমার কাণের ভিতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ ক'রে এ ধ্বনি আমাকে সুরময় ক'রে তুলেছে। আর ত কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি না—সব সুর; প্রত্যেক রক্তবিন্দু সেই সুরে ধ্বনিত হচ্ছে। এ কি, ধ্বনির কি রূপ আছে? এ যে অতি মোহন রূপ! রূপে আমার হৃদয় ভ'রে গেল, বিশ্ব-সংসার রূপে আলো হ'ল।

রঘুনাথ বিহ্বলচিত্তে ধরণীপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িলেন। গোবর্দ্ধন 'জল' 'জল' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। হিরণ্য গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "উঁহু, জলে কিছু হবে না; রঘু রূপ চায়; রূপ এখন কোথায় পাই? হয়েছে—বউমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ত্বরায় নিয়ে এস; চল, আমরা অন্তরালে দাঁড়িয়ে দেখি, ব্যাপারটা কতদূর দাঁড়ায়।"

ব্যবস্থাটা গোবর্দ্ধনের পছন্দ না হইলেও তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। রত্নভূষিতা ইল্ললা সত্বর আসিয়া স্বামী-সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইলেন। রঘুনাথ তাহা লক্ষ্য করিলেন না; তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আহা কি রূপ!"

ইল্ললা স্বামীর সম্মুখে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার রূপ দেখে তুমি এমন ক্ষেপে উঠেছ?"

রঘুনাথ। তুমি কে? তুমি কি সেই রূপময় রূপ? না, না, তুমি অতি কুৎসিত; স'রে যাও, আমি তোমাকে চাই নে।

ইল্ললা। বুঝেছি, তোমার মন তোমাতে নেই। ঠাকুরকে বলছি ত তোমার আর একটা বিয়ে দিন, আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাই।

রঘুনাথ। তুমি আমার সামনে এস না ইল্ললা। তুমি এলে আমার যা' কিছু সুন্দর—সব স'রে যায়।

ইল্ললা। তা' ত যাবেই, পত্নী থাক্‌লে উপপত্নী আসতে পারে না।

রঘুনাথ। উপ-পত্নী? সে কে?

ইল্ললা। যা'র রূপে তুমি পাগল।

রঘুনাথ। সে পুরুষ কি স্ত্রী, তা'ও ত আমি কখন ভেবে দেখি নি, তুমি ও-সব কথা আর বলো না।

ইল্ললা। তা' বই কি, আমি চুপ ক'রে থাকি, আর তুমি যা' ইচ্ছে তাই কর। একবার তোমার সেই রূপকে পেতাম ত ঝাঁটাপেটা ক'রে ছাড়তুম।

রঘুনাথ। পাপিষ্ঠা! না—অভিসম্পাত করব না। প্রভু, অবোধকে ক্ষমা করো।

ইল্ললা। ম্যাগে! এইবার শাপমন্যি ধরেছে, তার পর মারবে। কত অধর্ম্ম করেছিলাম, তাই এ ঘরে পড়েছি।

ইল্ললা চোখে বস্ত্র দিয়া প্রস্থান করিলেন। রঘুনাথ তদবস্থায় ভূপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। নয়ন অর্দ্ধমুদ্রিত, মন প্রভুর চরণধ্যানে নিরত। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া রঘুনাথের পশ্চাতে দাড়াইলেন। রঘুনাথ বাহ্যজ্ঞানবিরহিত; তাঁহাদের লক্ষ্য করিলেন না। সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ওই যে বাঁশী আবার বেজে উঠেছে—সব ভাসিয়ে, সব ডুবিয়ে বাঁশী আবার তরঙ্গ নিয়ে ছুটেছে! আকাশ-পৃথিবী সব নিস্তব্ধ, শুধু সুরতরঙ্গ! আহা, কি সুন্দর, কি মধুর!"

রঘুনাথ সুর শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইলেন। সহসা বংশী নীরব হইল, সুর ভাসিতে ভাসিতে দিক্‌-দিগন্তের গর্ভে মিলাইয়া গেল। রঘুনাথ মাথা তুলিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে শূন্য আকাশ পানে চাহিলেন। বুঝি সুরকে খুঁজিতে লাগিলেন। অনন্ত আকাশের সামান্য একটু স্থানে আঁখি ও মন আবদ্ধ করিয়া সুর অথবা সুরের দেবতাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা দেখিলেন, সেই সামান্য স্থানটুকুতে নীলাকাশ উদ্ভিন্ন করিয়া একটা স্বর্ণবর্ণজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। প্রথমে অস্পষ্ট, ক্রমে স্পষ্ট হইয়া আকাশতলে ফুটিয়া উঠিল। জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে অবয়ব গ্রহণ করিল। রঘুনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এ কি! এ যে একখানি হাত! কি সুন্দর! কি জ্যোতির্ম্ময়! এ যে আমার প্রভুর হাত! সহসা আকাশে কেন? ও কি! আমাকে ডাকছ? আমার সময় হয়েছে দয়াল? যাই, যাই, প্রভু—"

রঘুনাথ ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া ছুটিলেন ; গোবর্দ্ধন তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "কোথা যাও রঘু ?"

রঘুনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "স'রে যাও, পথ ছেড়ে দেও, প্রভু আমাকে ডাকছেন।"

গোবর্দ্ধন। স্থির হও বাবা, বসো—চঞ্চল হয়ো না।

হিরণ্য। আর স্থির হয়েছে—বদ্যি ডাক্‌তে পাঠাও।

রঘুনাথ। বাবা, ওই দেখ, আকাশের গায় প্রভুর সোণার হাত ফুটে উঠেছে ; চেয়ে দেখ বাবা, কি সুন্দর ! নীলসমুদ্রের মধ্যে কি রূপময় জ্যোতিঃ !

গোবর্দ্ধন বাতায়ন-পথে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কই, আমি ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

রঘুনাথ। কেন দেখ্‌তে পাচ্ছ না বাবা ? ওই যে তোমার সাম্‌নে সমস্ত বিশ্বের আলো ম্লান ক'রে—

গোবর্দ্ধন। বদ্যিই ডাক্‌তে হ'ল—ছেলেটার মাথা বিগ্‌ড়েছে।

রঘুনাথ। বাবা, জ্যেঠা, তোমাদের কাছে কত অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর ; আমি চল্লুম।

গোবর্দ্ধন। কোথায় যাবে ? দাঁড়াও।

রঘুনাথ। কি, আমায় যেতে দেবে না ? প্রভু আমায় ডাকছেন, তুমি যেতে দেবে না ? তুমি আমার বন্ধ করবে ? এই বাপের কাজ ? আজ হ'তে তোমাদের সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল। সাধ্য থাকে, আমার পথ রোধ কর—আমায় বন্দী কর। তোমার অনুচরদের ডাক, তোমার যে যেখানে আছে ডাক, পৃথিবীর শক্তি একত্র কর—সাধ্য থাকে, আমার পথ রোধ কর। আজ প্রভু আমায় ডেকেছেন, আমার চিরকালের পিতা আমায় আদর ক'রে ডেকেছেন, আমাকে কেউ আজ ধ'রে রাখ্‌তে পারবে না। (বাতায়ন-সন্নিধানে ছুটিয়া গিয়া আকাশের প্রতি) যাই, যাই প্রভু, একটু অপেক্ষা কর, দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা কর। আমি চলেছি, দয়াল ! কিন্তু—কিন্তু—

বলিতে বলিতে রঘুনাথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সামান্য শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দ্বার বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রহরী বসিল। রঘুনাথ বন্দী হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সনাতন—নীলাচলে

সনাতনের অঙ্গময় গলিতকুষ্ঠ, ক্লেদ নির্গত হইতেছে। তদ্ধেতু সনাতন দুঃখিত নহেন। তাঁহার বিশ্বাস, প্রভুর ইচ্ছা ব্যতীত বিশ্বে কিছুই ঘটিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছাতেই আজ এই ঘৃণ্য রোগ। আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ এই দারুণ ব্যাধি সনাতন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।

সনাতন নীলাচলে আসিয়া হরিদাসের বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। সনাতনের জাতি নাই, তিনি মুসলমানের নিমখ্ খাইয়া হিন্দুর জাতি মারিয়াছেন, দেবমন্দির ভাঙ্গিয়াছেন ; হিন্দু-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিবে কেন ? সনাতন আপনাকে মানবমাত্রেরই অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়া সদাশয় ও মহাপ্রেমিক হরিদাসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

হরিদাসের তখন অনেক বয়স ; তিনি প্রভুর চেয়ে পঁয়ত্রিশ বৎসরের বড়, এমন কি, নিত্যানন্দের চেয়েও তেইশ বছরের বড় ; তবে তাঁহার গুরু অদ্বৈতাচার্য্যের চেয়ে সতর বছরের ছোট। বয়সের সঙ্গে তাঁহার দেহ কিছু স্থূল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি চিরদিনই কিঞ্চিৎ স্থূল, তবে ইদানীং কিছু বাড়াবাড়ি। জপ করিবার আর সে শক্তি নাই ; দেহ রাখিবার বাসনাও মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। মনকে বলেন, যদি তাঁকে ডাক্‌তেই পারবি না, তখন আর দেহ নিয়ে ফল কি।

সনাতন আসিয়া হরিদাসের চরণবন্দনা করিলেন, হরিদাস তাঁহাকে টানিয়া লইয়া বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে প্রভু সপার্ষদ তথায় উপনীত হইলেন। প্রভুর দর্শনমাত্র উভয়ে তাঁহার চরণে পড়িলেন। প্রভু, সনাতনকে চিনিবামাত্র দুই বহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। সনাতন পিছাইয়া গেলেন ; বলিলেন, "প্রভু, আমাকে স্পর্শ করিবেন না—আমি কুষ্ঠগ্রস্ত—অস্পৃশ্য।" প্রভু সে কথা কাণে তুলিলেন না, তিনি বলপূর্ব্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর অঙ্গে ক্লেদ লাগিয়া গেল, তদ্দর্শনে ভক্তেরা মনে ব্যথা পাইলেন।

সনাতন হরিদাসের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। হরিদাসের জন্য প্রভুর কিঙ্কর গোবিন্দ প্রত্যহ প্রসাদ আনিতেন। প্রভুর ইচ্ছায় সনাতনের জন্যেও সেইরূপ আসিতে লাগিল। এইরূপ কিছুকাল অতিবাহিত হইল। সনাতনের অভিপ্রায়, জগন্নাথদেবের

রথচক্রতলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। রথেরও আর বড় বিলম্ব নাই। সনাতন আসিয়াছিলেন, বৈশাখ মাসে; এক্ষণে আষাঢ় মাস। তিনি এক দিন হরিদাসকে বলিতেছিলেন, "প্রভুর কাছে শুনিলাম, অনুপ দেহত্যাগ করিয়াছে আর রূপ এখানে দশমাস থাকিয়া বৃন্দাবনে গিয়াছে। আমি এখানে একা; আমি এ রোগাক্রান্ত অকর্ম্মণ্য জীবন আর বহন করি কেন?"

হরিদাস। তুমি কেমন ক'রে জানলে, তোমার জীবনে কোন প্রয়োজন সাধিত হ'বে না?

সনা। প্রভু বলেছেন, বৃন্দাবনে হরিনাম প্রচার করতে; কিন্তু যে অস্পৃশ্য, ব্যাধিগ্রস্ত, তা'র নিকট কে আসবে? তা'র মুখের হরিনামই বা কে গ্রহণ করবে?

হরি। প্রভুই ত বলেছেন, যে পরিমাণে তুমি লোকের নিকট হ'তে ঘৃণা পাবে, সেই পরিমাণে তুমি কৃষ্ণকৃপা লাভ করবে।

সনা। আমিও তাঁর নিকট শুনিয়াছি, রোগ-শোক, নিন্দা-অপবাদ, ঘৃণা-অপমান সবই ভগবান পাপক্ষয়ের নিমিত্তে প্রেরণ করেন। যাহারা সুখে ঐশ্বর্য্যে আত্মপরিজন লইয়া আছে, তাহারা ভগবান্ হইতে অনেক দূরে। কিন্তু আমার কথা এই, যে নিজে ঘৃণ্য অস্পৃশ্য, সে হরিনাম প্রচার করিবে কিরূপে?

হরিদাসের একটি বালক ভৃত্য ছিল, সে বোবা ও কালা; নাম রঘুয়া। তাহার কেহ কোথাও নাই; হরিদাস তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন। হরিদাস যাহা প্রসাদ পাইতেন, তাহারই কিয়দংশ বালকের জন্য রাখিয়া দিতেন। বালকের কোনই কাজ ছিল না; হরিদাস যখন জপ করিতেন, তখন বালক তাঁহার নিকট হইতে কিছু দূরে বসিয়া হরিদাসের পানে চাহিয়া থাকিত। যখন হরিদাস, সনাতন বা অপর কোন ভক্তের সহিত আলাপাদি করিতেন, তখন বালক আশ্রমের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত। প্রভুর দর্শন পাইলে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, কিন্তু কখন তাঁহাকে প্রণাম করিত না, বা তাঁহার নিকটে আসিত না। সে এক্ষণে কুটীরের বাহিরে ছিল, সহসা ছুটিয়া আসিয়া যঁ্যা যঁ্যা করিতে লাগিল, হরিদাস বুঝিলেন, প্রভু আসিতেছেন। উভয়ে পিঁড়া হইতে নামিয়া উঠানে আসিলেন। প্রভু একা। সনাতন বুঝিলেন, অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছেন; তাই প্রভু একা আসিয়াছেন, উভয়ে চরণবন্দনা করিলেন; প্রভু যখন আলিঙ্গনোদ্যত হইলেন, তখন সনাতন পিছাইয়া গেলেন। প্রভু ডাকিলেন, "সনাতন, নিকটে এস।"

সনা। ক্ষমা করবেন প্রভু, নিকটে আর যাব না; আমার অঙ্গের ক্লেদ, আপনার অঙ্গে লেগে যায়, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না।

প্রভু, সনাতনকে ধরিবার জন্য যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সনাতন তত পিছাইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, আমি সন্ন্যাসী, বিষ্ঠা-চন্দনে আমার সমজ্ঞান হওয়া উচিত।"

সনা। আমি ত সন্ন্যাসী নই প্রভু, সুতরাং সমজ্ঞান আমাতে সম্ভব নয়। আমি কেমন ক'রে সহ্য করব, তুমি এই দুর্গন্ধময় ক্লেদ শ্রীঅঙ্গে মাখবে? যাঁর চরণে লোকে তুলসী-চন্দন দেয়, তাঁর অঙ্গে আমি ক্লেদ দেব? আমি পারব না প্রভু, ক্ষমা কর।

প্রভু। তোমার অঙ্গে দুর্গন্ধ কোথা? আমি ত চন্দনের গন্ধ পাই।

বস্তুতই সনাতনের অঙ্গে চন্দন-গন্ধ; সনাতন ছাড়া সকলেই সেটা উপলব্ধি করিয়াছেন। যে দিন প্রভু তাঁহাকে প্রথম আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করেন, সেই দিন হইতেই সনাতনের অঙ্গে চন্দন-গন্ধ।

সনাতন উত্তর করিলেন, যাঁর অঙ্গে পদ্ম-গন্ধ, তিনি দুর্গন্ধ কোথাও পান না।"

প্রভু পরাস্ত হইলেন। কহিলেন, "তুমি জান না সনাতন, ভক্তের অঙ্গ আমার নিকট কত প্রিয়।"

সনাতন। জগতে আমার একটিও ভক্ত নেই, আমি কেমন ক'রে তা জানব প্রভু?

প্রভু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া সনাতনকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে বক্ষের উপর অতি প্রীতিভরে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিলেন। প্রভুর সোণার অঙ্গ ক্লেদে ভরিয়া গেল। সনাতন মর্ম্মাহত হইলেন। তার পরে প্রভু দুই জনকে দুই হাতে ধরিয়া আনিয়া পিঁড়ায় বসিলেন এবং অতি গম্ভীরকণ্ঠে সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মঘাতীকে তুমি ভক্ত ব'লে মনে কর কি সনাতন?"

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এ সব কথা কেন প্রভু?"

প্রভু। বল সনাতন, যে আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প, সে কি কৃষ্ণের নিকট অপরাধী নয়?

সনা। প্রভু, প্রভু—

প্রভু। শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস না হারালে কেহ আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হ'তে পারে না; সে শুধু নিজের সুখ-দুঃখ অন্বেষণ করে—জগতের কল্যাণ, কৃষ্ণের

করুণা এ সব কথা স্মরণেই আনে না। শুন সনাতন, জীবনে কখন বিস্মৃত হযো না—কৃষ্ণ কখন নিষ্ঠুর নহেন—তিনি চিরকল্যাণময়।

সনা। ক্ষমা করুন প্রভু, আমি ভ্রম বুঝেছি।

প্রভু। উত্তম—আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলাম। আর এক কথা আছে, তুমি এক্ষণে নীলাচল ত্যাগ করিও না।

এমন সময় প্রভুর পার্ষদরা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। হরিদাস ও সনাতন তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভুর সান্নিধ্য ত্যাগ করত উঠানে নামিয়া আসিলেন। প্রভু পুনরায় বলিলেন, "শুনেছ সনাতন, তুমি এক্ষণে নীলাচল ত্যাগ করিও না।"

সনা। প্রভু আমাকে ছুটী দিন, আমি বৃন্দা-বনে যাই।

প্রভু। কেন তোমায় স্পর্শ করি, তাই? সনাতন, তুমি জান না, তুমি কত পবিত্র—তোমাকে স্পর্শ করিলে দেবতারাও পবিত্র হন। কেন তুমি অকারণ সঙ্কুচিত হও?

সনা। প্রভু, এ অস্পৃশ্য পামরকে এত ক'রে বাড়িয়ে তুলবেন না।

প্রভু। তোমার দৈন্যে আমি মুগ্ধ হইলাম, তুমি বর প্রার্থনা কর।

সনা। প্রভু, আপনি যখন আমার সম্মুখে, তখন ত আমার চাইবার কিছু নেই।

প্রভু। না সনাতন, তা হবে না; তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর—আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না।

সনা। প্রভু যখন দাসের প্রতি এতই প্রসন্ন, তখন এই বর চাই—প্রভু ক্ষমা করবেন, আপনার সৃষ্টির যদি কোন বিঘ্ন না ঘটে—তবে এই বর প্রদান করুন, যেন এই মূক বধির অনাথ বালক বাক্ ও শ্রবণ-শক্তি লাভ করে।

"তথাস্তু।"

সনাতন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন। ভক্তবৃন্দ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু কহিলেন, "সনাতন, দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।"

সনা। প্রভু, আর আমার চাইবার কিছু নেই, ক্ষমা করুন।

প্রভু। তোমার রোগমুক্তি?

সনা। না, না, প্রভু—আমি এ বেশ আছি; সম্মান লইয়া কি করিব? ঘৃণাই আমার সম্পদ্। ব্যাধি আমাকে দৈন্য শিখাইয়াছে, আবার আমার পুঞ্জীকৃত পাপরাশি ক্ষয়ও করাইতেছে। তুমি যা দিয়াছ, তা আমি ছাড়িতে চাই না।

প্রভু। সনাতন, তুমি যথার্থ কৃষ্ণভক্ত; সকলের চেয়ে তুমি আমার প্রিয়। এস সনাতন, আমার হৃদয়ে এস, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমি পবিত্র হই।

বলিয়া প্রভু উঠানে নামিলেন এবং সনাতনকে বক্ষে লইয়া অশ্রুপাত করিলেন। প্রভু যখন সরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন সকলে দেখিলেন, সনাতনের দেহ ব্যাধিমুক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

রঘুনাথ ও উন্মাদ

গভীর রাত্রি। রঘুনাথ কক্ষমধ্যে আবদ্ধ। রঘুনাথ দ্বার টানিয়া দেখিলেন—খুলিল না। ফিরিয়া বাতায়ন-পথে উদ্যানের দিকে নেত্রপাত করিলেন—বাতায়ন লৌহদণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত। বাহিরে শুধু অন্ধকার; বৃক্ষনিচয়, কৃষ্ণবর্ণ দৈত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রঘুনাথ চিন্তিত অন্তরে আকাশ পানে চাহিলেন। সেখানে আর সে জ্যোতিঃ নাই, সুরের দেবতাও নাই। নক্ষত্র ছাড়া তথায় আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। রঘুনাথ ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় বসিলেন—কাতরপ্রাণে প্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন।

সহসা বাতায়ন-পথে কে ডাকিল, "রঘুনাথ!" রঘুনাথ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুনরায় কে বলিল, "রঘুনাথ, এ দিকে এস।" রঘুনাথ বাতায়নে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি বাহিরে, উদ্যানের দিকে দাঁড়াইয়া আছে। আগন্তুক কহিলেন, "বাহিরে এস।"

রঘু। তুমি কে?

আগ। সে পরিচয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

রঘু। আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও?

আগ। নীলাচলে—তোমার প্রভুর কাছে।

রঘু। তবে চল, এখনি চল।

আগ। আমি বাতায়নের একটি দণ্ড সরায়েছি, তুমি এই পথে এস।

রঘুনাথ স্বল্পপরিসর পথে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। গভীর অন্ধকার, আগন্তুক তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আগে আগে চলিলেন। উদ্যান উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রাচীর-দ্বারে প্রহরী। আগন্তুক দ্বারের দিকে অগ্রসর না হইয়া এক নিভৃত স্থানে

আসিলেন এবং স্বল্প আয়াসে প্রাচীরের শিরোদেশে উঠিলেন। রঘুনাথ তাঁহার কৌশল ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রাচীরের মাথায় রজ্জু-নির্ম্মিত অবতারণী সংরক্ষিত ছিল; অপরিচিত ব্যক্তি তাহা নামাইয়া দিলেন। রঘুনাথ তৎসাহায্যে প্রাচীরের উপর উঠিলেন ও অপর পৃষ্ঠে নামিলেন।

রঘুনাথ এক্ষণে মুক্ত। দ্রুতপদে নগর অতিক্রম করিয়া উভয়ে বনপথ ধরিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি আগে আগে, রঘুনাথ পশ্চাতে। উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ নাই—বাক্যালাপের অবসরও নাই। বনেব মধ্যে নিবিড় অন্ধকার, কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। পথ দেখা দূরে যাক, গাছ-পালাও নজর হইতেছে না। সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া অপরিচিত ব্যক্তি অতিদ্রুতপদে নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হইতেছেন। এত দ্রুত যাইতেছেন যে, রঘুনাথকে সময় সময় ছুটিয়া তাঁহার সঙ্গ লইতে হইতেছে। যখন অরুণোদয়, তখন অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন, "রঘুনাথ, বসো, ক্লান্ত হযে পড়েছ।"

রঘুনাথ বসিলেন; অপরিচিত ব্যক্তির পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, তাঁহার মুখের ভূরিভাগ কেশে আবৃত; বয়স নির্ণয় করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আপনার কৃপায় আজ আমি মুক্ত।"

অপরিচিত। কৃপার মালিক আমি নই, এক জনের হুকুমে দুনিয়া চলছে।

রঘু। আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

অপ। আমার আবার পরিচয় কি?—আমি ভবঘুরে।

রঘু। আপনাকে কি ব'লে ডাকবো?

অপ। ডাকবার প্রয়োজন হবে না—আমি এইখান হ'তেই বিদায় নিচ্ছি।

রঘু। আপনি নীলাচলে যাবেন না?

অপ। না; তুমি যাও। এই পথে যেও; যদি পথ ভুল হয় বা বিপদে পড়, তবে কৃষ্ণকে ডেকো; তিনি তোমায় পথ দেখিয়ে দেবেন, বিপদে রক্ষা করবেন।

রঘু। আপনি এই বনের ভিতর কোথায় যাবেন?

অপ। তা' ত জানিনে, কোথায় আবার যেতে হয়; কর্ত্তা ত আমি নই। কর্ত্তা হ'লে বলতে পারতুম কোথায় যাব।

অপরিচিত ব্যক্তি প্রস্থান করিলেন। রঘুনাথ হাত-মুখ ধুইয়া আবার চলিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। তাঁহার পরিধানে একখানি বসন, অঙ্গে পেটাঙ্গি মাত্র; দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, কপর্দ্দকও সম্বল নাই। আহার করেন গাছের ফল, পান করেন নদী বা ঝরণার জল, শয়ন করেন তরুতলে। যেখানে ফল অপ্রাপ্য, সেখানে উপবাস, যেখানে জল নাই, সেখানে নিরম্বু, যেখানে বৃক্ষ নাই, সেখানে উন্মুক্ত আকাশ, রঘুনাথ এই ভাবে দিনের পর দিন ছুটিয়াছেন নীলাচল অভিমুখে। মুখে কৃষ্ণ-নাম, হৃদয়ে গৌরাঙ্গ-মূর্ত্তি। পাখীর কূজনে, বন্য-জন্তুর চীৎকারে শুনিতেছেন কৃষ্ণনাম; বৃক্ষপত্রে, ফুলের অঙ্গে দেখিতেছেন, গৌরাঙ্গরূপ। প্রভুর কাছে যাইতেছেন, আনন্দে অধীর—ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। আবার ভয়ও আছে, পাছে শত্রুরা, অর্থাৎ পিতার অনুচরেরা আসিয়া ধরে। খোলা মাঠ বা গ্রাম্যপথ না ধরিয়া জঙ্গল ভাঙ্গিয়াই চলিয়াছেন। অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত, চরণ কণ্টকাহত; নিদ্রা নাই, আহার নাই—আছে শুধু বিপুল আনন্দ।

একদা মধ্যাহ্নে রঘুনাথকে এক ভল্লুকে তাড়া করিল। রঘুনাথ ভীত হইয়া দৌড়িতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রান্ত চরণ টানিয়া লইযা বনপথে বড় বেশী দূর যাইতে পারিলেন না। সেই অপরিচিত ব্যক্তির উপদেশ সহসা মনে পড়িল; তিনি দৌড়িতে দৌড়িতে ডাকিলেন, "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আমায রক্ষা কর।" কৃষ্ণ যে সে আহ্বান শুনিতে পাইলেন, এরূপ মনে হইল না। ভল্লুক নিকটবর্ত্তী; রঘুনাথ উপায়ান্তর না দেখিয়া এক বৃক্ষোপরি উঠিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অভ্যাস নাই, পারিলেন না। তিনি সকাতরে বলিলেন, "ভল্লুক, আমায় মেরো না, আমি কৃষ্ণদর্শনে চলেছি—আমায় মেরো না। আগে তাঁকে এক-বার দেখে আসি, তা'র পর যা' হয় করো।" ভল্লুক সে প্রার্থনা যে মঞ্জুর করিল, এরূপ বুঝা গেল না; সে আক্রমণোদ্যত হইল। রঘুনাথ তখন চক্ষু মুদ্রিত করত সহায়শূন্য হইয়া ডাকিলেন, "আমি আর পারিলাম না কৃষ্ণ, তুমি যা' হয় করো।"

সহসা এক চীৎকার শুনা গেল। একটি কৃষ্ণবর্ণ বালক জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সে দেখিল, ভল্লুক একটি নিরাশ্রয় যুবককে আক্রমণোদ্যত; সে তখন তাহার কাঠের বোঝা ভল্লুকের মাথার উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া কুঠার লইয়া দাঁড়াইল। ভল্লুক দেখিল, এবার এরা দলে ভারি; সুতরাং পলায়নই বুদ্ধিমানের কার্য্য। অতি তৎপরতার সহিত ভল্লুক স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

রঘুনাথ কহিলেন, "তুমি কে ভাই, আমার জীবন রক্ষা করলে ?"

বালক। আমি ভাই বড় কাঙ্গাল ; কাঠ ভেঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তোমার চীৎকার শুনে ছুটে আসি।

রঘুনাথ। আমি ত ভাই, চীৎকার করি নি, আস্তে আস্তেই ভগবানকে ডেকেছিলাম।

বালক। তুমি কি মনে কর ভাই, খুব চেঁচিয়ে না ডাক্‌লে তোমার ভগবান্ শুনতে পান না ?

রঘুনাথ। তুমি ত আর ভগবান্ নও ভাই, তুমি কেমন ক'রে আমার ডাক শুন্‌তে পেলে ?

বালক। আমি যে তোমার খুব কাছেই ছিলাম, তুমি আমায় দেখতে পাও নি ; তুমি যে তখন চোখ বুজে ছিলে। আমার তখন বড় আনন্দ হয়েছিল।

রঘুনাথ। আনন্দ কেন ?

বালক। কি জানি ভাই, কেউ চোখ বুজে ভগবানকে ডাক্‌লে আমার ভারি আনন্দ হয়।

উভয়ে চলিতে লাগিলেন। রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথা ভাই ?"

বালক। সে দুঃখের কথা আর জিজ্ঞেস করো না ভাই ; কোথায় যে বাড়ী বলি, তা' ঠিক করতে পারছি না। আচ্ছা ভাই, যেখানে ভালবাসার লোক থাকে, সেই বাড়ী ; কেমন না ?

র। হাঁ।

বা। এখানে আমায় কেউ ভালবাসে না ; নীলাচলে আমার আপন জন আছে, আমি সেখানে চলেছি।

র। তুমি নীলাচলে যাবে ? বেশ হয়েছে, এক-সঙ্গে যাব।

বা। তুমিও যাবে ?—বেশ ! হাঁ ভাই, তোমার নাম কি ? বাড়ী কোথায় ?

র। আমার নাম রঘুনাথ, বাড়ী সপ্তগ্রামে ; না, না, নীলাচলে। যেখানে আমার প্রভু আছেন, সেইখানে আমার বাড়ী।

বা। প্রভু কে ?

র। তাঁকে চেন না ? আচ্ছা, তোমায় দেখাব ; তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

বা। শ্রীকৃষ্ণ কে ?

র। তা'ও জান না ? তিনি যে ভগবান্।

বা। কোন ভগবান্-টগবানের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় নেই ; আমি চাই আপন জন, বাপ-মা, ভাই-বোন—প্রভু-ট্রভু, দেবতা-টেবতায় আমার কাজ নেই।

র। তুমি এখনও বড় ছেলেমানুষ, ধর্ম্মজ্ঞান হয় নি। আচ্ছা ভাই, বল্‌তে পার, তোমার উপর আমার এত মায়া পড়ছে কেন ? সুন্দর ছেলে অনেক দেখিছি, কিন্তু তোমার মত এমনটা কখন দেখি নি ; তুমি কে ভাই ?

বা। আমি—আমি—আমার নাম প্রেমদাস ; লেখাপড়া জানি নে, বড় কাঙ্গাল—বড় গরীব, একটু স্নেহের আশায় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই। যে ডাকে, তা'র কাজ করি। থাকবার স্থানেরও ঠিক নেই ; লোকে বলে, আমি বড় চঞ্চল,—আচ্ছা ভাই, তুমি গান জান ?

র। ভাল জানিনে ; নিজে রচনা ক'রে চুপি চুপি নিজে গাই।

বা। আচ্ছা, একটা গান কর না ভাই।

র। আমার নিজের রচনা ? কিন্তু সে ভগবানের নাম, তোমার হয় ত ভাল লাগবে না।

বা। আচ্ছা, গাও দেখি।

রঘুনাথ গান করিলেন—

"ওগো দীন-দয়াল, আমায় তোমারি করিয়া লও,
আমার সকল কাড়িয়া আমায় কাঙ্গাল করিয়া দাও।
গর্ব্ব অভিমান, ক্রোধ দ্বেষী কাম,
সকল কাড়িয়া লয়ে আমায় তোমারি করিয়া লও।
ধন জন পদ, কামনা গৌরব,
সকলি লইয়া প্রভু, আমায় কাঙ্গাল করিয়া দাও ॥"

বালক। বাঃ, বেশ গাইতে পার ত। যদিও গান আমি ভাল বুঝতে পারলুম না, কিন্তু লাগল ভাল।

রঘু। তুমি একটা গাও না, প্রেমদাস !

বা। আমি গান কোথায় পাব ? আমি গান শুনে বেড়াই, গান আমার বেশ লাগে।

রঘু। এত গান শুনেছ, একটা মনে ক'রে বল না।

বা। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েছে, সে দিন একটা ঝাঁক্‌ড়াচুলো বনের ভিতর ব'সে গাচ্ছিল, মনে পড়েছে।

র। ঝাঁক্‌ড়াচুলো ? তুমি তা'কে দেখেছ ? আহা, সে আমার বড় উপকার করেছে। সে কে ভাই ?

বা। একটা ভবঘুরে হবে ; আজ এখানে, কাল সেখানে ; আজ এর কাজ, কাল ওর কাজ, এই ক'রে বেড়াচ্ছে। তুমি কি দিলে ?

র। আমি কিছুই দিতে পারি নি ভাই, আমার কাছে কিছু ছিল না ; শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

বা। ওরে বাপ্ রে ! এতটা দিয়ে ফেলেছ ?

আমি হ'লে কৃতজ্ঞতা ছুড়ে ফেলে রেগে গরগর ক'রে চ'লে যেতাম।

র। তবে তুমি কি চাও ভাই?

বা। বলেছি ত, আমি চাই ভালবাসা।

র। সে ত তুমি না চাইতেই পাও।

বা। না, পাই না। লোকে নিজেকেই ভালবাসে।

র। আচ্ছা, এখন পাও।

প্রেমদাস গান ধরিলেন—

তুমি আসিবে বলিয়া, রেখেছি খুলিয়া,
আমার হৃদয়-দুয়ার।
আমি কত কাজে রত, আমার আছে কত শত,
তবু তোমারে ভাবি অনিবার।
আমি আপন বিলায়ে, তোমায় সকলি দিয়ে,
চিরতরে হয়েছি তোমার।
আমি কত ডাকি তোমায়, কত সাধি হে তোমায়,
তবু তুমি না হও আমার॥

রঘুনাথ। বাঃ, বেশ গান ভাই, কিন্তু ভাব বুঝতে পারলুম না।

বালক। তুমিও বুঝি আমার মত মুখ্‌খু?

রঘুনাথ। আমি মূর্খ কেন হব? আমি লেখাপড়া জানি।

বালক। আমি কিন্তু ভাই, মুখ্‌খু'কে বড় ভালবাসি। যে পুঁথি নিয়ে বিদ্যের অহঙ্কার করে, তা'র কাছ হ'তে আমি স'রে দাঁড়াই। আমি ভাই চল্লুম, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া হ'ল না।

বালক ছুটিয়া পলাইল। রঘুনাথ পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে ডাকিলেন, "ফিরে এস প্রেমদাস, আর আমি বিদ্যার কথা বলব না—আমি মূর্খ—তোমার চেয়ে মূর্খ—আমায় ফেলে যেও না।"

বালক ফিরিল না, সত্বর অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

সম্মিলন ও বিদায়।

রঘুনাথ আঠারো দিনের পথ বারো দিনে অতিক্রম করিয়া নীলাচলে আসিলেন। এই বারো দিনের মধ্যে তিন দিন তাঁহার আহার জুটিয়াছিল। যখন নীলাচলে প্রভুর সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার। প্রভু রঘুনাথকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দান করিলেন; রঘুনাথের অঙ্গ জুড়াইয়া গেল—তাঁহার সকল কষ্টের অবসান হইল।

রঘুনাথ সমুদ্রস্নানে চলিয়াছেন; কিন্তু হরিদাসের পদ-বন্দনা না করিয়া যাইতে পারেন না। তাঁহার আশ্রমে আসিয়া দেখিলেন, হরিদাস এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। এই অপরিচিত ব্যক্তি সনাতন। রঘুনাথ দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিতেছিলেন, "তোমার মত জ্ঞানী ও পণ্ডিতের নিকট এ কথা শুনব প্রত্যাশা করি নি, সনাতন ঠাকুর।"

সনাতন। প্রেম কি এতই দুর্লভ?

হরিদাস। হাঁ, এতই দুর্লভ। শিখি মহাতি বা রামানন্দ রায়ের কথা যে উল্লেখ করিলে, আমার বিবেচনায় তাঁহারাও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন নাই।

সনাতন। তবে কি জগতে কেহই কৃষ্ণপ্রেম পান নাই?

হরিদাস। বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কেহই পান নাই। প্রেম কা'কে বলে প্রভু তাহা আচরণ করিয়া জীবকে দেখাইতেছেন, পরে আরও দেখাইবেন।

সনাতন। গোপীদের অনুরাগও কি প্রেম নহে?

হরিদাস। তাঁহাদের অনুরাগই প্রেম, আর তোমার আমার অনুরাগ প্রেম নয়। গীতায় বা গীতাধর্ম্মাশ্রয়ীর হৃদয়ে প্রেম নাই। প্রেমের কথা শুধু শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে।

সনাতন উত্তর করিলেন না, নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে রঘুনাথ অগ্রসর হইয়া হরিদাসের চরণে প্রণত হইলেন। হরিদাস তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং সনাতনের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। নাম শুনিবামাত্র রঘুনাথ তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন। বলিলেন, "আপনি আমার আদর্শ, নিত্য-পূজ্য, আজ বহু সৌভাগ্যে আপনার চরণধূলি মাথায় ধরিতে পাইলাম।" সনাতন আলিঙ্গনদানে রঘুনাথকে কৃতার্থ করিলেন।

পথের পরিচয় দিতে দিতে রঘুনাথ কহিলেন, "জঙ্গলের ভিতর এক বালক অদ্ভুত উপায়ে আমার জীবনরক্ষা করিয়াছে।"

হরি। কি রকম?

রঘু। এক ভল্লুক আমায় তাড়া করেছিল; আমি কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে ছুটিতে লাগিলাম। যখন ছুটিতে আর পারিলাম না, তখন কৃষ্ণের উপর সমস্ত নির্ভর ক'রে আমি মুদ্রিত-নয়নে ভল্লুকের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ভল্লুক না এসে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে এক বালক এল! বালকের তাড়নায় ভল্লুক পালাল।

হরি। বালকটি দেখতে কেমন ?

রঘু। অতি সুন্দর—কৃষ্ণবর্ণ। দেখ্‌লেই ভালবাসতে ইচ্ছা হয়।

হরি। বাড়ী কোথায় বল্‌লেন ?

রঘু। বল্‌লে, বাড়ীর কোন ঠিকানা নেই; যেখানে ভালবাসার লোক থাকে, সেইখানেই তা'র বাড়ী। আরও বল্‌লে, নীলাচলে তা'র ভালবাসার লোক আছে; নীলাচলে আমার সঙ্গে তাই আস্‌ছল।

হরি। এলেন না কেন ?

রঘু। আসছিল; আমি যেমনি বিদ্যার গর্ব্ব করেছি, আর অমনি ছুটে পালাল; বললে, পণ্ডিতের কাছে সে থাকে না।

হরিদাস নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার আঁখি বহিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল; অঙ্গে পুলক দৃষ্ট হইল, দেহ শীতে সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। ক্ষণমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া জড়িতকণ্ঠে কহিলেন, "রঘুনাথ, ত্রিভুবনের নিধিকে তুমি পেয়েও ছেড়েছ। কাছে পেয়েও চিন্‌তে পারূলে না ? তোমারই বা অপরাধ কি ? তিনি কৃপা না করূলে ব্রহ্মারও সাধ্য নাই তাঁহাকে চিনে উঠেন।"

রঘুনাথ স্তম্ভিত হইলেন; অবশেষে ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যে গান বালক গাইয়াছিলেন, সে গানের অর্থও ক্রমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। দুঃখে অনুতাপে রঘুনাথ দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে রঘুনাথের জ্বর হইল; তা' হইবারই কথা। পথশ্রম, উপবাস, মানসিক উদ্বেগ, সুখের দেহ সহ্য করিতে পারিল না। অষ্টাহ লঙ্ঘনের পর রাত্রিশেষে জ্বরত্যাগ হইল; তখন তাঁহার অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হইল, কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিতে পারেন না। তখন মনে মনে প্রভুর জন্য রন্ধন আরম্ভ করিলেন। সূক্ষ্ম তণ্ডুল সংগ্রহ করিলেন, নানাবিধ শাক সংগ্রহ করিয়া সুখে রন্ধন করিলেন এবং সুগন্ধ চাউলের পায়সান্ন রাঁধিয়া প্রভুর জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। তা'র পর মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে সুখে বসাইলেন এবং তাঁহাকে আকণ্ঠ পূরিয়া খাওয়াইলেন।

মধ্যাহ্নে স্বরূপ দামোদর আসিয়া রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি অসময়ে প্রভুকে ভোগ দিয়াছ ?"

রঘু। কই, আমি ত শয্যায় প'ড়ে আছি, স্নানও করি নি।

স্বরূপ। প্রভু বলছেন, তাঁর অজীর্ণ হয়েছে, তোমার রন্ধন নাকি উত্তম হয়েছিল।

রঘু। আমি কখন্ রাঁধিলাম ?

স্বরূপ। তা' জানি নে; তুমি এত রকম শাক রেঁধেছিলে যে, প্রভু লোভে প'ড়ে সব খেয়েছিলেন, কিন্তু শেষে সহ্য করতে পার্‌লেন না। তা'র উপর আবার অসময়ে নূতন গুড়ের পায়স।

রঘু। ওঃ, হয়েছে। ও আমার প্রভু, তুমি খেয়েছ ? দয়াল আমার, এ কাঙ্গালের উপর এত কৃপা !

রঘুনাথ ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বরূপ চমৎকৃত হইলেন। রঘুনাথের তখন আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, প্রভুকে দর্শন করিতে ছুটিলেন।

রথযাত্রা সন্নিকট। গৌড় হইতে ভক্তেরা আসিয়াছেন। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় দুইশত হইবেন; নীলাচলের ভক্তও বড় কম নয়। সকলে সচল জগন্নাথকে দেখিতে আসিয়াছেন, অচলকে দেখিতে বড় কেহ ব্যাকুল নহেন। অচলের রথযাত্রা উপলক্ষ্য মাত্র।

প্রথম যাত্রার দিন প্রভাতে ভৃত্য রঘুয়া আসিয়া হরিদাসকে কহিল, "প্রভু আপনাদের ডাকছেন, তিনি রথের আগে দাঁড়িয়ে আছেন।"

হরিদাস ও সনাতন ছুটিয়া চলিলেন। মন্দিরের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলেন, বিষম জনতা। প্রভু রথাগ্রে সপার্ষদ দণ্ডায়মান। হরিদাস ও সনাতন নিজেদের অস্পৃশ্য মনে করিতেন, লোকের সংস্পর্শে আসিতে সঙ্কুচিত হইতেন। কিন্তু আজ প্রভুর আজ্ঞায় আসিতে হইল। উভয়ে প্রভুর চরণবন্দনা করিলেন, প্রভু সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহাদের গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তোমরা জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর, মন্দিরে গিয়া দর্শনের সুযোগ তোমাদের ঘটে নাই। রথে জগন্নাথ দর্শন করিলে আর জন্ম হয় না। দেখিয়া জন্ম সার্থক কর।"

উভয়ে প্রভুকেই দর্শন করিতে লাগিলেন, যেন কত কাল, কত যুগ তাঁহাকে দেখেন নাই। প্রভু কহিলেন, "জগন্নাথ দেবকে দর্শন কর।"

সনাতন উত্তর করিলেন, "এই ত দেখিতেছি প্রভু; জগন্নাথ আমার সম্মুখে—"

প্রভু পিছন ফিরিলেন।

রথ চলিতে লাগিল। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র রথের আগে আগে সুবর্ণ-মার্জ্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতে করিতে মার্জ্জিত পথের উপর চন্দনের জল ছিটাইতে ছিটাইতে চলিলেন। প্রভু তাঁহার নিজগণকে মালা-চন্দন দিয়া শক্তিসম্পন্ন করিলেন; পরে

তাঁহাদিগকে লইয়া সাতটি কীর্ত্তন সম্প্রদায় গঠিত করিলেন। তাঁহারা গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে রথের আগু পিছু চলিলেন। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই নাচিয়া নাচিয়া জীবন দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঁই করেন বিলাস॥
সবে কহে প্রভু আছে এই সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঁই নাহি যায় আমার মায়ায়॥ *

এইরূপে রথযাত্রা সমাপ্ত হইল; ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস, দোলযাত্রা, একে একে সব পর্ব্বই শেষ হইল। সনাতনের বিদায়ের সময় আসিল। সকলেরই মন অবসন্ন; সকলেই জানেন, সনাতনের এই শেষ বিদায়। প্রভু তাঁহাকে প্রায় এক বৎসর কাছে রাখিয়া শিক্ষা ও শক্তি দিয়াছেন। যে শরাসন হইতে নিত্যানন্দরূপ দিব্যাস্ত্র বঙ্গের তমোরাশি বিনাশ করিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই শরাসন হইতে সনাতনরূপ ব্রহ্মাস্ত্র বৃন্দাবনের অন্ধকাররাশি ধ্বংস করিতে নিক্ষিপ্ত হইল। সহসা হইলেন, পঞ্চরথী। †

বিদায়ের পূর্ব্বে সনাতন, হরিদাসকে বলিতেছিলেন, "তুমি সত্বর দেহ রাখিবে বুঝিলাম; তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা।"

হরি। এই দেহ নিয়ে তোমার সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ, কিন্তু বৃন্দাবনে তুমি আমার দর্শন পাবে।

সনা। প্রভু আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছেন বটে, কিন্তু আমি একা সে জঙ্গলে গিয়ে কি করব?

হরি। তুমি সেখানে একা পড়্‌বে না, তোমাকে সাহায্য করতে আরও অনেকে যাবেন। প্রভু অস্ত্রে শাণ দিচ্ছেন।

সনা। অস্ত্র? আর কই?

হরি। রূপকে পেয়েছ, ক্রমে আরও পাবে; এই রঘুনাথই এক দিন যাবেন।

বলিতে বলিতে রঘুনাথ সমুপস্থিত হইলেন। তিনি উভয়ের চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় যাব হরিদাস ঠাকুর?"

হরি। এই শ্রীবৃন্দাবনে।

রঘু। প্রভু বলেছেন, আমি তাঁরই কাছে থাক্‌ব।

হরি। আপাততঃ বটে।

রঘু। তা'র পর?

হরি। তা'র পর সনাতনের কাছে থাক্‌বে।

রঘুয়া আসিয়া সংবাদ দিল প্রভু আসিতেছেন। হরিদাস প্রভৃতি অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। প্রভু সপার্ষদ পিঁড়ার উপর উপবেশন করিলেন। প্রভুর বদন বিষাদাচ্ছন্ন, সুতরাং ভক্তদেরও মুখ মলিন। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তোমায় বিদায় দিতে আমার প্রাণ ছিঁড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু উপায় কি? জীব উদ্ধার কিরূপে হইবে? তুমি যদি না যাও, আমাকে যাইতে হয়।"

সনাতন। ইচ্ছাময়, জীব উদ্ধার মুহূর্ত্তে হয়।

প্রভু। কিরূপে সনাতন?

সনা। তুমি জীবের সমুদয় পাপ আমাকে দেও, আমি তাদের সকল পাপ নিয়ে অনন্তকাল নরক ভোগ করি; তা হ'লে তোমার জীব সহজে উদ্ধার হয়। ইচ্ছাময়, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

প্রভু। তুমি নরকে দুঃখ পেলে সে দুঃখ কি আমার প্রাণে লাগ্‌বে না, সনাতন?

সনা। সে দুঃখ আমি অম্লানবদনে সহ্য করব, কিন্তু তুমি যে জীব উদ্ধারের জন্য পাহাড়-জঙ্গলে পদব্রজে অনশনে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াবে, তা আমি সহ্য করতে পারব না। তোমার চরণতলে একটি তৃণের আঘাত লাগলে আমার যে কোটিকল্প নরক-যন্ত্রণার চেয়েও বেশী লাগ্‌বে প্রভু।

প্রভুর নয়ন হইতে ঝর-ঝর করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। সনাতন যুক্তকরে প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। তাঁহার ক্লিষ্ট বদন দেখিয়া সকলেরই চোখে জল আসিল। ক্ষণমধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রভু কহিলেন, "সনাতন, জীব উদ্ধারের জন্যেই তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইতেছি, কৃষ্ণনামে আমি বিহ্বল হইয়া পড়ি, অন্য কোথাও যাইবার আমার শক্তি নাই; জীবনের অবশিষ্ট কাল জগন্নাথের চরণতলে কাটাইব বাসনা করিয়াছি।"

সনাতন। প্রভু, আমি প্রফুল্ল অন্তরে নির্ব্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলাম। বুঝিয়াছি, শ্রীচরণ-দর্শন আর আমার ভাগ্যে নাই।

প্রভু। আমার মন তোমারই সঙ্গে যাইবে সনাতন; তুমি যখনই আমাকে ডাকিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে।

সনা। তবে আর কিছু চাই না প্রভু, যথেষ্ট আমাকে দিলে। যদি অনুমতি হয়, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

প্রভু। কি কথা সনাতন?

সনা। কাশীধামে আপনার ক্রোড়ে এক মহাপুরুষকে দেখিয়াছিলাম, তিনি আমার চিত্তকে অধিকার করিয়া আমাকে বড় ব্যাকুল করিয়া

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
† রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, শ্রীরূপ, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস

তুলিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি সেই মহাপুরুষের পরিচয় অবগত নই।

প্রভু। তুমি কি তাঁকে আবার দেখেছ?

সনা। ঠিক দেখি নি, গান শুনেছি। বৃন্দাবন হ'তে আসবার পথে এক দিন আমি বনের ভিতর অন্ধকারে পথ হারিয়ে বড় বিপাকে পড়েছিলাম, তিনি গান গাইতে গাইতে এসে আমাকে সাহস দিলেন। আমি কণ্ঠস্বরে তাঁহাকে চিনেছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে দর্শন দিলেন না।

প্রভু। তিনি সত্যই এক মহাপুরুষ; অনেক দিন হ'ল তিনি পার্থিব দেহ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু অন্য ব্যক্তির পার্থিব দেহ আশ্রয় ক'রে মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়ে থাকেন। জীবের উদ্ধারই এই সব মহাপুরুষদের ব্রত; ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, আর বিপদ্ দেখলে সাধ্যমত সাহায্য করেন। এই মহাপুরুষ, রঘুনাথকে সাহায্য না করলে রঘুনাথ আজ গৃহের বাহির হ'তে পারতেন না। যে দেহ তুমি বা রঘুনাথ দেখেছ, সে দেহ তাঁহার প্রকৃত দেহ নয়*।

ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিলেন, সে দেহধারী কে; কিন্তু সনাতন বা রঘুনাথ কিছুই বুঝিলেন না—তাঁহারা প্রভুর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমরা তাঁহার নাম শুনিয়া থাকিবে—তিনি আমার গুরুর গুরু—মহাভক্ত মাধবেন্দ্র পুরী। তিনি দয়া ক'রে একবারমাত্র আমায় দর্শন দিয়েছিলেন। আর কি তাঁর কৃপা হবে?"

তা'র পর বিদায়ের পালা। প্রভু সনাতনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাঁদিলেন। প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সনাতন, ভক্তদের চরণ-বন্দনা করিলেন। পরে নীলাচল ত্যাগ করিয়া ধীরপদে চলিলেন। তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে রঘুয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে একটি দণ্ড ও একটি করঙ্ক প্রদান করিল। পরে সনাতনের চরণধূলি মাথায় লইয়া কাতর-মুখে তাঁহার পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সনাতন তাহাকে বক্ষে লইয়া সাদরে বলিলেন, "রঘুয়া, কেঁদো না, তোমাতে আমাতে শীঘ্রই আবার দেখা হবে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

সনাতন—বৃন্দাবনে

লোকনাথ ও ভূগর্ভ বৃন্দাবনে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছেন। যমুনা-তীরে চিরঘাটে তাঁহাদের আশ্রম। দুইজনে একত্রে গৌড় হ'তে বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। সে অনেক দিনের কথা; বৃন্দাবন তখন জঙ্গলাবৃত। প্রভুর আদেশ ছিল, চিরঘাটে বাস করিতে; কিন্তু চিরঘাটই তাঁহারা খুঁজিয়া পান না। স্থানীয় লোকেরাও তাঁহাদের কিছু বলিতে পারিল না। অবশেষে এক অর্দ্ধোন্মাদের নিকট তাঁহারা চিরঘাটের সন্ধান পাইলেন; তখন তাঁহারা দুইখানি কুটীর পাশাপাশি বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

একদা অপরাহ্ণে ঘাটের উপর বসিয়া লোকনাথ গোস্বামী বলিতেছিলেন, "আমাদের কি দুর্ভাগ্য বল দেখি ভূগর্ভ! আজ নয় বৎসর প্রভুর প্রতীক্ষায় এখানে ব'সে আছি, অথচ প্রভুর দর্শন পেলাম না! প্রভুকে খুঁজতে আমরা যেমন দাক্ষিণাত্যে গেছি, আর প্রভু অমনি বৃন্দাবনে এলেন! কি দুর্ভাগ্য!

ভূগর্ভ। প্রভুর দর্শন দিতে ইচ্ছা না হ'লে কোথা হ'তে দর্শন পাবে? ত্রিভুবন ঘুরলেও তাঁর দেখা পাবে না।

লোকনাথ। কেন, আমাদের অপরাধ কি? প্রভু বললেন, লোকনাথ, বৃন্দাবনে যাও, আমি দু'মাস পরে সন্ন্যাস নিয়ে যাচ্ছি। যেমন বললেন, অমনি চ'লে এলুম। পথে কত বিঘ্ন, চারিদিকে লড়াই; কোন বাধা না মেনে, কত পথ ঘুরে এখানে এসে দেখি, সব জঙ্গল, আমাদের বাঙ্গালা দেশের মানুষ একটিও নেই—সব ব্রজবাসী; ভাষাও বুঝি নে, বুলিও জানি নে। তুমি সঙ্গে না থাকলে আমায় ফিরে যেতে হ'ত।

ভূগর্ভ। আচ্ছা, অদূরে একটা লোক দেখছি না? আমাদের দেশের মানুষ ব'লে মনে হ'চ্ছে। কি সুন্দর পুরুষ!

লোকনাথ। কি প্রেমময়! কি স্নিগ্ধ দৃষ্টি! মুখখানি যেন প্রণয়াকুল।

আগন্তুক নিকটে আসিয়া উভয়কে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও নমস্কারান্তে অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুক একখানি প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলে লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দেশ হ'তে কোন্ কার্য্যের জন্যে এখানে আগমন হয়েছে?"

"আপাততঃ নীলাচল হ'তে আসছি। কোন্

কার্য্যের জন্যে, তা' জানি নে ; প্রভু পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি।"

"প্রভু? প্রভু পাঠিয়েছেন? কোথায় প্রভু?"

"নীলাচলে।"

"হায়, হায়, আমরা তাঁর দর্শন পেলাম না।"

ভূগর্ভ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম?"

"দাসের নাম সনাতন।"

লোকনাথ। আপনি সেই মহাপুরুষ? আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নি

সনাতন। আমি আপনাদের দাসানুদাস।

লোকনাথ। আপনার দৈন্য আপনাকে এত বড় করিয়াছে।

সনাতন। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। রূপ কোথায়?

লোকনাথ। তিনি বৃন্দাবনেই আছেন।

সনাতন উঠিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প, একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবেন না—এক ব্যক্তির সহিত বেশীক্ষণ আলাপাদি করিবেন না—গ্রাম্য কথায় কালক্ষেপ করিবেন না। সনাতন যমুনাকে বন্দনা করিয়া পবিত্র সলিলে নামিলেন এবং স্নানান্তে এক বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে দিন লোকনাথ ভিক্ষা দিলেন। পরদিবস প্রভাতে উঠিয়া সনাতন জঙ্গলে শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া বাজারে তাহা বিক্রয় করিলেন। যাহা কিছু আহরণার্থে বহির্গত হইলেন এবং মাথায় করিয়া কাষ্ঠ পাইলেন, তদ্দ্বারা আহার্য্য ক্রয় করিলেন, নিজের জন্যে যৎসামান্য রাখিয়া ভূরিভাগ দরিদ্র ক্ষুধাতুরকে দান করিলেন। সে দিবস অন্য এক তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুই রাত্রি এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইবেন না, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প—পাছে বৃক্ষের উপর মায়া পড়ে। তাঁহার আহারের পাত্র বৃক্ষপত্র, জলপাত্র হস্তযুগ, শয্যা পৃথিবী, সম্বল ছিন্ন কন্থা, আশ্রয় বৃক্ষতল। এইরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া গৌড়-রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স সাঁইত্রিশ বৎসর মাত্র।

একদা মধ্যাহ্নে এক বৃদ্ধ ব্রজবাসী, সনাতনের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। সনাতন ক্ষণপূর্ব্বে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া ফিরিয়াছেন ; বলিলেন, "আপনি এই বৃক্ষতলে একটু বিশ্রাম লউন, আমি সত্বর আসিতেছি" বলিয়া তিনি কাঠের বোঝা মাথায় লইয়া বাজারের দিকে ছুটিলেন ; এবং অনতিবিলম্বে কাষ্ঠবিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা আহার্য্য ক্রয় করিয়া আনিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রজবাসী অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন ; যখন রন্ধন প্রায় সমাপ্ত, তখন ব্রজবাসী উঠিলেন ; বলিলেন, "অন্য-স্থানে চেষ্টা দেখি গে, অপরাহ্ণ হয়ে এল।"

সনাতনের মুখ মলিন হইয়া গেল ; তিনি যুক্তকরে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আর একটু অপেক্ষা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে।"

ব্রজবাসী। তুমি বৃন্দাবনে কি করতে এসেছ বাবা?

সনাতন। তা' জানি নে ; প্রভু পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি।

ব্রজ। তিনি কি তোমায় কাঠ কাটতে এ দেশে পাঠিয়েছেন বাবা?

সনা। না।

ব্রজ। বাজার করা, কাঠ বেচা, হিসাব করা, এ সব কাজের জন্যেও যে পাঠিয়েছেন, তা'ও ত আমার মনে লাগে না।

সনাতন অধোমুখে নীরব রহিলেন।

ব্রজবাসী কহিলেন, "আর দেখ বাবা, রন্ধনও শয়ন তোমার দেশে থেকেও চলত বলে মনে হয়।"

রোরুদ্যমান সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি করতে হবে, উপদেশ দিন্।"

ব্রজবাসী যাইতে যাইতে বলিলেন, "আমি উপদেশের কি জানি বাবা?"

সনাতন সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমি তোমায় চিনেছি মহাপুরুষ, তুমি সেই দেবতা মাধবেন্দ্রপুরী। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমায় উপদেশ দিয়ে যাও—"

"জপ করিতে করিতে নিজেই সব জানিতে পারিবে, উপদেশের প্রয়োজন হইবে না।"

ব্রজবাসী সত্বর বনান্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

সনাতন সজল-নয়নে ফিরিয়া আসিয়া প্রস্তুত অন্ন যমুনার জলে ঢালিয়া দিলেন। তা'র পর আহারের জন্য মাধুকরী আরম্ভ করিলেন ; ভিক্ষার্থে এক দিনে দুই গৃহস্থের বাড়ী যাইতেন না! যাহা জুটিত, তাহাতেই তৃপ্ত। তরুতল ছাড়িয়া যমুনার তীরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিলেন। মৃন্ময় জলপাত্র ও রন্ধনপাত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন, এবং দিবা-রাত্রের মধ্যে চারিদণ্ড মাত্র আহার ও নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া অবশিষ্টাংশ জপ ও গানে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর এইরূপে গড়াইয়া চলিল। প্রভু তখন অপ্রকট, হরিদাস দেহ রাখিয়াছেন। শ্রীরূপ ও অনুপের পুত্র শ্রীজীব বৃন্দাবনে স্বতন্ত্র কুটীর উঠাইয়া বাস

করিতেছেন। গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি প্রভুর বহু ভক্ত বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। বৃন্দাবন তখন আর সে জঙ্গলময় বৃন্দাবন নয়,—চারিদিকে সর্ব্বশোভাময় মন্দির—ভক্তকণ্ঠোচ্চারিত কৃষ্ণনামে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত। সনাতন এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কর্ত্তা—শ্রীবৃন্দাবনের রাজা, তিনি এক্ষণে বৃদ্ধ।

সনাতন একদা প্রভাতে যমুনায় স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, একটি স্পর্শমণি স্বল্পজলে পতিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা স্পর্শ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। মণিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই, অপরেও লোভ করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। বিষয়ী লোক বৃন্দাবনে নাই, থাকিলে তাহাকে মণির সন্ধান দিতে পারিতেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে এক টুক্‌রা খাপ্‌রা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা মণি উঠাইলেন এবং তীরের উপর বালুকার নিম্নে তাহাকে প্রোথিত করিলেন।

স্নান-পূজা সমাপন করিয়া দীর্ঘকাল পরে যখন তিনি তীরে উঠিলেন, তখন এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আসিয়া সনাতনের চরণে দণ্ডবৎ হইলেন। সনাতন বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আমার নমস্ত—আমাকে অপরাধী করিবেন না।"

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি সনাতন গোঁসাই?"

সনাতন করযোড়ে কহিলেন, "আমাকে আপনার দাস বলিয়া জানিবেন; আমার দ্বারা কি হইতে পারে, আজ্ঞা করুন।"

ব্রাহ্মণ। বলিতেছি; আগে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন। আমার নাম জীবন, বাস বর্দ্ধমানের নিকট মানকরে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, চরিত্রদোষে তাহা নষ্ট করিয়াছি। স্ত্রীর গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি কাশীধামে আসি এবং অর্থ-কামনায় বিশ্বেশ্বরের আরাধনা করি। বিশ্বনাথ প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন যে, আপনার নিকট আসিলে অর্থ পাইব। তাই অর্থ-প্রাপ্তির আশায় আপনার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি।

সনাতন। আমি অর্থ কোথা পাইব, আমি ভিক্ষাজীবী, এক কপর্দ্দকেরও সম্বল আমার নাই।

ব্রাহ্মণ। আপনি আমাকে প্রতারণা করিবেন না।

সনাতন। প্রতারণা ত করিনি ব্রাহ্মণ! আমার কুটীরে চল, তথায় আমার যা কিছু আছে, তুমি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পার।

ব্রাহ্মণ তখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল—

"হা হা মোর ভাগ্যে কি ঈশ্বর প্রতারিল,
কিংবা মুঞি স্বপন বা প্রলাপ দেখিল।"*

তখন সহসা সনাতনের মনে পড়িল, তিনি ক্ষণপূর্ব্বে একখণ্ড স্পর্শমণি মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্মরণ হইবামাত্র তিনি বলিলেন, "রোদন সম্বরণ কর ব্রাহ্মণ; মহাদেব তোমায় প্রতারণা করেন নি; আমার স্মরণ হয়েছে, মৃত্তিকামধ্যে একখানি স্পর্শমণি ক্ষণপূর্ব্বে আমি রেখেছি—তুমি তাহা খনন ক'রে লও।"

ব্রাহ্মণ। স্পর্শমণি? যা'র স্পর্শে লৌহ স্বর্ণ হয়? কই, কোথায় সে মণি? দেও, দেও আমাকে।

সনা। ওই স্থানে মাটী খুঁড়ে দেখ, আমি তা' স্পর্শ করিব না।

ব্রাহ্ম। এত মাটী খুঁড়লাম, কই, মণি ত পাচ্ছি না। তুমি একবার দেখ।

সনা। আমি স্নান করেছি, মণি স্পর্শ করব না, দেখবও না। তুমি ভাল ক'রে দেখ, ঐখানেই কোথায় আছে।

ব্রাহ্ম। এই যে মণি! বাঃ, কি উজ্জ্বল! আমি এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী। ধন্য মহাদেব। চল্লুম গোঁসাই।

অভিবাদন করিবারও আর অবসর হইল না, তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। সনাতন চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণের আনন্দ দেখিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, মণি ত পেলাম; কিন্তু ভিক্ষাজীবী দরিদ্র গোঁসাই এমন অমূল্য ধন আমায় দিলে কেন? প্রতারণা করে নি ত? পরখ্ ক'রে দেখাই যাক্ না। এই যে আমার হাতেই মাদুলী আছে; বাঃ, স্পর্শমাত্রেই সোনা! না, ঠকায় নি। কিন্তু—কিন্তু দিলে কেন? যে রত্ন বাদশার ভাণ্ডারে নেই, সে রত্ন দিলে কেন? নিজে রাখ্‌লেই ত পারত!

'রাখিবার কায থাকুক স্পর্শ নাহি করে
স্পর্শের থাকুক কায ঘৃণায় না হেরে।'

মণির চেয়ে কোন বড় জিনিস নিশ্চয় গোঁসাই পেয়েছেন আমিও কেন সেই বস্তুর কামনা করি না? দেখ্‌ছি ঠাকুরের কাছে যা' কামনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়; ধন চেয়েছিলাম, তিনি ঢেলে দিলেন। এবার তাঁকে চেয়ে দেখি না? ছি ছি, আমি তুচ্ছ বস্তুর এতটা লোভ করেছিলাম। দূর হও

* ভক্তমাল।

মণি, আমি আর তোমায় চাই না। গোসাই, গোসাই, (মণি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া) আমি তোমার ও তুচ্ছ মণি চাই না—আমি সেই মণির মণি নীলকান্তমণিকে চাই—আমায় কৃপা কর।"

সনাতন তখন সেই ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মনমোহনিয়া

এই মণির কথা দিল্লীর নবীন সম্রাট্ আকবর শা শুনিলেন। তাঁহার লোভ গর্জ্জিয়া উঠিল; যমুনার গর্ভ হইতে মণি উদ্ধার করিবার মানসে তিনি স্বয়ং আসিলেন। আর যে ব্যক্তি এই মহামূল্য রত্নকে তুচ্ছ করিয়া স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিয়াছে, সেই ভিক্ষাজীবী সনাতন গোস্বামীকে দেখিবার বাসনাও যে তাঁহার অন্তরে ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি সৈন্যাদি লইয়া বৃন্দাবনের বাহিরে শিবির সংস্থাপন করিলেন।

অনেক ডুবুরী যমুনায় নামিল, কিন্তু মণি পাইল না। অবশেষে হাতী নামান হইল। তাহাদের পায় লোহার শিকল; একটা হাতীর শিকল সোণা হইয়া গেল, কিন্তু মণির সন্ধান হইল না। যমুনার জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল, তখন বাদশা নিরস্ত হইলেন।

বাদশা, সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিতে আসিলেন। সনাতন বিষয়ী লোকের মুখদর্শন করেন না, বা তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন না। সম্রাট আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, সনাতন অবনতবদনে মৃত্তিকাপানে চাহিয়া প্রভুর চরণধ্যান করিতে লাগিলেন। বাদশা কুর্ণিশ করিলেন, সনাতন নিস্পন্দ রহিলেন। বাদশা তবিয়তের হাল জিজ্ঞাসা করিলেন, সনাতন নীরব রহিলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কোনও প্রার্থনা আছে?"

সনাতন নিরুত্তর।

বাদশা। আমি দিল্লীর বাদশা, আমার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য অসীম; আমার নিকট আপনি কি চান?

সনাতন বাক্‌শূন্য।

বাদশা। আমার নিকট আপনার কি কিছুই চাইবার নেই?

সনাতন নিস্তব্ধ।

বাদশা (সকাতরে)। আপনার জন্যে আমি কিছু করতে চাই, দয়া ক'রে আমায় সে অধিকারটুকু দিন্।

সনাতন এবার কথা কহিলেন, কিন্তু মাথা তুলিলেন না; বলিলেন, "আপনার যদি এতই কৃপা, তবে আমার আশ্রমের ধারটুকু বাঁধিয়ে দিন—নদীর জলে দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে।"

বাদশা কৃতার্থ হইলেন। তখনই তাঁহার সম্মুখে কার্য্য আরম্ভ হইল। শত শত লোক মাটী তুলিতে প্রবৃত্ত হইল; যে সব মৃত্তিকা যমুনার তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, সেই সব মৃত্তিকা তুলিয়া আশ্রমে ফেলিতে লাগিল। বাদশা প্রভৃতি সকলে বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, সেই সব মৃত্তিকা মণিমুক্তাময়। কত দুষ্প্রাপ্য মহামূল্য মণি সেই মৃত্তিকামধ্যে নিহিত রহিযাছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাদশা বুঝিলেন, সনাতনের ইচ্ছায় এই সব মণি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হইয়াছে। তখন ভারতের সদাশয় সম্রাট্ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সনাতনকে বলিলেন, "আমার শিক্ষা হয়েছে, আমার গর্ব্ব চূর্ণ হয়েছে—আমায ক্ষমা করুন। আপনি যা' পেযেছেন, তা'র তুলনায পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য অতি সামান্য; আর আপনার তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র। এক্ষণে বিদায় নিলাম—বিরক্ত করিতে আমি বা আমার লোকেরা আর আসবে না।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সনাতন মাধুকরী করিতেন; কিন্তু এক গৃহে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করিতে যাওয়া তিনি উচিত বিবেচনা করিতেন না। তাই নিকটবর্ত্তী গ্রামে মধ্যে মধ্যে যাইতেন, কখন কখন বা সুদূর মথুরাতেও যাইতেন। এক দিন মথুরানগরে মথুরা-প্রসাদ চৌবের গৃহে মাধুকরী করিতে গিয়াছেন। গিয়া দেখিলেন, তথায় মনমোহনিয়া মদনমোহন বিগ্রহ রহিয়াছেন কিন্তু বড় অনাচারে ঠাকুরের সেবা হয়। সেবা যে হয়, তা'ও ঠিক নয। চৌবের ছেলেরা যখন আহারাদি করে, ঠাকুরকেও তখন সেই সঙ্গে কিছু দেওয়া হয। ঠাকুরের জন্য স্বতন্ত্র রন্ধন বা আয়োজন কিছুই করা হয না। ফুল তুলসী ঠাকুর যে কখন পাইয়াছেন, এরূপ কোন চিহ্ন সনাতন দেখিলেন না। চৌবে-নন্দনেরা যখন স্নান করে, ঠাকুরকেও সেই সঙ্গে স্নান করান হয়। এই প্রকার অনেক অনাচার দেখিয়া সনাতন অত্যন্ত ক্লেশানুভব করিলেন। চৌবে-গৃহিণীকে কহিলেন, "মা, ঠাকুরের তেমন যত্ন হয় না।"

চৌ-গৃ। কি করব বাবা, আমার যতটুকু সাধ্য, আমি ততটুকু করি।

সনা। ঠাকুরকে অনাচারে রাখ কেন?

চৌ-গৃ। আচার করতে গেলে বেলা হয়ে যায়; একা মানুষ, আমাকে সব দিক্ দেখ্‌তে হয় ত।

সনা। ছেলেদের উচ্ছিষ্ট ঠাকুরকে খাওয়ায় না কি?

চৌ-গৃ। উচ্ছিষ্ট ঠিক খেতে দিই নে; তবে সব ছেলে একত্র ব'সে খায়।

সনা। মদনমোহনকে আগে দিলেই ত পার।

চৌ-গৃ। না বাবা, তা' হয় না; মনুমোহনিঞা ছেলেদের ফেলে খাবে না, ছেলেরাও তা'কে ফেলে খাবে না। ছেলেরা কি কেউ কথা শোনে! মোহনিঞাকে যদি আগে দি, ছেলেরাই হয় ত কেড়ে খেয়ে নেবে। বাবা, আমার জ্বালা কি কম!

সনা। আচ্ছা মা, মোহনিঞার পূজা কর না কেন?

চৌ-গৃ। কা'র পূজা করব? মোহনিঞার? সে কি গো, ছেলের পূজো ক'রে তা'র অকল্যাণ করব? তুমি এ কি বলছ গোঁসাই?

সনাতন স্তম্ভিত হইলেন। কথাটার ভাব তিনি ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, মা। যাই হো'ক, ঠাকুরকে অনাচারে রেখো না।"

বলিয়া সনাতন প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলেন, "এ আবার কি! ঠাকুরকে পূজা করতে বললে হেসে উঠে, আচার করতে পরামর্শ দিলে, বলে, পেরে উঠব না। অথচ ঠাকুরকেও ভালবাসে। বুঝলুম না।"

সনাতন বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। তা'র দুই তিন দিন পরে একদা প্রভাতে আবার চৌবের গৃহে উপস্থিত। রুদ্ধ দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "মা"!

চৌবে-গৃহিণী দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন, কিন্তু সনাতনকে ভিতরে আসিতে আহ্বান করিলেন না। সনাতন বলিলেন, "মা, আমায় ক্ষমা কর, আমি তোমার অবুঝ সন্তান।"

চৌ-গৃ। কেন, কি হয়েছে বাবা?

সনা। মদনমোহন কাল রাতে আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছেন, 'তুই আচার করতে কেন ব'লে এসেছিস্? আমি যে আর ঠিক সময়ে খেতে পাইনে। আমি ছেলেদের সঙ্গে ব'সে কত আনন্দে খেতাম, এ দু'দিন ছেলেরাও কেঁদেছে, আমিও কেঁদেছি।' তাই মা, আমি তোমায় বলতে এলাম, আর আচারের প্রয়োজন নেই; তুমি যেমন রেখেছিলে, তেমনি রাখ।

চৌ-গৃ। আমি আজ হ'তে আবার তেমনি রেখেছি বাবা! সে দিন তোমার কথা শুনে দু'একদিন একটু আচার করেছিলাম; ক'রে দেখি, সকলেরই বড় কষ্ট, তাই আজ সকলকেই একসঙ্গে খেতে দিয়েছি। পাছে তা' দেখে তুমি রাগ কর, তাই দ্বার বন্ধ ক'রে ছেলেদের খাওয়াচ্ছি। আর লুকাবার কিছু নেই বাবা, তুমি এখন ভিতরে এস।

ভিতরে আসিয়া সনাতন দেখিলেন—

"চৌবের বালক সহ মদনমোহন,
একত্র বসিয়া অন্ন করেন ভোজন।"

প্রেমেতে সনাতন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মোহনিঞার অধরে মৃদু মধুর হাসি, দৃষ্টি অপাঙ্গ—যেন আড়নয়নে সনাতনকে দেখিতেছেন। সনাতনের আঁখি-জলে বসুন্ধরা প্লাবিত হইল। সনাতন প্রকৃতিস্থ হইয়া চৌবে-গৃহিণীকে যুক্তকরে কহিলেন, "মা, যদি দয়া ক'রে মোহনিঞার প্রসাদাম আমায় কিছু দেও, তবে আমি কৃতার্থ হই।"

গৃহিণী প্রসাদ দিলেন। সনাতন, প্রসাদ মস্তকে ধারণ করিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নয়ন হইতে ঝর-ঝর করিয়া বারিধারা ঝরিতে লাগিল। চৌবে-গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহার গোপাল মনমোহনিঞার প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গোঁসাই ঠাকুরের কেন ভাবান্তর উপস্থিত হইল এ প্রসাদ ত তাঁহারা নিত্য ফেলিয়া দিয়া থাকেন।

সনাতন প্রসাদ লইয়া চোরের ন্যায় ছুটিয়া পলাইলেন। পরদিন প্রভাতে সনাতন পুনরায় আসিয়া চৌবের গৃহে দর্শন দিলেন। তাঁহার বদন প্রফুল্ল, কিন্তু গম্ভীর; একটা আনন্দোচ্ছ্বাস তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তিনি দ্বারে আসিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিতে না ডাকিতে দ্বার খুলিয়া গেল। সনাতন দেখিলেন, চৌবে-গৃহিণীর বদন বিষাদে আচ্ছন্ন; পুত্রশোকাতুরারও বদন এত ক্লিষ্ট ও কাতর দেখা যায় না। সনাতন ডাকিলেন, "মা!"

গৃহিণী উত্তর না করিয়া শুধু কাঁদিতে লাগিলেন।

সনাতন। কি হয়েছে মা?

চৌ-গৃ। তুমি কি আমার মোহনিঞাকে নিতে এসেছ?

সনা। হাঁ, মা। মদনমোহনের আদেশে তাঁকে নিতে এসেছি। স্বপ্নে আমাকে বলেছেন, তুই আমাকে নিয়ে এসে ফুলতুলসী দিয়ে পূজা কর, আমি চৌবের ঘরে আর থাক্‌ব না।

চৌ-গৃ। আমাকেও তাই বলেছে। নিয়ে যাও গোঁসাই, আমি অমন ছেলের মুখ দেখ্‌তে চাইনে। না, দাঁড়াও—আমি বাছাকে ছেড়ে কেমন ক'রে

থাক্‌ব ! না গে, পারব না। তুমি আমার বাকি ছেলে কটাকে নিয়ে যাও, কিন্তু মোহনিঞাকে নিও না, ও যে আমার বুকের কলিজা, ওকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না।

সনা। শান্ত হও মা, মদনমোহন ত তোমারি রহিল ; তুমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে যেও।

গৃহিণীর কান্নার বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। সনাতন মহাধনে লোভ করিয়াছেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না,—ত্বরায় আসিয়া বিগ্রহ ধরিলেন। চৌবে-নন্দনেরা কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিয়া সনাতনকে ধরিল ; বলিল, "আমাদের মোহনিঞাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?"

"আমার আশ্রমে দাদা।"

কনিষ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল, "দেখ মা, আমার মোহনিঞাদাদাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।" জননী তখন বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছিলেন, তিনি কোন উত্তর করিলেন না।

জ্যেষ্ঠ কহিল, "আমার মোহনিঞাকে আমি কিছুতেই নিযে যেতে দেব না—আমাকে আগে মেরে ফেল, তা'র পর নিয়ে যেও।"

ছোট কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে আছড়াইয়া পড়িল ; মুখে কেবল বুলি—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমার দাদাকে নিয়ে যেও না।

সনাতন মহা ফাঁপরে পড়িলেন ; বিগ্রহ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, সকলেই কাঁদিতেছে ; গৃহিণীর প্রাণ যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে ; জ্যেষ্ঠ বালকের নয়নে আগুন ও জল ; কনিষ্ঠ ধূলায় পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতেছে। সনাতন এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মোহনিঞা ত তোমাদের—আমার নয়, আমি চলিলাম।"

সনাতন প্রস্থান করিলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "আহা, কি ব্যাকুলতা ! একে কি প্রেম বলে ? আমার কেন এমন হয় না ? কি করলে কৃষ্ণ তোমাতে আমার প্রেম হয় ? মদনমোহন, কবে তোমায় পাব ?"

নিশিতে পুনরায় স্বপ্ন দেখিয়া সনাতন পরদিন প্রভাতে মদনমোহনকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। চৌবে-নন্দনেরা সে সময় গৃহে ছিল না, তাই তিনি আনিতে পারিয়াছিলেন। ত্রিভুবনের নিধিকে ক্রোড়ে করিয়া চোরের ন্যায় সনাতন ছুটিয়া পলাইলেন এবং আশ্রমে বসাইয়া চোখের জলে পদ ধৌত করিয়া দিলেন ; তুলসীর পরিবর্ত্তে শির তাঁহার চরণে দিলেন ; ফুলের পরিবর্ত্তে হৃদয়পদ্ম দিলেন। সে মদনমোহন আজও আছেন, কিন্তু তাঁহার সে সনাতন নাই।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীজীব-বর্জ্জন

রূপ দীক্ষা লইয়াছিলেন সনাতনের নিকট হইতে ; আবার জীব মন্ত্র লইযাছিলেন রূপের নিকট হইতে। যে বৎসর প্রভু অপ্রকট হন, সেই বৎসর জীব বিংশতি বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন। সে যুগের মহাপুরুষেরা অল্পবয়সেই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। বিশ্বরূপ, নিত্যানন্দ, গোপাল ভট্ট, রূপ, জীব, সনাতন, রঘুনাথ, লোকনাথ, গদাধর, ভূগর্ভ প্রভৃতি অনেকেই অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদা এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থে রূপ-সনাতনের নিকট সমুপস্থিত। রূপ ও সনাতন বিচার না করিয়া পণ্ডিতজীকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। পণ্ডিতজী তখন ষট্‌সন্দর্ভপ্রণেতা অদ্বিতীয় পণ্ডিত জীব গোস্বামীর অনুসন্ধানে রাধাকুণ্ডতীরে আসিলেন। জীব তখন যমুনাতে স্নানে প্রবৃত্ত। গজপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া পণ্ডিতজী, জীবকে অভিবাদন করত কহিলেন, "রূপ ও সনাতন আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন ; তুমিও লিখিয়া দাও, নতুবা বিচারে প্রবৃত্ত হও।"

শ্রীজীব তাঁহার গুরুর অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। বলিলেন, "পণ্ডিতজী, বিনা শাস্ত্রপ্রসঙ্গে রূপ-সনাতন তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তুমি তাঁহাদের তুলনায় কত ক্ষুদ্র, তাহা তুমি গর্ব্বে অন্ধ হইয়া দেখিতে পাও নাই। আমি তাঁহাদের অতি ক্ষুদ্র শিষ্য, আমি এখনি তোমার গর্ব্ব চূর্ণ করিব—বিচারে প্রবৃত্ত হও।" বিচার হইল এবং পণ্ডিতজী সত্বর পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলেন।

শ্রীরূপ এ কথা শুনিয়া জীবের প্রতি কুপিত হইলেন ; বলিলেন, "তুমি বৃথাই বৈষ্ণব হয়েছ ; আজও মান-অভিমান ত্যাগ করতে পার নি। পণ্ডিত জয় চায়, তুমি তাঁহাকে সম্মান দিয়ে নিজে কেন ছোট হ'লে না ?"

শ্রীজীব উত্তর করিলেন, "আমি নিজের সম্মান খুঁজি নি, গুরুর সম্মান খুঁজেছি। গুরু-নিন্দা অসহ্য, তাই তাঁহাকে বিধি-অনুসারে শাসন করেছি।"

রূপ সে কৈফিয়ত গ্রহণ না করিয়া কহিলেন,—

"আজ হইতে তব না হেরিব মুখ।"

এই বজ্রতুল্য বাক্য শুনিয়া জীবের বুক কাঁপিয়া উঠিল; তিনি গুরুর চরণ ধরিয়া অনেক স্তবস্তুতি করিলেন, কিন্তু রূপ প্রসন্ন হইলেন না। তখন জীব অন্নজল পরিত্যাগ করত যমুনার তীরে বসিয়া গুরুর চরণধ্যান করিতে লাগিলেন। সনাতন সে কথা শুনিলেন। তিনি দুই এক দিন পরে রূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সদাচারের মধ্যে কোন্‌টাকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর?"

রূপ। আমার বিবেচনায় জীবে দয়া।

সনা। তবে তোমাতে তা দেখি না কেন?

রূপ, গুরুর ইঙ্গিত পাইয়া তৎক্ষণাৎ জীবের নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বুকে ধরিয়া অনেক অশ্রু বর্ষণ করিলেন।

নবম অধ্যায়

অপ্রাকৃত দেহগ্রহণ

দিনের পর দিন গড়াইয়া চলিল। ১৪৮৬ শক (১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ) সমুপস্থিত। আষাঢ় মাস, পূর্ণিমা তিথি। প্রভাতে রূপগোস্বামী ব্রহ্মকুণ্ডতীরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার মন আজ চঞ্চল, উদ্বিগ্ন। উপাসনায় কিছুতেই মন বসিতেছে না; পাঠ বা ধ্যান যাহাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতেই বিফলকাম হইতেছেন। কৃষ্ণের উপর অভিমান জন্মিল; আহারাদি ত্যাগ করিয়া নীরবে অভিমানভরে বসিয়া রহিলেন। সঙ্কল্প, কেহ আহার্য্য না দিয়া গেলে আহার করিবেন না—মৃত্যু হয়, সেও ভাল। ভক্তের দুঃখ, কাঙ্গালের ঠাকুরের বুকে গিয়া বাজিল; তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—গ্রাম্য-বালকের রূপ ধরিয়া দুগ্ধ-ভাণ্ড হস্তে উপস্থিত হইলেন এবং রূপের সম্মুখে ভাণ্ডটি রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। দুগ্ধ আস্বাদ করিয়া রূপ বুঝিলেন, ইহা অমৃততুল্য; প্রতীতি হইল, এ দুগ্ধ অপ্রাকৃত। কে আনিল,জানিবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন; ধ্যানে অবগত হইলেন যে, যিনি দুগ্ধ আনিয়াছিলেন, তিনি আর কেহ নহেন—তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তখন রূপগোস্বামী প্রেমে হতচৈতন্য হইলেন।

সনাতন এ সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং রূপকে বহু তিরস্কার করিলেন; কহিলেন, "কেন তুমি কৃষ্ণকে দুঃখ দিবার জন্যে উপবাস করেছিলে? তাঁর কত কষ্ট হয়েছে! সেই সুকুমার হস্তে গুরুভার ভাণ্ড নিয়ে, বায়ু অপেক্ষা কোমল চরণে হেঁটে এসে তিনি তোমায় দুধ দিয়ে গেছেন। হায় হায়, সেই দুধ আবার তোমার সেবায় লেগেছে! কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর—আমরা অবোধ ভক্তিহীন, পদে পদে তোমায় ব্যথা দি। (চোখের জল মুছিয়া) শুন রূপ, অতঃপর তুমি আর উপবাসে থাকিবে না—নিজের আহার্য্য নিজে মাধুকরী করিয়া সংগ্রহ করিবে, না পার, রঘুনা আনিয়া দিবে।"

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রূপ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তখন গোস্বামী রঘুনাথ দাস আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমরা আমার কৃষ্ণকে এই পথে যেতে দেখেছ?"

রঘুনাথ অন্ধ, কৃষ্ণের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চক্ষু গিয়াছে। তিনি বনে জঙ্গলে গাছের তলায় সকল স্থানে কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়ান। দেখা পান কি না, কেহ জানে না, কিন্তু অন্বেষণের বিরাম নাই। দিবারাত্রির মধ্যে চারিদণ্ড মাত্র আহার-নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া বাকী সময় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বৃন্দাবনময় ঘুরিয়া বেড়ান।

সনাতন কহিলেন, "রঘুনাথ, তোমার কৃষ্ণ ক্ষণপূর্ব্বে এইখানে ছিলেন।"

রঘুনাথ। কই, কই, আমার কৃষ্ণ কই? আমি যে তাঁর দেখা পাচ্ছি না।

সনাতন। তুমি কি তাঁর দেখা পাওনি গোসাই?

রঘুনাথ। তিনি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছেন।

সনাতন। কত ভাগ্যবান্ তুমি রঘুনাথ! ত্রিলোকের ধন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

এমন সময় দূরে সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হইল। যিনি গাইতেছিলেন, তিনি ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইলেন। সনাতন তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই চিনিলেন। কলেবর ভিন্ন হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে সনাতন বুঝিলেন, এই নবকলেবরধারী আর কেহ নহেন—তিনি সেই মহাপুরুষ মাধবেন্দ্রপুরী। সনাতন প্রভৃতি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তিনি গাইতে লাগিলেন,—

কৃষ্ণ আমায় পাগল করিয়া দাও,
কৃষ্ণ নামেতে আমায় মাতায়ে দাও;
আমি জপিব কৃষ্ণ, ডাকিব কৃষ্ণ, দেখিব কৃষ্ণ ভুবনময়।
আমার বসন ভূষণ হইবে কৃষ্ণ,
আমার আহার বিহার সকলি কৃষ্ণ,
তোমায় কৃষ্ণ দেখিতে দেখিতে আমিও হইব কৃষ্ণময়।

তুমি দূর হ'তে এ'স মিশিবে আমাতে,
অমি ছুটে গিয়ে নাথ মিশিব তোমাতে,
আকাশ পৃথিবী, তুমি ও আমি মিশিয়া হইব কৃষ্ণময়॥

ভাব উথলিয়া উঠিল—সকলেরই নয়নে জল। বৃন্দাবনে শুধু কৃষ্ণনাম—হরিনাম নাই। শ্রীধাম কৃষ্ণময়, বৈষ্ণবদের হৃদয় কৃষ্ণময়, পশুপক্ষী, স্থাবর-জঙ্গম সব কৃষ্ণময়; তারই মধ্যে মহাপ্রেমিককণ্ঠোত্থিত সুর উঠিল—আকাশ পৃথিবী তুমি ও আমি মিশিয়া হইব কৃষ্ণময়। ভক্তেরা প্রেমোন্মত্ত হইয়া ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িলেন, কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অষ্টসাত্ত্বিক ভাব সনাতনের অঙ্গে দৃষ্ট হইল। ক্ষণপরে মহাপুরুষের হস্তস্পর্শে সনাতন বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তখন মহাপুরুষ কহিলেন, "সনাতন, আমি আজ এসেছি কেন বুঝেছ?"

সনাতন। বুঝেছি দয়াময়।

মহাপুরুষ। তবে আর বিলম্ব করো না—পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠেছে।

সনাতন পদ্মাসন করিয়া যমুনাতীরে বসিলেন। বৈষ্ণবেরা শুনিলেন, সনাতন দেহরক্ষা করিবেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে নরনারী ছুটিয়া আসিলেন!

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী; পবিত্রতোয়ে কলঙ্ক ধুইবার আশায় চন্দ্রদেব যমুনায় স্নানার্থে নামিয়াছেন। চারিদিক্ শোভাময়, কিন্তু নিস্তব্ধ। নক্ষত্রের নয়ন, মানুষের আঁখি জ্বলিতেছে; কিন্তু নীরব—মানুষ বা নক্ষত্র সব নীরব। হৃদয় রোরুদ্যমান, কিন্তু ভিতরের চীৎকার বাহিরে শুনা যাইতেছে না। সব স্থির—নিস্তব্ধ।

যমুনার অপরপারে জঙ্গল। সনাতন দেখিলেন, তীরের উপর একটি ক্ষুদ্রকায় কদম্ববৃক্ষ। ক্ষুদ্র হইলেও তাহার দেহ ফুলভরা। সেই ফুলময় বৃক্ষতলে রাধা-কৃষ্ণ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সনাতন দেখিলেন। শুভ্র-ফুলদল তাঁহাদের আশেপাশে ঝরিয়া পড়িয়াছে; বৃক্ষ তাঁহাদের মাথার উপর ছত্র ধরিয়াছে, একটা জ্যোতিঃ জ্যোৎস্নাকে মলিন করিয়া মূর্ত্তিদ্বয় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। যমুনা ফুলিয়া উঠিয়া সেই যুগলচরণে পড়িবার জন্য ছুটিয়াছে। আকাশের চন্দ্রতারা নামিয়া আসিয়া চরণ-নখরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উষাদেবী অসময়ে আবির্ভূত হইয়া যুগলচরণতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। গলায় বনমালা, অধরে হাসি, নয়নে করুণা, শ্রীহস্তে মুরলী। সহসা বংশী বাজিয়া উঠিল; অতি মৃদু, অতি ধীর, অতি করুণ। সেই মৃদুধ্বনিতে কত আবেগ, কত স্নেহ, কত আহ্বান। সনাতন পুলকিত-কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিলেন—

"যাই, যাই দয়াময়!"

সব অন্তর্হিত হইল। সে গাছ নাই, সে যুগলমূর্ত্তি নাই, সে বংশীধ্বনি নাই। রহিল শুধু বিরহ। সনাতন কাঁদিয়া উঠিলেন।

মহাপুরুষ ডাকিলেন, "সনাতন!"

"সনাতনের বুকের ভিতর কান্নার রোল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ কহিলেন, "সনাতন, দ্বাপরের অবতারে তুমি কে ছিলে, তাহা বোধ হয় ভাবিয়া দেখ নাই। তুমি পুনরায় শ্রীনবমঞ্জরীর দেহ ধারণ করিয়া ব্রজধামে নিত্যলীলা করিতে থাক।"

সম্পূর্ণ